উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

চতুর্থবর্ষ।

১৩০৮ মাঘ হইতে ১৩০৯ পৌষ।

স্বামী ত্রিগুণাতীত--সম্পাদক।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—(সডাক) ২৲।

প্রয়োজন প্রতি বর্ষের সমগ্র উদ্বোধন কাপড়ে ভাল বাঁধাই ম৹ ; ডাকমাশুল
চারি আনা ও ভিঃ পিঃ খরচা ৵০ স্বতন্ত্র।

১৫ই পৌষ, ১৩০৯ সাল।

কলিকাতা, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কম্বুলেটোলা, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেনস্থ
[illegible] যন্ত্র হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

কে তুমি?

(বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।)

দুষ্টের শাসনে যবে দীনের দুর্গতি,
কে তুমি "শ্রীকৃষ্ণ" নাম করিয়া ধারণ,
দীনে রক্ষি কুরুক্ষেত্রে হইয়া সারথী,
দুষ্টে নাশি ধর্ম্মরাজ্য করিলা স্থাপন?
ভক্তিহীন বঙ্গ যবে বিদ্যার গৌরবে,
কে তুমি "চৈতন্য" রূপে হইয়া উদয়,—
পরাজিয়া পণ্ডিতেরে বিদ্যার প্রভাবে,
হরিনামে প্রচারিলা ভক্তির বিজয়?
ধনলোভী নর এবে ভোগপরায়ণ,
ভ্রান্তবুদ্ধি, তর্করত—নাহি ধর্ম্মলেশ,—
"রামকৃষ্ণ" নামে আসি কে তুমি ব্রাহ্মণ,
"কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ"—দিলা উপদেশ?
কে তুমি হইয়া মূর্খ, দানিলা যে নীতি—
সুপ্ত বিশ্ব জাগরিত শুনি সে ভারতী!
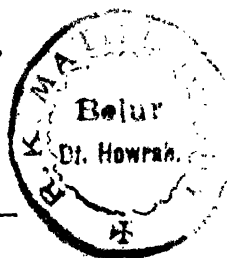
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—লিখিত।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, শ্রীযুক্ত ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি ভক্তেরকথোপকথন।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ রবিবার, ১০ই কার্ত্তিক, কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথি। ইংরাজি ২৫শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কলিকাতায় সেই শ্যামপুকুরের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। গলার Cancer চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন। আজকাল ডাক্তার সরকার দেখিতেছেন।

মাষ্টারকে ডাক্তারের কাছে পরমহংসদেবের অবস্থা জানাইবার জন্য প্রত্যহ পাঠান হইয়া থাকে। আজ সকালে বেলা ৬॥০ টার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন আছেন?" ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন, "ডাক্তারকে বল্‌বে, শেষরাত্রে একমুখ জল হয়, কাশি আছে", ইত্যাদি। "জিজ্ঞাসা করবে, নাইবো কি না?"

মাষ্টার ৭ টার পর ডাক্তার সরকারের সঙ্গে দেখা করিলেন ও সমস্ত অবস্থা বলিলেন। ডাক্তার সরকারের বৃদ্ধ শিক্ষক ও দুই একজন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার (বৃদ্ধ শিক্ষকের প্রতি)। মহাশয়, রাত তিন্‌টে থেকে পরমহংসের ভাবনা আরম্ভ হয়েছে—ঘুম নেই। এখনও পরমহংস চল্‌ছে। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তারের একজন বন্ধু (ডাক্তারের প্রতি)। মহাশয়, শুনতে পাই, পরমহংসকে কেউ কেউ অবতার বলে। আপনি তো রোজ দেখ্‌ছেন, আপনার কি বোধ হয়?

ডাক্তার। As man, I have the greatest regard for him.

মাষ্টার। (ডাক্তারের বন্ধুর প্রতি) ডাক্তার মহাশয় তাঁকে অনুগ্রহ করে অনেক দেখ্‌ছেন।

ডাক্তার। অনুগ্রহ!—

মাষ্টার। আমাদের উপর অনুগ্রহ বল্‌ছি; পরমহংসদেবের উপর বল্‌ছি না।

ডাক্তার। তা নয় হে! তোমরা জানো না, আমার actual loss হচ্চে, রোজ রোজ ২। ৩ টা call যাওয়াই হচ্চে না। তারপর দিন আপনিই রোগীদের বাড়ী যাই, আর fee নিই না—আপনি গিয়ে fee নেবো কেমন কোরে?

শ্রীযুক্ত ম—চক্রবর্ত্তীর কথা হইল। শনিবারে যখন ডাক্তার পরমহংসদেবকে দেখিতে যান, তখন চক্রবর্ত্তী উপস্থিত ছিলেন, ডাক্তারকে দেখিয়া তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়, আপনি ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ করেছেন।'

মাষ্টার। (ডাক্তারের প্রতি) ম—চক্রবর্ত্তী আপনার এখানে আগে আসিতেন। আপনি বাড়ীতে ডাক্তারী Science এর lecture দিতেন; তিনি শুন্‌তে আসতেন।

ডাক্তার। বটে? লোকটার কি তমো! দেখ্‌লে আমি নমস্কার কর্‌লুম as God's Lower Third? আর ঈশ্বরের ভিতর তো (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) সব গুণই আছে; তুমি ও কথাটা mark করেছিলে, 'আপনি ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ করে বসেছেন'?

মাষ্টার। ম--চক্রবর্ত্তীর বিশ্বাস যে, পরমহংসদেব মনে কর্‌লে নিজে ব্যারাম আরাম কর্ত্তে পারেন।

ডাক্তার। ওঃ! তাকি হয় যে, আপনি ব্যারাম ভাল করা! আমরা ডাক্তার, আমরা তো জানি, ও cancerএর ভিতর কি আছে—আমরাই আরাম করতে পারি না—উনি তো কিছু জানেন না, উনি কি রকম করে আরাম কর্‌বেন!

(বন্ধুদের প্রতি) দেখুন, রোগ দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু এরা তেমনি সকলে devoteeর মত সেবা কর্‌ছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(সরলতা ও ঈশ্বরলাভ।)

মাষ্টার ডাক্তারকে আসিতে বলিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর, বেলা ৩টার সময় আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন।

মাষ্টার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। ডাক্তার আজ বড় অপ্রতিভ করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি হয়েছে?

মাষ্টার। আপনি 'হতভাগা ডাক্তারদের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ করে বসেছেন', একথা কাল শুনে গিছ্‌লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কে বলেছিল?

মাষ্টার। ম—চক্রবর্ত্তী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তার পর?

মাষ্টার। তা ম-চক্রবর্ত্তীকে বলে,'তমোগুণী ঈশ্বর' (God's Lower Third)। এখন ডাক্তার বল্‌ছে, ঈশ্বরে সব গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) আছে। (পরমহংসদেবের হাস্য)।

মাষ্টার। আবার আমায় বল্লে, রাত তিনটার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেছে

আর পরমহংসের ভাবনা। বেলা ৮টার সময় বলে, 'এখনো পরমহংস চল্‌ছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। ও ইংরাজী পড়েছে, ওকে বল্‌বার যো নাই আমাকে চিন্তা কর, তা আপনিই কর্‌ছে।

মাষ্টার। আবার বলে —'As man I have the greatest regard for him' এর মানে এই, আমি তাঁকে অবতার বলি না, কিন্তু মানুষ বলে যতদূর সম্ভব, আমার ভক্তি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর কিছু কথা হলো ?

মাষ্টার। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম 'আজ ব্যারামের কি বন্দোবস্ত হবে ?' ডাক্তার বল্লে, 'বন্দোবস্ত আর আমার মাথা আর মুণ্ডু, আবার আজ যেতে হবে, আর কি বন্দোবস্ত (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)। আরো বল্লে, তোমরা জানো না যে, আমার কত টাকা লোক্‌সান রোজ হচ্চে, দুই তিন জায়গায় রোজ যেতে ভুল হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(বিজয়াদিভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দ।)

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিলেন। সঙ্গে কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত। বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় অনেক দিবস ছিলেন, আপাততঃ পশ্চিমে অনেক তীর্থ ভ্রমণ ক'রে সবে এসে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। আসিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এ সময়ে অনেকে উপস্থিত ছিলেন, নরেন্দ্র, ম—চক্রবর্ত্তী, নবগোপাল, ভূপতি, লাটু, মাষ্টার, ছোট নরেন্দ্র ইত্যাদি অনেকগুলি ভক্ত।

ম-চক্রবর্ত্তী (বিজয়ের প্রতি)। মহাশয়, অনেক দেশ তীর্থ দেখে এলেন, এখন কি দেখ্‌লেন বলুন।

বিজয়। কি বল্‌বো! দেখ্‌ছি, যেখানে এখন বসে আছি, এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোন কোন জায়গায় এঁরই এক আনা কি দুই আনা, কোথায় চারি আনা, এই পর্য্যন্ত। এখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখ্‌ছি।

ম-চক্রবর্ত্তী। ঠিক বলেছেন, আবার ইনিই ঘোরান্‌, ইনিই বসান্‌।

* * * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রাদির প্রতি) দেখ, বিজয়ের কি অবস্থা হয়েছে!

লক্ষণ সব বদ্‌লে গেছে, যেন আউটে গেছে। আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিন্‌তে পারি। বল্‌তে পারি, পরমহংস কি না।

ম-চক্রবর্ত্তী (বিজয়ের প্রতি)। মহাশয়! আপনার আহার কমে গেছে?

বিজয়। হাঁ, বোধ হয় গিয়াছে।

(শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনার পীড়ার কথা শুনে দেখ্‌তে এলেম। আবার ঢাকা থেকে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি?

বিজয় কোন উত্তর দিলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

বিজয়। ধরা না দিলে ধরা শক্ত। এখানে ষোল আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেদার * বল্লে, অন্য জায়গায় খেতে পাই নাই—এখানে এসে পেটভরা পেলুম।

ম-চক্রবর্ত্তী। পেটভরা কি, উপ্‌চে পড়্‌ছে!

বিজয়। (হাত জোড় করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) বুঝেছি আপনি কে, আর বল্‌তে হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভাবস্থ) যদি তা হয়ে থাকে, তো তাই।

বিজয়। বুঝেছি।

এই বলিয়া বিজয় ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদমূলে পতিত হইলেন ও নিজের বক্ষে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।

এই প্রেমাবেশ, এই অদ্ভুত দৃশ্য, দেখিয়া উপস্থিত ভক্তেরা কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ স্তব করিতে লাগিলেন। যাঁহার যে মনের ভাব, তিনি সেই ভাবে একদৃষ্টে ঠাকুর রামকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেহ তাঁহাকে পরম ভক্ত, কেহ সাধু, কেহ বা সাক্ষাৎ দেহধারী ঈশ্বরাবতার দেখিতে লাগিলেন। যাঁহার যেমন ভাব!

শ্রীযুক্ত ম-চক্রবর্ত্তী সাশ্রুনয়নে গাইলেন——

দেখ দেখ প্রেমমূর্ত্তি—

ও মাঝে মাঝে যেন ব্রহ্মদর্শন করিতেছেন, এই ভাবে বলিতে লাগিলেন,—

"তুরীয়ং সচ্চিদানন্দম্ দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্।"

* শ্রীযুক্ত কেদার চাটুর্য্যে অনেক দিন ঢাকায় ছিলেন। ঈশ্বরের কথা পড়িলেই তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইত। একজন পরম ভক্ত।

সবগোপাল কাঁদিতে লাগিলেন।

আর একটি ভক্ত গাইলেন—

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর ভূমি,
মঙ্গলের তুমি, মূলাধার।
নানা রসযুত ভব, গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়,
মহাকবি আদি কবি, ছন্দে উঠে শশী রবি,
ছন্দে পুনঃ অস্তাচলে যায়।
তারকা কনক কুচি, জলদ অক্ষর রুচি,
গীত লেখা নীলাম্বর পাতে ;
ছয় ঋতু সম্বৎসরে, মহিমা কীর্ত্তন করে,
সুখপূর্ণ চরাচর সাথে।
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্র রবে রুদ্র তুমি ভীম ;
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
ধ্যায় যুগযুগান্ত অসীম।
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে,
কোটিচন্দ্রে কোটি সূর্য্য তারা ;
তোমারি এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারী
হাহাকারে নেত্রে বহে ধারা।
মিলি সুর, নর, ঋভু, প্রণমে তোমায় বিভু,
তুমি সর্ব্ব-মঙ্গল-আলয় ;
দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম,
দেও দেও ওপদে আশ্রয়।

সেই ভক্তটী আবার গাইলেন,—

ঝিঁঝিঁট—কীর্ত্তন।

(খয়রা) চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দলহরী।
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।

বিবিধ বিলাস রসপ্রসঙ্গ,　　কত অভিনব ভাবতরঙ্গ;
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ,　　নবীন নবীন রূপ ধরি।
(হরি হরি বলে)
মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল,
দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল,
(আশা পূরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল।)
(এখন) আনন্দে মাতিয়া, দুবাহু তুলিয়া,
বলরে মন হরি হরি।

(ঝাঁপতাল)

টুটল ভরম ভীতি,　　ধরম করম নীতি
দূর ভেল জাতি কুলমান;
কাঁহা হাম, কাঁহা হরি,　　প্রাণ মন চুরি করি,
বঁধুয়া করিলা পয়ান;
(আমি কেনই বা এলাম রে প্রেমসিন্ধুতটে)
ভাবেতে হওল ভোর,　　অব হুঁ হৃদয় মোর,
নাহি যাত আপনা পরাণ;
প্রেমদাস কহে হাসি,　　শুন সাধু জগবাসী,
এয়সাহি নূতন বিধান।
(কিছু ভয় নাই! ভয় নাই)॥

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) কি একটা হয় আবেশে। এখন লজ্জা হচ্চে। যেন ভূতে পায়। আমি আর আমি থাকি না।

[ব্রহ্মজ্ঞান ও আশ্চর্য্য গণিত]

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ অবস্থার পর গণনা হয় না। গণ্‌তে গেলে ১। ৭। ৮ এই রকম গণা হয়।

নরেন্দ্র। সব এক কি না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, এক দুয়ের পার। *

ম-চক্রবর্ত্তী। আজ্ঞা হাঁ, দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হিসাব পচে যায়। পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়

* এক দুয়ের—The Absolute as distinguished from the Relative.

না। তিনি শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের পার। হাতে একখান বই যদি দেখি, জ্ঞানী হলেও তাকে রাজর্ষি বলে কই। ব্রহ্মর্ষির কোন চিহ্ন থাকে না। শাস্ত্রের কি ব্যবহার জানো? একজন চিঠি লিখেছিল, পাঁচ সের সন্দেশ ও একখান কাপড় পাঠাইবে। যে চিঠি পেলে, সে চিঠি পড়ে /৫ সের সন্দেশ ও একখান কাপড় এই কথা মনে রেখে চিঠিখানা ফেলে দিলে। আর চিঠির কি দরকার?

[অবতারের প্রয়োজন]

বিজয়। সন্দেশ পাঠান হয়েছে, বোঝা গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষদেহ ধারণ করে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পুরে না, প্রয়োজন মেটে না। কি রকম জানো! গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে; শিঙটা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হোলো; কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়।

ম-চক্রবর্ত্তী। দুধ যদি দরকার হয়, গাইটার শিঙে মুখ দিলে কি হবে? বাঁটে মুখ দিতে হবে। (সকলের হাস্য)।

বিজয়। কিন্তু বাছুর প্রথম প্রথম এদিক উদিক ঢুঁ মারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আবার কেউ হয়তো বাছুরকে ঐ রকম দেখে বাঁট্‌টা ধরিয়ে দেয়। (সকলের হাস্য)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময়ে ডাক্তার তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার সরকার। কাল রাত তিনটে থেকে আমার ঘুম ভেঙ্গেছে। কেবল তোমার জন্য ভাব্‌ছিলাম। ভাব্‌ছিলাম, পাছে ঠাণ্ডা লেগে থাকে। আরো কত কি ভাব্‌ছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাশি হয়েছে, টাটিয়েছে, শেষ রাত্রে একমুখ জল, আর যেন কাঁটা বিঁধ্‌ছে।

ডাক্তার। সকালে সব খপর পেয়েছি।

* * * * *

শ্রীম-চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভারতবর্ষ ভ্রমণের কথা বলিতেছিলেন। বলিলেন

য, লঙ্কাদ্বীপে 'laughing man' নাই। ডাক্তার সরকার বলিলেন তা হলে, ওটা 'inquire' করতে হবে। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তারী কর্ম্মের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। ডাক্তারী কর্ম্ম খুব উঁচু কর্ম্ম বলে অনেকের বোধ আছে। যদি টাকা না নিয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া করে কেউ চিকিৎসা করে, তবে সে মহৎ। কাযটাও মহৎ। কিন্তু টাকা নিয়ে ওসব কায করতে করতে মানুষ নির্দ্দয় হয়ে যায়। ব্যবসার ভাবে টাকার জন্য হাগা বাহ্যের রং এইসব দেখা—নীচের কায।

ডাক্তার। তা যদি শুধু করে, তা হলে কায খারাপ বটে। তোমার কাছে বলা গৌরব করা।—

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ডাক্তারী কাযে নিঃস্বার্থভাবে যদি পরের উপকার করা থাকে, তা হলে খুব ভাল। তা যে কর্ম্মই লোকে করুক না কেন, সংসারী ব্যক্তির মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ বড় দরকার। ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে লোকে সাধুসঙ্গ আপনি খুঁজে লয়। আমি উপমা দিই গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে। অন্য লোক দেখলে মুখ নীচু করে চলে যায়, বা লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু আর একজন গাঁজাখোর দেখলে মহা আনন্দ। হয় ত কোলাকুলি করে। আবার শকুনি শকুনির সঙ্গে থাকে।

ডাক্তার। আবার কাকের ভয়ে শকুনি পালায়। আমি বলি, শুধু মানুষ কেন, সব জীবেরই সেবা করা উচিত। আমি প্রায় চড়ুই পাখীকে ময়দা দিই। ছোট ছোট ময়দার গুলি করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলি, আর ছাদে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই পাখী এসে খায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাঃ, এটা খুব কথা। জীবকে খাওয়ান সাধুর কায। সাধুরা পিঁপড়েদের চিনি দেয়।

ডাক্তার। আজ গান হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। একটু গান কর্ না।

নরেন্দ্র গাইতে লাগিলেন, তানপুরা সঙ্গে। অন্য বাজনাও হইতে লাগিল।

সুন্দর তোমার নাম দীন-শরণ হে,
বরিষে অমৃত ধার, জুড়ায় শ্রবণ, (ও) প্রাণরমণ হে।
এক তব নাম-ধন অমৃত-ভবন হে,

অমর হয় সেই জন যে করে কীর্ত্তন হে।

গভীর বিষাদরাশি, নিমেষে বিনাশে ;

যখনি তব নাম-সুধা শ্রবণে পরশে ;

হৃদয় মধুময়, তব নাম গানে,

হয় যে হৃদয়নাথ চিদানন্দ ঘন হে।

নরেন্দ্র আবার গাইলেন,—

আমায় দে মা পাগল করে, আর কায নাই জ্ঞান বিচারে।

(ব্রহ্মময়ী দে মা পাগল করে)

ওমা) তোমার ও প্রেমের সুরা, পানে করো মাতোয়ারা,

ওমা ভক্তচিত্তহরা, ডুবাও প্রেমসাগরে।

তোমার এ পাগলাগারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,

কেহ নাচে আনন্দ ভরে ;

ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,

হায় কবে হব মা ধন্য, ওমা মিশে তার ভিতরে।

গানের পর আবার অদ্ভুত দৃশ্য ! সকলেই ভাবে উন্মত্ত। পণ্ডিত পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বল্‌ছেন, 'আমায় দে মা পাগল করে আর কায নাই জ্ঞান বিচারে'। বিজয় সর্ব্ব প্রথমে আসন ত্যাগ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর দেহের কঠিন অসাধ্য ব্যাধি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার সম্মুখে। তিনিও দাঁড়াইয়াছেন। রোগীরও হুঁস নাই। ডাক্তারেরও হুঁস নাই। ছোট নরেনেরও ভাব-সমাধি হইল। লাটুরও ভাব-সমাধি হইল। ডাক্তার Science পড়িয়াছেন, কিন্তু অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, যাঁহাদের ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের বাহ্য চৈতন্য কিছুই নাই, সকলেই স্থির, নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছেন—ভাব উপশম হইলে কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ হাসিতেছেন, যেন কতকগুলি মাতাল একত্র হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এই কাণ্ডের পর সকলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন। রাত ৮টা হইয়া গিয়াছে। আবার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। এই যা ভাবটাব দেখ্‌লে, তোমার Scienceএ কি বলে? তোমার কি সব ঢং বোধ হয়?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। যেখানে এত লোকের হচ্চে, সেখানে natural (আন্তরিক) বোধ হয়, ঢং বোধ হয়না।

(নরেন্দ্রের প্রতি)। যখন তুমি গাচ্ছিলে, 'দে মা পাগল করে আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে' তখন আর থাক্‌তে পারি নাই। দাঁড়াই আর কি! তার পর অনেক কষ্টে ভাব চাপ্‌লুম, এই ভাব্‌লুম যে, display করা হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) তুমি যে অটল, অচল, সুমেরুবৎ (সকলের হাস্য)। তুমি গম্ভীরাত্মা। রূপসনাতনের ভাব কেউ টের পেতো না—যদি ডোবাতে হাতী নামে, তা হলেই তোলপাড় হয়ে যায়, কিন্তু সায়রে দীঘিতে হাতী নাম্‌লে তোলপাড় হয় না, কেউ হয় তো টেরও পায় না। শ্রীমতী সখীকে বল্লেন, "সখি, তোরা তো কৃষ্ণের বিরহে কত কাঁদ্‌ছিস, কিন্তু দেখ্, আমি কি কঠিন, আমার চক্ষে একবিন্দুও জল নাই।" তখন বৃন্দা বল্লেন, "সখি, তোর চক্ষে জল নাই, তার অনেক মানে আছে। তোর হৃদয়ে বিরহ অগ্নি সদা জ্বল্‌ছে; চক্ষে জল উঠ্‌ছে আর সেই অগ্নির তাপে শুকিয়ে যাচ্চে।"

ডাক্তার। তোমার সঙ্গে তো কথায় পার্‌বার যো নাই। (সকলের হাস্য)।

* * * * *

ক্রমে অন্য কথা পড়িল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজের প্রথম ভাবাবস্থা বর্ণনা করিতেছিলেন। কাম ক্রোধাদি কিরূপে বশ করিতে হয়, সেই কথা হইতেছিল।

ডাক্তার। তুমি ভাবে পড়েছিলে, আর একজন দুষ্ট লোক তোমায় বুট জুতার গোঁজা মেরেছিল, সে সব কথা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাষ্টারের কাছে শুনেছ। সে কালীঘাটের চন্দ্র হালদার। সেজো * বাবুর কাছে প্রায় আস্‌তো। আমি ঈশ্বরের আবেশে মাটীতে অন্ধকারে পড়ে আছি। চন্দ্র হালদার ভাব্‌তো, আমি ঢং করে ঐ রকম থাকি, বাবুর প্রিয়পাত্র হবো বলে। সে সেই অন্ধকারে এসে বুটের গোঁজা

* 'সেজো বাবু'—রাসমণির জামাতা। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে অতিশয় ভক্তি করিতেন ও শিষ্যের ন্যায় সেবা করিতেন।

দিতে লাগ্‌লো। গায়ে দাগ হয়েছিল। সবাই বল্লে, সেজো বাবুকে বলে দেওয়া যাক্‌। আমি বারণ কর্‌লুম।

ডাক্তার। এও ঈশ্বরের খেলা, ওতেও লোক শিখ্‌বে। ক্রোধ কি রকম করে বশীভূত করতে হয়, ক্ষমা কাকে বলে, লোকে শিখ্‌বে।

* * * * *

ইতিমধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সম্মুখে বিজয়ের সঙ্গে ভক্তদের অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

বিজয়। কে একজন আমার সঙ্গে সদাসর্ব্বদা থাকেন, আমি দূরে থাক্‌লেও তিনি জানিয়ে দেন, কোথায় কি হচ্চে।

নরেন্দ্র। Guardian angel এর মত।

বিজয়। ঢাকায় এঁকে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি! গা ছুঁয়ে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। সে তবে আর একজন।

নরেন্দ্র। আমিও এঁকে নিজে অনেকবার দেখিছি। (বিজয়ের প্রতি) তাই কি করে বল্‌বো—আপনার কথা বিশ্বাস করি না।

অরণ্যে রোদন।

আমাদের এ জগতে, যাকে হিসাবি কায বলে—ভূদিকরাখা কায—সেটা হওয়া বড় শক্ত। যখন যা বাড়্‌তে আরম্ভ করে, বেড়েই চলে। সেই বাড়েতেই যে মরণ হবে, তা মনে থাকে না।

মানুষের সম্বন্ধেই যে এ কথা সত্য, প্রকৃতির অন্য বিভাগে সত্য নয়, তা নয়। পেলিয়ণ্টলজিবিৎ (Palæontology) পণ্ডিতেরা ভূগর্ভে এক প্রকার বাঘের কঙ্কাল পান, যাদের একটি দাঁত তলবারের মত (Saber-toothed tiger)। দাঁতটি বেড়ে বেড়ে তলবারাকৃতি হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম বাড়ের অবস্থায় দাঁত খুব কায দিয়েছিল। সে দাঁতের কাছে কোন জন্তু পেরে উঠ্‌তেন না, বা পালাতে পার্‌তেন না। ক্রমে ব্যবহার বেড়ে যেতে দাঁতও বাড়্‌তে লাগ্‌লেন, অবশেষে সেই সারা জাতটা এক বিষম দাঁত নিয়ে মারা পড়্‌ল। দাঁত এমন বাড় বাড়্‌লে যে, চোয়ালের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। কাযেই সারা জাতটা ধ্বংস হল। এখন সাক্ষী আছেন মাত্র কঙ্কাল।

যে পদার্থটা একবার একটা জাতি বা সমাজের উন্নতির কারণ হয়, সেই

পদার্থই আবার সেই জাতি বা সমাজের সর্ব্বনাশ করে। জগতের সমস্ত প্রাচীন জাতির ইতিহাস এই সত্যের দৃষ্টান্তে পূর্ণ। যে সকল জাতি বল বীর্য্যের উৎকর্ষ সাধনে সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে যুদ্ধে এমন পারদর্শিতা লাভ করলেন যে, সসাগরা পৃথিবী জয় করা তাঁদের অনায়াসসাধ্য হয়ে উঠল, সেই বলবীর্য্য, সেই রণমদ, সময়ে সেই জাতিগুলিকে হীনবীর্য্য, কাপুরুষ, জন্মভূমিরক্ষণে অক্ষম ভেড়ার দলে পরিণত করে। বর্ত্তমান গ্রীস, রোম, স্পেন প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। যত বীরগুলি, মহাপ্রাণ মনীষীগুলি, যুদ্ধে শরীর পাত করেন; ঘরে থাকে হতভাগাগুলো। এই প্রকার যত যুদ্ধ হয়, তত ভালর সংখ্যা কমে যায়, মন্দগুলোর উপর গৃহস্থালির ভার, বংশরক্ষা প্রভৃতি, পড়ে, কাযেই জাতিটা কেবল নিরেশ, বাতিল, ছাঁটপড়া লোকের সমষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। এত রক্তে উপার্জ্জিত অধিকারগুলো বজায় রাখতে পারে না; চেষ্টা করতে গিয়ে আপনাদের জন্মভূমিটুকুও খোয়াতে বসে।

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় এই সত্যের আর একটি সাক্ষী। পোপের কথা অটুট, অভ্রান্ত, আমাদের দেশের 'বেদবাক্যের' সমান। পোপ এক কলম লিখে দিলেই বা একটা মুখের কথা খসালেই, লোকের পাপ, দুষ্কৃতি, সব মোচন হয়ে যায়। হুহু করে সম্প্রদায় বেড়ে উঠলো। সারা য়ুরোপ ছেয়ে ফেল্লে। কিন্তু তার পর? যার দ্বারা উৎপত্তি, সেই কর্‌লে নিবৃত্তি। বিপরীত দিকে স্রোত ফিরিল। পোপের পাপ দূর করবার শক্তি নাই, ও মিছে কথা, এতদিন পৃথিবী ঠকেছে। এখন রোমান ক্যাথলিকের বিপক্ষ কত সম্প্রদায় উঠেছে, পোপের ইহপরলোকব্যাপিনী শক্তি কত খাট হয়ে গেছে।

এই দুনিয়ার ব্যাপার। যা হতে জীবন, তারি হাতে মরণ। তবে এর ভিতর একটা সামঞ্জস্য করা চলে। সময়ে সাবধান হলে, বাড়ের গতিটা ফিরিয়ে দিলে, শ্রীভ্রষ্ট হতে হয় না। তার প্রমাণ বর্ত্তমান জাপান।

এসিয়া খণ্ডের অন্য প্রাচীন জাতিগুলির মত জাপানও কঠিন সামাজিক বন্ধনে বদ্ধ ছিল। সামাজিক বন্ধন উচ্চ সভ্যতার লক্ষণ ও সোপান। কিন্তু তা হলে হবে কি? ঐ বন্ধনই আবার উদ্বন্ধন প্রসব করে। উচ্চ সভ্যতার প্রারম্ভে আমাদের জাতির সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি সামাজিক উৎকর্ষ লাভে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, কিসে প্রত্যেক ব্যক্তিটি সমাজশরীরে ঠিক ঠিক

অবয়বের কায করতে পারবে—কিসে কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে না, এই চিন্তাতেই সব বড় মাথা গুলো লেগেছিল। ফল হল, দাঁতন করা থেকে সন্তানোৎপাদন পর্য্যন্ত যাবতীয় কায বিধিবদ্ধ হয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটার মত মানুষের জীবন নিয়মিত হল। যত দিন জাতীয় জীবনীশক্তি সম্পূর্ণ ভাবে বিধিনিষেধের বশে আসে নি, তত দিন বেশ চলেলো। যেই বশীভূত হয়ে গেল, জাতটা হয়ে দাঁড়াল ঘড়ি ; মনুষ্যত্ব চলে গেল। বিধি নিষেধ গুলির ঠিক ঠিক উদ্দেশ্য ও মানে ভুলে গেল, তারা হয়ে দাঁড়াল চোরের বেড়ী। জাপান ব্যাপারটা সময়ে বুঝতে পারলে, সামাজিক বন্ধন শিথিল করে, ঐ শক্তিট অন্য পথে চালিয়ে দিলে, দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল। আমরা এখনো বুঝতে পারছি না।

আজকাল য়ুরোপের একটি প্রধান ভাবনা কিসে অধিক লোকে বিবাহ করে, আর যৌবন থাকতে থাকতে করে। য়ুরোপে বিবাহটা দিন দিন এমন দামি বড়মানষি হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, অধিকাংশ লোকেই দুর্ম্মূল্য পদার্থ বলে বিবাহের কাছে ঘেঁসতে চায় না। যখন টাকা কড়ি জমে, (জমতে জমতে যৌবন ফুরিয়ে যায়) তখন বিবাহ করে। আমাদের দেশে ঠিক উল্টা ভাবনা। কিসে লোক একটু বেশী বয়সে বিবাহ করে, এবং কিছু অন্ন সংস্থানের পর। য়ুরোপে প্রতীকারের নানা চেষ্টা হচ্ছে। ফ্রান্স প্রভৃতিতে গভর্ণমেণ্টও উদ্যোগী হয়েছেন। আমাদের দেশে যে কিছুই হচ্ছে না, তা বলতে পারি না। কিন্তু এত অল্প পরিমাণে হচ্ছে যে, সে না হবারই মধ্যে। আমাদের মনে হয়, তার কারণ বিষয়টা ঠিক ঠিক না বুঝা। কোথায় রোগ ঠিক না ধরতে পারা।

বাড়ের মুখে পাকে না। বাড় শেষ হলেই, পুরুষ্টু হলেই, পাকে। যত দিন কোন একটা জিনিষ পূর্ণতা পায় না, অর্থাৎ যতদিন তার অবয়বগুলি এখনও বাড়ছে, সম্পূর্ণতা পায়নি, ততদিন সে জিনিষটির পরিপক্কতা হয় নি। পরিপক্কতা হলে তবে সে জিনিষটীর ঠিক ঠিক জনন-শক্তি হয়, অর্থাৎ তার দ্বারা উৎপাদিত জীব, সেই জাতিসুলভ অবয়ব, গুণ প্রভৃতির পূর্ণতা লাভ করতে পারে। নতুবা নয়। চারা গাছে ফল ধরলে ফলগুলি ভেঙ্গে দিতে হয়। তা না হলে গাছও খারাপ হয়ে যায়, আর ফল ত ভাল হয়ই না। ছেলেদের দাঁত বেরুলেই কি বুঝতে হবে যে, তারা যা তা খাবার উপযুক্ত হল ? না দাঁত গুলি শক্ত হলে তবে শক্ত জিনিষ খেতে দেওয়া উচিত ?

কিন্তু কি পোড়া কপাল, এই সামান্য কথাটা আমাদের দেশে লোকে এ পর্য্যন্ত বুঝ্‌লে না। মেয়েদের ঋতু হলেই, আমাদের পণ্ডিতেরা বুঝ্‌লেন, তাদের গর্ভধারণসামর্থ্য হয়েছে, অমনি গর্ভাধান কর্‌তে হবে, আর দেরী সয় না! প্রসবক্রিয়া যে যন্ত্রের সাহায্যে হয়, তাকে পেলভিস্ (pelvis) বলে, এবং তার মধ্যেই গর্ভ থাকে। সেই যন্ত্রটি যখন পূর্ণতা লাভের পথে প্রথম পা দেয়, তখন প্রথম ঋতু হয়। এ দেশে অন্ততঃ ১৯।২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এ যন্ত্রটি পূর্ণাবয়ব হয় না। তা ছাড়া ১৯।২০ বৎসর বয়স না হলে সন্তান-পোষক অবয়ব গুলিও (mammary glands) পূর্ণতা পায় না। কিন্তু আমাদের দেশে ১৪।১৫ বৎসর বয়স থেকেই মেয়েরা মা হতে সুরু করে। কুড়িতে ত বুড়ি হয়ে যায়! সুতরাং আমরা দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা, অধ্যবসায়হীনতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহের অনন্যাধার হব, তার আর আশ্চর্য্য কি? চারা গাছের ফল, কচি কাঠের তক্তা, কোথায় কাযের হয়ে থাকে? কাযেই আমরা যা কর্‌তে যাই না কেন, অলক্ষ্মী তার আগে আগে! এদিকে বিশমোল্লায় গলদ যে! অপুরুষ্ট, ভাঙ্গা, পোনে মানুষে কোন কায কর্‌তে পারে কি?

যাঁরা আপনাদের ও দেশের হিত কর্‌তে চান, তাঁদের এ রোগের প্রতীকার ছাড়া প্রথম কর্ত্তব্য আর কিছু আছে কি?

আরণ্যক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসেবাশ্রম।

(কনখল।)

গত ১৫ই অগ্রহায়ণের উদ্বোধনে জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই আশ্রমের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানাভাববশতঃ অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত—কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। যাঁহারা ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা আলমোড়া, মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম হইতে প্রকাশিত প্রবুদ্ধভারতে এবং বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকা-গুলিতে তাহা অন্বেষণ করিবেন।

আলোচ্য তিন মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ১৬৮ জন সাধু ও গৃহস্থ রোগী চিকিৎ-

সিত হন। তন্মধ্যে—অধিকাংশ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। অল্পসংখ্যক রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবার পূর্ব্বেই চলিয়া যান।

এই তিন মাসে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের Judicial Serviceএর একজন মেম্বরের নিকট হইতে ৮৸৵৹ মণ আটা, ১৷০ মণ চাউল, ২৷০ মণ ডাল, ৴।০ সের লবণ, ৴২ সের সাগু, ৴১ সের এরারুট, ১ টিন বার্লি এবং কতক-গুলি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পাওয়া যায়। মিরটের P. C. Ghosh & Co. এবং কানপুরস্থ ডাক্তার হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে কতকগুলি এলোপ্যাথিক ঔষধ পাওয়া যায়। দেরাডুনস্থ পণ্ডিত ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে কতকগুলি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পাওয়া যায়। মান্দ্রাজের ডাক্তার M. B. N. পূর্ব্বে ১০০টী ম্যালেরিয়া জ্বরের বটিকা পড়তা দরে দিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিনামূল্যে আর ১০০টী বটিকা দিয়াছেন। উদ্বোধনের গ্রাহক পানিহাটীর জমীদার বাবু হরিহর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই আশ্রমের সাহায্যার্থে ৫৲ টাকা দিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি ঔষধ ব্যতীত আর সবই খরচ হইয়া গিয়াছে। আশ্রম এবং আমরা আর অন্য সর্ব্বসাধারণ সকলেই এই সকল মহানুভবগণের সহৃদয়-তার জন্য অতিশয় কৃতজ্ঞ। আশা করা যায়, অন্যান্য মহাত্মা—ইঁহাদের পথানুসরণ করিয়া সাধু ও দরিদ্র দুঃখ নিবারণে সহায়তা করিয়া ভগবানের কৃপাভাজন হইবেন ও দেশের যথার্থ হিতসাধন করিবেন।

জানুয়ারি মাসের মধ্যভাগ হইতে হৃষীকেশ নামক সাধুদের তপোভূমে এইরূপ আর একটী আশ্রম খোলা হইয়াছে। এই স্থান হরিদ্বার হইতে ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী। এখানে শীতকালে ভারতের নানাস্থান হইতে সাধুগণ সমবেত হইয়া কুটীর বাঁধিয়া—৮ মাস সাধন ভজন করেন। ইঁহাদের মাধুকরী ভিক্ষার জন্য এখানে কয়েকটী অন্নসত্র আছে, কিন্তু পীড়া হইলে তাহার প্রতীকারের কোন উপায় নাই। আশ্রমের তহবিলে অতি অল্পই অর্থ আছে। অতএব আশা করা যায়, এই মহৎকার্য্যের জন্য ভারতের আপামর সাধারণ সকলেই যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন। এমন কি, এই সৎকার্য্যের জন্য এক পয়সা দান পর্য্যন্ত সাদরে গৃহীত হইবে ও প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ;—

সম্পাদক, উদ্বোধন।
বাগবাজার, কলিকাতা।

আমরা জানি, বিচারের বিশেষ মূল্য কিছু নাই, হৃদয়ই বিশেষ প্রয়োজন। হৃদয়ের দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়, বুদ্ধি দ্বারা নহে। বুদ্ধি কেবল ঝাড়ুদারের মত রাস্তা সাফ করিয়া দেয় মাত্র—গৌণভাবে উপকারক। বুদ্ধি চৌকীদারের ন্যায়—কিন্তু সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য চৌকীদারের অত্যন্ত প্রয়োজন নাই। তাহাকে কেবল গোল থামাইতে হয়—অন্যায় নিবারণ করিতে হয়। বিচারশক্তির—বুদ্ধির কার্য্যও ততটুকু। যখন এইরূপ বিচারাত্মক পুস্তক তোমরা পাঠ কর, তখন একবার উহা আয়ত্ত হইলে তোমরা ত চিন্তা করিয়া থাক—ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলাম। ইহার কারণ বিচারশক্তি অন্ধ, ইহার নিজের গতিশক্তি নাই, ইহার হাত পা ও নাই। হৃদয়—ভাবই বাস্তবিক কার্য্য করে, উহা বিদ্যুৎ অথবা তদপেক্ষা দ্রুতগামী পদার্থ অপেক্ষা অধিক দ্রুতগমন করিয়া থাকে। প্রশ্ন এই, তোমার হৃদয় আছে কি? যদি তাহা থাকে, তবে তুমি তাহা দিয়াই ঈশ্বরকে দেখিবে। আজ যে তোমার এতটুকু ভাব আছে, তাহাই প্রবল হইবে, ব্রহ্মভাবাপন্ন হইবে, উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবে উন্নত হইতে থাকিবে, যতদিন না উহা সমুদয় অনুভব করিতে পারে। বুদ্ধি তাহা করিতে পারে না। 'বিভিন্নরূপে শব্দযোজনার কৌশল, শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, মুক্তির জন্য নহে।'

তোমাদের মধ্যে যাহারা টমাস আ কেম্পিসের ঈশা অনুসরণ পুস্তক পাঠ করিয়াছ, তাহারাই জান, প্রতি পৃষ্ঠায় কেমন তিনি ইহার উপর ঝোঁক দিতেছেন। জগতের প্রায় সকল মহাপুরুষই ইহার উপর ঝোঁক দিয়াছেন। বিচার আবশ্যক। বিচার না করিলে আমরা নানা বিষম ভ্রমে পড়ি। বিচারশক্তি উহা নিবারণ করে, এতদ্ব্যতীত বিচারভিত্তিতে আর কিছু নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিও না। উহা একটী গৌণ সাহায্যমাত্র, কোন কার্য্যকর নহে—প্রকৃত সাহায্য হয়—ভাবে, প্রেমে। তুমি কি অপরের জন্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ? যদি তুমি তাহা কর, তবে তোমার হৃদয়ে একত্বের ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে। যদি তুমি তাহা না কর, তবে তুমি একজন মহা বুদ্ধিজীবী হইতে পার, কিন্তু তোমার কিছুই হইবে না—কেবল শুষ্ক বুদ্ধির ঢিবি হইয়াই থাকিবে। আর যদি তোমার হৃদয় থাকে, তবে একখানি বই পড়িতে না পারিলেও, কোন ভাষা না জানিলেও তুমি ঠিক পথে চলিতেছ। ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন।

জগতের ইতিহাসে মহাপুরুষদের শক্তির কথা কি পাঠ কর নাই? এ

শক্তি তাঁহারা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন? বুদ্ধি হইতে? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি দর্শনসম্বন্ধীয় সুন্দর পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন? অথবা ন্যায়ের কূট বিচার লইয়া? কেহই এরূপ করেন নাই। তাঁহারা কেবল গুটিকত কথা মাত্র বলিয়াছেন। খ্রীষ্টের ন্যায় হৃদয়সম্পন্ন হও, তুমিও খ্রীষ্ট হইবে; বুদ্ধের ন্যায় হৃদয়সম্পন্ন হও, তুমিও একজন বুদ্ধ হইবে। ভাবই জীবন, ভাবই বল, ভাবই তেজ—ভাব ব্যতীত যতই বুদ্ধির চালনা কর না কেন, কিছুতেই ঈশ্বর প্রাপ্ত হইবে না।

বুদ্ধি যেন চালনাশক্তিশূন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায়। যখন ভাব তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া গতিযুক্ত করে, তখনই তাহা অপরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। জগতে চিরকালই এরূপ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং ইহা তোমাদের স্মরণ থাকা আবশ্যক। বৈদান্তিক নীতিতত্ত্বে ইহা একটী বিশেষ কাযের শিক্ষা, কারণ, বেদান্ত বলেন, তোমরা সকলেই মহাপুরুষ—তোমাদের সকলকেই মহাপুরুষ হইতেই হইবে। কোন শাস্ত্র তোমার কার্য্যের প্রমাণ নহে, কিন্তু তুমিই শাস্ত্রের প্রমাণ। কোন শাস্ত্র সত্য বলিতেছে, তাহা কি করিয়া জানিতে পার? তুমিও সেইরূপ অনুভব করিয়া থাক বলিয়া। বেদান্ত ইহাই বলেন। জগতের খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের বাক্যের প্রমাণ কি? না, তুমি আমিও সেইরূপ অনুভব করিয়া থাকি। তাহাতেই তুমি আমি বুঝিতে পারি—সেগুলি সত্য। আমাদের ঐশ্বরিক আত্মা, তাঁহাদের ঐশ্বরিক আত্মার প্রমাণ। এমন কি, তোমার ঈশ্বরত্ব ঈশ্বরেরও প্রমাণ। যদি তুমি বাস্তবিক মহাপুরুষ না হও, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধেও কোন কথা সত্য নহে। তুমি যদি ঈশ্বর না হও, তবে কোন ঈশ্বরও নাই, কখনই হইবেনও না। বেদান্ত বলেন, এই আদর্শই অনুসরণীয়। আমাদের প্রত্যেককেই মহাপুরুষ হইতে হইবে—আর তুমি স্বরূপতঃ তাহাই আছ। কেবল উহা জ্ঞাত হও। আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব আছে, কখন ভাবিও না। এরূপ বলা ভয়ানক নাস্তিকতা। যদি পাপ বলিয়া কিছু থাকে, তবে এরূপ বলাই এক মাত্র পাপ যে, আমি দুর্ব্বল বা অপরে দুর্ব্বল।

কর্ম্মজীবনে বেদান্ত।

২য় প্রস্তাব।

আমি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটী গল্প পাঠ করিব—এক বালকের কিরূপে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। অবশ্য গল্পটী প্রাচীন ধরনের বটে, কিন্তু উহার ভিতরে একটী সারতত্ত্ব নিহিত আছে। একটী অল্পবয়স্ক বালক তাহার মাতাকে বলিল, 'মা, আমি বেদশিক্ষা করিতে যাইব, আমার পিতার নাম কি ও আমি কি গোত্র, তাহা বলুন।'

তাহার মাতা বিবাহিতা রমণী ছিলেন না, আর ভারতবর্ষে অবিবাহিতা রমণীর সন্তান সমাজে নগণ্যরূপে বিবেচিত—কোন কার্য্যেই তাহার অধিকার নাই, বেদপাঠ করা ত দূরের কথা। তাই তাহার মাতা বলিলেন, 'আমি যৌবনে অনেকের পরিচর্য্যা করিতাম, তদবস্থায় তোমায় লাভ করিয়াছি, আমি সুতরাং তোমার পিতার নাম এবং তুমি কি গোত্র, তাহা জানি না, কিন্তু আমার নাম জবালা।' বালক ঋষিগণের নিকট গমন করিল—সেখানে তাহাকে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত হইল—সে ব্রহ্মচারী শিষ্য হইতে প্রার্থনা করিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার পিতার নাম কি এবং তুমি কি গোত্র?' বালক মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই আবৃত্তি করিল। অনেকেই এই উত্তরলাভে সন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'বৎস, তুমি সত্য বলিয়াছ, তুমি ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হও নাই—এই সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ; অতএব তোমাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া নিশ্চয় করিলাম—আমি তোমাকে শিষ্য করিব।' এই বলিয়া তিনি তাহাকে আপনার নিকটে রাখিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালকের নাম সত্যকাম।

এক্ষণে প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে সত্যকামের শিক্ষা হইতে লাগিল। গুরু সত্যকামকে কয়েক শত গো প্রদান করিয়া বলিয়া দিলেন, 'এইগুলি লইয়া তুমি অরণ্যে গমন কর—যখন সর্ব্বশুদ্ধ সহস্র গো হইবে, তখন প্রত্যাবৃত্ত হইবে।' সে তাহাই করিল। কয়েক বৎসর পরে সেই গোসবলের মধ্যে একটী প্রধান বৃষ সত্যকামকে বলিল, 'আমরা এক্ষণে এক সহস্র হইয়াছি, আমাদিগকে তোমার গুরুর নিকট লইয়া যাও। আমি তোমাকে ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব।' সত্যকাম বলিল, 'বলুন প্রভু।' বৃষ বলিল,

'উত্তর দিক্ ব্রহ্মের এক অংশ, পূর্ব্বদিক্ দক্ষিণ দিক্ পশ্চিম দিক্‌ও তাঁহার এক এক অংশ। চারি দিক্ ব্রহ্মের চারি অংশ। অগ্নি তোমাকে আরো কিছু শিক্ষা দিবেন।' তখনকার কালে অগ্নি ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রতিমারূপে পূজিত হইতেন। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকেই অগ্নি চয়ন করিয়া তাহাতে আহুতি দিতে হইত। যাহা হউক, সত্যকাম স্নানাদি করিয়া অগ্নিতে হোম করিয়া তাহার নিকটে উপবিষ্ট আছে, এমন সময়ে অগ্নি হইতে একটী বাণী শুনিতে পাইল—'সত্যকাম!' সত্যকাম বলিল, 'প্রভু, আজ্ঞা করুন'। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, বাইবেলের প্রাচীন সংহিতায় এইরূপ একটী গল্প আছে—সামুয়েল এইরূপ এক অদ্ভুত বাণী শুনিয়াছিলেন। অগ্নি বলিলেন, 'আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিব। এই পৃথিবী ব্রহ্মের এক অংশ। অন্তরীক্ষ এক অংশ, স্বর্গ এক অংশ, সমুদ্র এক অংশ। একটী হংস তোমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন।' একটী হংস একদিন আসিয়া সত্যকামকে বলিল, 'আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব। হে সত্যকাম, এই অগ্নি, যাহার তুমি উপাসনা করিতেছ, তাহা ব্রহ্মের এক অংশ, সূর্য্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ, বিদ্যুতও এক অংশ। মদ্গু নামক এক পক্ষী তোমাকে আরও কিছু শিখাইবেন।' একদিন সেই পক্ষী আসিয়া তাহাকে বলিল, 'আমি তোমাকে ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু শিখাইব। প্রাণ তাঁহার এক অংশ, চক্ষু এক অংশ, শ্রবণ এক অংশ এবং মন এক অংশ।' তাহার পর বালক তাহার গুরুর নিকট উপনীত হইল, গুরু দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'বৎস, তোমার মুখ যে ব্রহ্মবিদের মত উদ্ভাসিত দেখিতেছি।' বালক গুরুকে ব্রহ্মসম্বন্ধে আরো উপদেশ দিবার জন্য কহিল। তিনি বলিলেন, 'তুমি ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু পূর্ব্বেই জানিয়াছ।'

এই সকল রূপক ছাড়িয়া দিয়া—বৃষ কি শিখাইল, অগ্নি কি শিখাইল আর সকলে কি শিখাইল—এসব কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি, তবে বুঝিব, চিন্তার গতি কোন্ দিকে যাইতেছে। আমরা এখান হইতেই এই তত্ত্বের আভাস পাইতেছি যে, এই সকল বাণীই আমাদের ভিতরে। আমরা আরো অধিক দূর পাঠ করিয়া গেলে বুঝিব, অবশেষে এই তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ বাণী বাস্তবিক আমাদের হৃদয়াভ্যন্তর হইতে উত্থিত। শিষ্য বরাবরই সত্যসম্বন্ধে উপদেশ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি ইহার যাহা ব্যাখ্যা দিতেছেন অর্থাৎ উহা বহির্দ্দেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা সত্য নহে। আর এক তত্ত্ব ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে—কর্ম্মজীবনে ব্রহ্মোপলব্ধি—ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার। ধর্ম্ম হইতে

কার্য্যতঃ কি সত্য পাওয়া যাইতে পারে, ইহাই সর্ব্বদা অন্বেষিত হইতেছে; আর এই সকল গল্পপাঠে আমরা ইহা দেখিতে পাই, দিন দিন কেমন উহা তাঁহাদের দৈনিক জীবনের অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে। তাঁহাদের যে সকল জিনিষের সঙ্গে সর্ব্বদা সংস্পর্শে আসিতে হইত, তাহাতেই তাঁহারা ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতেছেন! অগ্নি—যাহাতে তাঁহারা প্রত্যহ হোম করিতেন, তাহাতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতেছেন। এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে তাঁহারা ব্রহ্মের একাংশরূপে জ্ঞাত হইতেছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরবর্ত্তী উপাখ্যানটী সত্যকামের এক শিষ্যসম্বন্ধীয়। ইনি সত্যকামের নিকট শিক্ষালাভার্থ তাঁহার নিকট কিয়ংকাল বাস করিয়াছিলেন। সত্যকাম কার্য্যবশতঃ কোন স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে শিষ্যটী একেবারে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িল। যখন গুরুপত্নী তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস তুমি কিছু খাইতেছ না কেন? তখন বালক বলিলেম, আমার মন বড় অসুস্থ, তজ্জন্য কিছু খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না; এমন সময়ে তিনি যে অগ্নিতে হোম করিতেছিলেন, তাহা হইতে এই বাণী উঠিল, 'প্রাণ ব্রহ্ম, সুখ ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হও।' তখন তিনি বলিলেন, 'প্রাণ যে ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি, কিন্তু তিনি যে আকাশ ও সুখস্বরূপ, তাহা আমি জানি না।' তখন অগ্নি আরো বলিতে লাগিলেন। 'এই পৃথিবী, এই অন্ন, এই সূর্য্য তুমি যাহার উপাসনা করিতেছ, যিনি এই সকলে বাস করিতেছেন, তিনি তোমাদের সকলের মধ্যেও আছেন। যিনি ইহা জানেন এবং এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায়, তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন ও সুখী হন। যিনি দিক্ সকলে বাস করেন, আমিই তিনি। যিনি এই প্রাণে, এই আকাশে, স্বর্গসমূহে ও বিদ্যুতে বাস করেন, আমিই তিনি।' এখানেও আমরা ধর্ম্মের সাক্ষাৎকারের কথা পাইতেছি। যাহা তাঁহারা অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতিরূপে উপাসনা করিতেছিলেন, যে সকল বস্তুর সহিত তাঁহারা পরিচিত, তাহাদেরই ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল, তাহাদিগেরই একটী উচ্চতর অর্থ দেওয়া হইতে লাগিল, আর ইহাই বাস্তবিক বেদান্তের সাধনকাণ্ড। বেদান্ত জগৎকে নাশ করিয়া ফেলে না, কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যা করে। উহা ব্যক্তিকে বিনাশ করে না, উহাকে ব্যাখ্যা করে—উহা আমিত্বকে বিনাশ করে না, কিন্তু প্রকৃত আমিত্ব কি, তাহা বুঝাইয়া দেয়। উহা এরূপ বলে না যে, জগৎ বৃথা, অথবা উহার অস্তিত্ব নাই, কিন্তু বলে যে,

জগৎ কি, তাহা বুঝ, যাহাতে উহা তোমাকে আঘাত করিতে না পারে। সেই বাণী সত্যকাম বা তাঁহার শিষ্যকে বলে নাই যে, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র অথবা বিদ্যুৎ অথবা আর কিছু যাহা তাঁহারা উপাসনা করিতেছিলেন, তাহা একেবারে ভুল কিন্তু, ইহাই বলিয়াছিল যে, যে চৈতন্য সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ অগ্নি এবং পৃথিবীর ভিতরে রহিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের ভিতরও রহিয়াছেন,সুতরাং তাঁহাদের চক্ষে সমস্তই আর একরূপ ধারণ করিল। যে অগ্নি পূর্ব্বে কেবলমাত্র হোম করিবার জড় অগ্নিমাত্র ছিল, তাহা এক নূতনরূপ ধারণ করিল ও প্রকৃত পক্ষে ভগবান হইয়া দাঁড়াইল। পৃথিবী আর একরূপ ধারণ করিল, প্রাণ আর একরূপ ধারণ করিল, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ সকলই আর একরূপ ধারণ করিল, ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া গেল। তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ তখন পরিজ্ঞাত হইল। কারণ, আমাদের ইহা বিশেষরূপে জানা উচিত যে, বেদান্তের উদ্দেশ্যই এই— সমুদয় বস্তুতে ভগবান দর্শন করা, তাহারা যেরূপে আপাততঃ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না দেখিয়া তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে জ্ঞাত হওয়া।

তার পর আর একটী প্রস্তাব আছে, ইহা একটু অদ্ভুত রকমের। 'যিনি চক্ষের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন, তিনি ব্রহ্ম; তিনি রমণীয় ও জ্যোতিস্ময়। তিনি সমুদয় জগতেই দীপ্ত পাইতেছেন।' এখানে ভাষ্যকার বলেন, পবিত্রাত্মা পুরুষগণের চক্ষে যে এক বিশেষ প্রকার জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহাই এখানে চাক্ষুষ জ্যোতির অর্থ; ইহা কথিত হয় যে, উহা সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মার জ্যোতি। সেই জ্যোতিই গ্রহগণে, এবং সূর্য্য চন্দ্র তারায় প্রকাশ পাইতেছে।

তোমাদের নিকট এক্ষণে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধে এই প্রাচীন উপনিষদ্ সকলের কতকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত মতের কথা বলিব। হয়ত ইহা তোমাদের ভাল লাগিতে পারে। শ্বেতকেতু পঞ্চালরাজের নিকট গমন করিল। রাজা তাহাকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি জান, লোকের মৃত্যু হইলে তাহারা কোথায় যায়?' 'তুমি কি জান, তাহারা কিরূপে আবার ফিরিয়া আসে?' 'তুমি কি জান, পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যায় না কেন, খালিই বা হয় না কেন?' বালক বলিল, 'না, আমি এ সকল কিছুই জানি না।' সে তখন তাহার পিতার নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকটও সেই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিল। পিতা বলিলেন, 'আমিও জানি না।' তখন তাঁহারা উভয়ে রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজা বলিলেন, 'এই জ্ঞান

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদের জানা ছিল না, রাজারাই কেবল উহা জানিতেন আর সেই জ্ঞানবলেই রাজারা পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন।' তখন তাঁহারা উভয়ে কিছুদিন রাজার সেবা করিলেন, অবশেষে রাজা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'হে গৌতম, তুমি যে এই অগ্নির উপাসনা করিতেছ, তাহা বাস্তবিক অতি নিম্নদরের পদার্থ। এই পৃথিবীই সেই অগ্নিস্বরূপ। সংবৎসর উহার কাষ্ঠস্বরূপ, রাত্রি উহার ধূমস্বরূপ, দিক্‌সকল উহার শিখাস্বরূপ। কোণসকল উহার বিস্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। এই অগ্নিতে দেবতারা বৃষ্টিরূপ আহুতি দিয়া থাকেন, যাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।' ইত্যাদি ইত্যাদি উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, তোমার এই ক্ষুদ্র অগ্নিতে হোম করিবার কোন প্রয়োজন নাই, সমুদয় জগৎই সেই অগ্নি এবং দিবারাত্র তাহাতে হোম হইতেছে। দেবতা মানব সকলেই দিবারাত্র উপাসনা করিতেছেন। 'হে গৌতম, মনুষ্যশরীরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্নি'। আমরা এখানেও আবার ধর্ম্মকে কার্য্যে পরিণত করা যাইতেছে, ব্রহ্মকে নামাইয়া সংসারের ভিতর আনা হইতেছে, দেখিতেছি। আর এই সকল রূপক গল্পের ভিতর এই এক তত্ত্ব দেখিতেছি যে, মানুষের কৃত প্রতিমা লোকের হিতকারী ও শুভকর হইতে পারে, কিন্তু উহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। যদি ঈশ্বর উপাসনা করিবার জন্য প্রতিমার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে জীবন্ত মানব-প্রতিমা ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।—যদি ঈশ্বরোপাসনার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাও, বেশ, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই উহা হইতে উচ্চতর, উহা হইতে শ্রেষ্ঠতর নেব দহরূপ মন্দির ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বেদের দুই ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদের অভ্যুদয়ের সময়ে কর্ম্মকাণ্ড এত জটিল ও বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছিল যে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। উপনিষদে কর্ম্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিলেই হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে আর উহার ভিতর একটী গভীর অর্থ দিয়া। অতি প্রাচীনকালে এই সকল যাগ যজ্ঞাদি ছিল, কিন্তু এখন জ্ঞানীরা আসিলেন। তাঁহারা কি করিলেন? আধুনিক সংস্কারকগণের ন্যায় তাঁহারা যাগযজ্ঞাদির বিরুদ্ধে প্রচ করিলেন না, কিন্তু তাঁহারা তাহার স্থলে কিছু দিলেন।

অগ্নিতে হবন কর, ইহা উত্তম, কিন্তু এই পৃথিবীতে দিবারাত্র হবন হইতেছে। এই ক্ষুদ্র মন্দির রহিয়াছে; বেশ, কিন্তু সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আমার

মন্দির ; যেখানেই আমি উপাসনা করি না কেন, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। তোমরা বেদী নির্ম্মাণ করিয়া থাক—কিন্তু আমার পক্ষে জীবন্ত, চেতন মনুষ্যদেহ রহিয়াছে এবং এখানে পূজা অন্য অচেতন মৃত জড় আকৃতির পূজা হইতে শ্রেয়স্কর।

এখানে আর একটী বিশেষ মত বর্ণিত হইতেছে। আমি ইহার অধিকাংশই বুঝি না। যদি তোমরা উহার ভিতর হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে পার, তবে তোমাদের কাছে উহা পাঠ করি। যে ব্যক্তি ধ্যানবলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন সে প্রথমে অর্চ্চি, তৎপরে দিন, ক্রমান্বয়ে শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ ছয় মাসে গমন করে ; ঐ মাস সকল হইতে বৎসরে, বৎসর হইতে সূর্য্যলোকে, সূর্য্যলোক হইতে চন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে গমন করে। সেখানে একজন অমানব পুরুষ তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। ইহার নাম দেবযান। যখন সাধু ও জ্ঞানীদিগের মৃত্যু হয়, তাঁহারা এই পথ দিয়া গমন করেন। এই মাস বৎসর প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি, কেহই ভাল করিয়া বুঝেন না। সকলেই স্ব স্ব কপোল-কল্পিত অর্থ করিয়া থাকেন, আবার অনেকে বলেন, এ সকল বাজে কথা মাত্র। এই চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক প্রভৃতিতে যাওয়ার অর্থ কি ? আর এই যে অমানব পুরুষ আসিয়া বিদ্যুল্লোক হইতে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, ইহারই বা অর্থ কি ? হিন্দুদের মধ্যে এক ধারণা ছিল যে, চন্দ্রলোকে প্রাণীর বাস আছে—ইহার পরে আমরা পাইব, কি করিয়া চন্দ্রলোক হইতে পতিত হইয়া মানুষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। যাহারা জ্ঞানলাভ করে নাই, কিন্তু এই জীবনে শুভকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদের যখন মৃত্যু হয়, তাহারা প্রথমে ধূমে গমন করে, পরে রাত্রি, তৎপরে কৃষ্ণপক্ষ, তৎপরে দক্ষিণায়ণ ছয় মাস, তৎপরে বৎসর হইতে তাহারা পিতৃলোকে গমন করে। পিতৃলোক হইতে আকাশে, তথা হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে। তথায় দেবতাদের খাদ্যরূপ হইয়া দেবজন্ম গ্রহণ করে। যতদিন তাহাদের পুণ্যক্ষয় না হয়, ততদিন তথায় বাস করিয়া থাকে। আর কর্ম্মফল শেষ হইলে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে পৃথিবীতে আসিতে হয়। তাহারা প্রথমে আকাশরূপে পরিণত হয় ; তৎপরে বায়ু, তৎপরে ধূম, তৎপরে মেঘ প্রভৃতিরূপে পরিণত হইয়া শেষে বৃষ্টিকণাকে আশ্রয় করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তথায় শস্যক্ষেত্রে পতিত হইয়া শস্যরূপে পরিণত হইয়া মনুষ্যের খাদ্যরূপে পরিগৃহীত অবশেষেএবে তাহাদের সন্তানাদিরূপে পরিণত হয়। যাহারা খুব সৎকর্ম্ম

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়। যেষাং পুণ্যকর্ম্মণাং জনানাং তু পাপং অন্তগতং তে দৃঢ়ব্রতাঃ দ্বন্দ্ব-মোহনির্মুক্তাঃ সন্তঃ মাং ভজন্তে। ২৮।

মূলানুবাদ। যে সকল পবিত্রকর্ম্মা ব্যক্তির পাপ বিনষ্ট হয়, সেই সকল দৃঢ়ব্রত (মহাত্মাগণ) দ্বন্দ্বমোহবিনির্মুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥২৮॥

ভাষ্য।—কে পুনরনেন দ্বন্দ্বমোহেন নির্ম্মুক্তাঃ সন্তস্ত্বাং বিদিত্বা যথাশাস্ত্রং আত্মভাবেন ভজন্তে ইত্যপেক্ষিতমর্থং দর্শয়িতুমুচ্যতে—যেষাং তু পুনরন্তগতং সমাপ্তপ্রায়ং ক্ষীণং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং পুণ্যং কর্ম্ম যেষাং সত্ত্বশুদ্ধিকারণং বিদ্যতে তে পুণ্যকর্ম্মাণস্তেষাং পুণ্যকর্ম্মণাম্। তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ যথো-ক্তেন দ্বন্দ্বমোহেন নির্ম্মুক্তাঃ ভজন্তে মাং পরমাত্মানং দৃঢ়ব্রতাঃ এবমেব পরমার্থ-তত্ত্বং নান্যথাইত্যেবং নিশ্চিতবিজ্ঞানা দৃঢ়ব্রতাইত্যুচ্যতে। ২৮।

ভাষ্যানুবাদ। তাহারা কে যাহারা এই দ্বন্দ্বমোহ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া তোমাকে যথাশাস্ত্র জানিয়া আত্মভাবে ভজনা করে? এই অপেক্ষিত বিষয়ের উত্তর দেওয়া যাইতেছে যে, যে সকল ব্যক্তির পাপ "অন্তগত" সমাপ্তপ্রায় (অর্থাৎ) ক্ষীণ হইয়াছে (তাহারা কেমন) "পুণ্যকর্ম্মা" পবিত্র (অর্থাৎ) বিশুদ্ধ হইয়াছে চিত্তশুদ্ধিকারণ কর্ম্ম যাহাদের, তাহারাই পুণ্য-কর্ম্মা, সেই সকল পুণ্যকর্ম্মাগণ যথোক্ত দ্বন্দ্বমোহ হইতে নির্মুক্ত হইয়া পর-মাত্মস্বরূপ আমাকে আত্মভাবে ভজনা করে (তাহাদের কি প্রকার হইয়া থাকে?) "দৃঢ়ব্রত" এই আত্মাই পরমার্থতত্ত্ব, ইহার কোন প্রকারে অন্যথা হইতে পারে না, এই প্রকার নিশ্চয় জ্ঞান যাহাদের আছে, তাহারাই দৃঢ়ব্রত বলিয়া উক্ত হয়। ২৮।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥২৯ ॥

অন্বয়। মাং আশ্রিত্য যে জরামরণমোক্ষায় যতন্তি (যতন্তে) তে তৎ-কৃৎস্নং অধ্যাত্মং ব্রহ্ম অখিলং কর্ম্ম চ বিদুঃ। ২৯।

মূলানুবাদ। আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা জরা ও মরণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য যত্ন করে তাহারা সেই প্রত্যাত্মস্থিত অখণ্ড ব্রহ্ম ও সকল প্রকার কর্ম্মের স্বরূপ জানিতে পারে। ২৯।

ভাষ্য। জরামরণমোক্ষায় জরামরণমোক্ষার্থং মাং পরমেশ্বরমাশ্রিত্য মৎসমাহিতচিত্তাঃ সন্তো যতন্তি প্রযতন্তে যে তে যদ্ ব্রহ্মপরং তদ্বিদুঃ কৃৎস্নং সমস্তং অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মবিষয়ং বস্তু তদ্বিদুঃ কর্ম্ম চ অখিলং সমস্তং তদ্বিদুঃ। ২৯।

ভাষ্যানুবাদ। জরা ও মরণ হইতে মোক্ষ পাইবার জন্য পরমেশ্বর আমাকে আশ্রয় করিয়া (অর্থাৎ) আমাতেই চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক যাহারা যত্ন করিয়া থাকে তাহারা সেই সকল ভূতের উপাদান পরব্রহ্মকে অধ্যাত্ম (অর্থাৎ) প্রত্যগাত্মভাবে এবং নিখিল কর্ম্মস্বরূপে জানিতে সমর্থ হয়। ২৯।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৩০॥

অন্বয়। সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং চ মাং যে বিদুঃ তে যুক্তচেতসঃ প্রয়াণকালেঽপি চ মাং বিদুঃ। ৩০।

মূলানুবাদ। অধিভূত অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত আমার স্বরূপ যাহারা (শাস্ত্রানুসারে) জানে, তাহারাই প্রয়াণকালে সমাহিত হৃদয়ে আমার প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করিতে পারে। ৩০।

ভাষ্য। সাধীতি সাধিভূতাধিদৈবং অধিভূতং চ অধিদৈবং চ অধিভূতাধিদৈবং অধিভূতাধিদৈবেন সহ সাধিভূতাধিদৈবং চ মাং যে বিদুঃ সাধিযজ্ঞং চ সহ অধিযজ্ঞেন সাধিযজ্ঞং যে বিদুঃ প্রয়াণকালেঽপি চ মরণকালেঽপি চ মাং তে বিদুঃ যুক্তচেতসঃ সমাহিতচিত্তা ইতি। ৩০।

ভাষ্যানুবাদ। সাধিভূত ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ, "সাধিভূতাধিদৈব" অধিভূত ও অধিদৈব (এই অর্থে) অধিভূতাধিদৈব (এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে) অধিভূতাধিদৈবের সহিত বিদ্যমান (এই অর্থে) সাধিভূতাধিদৈব (এই শব্দটী ব্যবহৃত) এবং "সাধিযজ্ঞ" (অর্থাৎ) অধিযজ্ঞের সহিত বিদ্যমান, (এইভাবে) আমাকে যাহারা জানিতে পারিয়াছে, তাহারা প্রয়াণকালে (অর্থাৎ) মরণকালেও আমাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। ইতি ৩০।

(ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসু জ্ঞানবিজ্ঞানযোগোনাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।)

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যানুবাদের জ্ঞানবিজ্ঞানযোগনামক সপ্তম অধ্যায়।

অথ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।—কিন্তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২॥

অন্বয়। হে পুরুষোত্তম! কিং তদ্ ব্রহ্ম? কিং অধ্যাত্মং? কিং কর্ম্ম? কিং চ অধিভূতং প্রোক্তং কিং (বা) অধিদৈবং উচ্যতে? হে মধুসূদন অত্র দেহে কঃ অধিযজ্ঞঃ কথং বা (স চিন্তনীয়ঃ) প্রয়াণকালে চ (ত্বং) নিয়তাত্মভিঃ কথং জ্ঞেয়োঽসি। ১—২।

মূলানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন হে পুরুষোত্তম সেই ব্রহ্মের স্বরূপ কি? কাহাকে অধ্যাত্ম কহা যায়? কি কর্ম্ম? কাহাকেইবা অধিভূত বলা হইয়াছে? অধিদৈবই বা কাহাকে বলা যায়? কাহাকে অধিযজ্ঞ বলা যায়? সেই অধিযজ্ঞকে কি প্রকারে ভাবিতে হইবে? হে মধুসূদন, প্রয়াণকালে নিয়তাত্মা (সাধক) গণ কেমন করিয়া তোমাকে জানিতে পারে? ১—২।

শ্রীভগবানুবাচ।—অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩॥

অন্বয়। অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবঃ অধ্যাত্মং উচ্যতে। ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। ৩।

মূলানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন, যাহার বিনাশ নাই, তাহাই সেই পরব্রহ্ম, স্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলা যায়, যাহা দ্বারা ভূতনিচয়ের উৎপত্তি হয়, সেই বিসর্গ (অর্থাৎ দেবতাগণের প্রীতির জন্য দ্রব্যবিসর্জ্জন) কে, কর্ম্ম সংজ্ঞাদ্বারা অভিহিত করা যায়। ৩।

ভাষ্য। এষাং প্রশ্নানাং যথাক্রমং নির্ণয়ায় (শ্রীভগবানুবাচ) "অক্ষরং" ন ক্ষরতীতি পর আত্মা "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ ওঁকারস্য চ ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি পরেণাবিশেষণাদগ্রহণং পরমিতি চ নিরতিশয়ে ব্রহ্মণি অক্ষরে—উপপন্নতরং বিশেষণং তস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাবঃ স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে আত্মানং দেহং অধিকৃত্য প্রত্যগাত্মতয়া প্রবৃত্তং পরমার্থব্রহ্মাবসানং বস্তু স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে অধ্যাত্ম-

শব্দেনাভিধীয়তে। "ভূতভাবোদ্ভবকরঃ" ভূতানাং ভাবঃ তস্য উদ্ভবঃ তংকরোতীতি— ভূতভাবোদ্ভবকরঃ ভূতবস্তূৎপত্তিকরইত্যর্থঃ। "বিসর্গঃ" বিসর্জ্জনং দেবতোদ্দেশেন চরুপুরোডাশাদেঃ দ্রব্যস্য পরিত্যাগঃ—স এব বিসর্গ-লক্ষণোযজ্ঞঃ "কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ" কর্ম্মশব্দিত ইত্যেতৎ এতস্মাদ্ধি বীজভূতাদবৃষ্ট্যাদি-ক্রমেণ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতানি উদ্ভবন্তি। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। এই সকল প্রশ্নের যথাক্রমে নির্ণয় করিবার জন্য (ভগবান্ বলিলেন) "অক্ষর" যাহা বিনষ্ট হয় না, তাহাই (অক্ষর শব্দের অর্থ) পরম আত্মা "এই অক্ষরের শাসনানুসারে হে গার্গি (চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ পায় ও তাপ প্রদান করে)" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও (অক্ষর শব্দের অর্থ যে পরমাত্মা) তাহা সিদ্ধ হইতেছে, এখানে অক্ষর শব্দের দ্বারা প্রণবেরও গ্রহণ হইতেছে না। (কারণ) ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্লোকে যে অক্ষর শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে "পর" এই বিশেষণ নাই, এখানে কিন্তু "পর" এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, এই জন্য এ স্থানে অক্ষর শব্দের দ্বারা প্রণব গ্রহণ হইতে পারে না। "পরম" এই বিশেষণটী নিরতিশয় ব্রহ্মরূপ অক্ষরেই উপপন্নতর হয়। সেই পরব্রহ্মেরই প্রতিদেহে প্রত্যগাত্মভাবে স্থিতিকেই স্বভাব কহা যায়, ইহাই "স্বভাব" অধ্যাত্ম উক্ত হইয়া থাকে। দেহরূপ আত্মাকে অধিকৃত করিয়া প্রতি পুরুষের আত্মভাবে অবস্থিত সেই পরব্রহ্মরূপ পরমার্থ বস্তু পর্য্যন্ত সকল পদার্থকেই স্বভাব বা অধ্যাত্ম শব্দের দ্বারা প্রতিপাদন করা হইতেছে। "ভূতভাবোদ্ভবকর" ভূত (অর্থাৎ) পৃথিবী প্রভৃতি যে "ভাব" (অর্থাৎ) বস্তু তাহাই ভূতভাব এই শব্দটীর অর্থ—সেই ভূতভাবের "উদ্ভব" (উৎপত্তি) ভূতভাবোদ্ভব, তাহাকে যে করে, তাহার নাম ভূতভাবোদ্ভবকর "বিসর্গ" এই শব্দটীর অর্থ বিসর্জ্জন অর্থাৎ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের তৃপ্তির উদ্দেশে যে পুরোডাশ প্রভৃতি দ্রব্যের ত্যাগ, তাহাই বিসর্গ শব্দের অর্থ—এই বিসর্গই ভূতভাবোদ্ভবকর, অর্থাৎ (অদৃষ্টের উৎপাদন দ্বারা) ভূতনিচয়ের উৎপাদক। সেই বিসর্গ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ যজ্ঞ; এই যজ্ঞই কর্ম্মসংজ্ঞিত, অর্থাৎ কর্ম্মশব্দের দ্বারা যজ্ঞই অভিহিত, এই যজ্ঞরূপ বীজ হইতে স্থাবর ও জঙ্গমরূপ দ্বিবিধ ভূতনিচয়ই উৎপন্ন হয়। ৩।

অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৪॥

অন্বয়। ক্ষরঃ ভাবঃ অধিভূতম্, পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্, হে দেহভৃতাং বর, অত্র দেহে অহমেব অধিযজ্ঞঃ। ৪।

মূলানুবাদ। বিনশ্বর বস্তু মাত্রই অধিভূত, (আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী) পুরুষই অধিদৈবত, হে প্রাণিগণের শ্রেষ্ঠ! এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ। ৪।

ভাষ্য। অধিভূতমিতি। অধিভূতং প্রাণিজাতমধিকৃত্যভবতীতি কোঽসৌ ক্ষরঃ ক্ষরতীতি ক্ষরঃ বিনাশী ভাবো যৎকিঞ্চিৎ জনিমদ্ বস্তু ইত্যর্থঃ। পুরুষঃ পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি পুরিশয়নাদ্বা পুরুষ আদিত্যান্তর্গতঃ হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বপ্রাণিকরণানামনুগ্রাহকঃ সোঽধিদৈবতম্। অধিযজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞাভিমানিনী দেবতা বিষ্ণ্বাখ্যা "যজ্ঞোবৈ বিষ্ণু" রিতি শ্রুতেঃ। স হি বিষ্ণুরহমেবাত্রাস্মিন্ দেহে যো যজ্ঞস্তস্যাহমধিযজ্ঞঃ যজ্ঞোহি দেহনির্ব্বর্ত্ত্যত্বেন দেহসমবায়ীতি দেহাধিকরণোভবতি দেহভৃতাং বর। ৪।

ভাষ্যানুবাদ। অধিভূতমিত্যাদি শ্লোকের (তাৎপর্য্য এই যে) প্রাণিগণের ভোগের জন্য যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই অধিভূত কহা যায় (সে কি?) "ক্ষর" যাহা বিনষ্ট হয়, তাহাই ক্ষর, এমন যে "ভাব" তাহাই অধিভূত, অর্থাৎ যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, এমন সকল বস্তুই অধিভূত শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। "পুরুষ" যাহাদ্বারা জগৎ সকলই পরিপূরিত অথবা যিনি দেহরূপ পুরে বিরাজমান, তিনিই পুরুষ। (তিনি কে?) সেই আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সকলপ্রাণীর সকলইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা হিরণ্যগর্ভ, সেই পুরুষই অধিদৈবত (শব্দের দ্বারা অভিহিত হন)। "অধিযজ্ঞ" সকল যজ্ঞের উপর আত্মীয়ত্বাভিমান যে দেবতার আছে, সেই বিষ্ণুই অধিযজ্ঞ শব্দের দ্বারা অভিহিত, শ্রুতিতেও নির্দ্দিষ্ট আছে যে;—বিষ্ণুই যজ্ঞ, সেই বিষ্ণু আমিই, এই দেহে অধিযজ্ঞরূপে বিদ্যমান আছি। দেহের দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে এইজন্য যজ্ঞ। (অর্থাৎ যজ্ঞের ফল দেহে থাকে, অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে) সুতরাং তাহা দেহাধিকরণ (সুতরাং যজ্ঞাভিমানিনী দেবতাও দেহে থাকেন) হে দেহভৃদ্গণের শ্রেষ্ঠ। ৪।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫॥

অন্বয়। অন্তকালে চ মাং এব স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা যঃ প্রয়াতি স মদ্-ভাবং যাতি অত্র সংশয়ঃ ন অস্তি। ৫।

মূলানুবাদ। মরণসময়ে কেবল আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি শরীর পরিত্যাগ করিয়া যায়, সে আমার ভাবকে প্রাপ্ত হয় ; এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৫।

ভাষ্য। অন্তকালে ইতি। অন্তকালে চ মরণকালে মামেব পরমেশ্বরং বিষ্ণুং স্মরন্ মুক্ত্বা পরিত্যজ্য কলেবরং শরীরং যঃ প্রযাতি গচ্ছতি স মদ্ভাবং বৈষ্ণবং তত্ত্বং যাতি নাস্তি ন বিদ্যতেঽত্রাস্মিন্ অর্থে সংশয়ো যাতি বা নবেতি। ৫।

ভাষ্যানুবাদ। অন্তকালে ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "অন্তকালে" মরণ কালে আমাকেই (অর্থাৎ) পরমেশ্বরবিষ্ণুকে স্মরণ করিতে করিতে "কলেবর" শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রয়াণ করে (অর্থাৎ) গমন করে (লোকান্তরে) সে "মদ্ভাব" বৈষ্ণব তত্ত্বকে প্রাপ্ত হয়, এই বিষয়ে কোন সংশয় (অর্থাৎ বৈষ্ণব পদ পায় কি না এই প্রকার সন্দেহ) বিদ্যমান নাই। ৫।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়। হে কৌন্তেয় অন্তে যং যং বাপি ভাবং স্মরন্ কলেবরং ত্যজতি সদা তদ্ভাবভাবিতঃ সন্ তং তং এব এতি। ৬।

মূলানুবাদ। হে কুন্তীনন্দন, মরণ কালে যে যে ভাববিশেষকে স্মরণ করিয়া জীব দেহত্যাগ করে, সর্ব্বদা সেই ভাববিশেষের ভাবনার অভ্যাসবশে সে সেই ভাবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে (পরলোকেও)। ৬।

ভাষ্য। ন মদ্বিষয় এবায়ং নিয়মঃ কিং তর্হি যং যং বাপি যং যং ভাবং দেবতাবিশেষং স্মরংশ্চিন্তয়ন্ ত্যজতি পরিত্যজতি অন্তে প্রাণবিয়োগকালে কলেবরং তং তমেব স্মৃতং ভাবং এব এতি নান্যং কৌন্তেয় সদা সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিতঃ তস্মিন্ ভাবঃ তদ্ভাবঃ সভাবিতঃ স্মর্য্যমাণতয়া অভ্যস্তো যেন স তদ্ভাবভাবিতঃ সন্। ৬।

ভাষ্যানুবাদ। আমার বিষয়েই যে এই নিয়ম, তাহা নহে তবে কি ?—(ইহারই উত্তর এই হইতেছে যং যং বাপি ইত্যাদি) যে যে ভাব অর্থাৎ দেবতাবিশেষকে স্মরণ করিয়া অন্তে অর্থাৎ প্রাণবিয়োগকালে কলেবরকে (জীব) পরিত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, "সদা" সর্ব্বদা "তদ্ভাবভাবিত" হইয়া

সে সেই দেবতাবিশেষকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই দেবতার প্রতি ভাব (এই অর্থে) তদ্ভাব (শব্দটী ব্যবহৃত)। তদ্ভাব যাহা দ্বারা "ভাবিত" অনবরত স্মৃতির বিষয় হইয়া অভ্যস্ত হয়, সেই তদ্‌ভাবভাবিত। ৬।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাং অনুস্মর যুধ্য চ, ময়ি অর্পিত মনো-বুদ্ধিঃ অসংশয়ঃ (সন্) মাং এব এষ্যসি। ৭।

মূলানুবাদ। সেই কারণে সকলসময়ে আমাকে স্মরণ করিতে থাক এবং যুদ্ধও কর। আমার উপর মনঃ ও বুদ্ধিকে সমর্পণপূর্ব্বক সর্ব্বসংশয় হইতে মুক্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ৭।

ভাষ্য। যস্মাদেবমন্ত্যাভাবনা দেহান্তরপ্রাপ্তৌ কারণং তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাং অনুস্মর যথাশাস্ত্রং যুধ্য চ যুদ্ধং চ স্বধর্ম্মং কুরু ময়ি বাসুদেবে অর্পিতে মনোবুদ্ধী যস্য স ত্বং ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ সন্ মামেব যথাস্মৃতং এষ্যসি আগমিষ্যসি অসংশয়ো ন সংশয়োঽত্র বিদ্যতে। ৭।

ভাষ্যানুবাদ। যে কারণে এই প্রকার মরণকালের ভাবনা দেহান্তর প্রাপ্তির প্রতি কারণ, এই জন্যই সকল কালেই আমার স্মরণ করিতে থাক এবং যথাশাস্ত্র যুদ্ধও কর। (কারণ) যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম্ম। যাহার মনঃ ও বুদ্ধি বাসুদেব আমাতে অর্পিত হইয়াছে, সেই তুমি "ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধি" হইয়া আমাকেই যেমন স্মরণ করিবে, তদনুসারে প্রাপ্ত হইবে, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৭।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—হে পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্তেন ন অন্যগামিনা চেতসা অনু-চিন্তয়ন্ দিব্যং পরমং পুরুষং যাতি। ৮।

মূলানুবাদ। হে পার্থ, অনন্যপরায়ণ ও অভ্যাসযোগযুক্তমনে সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে (সাধক) সেই আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৮।

ভাষ্য।—অভ্যাসযোগযুক্তেন ময়ি চিত্তসমর্পণবিষয়ভূতে একস্মিন্ তুল্য-

প্রত্যয়াবৃত্তিলক্ষণো বিলক্ষণপ্রত্যয়ান্তরানন্তরিতোঽভ্যাসঃ স চাভ্যাসোযোগঃ তেন যুক্তং তত্রৈব ব্যাপৃতং যোগিনশ্চেতস্তেন চেতসা নান্যগামিনা ন অন্যত্র বিষয়ান্তরে গন্তুংশীলমস্যেতি নান্যগামি তেন নান্যগামিনা পরমং পুরুষং দিব্যং দিবি সূর্য্যমণ্ডলে ভবং যাতি গচ্ছতি—হেপার্থ অনুচিন্তয়ন্ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুধ্যায়ন্ ইত্যেতৎ। ৮।

ভাষ্যানুবাদ—আরও (বক্তব্য এই যে) চিত্তসমর্পণের বিষয়ভূত একমাত্র আমাতেই একাকার চিত্তবৃত্তির যে আবৃত্তি অথচ যাহার মধ্যে অন্য কোন বিলক্ষণ বৃত্তির উদয় না হয়, সেই আবৃত্তিই অভ্যাস (শব্দের প্রতিপাদ্য)। সেই অভ্যাসই যোগ, এই প্রকার অভ্যাসযোগেতেই যোগীর যে চিত্ত ব্যাপৃত থাকে, তাহাকেই অভ্যাসযোগযুক্তচিত্ত বলা যায়। সেই চিত্ত অনন্যগামি (ও হওয়া চাই)। মদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ে সংলগ্ন হওয়া যাহার স্বভাব, সেই চিত্তকে অন্যগামি কহে; যে চিত্ত এ প্রকার নহে, তাহাই নান্যগামি চিত্ত। সেই নান্যগামি এবং অভ্যাসযোগযুক্ত চিত্তের সাহায্যে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে সেই আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে (সাধক) তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৮।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারং অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়। যঃ তমসঃ পরস্তাৎ আদিত্যবর্ণং অচিন্ত্যরূপং সর্ব্বস্য ধাতারং অণোরণীয়াংসং পুরাণং কবিং অনুস্মরেৎ। ৯।

মূলানুবাদ।—(অবিদ্যারূপ) অন্ধকারের বহির্ভূত, সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, অচিন্ত্যরূপ, সকল জগতের বিধাতা, অণু হইতেও অণুতর, সকল জগতের শাসিতা সেই পুরাতন কবিকে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকে। ৯।

ভাষ্য। কিং বিশিষ্টং পুরুষং যাতীতি উচ্যতে। কবিং ক্রান্তদর্শিনং সর্ব্বজ্ঞং পুরাণং চিরন্তনমনুশাসিতারং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রশাসিতারং অণোঃ সূক্ষ্মাদপি অণীয়াংসং সূক্ষ্মতরং অনুস্মরেৎ যঃ কশ্চিৎ সর্ব্বস্য কর্ম্মফলজাতস্য ধাতারং বিচিত্রতয়া প্রাণিভ্যো বিভক্তারং বিভজ্য দাতারং অচিন্ত্যরূপং নাস্য রূপং নিয়তং বিদ্যমানমপি কেনচিৎ চিন্তয়িতুং শক্যতে ইতি অচিন্ত্যরূপস্তম্ আদিত্যবর্ণং আদিত্যস্যেব নিত্যচৈতন্যপ্রকাশোবর্ণো যস্য তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদজ্ঞানলক্ষণাম্মোহান্ধকারাৎ পরং তং অনুচিন্তয়ন্ যাতীতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ। ৯।

ধর্ম্ম।

(বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

আমরা সর্ব্বদাই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকি। যখন মনে করি, কেহ আমাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, আর যদি সেই অসদ্ব্যবহারের প্রতিদান দিতে অক্ষম হই, তাহা হইলে অমনি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকি। যদি কোন অত্যাচারী সুখে আছে দেখিতে পাই, অমনি বলি,—"ধর্ম্ম কি নাই"! ধর্ম্ম যে প্রতি হাত আমাদের শত্রুকে দমন করেন না,—এই নিমিত্ত আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করি, "ঘোরকলি", "অধর্ম্মেরই জয়!"—এই বলিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে আবার যিনি একটু বিজ্ঞ, তিনি ভাবেন ও মনকে শান্তি দেন যে, একদিন না একদিন ধর্ম্ম, তাঁহার শত্রুকে শাস্তি দিবেন। যাহার সহিত কোন কার্য্যের সম্বন্ধ আছে, পাছে কার্য্যস্থলে তাহার দ্বারা প্রতারিত হই, এ নিমিত্ত তাহাকে বিশেষ করিয়া ধর্ম্মের ভয় দেখাই। কিন্তু নিজে যদি কাহাকেও শাস্তি দিতে পারি, তখন আর ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচারীর দণ্ডের নির্ভর না করিয়া আপনিই দণ্ডবিধানকর্ত্তা হই এবং দণ্ড দিয়া গৌরব করিয়া থাকি যে, পাপীর প্রতি শাস্তি বিধান করিয়া বড়ই পুণ্য কার্য্য করিয়াছি। পরের বেলা যে, ধর্ম্মের দোহাই দি, সেই ধর্ম্মকে অধিক সময় আপনারা উপেক্ষা করি।—এমন কি ঘৃণা করি বলিলে, অত্যুক্তি হয় না।

পুরাণে শুনিতে পাই, রাজা যুধিষ্ঠির জন্ম গ্রহণ করিলে দৈববাণী হয়, "পাণ্ডুরাজ, তোমার এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিল।" দৈববাণী শুনিয়া পাণ্ডুরাজ ক্ষুব্ধ হইলেন, ভাবিলেন,—ধার্ম্মিক সন্তান পৃথিবীর কোন্ কার্য্যের হইবে? ধার্ম্মিক বা অকর্ম্মণ্য এক কথা—এই তাঁহার ক্ষোভের কারণ। ধার্ম্মিক পুত্র রাজকার্য্যের উপযুক্ত নয়, এরূপ ধারণা সাধারণের। কিন্তু ভারত যুদ্ধে, তাঁহার ভীমার্জ্জুন পুত্রদ্বয় দ্বারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভগদত্ত প্রভৃতি মহা-বীরগণ পরাজিত হইত না, কৃষ্ণসহায়ে "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" হইয়াছিল।

এরূপ ধারণার কারণ এই, অনেক সময় ভীরু ব্যক্তিকে আমরা ধার্ম্মিক বলিয়া গ্রহণ করি। কাহারও কথায় থাকেন না, কেহ মন্দ ব্যবহার করিলে সহ্য করেন, সকলের নিকটে বিনয়ী নিরীহ গোবেচারা,—ধূর্ত্ত শঠ ব্যক্তি বার বার তাঁহাকে প্রতারিত করে, তবু কাহাকেও তিনি কিছু বলেন না, এরূপ ব্যক্তি অকর্ম্মণ্যই বটে; এরূপ ব্যক্তির সকল কার্য্যের ভিত্তি ভয়।

তিনি ভয়ে শক্র দমনের চেষ্টা করেন না। অনেক সময়ে যে প্রতারিত হইয়াছেন, তাহার কারণ লোভ—যে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে, সে তাঁহাকে লাভের আশা দিয়াছিল ; সেই লাভের আশায়, প্রতারককে তিনি অর্থদান করিয়াছিলেন। ভালমন্দ কিছুতেই থাকেন না ; সদাই ভাবেন, না জানি কি করিতে কি হইবে ! এরূপ ব্যক্তি ঘোর তমোগুণাচ্ছন্ন ; সত্যই জগতের কোন কার্য্যই ইহাঁর দ্বারা হয় না।

কিন্তু যিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক, তিনি মহাবীর, তিনি অসীম সাহসী, তিনি বিপুল কর্ম্মক্ষম। ধার্ম্মিকের প্রধান লক্ষণ দয়া। দয়া কখনও স্থির থাকিতে দিবে না, নিয়ত কর্ম্মে নিবিষ্ট রাখিবে। দয়াবান ব্যক্তি দুর্ব্বলপীড়ন দেখিতে পারিবেন না। শত শক্র উপেক্ষা করিয়া, দুর্ব্বলের রক্ষার চেষ্টা পাইবেন। পরের রক্ষার নিমিত্ত অনায়াসে অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন, অনায়াসে সমুদ্রে ঝাঁপ দিবেন। ইনি অত্যাচারীর প্রতি দুর্ব্যবহার করেন না, ইহার কারণ ভয় নহে, মার্জ্জনা। ভয়ে চালিত হইয়া কখনও কখনও আমরা ক্ষমাশীল হই। পুরাণে তাহার একটী অদ্ভুত উদাহরণ—অর্জ্জুন ; রণস্থলে যুদ্ধ করিতে চাহেন না। গীতায় দেখা যায় যে, অর্জ্জুন বলিতেছেন, এ সমস্ত আত্মীয়গণকে কিরূপে বধ করিব ? ইহাদের বধ করিয়া রাজ্যলাভ করা অপেক্ষা ভিক্ষাপাত্র অবলম্বন করাই ভাল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের এ কথা শুনিয়া, তাঁহাকে "মূর্খের মত আচরণ করিতেছ"—বলিয়া তিরস্কার করেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে, গীতা পাঠে অনুভব হয়, অর্জ্জুন তমোগুণাচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে বিমুখ হন। শঙ্কায় তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়, মহা অস্ত্রধারী, মহা রথীবৃন্দ বিপক্ষ পক্ষে দর্শনে, তিনি যুদ্ধে বিমুখ হইতে চাহেন। ভগবান উপদেশ দ্বারা, সেই ঘোর তমঃ দূর করিয়া, তাঁহাকে গাণ্ডীব ধরান। ভগবান যোগদৃষ্টি দানে তাঁহাকে দেখান যে, যে সমস্ত বীরপুরুষ তাঁহার বিপক্ষ, তাঁহারা সকলেই মৃত, কেবল নিমিত্ত হইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুন নিমিত্ত মাত্র, ভগবানের কার্য্য ভগবান করিয়াছেন। গীতার মর্ম্ম এই যে, বীর ব্যতীত ধর্ম্মের অধিকারী আর কেহই হইতে পারে না।

ইতিহাসে দেখা যায় যে, জাতীয় উন্নতির মূলে ধর্ম্ম। ধার্ম্মিক, স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ ব্যতীত কেহ কখনও কোন জাতির নেতা হন নাই। স্বার্থশূন্য ব্যক্তির দ্বারা চালিত না হইয়া, পৃথিবীতে কখনো কোন কার্য্য হয় নাই। ধর্ম্মের ভিত্তি ভিন্ন সাংসারিক কোন কার্য্যই হয় না। ধর্ম্মমূলক না হইলে,

পৃথিবীতে বিপুল বাণিজ্য স্থাপিত হইত না। কখনও কোন অধার্ম্মিক ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, দেখা যায়, কিন্তু প্রায়ই সে অর্থ তাহার ভোগে আসে না। নানা কষ্টে, নানা ভয়ে, নানা অনুতাপে দগ্ধ হইয়া অর্থ উপার্জ্জন হয়, কিন্তু তাঁহার উপার্জ্জন যকের ন্যায়, তাঁহার কোন কার্য্যেই আসে না। অসৎ বৃত্তির দ্বারা কদাচ কেহ ধনাঢ্য হয় বটে, কিন্তু শত শত ব্যক্তিকে অসৎ পথে গিয়া কারাবাসে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। Policy (কৌশল) যাহার অর্থ আমরা প্রতারণা বুঝি, বস্তুতঃ তাহা প্রতারণা নয়, পণ্ডিতেরা বলেন, সততা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশল নাই।

গুরু ধার্ম্মিক হইতে উপদেশ দেন, সারবান গ্রন্থে ধর্ম্মের অশেষ ব্যাখ্যা; তবে কি নিমিত্ত আমরা ধর্ম্মপথে চলি না? অধর্ম্মের কতকগুলি আশু প্রলোভন আছে। এক ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মিথ্যা কথা বলা কি ভাল? বন্ধু কৌতুকচ্ছলে উত্তর করেন, মিথ্যা কথা ভাল নয় বটে, কিন্তু যদি সত্য গোপন করিতে চাও, তাহা হইলে মিথ্যা কথা অপেক্ষা সত্য গোপন করিবার আর কোন উৎকৃষ্ট উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। সমাজ হীনদশাপন্ন হওয়ায় বাল্যকাল হইতে মিথ্যার প্রয়োজন হইয়াছে, মানব-জীবনে, বিশেষ বাল্যাবস্থায় পদে পদে অপরাধ। অপরাধ গোপন করিবার নিমিত্ত বালক মিথ্যা কথা কহে। পিতামাতা বা শিক্ষক মিথ্যাবাদী বালককে সুচতুর বলিয়া আদর করে। ইতিপূর্ব্বে শিশু কোন আবদার করিলে তাহাকে মিথ্যা বলিয়া ভুলান হইত; শিশু তখনই শিখিয়াছে যে, মিথ্যা বড় সহজ উপায়। শিশু যখন কোন বস্তু চাহিয়াছিল, তাহাকে বলা হইয়াছিল, "হুস, কাগা নিয়ে গেছে।" যদি শিশুর নিকট কৌতুক করিয়া কোন দ্রব্য চাওয়া হয়, সেও আধ আধ স্বরে বলে, "হুস্ কাগা!" আমরা, শিশুর কৌশলে হাসিয়া ঢলিয়া পড়ি। শিশুও মনে ভাবে, আমি কি সুকৌশলী! বালক দেখিতে পায়, মাতা পিতার সহিত, পিতা মাতার সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত মিথ্যা কথা কয়। পিতা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইলে বালককে বলিয়া দেয়, "বলগে, আমি বাড়ী নাই।" বালক মিথ্যার বিশেষ আদর করিতে শিখে এবং সেই কোমল হৃদয়ে যে দাগ পড়ে, তাহা আর ইহজন্মে উঠে না। সমাজ জানে, বালককে শিষ্ট করিবার উপায়, ভয় প্রদর্শন। জুজু হইতে সুরু করিয়া, বরাবর ভয়ই প্রদর্শন করা হয়; সুখের বাল্য-জীবনে ভয় অধিকার করিলে, উচ্চ বৃত্তি সমস্ত দমিত হয়। সকলউচ্চ বৃত্তির

আবার সাহস ; যাহার পদে পদে আশঙ্কা, তাহার দ্বারা কোন্ কার্য্য সম্পাদিত হইবে? যাহা মন্দ, তাহা মন্দ বলিয়া ঘৃণা করিতে শেখে না, কেবল ভয়ের দ্বারা মন্দ কার্য্য করিতে বিরত হয়। যৌবনে, যখন আশু ভয়ের কোন কারণ না থাকে, তখনই সেই কুকার্য্যে রত হয়। সে যতদূর শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে জানে যে, চুরী করিব না কেন? মার খাইব। কুস্থানে গমন করিব না কেন? বাবা তাড়াইয়া দিবে। তাড়নার ভয়ে কুকার্য্য করে না, কিন্তু কুকার্য্যের রুচি বাধা পাইয়া আরও প্রবল হইতে থাকে। সচরাচর দেখা যায়, শিষ্ট শান্ত ছিল, যেই পিতৃহীন বা অভিভাবকহীন হইল, অমনি মহা কুচরিত্র হইয়া উঠিল। এখন তার ভয় নাই, তবে দুষ্কর্ম্ম করিবে না কেন? বাল্যাবধি যে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার ফল ইহা ভিন্ন হইতে পারে না।

কিন্তু যদি কুকার্য্যকে কুকার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিত, যদি উপদেশ শ্রবণে ও আদর্শ দর্শনে, বাল্যাবধি ধর্ম্মানুরাগী হইতে দীক্ষিত হইত, যদি বুঝিতে পারিত যে, মানবজীবনে ধর্ম্মই একমাত্র সহায়, ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে শত শত বিপদে ধৈর্য্যচ্যুত হইতে হয় না, ধর্ম্ম অবলম্বনে মনুষ্যত্ব লাভ হয়, তাহা হইলে অভিভাবকহীন হইলেও তাহাকে কেহ কুপথগামী করিতে পারিত না। বাল্যকালে মিথ্যা প্রবঞ্চনা না শিখিলে সত্যাশ্রয়ী হইত, আর যিনি সত্যাশ্রয়ী, তাঁহার তুল্য জগতে নির্ভীক কে? সভ্যজাতির ভিতর ভীরু অপেক্ষা গালি নাই এবং ভীরু বা মিথ্যাবাদী একই কথা। যিনি বাল্যাবধি গুরুজন উপদেশে সত্যব্রত, তিনি যে অশেষ গুণের আধার হন, সন্দেহ নাই। পাছে মিথ্যা বলিতে হয়, এই জন্য তিনি কুৎসিত কর্ম্ম হইতে বিরত থাকেন। আমেরিকার বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট রুসভেল্টকে, তাঁহার কোন এক বন্ধু রবিবারে, শীকার করিতে যাইতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, "অদ্য রবিবারে, শীকার করা তো প্রথা নয়।" বন্ধু উত্তর করিলেন, "এখানে তো পাদ্‌রী নাই, তবে যাইতে দোষ কি?" রুসভেল্ট, তাহাতে হাস্য করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভাই, অত সাত পাঁচ ভাবিয়া, গোপনে শীকার করিতে যাওয়া অপেক্ষা না যাওয়াই নিরাপদ।" সত্যাশ্রয়ী সর্ব্বদাই এরূপ নিরাপদ সত্য।

বালককালে মিথ্যাশিক্ষার সহিত একরূপ ব্যবসায়ী ধর্ম্মশিক্ষাও বালক পাইয়া থাকে। সকলের মুখেই শোনে, ধর্ম্মপথে থাকিলে ভাল হয়, অর্থাৎ ধন হয়, জন হয়, মান হয়। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম, কাহারও নিকট ধন, জন, মান

বা সাংসারিক উন্নতি দান করিতে অঙ্গীকৃত নন। এই ব্যবসায়িক ধর্ম্মশিক্ষা অনেক সময় বিড়ম্বনার কারণ হয়। সংসার দৃষ্টে অনেক সময় বোধ হয়, বুঝি, অধর্ম্মেরই জয় হইতেছে। দেখা যায়, শঠ, ছল, মিথ্যাবাদী, কপট মকদ্দমায় জয়ী হইল, পরের সম্পত্তি হরণ করিয়া বিষয় পাইল। ছলনায় রোজগার করিয়া, বাবুয়ানা করিতেছে। যে পরপীড়ক, তাহাকে সকলে ভয় করে। এ দিকে আবার ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দাতা নানা ক্লেশে ধনোপার্জ্জন করে, দরিদ্রের দুঃখমোচনে রত থাকিয়া অর্থ রাখিতে পারে না, পরের হিত করিতে গিয়া অনেক সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে গিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, জমিদারের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষী না দিলে উদ্‌বাস্ত হয়, রুগীর শুশ্রূষা করিয়া স্বয়ং রোগগ্রস্ত হয়। যিনি ব্যবসায়ী ধর্ম্ম শিখিয়াছেন, এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার ধর্ম্মে অনাস্থা জন্মে। তিনি মিথ্যা কথা কন না, প্রতারণা করেন না; কৈ, ঘরে বসিয়া ধর্ম্ম তো তাঁহাকে অর্থ দেন না। অনেক ব্যক্তি, যাহাদের তিনি উপকার করিয়াছেন, প্রায়ই তাহারা তাঁহার নিন্দা করে। পরোপকার করিয়া কই তিনি জগতে মান্য গণ্য হইলেন? তাঁহার পল্লীস্থ শত শত ব্যক্তি ধনাঢ্য অধার্ম্মিকের বশীভূত, তাঁহার বশীভূত কেহই নয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, কিন্তু এক অধার্ম্মিক ব্যক্তির সাত পুত্রই জীবিত। তবে ধার্ম্মিক হইয়া তাঁহার কি ফল ফলিল? আত্মীয় বন্ধুরা তাঁহাকে উপহাস করে, অনেকেই বোকা বলে। ইনি সত্য কথা কহিয়া মকদ্দমায় হারিয়াছেন,—ইহাতে ঘর পরে লাঞ্ছনার এক শেষ! তবে আর কেন তিনি ধার্ম্মিক থাকিবেন? এতদিন মূর্খের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন, এইবার সতর্ক হইয়া চলিবেন। আশু কতক ফলও ফলে। তিনি যে মিথ্যা কথা শিখিয়াছেন, লোকে তাহা সহজে জানিতে পারে না। লোকের বিশ্বাস-পাত্র হইয়া অনেককে ঠকাইতে সক্ষম হন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারেন যে, প্রতারণায় অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইয়াছে। কখন কোন্ জুয়াচুরী ধরা পড়িবে! যে সকল কায করিয়াছেন, ইহকালেই তার সাজা আছে। সমস্ত কথা প্রকাশ হইলে, জেল নিশ্চিত। একটা মিথ্যা ঢাকিবার জন্য মিথ্যার জাল বিস্তার করিতে হইয়াছে। প্রাতে কেহ ডাকিলে পূর্ব্বের ন্যায় সহজে তাঁর সম্মুখীন হইতে পারেন না। দিবসে হাস্যমুখে, অন্তরের ছুরি ঢাকিয়া রাখিতে হয়। রজনীযোগে, উপাধানে মস্তক রাখিলেই পূর্ব্ববৎ নিদ্রা আসে না। যে সকল গলৎ হইয়াছে, তাহা কি গলৎ

কার্য্য করিয়া লুকাইতে পারিবেন, এই চিন্তায় অর্দ্ধেক রাত্রি জাগরিত থাকিতে হয়। এখন আর সে শান্ত মেজাজ নাই, ভাল কথা কহিলে বেজার হন। অসৎ ব্যক্তির সাহায্যে তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন। অসৎ ব্যক্তি না হইলে তাঁহার অসৎ কার্য্যে সাহায্য দান কে করিবে? কিন্তু যাহাকে অসৎ জানেন, তাহার উপর কার্য্য নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সেই অসৎ ব্যক্তি সত্যই কি তাঁহার সাহায্য করিবে? কিম্বা তাঁহার শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে? নানা দুশ্চিন্তা—তথাপি ফিরিবার উপায় নাই,—কাহাকেও বিশ্বাস হয় না, চাকর বাকর, আত্মীয় স্বজন এমন কি, ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেও মনের গুণে অসৎ বিবেচনা করেন। দিবসে দুশ্চিন্তা, রাত্রে দুঃস্বপ্ন—তাঁহার জীবন হলাহলময় হইয়াছে। যে অর্থের নিমিত্ত ধর্ম্মপথে জলাঞ্জলি দিয়া, অধর্ম্মপথে বিচরণ করিতেছেন, সেই অর্থ তাঁহার পুত্রকেও পর করিয়াছে।

কতদিনে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইবে,—তাঁহার পুত্রের এই চিন্তা। মনে মনে বেশ বুঝিতে পারেন, কেবল প্রত্যাশাপন্ন হইয়া তাঁহাকে যত্ন করিতেছে। চক্ষের উপর দেখিয়াছেন যে, যে ধনাঢ্য ব্যক্তিকে হিংসা করিয়া, তিনি ধর্ম্মচ্যুত হইয়া পাপপথে বিচরণ করিতেছিলেন,—সেই ধনাঢ্য ব্যক্তির মৃত্যুকালে, অজ্ঞানাবস্থায় যখন মুখে মক্ষিকা প্রবেশ করিতেছিল, তখন তাঁহার সেই অজ্ঞান অবস্থার প্রতি কেহ লক্ষ্য না রাখিয়া তালা-চাবি দিতে ব্যস্ত। যে যেখানে যা পাইতেছে, তাহা সরাইতেছে। আত্মীয়েরা তাঁহাকে শ্মশান ভূমেতে লইয়া গেল, এদিকে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, যেসকল বস্তু তাহার নিকট জিম্মা ছিল সে গুলি লইয়া পলায়ন করিল। সৎকার করিয়া আসিয়াই দুই পুত্রে লাঠা লাঠি বাধিল। অর্দ্ধেক বিষয় উকীল কৌন্সিল খাইল। আবার দেখেন, যে লোক জুয়াচুরী করিয়া বাবুয়ানা করিতেছিল, এতদিনে তাহার জাল ধরা পড়িয়াছে,—নিশ্চয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর যাইতে হইবে—কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী সম্পত্তি পাইয়া উপপতির বাঁদী হইয়াছে। তাঁহার ভাগ্যে যে ঐ একরূপ ঘটিবে, তাহা নিশ্চিত নয় কেন? কিন্তু তথাপি পাপের মমতা ছাড়ে না, ছাড়িবার যোও নাই।—দুষ্কর্ম্ম চাপা দিবার নিমিত্ত দুষ্কর্ম্ম করিতে হইতেছে। অর্থলোভে আবার নূতন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন। জীবন অশান্তিময়, কিন্তু লালসাও সেইরূপ বলবতী! ইহকালের সাজাই যথেষ্ট, ইহার পর পরকাল আছে! একেবারে পরকালের ভয় মহানাস্তিকেরও দূর হয় না। ধর্ম্মভ্রষ্ট পাপী যতই

দিন দিন হীনবল হইতে থাকে, শরীরের বার্দ্ধক্য অবস্থায় যতই দিন দিন বুঝে যে, চরমকালের আর বেশী বিলম্ব নাই, ততই রাত্রদিন বিভীষিকা দর্শন করে। ব্যবসায়ী ধর্ম্ম লোককে অধঃপাতে প্রেরণ করে।

কিন্তু যে মহাত্মা ধর্ম্মের বিমল মূর্ত্তি দেখিয়া ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছেন, যিনি ধর্ম্মকে ধর্ম্মের জন্য উপাসনা করেন, যিনি ধর্ম্মের নিকটে ধর্ম্মপ্রত্যাশী আর অপর প্রত্যাশা কিছুই রাখেন না, জগতে একমাত্র তিনিই ধন্য! রোগ শোক, দুর্ঘটনা, মনুষ্যজীবনে অনিবার্য্য, কিন্তু এরূপ দুঃখ জগতে নাই, যাহাতে সেই ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিকে বিকল করিতে পারে। শান্তিময় ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া, তাঁহার হৃদয় শান্তিময় করিয়াছে, শক্রতরবারিদৃষ্টে তাঁহার চক্ষে পলক পড়ে না! দুর্জ্জন পীড়নে তাঁহাকে তাপিত হইতে হয় না।—ধর্ম্মবলে রোগ-শোকে অধীর নন—রাজক্রোধেও তিনি ভীত হন না; সকল অবস্থায় সর্ব্বসময় তাঁহার শান্তি! তিনি যমজয়ী, তাঁহার মৃত্যুভয় নাই।

এ ধর্ম্ম লাভ কিরূপে হয়? এ মহারত্ন কিরূপে অর্জ্জন করা যায়? সদ্-গুরুর উপদেশ, ও সদসদ্বিচার। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পাপ বড় মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নরসম্মুখে অবস্থান করে। একবার অন্তরে প্রবেশ করিলে কত যন্ত্রণা দিবে, তাহা সে মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে অনুভূত হয় না। পাপের যন্ত্রণার কথা শুনিয়া, শিক্ষা করা বড়ই কঠিন। অনেক সময়েই মনে হয়, ইন্দ্রিয়ের সুখভোগই পরমার্থ,—একটু মানসিক যন্ত্রণায় আর কি আসিয়া যাইবে!—যাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত না হইয়াছে,—অন্তর্দাহ যে কি কঠোর নরক,—তাহা সে বুঝিতে পারে না। অন্তর্দাহের কথা শুনিয়াছে মাত্র, প্রবল ইন্দ্রিয় কখনও অন্তর্দৃষ্টি করিতে দেয় নাই। সুতরাং পাপের তাড়না, কলুষিত মনের গ্লানি, দণ্ডের আশঙ্কা, যে কত দূর দুঃসহ, তাহা কিরূপে জানিবে! হিতাহিত জ্ঞান যে কত তীব্র শূল জাগরণে, শয়নে, স্বপনে বিদ্ধ করে, তাহা ইন্দ্রিয়াসক্ত মূঢ় বোঝে না,—এই নিমিত্ত ধর্ম্মে অনাস্থা।

হে ধর্ম্ম, তোমায় এত দিন ভয় করিয়াই আসিয়াছি। বুঝিতে পারি নাই তুমি পরম বন্ধু। তোমাকে আমার সুখের বিরোধী জানিতাম। তুমি [illegible]কথা, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার করিতে নিষেধ কর,—এই নিমিত্ত তোমায় [illegible] ভাবিয়াছি; তুমি সদাচার, নিষ্ঠাবান, ও কর্ত্তব্যরত হইতে উপদেশ দাও, [illegible] নিমিত্ত তোমায় ঘৃণা করিয়াছি; তুমি অলস হইতে নিষেধ কর, তুমি ইন্দ্রিয়া-[illegible] হইতে নিষেধ কর, তুমি পরের অনিষ্ট করিতে নিষেধ কর, এই নিমিত্ত

ঐক্য সমা ভারা হারা অপেক্ষ সকল

তোমায় বাতুল ভাবিয়াছি। তুমি ধন জন, গৌরব সম্পদ অনিত্য বলিতে শিখাও, তুমি সুখ দুঃখে সমভাবে থাকিতে বলো, মানব-জীবনে দুঃখ অনিবার্য্য, ইহাই প্রচার করিয়া থাক। দুঃখে অন্তর মার্জ্জিত হয়, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ চক্রবৎ ঘুরিতেছে, সে কারণ সুখ দুঃখ উভয়কে উপেক্ষা করিতে তুমি পরামর্শ দাও।—আমি নির্ব্বোধ, বিবেকহীন,—সারগর্ভ কথা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব,—অতএব ও সকল কথার কথা জানিয়াছিলাম। তুমি যে স্বাস্থ্যদাতা, বলদাতা, সাহসদাতা, ধৈর্য্যদাতা, শান্তিদাতা—এতদিন তোমায় চিনি নাই,—হে শান্তিময়, হে নিরঞ্জন, হে মঙ্গলময়, তোমাকে নমস্কার করি। শুনিয়াছি, প্রার্থনা করিলে তুমি হৃৎপদ্মে আসিয়া বোসো। হে ধর্ম্ম, যে প্রার্থনা তোমায় প্রিয়, সেই প্রার্থনা আমায় শিক্ষা দাও, তোমার মোহন মূর্ত্তি দেখিবার আমায় চক্ষু দাও, তোমার উপাসনা করিবার বল দাও!—হে ধর্ম্ম, তোমায় একমাত্র বান্ধব জানিয়া যেন আমার জীবন লীলা সংবরণ হয়।

হিন্দুবিবাহ ও সার এডুইন আর্ণল্ড।

সার এডুইন আর্ণল্ডের নাম এদেশের অনেকের নিকট পরিচিত। তাঁহার ইংরাজী কবিতায় লিখিত বুদ্ধদেবচরিত, ভগবদ্গীতা, কঠোপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যান প্রভৃতি দ্বারা তিনি যে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও সহানুভূতিসম্পন্ন, তাহা অনেকেই বোধ হয় জানিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রে 'ভারতে বিবাহ' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার ভারতীয় সমাজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে।

বিলাতের প্রিভি কৌন্সিলে কোন হিন্দু বিধবার স্বত্বাধিকার লইয়া যে আপীল হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুবিবাহের অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে সচরাচর পড়ে না। আর্ণল্ড বিবাহ ও অন্যান্য বিষয়ক কতকগুলি হিন্দুপ্রথার উল্লেখ করিয়া পরিশেষে কতকগুলি বিষয়ে যে, মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বড় সারগর্ভ।

ইনি বলেন, "হিন্দুদের বর সচরাচর কন্যাকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া বিবাহ করে না। তাহাদের পিতামাতা বা অন্যান্য অভিভাবকের অনুমোদনক্রমে ঘটকের সহায়তায় ইহা সম্পাদিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রথা এই খুব উপযোগীই হইয়া থাকে। আমার বোধ হয়, কেহ কেহ বলিবেন সকাহ

পাশ্চাত্য স্বাধীন নির্ব্বাচনপ্রথা হইতে ইহা অধিকতর উপযোগী। আমি নিজে বিশ্বাস করি যে, ইহা সাহসপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে এবং তালিকা দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রাচ্যদেশে সুখী দম্পতীর সংখ্যা অধিক। পাশ্চাত্য প্রথার বিবাহে যে সকল বিসদৃশ ভ্রান্তি, হঠাৎ নির্ব্বাচন ও তজ্জনিত প্রবল নৈরাশ্য দেখা যায়, প্রাচ্যপ্রথার বিবাহে সংসারাভিজ্ঞ সুচতুর ব্যক্তিগণের সাবধান নির্ব্বাচনে তাহা ঘটিতে পারে না। প্রেমের তরুণ স্বপ্নে যে বিচার অসম্ভব, তাঁহারা সেই বিষয়বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া, অবস্থার উপযোগী যতদূর সম্ভব, উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। হিন্দুরা বিবাহবন্ধনকে একটা তুচ্ছ বিষয় বিবেচনা করেন বলিয়া যে এরূপ করেন তাহা নহে। বিবাহবন্ধনের পবিত্রতা ও উহার গভীর অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা এইরূপ করিয়া থাকেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য্য বিধানের দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন আর বাস্তবিকও আপাতদৃষ্টিতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, একটী অল্পবয়স্কা বালিকা, যে স্বামীকে পূর্ব্বে কখন না দেখিয়াই বিবাহিত হইয়াছে, সে অল্পবয়সে স্বামীর মৃত্যুর জন্যে রমণীজীবনের সর্ব্বস্ব সুখ হারাইল - ইহা অতি নিষ্ঠুর প্রথা, কিন্তু হিন্দুদের চক্ষে একবার এই বিষয় বিচার করিয়া দেখ। বিবাহিতা হইবামাত্রই সেই কন্যার ভার তাহার স্বামীর পরিবারবর্গ লইয়া থাকেন। এই কারণেই ভারতে স্ত্রীজাতীয় ভিক্ষুক নাই বলিলেই চলে। বিকলাঙ্গী, উন্মত্তা বা অন্য কোনরূপ দোষগ্রস্তা ব্যতীত সকল কন্যারই বিবাহ হইয়া থাকে আর যতক্ষণ তাহার স্বামীর গৃহে একমুষ্টিও অন্ন থাকে, ততক্ষণ তাহাকে উপবাস করিতে হয় না। পতির এরূপ অকালমৃত্যুকে পত্নীর পূর্ব্বজন্মকৃত কোন পাপের ফল বলিয়া বিবেচনা করা হয়। পতিগৃহে থাকিয়া পতির অনুধ্যানে জীবনযাপন করিলে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। হিন্দুবিধবারা তাহাই করিয়া থাকেন। যদি ভারতের সকল বিধবা বিবাহ করেন, তবে প্রথম বা দ্বিতীয় পতির পরিবারবর্গ কখনই বিবাহবন্ধনকে এত দুশ্ছেদ্য ভাবিবেন না আর আমি গণনা করিয়া দেখিয়াছি, যদি সমাজসংস্কারকগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতে দশ বৎসর যাইতে না যাইতে ১৬০ লক্ষ বিধবা দ্বিতীয় বার পতি হারাইয়া পথে দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেন। আমি যে প্রাচ্য প্রথা আমাদের প্রথা অপেক্ষা অধিকতর বিচারসঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিতেছি, তাহা নহে। যে সকল ব্যক্তি বিশেষরূপ না জানিয়া শুনিয়া অথচ উদার হৃদয়ের প্রেরণায়

আমাদের প্রাচ্য ভ্রাতা ভগিনীগণের সম্বন্ধে একটা হঠাৎ মতপ্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সৎপ্রবৃত্তিতে বাধা দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু যাহা বলা হইল, তাহা আমাদিগকে লক্ষ লক্ষ মানবের অতি প্রাচীনকাল হইতে দৃঢ়নিবদ্ধ আচার ব্যবহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার সময় সাবধানতা ও সহানুভূতি শিক্ষা প্রদানে যথেষ্ট হইবে।"

ডিগ্‌বী ও শ্রীরামকৃষ্ণ

আজকাল অনেক ইউরোপীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছেন। সম্প্রতি পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর ভারতহিতৈষী ডিগ্‌বীমহোদয়—'সমৃদ্ধ' ব্রিটিশশাসনাধীন ভারত (Prosperous British India) নামে একখানি গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি সরকারী কাগজপত্র দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ব্রিটিশশাসনে ভারতের অনেক উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু কতকগুলি অনিষ্টও ঘটিয়াছে। ইনি যে শুধু পুস্তকে ভারতের ভৌতিক উন্নতির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নহে, ভারতের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর ব্রিটিশশাসনের কি প্রভাব, তাহাও এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। ইহঁার পুস্তক হইতে কতকাংশের অনুবাদ দেওয়া গেল। ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিবেন, ভারতের উপর ইহঁার কতদূর সহানুভূতি এবং ভারতীয় মহাপুরুষগণের, বিশেষতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণের উপর ইহঁার কতদূর শ্রদ্ধা। ইনি বলেন, " * * উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে জষ্টিস রাণাডে সমুদয় জগতের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিতেন। কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়েই ভারত আত্মসম্মান বজায় রাখিয়াছে। কেবল পরলোকগত ভারতীয় ধর্ম্মবীরগণের নাম করিতে গেলে রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও রামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহঁারা সকলেই বাঙ্গালী। ইহঁারা সমগ্র জগতে পরিচিত এবং জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সমগ্র জগতের তুলনায় বোধ হয় যেখানে আধ্যাত্মিকতা অধিক, সেই দেশের কোটি কোটি অধিবাসিগণের ভিতর ইহঁারা ত মুষ্টিমেয়। ভারতকে এই বিষয়ে অথবা অন্য বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার সুযোগ মোটেই দেওয়া হয় নাই। ইউরোপ যখন মার্টিন লুথারকে প্রসব করিল, তখন সমগ্র জগতের লোক তাঁহাকে একজন ধর্ম্ম-

সংস্কারক বলিয়া জানিতে পারিল। ঠিক সেই সময়েই ভারতও তাঁহার ধর্ম্মবীর প্রসব করিলেন। (সমগ্র জগতে তাঁহাকে ভালরূপ না জানিলেও) শত শত লোকে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। গত শতাব্দীতে যে সকল মনস্বী জন্মগ্রহণ করিয়া ইংরাজজাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয়, রবার্ট ব্রাউনিং ও জন রাস্কিনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। কিন্তু তাঁহারাও বঙ্গদেশের সেই নিরক্ষর রামকৃষ্ণের তুলনায় কেবল অন্ধকারে হাতড়াইয়াছেন মাত্র। তিনি, আমরা যাহাকে শিক্ষা বলি, তাহার কিছুই পান নাই অথচ এমন গভীর তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন যাহা বর্ত্তমান যুগের কেহই দিতে পারেন নাই এবং সংসারক্লিষ্ট, মর্ত্ত্য জীবের নিকট ব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।"

সিষ্টার নিবেদিতা।

(লণ্ডনে।)

উদ্বোধনের পাঠকগণের সিষ্টার নিবেদিতার কথা অবশ্যই স্মরণ আছে। ইনি একজন উচ্চশিক্ষিতা ইংরাজ রমণী। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাগবাজারে প্রায় দেড় বৎসর অবস্থান করিয়া হিন্দুসমাজের, বিশেষতঃ, হিন্দুরমণীর অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ইনি তথায় এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া হিন্দুভাবে বালিকাগণকে অনেক দিন শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। প্লেগের প্রথম আক্রমণের সময় কিরূপে নিঃস্বার্থভাবে কলিকাতার নানাস্থানের বস্তি পরিষ্কার করাইয়াছিলেন, তাহাও সাধারণে অবগত আছেন। 'কালীপূজা' বিষয়িনী অনেকগুলি প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়াছিলেন, উহার মধ্যে কি গূঢ় রহস্য আছে। তাহার পর প্রায় দুইবৎসরের উপর আমেরিকা ও ইংলণ্ডের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া হিন্দুরমণীদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্যজাতির যে সকল ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি পুনরায় কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন এবং হিন্দুভাবে বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এক বিদ্যালয় খুলিবার আয়োজন করিতেছেন। তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে লণ্ডনে 'হিন্দুরমণীর শিক্ষা ও আদর্শ' বিষয়ে

এক বক্তৃতা দেন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল সেই সভায় সভাপতি হন।

সভাপতি মহাশয় বলেন, 'মিস নোব্‌ল ভারতে শিক্ষাপ্রদান কার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের উৎকৃষ্ট অংশের প্রতি তাঁহার খুব অনুরাগ। শিক্ষা-বিষয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি বরাবরই খুব উদার। গভর্ণমেণ্ট নিজে যে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী, তাহা কখন গোপন করেন নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া জোর করিয়া ভারতীয় প্রজাগণকে খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিতে অগ্রসর হন নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে বেসরকারী সকল সম্প্রদায়কেই গভর্ণমেণ্ট উৎসাহ দিয়াছেন। মিস নোব্‌ল হিন্দুবালিকাগণকে, তাহাদের জাতীয় ধর্ম্মের আদর্শের উপর কোন আক্রমণ না করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা দিতে চান। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্তগণ অনেক সময়ে আমাদের সর্ব্বাংশে অনুকরণ করিতে চাহে, ইহাই ঐ শিক্ষার এক মহাদোষ। অতএব মিস নোব্‌ল যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অতি প্রশংসনীয় এবং তিনি উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত। তাঁহার প্রস্তাব ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতির বিরোধী নহে।'

মিস নোব্‌ল বলেন, 'শিক্ষা কোন রূপ বোতলে ভরিয়া ঔষধ গেলানর মত নিয়মিত মাত্রা হিসাবে দেওয়া যায় না। হিন্দুরমণীর পক্ষে তাহাদের শিক্ষার প্রধান অংশ—তাহাদের প্রাচীন শাস্ত্রের প্রভাব। কোন জাতির শিক্ষাসম্বন্ধে কোন প্রণালী উপদেশ করিতে গেলে শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহাদের অবস্থা ও আভ্যন্তরিক জীবনের পর্য্যালোচনা আবশ্যক। আমি অল্পদিন ধরিয়া (দেড় বৎসর) বাঙ্গালী রমণীর বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। আমি যে শুধু হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠভাবের উপর অনুরক্ত, তাহা নই, আমি হিন্দুধর্ম্মের ভালমন্দ সর্ব্বাংশের প্রতিই সহানুভূতিসম্পন্ন। অতএব আমি হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে কোন সমালোচনা করিতে চাহি না। সমুদয় লইয়া হিন্দুজাতি সর্ব্বোচ্চ সভ্যজাতি, আর জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজেই সুন্দর শিক্ষার উপ-যোগী অবস্থা বর্ত্তমান। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যরমণীর এত প্রভেদ যে, কোন ইংরাজমহিলা যদি হিন্দুরমণীকে যথার্থ শিখাইতে চান, তবে তাঁহাকে অবশ্য আপনাকে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে।

'পাশ্চাত্য প্রদেশে রমণীরা অনেকে রাজ্ঞী হইয়াছেন ও কর্ম্মিরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন; অপর দিকে প্রাচ্যপ্রদেশে রমণীর মধ্যে অনেকে মহাসাধু হইয়াছেন। এই ভেদ কেবল রমণীর ভিতর আবদ্ধ নহে, কিন্তু ভারতীয় ব্যক্তিগণের আভ্য-

স্তরিক, সত্য, সরলতাময় জীবনের প্রত্যেক অংশে এই ভেদ বর্ত্তমান। হিন্দু যাহা স্পর্শ করেন, তাহাই নীতিময় হইয়া যায়। জগতে যত সুন্দর জিনিষ আছে, হিন্দুগার্হস্থ্যজীবনের ন্যায় সুন্দর জিনিষ বোধ হয়, কিছুই নাই। ভারতীয় রমণীর আদর্শ, প্রেম নহে, কিন্তু ত্যাগই তাঁহাদের আদর্শ। এই আদর্শে আঘাত না করিয়া আমি হিন্দুরমণীকে আধুনিক পাশ্চাত্য কার্য্যকরীভাব শিক্ষা দিতে চাই।'

(মান্দ্রাজে।)

ইণ্ডিয়ান নেশন বলেন,—"পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া হিন্দু নাস্তিক হইয়া যাইতেছে এবং তাহার অতীত ইতিহাসের প্রতি অশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু আর্য্যধর্ম্মের সত্য ও সনাতন অংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেন ইহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতেছেন। কতকগুলি পাশ্চাত্য নরনারী প্রাচ্যজীবনের সংস্পর্শে আসিয়া প্রাচ্যজাতির অনেকগুলি আধ্যাত্মিক সত্য গ্রহণ করিতেছেন। এই বিনিময়ের জন্য আমরা দুঃখিত নহি। যে গুলি বিনষ্ট হইতেছে, আর যে গুলির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সেগুলির বিনাশ হউক। প্রকৃতির সকল শক্তিই তাহাদের বিরোধী। জীবন্ত ও বিকাশশীল বস্তুর বিকাশে সহায়তা করি আইস। যদি আধুনিক হিন্দুগণের মধ্যে কেহ এত স্থূলদর্শী হন যে, সূক্ষ্ম হিন্দুধর্ম্ম তাঁহার ভাল না লাগে, তিনি পাশ্চাত্য জড়বাদে আপনার মনের মত জিনিষ পাইতে পারেন। কিন্তু আবার যদি কোন নরনারী জড়বাদে বিরক্ত হইয়া ঋষিদের ধর্ম্মেই কেবল শান্তি পান, তাঁহাদিগকেও সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের আত্মার ক্ষুৎপিপাসা মিটাইতে উৎসাহ দেওয়া উচিত—তাঁহারাও যাহাতে আপনাদের উপযোগী বিশ্বাস পোষণ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। মিস নোব্‌ল অথবা যিনি রামকৃষ্ণমিশনসম্প্রদায়ের সিষ্টার নিবেদিতা বলিয়া পরিচিত, তিনি সম্প্রতি মান্দ্রাজ মহাজন সভায় এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার মধ্যে তিনি সাধারণভাবে হিন্দুজীবন ও হিন্দুচিন্তার আলোচনা করেন ও বিশেষভাবে প্রোফেসার জে, সি, বোসের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আলোচনা করেন। তাঁহার কতকগুলি মত আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারকগণের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া প্রতীত হইবে। তিনি বলিয়াছেন, 'ইহা লোকে অনেক দিন বুঝিয়াছে, ধর্ম্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্যদেশকে তোমাদের অনেক শিক্ষা দিবার আছে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিবার তোমাদের কিছুই নাই।'

"ইংরাজরমণীর নিম্নলিখিত ধারণাগুলি দেখিয়া কি সংস্কারকগণ চমকিত ও ভীত হইবেন না ? 'অনেকের ধারণা, ভারতীয় রমণীগণ মূর্খ ও অত্যাচার-পীড়িত। যাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই উত্তর দিতে পারি যে, ভারতীয় রমণীগণ অবশ্য অত্যাচারপীড়িত নহেন। যে সকল দেশ নূতন সভ্য হইয়াছে, সেই সকল দেশে রমণীগণের উপর যত অত্যাচার হয়, ও যত ঘৃণিতভাবে অত্যাচার হয়, ভারতে তত নয়। আর ভারতীয় রমণীর সুখসচ্ছন্দ, তাহাদের সামাজিক প্রাধান্য ও উচ্চ চরিত্র, ভারতের জাতীয়সম্পত্তির শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। ভারতীয় রমণীগণ মূর্খ বলিলে আরো অধিক অন্যায় কথা বলা হয়। তাঁহারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা না হইতে পারেন অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক রমণীই লিখিতে পারেন আর অনেকেই পড়িতে পারেন না ; কিন্তু তাই বলিয়াই কি তাঁহাদিগকে অশিক্ষিতা বলিতে হইবে ? যদি তাই হয়, তবে মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ এবং যে সকল গল্প, সকল জননী ও পিতামহী শিশুগণকে শিখাইয়া থাকেন, তাহারাও শিক্ষার উপাদান নহে। আর—পাশ্চাত্য উপন্যাসাবলিই এবং সংবাদপত্রসমূহই প্রকৃত সাহিত্য ও শিক্ষার উপাদান ! এ কথা কে স্বীকার করিবে ?'

"আর আমাদের যুক্তিবাদী বন্ধুগণ—যাঁহাদের নিজেদের যুক্তির উপর খুব বিশ্বাস, কিন্তু যাঁহারা কোনরূপ অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের শক্তিসম্বন্ধে অজ্ঞ, তাঁহারাই বা এ কথায় কি বলিবেন ? 'ভারত তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহাতে তোমাদিগকে বিজ্ঞানালোচনায় অত্যধিক সহায়তা দেয়, এমন একটী বিষয় আছে ;—অপরোক্ষজ্ঞান শক্তি।—তোমরা কখন লোককে ব্রহ্মের বিষয় শিক্ষা করিতে উপদেশ দাও নাই, তোমরা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জানিতে উপদেশ দিয়াছ—যাহাতে মন সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মবস্তুর সহিত একীভূত হইয়া যায়। এইরূপে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা অনুমান বা বিচারলব্ধ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রতিভা সর্ব্বত্র এইরূপেই জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া থাকে।' "

সমালোচনা।

The Vedanta and its relation to modern Thought. Vol 1. by Pundit Sitanath Tattabhushana (বেদান্ত ও আধুনিক চিন্তার সহিত উহার সম্বন্ধ, ১ম ভাগ ; পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত।)

সীতনাথ বাবু কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় বেদান্তসম্বন্ধে যে কয়েকটী বক্তৃতা দেন, সেইগুলি একত্র করিয়াই এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে। সীতানাথ বাবু বেদান্তের বিশেষ অনুরাগী। তিনি স্বাধীনভাবে প্রকৃত বেদান্ত বা উপনিষদের ভাব বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহার ফলস্বরূপ তিনি কতকটা যেন রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে উপনীত হইয়াছেন। সীতানাথ বাবু নিজে অনেকস্থলে বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞান সাধনলভ্য ও সেই কথার প্রমাণস্বরূপে অনেকস্থলে শাস্ত্রবাক্যও উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ অনেকস্থলে উপনিষদ্‌কে মতবিশেষ বলিয়া যেন ধারণা থাকাতে প্রাচীনকালের শঙ্করাদি বৈদান্তিকগণও যেমন উহাকে কোন বিশেষ মতের পক্ষপাতী বলিয়া মনে করিয়াছেন, সীতানাথ বাবুরও সেই ভ্রম হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার পুস্তকের শেষ অধ্যায় পাঠ করিলে ইহা বেশ প্রতীয়মান হইবে যে, সীতানাথ বাবু বাধ্য হইয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে একমাত্র সত্য মনে করিলেও এক একবার যেন তাঁহার মনে চকিতের মত শুদ্ধাদ্বৈতবাদকেই সত্য বলিয়া মনে হইতেছে।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব এই সকল বিভিন্ন মতের সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বাদ কেবল মত নহে—সাধকের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। শঙ্করের মায়াবাদ শুধু বিচারের দিক্ দিয়া বুঝা যায় না—সাধনের আলোকে এই মায়াবাদতত্ত্ব অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সীতানাথ বাবু বলেন, একত্ব ও বহুত্ব এক সময়েই থাকিতে পারে—এই বিশ্বাস তাঁহার অতিরিক্ত দার্শনিক আলোচনার ফল। সহজজ্ঞানে ও সাধন অবলম্বন করিলে বুঝা যায়, যখন একজ্ঞান হয়, তখন বহুজ্ঞান থাকে না।

যাহা হউক, সীতানাথ বাবুর পুস্তকে ইহা প্রকাশ পাইতেছে, ব্রাহ্ম-সমাজ ঘোর যুক্তিবাদী হইলেও কিরূপে ধীরে ধীরে প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতেছেন। ইনি বলেন, 'রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ বেদান্তভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর চরিত্রে ও জীবনে খুব উন্নত হইলেও বেদান্তের কোন কোন মতে মত দিতে না পারায়—এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজ বেদান্তকে একেবারে পরিত্যাগ করিল। ইহাতে তাঁহার নিজের বিশেষ ক্ষতি না হইলেও সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল। কারণ, যখন কেশব বাবু আদি সমাজের সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার দলের মধ্যে বিজাতীয় ভাবের আতিশয্য হইল। শেষ জীবনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ ও উদাহরণে আপনার ভ্রান্তি

বুঝিয়াছিলেন ও পুনর্ব্বার বেদান্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি ইহা নিজমুখে প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী সে বিষয় প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আবার কেশব বাবুর সমাজের সহিত পৃথক্ হইয়া বেদান্তের চর্চ্চা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিল বলিলেই হয়, কিন্তু কিছুদিন হইল, ইহার কতকগুলি সভ্য বেদান্তচর্চ্চা করিতে রীতিমত আরম্ভ করিয়াছেন।' বলা বাহুল্য,—ইহাঁরা আর কেহ নহেন, সীতানাথ বাবু স্বয়ং এবং তাঁহার কতকগুলি সহযোগী। ইহাঁরা দিন দিন বেদান্তচর্চ্চায় আরো অধিক মনোনিবেশ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

সীতানাথ বাবু উদারপ্রকৃতি। তিনি ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত অন্যত্রও যথা থিওসফিক্যাল সোসাইটী ও রামকৃষ্ণ মিশনে নিরপেক্ষ ভাবে বেদান্তের চর্চ্চা দেখিয়া আনন্দিত। আমরা সকলকে এই গ্রন্থখানি একবার মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

প্রাপ্তি স্বীকার।

বাবু কিশোরীলাল জৈনী কৃত তাম্বুলবিহার। ইহা যে কেবল তাম্বুলের সহিত সেবা তাহা নহে, তামাকের সহিত অতি উপাদেয়। সুগন্ধ ও সুস্বাদজনক। ইহার কৌটাও অতি সুন্দর। মূল্যও খুব সস্তা—চারি আনা মাত্র। ঠিকানা নং ১১৯। ৪, পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মমহোৎসব।

আগামী ২রা চৈত্র রবিবারে কলিকাতার সন্নিকটে, ভাগিরথীর পশ্চিমকূলে বেলুড়-মঠ ঠাকুরবাটীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মমহোৎসব হইবে। তথায় সেই দিবসে উক্ত মঠের অধ্যক্ষ যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এবং যাবতীয় শ্রেণীর আবালবৃদ্ধ সকলকেই নিমন্ত্রণ করিতেছেন। সকলে মহোৎসবে যোগদান করিয়া সকলকার আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

করিয়াছিল, তাহারা সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করে আর যাহারা খুব অসৎ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদের অতি নীচ জন্ম হয়, এমন কি, তাহাদিগকে কখন কখন শূকরজন্ম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হয়। আবার যে সকল প্রাণী দেবযান ও পিতৃযান নামক এই দুই পথের কোন পথে গমন করিতে পারে না, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ ও পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এই জন্যই পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হয় না, একেবারে শূন্যও হয় না।

আমরা ইহা হইতেও কতকগুলি ভাব পাইতে পারি আর পরে হয়ত আমরা ইহার অর্থ অনেকটা বুঝিতে পারিব। শেষ কথাগুলি অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিয়া আবার কিরূপে ফিরিয়া আসে, তাহা প্রথম কথাগুলির অপেক্ষা যেন কিছু অধিক স্পষ্ট বোধ হয়, কিন্তু এই সকল উক্তির সার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, ব্রহ্মানুভূতি ব্যতীত স্বর্গাদিলাভ বৃথা। মনে কর, কতকগুলি ব্যক্তি আছেন—তাঁহারা ব্রহ্মানুভব করিতে এখনও পারেন নাই, কিন্তু ইহলোকে কতকগুলি সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, আর সেই কর্ম্ম আবার ফলকামনায় কৃত হইয়াছে, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা এখান ওখান নানাস্থান দিয়া যাইয়া স্বর্গে উপস্থিত হন আর আমরাও যেমন এখানে জন্মিয়া থাকি, তাঁহারাও ঠিক সেইরূপে দেবতাদের সন্তানরূপে জন্মিয়া থাকেন, আর যতদিন তাঁহাদের শুভ কার্য্যের শেষ না হয়, ততদিন তাঁহারা তথায় বাস করেন। ইহা হইতেই বেদান্তের একটী মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় যে, যাহার নামরূপ আছে, তাহাই নশ্বর। সুতরাং স্বর্গও অবশ্য নশ্বর হইবে, কারণ তথায় নামরূপ রহিয়াছে। অনন্ত স্বর্গ স্ববিরুদ্ধ বাক্যমাত্র যেমন এই পৃথিবী কখন অনন্ত হইতে পারে না, কারণ, যে কোন বস্তুর নামরূপ আছে, তাহারই উৎপত্তি—কালে, স্থিতি—কালে এবং বিনাশও—কালে। বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত স্থির—সুতরাং অনন্ত স্বর্গের ধারণা পরিত্যক্ত হইল।

আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতা ভাগে অনন্ত স্বর্গের কথা আছে, যেমন মুসলমান ও খ্রীশ্চয়ানদের আছে। মুসলমানেরা আবার স্বর্গের অতিশয় স্থূল ধারণা করিয়া থাকে। তাহারা বলে, স্বর্গে বাগান আছে, তাহার নীচে নদী প্রবাহিত হইতেছে। আরবের মরুতে জল একটী অতি বাঞ্ছনীয় পদার্থ, এইজন্য মুসলমানেরা স্বর্গকে সর্ব্বদাই জলপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করে। আমার যেখানে জন্ম, সেখানে বৎসরের মধ্যে ছয়মাস জল। আমি হয়ত স্বর্গকে শুষ্ক স্থান ভাবিব, ইংরাজেরাও তাহা ভাবিবেন। সংহিতার এই স্বর্গ অনন্ত, মৃত ব্যক্তিরা তথায় গমন করিয়া থাকে। তাহারা তথায় সুন্দর দেহ লাভ

করিয়া তাহাদের পিতৃগণের সহিত অতি সুখে চিরকাল বাস করিয়া থাকে, সেখানে তাহাদের সহিত তাহাদের পিতামাতা স্ত্রী পুত্রাদির সাক্ষাৎ হয় আর তাহারা সর্ব্বাংশে এখানকারই মত, তবে অপেক্ষাকৃত অধিক সুখের জীবন যাপন করিয়া থাকে। এই জীবনে সুখের যে সকল বাধাবিঘ্ন আছে, সব চলিয়া যাইবে, কেবল ইহার যাহা কিছু সুখকর অংশ, তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু মানুষ যতই ভাবুক না কেন, উহা খুব সুখের কথা বটে, কিন্তু সুখকর ও সত্য সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। বাস্তবিক চরমসীমায় না উঠিলে সত্য কখন সুখকর হয় না। মনুষ্যস্বভাব বড় স্থিতিশীল। মানুষ কোন বিশেষ কার্য্য করিতে থাকে, আর একবার তাহা আরম্ভ করিলে তাহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। মন নূতন চিন্তা আসিতে দিবে না, কারণ, উহা বড় কষ্টকর।

অতএব আমরা দেখিতেছি, উপনিষদে পূর্ব্বপ্রচলিত ধারণার বিশেষ ব্যতিক্রম হইয়াছে। উপনিষদে কথিত হইয়াছে, এই সকল স্বর্গ, যেখানে মানুষ যাইয়া পিতৃলোকদের সহিত বাস করে, তাহা কখন নিত্য হইতে পারে না, কারণ, নামরূপাত্মক বস্তু মাত্রেই বিনাশশীল। যদি সাকার স্বর্গ থাকে, তবে কালে অবশ্য সেই স্বর্গের ধ্বংস হইবে। হইতে পারে, উহা লক্ষ লক্ষ বৎসর থাকিবে, কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিবে, যখন তাহার ধ্বংস হইবেই হইবে। আর এক ধারণা ইতিমধ্যে লোকের মনে উদিত হইয়াছে যে, এই সকল আত্মা আবার এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে আর স্বর্গ কেবল তাহাদের শুভকর্ম্মের ফলভোগের স্থান মাত্র। আর এই ফল ভোগ হওয়া গেলে তাহারা আবার আসিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। এইটী কথা ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মানব অতি প্রাচীনকাল হইতেই কার্য্য-কারণ-বিজ্ঞান জানিত। পরে আমরা দেখিব, আমাদের দার্শনিকেরা দর্শন ও ন্যায়ের ভাষায় এই তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু এখানে একরূপ শিশুর অস্পষ্ট ভাষায় ইহা কথিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় তোমরা ইহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, এইগুলি সবই আভ্যন্তরিক অনুভূতি। যদি তোমরা জিজ্ঞাসা কর, ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে কিনা, আমি বলিব, ইহা আগে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তৎপরে দর্শনরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। তোমরা দেখিতেছ, এইগুলি প্রথমে অনুভূত, পরে লিখিত হইয়াছে। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রাচীন ঋষিগণের নিকট কথা বলিত। পক্ষিগণ তাঁহাদের সহিত কথা

কহিত, পশুগণ কহিত, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহাদের সহিত কথা কহিত। তাঁহারা একটু একটু করিয়া সকল জিনিষ অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রকৃতির অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চিন্তা দ্বারা বা ন্যায়বিচার দ্বারা উহা লাভ করেন নাই, কিম্বা আধুনিক কালের যেমন প্রথা, অপরের মস্তিষ্কপ্রসূত কতকগুলি বিষয়সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থপ্রণয়ন করেন নাই, অথবা আমি যেমন তাহাদেরই একখানি গ্রন্থ লইয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া থাকি, তাহাও করেন নাই, তাঁহাদিগকে উহা আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল। ইহার সার ছিল সাধন—প্রত্যক্ষানুভূতি, আর চিরকালই তাহা থাকিবে। ধর্ম্ম চিরকালই একটী প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান থাকিবে। মতবাদের ধর্ম্ম কখন হইবে না। প্রথমে অভ্যাস, তার পর জ্ঞান। আত্মাগণ যে এখানে ফিরিয়া আসে, এ ধারণা এই উপনিষদেই বর্ত্তমান দেখিতেছি। যাহারা ফলকামনা করিয়া কোন সৎকর্ম্ম করে, তাহারা সেই সৎ কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই ফল নিত্য নহে। কার্য্য-কারণ-বাদের ধারণা এখানে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, কারণ, কথিত হইয়াছে যে, কার্য্য কারণের অনুসারেই হইয়া থাকে। কারণ যাহা, কার্য্যও তাহাই হইবে। কারণ যখন অনিত্য, তখন কার্য্যও অনিত্য হইবে। কারণ নিত্য হইলে কার্য্যও নিত্য হইবে। কিন্তু সৎকর্ম্মকরা রূপ এই কারণগুলি অনিত্য—সসীম, সুতরাং তাহাদের ফলও কখন নিত্য হইতে পারে না।

এই তত্ত্বের আর এক দিক্ দেখিলে ইহা বেশ বোধগম্য হইবে যে, যে কারণে অনন্ত স্বর্গ হইতে পারে না, অনন্ত নরকও সেই কারণেই হওয়া অসম্ভব। মনে কর, আমি একজন খুব বদ লোক। মনে কর, আমি জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে অন্যায় কর্ম্ম করিতেছি। তথাপি এই সারা জীবনটাও অনন্ত জীবনের তুলনায় কিছুই নয়। যদি অনন্ত শাস্তি থাকে, তাহার অর্থ এই হইবে যে, সান্ত কারণের দ্বারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হইল। এই জীবনের কার্য্যরূপ সান্ত কারণ দ্বারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হইল, তাহা হইতেই পারে না। যদি আমি সারা জীবন সৎকর্ম্ম করিয়া অনন্ত স্বর্গলাভ করি, তাহাতেও ঐ দোষ হইল। পূর্ব্বে যে সকল পথের কথা বর্ণিত হইল, তদ্ব্যতীত, যাঁহারা সত্যকে জানিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আর এক পথ আছে। ইহাই মায়াবরণ হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায়—'সত্যকে অনুভব করা', আর উপনিষদ্ সকল এই সত্যানুভব কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইতেছেন।

ভালমন্দ কিছুই দেখিও না, সকল বস্তু এবং সকল কার্য্যই—আত্মা হইতে

প্রসূত চিন্তা করিবে। আত্মা সকলেতেই রহিয়াছেন। বল, জগৎ বলিয়া কিছু নাই, বাহ্যদৃষ্টি রুদ্ধ কর, সেই প্রভুকে স্বর্গনরক সকল স্থলে দেখ। মৃত্যুতে এবং জীবনে তাঁহাকে দেখ। আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে যাহা পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহাতেও এই ভাব—এই পৃথিবী সেই ভগবানের একপাদ, আকাশ ভগবানের একপাদ ইত্যাদি। সকলই ব্রহ্ম। ইহা দেখিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কেবল ঐ বিষয়ে আলোচনা করিলে বা চিন্তা করিলে চলিবে না। মনে কর, আত্মা জগতের প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারিল, প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মময় বোধ হইতে লাগিল, তখন আমি স্বর্গেই যাই, নরকেই যাই বা অন্যত্র যাই, কিছুই আসিয়া যায় না। আমি পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করি, অথবা স্বর্গেই যাই, তখন কিছুই আসিয়া যায় না। আমার পক্ষে এগুলির আর কোন অর্থ নাই, কারণ, আমার পক্ষে সব জায়গা সমান ও সকল স্থানই ভগবানের মন্দির, সকল স্থানই পবিত্র আর স্বর্গে নরকে বা অন্যত্র আমি কেবল ভগবানের সত্তা অনুভব করিতেছি। ভালমন্দ বা জীবনমৃত্যু কিছুই দেখিতেছি না।

বেদান্তমতে মানুষ যখন এই অনুভূতিসম্পন্ন হয়, তখন সে মুক্ত হইয়া যায় আর বেদান্ত বলেন, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত, অপরে নহে। যে ব্যক্তি জগতে অন্যায় দেখে, সে কিরূপে জগতে বাস করিতে পারে? তাহার জীবন ত দুঃখময়। যে ব্যক্তি এখানে নানা বিঘ্নবাধা বিপদ্ দেখে, তাহার জীবন ত দুঃখময়, যে ব্যক্তি জগতে মৃত্যু দেখে, তাহার জীবন ত দুঃখময়। যে ব্যক্তি প্রত্যেক বস্তুতে সেই সত্যস্বরূপের দর্শন করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত; সেই কেবল বলিতে পারে, আমি এই জীবন সম্ভোগ করিতেছি, আমি এই জীবন লইয়া বেশ সুখী। এখানে আমি ইহা বলিয়া রাখিতে পারি যে, বেদেতে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্ত্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গের অবতারণা। বেদেতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাস্তির কথা এই পাওয়া যায়—পুনর্জ্জন্ম, অর্থাৎ আর একবার উন্নতির সুবিধালাভ করা। প্রথম হইতেই নির্গুণের ভাব আসিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পুরস্কার ও শাস্তির ভাবই খুব জড়ভাবাত্মক, আর ঐ ভাব কেবল মানুষের ন্যায় সগুণ ঈশ্বরবাদেই সম্ভব হয়—যিনি আমাদেরই ন্যায় একজনকে ভাল বাসেন, অপরকে বাসেন না। এরূপ ঈশ্বরধারণার সহিতই পুরস্কার ও শাস্তির ভাব সঙ্গত

হইতে পারে। সংহিতার ঈশ্বর এই রূপ ছিল। সেখানে ঐ ধারণার সঙ্গে ভয়ও মিশ্রিত ছিল, কিন্তু উপনিষদে এই ভয়ের ভাব একেবারে লোপ পাইয়াছে: ইহার সহিত নির্গুণের ধারণা আসিতেছে—আর প্রত্যেক দেশেই এই নির্গুণের ধারণা বিশেষ কঠিন ব্যাপার। মানুষ সর্ব্বদাই সগুণ ব্যক্তি লইয়া থাকিতে চায়।

অনেক বড় বড় চিন্তাশীল লোক, অন্ততঃ জগতে যাঁহাদিগকে খুব চিন্তাশীল লোক বলিয়া থাকে, তাঁহারা এই নির্গুণবাদের উপর বিরক্ত কিন্তু আমার এই সগুণবাদ অতিশয় হাস্যাস্পদ, অতিশয় নিম্নভাবাপন্ন, অতিশয় নীচজনোচিত, এমন কি, অতিশয় ভগবন্নিন্দাকর বোধ হয়। বালকের পক্ষে ভগবানকে একজন সাকার মনুষ্য বলিয়া ভাবা শোভা পায়, সে ঐরূপ ভাবিলে তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু বয়ঃস্থ ব্যক্তির পক্ষে—চিন্তাশীল নরনারীর পক্ষে—ভগবানকে স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া চিন্তা করা বড় লজ্জার কথা। উচ্চতর ভাব কোন্‌টী—জীবিত ঈশ্বর বা মৃত ঈশ্বর?—যে ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, কেহ যাঁহার সম্বন্ধে, কিছু জানে না অথবা যে ঈশ্বর জ্ঞাত? সময়ে সময়ে তিনি জগতে তাঁহার এক এক জন দূতকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে অভিশাপ, আর আমরা যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস না করি, তবে একেবারে বিনাশ! তিনি কেন নিজে আসিয়া, কি করিতে হইবে, আমাদের বলিয়া না দেন? তিনি কেন ক্রমাগত দূত পাঠাইয়া আমাদিগকে শাস্তি ও অভিশাপ দিতেছেন? কিন্তু এই বিশ্বাসেই অনেক লোক সন্তুষ্ট। আমাদের কি নীচতা!

অপর পক্ষে, নির্গুণ ঈশ্বরকে জীবন্তরূপে আমার সম্মুখে দেখিতেছি; তিনি একটী তত্ত্বমাত্র। সগুণ নির্গুণের মধ্যে প্রভেদ এই;—সগুণ ঈশ্বর ক্ষুদ্র মানববিশেষ মাত্র, আর নির্গুণ ঈশ্বর—মানুষ, পশু, দেবতা এবং আরো কিছু যাহা আমরা দেখিতে পাই না, কারণ, সগুণ নির্গুণের অন্তর্গত—উহা সমুদয় ব্যক্তির সমষ্টি এবং তদতিরিক্ত আরো অনেক। 'যেমন একই অগ্নি জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে, আবার তদতিরিক্ত অগ্নিরও অস্তিত্ব আছে,' নির্গুণও তদ্রূপ। আমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে পূজা করিতে চাই। আমি সারা জীবন ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু দেখি নাই, তুমিও দেখ নাই। এই চেয়ার খানিকে দেখিতে হইলে তোমাকে প্রথমে ঈশ্বরকে দেখিতে হয়, তৎপরে তাঁহারই ভিতর দিয়া চেয়ার খানিকে দেখিতে হয়। তিনি দিবারাত্র জগতে থাকিয়া

'আমি আছি', 'আমি আছি', বলিতেছেন। যে মুহূর্ত্তে তুমি বল, 'আমি আছি', সেই মুহূর্ত্তেই তুমি সত্তাকে জানিতেছ। কোথায় তুমি ঈশ্বরকে খুঁজিতে যাইবে, যদি তুমি তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে—জীবিত প্রাণিগণের ভিতর না দেখিতে পার—যদি না তাঁহাকে ঐ যে লোকটা রাস্তায় মোট বহিয়া গলদঘর্ম্ম হইতেছে, তাহার ভিতর না দেখিতে পার? 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী, ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।' তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি বালক, তুমি বালিকা, তুমি বৃদ্ধ, দণ্ডে ভর দিয়া বেড়াইতেছ, তুমি সমুদয় জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।' তুমি এই সব। কি অদ্ভুত জীবন্ত ঈশ্বর! জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র বস্তু। ইহা অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক ইহা পূর্ব্বাপরচলিত ঈশ্বরধারণার বিরোধী বটে, যিনি কোন বিশেষ স্থানে কোন আবরণের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিয়াছেন, যাঁহাকে কেহই কখন দেখিতে পায় না। পুরোহিতেরা আমাদিগকে কেবল এই আশ্বাস দেন যে, যদি আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া জিহ্বা দ্বারা তাঁহাদের পদধূলি লেহন করি ও তাঁহাদিগকে পূজা করি, তবে আমরা এই জীবনে ঈশ্বরকে দেখিব না বটে, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁহারা আমাদিগকে একখানি ছাড় দিবেন—তখন আমরা ঈশ্বরের মুখ দর্শন করিতে পারিব। এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়! এই সকল স্বর্গবাদ আর কি? কেবল পুরোহিতদের দুষ্টামীমাত্র।

অবশ্য নির্গুণবাদে অনেক জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলে, উহা পুরোহিতদের হস্ত হইতে সব ব্যবসা কাড়িয়া লয়—উহাতে মন্দির, চর্চ্চ প্রভৃতি সব উড়িয়া যায়। ভারতে এক্ষণে দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, কিন্তু অনেক মন্দির আছে, যাহাতে অসংখ্য হীরা জহরত রহিয়াছে। যদি লোককে এই নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় শিখান যায়, তাহাদের ব্যবসা চলিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদিগকে ইহা পৌরোহিত্যের ভাব ছাড়িয়া দিয়া শিখাইতে হইবে। তুমিও ঈশ্বর, আমিও তাহাই—তবে কে কাহার আজ্ঞা পালন করিবে? কে কাহার উপাসনা করিবে? তুমি ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির; আমি কোনরূপ মন্দিরে কোন রূপ প্রতিমা বা কো রূপ শাস্ত্র উপাসনা না করিয়া বরং তোমার উপাসনা করিব। লোকে এ পরস্পর বিরোধী চিন্তা করে কেন? লোকে বলে, আমরা খাঁটী প্রত্যক্ষবাদী বেশ কথা। কিন্তু এইখানে তোমাকে উপাসনা করার চেয়ে আর কি অধি প্রত্যক্ষ হইতে পারে? আমি তোমাকে দেখিতেছি, তোমাকে বেশ অনুভ

করিতেছি, আর জানিতেছি তুমি ঈশ্বর। মুসলমানেরা বলেন, আল্লা ব্যতীত ঈশ্বর নাই, কিন্তু বেদান্ত বলেন, মানুষ ব্যতীত ঈশ্বর নাই। ইহা শুনিয়া তোমাদের অনেকের ভয় হইতে পারে, কিন্তু তোমরা ক্রমশঃ ইহা বুঝিবে। জীবন্ত ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, তথাপি তোমরা মন্দির—গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতেছ আর সর্বপ্রকার কাল্পনিক মিথ্যা বস্তুতে বিশ্বাস করিতেছ। মানবাত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য তির্য্যগ্‌জাতিরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মানুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহলস্বরূপ। যদি আমি তাহার উপাসনা করিতে না পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না। যে মুহূর্ত্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যদেহরূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব, যে মুহূর্ত্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যের সম্মুখে ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারিব, আর বাস্তবিক তাহার মধ্যে ঈশ্বর দেখিব, যে মুহূর্ত্তে আমার ভিতরে এই ভাব আসিবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইব—সমুদয় পদার্থই আমার দৃষ্টি হইতে অপসারিত হইয়া যাইবে।

ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাযের উপাসনা। মতমতান্তর লইয়া আমার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এ কথা বলিলে অনেক লোকে ভয় পায়। তাহারা বলে, ইহা ঠিক নহে। তাহারা তাহাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতামহ তস্য পিতামহ ২০০০০ বৎসর পূর্ব্বে কি বলিয়া গিয়াছেন, তিনি যাঁহাকে বলিয়াছেন, তিনি আবার অপরকে কি বলিয়াছেন, এই সকল কথার বিচারে ব্যস্ত। কথাটা এই, স্বর্গের কোন স্থানে অবস্থিত একজন ঈশ্বর কাহাকেও বলিয়াছিলেন—আমি ঈশ্বর। সেই সময় হইতে কেবল মতমতান্তরের আলোচনাই চলিতেছে। তাঁহাদের মতে ইহাই কাযের কথা—আর আমাদের মত কার্য্যকরী নহে। বেদান্ত বলেন, সকলেই আপনার নিজ নিজ পথে চলুক, ক্ষতি নাই, ইহাই কিন্তু আদর্শ। স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি মন্দ নহে, কিন্তু উহারা সত্যের সোপানমাত্র, সত্য নহে। ঐ সকলে সুন্দর মহৎ ভাব সকল আছে, কিন্তু বেদান্ত প্রতিপদে বলেন, বন্ধো, তুমি যাঁহাকে অজ্ঞাত বলিয়া উপাসনা করিতেছ এবং সারাজগৎ যাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, তিনি জগতে সর্ব্বদাই বিরাজিত। তুমি যে জীবিত রহিয়াছ, তাহাও তিনি আছেন বলিয়া। তিনিই জগতের নিত্যসাক্ষী। সমুদয় বেদ যাঁহার উপাসনা করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে, যিনি নিত্য 'আমি'তে সদা বর্ত্তমান, তিনি আছেন বলিয়াই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। তিনিই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আলোকস্বরূপ। তিনি

যদি তোমাতে বর্ত্তমান না থাকিতেন, তবে তুমি সূর্য্যকেও দেখিতে পাইতে না, সমুদয়ই তোমার পক্ষে অন্ধকারময় জড়রাশি—শূন্য—বলিয়া প্রতীত হইত। তিনিই দীপ্তি পাইতেছেন বলিয়া তুমি জগৎকে দেখিতেছ।

এ বিষয়ে সাধারণতঃ একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে—ইহাতে ত ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। আমাদের সকলেই মনে করিবে, 'আমি ঈশ্বর—যাহা কিছু আমি ভাবি বা করি, তাহাই ভাল—ঈশ্বরের আবার পাপ কি?' প্রথমতঃ, এই প্রকার বিপরীত ব্যাখ্যারূপ আশঙ্কার সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহা কি প্রমাণ করা যাইতে পারে, অপর পক্ষে ঐ আশঙ্কা নাই? লোকে আপনা হইতে পৃথক্ স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে, তাঁহাকে তাহারা খুব ভয় করিয়া থাকে। তাহারা কেবল ভয়ে কাঁপিতে থাকে আর সারা জীবন এইরূপ কাঁপিয়া কাটাইয়া দেয়। ইহাতে কি জগৎ পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে? তুমি ত অপর পক্ষকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলে। যাঁহারা সগুণ ঈশ্বরবাদ বুঝিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিয়াছেন, এবং যাঁহারা নির্গুণ ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে জগতের বড় বড় লোক হইয়াছেন?—মহা কর্ম্মিগণ—মহা চরিত্রবলশালিগণ? অবশ্যই নির্গুণ সাধকদের মধ্য হইতে। ভয় হইতে চরিত্রবান পুরুষ জন্মিবে, ইহা কিরূপে আশা করিতে পার? অবশ্যই ইহা কখনই হইতে পারে না। 'যেখানে একজন অপরকে দেখে, যেখানে একজন অপরের হিংসা করে, সেইখানেই মায়া। যেখানে একজন অপরকে দেখে না, একজন অপরকে হিংসা করে না, যেখানে সবই আত্মময় হইয়া যায়, সেখানে আর মায়া থাকে না।' তখন সবই তিনি অথবা সবই আমি—তখন আত্মা পবিত্র হইয়া যায়। তখনই, কেবল তখনই আমরা প্রেম কাহাকে বলে, বুঝিতে পারি। ভয় হইতে কি এই প্রেমের উৎপত্তি সম্ভব? প্রেমের ভিত্তি স্বাধীনতা। স্বাধীনতা—মুক্তভাব—হইলেই তবে প্রেম আসে। তখনই আমরা বাস্তবিক জগৎকে ভালবাসিতে আরম্ভ করি ও সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের অর্থ বুঝিতে পারি—তাহার পূর্ব্বে নহে।

অতএব এই মতে সমুদয় জগতে ভয়ানক পাপের স্রোত প্রবাহিত হইবে, এ কথা বলা উচিত নয়, যেন অপর মতে কখন লোককে অন্যায় দিকে লইয়া যায় না, যেন উহাতে সমস্ত জগৎকে রক্তপ্লাবনে ভাসাইয়া দেয় না, যেন উহাতে লোককে পরস্পর পৃথক্ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে না। আমার

যদি উপধাভূত ৠকারেরও ইত্ব প্রাপ্তি হয়, তবে 'মাতৃ' এবং 'পিতৃ', শব্দের ঋকার, দীর্ঘ হইবার কালীন 'র'পরবিশিষ্ট হইয়া হইলেও ত ইত্ব প্রাপ্ত হইবে? সেই হেতুই সেখানে (ঋত ইদ্ধাতোঃ সূত্রে) 'ধাতু' শব্দ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই 'মাতৄণাম্, 'পিতৄণাম্' শব্দ ধাতু না হওয়াতে, ইত্ব প্রাপ্ত হইবেনা।

এই প্রকারে তবে সমর্থতা প্রযুক্তই পূর্ব্ব'ণ'কারের সহিত 'অণ্প্রত্যাহারের গ্রহণ হইবে; কিন্তু পরের 'ণ' কারের সহিত গ্রহণ হইবে না। কারণ, যদি পরের ণ কারের গ্রহণ হইত, তবে অণ্ প্রত্যাহারের গ্রহণই অনর্থক হইত। উরণ্রপরঃ এইরূপ সূত্র বলা হইত। অর্থাৎ 'ঋ'স্থানে কোন আদেশ হইতে, যখন তাহা, অচ্ প্রত্যাহারের অন্তর্গতই হইবে, তখন, সন্দেহনিবারক অথচ নিকটবর্ত্তী 'চ'কারের সহিত অচ্ প্রত্যাহারকে অতিক্রম করিয়া দূরবর্ত্তী পরস্থিত অণ্ প্রত্যাহারের গ্রহণ অনাবশ্যক বলিয়া কখনও তাহা গৃহীত হইত না।

ভাষ্যমূল।—অস্মিংস্তর্হি ণ্গ্রহণে সন্দেহঃ। অণুদিৎসবর্ণস্য চাপ্রত্যয় ইতি। অসন্দিগ্ধং পরেণ ন পূর্ব্বেণ ইতি। কুত এতৎ। সবর্ণেহণ্ গ্রহণং তপরংহ্যর্ৎ। *।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পূর্ব্ব 'ণ' কারের সহিত 'অণ্' প্রত্যাহার গ্রহণ সিদ্ধ হইলেও, তবে "অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ। ১। ১। ৬৯। (১) এই সূত্রে, সন্দেহ হইবে?

এই স্থলে পরের 'ণ' কারের সহিতই যে 'অণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইহা কি প্রকারে হইবে?

বার্ত্তিকানুবাদ।—সূত্রকার পাণিনি, সবর্ণ সংজ্ঞাতে পরের 'ণ'কারেরই সহিত 'অণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ করিয়াছেন; যেহেতু, তিনি 'উর্‌ৎ' সূত্র, 'ত'পর বিশিষ্ট করিয়াছেন। *।

ভাষ্যমূল। যদয়মুর্দিত্যকারে তপরকরণং করোতি তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যঃ পরেণ ন পূর্ব্বেণেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু এই "উর্‌ৎ"।৭।৪।৭। (উপধাভূত ঋবর্ণ অর্থাৎ হ্রস্ব ঋ, দীর্ঘ ৠ এবং প্লুত ঋ৩ স্থানে, ঋৎ অর্থাৎ কেবলমাত্র হ্রস্ব ঋ হয়, বিকল্পে,

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

ঢঙ্ পরে আছে এমন ণান্ত বিষয় হইলে) সূত্রে, 'ঋ'কার গ্রহণ করিতে, তপর অর্থাৎ 'ঋৎ' এইরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতেই আচার্য্য (পাণিনি) ইহা জানাইয়াছেন যে, "অণুদিৎ * * *" সূত্রে, সবর্ণ সংজ্ঞাগ্রহণে, পরের 'ণ' কারের সহিতই 'অণ্' প্রত্যাহার হইবে ; পূর্ব্বের 'ণ'কারের সহিত হইবে না। কারণ, যদি পূর্ব্ব 'ণ'কারের সহিত 'অণ্' প্রত্যাহার হইত, তবে 'ঋ'বর্ণ তাহার মধ্যে পতিত হইত না ; সুতরাং 'ঋ'কারের সবর্ণ সংজ্ঞাও হইত না, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত তিন প্রকারের ঋকারেরও গ্রহণ হইত না। 'উঋৎ' সূত্রে, 'ত'পরবিশিষ্ট না করিয়া কেবল ঋকারান্ত অর্থাৎ 'উঋ' এইরূপ সূত্র করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইত।

ভাষ্যমূল।—ইণ্গ্রহণেষু তর্হি সন্দেহঃ অসন্দিগ্ধং পরেণ ন পূর্ব্বেণ। কুত এতৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে 'ইণ্' প্রত্যাহার সমূহ গ্রহণে সন্দেহ হইবে ?

এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, পরের 'ণ'কারের সহিতই 'ইণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ হইবে ; কিন্তু পূর্ব্ব 'ণ'কারের সহিত হইবে না।

ইহা কিরূপে হইবে ?

শ্লোকাংশমূল।—য্বোরন্যত্র পরেণেণ্ স্যাৎ।

শ্লোকাংশানুবাদ।—'য্বোঃ' অর্থাৎ যেখানে (পাণিনি) 'ই'কার এবং 'উ'-কারের গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্যত্র, পরের 'ণ'কারের সহিতই 'ইণ্' প্রত্যা-হারের গ্রহণ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—যত্রেচ্ছতি পূর্ব্বেণ সংমৃদ্য গ্রহণং তত্র করোতি য্বোরিতি। তচ্চ গুরু ভবতি। কথং কৃত্বাজ্ঞাপকম্। তত্র বিভক্তিনির্দ্দেশে সংমৃদ্য গ্রহণে-ঽর্দ্ধচতস্রো মাত্রাঃ। প্রত্যাহারগ্রহণে পুনস্তিস্রোমাত্রাঃ। সোঽয়মেবং লঘীয়সা ন্যাসেন সিদ্ধে সতি যদ্গরীয়াংসং যত্নমারভতে তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যঃ পরেণ ন পূর্ব্বেণেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যেখানেই আচার্য্য, পূর্ব্ব 'ণ'কারের সহিত সংমর্দ্দন করিয়া 'ইণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেখানেই 'য্বোঃ' (১) এই রূপ পাঠ করিয়াছেন। তাহা ('য্বোঃ' এইরূপ পাঠ, 'ইণ্' এইরূপ পাঠ অপেক্ষা) গুরুও হইয়া থাকে।

ইহা ('য্বোঃ' এইরূপ গুরু অর্থাৎ অতিরিক্ত মাত্রাবিশিষ্ট পাঠ) কিরূপে, পর 'ণ'কারের সহিত 'ইণ্' প্রত্যাহার গ্রহণের জ্ঞাপক হইল ?

সেই স্থলে ('ই'কার 'উ'কার স্থলে), বিভক্তি নির্দ্দেশ করিলে ('য়োঃ' এই রূপ ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বিবচনের রূপ গ্রহণ করিলে) 'ই'কার 'উ'কা। সংমর্দ্দন করিয়া গ্রহণ করাতে অর্দ্ধ কম চারি মাত্রা অর্থাৎ সাড়ে তিন মাত্রা হইবে।

আর পক্ষান্তরে প্রত্যাহার (ইণ্) গ্রহণে, তিন ('ইণঃ'এর ইকারে এক মাত্রা, 'ণ'কারে অর্দ্ধ, 'অ'কারে এক এবং বিসর্গে অর্দ্ধ মাত্রা, এই সমুদায়ে তিন মাত্রা) হইবে। সুতরাং উহা, এইরূপ লঘুতর প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধ হইলেও যে, গুরুতর যত্ন আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আচার্য্য ইহাই জানাইতেছেন যে, 'ইণ্' গ্রহণ পরের 'ণ'কারের সহিতই হইবে, পূর্ব্ব 'ণ'কারের সহিত নহে।

ভাষ্যমূল।—কিং পুনর্ব্বর্ণোৎসত্তাবিবায়ং 'ণ'কারো দ্বিরনুবধ্যতে। এতজ্‌জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যো ভবত্যেষা পরিভাষা ব্যাখ্যানতোবিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহা-দলক্ষণমিতি। অণুদিৎসবর্ণং পরিহায় পূর্ব্বেণাণ্ গ্রহণং পরেণেণ্ গ্রহণমিতি ব্যখ্যাস্যামঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—পুনঃ বক্তব্য এই যে, অন্ত দুইটী অসমান বর্ণ কি উৎসরের ন্যায়ই হইয়াছিল যে, এই 'ণ'কারটাকেই কেবল দুইবার অনুবন্ধ (লোপ)-বিশিষ্ট করা হইয়াছে ?

আচার্য্য পাণিনি এইটী জানাইতেছেন যে, "ব্যাখ্যান দ্বারা কোন সূত্রের বা বিষয়ের বিশেষ প্রতিপত্তি (ব্যুৎপত্তি) হইয়া থাকে ; সন্দেহ হইলেই যে অলক্ষণ হইবে, তাহা নহে ;" (১) এইরূপ পরিভাষা হইবে। অতএব আমরা এইরূপ ব্যাখ্যা করিব যে, "অণুদিৎ সবর্ণস্যচাপ্রত্যয়ঃ" এই সূত্রের 'অণ্' ভিন্ন যাবতীয় 'অণ্' প্রত্যাহার, পূর্ব্বের 'ণ'কারের সহিত গ্রহণ হইবে, আর যাবতীয় 'ইণ্' প্রত্যাহার, পরের 'ণ'কারের সহিতই হইবে।

সূত্রমূলম্।—ঞ ম ঙ ণ ন ম্। ৭। ঝ ভ ঞ্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যমূল।—কিমর্থমিমৌ মুখনাসিকাবচনাবুভাবনুবধ্যেতে। ন ঞকার এবানুবধ্যেত।

(১) পূর্ব্বে অন্যান্য দেব ঋষিকৃত ব্যাকরণে যাহা প্রসিদ্ধ ছিল,এবং পাণিনি যাহা জ্ঞাপক নিয়ম দ্বারা সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ভাষ্যকার পতঞ্জলি, স্বকীয় মহাভাষ্যে সুন্দর সুস্পষ্ট সুশৃঙ্খলরূপে, পরিভাষাকারে সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাহারই প্রথম পরিভাষা এই যে,—"ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণম্।" এই পরিভাষা নাগেশভট্ট, তদীয় পরিভাষেন্দুশেখরে, বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভাষ্যানুবাদ। —এই পূর্ব্বোক্ত দুই সূত্রে, এই ('ম্' এবং 'ঞ্') দুইটী মুখ-নাসিকাবচন (অনুনাসিক বর্ণ), অনুবন্ধবিশিষ্ট করা হইয়াছে; কেনইবা কেবল-মাত্র পরসূত্রস্থ (ঝ ভ ঞ্) ঞকারটীই অনুবন্ধবিশিষ্ট করা হয় নাই?

ভাষ্যমূল।—যানি মকারেণ প্রত্যাহারগ্রহণানি হলো যমাং যমি লোপ ইতি। সন্তু ঞকারেণ। হলো যঞাং যঞি লোপ ইতি। নৈবং শক্যম্। ঝকারভকারপরয়োরপি ঝকারভকারয়োর্লোপঃ প্রসজ্যেত। ন ঝকারভকারৌ ঝকারভকারপরৌস্তঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি একমাত্র পরের 'ঞ'ই অনুবন্ধবিশিষ্ট করা হয়, তবে 'ম'কারের সহিত, "হলো যমাং যমি লোপঃ"(১) প্রভৃতি সূত্রে, যে সকল প্রত্যাহার করা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

কেন, হউক না সেখানেও 'ঞ'কারের সহিতই প্রত্যাহার; "হলো যঞাং যঞি লোপঃ" এইরূপই সূত্র হইবে?

এইরূপ হইতে পারে না। (তাহা হইলে) ঝকার ভকার পরে থাকিলেও ঝকার ভকারের (অসঙ্গত রূপ) লোপ প্রসঙ্গ হইবে?

তাহাও হইবে না; যেহেতু, ঝকার এবং ভকার, ঝকার এবং ভকারান্ত শব্দের পরে কুত্রাপি নাই। সুতরাং কেবলমাত্র 'ঞ'কে অনুবন্ধ করিলে, এ স্থলে কোন দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—কথং পুমঃ খয্যম্পর ইতি। এতদপ্যস্তু ঞকারেণ পুমঃ খয্যঞ্পর ইতি। নৈবং শক্যম্। ঝকারভকারপরেঽপি হি খয়ি রুঃ প্রসজ্যেত। ন ঝকারভকারপরঃ খয়স্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—"পুমঃ খয্যম্পরে" ।৮।৩।৬। (অম্ পরে আছে এমন খয়্ পরে থাকিলে, পুম্ শব্দের স্থানে রু হয় অর্থাৎ 'ম'কার স্থানে রু হয়) এই সূত্রে, 'অম্' প্রত্যাহার কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

ইহাও ঞকারেরই সহিত প্রত্যাহার হউক, "পুমঃ খয্যঞ্পরে" এইরূপ সূত্র হইবে।

এইরূপ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে 'ঝ'কার এবং 'ভ'কার পরে আছে, এমন 'খয়্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলেও (অসঙ্গত রূপে) 'রু' প্রাপ্তির প্রসঙ্গ হইবে।

---

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

হইলই বা তাহাতে ক্ষতি কি? কারণ ঝ'কার কিম্বা 'ভ'কার পরে আছে, এমন 'খয়্' প্রত্যাহারান্তর্গত কোন বর্ণ নাই। সুতরাং এ স্থলে 'রু'র প্রসঙ্গ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

ভাষ্যমূল।— কথং ঙমোহ্রস্বাদচি ঙমুণ্নিত্যমিতি। এতদপ্যস্ত ঞকারেণ ঙঞো হ্রস্বাদচি ঙঞুণ্নিত্যমিতি। নৈবং শক্যম্। ঝকারভকারয়োরপি হি পদান্তয়োর্ঝকারভকারাবাগমৌ স্যাতাম্। ন ঝকারভকারৌ পদান্তৌ স্তঃ। এবমপি পঞ্চাগমাস্ত্রয় আগমিনো বৈষম্যাৎ সংখ্যাতানুদেশোন প্রাপ্নোতি। সন্তু তাবদ্যেষামাগমানামাগমিনঃ সন্তি। ঝকারভকারৌ পদান্তৌ ন স্ত ইতি কৃত্বা আগমাবপি ন ভবিষ্যতঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি 'ম্'কার অনুবন্ধ না করা যায়, তবে "ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্নিত্যম্ ।৮।৩।৩২।"(হ্রস্বের পরে যে 'ঙম্', সেই 'ঙম্' অন্তে আছে এমন যে পদ, তাহার পরস্থিত অচের, নিত্য 'ঙমুট্' আগম হয়; যথা,—সুগণ্ণীশঃ) সূত্রে, 'ঙম্'এর গ্রহণ কিরূপে হইবে?

কেন; এখানেও পরবর্ত্তী 'ঞ'কারের সহিতই প্রত্যাহার হইবে। আর 'ঙঞো হ্রস্বাদচি ঙঞুণ্নিত্যম্' এইরূপ সূত্র হইবে।

এইরূপ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে পদান্তস্থিত ঝকার এবং ভকার আগম হইতে থাকিবে।

তাহা হইবে না; কারণ পদের অন্তে ঝকার কিম্বা ভকার, কুত্রাপি নাই।

এইরূপ করিলেও পাঁচটী বর্ণের আগম হইবে, (ঙ, ণ, ন, ঝ, ভ), আর আগমী হইবে তিনটী (ঙ, ণ, ন,); সুতরাং সমান বর্ণ না হওয়াতে, বৈষম্য হেতু, "যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্।১।৩।১০।(১) সূত্রানুসারে, সমানসংখ্যক (আগমাদি) আদেশ প্রাপ্ত হইতে পারিবেনা?

হউক না কেন সেইরূপ; যে সকল আগমবিশিষ্ট বর্ণের আগমী বর্ত্তমান থাকিবে, তাহাদিগেরই আগম প্রাপ্ত হইবে। ঝকার এবং ভকার পদান্ত-বিশিষ্ট নাই, এই করিয়াই ঝকার এবং ভকারের আগমও হইবে না।

ভাষ্যমূল।—অথ কিমিদমক্ষরমিতি। অক্ষরং ন ক্ষরং বিদ্যাৎ। ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতীতি বা অক্ষরম্। অশ্নোতের্বা সরোঽক্ষরম্। অশ্নোতে-

(১) সমানসম্বন্ধীয় যে বিধি, তাহা যথাসংখ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ যে যে বর্ণ স্থানে যে যে বর্ণ আদেশ হইবে, তাহাদের উভয় পক্ষের সম্বন্ধই যদি সমান হয়, তবে সমানসংখ্যক আদেশ বা আগমাদিবিধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

র্ণা পুনরয়মৌণাদিকঃ সরন্ প্রত্যয়ঃ। বর্ণং বাহুঃ পূর্ব্ব সূত্রে ॥ অথবা পূর্ব্ব-সূত্রে বর্ণস্যাক্ষরমিতি সংজ্ঞা ক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর এই বিচার্য্য হইতেছে যে, যে সকল অক্ষরের কথা বলা হইয়াছে বা হইবে, সেই অক্ষর কাহাকে বলে ?

যাহার ক্ষর অর্থাৎ বিনাশ নাই, তাহাকে 'অক্ষর' বলিয়া জানিবে ॥।

যাহা ক্ষয় হয়না অথবা ক্ষরণ (ভ্রষ্ট) হয়না, তাহাকে 'অক্ষর' বলে।

অথবা অশূ (ব্যাপ্তৌ সংঘাতে চ, স্বাদিগণীয়) ধাতুর উত্তর সরন্ প্রত্যয় করিয়া 'অক্ষর' হইয়াছে।

অথবা পক্ষান্তরে অশূধাতুর ব্যাপ্তি অর্থে ঔণাদিক সরন্ প্রত্যয় করিয়া, অশ্নুতে অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয় সর্ব্বত্র যাহা, তাহাই 'অক্ষর'।

কিংবা পূর্ব্ব সূত্রে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যাকরণে বর্ণকে অক্ষর বলা হইয়াছে।

অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব (ব্যাকরণস্থিত) সূত্রে, বর্ণেরই অক্ষর সংজ্ঞা করা হইয়াছে। (এখানে তাহাও স্বীকৃত হইতেছে)।

ভাষ্যমূল।—কিমর্থমুপদিশ্যতে।॥

অথ কিমর্থমুপদেশঃ ক্রিয়তে। বর্ণজ্ঞানং বাগ্‌বিষয়ো যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে। তদর্থমিষ্টবুদ্ধ্যর্থং লঘ্বর্থঞ্চোপদিশ্যতে ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কিজন্য উপদেশ করা হইয়াছে ?

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, অক্ষরসমূহ, বৈয়াকরণগণ কর্ত্তৃক, কেন ব্যাকরণে উপদেশ করা হইয়াছে ?

বর্ণ অর্থাৎ অক্ষরসমূহের জ্ঞান দ্বারাই সেই অক্ষরসমূহ মিলিত হইয়া যে বাক্য হইয়া থাকে, সেই বাক্যের এবং বাক্যের বিষয়সমূহের জ্ঞান হইয়া থাকে ; অর্থাৎ বাক্যের বিষয় স্বরূপ শাস্ত্রের জ্ঞান হয় ; যে বাক্যে (পদে), ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তজ্জন্য অর্থাৎ শাস্ত্র জ্ঞানের জন্য, ইষ্ট বুদ্ধি অর্থাৎ অভীপ্সিত পদ পদার্থ জ্ঞান হওয়ার জন্য এবং লঘু উপায়ে, অর্থ বোধ হইবার জন্য, বর্ণসমূহের উপদেশ করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূল। সোঽয়মক্ষরসমাম্নায়ো বাক্‌সমাম্নায়ঃ পুষ্পিতঃ ফলিতশ্চন্দ্র-তারকবৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ। সর্ব্ববেদপুণ্যফলাবাপ্তিশ্চাস্য জ্ঞানে ভবতি। মাতাপিতরৌ চাস্য স্বর্গে লোকে মহীয়েতে ॥

ইতি শ্রীমদ্ ভগবৎ পতঞ্জলিবিরচিতে ব্যাকরণমহাভাষ্যে প্রথমস্যাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে দ্বিতীয়মাহ্নিকম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে অক্ষরের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে, সেই যে এই অক্ষরসমাম্নায় এবং বাক্‌সমাম্নায়, তাহা ব্যাকরণ দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করাতে, পুষ্পিত অর্থাৎ পুষ্প যেমন শোভা সুগন্ধি দ্বারা লোকের নিকট মনোহর হয়, সেইরূপ মনোহর। ফলিত অর্থাৎ পুষ্প যেমন পরিণামে শোভা সুগন্ধি পরিত্যাগ করিয়া জীব-ভোগ-পুষ্টিকর-ফলাকার ধারণ করে, সেইরূপ ব্যাকরণাদি শাস্ত্রদ্বারা শব্দের তাৎপর্য্য জ্ঞান হইলে, আর পদলালিত্যের দিকে দৃষ্টি না থাকিয়া চরমলক্ষ্য তত্বজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি পড়ে এবং বিমল ব্রহ্মানন্দ ভোগ হইতে থাকে। চন্দ্রতারকাদিবৎ প্রতিমণ্ডিত অর্থাৎ চন্দ্র এবং তারকাসমূহ যেমন অনাদি কাল হইতে প্রতিকল্পেই প্রকাশিত হইয়া থাকে, বাক্‌ব্যবহারও সেইরূপ অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং চলিবে। আর সেই বর্ণসমূহেই বেদমন্ত্রসমূহ রহিয়াছে বলিয়া, সেই বর্ণসমূহকেই 'বেদরাশি' জানিতে হইবে।

যে হেতু বর্ণসমূহের সমষ্টিই বেদ, সেই হেতু সর্ব্ববেদ অধ্যয়নজনিত পুণ্যফলও কেবলমাত্র এই বর্ণের জ্ঞানেই হইয়া থাকে। আর উহার (বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির) মাতা পিতাও স্বর্গলোকে পূজিত হন ॥

শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলিবিরচিতব্যাকরণমহাভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের
প্রথম পাদের দ্বিতীয় আহ্নিক সম্পূর্ণ।

বৃদ্ধিরাদৈচ্ ॥ ১ ॥

বৃদ্ধিঃ। ১। আৎ। ১। ঐচ্। ১।

সূত্রানুবাদ।—আৎ অর্থাৎ আকার এবং ঐচ্ অর্থাৎ ঐকার, ঔকারের, বৃদ্ধি সংজ্ঞা হয় ॥ ১ ॥

ভাষ্যমূল।—কুত্বং কস্মান্ন ভবতি। চোঃ কুঃ পদস্যেতি। ভত্বাৎ। কথং ভসংজ্ঞা। অয়স্ময়াদীনি ছন্দসীতি। ছন্দসীত্যুচ্যতে। ন চেদং ছন্দঃ। ছন্দোবৎ সূত্রাণি ভবন্তি। যদি ভসংজ্ঞা বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণ ইতি জশ্‌ত্বমপি ন প্রাপ্নোতি। উভয়সংজ্ঞান্যপি ছন্দাংসি দৃশ্যন্তে। তদ্‌যথা। স সুষ্টুভা স ঋক্বতা গণেন। পদত্বাৎ কুত্বম্। ভত্বাৎ জশ্‌ত্বং ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' এই সূত্রের অন্তবর্ণ 'চ' কারের স্থানে, কুত্ব (কবর্গ) অর্থাৎ 'ক'কার কিংবা 'গ'কার কেন হয় না? চোঃ কুঃ। ৮। ২

৩০। (চবর্গস্থানে কবর্গ হয়, ঝল্ পরে থাকিলে কিংবা পদান্তে বর্ত্তমান থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, 'আদৈচ্' এর 'চ' কার ত পদের অন্তস্থিতই হইয়াছে ?

এই স্থলে, 'চ' কারের ভসংজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া, পদসংজ্ঞার অভাব প্রযুক্তই 'ক'বর্গ হইবেনা।

কি প্রকারে 'চ' কারের 'ভ' সংজ্ঞা হইল ? (১)

অয়স্ময়াদীনি ছন্দসি।১।৪।২০। (অয়স্ময়াদিগণপঠিত শব্দ, বেদে ভসংজ্ঞা হইয়া থাকে।) এই সূত্রানুসারে 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের 'চ'কারও 'ভ'-সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইয়াছে।

তাহা কিরূপে হইল ? কারণ, 'অয়স্ময়াদীনি' সূত্রে ত 'ছন্দসি' অর্থাৎ বেদে 'ভ' সংজ্ঞা হয়, এই কথা বলা হইয়াছে ; কিন্তু ইহা ত বেদ নহে ?

সূত্রসমূহও ছন্দ অর্থাৎ বেদের ন্যায় হইয়া থাকে। অর্থাৎ বেদে যে সমস্ত পদ প্রয়োগ হইয়া থাকে, সূত্রসমূহেও সেই সমস্ত পদ প্রাপ্ত হয়, এবং এইজন্যই 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, বেদের ন্যায়, 'ভ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল বলিয়া ক-বর্গ হইল না।

যদি 'ভ' সংজ্ঞাই হইল, তবে 'বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণঃ' এই দুই সূত্র, যেখানে একত্রীকৃত করিয়া পাঠ করা হইয়াছে, সেখানেও 'চ' কার স্থানে জকার হইবেনা (১), কারণ, ঝলের স্থানে জশ্ত্ত পদান্ত হইলেই হয়। যেহেতু 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের চকার পদান্ত হয় নাই, 'ভ' সংজ্ঞা হওয়াতে, সেই হেতুই জশ্ত্বও প্রাপ্তি হইবেনা ; সুতরাং 'চ' স্থানে 'জ'ও হইবে না।

কেন হইবেনা ? যেহেতু, ছন্দসমূহ উভয় (পদ ও ভ) সংজ্ঞাবিশিষ্টই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন, ছন্দে এতদ্রূপ প্রয়োগ দেখা যায় যে, "স সুষ্টুভা স ঋকতা গণেন" এই মন্ত্রে 'ঋচ্' শব্দের 'চ'কার, পদত্ব মানিয়া "চোঃ কুঃ" সূত্রানুসারে, 'ক'কার হইয়াছে ; কিন্তু সেই 'ক'কার, পুনঃ 'ভত্ব' মানিয়া 'জশ্ত্ব' (গকার) হয় নাই। সেইরূপ এই (বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণঃ) স্থানেও পদত্ব মানিয়া 'জশ্ত্ব' (ছকার স্থানে জকার) হইয়াছে ; কিন্তু 'ভত্ব' মানিয়া 'চ'বর্গ স্থলে 'ক'বর্গ (চ স্থানে ক) হইবে না।

(১) ঝলাং জশোঽন্তে।৮।২।৩৯। পদান্তে বর্ত্তমান যে 'ঝল্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, তাহার স্থানে 'জশ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ হয়। যেমন,—বাক্+ঈশঃ=বাগীশঃ, সেইরূপ, আদৈচ্+অদেঙ্=আদৈজদেঙ্।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—লিখিত।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, কালী,* শরৎ, রাখাল, ডাক্তার সরকার ইত্যাদির কথোপকথন।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরদিন আশ্বিনের কৃষ্ণাতৃতীয়া তিথি, সোমবার ,১১ই কার্ত্তিক, ইংরাজী ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় ঐ শ্যামপুকুরের বাটীতে চিকিৎসার্থ রহিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ আসেন, আর তাঁহার নিকট পীড়ার সংবাদ লইয়া লোক সর্ব্বদা যাতায়াত করে।

শরৎকাল। কয়েকদিন হইল, শারদীয়া দুর্গা-পূজা হইয়া গিয়াছে। এ মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলী হর্ষ-বিষাদে অতিবাহিত করিয়াছেন, কেননা, তিন মাস ধরিয়া গুরুদেবের কঠিন পীড়া,—কণ্ঠদেশে Cancer। সরকার ইত্যাদি ডাক্তার ইঙ্গিত করিয়াছেন, পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য। হতভাগ্য শিষ্যেরা এ কথা শুনিয়া একান্তে নীরবে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করেন। এক্ষণে এই শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। শিষ্যেরা প্রাণপণে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। নরেন্দ্রাদি কৌমার-বৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যগণ এই মহতী সেবা উপলক্ষে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ-পথ-প্রদর্শী সোপান আরোহণ করিতে সবে শিখিতেছেন।

এত পীড়া, কিন্তু দলে দলে লোক দর্শন করিতে আসিতেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিলেই শান্তি ও আনন্দ হয়। অহেতুককৃপাসিন্ধু! দয়ার ইয়ত্তা নাই—সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেছেন, কিসে তাহাদের মঙ্গল হয়। শেষে ডাক্তারেরা, বিশেষতঃ ডাক্তার সরকার কথা কহিতে একেবারে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার নিজে ৬ ঘণ্টা ৭ ঘণ্টা করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, 'আর কাহারো সহিত কথা কহা হবে না, কেবল আমার সঙ্গে কথা কহিবে।'

* কালী—এখন আমেরিকায় আছেন। আর একটী অন্তরঙ্গ —শরৎ। তিনিও আমেরিকায় গিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিয়া ডাক্তার একেবারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাই এতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকেন।

বেলা দশটার সময় ডাক্তারকে সংবাদ দিবার জন্য মাষ্টার যাইতেন, তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। অসুখটা খুব হাল্‌কা হ'য়েছে। খুব ভাল আছি। আচ্ছা, তবে ঔষধে কি এরূপ হ'য়েছে? তা'হলে ঐ ঔষধটা খাই না কেন?

মাষ্টার। আমি ডাক্তারের কাছে যা'চ্ছি, তাঁকে সব ব'ল্‌বো, তিনি যা ভাল হয়, তাই ব'ল্‌বেন্‌।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, পূর্ণ * দুই তিন দিন আসে নাই, বড় মন কেমন কচ্চে।

মাষ্টার (কালীর প্রতি)। কালী বাবু, তুমি যাও না পূর্ণকে ডাক্‌তে।

কালী। এই যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। ডাক্তারের ছেলেটী বেশ। একবার আস্‌তে বোলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাষ্টার ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ডাক্তার দু এক জন বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া আছেন।

ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি)। এই এক মিনিট হ'লো তোমার কথা কচ্ছিলাম, দশটায় আস্‌বে বল্লে, দেড়ঘণ্টা ব'সে। ভাব্‌লুম, কেমন আছেন, কি হ'লো!

ডাক্তার (বন্ধুর প্রতি)। ওহে, সেই গানটা গাওত।

বন্ধু গাইলেন,—

কর তাঁর নাম গান,
যত দিন রহে দেহে প্রাণ।

যাঁর মহিমা জলন্ত জ্যোতিঃ জগৎ করে হে আলো;

---

* শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র, বয়স ১৪।১৫ বৎসর, তখন স্কুলে পড়িতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বড় ভালবাসেন। ঠাকুরের আর একটী অন্তরঙ্গ!

স্রোত বহে প্রেমপীযূষবারি, সকল জীবসুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি;
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে, নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে, কি আকাশে;
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর,
এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে নাহি রহে দুঃখ লেশ হে।

ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি)। গানটী খুব ভাল নয়? ঐ খানটী কেমন? "অন্ত কোথা তাঁর অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে।"

মাষ্টার। হাঁ, ওখানটী বড় চমৎকার, খুব অনন্তের ভাব।

ডাক্তার। (সস্নেহে) অনেক বেলা হয়েছে, তুমি খেয়েছো ত? আমার দশটার মধ্যে খাওয়া হ'য়ে যায়, তার পর আমি ডাক্তারী করতে বেরুই। না খেয়ে বেরুলে অসুখ করে। ওহে, একদিন তোমাদের খাওয়াবো মনে ক'রেছি।

মাষ্টার। তা বেশ মহাশয়!

ডাক্তার। আচ্ছা, এখানে না সেখানে? তোমরা যা বল।

মাষ্টার। মহাশয়, এখানেই হ'ক, আর সেখানেই হ'ক, সকলে আহ্লাদ ক'রে খাবে।

মা কালীর কথা পড়িল।

ডাক্তার। কালী ত একজন সাঁওতালী মাগী। (মাষ্টারের উচ্চহাস্য)।

মাষ্টার। ও কথা কোথায় আছে?

ডাক্তার। শুনেছি এই রকম। (মাষ্টারের হাস্য)

পূর্ব্বদিন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ও অন্যান্য ভক্তের ভাবসমাধি হইয়াছিল। ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন। সেই কথা হইতে লাগিল।

ডাক্তার। ভাব ত দেখ্‌লুম। বেশী ভাব কি ভাল?

মাষ্টার। পরমহংসদেব বলেন যে, ঈশ্বরচিন্তা ক'রে যে ভাব হয়, তাহা বেশী হলেও কোন ক্ষতি হয় না। তিনি বলেন যে, মণির জ্যোতিতে আলো হয়, আর শরীর স্নিগ্ধ হয়, কিন্তু গা পুড়ে যায় না।

ডাক্তার। মণির জ্যোতিঃ! ও যে reflected light!

মাষ্টার। পরমহংসদেব আরও বলেন, অমৃতসরোবরে ডুব্‌লে মানুষ মরে যায় না। ঈশ্বর অমৃতের সরোবর। তাঁতে ডুব্‌লে মানুষের অনিষ্ট হয় না; বরং মানুষ অমর হয়। অবশ্য যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়।

ডাক্তার। হাঁ, তা বটে।

ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন, দুচারটী রোগী দেখিয়া পরমহংসদেবকে দেখিতে যাইবেন। পথে আবার মাষ্টারের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। ডাক্তার, চক্রবর্ত্তীর 'অহঙ্কার' এই কথা তুলিলেন।

মাষ্টার। পরমহংসদেবের কাছে তাঁর যাওয়া আসা আছে, অহঙ্কার কিছু দিনের মধ্যে আর থাক্‌বে না। তাঁর কাছে বস্‌লে জীবের অহঙ্কার পলায়ন করে, অহঙ্কার চূর্ণ হয়। ওখানে অহঙ্কার নাই কি না, তাই। নিরহঙ্কারের নিকট আস্‌লে অহঙ্কার পালিয়ে যায়। দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় অত বড় লোক, কত বিনয় আর নম্রতা দেখিয়েছেন। পরমহংসদেব তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন, বাদুড়বাগানের বাড়ীতে। যখন বিদায় লন, রাত তখন ৮।৯টা হবে। বিদ্যাসাগর library ঘর থেকে বরাবর সঙ্গে সঙ্গে নিজে এক একবার বাতি ধরে এসে গাড়ীতে তুলে দিলেন, আর বিদায়ের সময় হাত জোড় করে রহিলেন।

ডাক্তার। আচ্ছা, এঁর বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি রকম মত?

মাষ্টার। সে দিন খুব ভক্তি করেছিলেন। তবে কথা কয়ে দেখেছি, বৈষ্ণবেরা যাকে ভাবটাব বলে, সে সব বড় ভালবাসেন না। আপনার মতের মত।

ডাক্তার। হাত জোড় করা, পায়ে মাথা দেওয়া, আমি ও সব ভালবাসি না। মাথাও যা, পাও তা। তবে যার পা অন্য জ্ঞান আছে, সে করুক।

মাষ্টার। আপনি ভাব টাব ভালবাসেন না! পরমহংসদেব আপনাকে 'গম্ভীরাত্মা' মাঝে মাঝে বলেন, বোধ হয় মনে আছে। তিনি সেই সে দিন আপনাকে বল্‌ছিলেন যে, ডোবাতে হাতী নাম্‌লে জল তোলপাড়্ হয়, কিন্তু সায়রে দিঘী বড়, তাতে হাতী নাম্‌লে জল বেশী নড়েও না। গম্ভীরাত্মার ভিতর ভাবহস্তী নাম্‌লে তার কিছু কর্‌তে পারে না। তিনি বলেন, আপনি 'গম্ভীরাত্মা।'

ডাক্তার। I don't deserve the compliment. ভাব আর কি?

feelings—ভক্তি আরও অন্যান্য feelings. বেশী হলে কেউ চাপ্‌তে পারে, কেউ পারে না।

মাষ্টার। Explanation কেউ দিতে পারে এক রকম করে—কেউ পারে না, কিন্তু মহাশয়, ভাব ভক্তি জিনিসটা অপূর্ব্ব সামগ্রী। Stebbing on Darwinism আপনার libraryতে দেখ্‌লাম। Stebbing বলেন, human mind যার দ্বারাই হউক—evolution দ্বারাই হোক্ বা ঈশ্বর আলাহিদা বসে সৃষ্টিই করুন—equally wonderful. তিনি একটী বেশ উপমা দিয়েছেন—theory of light. "Whether you know the undulatory theory of light or not, light in either case is equally wonderful."

ডাক্তার। হুঁ; আর দেখেছো, Stebbing, Darwinism মানে, আবার Godও মানে!

আবার পরমহংসদেবের কথা পড়িল।

ডাক্তার। ইনি (পরমহংসদেব) দেখ্‌ছি কালীরই উপাসক।

মাষ্টার। তাঁর কালী মানে আলাদা। বেদে যাঁরে পরব্রহ্ম বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন। মুসলমান যাঁকে আল্লা বলে, খ্রীষ্টান যাঁকে God বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন। তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না, এক দেখেন। পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে গেছেন, যোগীরা যাঁকে আত্মা বলেন, ভক্তেরা যাঁকে ভগবান বলেন, পরমহংসদেব তাঁকেই কালী বলেন।

"তাঁর কাছে শুনেছি, একজনের একটী গামলা ছিল, তাতে রং ছিল। কারো কাপড় ছোপাবার দরকার হলে তার কাছে কাপড় ছোপাতে যেতো। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করতো, 'তুমি কি রঙ্গে ছোপাতে চাও?' লোকটী যদি বল্‌তো, সবুজ রং, তা হলে কাপড়খানি গামলার রঙ্গে ডুবিয়ে ফিরিয়ে দিত; ও বল্‌তো, 'এই নাও তোমার সবুজ রঙ্গে ছোপান কাপড়!' যদি কেহ বল্‌তো, লাল রং, তা হলে সেই এক গামলায় কাপড়খানি ছুবিয়ে বল্‌তো, 'এই নাও তোমার লালে ছোপান কাপড়।' সেই এক গামলার রঙে সবুজ, লাল, নীল, হলদে সব রঙের কাপড় ছোপান হোতো। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে একজন লোক বল্লে, বাবু, আমি কি রং চাই বলবো? তুমি নিজে যে রঙে ছুপেছ, আমায় সেই রং দাও। (সকলের হাস্য) সেইরূপ পরম-

হংসদেবের ভিতর সব ভাব আছে, সব ধর্ম্মের সব সম্প্রদায়ের লোক তাঁর কাছে শান্তি পায় ও আনন্দ পায়। তাঁর যে কি ভাব, কি গভীর অবস্থা, তা কে বুঝ্‌বে?

ডাক্তার। All things to all men! তাও ভাল নয়, although St. Paul says it.

মাষ্টার। পরমহংসদেবের অবস্থা কে বুঝ্‌বে? তাঁর মুখে শুনেছি, সূতার ব্যবসা না কর্‌লে ৪০ নং সূতা আর ৪১ নং সূতার প্রভেদ বোঝা যায় না। Painter না হলে painter এর art বুঝা যায় না। মহাপুরুষের গভীর ভাব। Christ এর ন্যায় না হলে Christ এর সব ভাব বুঝা যায় না। পরমহংসদেবের এই গভীর ভাব হয়তো Christ যা বলেছিলেন তাই, 'Be perfect as your Father in heaven is perfect'.

* * * * * *

ডাক্তার। আচ্ছা, তাঁর অসুখের তাদারক তোমরা কিরূপ কর?

মাষ্টার। প্রত্যহ এক একজন superintend করেন, যাঁদের বয়স বেশী। কোন দিন গিরীশবাবু, কোন দিন রামবাবু, কোন দিন বলরাম, কোন দিন সুরেশ বাবু, কোন দিন নবগোপাল, কোন দিন কালীবাবু, এই রকম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সকল কথা হইতে হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেব শ্যামপুকুরে যে বাড়ীতে চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বাড়ীর সম্মুখে ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া লাগিল। তখন বেলা ১টা হইয়াছে। দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। অনেকগুলি ভক্ত সম্মুখে উপবিষ্ট, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, শরৎ ইত্যাদি। সকলের দৃষ্টি সেই মহাযোগী সদানন্দ মহাপুরুষের দিকে। সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় রোজার সম্মুখে বসিয়া আছেন। অথবা বরকে লইয়া বরযাত্রীরা যেন আনন্দ করিতেছে। ডাক্তার ও মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তারকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'আজ বেশ ভাল আছি।'

ক্রমে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

(পণ্ডিত ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু পণ্ডিত কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে! ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করলে আমার একটা অবস্থা হয়। তখন পরণের কাপড় পড়ে যায়, শিড়্ শিড়্ করে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কি একটা উঠে। তখন সকলকে তৃণজ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যদি দেখি, বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, তা হলে তাকে খড় কুটো মনে হয়।

"রামনারাণ ডাক্তার আমার সঙ্গে তর্ক করছিল, হঠাৎ সেই অবস্থাটা হলো। তার পর তাকে বল্লুম, 'তুমি কি বলছো, তাঁকে তর্ক করে কি বুঝবে, তাঁর সৃষ্টিই বা কি বুঝবে! তোমার তো শাঁর তেঁতে বুদ্ধি!' আমার অবস্থা দেখে সে কাঁদতে লাগলো, আর আমার পা টিপতে লাগলো।

ডাক্তার। রামনারাণ ডাক্তার হিন্দু কি না। আবার ফুল চন্দন লয়। সত্য হিন্দু কি না।

মাষ্টার। (স্বগতঃ) ডাক্তার কিন্তু 'শাঁক ঘণ্টায় নাই'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। বঙ্কিম তোমাদের একজন পণ্ডিত। বঙ্কিমের * সঙ্গে দেখা হয়েছিল—আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কর্ত্তব্য কি? তা বলে, 'আহার, নিদ্রা আর মৈথুন'! এই সকল কথাবার্ত্তা শুনে আমার ঘৃণা হলো। বল্লুম যে, 'তোমার এ কি রকম কথা! তুমিতো বড় ছ্যাচড়া। যা সব রাত্ত দিন চিন্তা ক'রছো আর কাযে করছো, তাই তোমার মুখ দিয়ে বেরুচ্চে। মূলো খেলেই মূলোর ঢেঁকুর উঠে।' তার পর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হলো, ঘরে সঙ্কীর্ত্তন হলো। আমি আবার নাচলুম। তখন বলে, মহাশয়! আমাদের ওখানে একবার যাবেন! আমি বল্লুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তখন বলে, আমাদের সেখানেও ভক্ত আছে, দেখবেন। আমি হাসতে হাসতে বল্লুম, কি রকম ভক্ত আছে গো? 'গোপাল, গোপাল', যা বলেছিল, সেই রকম ভক্ত নাকি?

ডাক্তার। 'গোপাল', 'গোপাল' সে ব্যাপারটা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) একটী স্যাকরার দোকান ছিল। বড় ভক্ত। পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, কপালে তিলক, হাতে হরিনামের মালা। সকলে

* শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চাটুর্য্যের সহিত বেনেটোলায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পরম ভক্ত ৺অধরলাল সেনের বাটীতে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের দেখা হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে এই একবার দর্শন করিয়াছিলেন।

বিশ্বাস কোরে ঐ দোকানেই আসে, ভাবে পরম ভক্ত, এরা কখনও ঠকাতে যাবে না। একদল খদ্দের এলে দেখ্ ত, কোন কারিগর বল্ ছে, 'কেশব', 'কেশব'! আর একজন কারিগর খানিক পরে নাম কর্ ছে, 'গোপাল', 'গোপাল!' আবার খানিকক্ষণ পরে একজন কারিগর বল্ ছে, 'হরি', 'হরি', 'হরি,' তার পর কেউ বল্ ছে, 'হর', 'হর!' কাযে কাযেই এত ভগবানের নাম দেখে খরিদ্দাররা সহজেই মনে কর্ তো, এ স্যাকরা অতি উত্তম লোক। কিন্তু ব্যাপারটা কি জান? যে বল্লে, 'কেশব! কেশব,' তার মনের ভাব 'এ সব (খদ্দের) কে?' যে বল্লে, 'গোপাল' 'গোপাল', তার অর্থ এই যে, আমি এদের চেয়ে চেয়ে দেখ্ লুম, এরা গরুর পাল, গরুর পাল (সকলের হাস্য)। যে বল্লে, 'হরি' 'হরি'—তার অর্থ এই যে, 'যদি গরুর পাল হয়, তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি' (সকলের হাস্য)। যে বল্লে, হর', 'হর'—তার মানে এই যে, তবে হরণ কর, হরণ কর, এরা তো গরুর পাল। (সকলের হাস্য)।

"সেজো বাবুর সঙ্গে আর এক জায়গায় গিয়েছিলুম, অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি তো মুখ্যু (সকলের হাস্য।) তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হলে বল্লে, 'মহাশয়! আগে যা পড়েছি, সে সব পড়া বিদ্যা, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে, সব থু হয়ে গেল! এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান্ হয়, বোবার কথা ফুটে!' তাই বল্ ছি, বই পড় লে পণ্ডিত হয় না।

[ঈশ্বরের আবির্ভাব ও মূর্খের কণ্ঠে সরস্বতী]

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের কি আর অভাব থাকে? দেখনা, আমি তো মুখ্যু, আমি তো কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? আর জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয়। ও দেশে ধান মাপে, 'রামে রাম,' 'রামে রাম' এই সব বল্ তে বল্ তে। একজন মাপে, আর যাই ফুরিয়ে আসে আসে, এমন সময়ে আর একজন রাশ ঠেলে দেয়। তার কর্ম্মই ঐ, ফুরালেই রাশ ঠেলে। আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন।

"ছেলে বেলাই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। ১১ বছরের সময় মাঠের উপর কি দেখ্ লুম। সব্বাই বলে, বেহুঁস হয়ে গিছ্ লুম, কোন সাড় ছিল না। সেই দিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখ্ তে লাগ্ লুম। যখন ঠাকুর পূজা করতে যেতুম, হাতটা

অনেক সময়ে ঠাকুরের দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আস্‌তো, আর ফুল মাথায় দিতুম। যে ছোকরা থাক্‌তো, সে আমার কাছে আসতো না, বল্‌তো, তোমার মুখে কি এক জ্যোতিঃ দেখ্‌ছি, তোমার বেশী কাছে যেতে ভয় হয়।...

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[Free will or God's will ?]

('যন্ত্রারূঢ়')

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তো মুখ্যু, আমি কিছু জানি না, তবে এ সব বলে কে? আমি বলি, মা আমি যন্ত্র- তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর—তুমি ঘরণী, আমি রথ—তুমি রথী, যেমন করাও—তেমনি করি, যেমন বলাও—তেমনি বলি, যেমন চালাও—তেমনি চলি, নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ। তাঁরই জয়, আমি তো কেবল যন্ত্র মাত্র! শ্রীমতী (রাধা) যখন সহস্রধার কলসী নিয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুও পড়ে নাই, সকলে তাঁর প্রশংসা করতে লাগ্‌ল, বলে, এমন সতী হবে না। তখন শ্রীমতী বল্লেন, তোমরা আমার জয় কেন দাও, বল, কৃষ্ণের জয়, কৃষ্ণের জয়। আমি তাঁর দাসীমাত্র। আমি ঐ অবস্থায় ভাবে বিজয়ের বুকে পা দিলুম. কিন্তু এদিকে তো এত বিজয়কে ভক্তি করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি।

ডাক্তার। তার পর সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাত জোড় করে)। আমি কি করবো? সেই অবস্থাটা এলে আমি বেহুঁস হয়ে যাই। নিজে কি করি, কিছুই জান্‌তে পারি না।

ডাক্তার। সাবধান হওয়া উচিত, হাত জোড় করলে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন কি আমি কিছু কর্‌তে পারি? তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর? যদি ঢং মনে কর, তা হলে তোমার Science সায়েন্‌স সব ছাই পড়েছ।

ডাক্তার। মহাশয়! যদি ঢং মনে করি, তা হলে কি এত আসি? এই দেখ, সব কায ফেলে এখানে আসি, কত রোগীর বাড়ী যেতে পারি না, আর এখানে এসে ছয়ঘণ্টা সাতঘণ্টা ধরে থাকি।

['ন যোৎস্যে'—ভগবদ্গীতা]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেজো বাবুকে বলেছিলাম, তুমি মনে কোরো না, তুমি

একটা বড় মানুষ, আমায় মান্‌ছো বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলুম। তা তুমি মানো আর নাই মানো। তবে একটী কথা আছে,—মানুষ কি ক'র্‌বে, তিনিই মানাবেন! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড়কুটো!

ডাক্তার (excited)। তুমি কি মনে কর্‌ছো, অমুক মাড় তোমায় মেনেছে বলে আমি তোমায় মান্‌বো? অমুক মাড়কে আমি কি মানি? একজন ক্যাওট্ মেনেছে বলে আমিও পায়ে পড়্‌বো? তবে তোমায় সম্মান করি বটে, তোমায় regard করি, মানুষকে যেমন regard করে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি মান্‌তে বলেছি গা?

গিরীশ ঘোষ। উনি কি আপনাকে মান্‌তে বলেছেন?

ডাক্তার। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) তুমি কি বল্‌ছো, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে আর কি বল্‌ছি! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ কি কর্‌বে? অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বল্লেন, আমি যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌বো না, জ্ঞাতিবধ করা আমার কর্ম্ম নয়। কৃষ্ণ বল্লেন, অর্জ্জুন! তোমায় যুদ্ধ কর্‌তেই হইবে। কৃষ্ণ সব দেখিয়ে দিলেন, এই এই সব লোক মরে রয়েছে!*

*শিখরা ঠাকুর বাড়ীতে এসেছিল—তাদের মতে অশ্বত্থগাছে যে পাতা নড়্‌ছে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়—তাঁর ইচ্ছা বই একটী পাতাও নড়্‌বার যো নাই।

[LIBERTY OR NECESSITY ; FREE WILL OR GOD'S WILL ?]

ডাক্তার। যদি সব ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে তুমি বকো কেন? লোকদের জ্ঞান দেবার জন্য অত কথা কও কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলাচ্ছেন, তাই বলি। আমি যন্ত্র—তিনি যন্ত্রী।

ডাক্তার। যন্ত্র তো বল্‌ছো; হয় তাই বল, নয় চুপ করে থাকো, সবই ঈশ্বর।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মশাই যা মনে করেন, করুন। কিন্তু তিনি করান্ তাই করি—a single step against the Almighty will (তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে এক পা) কেউ যেতে পারে?

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব—নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচিন

(INFLUENCE OF MOTIVES)

ডাক্তার। Free Will তিনিই দিয়েছেন ত। আমি মনে কর্‌লে ঈশ্বর চিন্তা কর্‌তে পারি, আবার না কর্‌লে না কর্‌তে পারি।

গিরীশ। আপনার ঈশ্বর চিন্তা বা অন্ত কোন সৎকাষ ভাল লাগে ব'লে করেন। আপনি করেন না, সেই ভাল লাগাটা করায়।

ডাক্তার। কেন; আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলে করি—

গিরীশ। সেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্‌তে ভাল লাগে বলে।

ডাক্তার। (গিরীশের প্রতি) মনে কর, একটী ছেলে পুড়ে যাচ্চে; তাকে বাঁচাতে যাওয়া কর্ত্তব্যবোধে—

গিরীশ। ছেলেটীকে বাঁচাতে আপনার আনন্দ হয়, তাই আগুনের ভিতর যান, আনন্দ আপনাকে নিয়ে যায়। চাটের লোভে গুলি খাওয়া। (সকলের হাস্য)।

('জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা')

শ্রীরামকৃষ্ণ। কর্ম্ম কর্‌তে গেলে আগে একটী বিশ্বাস চাই,—সেই সঙ্গে জিনিসটী মনে করে আনন্দ হয়, তবে সেই ব্যক্তি কাযে প্রবৃত্ত হয়। মাটীর নীচে এক ঘড়া মোহর আছে—এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস প্রথমে চাই, ঘড়া মনে করে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়—তার পর খুঁড়ে। খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে ঠং শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তার পর ঘড়ার কাণা দেখা যায়, তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এই রকমে ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়্‌তে থাকে। আমি নিজে ঠাকুরবাড়ীর বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখেছি—সাধু গাঁজা তয়ের করছে, আর সাজ্‌তে সাজ্‌তে আনন্দ।

ডাক্তার। কিন্তু আগুন heatও (উত্তাপও) দেয়, আর lightও (আলোও) দেয়। আলোতে দেখা যায় বটে, কিন্তু উত্তাপে গা পুড়ে যায়। Duty (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) করতে গেলে কেবল যে আনন্দ হয় তা নয়; কষ্টও আছে।

মাষ্টার। (গিরীশের প্রতি) পেটে খেলে পিঠে সয়। কষ্টতেও আনন্দ।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি) মহাশয়! Duty (কর্ত্তব্যকর্ম্ম) শুষ্ক।

ডাক্তার। কেন?

গিরীশ। তবে সরস (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার। বেশ dilemma, এইবার লোভে গুলি খাওয়া এসে পড়্‌লো।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) সরস—নচেৎ duty কেন করেন?

ডাক্তার। এইরূপ মনের inclination (মনের ঐ দিকে গতি)।

মাষ্টার। (গিরীশের প্রতি) পোড়া স্বভাবে টানে। (হাস্য)। যদি inclinationই হলো, তবে free will কোথায়?

ডাক্তার। আমি free (স্বাধীন) একবারে বল্‌ছি না। গরু খুঁটিতে বাঁধা আছে, দড়ি যতদূর যায়, তার ভিতর free। দড়ি টান্ পড়্‌লে আবার—

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও Free Will.)

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই উপমা যদু মল্লিকও বলেছিল। (ছোট নরেনের প্রতি) একি ইংরাজীতে আছে?

(ডাক্তারের প্রতি) "দেখ, ঈশ্বর সব করছেন, তিনি যন্ত্রী—আমি যন্ত্র। এ বিশ্বাস যদি কারো হয়, সেতো জীবন্মুক্ত—'তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।' কি রকম জানো? বেদান্তের একটা উপমা আছে—একটা হাঁড়ীতে ভাত চড়িয়েছো; আলু, বেগুন সব ভাতে দিয়েছ; খানিক পরে আলু, বেগুন, চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান ক'রছে, আমি নড়্‌ছি, আমি লাফাচ্চি। ছোট ছেলেরা দেখ্‌লে ভাবে, আলু, পটল, বেগুন ওরা বুঝি জীয়ন্ত, তাই লাফাচ্চে। যাদের জ্ঞান হয়েছে, তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুন, পটোল এরা জীয়ন্ত নয়, নিজে নিজে লাফাচ্চে না; হাঁড়ীর নীচে আগুন জ্বল্‌ছে, তাই ওরা লাফাচ্চে। যদি কাট টেনে লওয়া যায়, তা হলে আর নড়ে না। জীবের আমি কর্ত্তা, এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান; জ্বলন্ত কাট টেনে নিলে সব চুপ। পুতুল নাচের পুতুল বাজীকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে পড়ে গেলে আর নড়েনা চড়েনা।

"যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, যতক্ষণ সেই পরশমণি ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ আমি কর্ত্তা এই ভুল থাক্‌বে; ততক্ষণ আমি সৎ কায করেছি, আমি অসৎ কায করেছি, এই সব ভেদ বোধ থাক্‌বেই থাক্‌বে। এ ভেদ বোধ তাঁরই মায়া—তাঁর মায়ার সংসার চালাবার জন্য বন্দোবস্ত। বিদ্যা মায়া আশ্রয় কর্‌লে, সৎপথ ধর্‌লে, তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁকে যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই এই মায়া পার হয়ে যেতে পারে। 'তিনি একমাত্র

কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা,' এ বিশ্বাস যার, সেই জীবন্মুক্ত। একথা আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) Free Will কেমন করে আপনি জান্‌লেন?

ডাক্তার। Reason (বিচার) এর দ্বারা নয়—I feel it!

গিরীশ। Then I and others feel it to be the reverse (আমরা সকলে ঠিক উল্টো বোধ করি, আমরা বোধ করি যে, আমরা পরতন্ত্র) (সকলের হাস্য)।

* * * * *

ডাক্তার। Dutyর ভিতর দুটো element আছে,—(১) Duty বোলে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্‌তে যাই, (২) পরে আহ্লাদ হয়। কিন্তু initial stageএ (গোড়া ত) আনন্দ হবে বলে, যাই না। ছেলেবেলায় দেখ্‌তুম, পুরুত সন্দেশে পিঁপড়ে হলে বড় ভাবিত হতো। পুরুতের প্রথমেই সন্দেশ চিন্তা করে আনন্দ হয় না—(হাস্য) প্রথমে বড় ভাবনা।

মাষ্টার। (স্বগতঃ) পরে আনন্দ হয়, কি সঙ্গে সঙ্গে মনে করে আনন্দ হয়, বলা বড় কঠিন। আনন্দের জোরে কার্য্য হলে free will কোথায় থাকে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[অহৈতুকী ভক্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ইনি (ডাক্তার) যা বল্‌ছেন, তার নাম অহৈতুকী ভক্তি। 'মহেন্দ্র সরকারের কাছে আমি কিছু চাই না—কোন প্রয়োজন নাই, তবু মহেন্দ্র সরকারকে দেখ্‌তে ভাল লাগে'—এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি। একটু আনন্দ হয়, তা কি কর্‌বো?

"অহল্যা বলেছিলেন, হে রাম! যদি শূকরযোনিতে জন্ম হয়, তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি থাকে—আমি আর কিছু চাই না।

"নারদ রাবণ বধের কথা স্মরণ করাবার জন্য অযোধ্যায় গিয়ে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলেন। তিনি সীতারাম দর্শন করে স্তব কর্‌তে

লাগ্‌লেন। রামচন্দ্র স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন, নারদ! 'আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি কিছু বর লও।' নারদ বল্লেন, 'রাম! যদি একান্ত আমায় বর দেবে, তো এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি থাকে, আর এই কোরো, যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।' রাম বল্লেন, 'আর কিছু বর লও।' নারদ বল্লেন, আর কিছুই আমি চাই না, কেবল চাই তোমার পাদপদ্মে 'শুদ্ধাভক্তি।'

"এঁর তাই। যেমন ঈশ্বরকে শুধু দেখ্‌তে চায়, আর কিছু—ধন, মান, দেহসুখ—চায় না। এর নাম শুদ্ধাভক্তি।

"আনন্দ একটু হয় বটে কিন্তু বিষয়ের আনন্দ নয়। ভক্তির, প্রেমের আনন্দ। শম্ভু (মল্লিক) বলেছিল—যখন আমি তার বাড়ীতে প্রায় যেতুম—তুমি এখানে এস; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাও, তাই আস;—ঐটুকু আনন্দ আছে।

"তবে ওর উপর আর একটা অবস্থা আছে। বালকের মত যাচ্চে, কোন ঠিক নাই, হয় তো একটা ফড়িঙ ধর্‌ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) এঁর (ডাক্তারের) মনের ভাব কি বুঝেছো? ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা হয়, হে ঈশ্বর, আমায় সৎ ইচ্ছা দাও, যেন অসৎ কাযে মতি না হয়!

"আমারও ঐ অবস্থা ছিল। একে দাস্য বলে। আমি মা মা বলে এমন কাঁদ্‌তুম যে, লোক দাঁড়িয়ে যেতো। আমার এই অবস্থার পর আমাকে বাড়বার* জন্য আর আমার 'পাগলামি' সারাবার জন্য তারা একজন রাঁড় এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল,—সুন্দর; চোক ভাল। আমি মা মা বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, আর হলধারীকে ডেকে দিয়ে বল্লুম, 'দাদা, দেখ্‌বে এসো, ঘরে কে এসেছে।' হলধারীকে আর সব লোককে বলে দিলুম। এই অবস্থায় মা মা বলে কাঁদ্‌তুম, কেঁদে কেঁদে বল্‌তুম, মা! রক্ষা কর, মা! আমায় নিখাদ কর, মা, যেন সৎ থেকে অসতে মন না যায়।

(ডাক্তারের প্রতি)। তোমার এ ভাব তো বেশ—ঠিক ভক্তিভাব, দাসভাব।

[জগতের উপকার ও সামান্য জীব। নিষ্কামকর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি কারো শুদ্ধসত্ত্ব (গুণ) আসে, সে কেবল ঈশ্বর চি

* বাড়বার—অর্থাৎ পরীক্ষা করবার।

করে, তার, আর কিছু ভাল লাগে না। কেউ কেউ প্রারব্ধের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ পায়। কামনাশূন্য হয়ে কর্ম্ম কর্‌তে চেষ্টা করলে শেষে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। রজোমিশ্রিত সত্ত্ব গুণ থাক্‌লে ক্রমে নানা দিকে মন হয়, তখন জগতের উপকার কর্‌বো, এই অভিমান এসে জোটে। জগতের উপকার এই সামান্য জীবের পক্ষে কর্‌তে যাওয়া বড় কঠিন। তবে যদি কেউ পরোপকারের জন্য কামনাশূন্য হয়ে কর্ম্ম করে, তাতে দোষ নাই—একে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। এরূপ কর্ম্ম কর্‌তে চেষ্টা করা খুব ভাল। কিন্তু সকলে পারে না! বড় কঠিন।

সকলেরই কর্ম্ম কর্‌তে হবে; দু একটা লোক কর্ম্ম ত্যাগ কর্‌তে পারে। দু একজন লোকের শুদ্ধসত্ত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে রজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ ক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে দাঁড়ায়। শুদ্ধসত্ত্ব হলেই ঈশ্বর লাভ হয়।

সাধারণ লোকে এই শুদ্ধ সত্ত্বের অবস্থা বুঝ্‌তে পারে না; হেম আমায় বলেছিল, 'কেমন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, জগতে মান লাভ করা মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য। কেমন?'

কামিনীকাঞ্চন ও ভক্তিবিশ্বাস।

(স্বামী ত্রিগুণাতীত।)

সাংসারিক পরিচয়ে কামিনীকাঞ্চনের প্রাধান্য; পারমার্থিকে,* ভক্তি-বিশ্বাসের বিশেষ প্রাধান্য। পারমার্থিক পরিচয়ে কামিনীকাঞ্চন কোনও মতেই উল্লেখযোগ্য হইতে পারে না; সাংসারিক পরিচয়ে ভক্তিবিশ্বাসের উল্লেখ কিছু যে নিন্দনীয় তাহা নহে। ইহার পরিচয় দুই দিনের জন্য এবং দু-দশ জনের নিকট; কিন্তু উহার পরিচয় অনন্তকালের জন্য এবং সর্ব্বত্র। কামিনীকাঞ্চনের সামর্থ্য অতি সামান্য; ভক্তিবিশ্বাসের বল অসীম। কামিনী-কাঞ্চনের ধর্ম্ম চঞ্চল; ভক্তিবিশ্বাসের ধর্ম্ম স্থির। কামিনীকাঞ্চনের অসদ্ব্যবহারই প্রায় সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্য, সদ্ব্যবহার খুবই কম; ভক্তি-বিশ্বাসে অসদ্ব্যবহারের সম্ভাবনা কুত্রাপি কিছুই নাই, সদ্ব্যবহারই সমস্ত। একে, প্রায়ই নরকগামী করায়; অপরে নিশ্চয়ই মোক্ষধামে লইয়া যায়। একটা যেন দানবের সৃষ্ট, অপরটা ("যেন" নয়,) সত্যই ঈশ্বরের প্রদত্ত। একটা, সম্রাটকেও পথের ভিখারী করিতে পারে; এমন কি, সমগ্র পৃথিবীকেও রসাতলে প্রেরণ করিতে

পারে। অপরটী, অতি ক্ষুদ্র ভৃত্যকেও সেই জগদীশ্বরের সিংহাসনে অধিরূঢ় করাইতে পারে ; এবং চাই কি, এই মর্ত্ত্যেই স্বর্গধাম আনয়ন করিতে পারে। এখন, আপনার চাই কি ? কি চাই, বলুন। উইয়ের ঢিবির ন্যায় যদি মাটিতে মাটি মিশাইয়া দিতে চান, অগ্রেরটীকে গ্রহণ করুন। আর যদি ঐ অনন্ত আকাশের ন্যায় নিত্যে নিত্য স্থাপন দেখিতে চাহেন, পরবর্ত্তীটীর উপাসনা করুন। যদি বারুদের ঘরে প্রবেশ করিতে চান, যান- ঐ নরকের দ্বারস্বরূপ কামিনীকাঞ্চনের উপাসনা করুন ; আর যদি মণিকোটায় বাস করিতে চান, আসুন—এই কল্পবৃক্ষ স্বরূপ ভক্তি-বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করুন। যদি পুঁটী মাছের ন্যায় অল্পজলে ফর্-ফর্ করেন, যদি জোনাকের ন্যায় অতি ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র আলোক ভাল বাসেন, তাহা হইলে আপনার গাত্রের চর্ম্মজালকে অতি সুখপ্রিয় করুন, এই বাহ্যিক নেত্রদ্বয়কে বিস্ফারণ করুন, মানব-মস্তিষ্ককে আধুনিক ও পার্থিব জ্ঞানে পূর্ণ করুন, ক্ষিপ্ত মনকে অভিমানাদির দ্বারা আরও সিক্ত করুন, করিয়া সকল সত্যের উপর যে আধ্যাত্মিক সত্য, সে সত্য জানিবার পথে কণ্টক দিয়া, সকল জ্ঞানের উপর যে আত্মজ্ঞান সে জ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া, কামিনীকাঞ্চনের আভায় মুগ্ধ হউন। আর যদি বৃহৎ মৎস্যের ন্যায় অগাধ জলে গম্ভীরভাবে বিচরণ করা আপনার স্বভাব হয়, যদি আপনি কৌস্তুভমণির ন্যায় নিত্য ও স্থির আলোকপ্রিয় হন, তাহা হইলে পার্থিব ও চঞ্চল চর্ম্মসুখকে বিসর্জ্জন দিন, বহির্দৃষ্টির রোধ দ্বারা জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করুন, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ককে আধ্যাত্মিক আলোচনা দ্বারা বর্দ্ধিত করুন, মলিন মনকে সদসৎ বিচারাদির দ্বারা মার্জ্জিত করুন, করিয়া একমাত্র পরম সত্-বস্তুর প্রয়াসী হইয়া ভক্তি-বিশ্বাসের মাহাত্ম্য আস্বাদন করুন। দেখুন, কামিনীকাঞ্চনরূপ মায়া ও মোহমদিরায় উন্মত্ত হইবেন ? না—ভক্তিবিশ্বাসরূপ আনন্দ ও অমৃতরসে বিহ্বল হইবেন ? যদি প্রথমটীর নিকটে যান, থাকুন এখানে ; শোকে, তাপে, দুঃখে, পীড়ায়, চিন্তায়, নিরাশায় খাক হইয়া যাইতে থাকুন ; অবশেষে জীবদ্দশায়ও, আপনার ভিতর আর কিছুই পদার্থ থাকিবে না ; সকলে তখন সাংঘাতিক ব্যারামগ্রস্ত ঘোটকের ন্যায় আপনাকে অতি অপদার্থ, নিষ্প্রয়োজনীয় এবং ত্যজ্য বলিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। আর যদি দ্বিতীয়টীকে গ্রহণ করেন, আসুন—শম দমাদি ষট্ সম্পত্তিসম্পন্ন হইয়া বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান প্রভৃতিতে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া, উত্তরোত্তর পরমসুখী হউন; জীবদ্দশায় ত এইরূপ হইবেনই ; অবশেষে মরিয়া যাইলেও, কত লোকে এখানে (স্বর্গের কথা ত ছাড়িয়াই দিন) পুষ্পচন্দন লইয়া আপনার চিত্র পূজা করিবেন, এবং আপনাকে কেবলমাত্র স্মরণ করিয়াই জীবনে কত শান্তি লাভ করিবেন।

ঈশ্বরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রমাণ? এস, উভয়ে যুদ্ধ করি—ইহাই প্রমাণ। দ্বৈতবাদ হইতে সমুদয় জগতে এই গোল আসিয়াছে। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পথ সকলে না গিয়া প্রশান্ত উজ্জ্বল দিবালোকে আইস। মহৎ অনন্ত আত্মা কি করিয়া সঙ্কীর্ণ ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে? এই আলোকময় ব্রহ্মাণ্ড সম্মুখে, ইহার প্রত্যেক বস্তু আমাদের। আপন বাহু প্রসারিত করিয়া—সমুদয় জগৎকে প্রেমালিঙ্গন করিতে চেষ্টা কর। যদি কখন এরূপ করিবার ইচ্ছা অনুভব করিয়া থাক, তবে তুমি ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছ।

বুদ্ধদেবের উপদেশাবলির মধ্যে তোমাদের সেই অংশটী অবশ্যই মনে আছে, তিনি কিরূপে উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে, উপরে নিম্নে প্রেমচিন্তাপ্রবাহ প্রেরণ করিলেন, যতক্ষণ না সমুদয় জগৎ সেই মহান অনন্ত প্রেমে পূর্ণ হইয়া গেল। যখন সেই ভাব তোমাদের আসিবে, তখনই তোমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব আসিবে। সমুদয় জগৎ এক ব্যক্তি হইয়া গেল—তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের দিকে আর মন থাকে না। এই অনন্ত সুখের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ পরিত্যাগ কর। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ লইয়া তোমার লাভ কি? বাস্তবিক কিন্তু ঐগুলিও তোমার, কারণ, তোমাদের মনে থাকিতে পারে যে, সগুণ নির্গুণের অন্তর্গত। অতএব ঈশ্বর সগুণ নির্গুণ উভয়ই। মানুষ—অনন্তস্বরূপ নির্গুণ মানুষও—আপনাকে সগুণরূপে, ব্যক্তিরূপে দেখিতেছেন। অনন্তস্বরূপ আমরা যেন আপনাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। বেদান্ত বলেন, এই ব্যাপার। আমরা আমাদের কর্ম্মদ্বারা আপনাদিগকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছি এবং তাহাই যেন আমাদের গলায় শিকল দিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেল ও মুক্ত হও। নিয়মকে পদদলিত কর। মনুষ্যের প্রকৃত স্বরূপে কোন বিধি নাই, কোন দৈব নাই, কোন অদৃষ্ট নাই। অনন্তে বিধান বা নিয়ম থাকিবে কিরূপে? স্বাধীনতাই ইহার মূলমন্ত্র, স্বাধীনতাই ইহার স্বরূপ—ইহার জন্মগত স্বত্ব। প্রথমে মুক্ত হও, তারপর যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব রাখিতে হয়, রাখিও। তখন আমরা রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃগণের ন্যায় অভিনয় করিব। যেমন একজন যথার্থ রাজা ভিখারীর বেশে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু এদিকে বাস্তবিক ভিক্ষুক যে, সে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছে। উভয়ে কত প্রভেদ দেখ! দৃশ্য উভয় স্থলেই সমান, বাক্যও হয়ত সমান, কিন্তু কি পার্থক্য! একজন ভিক্ষুকের অভিনয় করিয়া—আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, অপরে যথার্থ দারিদ্র্যকষ্টে প্রপীড়িত। কেন এই

পার্থক্য হয়? কারণ, একজন মুক্ত, অপরে বদ্ধ। রাজা জানেন, তাঁহার এই দরিদ্রতা সত্য নহে, ইহা কেবল তিনি ক্রীড়ার জন্য অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু যথার্থ ভিক্ষুক ব্যক্তি জানে, ইহা তাহার চিরপরিচিত অবস্থা,—তাহার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাহাকে এই দারিদ্র্য সহ্য করিতেই হইবে। তাহার পক্ষে ইহা অভেদ্য নিয়মস্বরূপ, সুতরাং সে কষ্ট পায়। তুমি আমি যতক্ষণ না আমাদের স্বরূপ জ্ঞাত হইতেছি, ততক্ষণ ভিক্ষুকমাত্র, প্রকৃতির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুই আমাদিগকে দাস করিয়া রাখিয়াছে। সমুদয় জগৎ সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি—শেষে কাল্পনিক জীবগণের নিকট পর্য্যন্ত সাহায্য চাহিতেছি, কিন্তু কোন কালে এই সাহায্য আসিল না। তথাপি ভাবিতেছি এই বারে সাহায্য পাইব—ভাবিয়া কাঁদিতেছি, চীৎকার করিতেছি, আশা করিয়া বসিয়া আছি, ইতিমধ্যে একটা জীবন কাটিল, আবার সেই খেলা চলিতে লাগিল।

মুক্ত হও; অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, তোমরা যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা স্মরণ কর, তবে দেখিবে, তোমরা সর্ব্বদাই বৃথা অপরের নিকট সাহায্য পাইবার চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু কখন পাও নাই; যাহা কিছু সাহায্য পাইয়াছ, সবই আপনার ভিতর হইতে। তুমি যাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছ, তাহারই ফল পাইয়াছ, তথাপি কি আশ্চর্য্য, তুমি সর্ব্বদাই সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ। ধনীদিগের বৈঠকখানায় খানিকক্ষণ বসিয়া যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে বেশ তামাসা দেখিতে পাইবে। দেখিবে, উহা সর্ব্বদাই পূর্ণ, কিন্তু এখন উহাতে যে দল রহিয়াছে, খানিক পরে আর সে দল নাই। সর্ব্বদাই তাহারা আশা করিতেছে, ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু আদায় করিবে, কিন্তু কখনই তাহা করিতে পারে না। আমাদের জীবনও তদ্রূপ; কেবল আশা করিয়াই চলিয়াছি, ইহার শেষ নাই। বেদান্ত বলেন, এই আশা ত্যাগ কর। কেন আশা করিতে যাইবে? সবই তোমার রহিয়াছে। তুমি আত্মা, তুমি সম্রাট্‌স্বরূপ, তুমি আবার কিসের আশা করিতেছ? যদি রাজা পাগল হইয়া আপন দেশে 'রাজা কোথায়, রাজা কোথায়,' বলিয়া ঢুঁড়িয়া বেড়ান, তিনি কখনই রাজার উদ্দেশ পাইবেন না, কারণ, তিনি স্বয়ংই রাজা। তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর—এমন কি, প্রত্যেক গৃহ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারেন, তিনি মহাচীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে পারেন, তথাপি রাজার উদ্দেশ পাইবেন

না, কারণ, তিনি নিজেই রাজা। আমরা যদি জানিতে পারি, আমরা রাজা আর এই রাজার অন্বেষণ রূপ অনর্থক চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারি, তবে বড় ভাল হয়। বেদান্ত বলেন, এইরূপে আপনাদিগকে রাজস্বরূপ জানিতে পারিলেই আমরা—সন্তুষ্ট ও সুখী হইতে পারি। এই সব ভূতের ব্যাপার ছাড়িয়া দাও, দিয়া জগতে খেলা করিতে থাক।

তখন আমাদের দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অনন্ত কারাস্বরূপ না হইয়া এ জগৎ ক্রীড়াস্থানরূপে পরিণত হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না হইয়া ইহা ভ্রমর-গুঞ্জিত পূর্ণ বসন্তকালের রূপ ধারণ করে। পূর্ব্বে এই জগৎ নরককুণ্ড ছিল, তখন তাহাই স্বর্গে পরিণত হইয়া যায়। বদ্ধের দৃষ্টিতে ইহা এক মহাযন্ত্রণার স্থান, কিন্তু মুক্তব্যক্তির দৃষ্টিতে ইহাই স্বর্গ, স্বর্গ অন্যত্র নাই। এক প্রাণই সর্ব্বত্র বিরাজিত। পুনর্জ্জন্মাদি যাহা কিছু হয়, সবই এখানে হইয়া থাকে। দেবতারা সকলেই এখানে—তাঁহারা মনুষ্যাদর্শের অনুসারে কল্পিত। দেবতারা মানুষকে তাঁহাদের আদর্শে নির্ম্মাণ করেন নাই, কিন্তু মানুষই দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে। কর্ম্মরূপ ইন্দ্র রহিয়াছেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের দেবতারা উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তোমরাই তোমাদের নিজেদের এক অংশকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ, তোমরাই কিন্তু মূল, আসল জিনিষ—তোমরাই প্রকৃত উপাস্য দেবতা। ইহাই বেদান্তের মত এবং ইহাই ইহার যথার্থ কার্য্যকারিতা! আমরা মুক্ত হইয়াছি বলিয়া উন্মত্ত হইয়া সমাজ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বা গুহায় মরিতে যাইব না। তুমি যেখানে ছিলে, সেই খানেই থাকিবে, তবে তফাত হইবে এইটুকু যে, তুমি সমুদয় জগতের রহস্য অবগত হইবে। পূর্ব্ব দৃশ্য সমস্তই আসিবে, কিন্তু উহাদের অর্থ তখন অন্যরূপ বুঝিবে। তোমরা এখনও জগতের স্বরূপ জান না; মুক্ত হইলেই কেবল উহার স্বরূপ বুঝা যায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, বিধি, দৈব বা অদৃষ্ট আমাদের প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই ব্যাপৃত। এটী কেবল আমাদের প্রকৃতির এক দিক্, অপর দিকে মুক্তি সর্ব্বদা বিরাজিত, আর আমরা শীকারীর দ্বারা অনুসৃত শশকের ন্যায় মাটীতে আমাদের মুখ লুকাইয়া আমাদিগকে অশুভ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

অতএব দেখা গেল, আমরা ভ্রমবশতঃ আমাদের স্বরূপ ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু উহা একেবারে ভুলা যায় না—সর্ব্বদাই উহা কোন না কোন-রূপে আমাদের সমক্ষে আসিতেছে, আমরা যে দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতির অনুসন্ধান করিয়া থাকি, আমরা যে বহির্জ্জগতে স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপণ করিয়া

থাকি, এ সকল আর—কিছুই নয়, আমাদের মুক্ত প্রকৃতি যেন কোন না কোন রূপে আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোথা হইতে এই বাণী উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে আমরা ভুল করিয়াছি মাত্র। আমরা প্রথমে ভাবি, এই বাণী, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা বা কোন দেবতা হইতে উত্থিত—অবশেষে আমরা দেখিতে পাই, এই বাণী আমাদের ভিতরে। এই সেই অনন্ত বাণী অনন্ত মুক্তির সমাচার ঘোষণা করিতেছে। এই সঙ্গীত অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। আত্মার সঙ্গীতের কিয়দংশ এই নিয়মাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড, এই পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু যথার্থতঃ আমরা আত্মস্বরূপ আছি ও চিরকাল সেই আত্মস্বরূপ থাকিব। এক কথায়, বেদান্তের আদর্শ এই জগতে মনুষ্যোপাসনা, আর বেদান্তের ইহাই ঘোষণা যে, যদি তুমি ব্যক্ত ঈশ্বরস্বরূপ তোমার ভ্রাতাকে উপাসনা করিতে না পার, তবে বেদান্ত তোমার উপাসনায় বিশ্বাস করে না।

তোমাদের কি বাইবেলের সেই কথা স্মরণ নাই যে, যদি তুমি তোমার ভ্রাতা, যাহাকে তুমি দেখিতেছ, তাহাকে ভাল না বাসিতে পার, তবে ঈশ্বর, যাঁহাকে কখন দেখ নাই, তাঁহাকে কি করিয়া ভাল বাসিবে? যদি তাঁহাকে দেবভাবাপন্ন মনুষ্যমুখে না দেখিতে পার, তবে তাঁহাকে মেঘে, অথবা অন্য কোন মৃত জড়ে অথবা তোমার নিজ মস্তিষ্কের কল্পিত গল্পে কিরূপে দেখিবে? যে দিন হইতে তোমরা নরনারীতে ঈশ্বর দেখিতে থাকিবে, সেই দিন হইতে আমি তোমাদিগকে ধার্ম্মিক বলিব, আর তখনই তোমরা বুঝিবে, ডানগালে চড় মারিলে বাঁগাল তাহার সম্মুখে ফিরানোর অর্থ কি। যখন তুমি মানুষকে ঈশ্বররূপে দেখিবে, তখন সকল বস্তু, এমন কি, ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত তোমার নিকট আসিলে তোমার কিছু ক্ষতিবোধ হইবে না। যাহা কিছু তোমার নিকট আসে, সবই সেই অনন্ত আনন্দময় প্রভু নানারূপে আসিতেছেন—তিনি আমাদের পিতা মাতা, বন্ধুস্বরূপ। আমাদের আপন আত্মাই আমাদের সঙ্গে খেলা করিতেছেন।

ভগবানকে পিতা বলা হইতেও শ্রেষ্ঠতর ভাব আছে, তাঁহাকে সাধকেরা মাতা বলিয়া থাকেন। তদপেক্ষাও পবিত্রতর ভাব আছে—তাঁহাকে প্রিয়সখা বলা। তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ভাব আমার প্রেমাস্পদ বলা। ইহার কারণ এই, প্রেম ও প্রেমাস্পদে কিছু প্রভেদ না দেখাই সর্ব্বোচ্চ ভাব। তোমাদের সেই প্রাচীন পারস্যদেশীয় গল্পের কথা মনে থাকিতে পারে। একজন প্রেমিক আসিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদের ঘরের দরজায় ঘা মারিলেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল,

'কেও?' তিনি বলিলেন, 'আমি।' আর কোন উত্তর আসিল না। দ্বিতীয় বার তিনি আসিলেন এবং উত্তর দিলেন, "আমি আসিয়াছি', কিন্তু দরজা খুলিল না। তৃতীয়বার আবার তিনি আসিলেন, আবার জিজ্ঞাসিত হইল, 'কেও', তখন তিনি বলিলেন, 'প্রেমাস্পদ, আমি তুমিই'; তখন দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। ভগবান এবং আমাদের মধ্যেও তদ্রূপ। তুমি সকলেতে, তুমিই সকল। প্রত্যেক নরনারীই সেই প্রত্যক্ষ জীবন্ত আনন্দময় একমাত্র ঈশ্বর। কে বলে, তুমি অজ্ঞাত? কে বলে, তোমাকে অন্বেষণ করিতে হইবে? আমরা তোমাকে অনন্তকালের জন্য পাইয়াছি। আমরা তোমাতে অনন্তকালের জন্য বাস করিতেছি —সর্ব্বত্র অনন্তকালের জন্য জ্ঞাত, অনন্তকাল উপাসিত তোমাকে পাইয়াছি।

আর একটী কথা এই,—অন্যান্য প্রকারের উপাসনা ভ্রমাত্মক নহে। এই বিষয়টী কোনমতে ভুলা উচিত নহে যে, যাহারা নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা ভগবানের উপাসনা করে, (আমরা উহাদিগকে যতই অনুপযোগী মনে করি না কেন,) তাহারা বাস্তবিক ভ্রান্ত নহে। সত্য হইতে সত্যে ভ্রমণ, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে ভ্রমণ। অন্ধকার বলিলে বুঝিতে হইবে, অল্প আলো; মন্দ বলিলে বুঝিতে হইবে, অল্প ভালো; অপবিত্রতা বলিলে বুঝিতে হইবে—অল্প পবিত্রতা। অতএব সত্যধারণার ইহাও এক দিক্ যে, আমাদিগকে অপরকে প্রেম ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে হইবে। আমরাও যে পথ দিয়া আসিয়াছি, তাহারাও সেই পথ দিয়া চলিতেছে। যদি তুমি বাস্তবিক মুক্ত হও, তবে তোমাকে অবশ্যই জানিতে হইবে, তাহারাও শীঘ্র বা বিলম্বে মুক্ত হইবে, আর তুমি যখন মুক্তই হইলে, তখন তুমি, যাহা অনিত্য, তাহা দেখ কি করিয়া? যদি তুমি বাস্তবিক পবিত্র হও, তবে তুমি অপবিত্রতা দেখ কিরূপে? কারণ, যাহা ভিতরে থাকে, তাহাই বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের নিজের ভিতরে অপবিত্রতা না থাকিলে বাহিরে কখনই উহা দেখিতে পাইতাম না। বেদান্তের ইহা একটী সাধনের দিক্। আশা করি, আমরা সকলে জীবনে ইহা পরিণত করিবার চেষ্টা করিব। ইহা অভ্যাস করিবার জন্য সারা জীবনটা পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু এই সকল বিচার আলোচনায় আমরা এই ফললাভ করিলাম যে, অশান্তি ও অসন্তোষের পরিবর্ত্তে আমরা শান্তি ও সন্তোষের সহিত কার্য্য করিব, কারণ, আমরা জানিলাম, সমুদয়ই আমাদের ভিতরে—উহা আমাদেরই রহিয়াছে, উহা আমাদের জন্মপ্রাপ্ত স্বত্ব। আমাদের আবশ্যক—কেবল উহাকে প্রকাশ করা, প্রত্যক্ষগোচর করা।

কর্ম্মজীবনে বেদান্ত।

তৃতীয় প্রস্তাব।

পূর্ব্বোক্ত (ছান্দোগ্য) উপনিষদ্ হইতেই আমরা পাইতেছি যে, দেবর্ষি নারদ এক সময় সনৎকুমারের নিকট আগমন করিয়া অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে সোপানারোহণক্রমে—ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া অবশেষে আকাশতত্ত্বে উপনীত হইলেন। 'আকাশ তেজ হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ, আকাশে চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ তারা সকলি রহিয়াছে। আকাশেই আমরা শ্রবণ করিতেছি, আকাশেই জীবনধারণ করিয়া আছি, আকাশেই আমরা মরিতেছি।' এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি না। সনৎকুমার বলিলেন, প্রাণ আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ। বেদান্তমতে এই প্রাণই জীবনের মূলীভূত শক্তি। আকাশের ন্যায় ইহাও একটা সর্ব্বব্যাপী তত্ত্ব আর আমাদের শরীরে বা অন্যত্র যাহা কিছু গতি দেখা যায়, সবই প্রাণের কার্য্য। প্রাণ আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ। প্রাণের দ্বারাই সকল বস্তু বাঁচিয়া রহিয়াছে, প্রাণই মাতা, প্রাণই পিতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য, প্রাণই জ্ঞাতা।

আমি তোমাদের নিকট ঐ উপনিষদ্ হইতেই আর এক অংশ পাঠ করিব। শ্বেতকেতু পিতা আরুণির নিকট সত্যসম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পিতা তাঁহাকে নানাবিষয় শিখাইয়া অবশেষে বলিলেন, 'এই সকল বস্তুর যে সূক্ষ্ম কারণ, তাহা হইতেই ইহারা নির্ম্মিত, ইহাই সব, ইহাই সত্য, হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।' তার পর তিনি ইহা বুঝাইবার জন্য নানা উদাহরণ দিতে লাগিলেন। 'হে শ্বেতকেতো, যেমন মধুমক্ষিকা বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধুসঞ্চয় করিয়া একত্র করে, এবং এই বিভিন্ন মধুগণ যেমন জানে না যে, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াও তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। অতএব হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।' 'যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, কিন্তু এই নদীসকল যেমন জানে না, ইহারা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা জানি না যে, আমরা তাহাই। হে শ্বেতকেতো,তুমি তাহাই।' পিতা পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

এক্ষণে কথা এই, সকল জ্ঞানলাভেরই দুইটী মূলসূত্র আছে। একটী সূত্র এই, বিশেষকে সাধারণে, এবং সাধারণকে আবার সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বে

সমাধান করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। দ্বিতীয় সূত্র এই, যে কোন বস্তর ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যতদূর সম্ভব, সেই বস্তর স্বরূপ হইতেই তাহার ব্যাখ্যা অন্বেষণ করিতে হইবে। প্রথম সূত্রটী ধরিয়া আমরা দেখিতে পাই, আমাদের সমুদয় জ্ঞান বাস্তবিক উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীবিভাগ মাত্র। একটী কিছু যখন ঘটে, তখন আমরা যেন অতৃপ্ত হই। যখন ইহা দেখান যায় যে, সেই একই ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে, তখন আমরা তৃপ্ত হই ও উহাকে 'নিয়ম' আখ্যা দিয়া থাকি। যখন একটী প্রস্তর অথবা আপেল পড়িতে দেখিতে পাই, তখন আমরা অতৃপ্ত হই। কিন্তু যখন দেখি,সকল প্রস্তর বা আপেলই পড়িতেছে, তখন আমরা উহাকে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি এবং তৃপ্ত হইয়া থাকি। ব্যাপার এই, আমরা বিশেষ হইতে সাধারণ তত্ত্বে গমন করিয়া থাকি। ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে ইহাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

ধর্ম্ম আলোচনা করিতে গেলে, এবং উহাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিণত গেলেও আমাদিগকে সেই মূলসূত্রের অনুসরণ করিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে আমরা দেখিতে পাই, এই প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে। এই উপনিষদ্, যাহা হইতে তোমাদিগকে শুনাইতেছি, তাহাতেও দেখিতে পাই, সর্ব্বপ্রথমে এই ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে—বিশেষ হইতে সাধারণে গমন। আমরা দেখিতে পাই, কিরূপে দেবগণ ক্রমশঃ একে লয় হইয়া এক তত্ত্বরূপে পরিণত হইতেছেন; জগতের ধারণায়ও তাঁহারা ক্রমশঃ কেমন অগ্রসর হইতেছেন, কেমন সূক্ষ্ম ভূত হইতে তাঁহারা সূক্ষ্মতর ও অধিকতর ব্যাপী ভূতে যাইতেছেন, কেমন তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ভূত হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এক সর্ব্বব্যাপী আকাশতত্ত্বে উপনীত হইতেছেন, কিরূপে তথা হইতেও অগ্রসর হইয়া তাঁহারা প্রাণনামক সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিতে উপনীত হইতেছেন, আর এই সকলের ভিতরই আমরা এই এক তত্ত্ব পাইতেছি যে, একটী বস্তু অপর সকল বস্তু হইতে পৃথক্ নহে। আকাশই সূক্ষ্মতররূপে প্রাণ এবং প্রাণ আবার স্থূল হইয়া আকাশ হয়, আকাশ আবার স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে থাকে, ইত্যাদি।

সগুণ ঈশ্বরকে তদপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্বে সমাধানও এই মূলসূত্রের আর একটী উদাহরণ। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সগুণ ঈশ্বরের ধারণাও এইরূপ সামান্যীকরণের ফল। ইহা হইতে পাওয়া গিয়াছে এইটুকু যে, সগুণ ঈশ্বর সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টিস্বরূপ। কিন্তু ইহাতে একটী শঙ্কা উঠিতেছে, ইহা ত পর্য্যাপ্ত সামান্যীকরণ হইল না। আমরা প্রাকৃতিক ঘটনার এক দিক্ অর্থাৎ

জ্ঞানের দিক্ লইলাম, তাহা হইতে আমরা সামান্যীকরণ প্রণালীতে সগুণ ঈশ্বরে উপনীত হইলাম, কিন্তু বাকি প্রকৃতিটি সব বাদ গেল। সুতরাং, প্রথমতঃ, এই সামান্যীকরণ অসম্পূর্ণ। ইহাতে আর একটী অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা দ্বিতীয় সূত্রের অন্তর্গত। প্রত্যেক বস্তুকে তাহার স্বরূপ হইতেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অনেক লোক হয়ত এক সময়ে ভাবিত, মাটীতে যে কোন পাথর পড়ে, তাহাই ভূতে ফেলিতেছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণই বাস্তবিক ইহার ব্যাখ্যা, আর যদিও আমরা জানি, ইহা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নহে, কিন্তু ইহা অপর ব্যাখ্যা হইতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিশ্চয়, কারণ একটী ব্যাখ্যা বস্তুর বহির্দ্দেশস্থ কারণ হইতে, অপরটী বস্তুর স্বভাব হইতে লব্ধ। এইরূপ আমাদের সমুদয় জ্ঞানের সম্বন্ধেই যে কোন ব্যাখ্যা বস্তুর প্রকৃতি হইতে লব্ধ, তাহা বৈজ্ঞানিক আর যে কোন ব্যাখ্যা বস্তুর বহির্দ্দেশ হইতে লব্ধ, তাহা অবৈজ্ঞানিক।

এক্ষণে 'সগুণ ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা", এই তত্ত্বটীকেও এই সূত্রটী দ্বারা পরীক্ষা করা যাউক। যদি এই ঈশ্বর প্রকৃতির বহির্দ্দেশে থাকেন, যদি প্রকৃতির সঙ্গে—তাঁহার কোন সম্বন্ধ না থাকে এবং যদি এই প্রকৃতি শূন্য হইতে সেই ঈশ্বরের আজ্ঞা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে স্বভাবতই ইহা অতি অবৈজ্ঞানিক মত হইয়া দাঁড়াইল। আর চিরকালই সগুণ ঈশ্বরবাদের এই খানে একটু গোল আছে—ইহাই ইহার দুর্ব্বলতা। এই মতে ঈশ্বর মানবগুণসম্পন্ন, কেবল সেই গুণগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত। যিনি শূন্য হইতে এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন অথচ যিনি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এরূপ ঈশ্বরবাদে দুইটী দোষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রথমতঃ, ইহা সামান্যে সম্পূর্ণ সমাধান নহে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা বস্তুর স্বভাব হইতে উহার ব্যাখ্যা নহে। উহা কার্য্যকে কারণ হইতে পৃথক্ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু মানুষ যতই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই সে এই মতের দিকে অগ্রসর হইতেছে যে, কার্য্য কারণের রূপান্তরমাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আবিষ্ক্রিয়া এই দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে আর আধুনিক সর্ব্ববাদিসম্মত ক্রমবিকাশবাদের তাৎপর্য্যই এই যে, কার্য্য কারণের রূপান্তর মাত্র। শূন্য হইতে সৃষ্টি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের উপহাসের বিষয়।

ধর্ম্ম কি পূর্ব্বোক্ত দুইটী পরীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? যদি এমন কোন ধর্ম্মমত থাকে, যাহা এই দুইটী পরীক্ষায় টিকিয়া যায়, তাহাই আধুনিক চিন্তাশীল মনের গ্রাহ্য হইবে। যদি পুরোহিত চর্চ্চ অথবা কোন শাস্ত্রের

ভাষ্যমূল।—কিংপুনরিদং তদ্ভাবিতগ্রহণং বৃদ্ধিরিত্যেবং যে আকারৈ-কারৌকারা ভাব্যন্তে তেষাং গ্রহণমাহোস্বিদাদৈজ্‌মাত্রস্য। কিং চাতঃ। যদি তদ্ভাবিতগ্রহণং শালীয়ো মালীয় ইতি বৃদ্ধলক্ষণশ্ছো ন প্রাপ্নোতি। আম্রময়ং শালময়ম্। বৃদ্ধলক্ষণো ময়ণ্ ন প্রাপ্নোতি। আম্রগুপ্তায়নিঃ শালগুপ্তায়নিঃ। বৃদ্ধলক্ষণঃ ফিঞ্ ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ। পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, "বৃদ্ধিরাদৈচ্" সূত্রে, তদ্ভাবিত অর্থাৎ বৃদ্ধি করিবার পরে সেই বৃদ্ধি দ্বারা উৎপন্ন যে বর্ণসমূহ, তাহাদেরই 'বৃদ্ধি' শব্দে গ্রহণ হইবে, অর্থাৎ অকার কিংবা ইকার উকারাদি স্থলে, বৃদ্ধি হইয়া যে সকল আকার ঐকার ঔকার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদেরই গ্রহণ হইবে অথবা আৎ ঐচ্ (আকার ঐকার ঔকার) মাত্রেরই গ্রহণ হইবে ?

ইহা হইতে অর্থাৎ এইরূপে বিচার দ্বারা ফল কি ?

ফল এই যে, যদি তদ্ভাবিত অর্থাৎ হ্রস্বাদিস্থানে বৃদ্ধি হইয়া উৎপন্ন বৃদ্ধি শব্দের গ্রহণ হয়, তবে শালীয় মালীয় প্রভৃতিস্থলে শালা এবং মালা শব্দের উত্তর আদি 'শ'কার এবং 'ম'কার স্থিত 'অচ্' অর্থাৎ আকারকে বৃদ্ধি মানিয়া (১) "বৃদ্ধাচ্ছঃ।" ৪।২।১১৪। (বৃদ্ধসংজ্ঞক শব্দের উত্তর ছ প্রত্যয় হয়) এই সূত্রানুসারে 'ছ' প্রত্যয় হইবেনা; সুতরাং শালীয় মালীয় প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধি হইবেনা।

আম্রময় শালময় প্রভৃতি শব্দে, বৃদ্ধসংজ্ঞাবিশিষ্ট আম্র এবং শাল শব্দের উত্তর "নিত্যং বৃদ্ধশরাদিভ্যঃ।" ৪।৩।১৪৪। (বৃদ্ধসংজ্ঞক শব্দের এবং শরাদিগণীয় শব্দের উত্তর নিত্য 'ময়ট্' প্রত্যয় হয়) এইসূত্রানুসারে 'ময়ট্' প্রত্যয় প্রাপ্ত হইবে না, সুতরাং আম্রময় শালময় প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

তৃতীয়দোষ এই হইবে যে, 'আম্রগুপ্তায়নিঃ', 'শালগুপ্তায়নিঃ' প্রভৃতি স্থলে বৃদ্ধ-লক্ষণীভূত আম্রগুপ্ত এবং শালগুপ্তশব্দের উত্তর "উদীচাং বৃদ্ধাদগোত্রাৎ।৪।১।১৫৭। (গোত্রসংজ্ঞকভিন্ন বৃদ্ধসংজ্ঞক শব্দের উত্তর, উত্তরদেশীয় ঋষিগণের মতে ফিঞ্ প্রত্যয় হয়) এই সূত্রানুসারে ফিঞ্ প্রত্যয় প্রাপ্ত হইবে না; সুতরাং আম্র-গুপ্তায়নি শালগুপ্তায়নি প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—অথাদৈজ্‌মাত্রস্য গ্রহণম্। সর্ব্বোভাসঃ সর্ব্বভাস ইত্যত্র-

(১) বৃদ্ধির্যস্যাচামাদিস্তদ্‌বৃদ্ধম্। ১।১।৭৩। যে সকল শব্দের সমুদায় অচ্-এর মধ্যে আদি অচ্ বৃদ্ধিবিশিষ্ট, তাহাদের বৃদ্ধ সংজ্ঞা হয়।

পদবৃদ্ধৌ সর্ব্বং চেত্যেষ বিধিঃ প্রাপ্নোতি। ইহ তাবতী ভার্যা যস্য তাবদ্ভার্য্যঃ যাবদ্ভার্য্যঃ। বৃদ্ধিনিমিত্তস্যেতি পুংবদ্ভাবপ্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর (পূর্ব্বপক্ষে দোষ দেখিয়া) যদি আৎ এবং ঐচ্ অর্থাৎ আকার ও ঐকার ঔকার মাত্রেরই গ্রহণ করা হয় (বৃদ্ধিশব্দে গ্রহণ করা হয়)?

এইরূপ করিলে 'সর্ব্ব যে ভাস—সর্ব্বভাস' এইস্থলে সর্ব্ব শব্দের সহিত উত্তরপদবৃদ্ধিলক্ষণসম্পন্ন 'ভাস' শব্দের "উত্তরপদবৃদ্ধৌ সর্ব্বং চ" ৬।২।১০৫। (উত্তরপদবৃদ্ধিবিশিষ্ট হইলে পূর্ব্বশব্দ এবং দিক্ শব্দের অন্ত্য অচ্ উদাত্তস্বরবিশিষ্ট হয়) এইসূত্রানুসারে সর্ব্ব শব্দের অন্ত্য অকার উদাত্তস্বরবিশিষ্ট হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা বিধেয় নহে।

আর তাবতী হইয়াছে ভার্য্যা যার, সে তাবদ্ভার্য্য (যাবতী হইয়াছে ভার্য্যা যার সে) যাবদ্ভার্য্য ইত্যাদি স্থলে তদ্ এবং যদ্ শব্দের উত্তর 'বতুপ্' প্রত্যয় (১) করিলে এবং সেই 'বতুপ্'কে নিমিত্ত করিয়া তদ্ এবং যদ্ শব্দের অকারের বৃদ্ধি করিয়া (২) তাবৎ এবং যাবৎ শব্দ হইলে এবং তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে তাবতী ও যাবতী শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস করিলে অবশ্য প্রাপ্তব্য তাবদ্ভার্য্য যাবদ্ভার্য্য ইত্যাদি রূপ পুংবদ্ভাব; তাহার বাধক "বৃদ্ধি-নিমিত্তস্য চ তদ্ধিতস্যারক্তবিকারে।" ৬।৩।৩৯। (বৃদ্ধির নিমিত্ত যে অরক্তবিকার-স্থিত তদ্ধিত, তাহার অন্তস্থিত স্ত্রীলিঙ্গবাচকশব্দ পুংবদ্ভাব অর্থাৎ পুংলিঙ্গের ন্যায় চিহ্নবিশিষ্ট হয় না) এই সূত্রানুসারে পুংবদ্ভাবের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্যমূল।—অস্ত তর্হি আদৈজ্মাত্রস্য গ্রহণম্। নম্ন চোক্তং সর্ব্বো ভাসঃ সর্ব্বভাস ইত্যুত্তরপদবৃদ্ধৌ সর্ব্বঞ্চেত্যেষ বিধিঃ প্রাপ্নোতীতি। নৈষ দোষঃ। নৈবং বিজ্ঞায়তে উত্তরপদস্য বৃদ্ধিরুত্তরপদবৃদ্ধিরিতি। কথং তর্হি। উত্তর-পদস্যেত্যেবং প্রকৃত্য যা বৃদ্ধিস্তদ্বত্যুত্তরপদে ইত্যেবমেতদ্বিজ্ঞায়তে। অবশ্যং চৈতদেবং বিজ্ঞেয়ম্। তদ্ভাবিতগ্রহণে সত্যপীহ প্রসজ্যেত। সর্ব্বঃ কারকঃ সর্ব্বকারক ইতি।

---

(১) যত্তদেতেভ্যঃ পরিমাণে বতুপ্। ৫।২।৩৯। যদ্, তদ্ এবং এতদ্ শব্দের উত্তর পরিমাণ অর্থে বতুপ্ প্রত্যয় হয়।

(২) আসর্ব্বনাম্নঃ। ৬।৩।৯১। সর্ব্বনাম শব্দের আকারান্ত আদেশ হয়, দৃগ্, দৃশ এবং বতুপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে।

ভাষ্যানুবাদ।—যখন উভয় পক্ষেই দোষ দেখা গেল, তখন একপক্ষ অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে। হউক্ তবে আকার, ঐকার এবং ঔকার মাত্রেরই গ্রহণ। যদি বল যে, তাহা হইলে, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, 'সর্ব্বো ভাসঃ' অর্থাৎ সর্ব্ব যে ভাগ=সেই 'সর্ব্বভাস' এই স্থলে, উত্তরপদবিভক্তৌ সর্ব্বং চ (১) এইসূত্রানুসারে যে বিধি হইয়া থাকে (উদাত্তরূপ বিধি), তাহা প্রাপ্ত হইবে।

এই দোষ হইবে না। কারণ এই কথা জানিবে না যে,—উত্তর পদের যে বৃদ্ধি=উত্তরপদবৃদ্ধি, তাহাতে, উত্তরপদবৃদ্ধিতে; এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইয়াছে।

তবে কি প্রকারে প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে?

এইরূপ সমাসবাক্য করিব যে;—উত্তরপদের প্রকরণে যে বৃদ্ধি, তদ্বিশিষ্ট উত্তরপদে; এপ্রকার জানিতে হইবে। অর্থাৎ উত্তরপদবৃদ্ধৌ সর্বং চ ৬।২।১০৫। এইসূত্রের এক্ষণে যথার্থরূপে এই ব্যাখ্যা হইবে যে;—'উত্তর পদের,' এই অধিকার করিয়া যে বৃদ্ধি বিহিত হইবে, তদ্বিশিষ্ট (বৃদ্ধিবিশিষ্ট) উত্তরপদ পরে থাকিলে 'সর্ব্ব' শব্দ এবং 'দিক্' শব্দের অন্তস্থিত স্বরবর্ণ উদাত্ত হয় কিন্তু 'সর্ব্বভাস' সমাসবিধায়ক শব্দটী উত্তরপদের প্রকরণে বিহিত হইয়া সমাস হয় নাই বলিয়াই উদাত্তও হইবে না।

আর এইরূপ করিয়া সূত্রের ব্যাখ্যা যে কল্পনা করা হইল, তাহাও নহে। এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা অবশ্যই জানিতে হইবে। কারণ 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের বৃদ্ধি শব্দ যদি যাবতীয় আ এবং ঐ ঔর গ্রহণ না করিয়া তদ্ভাবিতেরও গ্রহণ হয়, তাহা হইলেও এইরূপ ব্যাখ্যার প্রসঙ্গই আসিবে। যেহেতু এইরূপ করিলেই সর্ব্ব যে কারক=সর্ব্বকারক (২) এই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

---

(১) ইহার এক প্রকার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; বিশেষ ব্যাখ্যা পরে করা যাইতেছে।

(২) কৃ ধাতুর উত্তর ণ্বুল্ প্রত্যয় করিয়া "অচো ঞ্ণিতি ৭।২।১১৫। (ঞিৎ প্রত্যয় এবং ণিৎ অর্থাৎ ঞকার ও ণকার ইৎবিশিষ্টপ্রত্যয় পরে থাকিলে অজন্ত অর্থাৎ স্বরবর্ণান্ত অঙ্গের বৃদ্ধি হয়) এই সূত্রানুসারে 'ণ্বুল্' প্রত্যয়ের ণকার ইৎপ্রযুক্ত কৃধাতুর ঋকারের বৃদ্ধি হইয়া কারক হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্ব শব্দের সহিত বৃদ্ধিলক্ষণসম্পন্ন 'কারক' শব্দের সমাসে যথোচিত স্বর যাহাতে প্রাপ্ত হইতে পারে, এইজন্য সর্ব্বাবস্থায়ই 'উত্তরপদবিভক্তৌ সর্ব্বঞ্চ' এইসূত্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—যদপ্যুচ্যতে। ইহ তাবতী ভার্য্যা যস্য তাবদ্ভার্য্যঃ যাবদ্ভার্য্য ইতি। বৃদ্ধিনিমিত্তস্যেতি পুংবদ্ভাবপ্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতীতি। নৈষ দোষঃ। নৈবং বিজ্ঞায়তে। বৃদ্ধের্নিমিত্তং বৃদ্ধিনিমিত্তং বৃদ্ধিনিমিত্তস্যেতি। কিংতর্হি। বৃদ্ধের্নিমিত্তং যস্মিন্ সোঽয়ং বৃদ্ধিনিমিত্তঃ। বৃদ্ধিনিমিত্তস্যেতি। কিঞ্চ বৃদ্ধের্নিমিত্তম্। যোঽসৌ ককারো ঞকারো ণকারো বা।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে এইযে—তাবতী হইয়াছে ভার্য্যা যার, সে তাবদ্ভার্য্য; এইরূপ যাবদ্ভার্য্য প্রভৃতি বাক্য; এইসকল স্থলে "বৃদ্ধিনিমিত্তস্য চ তদ্ধিতস্যারক্তবিকারে। ৬।৩।৩৯। (১) এইসূত্রানুসারে পুংবদ্ভাবের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে; সে দোষ কিরূপে নিবারিত হইবে?

ইহা কখনও দোষ নহে। কারণ এইসূত্রের দ্বারা ইহা কখনও জানান হয় নাই যে—বৃদ্ধির যে নিমিত্ত, সে বৃদ্ধিনিমিত্ত; তাহার, বৃদ্ধিনিমিত্তের।

তবে কি?

বৃদ্ধির নিমিত্ত আছে যাহাতে, সেই এইস্থলে বৃদ্ধিনিমিত্ত; তাহার, বৃদ্ধিনিমিত্তের।

সেই বৃদ্ধির নিমিত্ত কি?

এইযে ককার, ঞকার অথবা ণকার, ইহারাই বৃদ্ধির নিমিত্ত। (২)

ভাষ্যমূল।—অথবা যঃ কৃৎস্নায়া বৃদ্ধের্নিমিত্তম্। কশ্চ কৃৎস্নায়া বৃদ্ধের্নিমিত্তম্। যস্ত্রয়াণামাকারৈকারৌকারাণাম্।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা যে সকল বর্ণ যাবতীয় বৃদ্ধির নিমিত্ত, সেই বৃদ্ধিনিমিত্ত।

কৃৎস্ন অর্থাৎ যাবতীয় স্থলেই বৃদ্ধির নিমিত্ত হয়, সে কোন্ কোন্ বর্ণ?

সেই বর্ণ এই যে, আকার ঐকার এবং ঔকার; এই তিন বর্ণেরই বৃদ্ধির নিমিত্ত হয়।

বার্ত্তিকমূল।—সংজ্ঞাধিকারঃ সংজ্ঞাসংপ্রত্যয়ার্থঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে ইহা যে সংজ্ঞাবোধক সূত্র তাহা উপলব্ধি হওয়ার জন্য 'সংজ্ঞা' এই শব্দের অধিকার করা কর্ত্তব্য।*

(১) ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে সামান্যতঃ হইয়াছে; বিশেষরূপে পরে বলা হইতেছে।

(২) ককার ইৎ ঞকার ইৎ এবং ণকার ইৎপ্রত্যয় পরে থাকিলে অব্যক্ত অঙ্গের বৃদ্ধি হয়।

ভাষ্যমূল।—অথ সংজ্ঞেত্যেবং প্রকৃত্য বৃদ্ধ্যাদয়ঃ শব্দাঃ পঠিতব্যাঃ। কিং প্রয়োজনম্। সংজ্ঞাসংপ্রত্যয়ার্থঃ। বৃদ্ধ্যাদীনাং শব্দানাং সংজ্ঞেত্যেষ সংপ্রত্যয়ো যথা স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর বক্তব্য এই যে, 'সংজ্ঞা' এই শব্দটি প্রকরণ (১) করিয়া 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের বৃদ্ধ্যাদি শব্দ, পাঠ করা কর্ত্তব্য।

তাহার প্রয়োজন কি?

বৃদ্ধি, গুণ প্রভৃতি শব্দ যে সংজ্ঞাবোধক, তাহা উপলব্ধি হইবার জন্য। অর্থাৎ বৃদ্ধি, গুণ প্রভৃতি শব্দ যে সংজ্ঞাবোধক, তাহার উপলব্ধি যাহাতে হইতে পারে, এইজন্য 'সংজ্ঞা' এই শব্দ, অধিকারবোধক করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বার্ত্তিকমূল।—ইতরথা হ্যসংপ্রত্যয়ো যথা লোকে। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ইতরথা অর্থাৎ 'সংজ্ঞা' শব্দের অধিকার অকরণে, যেমন লোকমধ্যে কাহারও সংজ্ঞা (নাম) না করিলে, কিছুই বুঝা যায় না, সেইরূপ এই স্থলেও 'বৃদ্ধি' এইটী যে 'সংজ্ঞা', তাহা বুঝা যাইবে না। *।

ভাষ্যমূল।—অক্রিয়মাণে হি সংজ্ঞাধিকারে বৃদ্ধ্যাদীনাং সংজ্ঞেত্যেষ সংপ্রত্যয়ো ন স্যাৎ। ইদমিদানীং বহুসূত্রমনর্থকং স্যাৎ। অনর্থকমিত্যাহ। কথম্। যথালোকে। লোকে হ্যর্থবন্তি চানর্থকানি চ বাক্যানি দৃশ্যন্তে।

ভাষ্যানুবাদ।—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'সংজ্ঞা' শব্দের অধিকার না করিলে, বৃদ্ধি, গুণ প্রভৃতি যে সংজ্ঞাবোধক শব্দ, তাহা উপলব্ধি হইবেনা। আর বৃদ্ধি, গুণাদি শব্দ যদি সংজ্ঞাবোধকই না হয়, তবে বহু বহু সূত্র অনর্থক হইবে।

অনেক সূত্র অনর্থক হইবে, এই কথা বলিতেছ? কেন তাহা হইবে?

যেমন লোকে হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেমন লোকমধ্যে অর্থবিশিষ্ট এবং অনর্থক উভয় প্রকার বাক্যেরই ব্যবহার দেখা যায়।

ভাষ্যমূল।—অর্থবন্তি তাবৎ দেবদত্ত গামভ্যাজ শুক্লাং দণ্ডেন দেবদত্ত গামভ্যাজ কৃষ্ণামিতি।

অনর্থকানি। দশ দাড়িমানি ষড়পূপাঃ কুণ্ডমজাজিনং পললপিণ্ডঃ অধরোরুকমেতৎকুমার্য্যাঃ স্ফৈজ্যকৃতস্য পিতা প্রতিশীন ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অর্থবিশিষ্ট বাক্যের দৃষ্টান্ত, যথা;—"দেবদত্ত শুক্ল বর্ণের

(১) প্রকরণ=অধিকার অর্থাৎ 'বৃদ্ধি' এই শব্দটী বৃদ্ধিসংজ্ঞাবোধক যত সূত্র আছে, সেই সকল স্থানে ইহার অনুবৃত্তি (অধিকার) হওয়া কর্ত্তব্য।

গোতাড়ন করিতেছেন দণ্ডদ্বারা; দেবদত্ত কৃষ্ণা গোতাড়ন করিতেছেন দণ্ড-দ্বারা;" এই সকল বাক্যের অর্থ রহিয়াছে বলিয়া ইহারা অর্থবান্।

অর্থহীন বাক্যের দৃষ্টান্ত, যথা;—"দশটী দাড়িম্ব ছয়খানি পিষ্টক কুণ্ড অজাজিনকে ভূষপিণ্ড ইহাই কুমারীর পারজামা স্ফৈয্যকৃত নামক ব্যক্তির পিতা প্রতিশীন নামক ব্যক্তি;" এই বাক্যে কোনও শব্দের সহিত কোনও শব্দের সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইহারা অনর্থক বাক্য।

বার্ত্তিকমূল।—সংজ্ঞাসংজ্ঞ্যসন্দেহশ্চ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, কোন্‌টী সংজ্ঞা এবং কোন্‌টী সংজ্ঞী, যাহাতে এই সন্দেহ না হয়, এরূপ কিছু বলা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—ক্রিয়মাণেঽপি সংজ্ঞাধিকারে সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোরসন্দেহো বক্তব্যঃ। কুতো হ্যেতৎ। বৃদ্ধিশব্দঃ সংজ্ঞা আদৈচঃ সংজ্ঞিন ইতি। ন পুনরাদৈচঃ সংজ্ঞা বৃদ্ধিশব্দঃ সংজ্ঞীতি। যত্তাবদুচ্যতে সংজ্ঞাধিকারঃ কর্ত্তব্যঃ সংজ্ঞাসংপ্রত্যয়ার্থ ইতি। ন কর্ত্তব্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'সংজ্ঞা' শব্দের অধিকার করিলেও সংজ্ঞাতে এবং সংজ্ঞীতে সন্দেহ না হয়, এইরূপ বলিতে হইবে।

কেন এইরূপ বলিতে হইবে?

যাহাতে সূত্রস্থিত বৃদ্ধিশব্দ সংজ্ঞাবাচক এবং আদৈচ্ (আ, ঐ, ঔ) বর্ণসমূহ সংজ্ঞী, এইরূপই বোধ হয়; কিন্তু তদ্বিপরীত 'আদৈচ্', সংজ্ঞাবাচক এবং 'বৃদ্ধি'শব্দ, সংজ্ঞিবাচক, এইরূপ প্রতীতি না হয়।

সংজ্ঞা সংজ্ঞী (১) অসন্দেহের জন্য বার্ত্তিকাদি কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই। এমন কি, যাহা বলা হইয়াছে যে, সংজ্ঞার প্রতীতি হওয়ার জন্য, 'বৃদ্ধি-রাদৈচ্' সূত্রে, 'সংজ্ঞা' এই শব্দের অনুবৃত্তি করা কর্ত্তব্য; তাহাও কর্ত্তব্য নহে।

বার্ত্তিকমূল।—আচার্য্যাচারাৎ সংজ্ঞাসিদ্ধিঃ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—পাণিনি প্রভৃতি আচার্য্যগণের আচার (ব্যবহার) দ্বারাই সংজ্ঞার সিদ্ধি হইবে। *

ভাষ্যমূল।—আচার্য্যাচারাৎ সংজ্ঞাসিদ্ধির্ভবিষ্যতি। কিমিদমাচার্য্যাচারাদিতি। আচার্য্যাণামুপচারাৎ।

---

(১) সংজ্ঞা আছে যার, সে সংজ্ঞী।

ভাষ্যানুবাদ।—আচার্য্যগণের আচার দ্বারাই সংজ্ঞাসিদ্ধি হইবে। এই আচার্য্যগণের আচারটী কি ?

পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণাচার্য্যগণের উপচার অর্থাৎ ব্যবহার দ্বারাই 'বৃদ্ধি' শব্দ যে সংজ্ঞাবাচক, তাহার উপলব্ধি হইবে।

বার্ত্তিকমূল।—যথা লৌকিকবৈদিকেষু। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যেমন, লৌকিক অথবা বৈদিক ব্যবহার দ্বারাই সংজ্ঞার বোধ হয়, তেমন এখানেও হইবে। *।

ভাষ্যমূল।—তদ্যথা লৌকিকেষু বৈদিকেষু চ কৃতান্তেষু। লোকে তাবন্মাতাপিতরৌ পুত্রস্য জাতস্য সংবৃতেঽবকাশে নাম কুর্বাতে দেবদত্তো যজ্ঞদত্ত ইতি। তয়োরুপচারাদন্যেঽপি জানন্তি ইয়মস্য সংজ্ঞেতি। বেদেঽপি যাজ্ঞিকাঃ সংজ্ঞাং কুর্বন্তি স্ফ্যো যূপশ্চষাল ইতি। তত্রভবতামুপচারাদন্যেঽপি জানন্তি ইয়মস্য সংজ্ঞেতি। এবং ইহাপি। ইহৈব তাবৎ কেচিদ্ব্যাচক্ষাণা আহুঃ। বৃদ্ধিশব্দঃ সংজ্ঞা আদৈচঃ সংজ্ঞিন ইতি। অপরে পুনঃ সিচি বৃদ্ধিরিত্যুক্ত্বা আকারৈকারৌকারানুদাহরন্তি তেন মন্যামহে যয়া প্রত্যায্যন্তে সা সংজ্ঞা যে প্রতীয়ন্তে তে সংজ্ঞিন ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—বৃদ্ধিশব্দ সংজ্ঞাবোধকই হইবে; যেমন লৌকিক এবং বৈদিক সিদ্ধান্তসমূহে হইয়া থাকে।

তাহার দৃষ্টান্ত এই যে—যেমন লোকমধ্যে নবজাত পুত্রের নির্জ্জন স্থানে তাহার মাতা পিতা দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নামকরণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের (ঐ পিতামাতার) ব্যবহার দেখিয়াই অন্যেও জানিতে পারে যে, এইটী (দেবদত্ত) ইহার (পুত্রের) সংজ্ঞা (নাম)। আবার বেদেও এইরূপ দেখা যায় যে, যাজ্ঞিকগণ (যজ্ঞকাণ্ডদ্রষ্টা ঋষিগণ) স্ফ্যো (১) যূপ (২) চষাল (৩) প্রভৃতি সংজ্ঞা করিয়া থাকেন; সেইস্থলে তাঁহাদিগের ব্যবহার দ্বারাই অন্যেও জানিতে পারে যে, এইটী (স্ফ্যো) ইহার সংজ্ঞা। সেইরূপ এইখানেও (বৃদ্ধিরাদৈচ্ সূত্রে) আচার্য্যগণের ব্যবহার দ্বারাই জানিবে।

---

(১) যজ্ঞাগারে যে, কাষ্ঠনির্ম্মিত খড়্গাকার বস্তুবিশেষ থাকে, তাহাকে 'স্ফ্যো' কহে।

(২) যজ্ঞীয় পশুবন্ধনের কাষ্ঠস্তম্ভের নাম 'যূপ'।

(৩) 'চষালো যূপকর্ণিকঃ' অর্থাৎ যূপকাষ্ঠের উপরিস্থিত কর্ণাকার স্থানবিশেষ।

আর এইস্থলেই কোন কোন ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে,—'বৃদ্ধি' শব্দ সংজ্ঞাবোধক এবং 'আদৈচ্' অর্থাৎ আকার, ঐকার, ঔকার, ইহারা সংজ্ঞি বোধক। কিন্তু অন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে,—"সিচি বৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু" (১) ।৭।২।১। এইসূত্রে, যে 'বৃদ্ধি'শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার উদাহরণ যেখানেই দেখাইয়াছেন, সেখানেই, আকার ঐকার এবং ঔকারেরই দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন; সেই হেতুই আমরা মনে করিব যে, যদ্দ্বারা কোনও বিষয় প্রতীয়মান করান হয়, সে সংজ্ঞা এবং যাহারা প্রতীত হয়, তাহারা সংজ্ঞী।

ভাষ্যমূল।—যদপ্যুচ্যতে। ক্রিয়মাণেঽপি সংজ্ঞাধিকারে সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোরসংদেহো বক্তব্য ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, 'সংজ্ঞা' শব্দের অধিকার করিলেও 'সংজ্ঞা' এবং 'সংজ্ঞী'র যাহাতে সন্দেহ না হয়, এরূপ করা কর্ত্তব্য?

বার্ত্তিকমূল।—সংজ্ঞাসংজ্ঞাসন্দেহশ্চ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীতেও কোন সন্দেহ নাই। *

ভাষ্যমূল।—সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোশ্চাসন্দেহঃ সিদ্ধঃ। কুতঃ। আচার্য্যাচারাদেব। উক্ত আচার্য্যাচারঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীতে যে কোন সন্দেহ নাই, তাহা সিদ্ধই আছে; (তাহার জন্য কোনও সূত্র বা বার্ত্তিক করিবার প্রয়োজন নাই)।

কিরূপে?

আচার্য্যের আচার দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। আচার্য্যাচারের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূল।—অনাকৃতিঃ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—যাহার আকৃতি নাই, তাহাকে সংজ্ঞা বলে। *

ভাষ্যমূল।—অথবাঽনাকৃতিঃ সংজ্ঞা আকৃতিমন্তঃ সংজ্ঞিনঃ। লোকেঽপি হ্যাকৃতিমতো মাংসপিণ্ডস্য দেবদত্ত ইতি সংজ্ঞা ক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা যাহার কোন আকৃতি নাই, তাহাকে সংজ্ঞা বলা হইবে এবং যাহারা আকৃতিবিশিষ্ট, তাহারা সংজ্ঞী হইবে। যেমন—লোকমধ্যেও আকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ডের দেবদত্ত (আকৃতিহীন) সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে।

(১) 'ইক্' যাহার আদিতে এমন যে অঙ্গ, তাহার বৃদ্ধি হয়, পরস্মৈপদসহিত সিচ্ পরে থাকিলে।

বসন্ত-আগমন।

(শ্রীহরিদাস দত্ত।)

সুরভি সময়, সুধারসময়,
বসুধা সুখী এ সুখের কালে।
নব-নব-দল, চারুতরুদল,
কলিত ললিত লতিকাজালে॥

সুবাস সুধীর, মলয় সমীর,
মোহিনী মোহিত বহিছে কিবা।
অতি কুতূহলী, কোকিল কাকলী,
উঠিছে উথলি রজনী দিবা॥

মালতী বকুল, আদি ফুলকুল,
হাসিল ভাসিল ভুবন-বন।
কুসুম সুবাসে, দশ দিশা ভাসে,
মধু আশে আসে মধুপগণ॥

উড়ি অলিজাল, কাল ফণিমাল
প্রকৃতির হৃদি-গগনে দোলে।
উড়িছে উঠিছে, ঘুরিয়া পড়িছে,
ফুলন ফুলের কোমল কোলে॥

মধুর আমোদে, মাতিয়া আমোদে,
কিশোর কেশরে রভসে বসে।
চির সাধু সাধে, সাধে মনোসাধে,
সুষম-কুসুম-সুরসে রসে॥

কত মধুব্রত, মধু উনমত
ধাইছে, গাইছে মধুর স্বরে।
কত অলিকুল, কলহে আকুল,
রসাল মুকুল মধুর তরে॥

মরাল সকল করে কল কল,
অমল কমল কমলাকরে।
লীলাতরঙ্গিত, লহরী-ললিত,
সলিলে দোলিত নলিনী ধরে॥

গুরু কে?

(শ্রীশরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবশতঃ মার্জ্জিতসংস্কার মানবের ব্রহ্মবিবিদিষা নিরতিশয় বেগবতী। বেগবতী অনুরাগমন্দাকিনী অদ্ভুতঅনন্ত পর্ব্বত মরুভূমি-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া আপনার বেগে আপনি মহাসমুদ্রে মিলিতা। অনুরাগী আপনার বেগে আপনি উন্মাদ, আপনার গন্তব্য পথের আপনি আবিষ্কারক। এজন্য তীব্রসংস্কার অনুরাগীর গুরুকরণে প্রয়োজনাভাব। কিন্তু এ হেন তীব্র অনুরাগী জগতে বড়ই বিরল। মন্দাধিকারী নিজ সামর্থ্যে অবিশ্বাসী, তমোভাবাপন্ন, অমার্জ্জিতসংস্কার সুতরাং পরসাহায্যে আত্মলাভেচ্ছু মানব স্বতঃই গুরুকৃপাসাহায্যপ্রার্থী। পরমাত্মা বা ঈশ্বরলাভে আত্মসাক্ষাৎকারকারী মানব ভিন্ন অন্য কেহই সহায় হইতে পারে না। এজন্য শ্রুতি বলিতেছেন, 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"—তাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত উপায়নহস্তে শ্রুতিবিৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে। সুতরাং যে কেহ শ্রুতিবিৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তিনিই গুরুপদবাচ্য। বিবেক-চূড়ামণিমুখে ভগবান্ শঙ্কর স্বামী বলিতেছেন, "উপসীদেদ্‌গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাৎ বন্ধবিমোক্ষণম্। শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ॥" যাঁহাদ্বারা ভববন্ধন মুক্তি হয়, যিনি প্রাজ্ঞ, বেদজ্ঞ, পাপাচারবিহীন, কামরহিত ও ব্রহ্মজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ, সেই গুরুর উপাসনা করিবে। ইহাদ্বারাও যে কেহ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকেই গুরু বুঝাইতেছে। পরমাত্মা বা ঈশ্বর-দর্শন বড়ই কঠিন বিষয়; সুতরাং যে সে এ বিষয়ের উপদেষ্টা হইতে পারে না। এজন্য শ্রুতি জীবকে সাবধান করিয়া দিতেছেন, "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইতে গেলে যেমন উভয়েই বিনষ্ট হয়, অজ্ঞানী গুরু এবং শিষ্যেরও সেই দশা হয়। কোন লোক গুরুপদবাচ্য হইতে পারে না; এ বিষয় বিশিষ্টরূপে বলিবার জন্য অন্যত্র শ্রুতি বলিতেছেন, "ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ" যেহেতু প্রাকৃত বুদ্ধি অব্রহ্মজ্ঞ মনুষ্যকর্তৃক উপদিষ্ট হইলে বহুচিন্তিত হইয়াও আত্মা সুবিজ্ঞেয় হয় না। সুতরাং প্রাকৃত মানব গুরুর আসন গ্রহণের একান্ত অযোগ্য।

বৈদিক যুগে গুরুর এরূপ ব্রহ্মজ্ঞতা জ্ঞাত হওয়া যায়। পৌরাণিক ও তান্ত্রিকযুগে এভাবের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও

কুলগুরু প্রভৃতি অদ্ভুত ও অবৈদিক মত ভারতবর্ষের দেশবিশেষে প্রচলিত হইয়া অধুনাতন সমাজে তাহা এক কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করিয়াছে। গন্ধর্ব্ব তন্ত্রের ২য় পটলে "আস্তিকোঽহং শুচির্দ্দক্ষো" ইত্যাদি বাক্যে গুরুর যে লক্ষণ করা হইয়াছে, সেরূপ গুরু তান্ত্রিক সাধকগণের মধ্যে প্রায় পরিলক্ষিত হয় না। হয় ত অধুনাতন কুলগুরুগণের কোন পূর্ব্বপুরুষ কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া অনেক শিষ্য করিয়া গিয়া থাকিবেন; তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণে নিরক্ষর হইয়া, কামিনীকাঞ্চনের ক্রীতদাস হইয়া কিরূপে সেই গুরুর আসন গ্রহণ করিতে চান—বুঝিতে পারি না। অনেক অদ্ভুত তন্ত্রে কুলগুরুপ্রথার অদ্ভুত মত লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয়। এই কুলগুরুপ্রথা বঙ্গদেশে যেরূপ অধিকার বিস্তার করিয়াছে, ভারতবর্ষের অন্য কোথাও তেমন বিড়ম্বনা ঘটে নাই। যখন পূর্ব্ব সিদ্ধপুরুষগণের বংশতিলকগণ জ্ঞান বা যোগাদি উপদেশে অপারগ হইয়া উঠিলেন, তখনি এক অভিনব তন্ত্র রচিত হইল; বলা হইল, আমরা দীক্ষগুরু থাকিবই; কাণফুঁকার ভারটা পিতৃপুরুষগণের কৃপায় আমাদেরই রহিল; কিন্তু ইচ্ছা করিলে শিষ্য অন্যত্র শিক্ষাগুরু করিতে পারেন। গুরুভক্তির অদ্ভুত উপাখ্যান, পুরাণ তন্ত্র ও লোকমুখে রচিত ও প্রচারিত হইতে লাগিল। কেহ বুঝিয়া শুঝিয়াও সমাজের ভয়ে কুলগুরুগণের বার্ষিকের টাকা বন্ধ করিলেন না। কেহ কুলগুরুগণের ঘোর ব্যভিচার ও অজ্ঞতা দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া গুরু অন্বেষণে ব্যগ্র হইলেন; অধিকাংশ লোক নাস্তিকতা অবলম্বন করিলেন। ইহাই বঙ্গদেশের আধুনিক সমাজের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

শিষ্যের একান্ত নিষ্ঠা থাকিলে যে, যে কোন গুরু হইতে বিদ্যালাভ হইতে না পারে, তা নয়। কিন্তু সে একান্তনিষ্ঠা বড়ই দুর্লভ। কয়জন লোক জগতে আছেন, যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি সদর্পে ঘোষণা করিতে পারেন, "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি ঘরে যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় ?"

অবধূতের ২৪টী গুরু করিবার প্রস্তাব ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া পরমহংসদেব বুঝাইয়া দিয়াছেন, যাঁহার নিকট যে কিছু বিষয় শিক্ষা করা যায়, তিনিই প্রকারান্তরে গুরুপদবাচ্য। এ ভাবে জগতের প্রত্যেক ব্যক্তি, এমন কি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ চরাচর সকলি এ প্রকারের গুরু। কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে সহায়কারী ব্যক্তিবিশেষকে গুরু স্বীকার করিয়া সাধনাপথে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন পরমাত্মসাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা না থাকায় গুরুকরণ ব্যক্তিমাত্রেরই প্রয়োজনীয়। ব্রহ্মজ্ঞ না হইলে আবার সে কোনমতেই গুরুপদ-

বাচ্য নহে। পরন্তু দৃঢ় অনুরাগীর গুরু খুঁজিতে হয় না। ধ্রুবের ন্যায় অনুরাগীর নিকটে ভগবান্ সর্ব্বদাই নারদরূপী গুরুকে প্রেরণ করিয়া ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সেরূপ অনুরাগী জগতে একান্ত দুর্লভ।

সাধনাদ্বারা ক্রমে যদি উচ্চ হইতে উচ্চজ্ঞানে পৌঁছান সম্ভবপর হয়, তবে গুরু হইতে গুর্ব্বন্তরে গমন করা অন্যায় হইবে কেন? যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের গুর্ব্বন্তরে গমনের প্রয়োজনাভাব; কারণ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষে সমস্ত জ্ঞান, সূর্য্যের মত প্রকাশমান। তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী কেহ থাকিতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ এ হেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ গুরুরূপে প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা গুর্ব্বন্তরে গমন করিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। তন্ত্রমুখে ভগবান্ সদাশিব বলিতেছেন, "মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ।" মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া যায়, জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য তেমনি গুরু হইতে গুর্ব্বন্তরে গমন করিবে।

যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি নিজেই ব্রহ্মস্বরূপ; তাই শ্রুতি বলেন, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইলে শিষ্যের অভয় পদ প্রাপ্তি হয়। "যথা দেবে তথা গুরৌ" বলিয়া শ্রুতি গুরুভক্তি ও গুরুনিষ্ঠার ফল বলিয়াছেন। এই গুরুভক্তি লাভ হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহার নিকট করামলকবৎ প্রতীয়মান হয়, তখন শিষ্য বলিতে পারেন, "ন গুরুর্নশিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।"

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] [৬৫৩ পৃষ্ঠার পর।

অচিন্ত্যদিব্যাদ্ভুতনিত্যযৌবন-
স্বভাবলাবণ্যময়ামৃতোদধিম্।
শ্রিয়ং শ্রিয়ং ভক্তজনৈকজীবিতম্
সমর্থমাপৎসখমর্থিকল্পকম্ ॥ ৪৫ ॥

তুমি অচিন্ত্য, দিব্য, অদ্ভুত, এবং নিত্যযৌবনশালী, সৌন্দর্য্যময় সুধাসমুদ্র, শোভাময়ী শ্রীদেবীরও শোভাসম্পাদক, ভক্তজনের একমাত্র জীবন, সামর্থ্যবান্, বিপৎকালের বন্ধু, এবং অর্থীদের কল্পবৃক্ষস্বরূপ ॥ ৪৫ ॥

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতঃ ॥ ৪৬ ॥

নিঃশেষে সমুদয় বাসনাজালকে শান্ত করিয়া, একমাত্র তোমারই নিত্যদাস হইয়া এ জীবনকে সনাথ করতঃ, কবে আমি সর্ব্বদা ত্বদীয় সেবায় রত থাকিয়া তোমার হর্ষসম্পাদন করিতে সমর্থ হইব? ৪৬ ॥

ধিগশুচিমবিনতং নির্দ্দয়ং মামলজ্জং
পরমপুরুষ যোহহং যোগিবর্য্যাগ্রগণ্যৈঃ।
বিধিশিবসনকাদ্যৈর্ধ্যাতুমত্যন্তদূরম্
তব পরিজনভাবং কাময়ে কামবৃত্তঃ ॥ ৪৭ ॥

অশুচি, অবিনীত, নির্দ্দয়, নির্ল্লজ্জ আমায় ধিক্, কারণ, হে পুরুষোত্তম, যোগিশ্রেষ্ঠগণের অগ্রগণ্য বিধিশিবসনকাদিও যাহা ধ্যানে আনিতে পারেন না, কামপ্রবৃত্তিপূর্ণ আমি কিনা তোমার সেই দাস্যভাব প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪৭ ॥

অপরাধসহস্রভাজনং
পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে
কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥ ৪৮ ॥

আমি সহস্র সহস্র অপরাধের অনুষ্ঠাতা, ভীষণ ভবসমুদ্র মধ্যে পতিত, নিরুপায়, এবং শ্রীচরণাশ্রিত, হে হরে, কেবলমাত্র কৃপা করিয়াই আমায় আপনার করিয়া লউন ॥ ৪৮ ॥

অবিবেকঘনান্ধদিঙ্মুখে
বহুধা সন্ততদুঃখবর্ষিণি।
ভগবন্ ভবদুর্দ্দিনে পথঃ-
স্খলিতং মামবলোকয়াচ্যুত ॥ ৪৯ ॥

এই সংসাররূপ প্রবল বর্ষাগমে, অজ্ঞানমেঘে দশদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া নানাপ্রকারের দুঃখবারি নিরন্তর বর্ষণ করতঃ আমায় পথচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছে, হে ভগবন, হে অচ্যুত, আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর ॥ ৪৯ ॥

ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে ততোদয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ ॥ ৫০ ॥

হে নাথ, প্রথমতঃ আমার এক বিজ্ঞাপন শ্রবণ করুন, আমি মিথ্যা বলিতেছি না, কেবল মাত্র সত্যই বলিতেছি। যদি তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ না কর, তাহা হইলে এরূপ দয়ার পাত্র আর কোথাও পাইবে না ॥ ৫০ ॥

তদহং ত্বদৃতে ন নাথবান্ মদৃতে ত্বং দয়নীয়বান্ ন চ।

বিধিনির্ম্মিতমেতদন্বয়ম্ ভগবন্ পালয় মাস্ম জীহপ ॥ ৫১ ॥

অতএব তোমা ভিন্ন আমার উপযুক্ত প্রভু কেহ হইতে পারিবে না, এবং আমা ভিন্ন তুমিও উপযুক্ত কৃপাপাত্র কখনও পাইতে পারিবে না। তোমার আমার মধ্যে এই প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ বিধাতারই অভিপ্রেত। সুতরাং হে ভগবন্, ইহা স্বীকার কর, পরিত্যাগ করিও না ॥ ৫১ ॥

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা

গুণতোঽসানি যথা তথাবিধঃ।

তদয়ং তব পাদপদ্ময়ো-

রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ ॥ ৫২ ॥

দেহাদিবিষয়ে আমি যাহা তাহা হই না কেন, গুণবিষয়ে যেরূপ সেরূপ হই না কেন, আমি অদ্যই এই আমার "অহং"কে তোমার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলাম ॥ ৫২ ॥

মম নাথ যদস্তি যোঽস্ম্যহং

সকলং তদ্ধি তবৈব মাধব।

নিয়ত স্বমিতি প্রবুদ্ধধী-

রথবা কিং নু সমর্পয়ামি তে ॥ ৫৩ ॥

হে নাথ, হে মাধব, যাহা "আমি" এবং আমার যাহা কিছু, সকলই তোমার অথবা যদি আমার এরূপ জ্ঞান হয় যে, "সকলই সর্ব্বক্ষণ তোমার" তাহা হইলে তোমায় কি সমর্পণ করিব ? ৫৩ ॥

অববোধিতবানিমাং যথা

ময়ি নিত্যাং ভবদীয়তাং স্বয়ম্।

কৃপয়ৈবমনন্যভোগ্যতাং

ভগবন্ ভক্তিময়ি প্রযচ্ছ মে ॥ ৫৪ ॥

অয়ি ভগবন্, তুমি যেমন স্বয়ং আমার ভিতর "আমি চিরকাল তোমারই", এইভাব জাগাইয়া দিয়াছ, কৃপা করিয়া তেমনি আমার সেই ভক্তি দাও, যদ্দ্বারা আমি তোমা ভিন্ন অন্য কিছুই ভোগ করিতে সমর্থ না হই ॥ ৫৪ ॥

তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং ভবনেঽস্ত্বপি কীটজন্ম মে।
ইতরাবসথেষু মাস্মভূৎ অপি মে জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা॥ ৫৫॥

একমাত্র তোমার দাস্যসুখে যাঁহারা আসক্ত, তাঁহাদের ভবনে আমার কীট-জন্ম হউক, তাহাও ভাল, কিন্তু যেন অন্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গৃহে আমি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইয়াও না জন্ম গ্রহণ করি॥ ৫৫॥

সকৃত্ত্বদাকারবিলোকনাশয়া
তৃণীকৃতানুত্তমভুক্তিমুক্তিভিঃ।
মহাত্মভির্মামবলোক্যতাং নয়
ক্ষণেঽপি তে যদ্বিরহোঽতিদুঃসহঃ॥ ৫৫॥

যে সকল মহাত্মা একবার মাত্র তোমার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার আশায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভোগ ও মোক্ষ তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় আমাকেও ত্বর্দর্শনযোগ্যতা দাও; কারণ, মুহূর্ত্তকালও তোমার বিরহ আমার অতি দুঃসহ বোধ হইতেছে॥ ৫৬॥

ন দেহং ন প্রাণান্ন চ সুখমশেষাভিলষিতং
ন চাত্মানং নান্যং কিমপি তব শেষত্ববিভবাৎ।
বহির্ভূতং নাথ ক্ষণমপি সহে যাতু শতধা
বিনাশং তৎ সত্যং মধুমথন বিজ্ঞাপনমিদম্॥ ৫৭॥

তোমার দাসস্বরূপ ঐশ্বর্য্য ভিন্ন, দেহ, প্রাণ, সর্ব্বজনের বাঞ্ছিত সুখ, আত্মা, বা অন্য কিছুই ক্ষণকালের জন্যও ইচ্ছা করি না। ইহারা শত প্রকারে নষ্ট হইয়া যাউক। হে নাথ, হে মধুমথন, ইহা সত্য। এইটি আমি তোমার শ্রীচরণে জানাইতেছি॥ ৫৭॥

দুরন্তস্যানাদেরপরিহরনীয়স্য মহতো
নিহীনাচারোঽহং নৃপশুরশুভস্যাস্পদমপি।
দয়াসিন্ধো বন্ধো নিরবধিকবাৎসল্যজলধে
তব স্মারং স্মারং গুণগণমিতীচ্ছামি গতভীঃ॥ ৫৮॥

হে দয়াসাগর, হে বন্ধো, হে অনন্তস্নেহসমুদ্র, যদিও আমি দুশ্ছেদ্য, অনাদি, অনিবার্য্য, মহান্ অমঙ্গলের পাত্র, নিরতিশয় হীনাচার, এবং নর-পশুতুল্য, তথাপি তোমার অশেষ গুণসমূহ বার বার স্মরণ করতঃ, নির্ভয় হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি॥ ৫৮॥

অনিচ্ছন্নপ্যেবং যদি পুনরিতীচ্ছন্নিব রজ-
স্তমশ্ছন্নশ্ছন্নস্তুতিবচনভঙ্গীমরচয়ম্‌।
তথাপীত্থং রূপং বচনমবলম্ব্যাপি কৃপয়া
ত্বমেবৈবংভূতং ধরণিধর মে শিক্ষয় মনঃ॥ ৫৯॥

হে ধরণিধর, যদিও রজস্তমঃসমাচ্ছন্ন হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও ইচ্ছার আকার প্রকাশ করতঃ আমি এই মৌখিক স্তব রচনা করিয়াছি, তথাপি কৃপা করিয়া এইরূপ বচনকেও গ্রহণ পূর্ব্বক, আমার এবম্ভূত মনকে শিক্ষা দাও॥ ৫৯॥

পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িততনয়স্ত্বং প্রিয়সুহৃৎ
ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরসি গতিশ্চাসি জগতাম্‌।
ত্বদীয়স্তদ্ভৃত্যস্তবপরিজনস্ত্বদ্গতিরহং
প্রপন্নশ্চৈবং সত্যহমপি তবৈবাস্মি হি ভরঃ॥ ৬০॥

তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি প্রিয় তনয়, তুমিই প্রিয় সুহৃৎ, তুমি মিত্র, তুমি জগতের গুরু ও গতি। আমি তোমার ভৃত্য, তোমার পরিজন; তুমি আমার গতি, আমি তোমার শরণাগত; এরূপ অবস্থায় আমি বাস্তবিকই তোমার ভারস্বরূপ॥ ৬০॥

জনিত্বাহং বংশে মহতি জগতি খ্যাতযশসাং
শুচীনাং যুক্তানাং গুণপুরুষতত্ত্বস্থিতিবিদাম্‌।
নিসর্গাদেব ত্বচ্চরণকমলৈকান্তমনসা-
মধোঽধঃ পাপাত্মা শরণদ নিমজ্জামি তমসি॥ ৬১॥

যাঁহারা খ্যাতনামা, পবিত্র, ও যুক্ত, যাঁহারা ত্রিগুণাত্মক প্রধান ও পুরুষের যাথার্থ্যজ্ঞ, স্বভাবতঃই যাঁহাদের মন তোমার পাদপদ্মে একান্ত ভক্তিযুক্ত, তাঁহাদের মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, হে আশ্রয়দাতঃ, দুষ্টাত্মা আমি অন্ধকার হইতে অধিকতর অন্ধকারে মগ্ন হইতেছি॥ ৬২॥

অমর্য্যাদঃ ক্ষুদ্রশ্চলমতিরসূয়াপ্রসবভূঃ
কৃতঘ্নো দুর্ম্মানী স্মরপরবশো বঞ্চনপরঃ।
নৃশংসঃ পাপিষ্ঠঃ কথমহমিতো দুঃখজলধে-
রপারাদুত্তীর্ণস্তব পরিচরেয়ং চরণয়োঃ॥ ৬২॥

আমি উচ্ছৃঙ্খল, ক্ষুদ্র, চঞ্চল, অসূয়ার জন্মভূমি, কৃতঘ্ন, অভিমানী, কামুক, বঞ্চক, নিষ্ঠুর ও পাপিষ্ঠ। আমি কিরূপে এই দুঃখসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তোমার পাদপদ্মযুগলের সেবা করিব? ৬২ ॥

রঘুবর যদভূস্ত্বং তাদৃশো বায়সস্য
প্রণত ইতি দয়ালুর্যচ্চ চৈদ্যস্য কৃষ্ণ।
প্রতিভবমপরাদ্ধুর্মুগ্ধসাযুজ্যদোঽভূ-
র্বদ কিমপদমাগস্তস্য তেঽস্তি ক্ষমায়াঃ ॥ ৬৩ ॥

হে রঘুবর, যখন তাদৃশ মহানিষ্টকারী কাক প্রণত হইয়াছিল বলিয়া, তাহার প্রতি দয়ালু হইয়াছিলে, হে কৃষ্ণ, প্রতি জন্মে তোমার নিকট অপরাধী হইলেও চেদিরাজ শিশুপালকে যখন তুমি আনন্দময় কৈবল্য দান করিয়াছ, তখন বল, এরূপ কি পাপ আছে, যাহা তুমি ক্ষমা করিতে না পার? ৬৩ ॥

ননু প্রপন্নঃ সকৃদেব নাথ
তবাহমস্মীতি চ যাচমানঃ।
তবানুকম্প্যঃ স্মর তৎপ্রতিজ্ঞাং
মদেকবর্জ্যং কিমিদং ব্রতং তে ॥ ৬৪ ॥

শরণাগত ব্যক্তি একবার মাত্র "আমি তোমার" বলিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে সে তোমার দয়াপাত্র হইবে, এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর, এবং বল, ইহা কি আমা ভিন্ন অন্য সকলের প্রতি খাটিবে, তুমি এরূপ ব্রত করিয়াছ? ৬৪ ॥

অকৃত্রিমত্বচ্চরণারবিন্দ-
প্রেমপ্রকর্ষাবধিমাত্মবন্তম্।
পিতামহং নাথমুনিং বিলোক্য
প্রসীদ মদ্বৃত্তমচিন্তয়িত্বা ॥ ৬৫ ॥

তোমার শ্রীচরণারবিন্দে অকৃত্রিম, প্রকৃষ্ট প্রেমের যিনি অবধিস্বরূপ, সেই আত্মবান্ পিতামহ নাথমুনিকে অবলোকন করতঃ, আমার দুশ্চরিত্রের বিষয় কিছু মনে না করিয়া, প্রসন্ন হও ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীযামুনাচার্য্যবিরচিতং স্তোত্ররত্নং সম্পূর্ণম্ ॥

(ক্রমশঃ)

বৈজ্ঞানিক কথা।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ।] [৪৮৮ পৃষ্ঠার পর।

বর্ত্তমান সৌরবিপ্লবের আলোচনা হইতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিরত হইয়া দেখা যাউক যে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের ইতিহাসে ঐরূপ আর কতগুলি বিপ্লব লিপিবদ্ধ আছে। দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে হিপার্কস নামক গ্রীসদেশীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা রাত্রিকালে একটী "নূতন" নক্ষত্র দেখিতে পান। আকাশমার্গে যে স্থানে নক্ষত্রটী উদিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে সে স্থানে অন্য কোন নক্ষত্র দেখা যাইত না। যে স্থানে নক্ষত্রের অস্তিত্ব পূর্ব্বে অনুমিত হয় নাই, সে স্থানে একটি অজানিত নক্ষত্রের আবির্ভাব হইলে তাহাকে 'নূতন' বলিয়া পরিগণনা করা অসঙ্গত নহে এবং এ পর্য্যন্ত যতগুলি নক্ষত্র সহসা উদিত হইয়াছে, তাহাদিগকে 'নূতন' আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। হিপার্কস যে নক্ষত্রটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা এত উজ্জ্বল ছিল যে, দিবালোকে উহা স্পষ্ট দেখা যাইত। হিপার্কস 'নূতন' নক্ষত্রের তালিকা প্রথম প্রকাশ করেন। ফরাসী বৈজ্ঞানিক বিও (Biot) চীনদেশীয় ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় ১৩৪ বৎসর পূর্ব্বে বৃশ্চিক রাশিতে আবির্ভূত আর একটী নূতন নক্ষত্রের উল্লেখ দেখিয়াছেন।

১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর ডেন্মার্কদেশীয় বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ টিকো ব্রা (Tycho Brahe) তাঁহার বিজ্ঞানমন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে একদল লোককে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করেন। এইরূপে তিনি একটী 'নূতন' নক্ষত্রের আবিষ্কর্ত্তা হন। তিনি ইহার বিশেষ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা ক্যাসিওপিয়া রাশিতে (Constellation of Cassiopia) আবির্ভূত হয় ও প্রথমে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র অপেক্ষাও অধিক জ্যোতিঃসম্পন্ন ছিল এবং দিবাভাগেও দৃষ্ট হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহার আলোকবিকীরণশক্তি হ্রাস হইতে লাগিল এবং ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ইহা একেবারে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয়। সর্ব্ব প্রথমে নক্ষত্রটী উজ্জ্বল শুভ্ররশ্মি-বিশিষ্ট ছিল। আকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা পীত লোহিত ও পাংশুবর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়।

১৬০৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আর একটী 'নূতন' নক্ষত্র অফিউকস্ রাশিতে (Constellation of Ophiucus) সহসা উদিত হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ কেপ্লারের ব্রনাউস্কি নামক ছাত্রকর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হয়।

কেপ্‌লার বলেন যে, ধূমকেতুর ন্যায় পুচ্ছবিশিষ্ট না হওয়ায় ইহা একটী নক্ষত্র বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। টিকোর নক্ষত্রের ন্যায় ইহাও অসাধারণ জ্যোতি-সম্পন্ন ছিল। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহা একেবারে অদৃশ্য হয়। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে সিগ্‌নাস্‌ রাশিতে (Constellation of Cygnus) আর একটী 'নূতন' নক্ষত্র আবির্ভূত হয়। কিন্তু ইহার আলোকবিকীরণশক্তি পূর্ব্বোল্লিখিত নক্ষত্রসমূহের অপেক্ষা অনেকাংশে ক্ষীণ ছিল।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল একটী ক্ষুদ্রতর 'নূতন' নক্ষত্র ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা হাইণ্ড সাহেবের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে বার্মিংহাম্‌ সাহেব নর্দার্ণ ক্রাউন নামক রাশিতে (Constellation of Northern Crown) এক 'নূতন' নক্ষত্র দেখিতে পান। ইতিপূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্‌ পণ্ডিতগণ ঐ স্থানে কোন নক্ষত্রের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই। যে রাত্রিতে ইহা আবিষ্কৃত হয়, ঐ রাত্রিতে ১১ ঘটিকার সময় এথেন্স নগরের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্‌ ডাক্তার স্মিড নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণকালে ঐ স্থানে চতুর্থ শ্রেণীর নক্ষত্র ব্যতিরেকে অন্য কোন বৃহৎ নক্ষত্র দেখেন নাই।

১৩ই মে তারিখে সন্ধ্যাকালে ডাক্তার স্মিড এই নক্ষত্রটী দেখিতে পান। এই সময়ে ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌ হাগিন্স্‌ (Huggins) ও ডাক্তার মিলার আলোক-বিশ্লেষণযন্ত্রসাহায্যে (Spectroscope) নক্ষত্রসমূহের রাসায়নিক তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। বার্মিংহাম্‌ সাহেব তাঁহাদের নিকট এই অভিনব নক্ষত্রের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে তাঁহারা নবাবিষ্কৃত আলোকবিশ্লেষণযন্ত্রসংযুক্ত দূরবীক্ষণ (Telespectroscope) দ্বারা ইহার জড়তত্ত্ব নির্ণয় আরম্ভ করিলেন।

হাগিন্স ও মুলার সাহেব আলোকবিশ্লেষণযন্ত্রদ্বারা নর্দার্ণ ক্রাউনে উদিত 'নূতন নক্ষত্র' অবলোকনকালে রামধনুবর্ণে রঞ্জিত স্থানে কৃষ্ণবর্ণ রেখাসমূহের মধ্যে চারিটী উজ্জ্বল রেখা দেখিতে পাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শেষোক্তের মধ্যে তিনটী হাইড্রোজেন গ্যাসের আলোক হইতে উৎপন্ন। হাগিন্স সাহেব বলেন যে, কোন অজানিত কারণে নক্ষত্রস্থ হাইড্রোজেন গ্যাস অন্যান্য মূল পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া প্রজ্বলিত হয় এবং তত্রত্য কঠিন দ্রব্য সমূহকে এরূপ উত্তপ্ত করে যে, তাহারাও আলোক বিকীরণ করিতে থাকে। পূর্ব্বে যে সকল অভিনব নক্ষত্রের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে একটীও সম্পূর্ণরূপে নূতন নহে। বৈজ্ঞানিকগবেষণা দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে, চক্ষুর অগোচর কোন ক্ষুদ্র নক্ষত্রে সহসা জড়বিপ্লব উপ-

স্থিত হইলে তত্রত্য হাইড্রোজেন প্রভৃতি জড় পদার্থের উত্তাপ এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ আলোক বিকীরণ করে এবং এই জন্যই তখন ঐ নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিপথে নীত হয়। ক্রমে যখন হাইড্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস হইতে থাকে, তখন নক্ষত্রও ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে ও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক মেয়ার (Meyer) ও ক্লাইন (Klein) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আকাশমার্গে ভ্রাম্যমান কোন নক্ষত্রের উপর আকর্ষণ প্রভাবে কোন গ্রহ কিম্বা তৎসদৃশ বিশাল আয়তনবিশিষ্ট জড়রাশি পতিত হইলে উভয়ের প্রতিঘাতে যে উত্তাপ উৎপন্ন হইতে পারে, তদ্দ্বারা নক্ষত্রস্থিত হাইড্রোজেন গ্যাস প্রজ্বলিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সৌভাগ্যের বিষয়, লক্ষাধিক বর্ষের জন্য আমাদের সূর্য্যে এইরূপে বিপ্লবব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ, ঐ সময়ের মধ্যে কোন গ্রহের সহিত সূর্য্যের সঙ্ঘর্ষণের আশঙ্কা অল্প। মেয়ার ও ক্লাইনের মতের বিরুদ্ধে প্রক্টার (Proctor) বলেন যে, কোন গ্রহ হঠাৎ কোন সূর্য্যের উপর পতিত হইতে পারেনা।

জোলনার (Zollner) বলেন যে—সকল নক্ষত্র তাহাদের প্রথমাবস্থায় বিকীরণশক্তিবিহীন এক প্রকার শীতল আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। এই সময়ে সংসক্তিপ্রভাবে উপরিস্থিত মূলপদার্থসকল মিলিত হয়। কিন্তু মধ্যভাগস্থ উত্তপ্ত দ্রবরাশি আবরণ ভেদ করিলে উপরে যে রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাহার ফলে প্রচুর পরিমাণে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়। সুতরাং Zollner এর মতে অন্তর্ভাগস্থ উত্তপ্ত দ্রবরাশি ও কঠিন আবরণের মিলনই 'নূতন নক্ষত্রে'র আবির্ভাবের কারণ।

জন্সন্ ষ্টোনি সাহেবের মতে কোন অন্তর্বিপ্লব 'নূতন নক্ষত্রের' কারণ নহে। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, দুই নক্ষত্রের বায়বীয় আবরণের ঘর্ষণে তৎসংশ্লিষ্ট হাইড্রোজেন উত্তপ্ত হইয়া এরূপ আলোক বিতরণ করিবে যে, তাহার অস্তিত্ব কিয়ৎকালের জন্য আলোকবিশ্লেষণযন্ত্রে চারিটী উজ্জ্বল রেখা দ্বারা প্রমাণিত হইবে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উদিত 'নোভা সিগ্‌নাস' (Nova Cygnus) নামক নক্ষত্রের আলোচনা কালে অধ্যাপক ভোগেল (Vogel) কর্ত্তৃক জোলনারের (Zollner) মত সমর্থিত হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার লোস্ (Dr. Lohse) রাসায়নিক সংসক্তির প্রভাব অদৃশ্য নক্ষত্রের প্রজ্বলনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ বৎসর বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ নর্ম্মাণ লকিয়ার সাহেব তাঁহার মত

প্রকাশ কালে বলেন যে, 'নূতন নক্ষত্র' সমূহের আলোক পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে, তাহাদের সহিত উল্কাপিণ্ড ও 'ধূমকেতুর বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং উল্কাসমষ্টির সঙ্ঘর্ষণই অদৃশ্য নক্ষত্রের জ্বলনের কারণ।

কোন জ্যোতিষ্কের সহিত উল্কাসমষ্টির সঙ্ঘাত উপস্থিত হইলে যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হইতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ক্যারিংটন (Carrington) ও হজ্‌সন্ (Hodgson) দূরবীক্ষণ সাহায্যে সূর্য্যদর্শনকালে দুইটা অত্যুজ্জ্বল জড়রাশি সূর্য্যের উপর দিয়া যাইতে দেখিতে পান। অনেকেই বলেন, ইহারা উল্কাপিণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বভাবতঃ সূর্য্যের প্রতি আমরা অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারি না। সূর্য্যের আলোকবিকীরণশক্তি এত অধিক যে, গ্রহণদর্শনকালে কেহ কেহ ভূষা দ্বারা আবৃত কাচের সাহায্য লইয়া থাকেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহার আয়তন ও তৎসঙ্গে বিকীরণশক্তি এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, চক্ষু ঝলসিয়া যায়। ধূমবর্ণ কাচের দ্বারা দূরবীক্ষণের শেষভাগ আবৃত করিলে অনায়াসে সূর্য্য অবলোকন করা যাইতে পারে। সূর্য্যের সহিত সঙ্ঘর্ষণে উল্লিখিত জ্বলন্ত উল্কারাশি এরূপ উজ্জ্বল আলোক বিকীরণ করিতেছিল যে, ক্যারিংটন ভাবিলেন, তাঁহার দূরবীক্ষণের ধূমবর্ণের কাচ ফাটিয়া গিয়াছে। এই ঘটনা বর্ণনকালে হজ্‌সন বলেন যে, উল্কাদ্বয় কর্ত্তৃক আবৃত সূর্য্যাংশ অবশিষ্ট অংশ অপেক্ষা অধিক জ্যোতির্ম্ময় ছিল এবং অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। সূর্য্যের উপর এই দুই উল্কাপিণ্ডের পতনে পৃথিবীতে কি হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাউক। ঐ সময়ে পৃথিবীর চুম্বক শক্তি উত্তেজিত হইয়া সমস্ত ভূভাগ আলোড়িত করিয়াছিল। সমুজ্জ্বল কেন্দ্রীয় আলোক (Auroræ) মেরু ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহ উদ্ভাসিত করিয়াছিল। তাড়িত ও চুম্বকশক্তির আলোড়নে পৃথিবীস্থ যাবতীয় টেলিগ্রাফ অফিসের কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল। আমেরিকার অন্তর্গত ওয়াসিংটন ও ফিলাডেলফিয়ার টেলিগ্রাফ আফিসের সংবাদপ্রেরকগণ সংবাদপ্রেরণকালে তাড়িত শক্তির আধিক্যবশতঃ বিশেষরূপে আহত হয়। নরওয়ের কোন রেলষ্টেশনের টেলিগ্রাফ যন্ত্র সহসা দগ্ধ হয় এবং এবং উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বোষ্টন সহরে বেন্ সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একটী টেলিগ্রাফ যন্ত্র হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হয়। যদি কেবল দুইটী উল্কার সূর্য্যমণ্ডলে পতনে পৃথিবীতে এত অনিষ্ট

ঘটিতে পারে, তাহা হইলে বহুসংখ্যক উল্কা সূর্য্যোপরি পতিত হইলে যে কি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, আমাদের সৌরজগতে এরূপ প্রলয়কাণ্ডের সংঘটন সম্ভব নহে।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ডাক্তার আণ্ডার্সন সাহেব একটী "নূতন নক্ষত্র" দেখিতে পান। বর্ত্তমান বর্ষে পার্সেউস্ মণ্ডলে যে নক্ষত্র উদিত হইয়াছে, এই আণ্ডার্সন সাহেব তাহারও আবিষ্কর্ত্তা। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা এই দুইটী নক্ষত্র হইতে অনেক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'নূতন নক্ষত্রে'র পর্য্যালোচনা এখন জ্যোতিষ শাস্ত্রের এক বিশেষ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত।

সার লেপেল গ্রিফিন ও হিন্দুধর্ম্ম।

সার লেপেল গ্রিফিন সম্প্রতি এক সভায় সভাপতি হইয়া অন্যান্য কথার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন।—হিন্দুধর্ম্ম একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম, উহার নীতিও অতি উচ্চ। যখন আমার ভারতবাসের কথা এবং তত্রত্য সর্ব্বসম্প্রদায়ের দেশীয় ব্যক্তিগণের ভিতর সহস্র সহস্র বন্ধুবর্গের কথা আমার মানসপথে উদয় হয়, যখন আমি সেই আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন, পরিশ্রমী, সুশৃঙ্খল, আইনের মর্যাদারক্ষক, মদ্যপানে অনাসক্ত, মনুষ্যোচিতগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিষয় চিন্তা করি, তখন আমার মনে সন্দেহ হয়, খ্রীষ্টধর্ম্মে এমন কিছু আছে কি না, যাহা ভারতীয় ব্যক্তিগণকে অধিকতর নীতিপরায়ণ করিতে পারে। আমি ত লণ্ডনের কোথাও ভারতবাসীদের ন্যায় নীতিপরায়ণ লোক দেখিতে পাই না। আমার বিবেচনায় ভারতীয় নীতি পশ্চিম ইউরোপের যে কোন দেশের নীতির সহিত সমকক্ষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে।

সমালোচনা।

পীঢ়াঁদরপীঢ়াঁ বা নবাবিষ্কৃত ভারতের ইতিহাস।—পুঁথির আবিষ্কারক ও তাহার বঙ্গানুবাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল। ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তকের একটী ভূমিকা লিখিয়াছেন। সেই ভূমিকার কতকাংশ উদ্ধৃত হইল। তাহাতেই এই গ্রন্থের পরিচয় পাঠকবর্গ পাইবেন।

"পীঢ়াঁদর পীঢ়াঁ"র অর্থ পুরুষানুক্রমিক ইতিবৃত্ত বা বংশাবলী। * * *

ইহাতে দিল্লীর রাজবংশাবলী এবং সেই সঙ্গে প্রধান প্রধান ঘটনাবলীও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই ইতিহাসটী আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মূল্য অল্প নহে। * * আধুনিক ইতিহাসের অনুসরণে লিখিত নয় বলিয়াই বর্ত্তমান প্রচলিত ইতিহাসলিখিত আখ্যান ও ঘটনাবলীর সহিত এতল্লিখিত অনেক আখ্যান ও ঘটনাবলীর অনেক স্থলে মিল নাই। * * * গ্রন্থকার দিল্লীর বা ইন্দ্র প্রস্থের ইতিহাস লিখিতে গিয়া মূল দেবরাজ ইন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই হিন্দুরীতানুসারে 'গণেশায় নমঃ' লিখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাতে গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় নাই। ইহাতে ইন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লীর মুসলমান সম্রাট শাহ আলম পর্য্যন্ত বিবরণ সংক্ষেপে আছে। * * ধুন্ধার রাজ্যের অন্তর্গত 'সবাই' জয়পুর সদৃশ সবাই মাধোপুর নামক এক নগর আছে। তত্রত্য জনৈক বৃদ্ধহিন্দুর নিকট কতকগুলি জীর্ণ পুঁথি" হইতে বাবু নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই পুঁথিখানি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পুঁথিটী ঝাড়সাহী বা জয়পুরী হিন্দী ভাষায় ও দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত ছিল। তাহা হইতে নগেন্দ্র বাবু বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে মূলগ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে ও তাহার অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মুসলমান বাদশাহদিগের কতকগুলি সুন্দর চিত্রও ইহাতে আছে। হিন্দুরা ইতিহাস লিখিতে একেবারে ঔদাস্য করিত, এই সংস্কার এই পুস্তকদৃষ্টে অনেকের দূর হইবে। আশা করি, ইতিহাসতত্ত্বানুসন্ধিৎসু সকলেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির আদর করিবেন।

আমিষ ও নিরামিষ আহার। প্রথম খণ্ড।—শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত। এই গ্রন্থেও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত একটী দীর্ঘ ভূমিকা আছে। ঋতেন্দ্র বাবু নানা প্রমাণ প্রয়োগে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালের যজ্ঞ হইতেই প্রথম খাদ্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী উৎপন্ন হইয়া ক্রমে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে। ইহাঁর মতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনটী যুগ বা স্তর আছে যথা, দেবযুগ ঋষিযুগ ও পিতৃযুগ। ইহাঁর মতে এই দেব বা পিতৃগণ কোন অলৌকিক পুরুষ নহেন—ইহাঁরা দেব বা পিতৃউপাধিকারী মনুষ্যবিশেষ। বিভিন্ন সময়ে এই সকল মহাপুরুষগণ নানা দ্রব্য ও ওষধি যজ্ঞচ্ছলে পরীক্ষা করিয়া অনেক নূতনবিধ খাদ্য ও ঔষধের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ভূমিকাটী খুব গবেষণাপূর্ণ ও

চিন্তাশীল মনের পরিচায়ক। সকলে ইহাঁর মতের সহিত একমত হইতে না পারিলেও নূতন চিন্তার অনেক উপকরণ পাইবেন।

মূলগ্রন্থের প্রথম ভাগে নিরামিষ আহারের মধ্যে কতকগুলি প্রস্তুতের প্রণালী লিখিত হইয়াছে। নানাপ্রকার, ভাত, নিরামিষ পোলাও, ভাতে, পোড়া, ভাজা, বড়ি, চচ্চড়ি, ছেঁচ্‌কি ও ঘণ্ট প্রস্তুত করিবার উপায় বেশ সুপ্রণালীক্রমে সাজাইয়া লিখা হইয়াছে। আর আয়ুর্ব্বেদমতে বা ডাক্তারীমতে প্রত্যেক জিনিষের গুণাগুণ লিখা থাকাতে পুস্তকখানি আরো অধিক শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে।

যাঁহারা রন্ধনের ক খ পর্য্যন্ত জানেন না, তাঁহারাও এই পুস্তক খানির সাহায্যে নানাবিধ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্যপ্রস্তুত করিয়া আপনাকে ও অপরকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন। গ্রন্থখানির বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে উল্লিখিত খাদ্যগুলি শুধু বড় মানুষের উপযোগী নহে, অনেকগুলি সামান্য গৃহস্থেও অতি স্বল্পব্যয়ে প্রস্তুত করিতে পারেন।

বঙ্গমঙ্গল।—জাতীয় ভাব উদ্দীপনাপূর্ণ ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক। কবিতা কয়েকটী অতি সুন্দর—কবির আন্তরিকতা আছে। জন্মভূমিকে মা জানিয়া পূজা করিতে কবি জানেন। আশা করি, এই পুস্তকখানি পাঠে প্রত্যেক বঙ্গ-সন্তানের মাতৃভূমির উন্নতির জন্য স্বার্থকে বলি দিতে প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠিবে।

চণ্ডীরাম (ধর্ম্মমূলক নাটক)।—শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ভারত-সঙ্গীতসমিতি হইতে প্রকাশিত।

আজকাল অভিনয়দর্শকগণের রুচি অনেকটা বিকৃতপথে চলিয়াছে বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। এই সময়ে এই ধর্ম্মমূলক নাটকখানিকে সাধারণে উৎসাহ দেওয়াতে তাঁহাদের সে সংস্কার দূর হইবে। সাধারণের সমক্ষে নূতন নূতন ধর্ম্মমূলক নাটক উপস্থিত করিতে পারিলে, সাধারণে যে উপেক্ষা করিবেন, তাহা বোধ হয় না। এই গ্রন্থখানিতে গিরীশ বাবুর নসীরামের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রচয়িতা সম্পূর্ণ সফলকাম হইয়া না থাকিলেও উদ্যম যে খুব প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। চণ্ডীরামের গীত-গুলি অভিনয়কালে সাধারণের মনপ্রাণ দ্রব করিয়া থাকে।

মতানুসারে কোন মত তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে বল, তবে বর্ত্তমান কালের লোকে উহা বিশ্বাস্ করিতে পারিবেন না, তাহার ফল দাঁড়াইবে,—ঘোর অবিশ্বাস। যাঁহারা বাহিরে দেখিতে খুব বিশ্বাসী, তাঁহারা বাস্তবিক ভিতরে ঘোর অবিশ্বাসী দেখা যায়। অবশিষ্ট লোকে ধর্ম্ম একেবারে ছাড়িয়া দেয়, উহা হইতে দূরে পলাইয়া যায়, যেন উহার সহিত কোন সম্পর্কই রাখিতে চায় না, উহাকে পুরোহিতদের জুয়াচুরা মনে করে।

ধর্ম্ম এক্ষণে জাতীয়ভাবে পরিণত হইয়াছে। উহা আমাদের প্রাচীন সমাজের একটী মহৎ অবশিষ্ট; উহাকে থাকিতে দাও। কিন্তু আধুনিক লোকের পূর্ব্বপুরুষ উহার জন্য যে প্রকৃত আগ্রহ বোধ করিতেন, এক্ষণে তাহা চলিয়া গিয়াছে; তাঁহার যুক্তিতে উহা মেলে না। এইরূপ সগুণ ঈশ্বর ও সৃষ্টির ধারণা, যাহাকে সচরাচর সকল ধর্ম্মেই একেশ্বরবাদ বলে, তাহাতে এখন লোকের প্রাণ তৃপ্ত হয় না। আর ভারতে বৌদ্ধদের প্রভাবে উহা প্রবল হইতে পায় নাই, আর এই বিষয়েই বৌদ্ধেরা প্রাচীনকালে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহা দেখাইয়া দিলেন, যদি প্রকৃতিকে অনন্তশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মানা যায়, যদি প্রকৃতি উহার নিজ অভাব আপনিই পূরণ করিতে পারে, তবে প্রকৃতির অতীত কিছু আছে, ইহা স্বীকার করা অনাবশ্যক। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই একটী তর্ক বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। এখনও সেই প্রাচীন কুসংস্কার জীবিত রহিয়াছে—দ্রব্য ও গুণের বিচার।

ইউরোপে মধ্য যুগে, এমন কি, দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, তাহার অনেক দিন পর পর্য্যন্তও এই একটী বিশেষ বিচারের বিষয় ছিল যে, গুণ দ্রব্যে লাগিয়া আছে, না, দ্রব্য গুণে লাগিয়া আছে? দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ কি জড়পদার্থনামক দ্রব্যবিশেষে লাগিয়া আছে আর এই গুণগুলি না থাকিলেও দ্রব্যটীর অস্তিত্ব থাকে কি না? এক্ষণে বৌদ্ধ আসিয়া বলিতেছেন, এরূপ একটী দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, এই গুণ গুলিরই কেবল অস্তিত্ব আছে। উহার অতিরিক্ত তুমি আর কিছু দেখিতে পাও না আর ইহাই আধুনিক অধিকাংশ অজ্ঞেয়বাদীর মত, কারণ, এই দ্রব্যগুণের বিচার আর একটু উচ্চভূমিতে লইয়া গেলে দেখা যায়, উহা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্তার বিচার। এই দৃশ্য জগৎ—নিত্যপরিণামশীল জগৎ রহিয়াছে আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছুও রহিয়াছে, যাহার কখন পরিণাম

হয় না, আর কেহ কেহ বলেন, এই দ্বিবিধ পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আবার অনেকে অধিকতর যুক্তির সহিত বলেন, আমাদের এই উভয় পদার্থ মানিবার কোন আবশ্যক নাই, কারণ, আমরা যাহা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, তাহা কেবল দৃশ্যপদার্থ মাত্র। দৃশ্যের অতিরিক্ত কোন পদার্থ মানিবার তোমার কোন অধিকার নাই। এই কথার কোন সঙ্গত উত্তর প্রাচীনকালে কেহ দিতে পারেন নাই। কেবল আমরা বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হইতে ইহার উত্তর পাইয়া থাকি—এক বস্তুরই কেবল অস্তিত্ব আছে, তাহাই কখন দ্রষ্টা কখন বা দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সত্য নহে যে, পরিণামশীল বস্তুর সত্তা আছে, আর তাহারই অভ্যন্তরে—অপরিণামী বস্তুও রহিয়াছে, কিন্তু সেই এক বস্তুই পরিণামশীল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহা অপরিণামী।

বুঝিবার উপযুক্ত একটী দার্শনিক ধারণা করিবার জন্য আমরা দেহ, মন, আত্মা প্রভৃতি নানা ভেদ করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক সত্তাই বিরাজিত। সেই এক বস্তুই নানারূপে প্রতিভাত হইতেছে। অদ্বৈতবাদীদের চিরপরিচিত উপমা অনুসারে বলিতে গেলে বলিতে হয়, রজ্জুই সর্পাকারে প্রতিভাত হইতেছে। অন্ধকারবশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে অনেকে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে সর্পভ্রম ঘুচিয়া যায়, আর উহাকে রজ্জু বলিয়া বোধ হয়। এই উদাহরণের দ্বারা আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, মনে যখন সর্পজ্ঞান থাকে, তখন রজ্জুজ্ঞান চলিয়া যায়, আবার যখন রজ্জুজ্ঞানের উদয় হয়, তখন সর্পজ্ঞান চলিয়া যায়। যখন আমরা ব্যবহারিক সত্তা দেখি, তখন পারমার্থিক সত্তা থাকে না, আবার যখন আমরা সেই অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা দেখি, তখন অবশ্যই ব্যবহারিক সত্তা আর প্রতিভাত হইবে না। এক্ষণে আমরা প্রত্যক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাদী (Idealist) উভয়েরই মত বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছি। প্রত্যক্ষবাদী কেবল ব্যবহারিক সত্তা দেখেন আর বিজ্ঞানবাদী পারমার্থিক সত্তার দিকে দেখিতে চেষ্টা করেন। প্রকৃত বিজ্ঞানবাদী, যিনি অপরিণামী সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পরিণামশীল জগৎ আর থাকে না; তাঁহারই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে, জগৎ সমস্তই মিথ্যা, পরিণাম বলিয়া কিছুই নাই। প্রত্যক্ষবাদী কিন্তু পরিণামের দিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষে অপরিণামী সত্তা উড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং তাঁহার জগৎ সত্য বলিবার অধিকার আছে।

এই বিচারের ফল কি হইল? ফল এই হইল, ঈশ্বরের সগুণ ধারণাই পর্য্যাপ্ত নহে। আমাদিগকে আরো উচ্চতর ধারণা করিতে হইবে অর্থাৎ নির্গুণের ধারণা চাই। উহা দ্বারা যে সগুণ ধারণা নষ্ট হইবে, তাহা নহে। আমরা সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই, ইহা প্রমাণ করিলাম না, কিন্তু আমরা দেখাইলাম যে, যাহা আমরা প্রমাণ করিলাম, তাহাই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। মানুষকেও আমরা এইরূপে সগুণ নির্গুণ উভয়াত্মক বলিয়া থাকি। আমরা সগুণও বটি, আবার নির্গুণও বটি। অতএব আমাদের প্রাচীন ঈশ্বর-ধারণা অর্থাৎ ঈশ্বরের সগুণ ধারণা, তাঁহাকে কেবল একটী ব্যক্তি বলিয়া ধারণা, অবশ্যই চলিয়া যাওয়া চাই, কারণ, মানুষ যে ভাবে সগুণ নির্গুণ উভয়ই বলা যায়, আর একটু উচ্চ দিকে লইয়া গিয়া ঈশ্বরকেও সেইভাবে সগুণ নির্গুণ উভয়ই বলা যায়। অতএব সগুণের ব্যাখ্যা করিতে হইলে অবশ্যই অবশেষে আমাদিগকে নির্গুণ ধারণায় যাইতে হইবে, কারণ নির্গুণ ধারণা সগুণ ধারণা হইতে উচ্চতর ভাবে সমাধান। অনন্ত কেবল নির্গুণই হইতে পারে, সগুণ কেবল সান্তমাত্র। অতএব এই ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা সগুণের রক্ষা করিলাম, উহাকে উড়াইয়া দিলাম না। অনেক সময়ে এই সংশয় আইসে, নির্গুণ ঈশ্বরের ধারণায় সগুণ ধারণা নষ্ট হইয়া যাইবে, নির্গুণ জীবাত্মার ধারণায় সগুণ জীবাত্মার ভাব নষ্ট হইয়া যাইবে, বাস্তবিক কিন্তু উহাতে 'আমিত্বে'র নাশ না হইয়া প্রকৃত রক্ষা হইয়া থাকে। আমরা সেই অনন্ত সত্তায় সমাধান না করিয়া ব্যক্তিকে কোন রূপে প্রমাণ করিতে পারি না। যদি আমরা ব্যক্তিকে সমুদয় জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করি, তবে কখনই তাহাতে সমর্থ হইব না, ক্ষণকালের জন্যও ওরূপ ভাবা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় তত্ত্বের আলোকে আমরা আরো কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বে উপনীত হই। যদি সকল বস্তুকে তাহার স্বরূপ হইতে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে, সেই নির্গুণ পুরুষ—সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ায় আমরা যে সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বে উপনীত হইয়াছি, তাহা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে আমরা তাহাই। 'হে শ্বেতকেতো, তত্ত্বমসি'—তুমি তাহাই, তুমিই সেই নির্গুণ পুরুষ, তুমিই সেই ব্রহ্ম যাঁহাকে তুমি সমুদয় জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, তাহা সর্ব্বদাই তুমি স্বয়ং। 'তুমি' কিন্তু 'ব্যক্তি' অর্থে নহে, নির্গুণ অর্থে। আমরা এই যে মানুষকে জানিতেছি, যাঁহাকে ব্যক্ত দেখিতেছি, তিনি বাস্তবিক সগুণ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত সত্তা নির্গুণ। এই

সগুণকে জানিতে হইলে আমাদিগকে নির্গুণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে, বিশেষকে জানিতে হইলে সাধারণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। সেই নির্গুণ সত্তাই বাস্তবিক সত্য, তিনিই মানুষের আত্মাস্বরূপ—এই সগুণ ব্যক্ত পুরুষকে সত্য বলা হয় নাই।

এ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠিবে। আমি ক্রমশঃ সেই গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। অনেক কূট উঠিবে, কিন্তু উহাদের মীমাংসার পূর্ব্বে আমরা অদ্বৈতবাদ কি বলেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি আইস। অদ্বৈতবাদ বলেন, এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি, ইহারই একমাত্র অস্তিত্ব আছে, অন্যত্র সত্যের অন্বেষণ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। স্থূলসূক্ষ্ম সবই এখানে; কার্য্যকারণ সবই এখানে—জগতের ব্যাখ্যা এখানেই রহিয়াছে। যাহা বিশেষ বলিয়া পরিচিত, তাহা সেই সর্ব্বানুস্যূত সত্তারই সূক্ষ্ম ভাবে পুনরাবৃত্তিমাত্র। আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াই জগৎসম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া থাকি। এই অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে যাহা সত্য, বাহির্জ্জগৎসম্বন্ধেও তাহাই সত্য। স্বর্গনরক বলিয়া বাস্তবিক যদি কোন স্থান থাকে, তাহারাও এই জগতের অন্তর্গত, সমুদয় মিলিয়াই এই এক ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। অতএব প্রথম কথা এই, নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টি স্বরূপ এই 'এক' রহিয়াছে আর আমাদের প্রত্যেকেই যেন সেই একের অংশস্বরূপ। ব্যক্তজীবভাবে আমরা যেন পৃথক্ হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু সেই একই সত্যস্বরূপ, আর যতই আমরা আপনাদিগকে উহা হইতে কম পৃথক্ মনে করিব, আমাদের পক্ষে তত মঙ্গল। আর যতই আমরা ঐ সমষ্টি হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ মনে করিব, ততই আমাদের কষ্ট আসিবে। এই তত্ত্ব হইতে আমরা অদ্বৈতবাদসঙ্গত নীতিতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলাম আর আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, আর কোনমত হইতে আমরা কোনরূপ নীতিতত্ত্বই প্রাপ্ত হই না। আমরা জানি, নীতির প্রাচীনতম ধারণা ছিল—কোন পুরুষবিশেষ অথবা কতকগুলি পুরুষবিশেষের খেয়াল যাহা,তাহাই কর্ত্তব্য। এখন আর কেহ উহা মানিতে প্রস্তুত নহে; কারণ, উহা আংশিক ব্যাখ্যামাত্র। হিন্দুরা বলেন, এই কার্য্য করা উচিত নয়, কারণ, বেদ উহা নিষেধ করিতেছেন,কিন্তু খ্রীশ্চিয়ান বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। খ্রীশ্চিয়ান আবার বলেন, এ কায করিও না, ও কায করিও না, কারণ বাইবেলে ঐ সকল কার্য্য করিতে নিষেধ আছে। যারা বাইবেল মানে না, তারা অবশ্য এ কথা শুনিবে না। আমাদিগকে এমন এক তত্ত্ব বাহির করিতে

হইবে, যাহা এই নানাবিধ বিভিন্ন ভাবের সমন্বয় করিতে পারে। যেমন লক্ষ লক্ষ লোক সগুণ সৃষ্টিকর্ত্তায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, সেইরূপ এই জগতে সহস্র সহস্র মনীষী আছেন, যাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল ধারণা পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা উহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু প্রার্থনা করেন; আর যখনই ধর্ম্মসম্প্রদায় এই সকল মনীষীগণকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিবার উপযোগী উদারভাবাপন্ন হয় নাই, তখনই ফল এই হইয়াছে যে, সমাজের উজ্জ্বলতম রত্নগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর বর্ত্তমানকালে প্রধানতঃ ইউরোপ খণ্ডে ইহা যত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আর কখনও এরূপ হয় নাই।

ইহঁাদিগকে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতর রাখিতে হইলে অবশ্য উহা খুব উদার-ভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্ম যাহা কিছু বলে, সমুদয় যুক্তির কষ্টিতে ফেলিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। সকল ধর্ম্মেই কেন যে এই এক দাবী করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা যুক্তির দ্বারা পরীক্ষিত হইতে চান না, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বাস্তবিক ইহার কারণ এই যে, গোড়াতেই গলদ আছে। যুক্তির মানদণ্ড ব্যতীত, ধর্ম্ম বিষয়েও কোনরূপ বিচার বা সিদ্ধান্ত সম্ভব নহে। কোন ধর্ম্ম হয়ত কিছু বীভৎস ব্যাপার করিতে আজ্ঞা দিল। * * * * * * মনে কর, মুসলমান ধর্ম্মের কোন আদেশের উপর একজন খ্রীশ্চিয়ান কোন এক দোষারোপ করিল। তাহাতে মুসলমান স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করিবেন, 'কি করিয়া তুমি জানিলে উহা ভাল কি মন্দ? তোমার ভালমন্দের ধারণা ত তোমার শাস্ত্র হইতে। আমার শাস্ত্র বলিতেছে, ইহা সৎকার্য্য।' যদি তুমি বল, তোমার শাস্ত্র প্রাচীন, তাহা হইলে বৌদ্ধেরা বলিবেন, আমাদের শাস্ত্র তোমাদের অপেক্ষা প্রাচীন। আবার হিন্দু বলিবেন, আমার শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অতএব শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না। তোমার আদর্শ কোথায়, যাহাকে লইয়া তুমি সমুদয় তুলনা করিতে পার? খ্রীশ্চয়ান বলিবেন, ঈশার 'পর্ব্বতের উপর হইতে প্রদত্ত উপদেশাবলি' দেখ, মুসলমান বলিবেন, কোরাণের নীতি দেখ। মুসলমান বলিবেন, এ দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা কে বিচার করিবে, মধ্যস্থ কে হইবে? বাইবেল ও কোরাণে যখন বিবাদ, তখন উভয়ের মধ্যে কেহই মধ্যস্থ হইতে পারেন না। কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি উহার মীমাংসক হইলেই ভাল হয়। উহা কোন গ্রন্থ হইতে পারে না, কিন্তু সার্ব্বভৌমিক কোন পদার্থ এই মীমাংসক হওয়া আবশ্যক। যুক্তি হইতে সার্ব্বভৌমিক আর কি আছে? কথিত হইয়া থাকে, যুক্তি সকল সময়ে সত্যানু-

সন্ধানে ক্ষমবান নহে। অনেক সময় উহা ভুল করে বলিয়া এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, কোন পুরোহিতসম্প্রদায়ের শাসনে বিশ্বাস করিতে হইবে। * * আমি কিন্তু বলি, যদি যুক্তি দুর্ব্বল হয়, তবে পুরোহিতসম্প্রদায় আরো অধিক দুর্ব্বল হইবেন; আমি তাঁহাদের কথা না শুনিয়া যুক্তি শুনিব, কারণ, যুক্তিতে যতই দোষ থাকুক, উহাতে কিছু সত্য পাইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অপর উপায়ে কোন সত্য লাভেরই সম্ভাবনা নাই।

অতএব আমাদিগকে যুক্তির অনুসরণ করিতে হইবে, আর যাহারা যুক্তির অনুসরণ করিয়া কোন বিশ্বাসেই উপনীত হয় না, তাহাদিগের সহিতও আমাদিগকে সহানুভূতি করিতে হইবে। কারণ কাহারও মতে মত দিয়া বিশলক্ষ দেবতা বিশ্বাস করা হইতে যুক্তির অনুসরণ করিয়া নাস্তিক হওয়াও ভাল! আমরা চাই উন্নতি, বিকাশ, প্রত্যক্ষানুভূতি। কোন মত অবলম্বন করিয়াই মানুষ শ্রেষ্ঠ হয় নাই। কোটি কোটি শাস্ত্রও আমাদিগকে পবিত্রতর হইতে সাহায্য করে না। ঐরূপ হইবার একমাত্র শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে। প্রত্যক্ষানুভূতিই আমাদিগকে পবিত্র হইতে সাহায্য করে আর ঐ প্রত্যক্ষানুভূতি মননের ফলস্বরূপ। মানুষ চিন্তা করুক। মৃত্তিকাখণ্ড কখন চিন্তা করে না। ইহা তুমি মানিয়াই লইতে পার যে, উহা সমুদয় বিশ্বাস করে, তথাপি উহা মৃত্তিকাখণ্ডমাত্র। একটী গাভীকে যাহা ইচ্ছা বিশ্বাস করান যাইতে পারে। কুকুর সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তাহীন জন্তু। ইহারা কিন্তু যে কুকুর, যে গাভী, যে মৃত্তিকাখণ্ড, তাহাই থাকে, কিছুই উন্নতি করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব মননশীল জীব বলিয়া। পশুদিগের সহিত আমাদের ইহাই প্রভেদ। মানুষের এই মনন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম অতএব আমাদিগকে অবশ্য মনের চালনা করিতে হইবে। এই জন্যই আমি যুক্তিতে বিশ্বাস করি এবং যুক্তির অনুসরণ করি; আমি শুধু লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া কি অনর্থ হয়, তাহা বিশেষরূপে দেখিয়াছি, কারণ, আমি যে দেশে জন্মিয়াছি, সেখানে এই অপরের বাক্যে বিশ্বাসের চূড়ান্ত করিয়াছে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, বেদ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। একটী গো আছে, কিরূপে জানিলে? কারণ, 'গো' শব্দ বেদে রহিয়াছে। মানুষ আছে, কি করিয়া জানিলে? কারণ, বেদে 'মনুষ্য' শব্দ রহিয়াছে। হিন্দুরা ইহাই বলেন। এ যে বিশ্বাসের চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। আর আমি যে ভাবে ইহার আলোচনা করিতেছি, সে ভাবে ইহার আলোচনা হয় না। কতকগুলি

তীক্ষ্ণবুদ্ধিব্যক্তি ইহা লইয়া কতকগুলি অপূর্ব্ব দার্শনিক তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন আর সহস্র সহস্র বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহস্র সহস্র বৎসর এই মতান্দোলনে কাল ক্ষেপণ করিয়াছেন। লোকের কথায় যুক্তিশূন্য বিশ্বাসের এতদূর শক্তি, উহাতে বিপদ্ও এত। উহা মনুষ্যজাতির উন্নতির স্রোত অবরুদ্ধ করে,—আর আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আমাদের উন্নতিই আবশ্যক। সমুদয় আপেক্ষিক সত্যানুসন্ধানেও সত্যটী অপেক্ষা আমাদের মনের চালনাই বেশী আবশ্যক হইয়া থাকে। এই মননই আমাদের জীবন।

অদ্বৈতবাদের এই টুকু গুণ যে, ধর্ম্মমতের ভিতর এই মতটীই অনেকটা নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণের যোগ্য। নির্গুণ ঈশ্বর, প্রকৃতিতে তাঁহার অবস্থিতি আর প্রকৃতি যে সেই নির্গুণ পুরুষের পরিণাম, এই সত্যগুলি অনেকটা প্রমাণের যোগ্য আর অন্য সমুদয় আংশিক ও সগুণ ঈশ্বরধারণার কোনটীই বিচারসহ নহে। ইহার আর একটী গুণ এই যে, এই যুক্তিসঙ্গত ঈশ্বরবাদ ইহাই প্রমাণ করে যে, এই আংশিক ধারণাগুলিও এখনও অনেকের পক্ষে আবশ্যক। এই মতগুলির অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ইহাই একমাত্র যুক্তি। দেখিবে, অনেক লোকে বলিয়া থাকে, এই সগুণবাদ অযৌক্তিক, কিন্তু ইহা বড় শান্তিপ্রদ। তাহারা সকের ধর্ম্ম চাহিয়া থাকে, আর আমরা বুঝিতে পারি, তাদের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। অতি অল্প লোকেই সত্যের বিমল আলোক সহ্য করিতে পারে, তদনুসারে জীবনযাপন করা ত দূরের কথা। অতএব এই সকের ধর্ম্মও থাকা দরকার; সময়ে ইহা অনেককে উচ্চতরধর্ম্মলাভে সাহায্য করে। যে ক্ষুদ্র মনের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য বস্তুই যে মনের উপাদান, সে মন কখন উচ্চ চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিতে সাহস করে না। তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা, প্রতিমা ও আদর্শের ধারণা উত্তম ও উপকারী, কিন্তু তোমাদিগকে নির্গুণবাদও বুঝিতে হইবে, আর এই নির্গুণবাদের আলোকেই এইগুলির উপকারিতা প্রতীত হইতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের কথা ধর। তিনি ঈশ্বরের নির্গুণ ভাব বুঝেন ও বিশ্বাস করেন—তিনি বলেন, সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। আমি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত, তবে আমি বলি, মনুষ্যবুদ্ধিতে নির্গুণের যতদূর ধারণা করা যাইতে পারে, তাহাই সগুণ ঈশ্বর। আর বাস্তবিক পক্ষে জগৎ কি? বিভিন্ন মন সেই নির্গুণেরই যতদূর ধারণা করিতে

পারে, তাহাই ; উহা যেন আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত একখানি পুস্তকস্বরূপ, আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা উহা পাঠ করিতেছে আর প্রত্যেককেই উহা নিজে নিজে পাঠ করিতে হয়। সকল মানুষেরই বুদ্ধি কতকটা সদৃশ, সেই জন্য মনুষ্যবুদ্ধিতে কতকগুলি জিনিষ একরূপ বলিয়া প্রতীত হয়। তুমি আমি উভয়েই একখানি চেয়ার দেখিতেছি। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের উভয়ের মনই কতকটা একভাবে গঠিত। মনে কর, অপর কোনরূপ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীব আসিল ; সে আর আমাদের অনুভূত চেয়ার দেখিবে না, কিন্তু যাহারা সমপ্রকৃতিক, তাহারা সব একরূপ দেখিবে। অতএব এই জগৎই সেই নিরপেক্ষ অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা আর ব্যবহারিক সত্তা তাহাকেই বিভিন্নভাবে দর্শনমাত্র। ইহার কারণ, প্রথমতঃ ব্যবহারিক সত্তা সর্ব্বদাই সসীম। আমরা যে কোন ব্যবহারিক সত্তা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, আমরা দেখিতে পাই, উহা অবশ্যই আমাদের জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ অতএব সসীম হইয়া থাকে আর সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা, তাহাতে তিনিও ব্যবহারিকমাত্র। কার্য্যকারণভাব কেবল ব্যবহারিক জগতেই সম্ভব আর তাঁহাকে যখন জগতের কারণ বলিয়া ভাবিতেছি, তখন অবশ্য তাঁহাকে সসীমরূপে ধারণা করিতেই হইবে। তাহা হইলেও কিন্তু তিনি সেই নিগুর্ণ ব্রহ্ম। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, এই জগৎও সেই নিগুর্ণ ব্রহ্মমাত্র, যেমন আমাদের বুদ্ধির নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে জগৎ সেই নিগুর্ণ পুরুষমাত্র আর আমাদের বুদ্ধিদ্বারা উহার উপর নামরূপ দেওয়া হইয়াছে। এই টেবিলের মধ্যে যতটুকু সত্য তাহা সেই পুরুষ আর এই টেবিল আকৃতি আর অন্যান্য যাহা কিছু, সবই সদৃশ মানববুদ্ধি দ্বারা তাঁহার উপর প্রদত্ত হইয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ গতির বিষয় ধর। ব্যবহারিক সত্তার উহা নিত্যসহচর। উহা কিন্তু সেই সার্ব্বভৌমিক পারমার্থিক সত্তাসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র অণু, জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন ও গতিশীল কিন্তু সমষ্টি হিসাবে জগৎ অপরিণামী, কারণ, গতি বা পরিণাম আপেক্ষিক পদার্থমাত্র। আমরা কেবল গতিহীন পদার্থের সহিত তুলনায় গতিশীল পদার্থের কথা ভাবিতে পারি। গতি বুঝিতে গেলেই দুইটী পদার্থের আবশ্যক। সমুদায় সমষ্টিজগৎ একত্বস্বরূপ, উহার গতি অসম্ভব। কাহার সহিত তুলনায় উহার গতি হইবে? উহার পরিণাম হয়, তাহাও বলিতে

বার্ত্তিকমূল।—লিঙ্গেন বা। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা সংজ্ঞাবোধক চিহ্নবিশেষের দ্বারা জানা যাইবে যে, এইটী সংজ্ঞা। *

ভাষ্যমূল।—অথবা কিঞ্চিল্লিঙ্গমাসজ্য বক্ষ্যামীত্থংলিঙ্গা সংজ্ঞেতি। বৃদ্ধিঃ শব্দে চ তল্লিঙ্গং করিষ্যতে নাদৈচ্‌শব্দে। ইদং তাবদযুক্তং যদুচ্যতে আচার্য্যাচারাদিতি। কিমত্রাযুক্তম্। তমেবোপালভ্যাগমকং তে সূত্রমিতি তস্যৈব পুনঃ প্রমাণীকরণমিত্যেতদযুক্তম্। অপরিতুষ্যন্ খল্বপি ভবাননেন পরিহারেণানেনাকৃতির্লিঙ্গেনবেত্যাহ। তচ্চাপি বক্তব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা কিছু লিঙ্গ (চিহ্ন) সংলগ্ন করিয়া বলিব যে, এইরূপ চিহ্নসূচক সংজ্ঞা আর সেই চিহ্নটি 'বৃদ্ধি' শব্দে করা হইবে; কিন্তু আদৈচ্ শব্দে করা হইবে না। ('বৃদ্ধি' শব্দে, ক্'বৃদ্ধি', খ্'বৃদ্ধি' বা র্'বৃদ্ধি' এইরূপ সংকেত করা যাইবে, সেই চিহ্নটী কালক্রমে লোপ হইয়াছে কিংবা ইচ্ছা করিয়া লোপ করা হইবে)।

পূর্ব্বে যে 'আচার্য্যগণের ব্যবহার দ্বারা বৃদ্ধি-শব্দ সংজ্ঞাবোধক হইবে,' এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহা ত অসঙ্গত হইবে?

এখানে কি অসঙ্গত?

অসঙ্গত এই যে, তাহাকে অর্থাৎ সূত্রকারকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল যে, তোমার সূত্র অগমক (অবোধক) হইয়াছে; আবার তাহার অর্থাৎ বার্ত্তিককারাদির বাক্য, তাহাতে প্রমাণ করা হইল। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, এক জনের বাক্যে দোষ দেখিয়া সেই দোষ পরিহারের জন্য আর এক জনের বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না; সুতরাং সূত্রকারকে 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'সংজ্ঞা' শব্দের অধিকার না করিলে, 'সংজ্ঞা'র বোধ হইবে না বলিয়া দোষ দিয়া, 'আচার্য্যাচারাৎ' অর্থাৎ বার্ত্তিককারাদি আচার্য্যগণের ব্যবহার দ্বারাই 'সংজ্ঞা'র বোধ হইবে; এইরূপ প্রমাণ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

আর বার্ত্তিককার, 'আচার্য্যাচারাৎ' এইরূপ বার্ত্তিক করিয়া ও সেই পরিহারের দ্বারা সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই 'অনাকৃতিঃ' 'লিঙ্গেন বা' এইরূপ বার্ত্তিক করিয়াছেন। অতএব 'আচার্য্যগণের ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধ হইবে' এইরূপ বার্ত্তিক করিলেও 'লিঙ্গেন বা' (অথবা চিহ্নবিশেষের দ্বারা সংজ্ঞাবোধ হইবে) এইরূপ বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূল।—যদপ্যেতদুচ্যতে। অথবৈতর্হি ইৎসংজ্ঞা ন বক্তব্যা লোপশ্চ

ন বক্তব্যঃ। সংজ্ঞালিঙ্গমনুবন্ধেষু করিষ্যতে। ন চ সংজ্ঞায়া নিবৃত্তিরুচ্যতে। স্বভাবতঃ সংজ্ঞা সংজ্ঞিনং প্রত্যায্য স্বয়ং নিবর্ত্ততে। তেনানুবন্ধানামপি নিবৃত্তির্ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি এইরূপ বলিতেই হয়; অর্থাৎ 'চিহ্নবিশেষের দ্বারা বৃদ্ধিশব্দ সংজ্ঞাবাচক,' এইরূপ অবশ্যই জানিতে হয়; তবে এইরূপ করিলে পরে, ইৎসংজ্ঞাও বলিতে হইবে না, লোপও বলিতে হইবেনা। কারণ, 'ইৎ'-সংজ্ঞাবিধায়ক যে সকল অনুবন্ধ বর্ণ, সে সকল বর্ণে, 'সংজ্ঞা' বোধক যে চিহ্ন, সেই চিহ্ন করা হইবে।

আবার সেই চিহ্নদ্বারা অনুবন্ধবর্ণসমূহে, 'সংজ্ঞা' আসিয়া উপস্থিত হইবে, অনুবন্ধবর্ণসমূহের লোপ হয় বলিয়া সেই সংজ্ঞারও নিবৃত্তি হয় (লোপ হয়) এইরূপ যে বলিতে হইবে, তাহাও নহে। কারণ, স্বভাবতঃই সংজ্ঞা শব্দ, তাহার সংজ্ঞীকে বোধন করাইয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সেই হেতু অনুবন্ধবর্ণসমূহেরও নিবৃত্তি হইবে।

বিশেষ বিবৃতি।—যেমন,—'অষ্টাভ্য ঔশ্' ।৭।১।২১। (অষ্টন্ শব্দের আকারান্ত করিবার পর, 'জস্' এবং 'শস্' বিভক্তির স্থানে 'ঔশ'হয়) এই সূত্রে, 'ঔশ্', 'শ্'কার অনুবন্ধ করিবার প্রয়োজন এই যে, 'অনেকাল্ শিৎ সর্ব্বস্য'। ১।১।৫৫। (অনেক বর্ণ এবং 'শ্'কার ইৎবিশিষ্ট আদেশ হইলে, সকল বর্ণস্থানে ঐ আদেশ হয়), এই সূত্রানুসারে, 'জস্' এবং 'শস্'এর সমুদায় ('জ'ও 'স্' উভয়) বর্ণস্থানে 'ঔশ্' আদেশ হয়। এইস্থলে, 'শ্'কারের 'ইৎ' করিবার জন্য 'হলন্ত্যম্।' ১।৩।৩। (উপদেশকালে যে অন্ত হল্, তাহার ইৎ হয়) প্রভৃতি সূত্র, এবং 'তস্য লোপঃ' ।১।৩।৯। (সেই 'ইৎ'এর লোপ হয়) ইত্যাদি লোপবিধায়ক সূত্র করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ, 'বৃদ্ধি' শব্দে, 'সংজ্ঞা'বোধের জন্য যেমন 'ক' 'খ' বা কোনরূপ চিহ্ন করা হইবে; সেইরূপ 'ঔশ্'এর 'শ'কার প্রভৃতি অনুবন্ধবর্ণ স্থানেও 'ক্'শ', 'খ্'শ' বা অন্য কোন রূপ চিহ্ন করিব। তাহা হইলেই সেই চিহ্নদ্বারা 'শ'কার প্রভৃতি বর্ণ যে ইৎসংজ্ঞাবোধক তাহা জানা যাইবে। আর অনুবন্ধ বর্ণের লোপের জন্য যে সংজ্ঞালোপের (সংজ্ঞাবোধক চিহ্নের লোপের) কোনও সূত্র করিতে হইবে, তাহাও নহে। কারণ 'সংজ্ঞা' শব্দের স্বাভাবিক শক্তিই এই যে, সে সংজ্ঞীর বোধ জন্মাইয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূল।—সিধ্যত্যেবম্। অপাণিনীয়ং তু ভবতি। যথান্যাসমেবাস্তু।

নমু চোক্তং সংজ্ঞাধিকারঃ সংজ্ঞাসংপ্রত্যয়ার্থ ইতরথা হ্যসংপ্রত্যয়ো যথা লোক-ইতি। ন চ যথা লোকে তথা ব্যাকরণে। প্রমাণভূত আচার্য্যোদর্ভপবিত্রপাণিঃ শুচাববকাশে প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য মহতা প্রযত্নেন সূত্রং প্রণয়তিস্ম তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুং কিং পুনরিয়তা সূত্রেণ।

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু অপাণিনীয় ত হইবে অর্থাৎ পাণিনিবিরুদ্ধ ত হইবে?

তবে পাণিনি যেরূপ সূত্র করিয়াছেন, সেইরূপই হউক! যদি বল যে, পূর্ব্বে যে দোষ উক্ত হইয়াছে,—"যেমন, লোকমধ্যে দেখা যায় যে, কোন বস্তুর কোনও সংজ্ঞা (নাম) না করিলে, লোকে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না; সেইরূপ এখানেও যে, 'বৃদ্ধি' শব্দ কি জন্য করা হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে না; এই জন্য 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, সংজ্ঞা শব্দের অধিকার (অনুবৃত্তি) করা কর্ত্তব্য"?

তাহা হইতে পারে না। কারণ, অপ্রামাণিক লোকগণ মধ্যে, যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, ব্যাকরণে তাহা হওয়া কখনও সম্ভব নহে। যেহেতু, ব্যাকরণের আচার্য্য পাণিনি, কুশনির্ম্মিত পবিত্র (১) হস্তে ধারণ করিয়া, অতি পরিশুদ্ধ সময়ে, পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া অত্যন্ত প্রযত্নের সহিত সূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাহার একটি বর্ণও অনর্থক হইতে পারে না; এত বড় বড় সূত্রের আর কথা কি?

ভাষ্যানুবাদ।—কিমতো যদশক্যম্। অতঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনাবেব। কুতোন্বু খল্বেতৎ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনাবেবেতি। ন পুনঃ সাধ্বনুশাসনেঽস্মিন্‌শাস্ত্রে সাধুত্বমনেন ক্রিয়তে। কৃতমনয়োঃ সাধুত্বম্। কথম্। বৃধিরস্মায়বিশেষেণোপদিষ্টঃ প্রকৃতিপাঠে তস্মাৎ ক্তিন্‌প্রত্যয়ঃ। আদৈচোপ্যক্ষরসমাম্নায়ে উপদিষ্টাঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা দ্বারা কি বোধ হইবে যে, যে জন্য একটী বর্ণও অনর্থক বলিতে সমর্থ হইব না?

ইহা দ্বারা ('বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্র দ্বারা) সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীরই বোধ হইবে। এঁ্যা; কেনই বা নিশ্চিতরূপে সংজ্ঞাসংজ্ঞীরই বোধক হইবে? "আর সাধু (পরিশুদ্ধ) শব্দের অনুশাসনের জন্য প্রণীত এই শাস্ত্রে, এই সূত্র দ্বারা সাধুত্বই বিধান করিতেছেন," এই কথাই কেন বলা হয় না?

তাহা হইতে পারে না; কারণ, 'বৃদ্ধি' এবং 'আদৈচ্' এই শব্দদ্বয়ের সাধুত্ব পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ রহিয়াছে।

(১) দুই গাছি কুশদ্বারা নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়বিশেষের নাম 'পবিত্র'।

কিরূপে ?

বৃধি (বৃদ্ধি অর্থবাচক) ধাতু, ইহাকে প্রকৃতি (ধাতু) পাঠে, অবিশেষ রূপে (অর্থাৎ বৃদ্ধি অর্থ ভিন্ন অন্য কোনও বিশেষ অর্থে নহে,) উপদেশ করা হইয়াছে ; তদুত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া 'বৃদ্ধি' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব 'বৃদ্ধি' শব্দ যে সাধু, তাহা সিদ্ধই আছে। আর এইরূপ আদৈচ্ (আ, ঐ এবং ঔ) বর্ণসমূহও (স্বতঃসিদ্ধ) অক্ষরসমাম্নায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই শব্দদ্বয় সাধু করিবার জন্য 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের প্রয়োজন হইতে পারে না ; অতএব, সংজ্ঞাসংজ্ঞিবোধনই এই সূত্রের প্রয়োজন।

ভাষ্যমূল। প্রয়োগনিয়মার্থং তর্হীদং স্যাৎ। বৃদ্ধিশব্দাৎ পরে আদৈচঃ প্রয়োক্তব্যা ইতি। নেহ প্রয়োগনিয়ম আরভ্যতে। কিং তর্হি। সংস্কৃত্য সংস্কৃত্য পদান্যুৎসৃজ্যন্তে তেষাং যথেষ্টমভিসম্বন্ধো ভবতি। তদ্‌যথা। আহর পাত্রং পাত্রমাহরেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে প্রয়োগের নিয়মের জন্য এই সূত্র করা হইয়াছে ; সেই নিয়ম এই যে, সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি শব্দের পরে, আ, ঐ, ঔ বর্ণসমূহ প্রয়োগ করিতে হইবে।

এই স্থলে অর্থাৎ এই গ্রন্থে কোথাও শব্দসমূহ পূর্ব্বাপর স্থাপনের নিয়ম আরম্ভ করা হয় নাই।

তবে কি ?

পদসমূহকে সংস্কার করিয়া করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে, তাহাদিগের, যেমন ইচ্ছা তেমনই (জনগণ কর্ত্তৃক) ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন;—'আহর পাত্রং' (আহরণ কর পাত্রকে) এইরূপও ব্যবহার হয় ; অথবা 'পাত্রমাহর' (পাত্রকে আহরণ কর) এইরূপও ব্যবহার হয়।

ভাষ্যমূল।—আদেশাস্তর্হীমে স্যুঃ। বৃদ্ধিশব্দস্যাদৈচ আদেশাঃ। ষষ্ঠী-নির্দ্দিষ্টস্যাদেশা উচ্যন্তে। ন চাত্র ষষ্ঠীং পশ্যামঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে ইহারা আদেশবাচক হউক! 'বৃদ্ধি' শব্দ স্থানে আ, ঐ, ঔ, আদেশ হইবে। তাহা হইতে পারে না ; কারণ, ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট শব্দেরই আদেশ বলা হইয়া থাকে ; কিন্তু এখানে (বৃদ্ধি শব্দে) ষষ্ঠী বিভক্তি দেখিতে পাই না।

ভাষ্যমূল।—আগমাস্তর্হীমে স্যুঃ। বৃদ্ধিশব্দস্যাদৈচ আগমাঃ। আগমা অপি ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টস্যৈবোচ্যন্তে। লিঙ্গেন চ। ন চাত্র ষষ্ঠীং ন চাত্র আগমলিঙ্গং পশ্যামঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে ইহারা আগমবাচক হউক! বৃদ্ধি শব্দের, আ, ঐ, ঔ আগম হইবে?

তাহা হইতে পারে না। কারণ, আগমও ষষ্ঠীবিভক্তিনির্দ্দিষ্ট শব্দেরই বলা হয়। অথবা আগমবিশিষ্ট শব্দে (যেমন,'কুক্'আগমে উকার ও ককার ইৎরূপ) চিহ্ন থাকে। সেই চিহ্নের দ্বারা জানা যায় যে, এইটী আগমবাচক শব্দ। কিন্তু 'বৃদ্ধিরাদৈচ্',এই সূত্রে,না দেখি ষষ্ঠী বিভক্তি,না দেখি আগমবোধক কোন চিহ্ন।

ভাষ্যমূল।—ইদং যদ্যপি ভূয়ঃ সামানাধিকরণ্যমেক বিভক্তিকত্বং চ দ্বয়োশ্চৈতদ্ভবতি। কয়োঃ। বিশেষণবিশেষ্যয়োর্বা সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোর্বা। তত্রৈতৎ স্যাদ্ বিশেষণবিশেষ্যে ইতি। তচ্চ ন। দ্বয়োর্হি প্রতীতপদার্থকয়োর্বি-শেষণবিশেষ্যভাবো ভবতি। ন চাদৈচ্ছব্দঃ প্রতীতপদার্থকঃ। তস্মাৎ সংজ্ঞা-সংজ্ঞিনাবেব।

ভাষ্যানুবাদ। ইহা ('বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দ এবং 'আদৈচ্' শব্দ), অত্যন্ত সমানাধিকরণবিশিষ্ট এবং (উভয় শব্দই) একবিভক্তিবিশিষ্ট। ইহা আবার দুই রকম হইয়া থাকে।

কাহাদের, (অর্থাৎ পরস্পর সামানাধিকরণ্য ও একত্ব কাহাদের হইয়া থাকে?)

বিশেষণ বিশেষ্যের অথবা সংজ্ঞা সংজ্ঞীর।

তবে সেইস্থলে ('বৃদ্ধি' শব্দে এবং 'আদৈচ্'শব্দে) ইহা বিশেষণবিশেষ্যই হউক!

তাহাও হইবে না। কারণ, দুইটী প্রতীতপদার্থকের অর্থাৎ যে সকল পদ ও অর্থের প্রতীতি পূর্ব্ব হইতেই লোকের বিদ্যমান আছে, তাহাদেরই বিশেষণ বিশেষ্য ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু 'আদৈচ্' শব্দ যে কি পদ, ইহার অর্থই বা কি, কি জন্যই বা ইহার প্রয়োজন, তাহার কিছুই কাহারও প্রতীতি নাই; অতএব ইহা প্রতীতপদার্থক নহে। অতএব ইহারা ('বৃদ্ধি' এবং 'আদৈচ্') সংজ্ঞাসংজ্ঞিবাচকই সিদ্ধ হইল।

ভাষ্যমূল।—তত্র ত্বেতাবান্ সন্দেহঃ কঃ সংজ্ঞী কা সংজ্ঞেতি। স চাপি ক সংদেহঃ। যত্রোভে সমানাক্ষরে। যত্র ত্বন্যতরল্লঘু সা সংজ্ঞা যদ্গুরু স সংজ্ঞী। কুত এতৎ। লঘ্বর্থং হি সংজ্ঞাকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।—সেইস্থলে এই সংদেহ হইয়া থাকে যে, সংজ্ঞীই বা কোন্টী সংজ্ঞাই বা কোন্টী?

এই সন্দেহও হইতে পারে না। কারণ, সেই সন্দেহ কোথায় হইয়া থাকে ? না, যেখানে উভয়পক্ষে (সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীতে) সমান অক্ষর হইয়া থাকে) যেখানে উভয়ের মধ্যে একটী অপেক্ষাকৃত লঘু, সেইটী সংজ্ঞা, যেটী গুরু, সেইটী সংজ্ঞী।

কেন এইরূপ হইবে ?

এইরূপ হইবার কারণ এই যে, লঘুপ্রয়োজনের জন্য অর্থাৎ যাহাতে লঘু উপায়ে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে, তাহার জন্যই সংজ্ঞা করা হইয়াছে। 'বৃদ্ধি', ইহা একটী মাত্র শব্দ, 'আদৈচ্' অর্থাৎ আ, ঐ, ঔ, তিনটী শব্দ ; অতএব তিনটী শব্দ সংজ্ঞা না হইয়া একটী শব্দ অর্থাৎ 'বৃদ্ধি' শব্দই সংজ্ঞা হইবে।

ভাষ্যমূল।—তত্রাপ্যয়ং নাবশ্যং গুরুলঘুতামেবোপলক্ষয়িতুমর্হতি। কিং তর্হি। অনাকৃতিতামপি। অনাকৃতিঃ সংজ্ঞাকৃতিমন্তঃ সংজ্ঞিনঃ। লোকেঽপি হ্যাকৃতিমতোমাংসপিণ্ডস্য দেবদত্ত ইতি সংজ্ঞা ক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ।—সেইস্থলে অবশ্যই ইহা যে কেবল গুরুলঘুতাকেই উপলক্ষ্য করিতে সমর্থ হইবে, তাহা নহে। তবে কি ?

ইহা অনাকৃতিতাও লক্ষ্য করিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আকৃতিহীন সংজ্ঞা, আকৃতি অর্থাৎ যাহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ রহিয়াছে এবং যে, সময়ে পরিবর্ত্তনশীল, সেই আকৃতিবিশিষ্ট সংজ্ঞী। যেমন লোকমধ্যেও আকৃতিবিশিষ্ট (বাল্য, কৌমার, যৌবন, বৃদ্ধাদিপরিবর্ত্তনবিশিষ্ট) মাংসপিণ্ডের, 'দেবদত্ত' এইরূপ সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূল।—অথবাবর্ত্তিন্যঃ সংজ্ঞা ভবন্তি। বৃদ্ধিশব্দশ্চাবর্ত্ততে নাদৈচ্ছব্দঃ। তদ্যথা। ইতরত্রাপি দেবদত্ত শব্দ আবর্ত্ততে ন মাংসপিণ্ডঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা যাহা আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ পাঠ) বিশিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাই সংজ্ঞা। ব্যাকরণে বৃদ্ধি শব্দের অনেক বার আবৃত্তি হইয়াছে; কিন্তু 'আদৈচ্' শব্দের তাহা হয় নাই। সুতরাং 'বৃদ্ধি' শব্দই সংজ্ঞাবাচক। যেমন ;—অন্যত্রও অর্থাৎ ব্যাকরণ ভিন্ন অন্যস্থানে (লোকমধ্যে), সংজ্ঞাবাচক 'দেবদত্ত' শব্দই আবর্ত্তিত হয় ('দেবদত্ত' নাম একশত জন লোকে একশতবার ডাকিলে, একশত বারই আবর্ত্তিত হয়) ; কিন্তু সংজ্ঞী যে দেবদত্তের শরীরস্থিত মাংসপিণ্ড, তাহার আবৃত্তি হয় না।

ভাষ্যমূল।—অথবা পূর্ব্বোচ্চারিতঃ সংজ্ঞী পরোচ্চারিতা সংজ্ঞা। কুত এতৎ। সতোহি কার্য্যিণঃ কার্য্যেণ ভবিতব্যম্। তদ্যথা। ইতরত্রাপি

সতো মাংসপিণ্ডস্য দেবদত্ত ইতি সংজ্ঞা ক্রিয়তে। কথং বৃদ্ধিরাদৈজিতি। এতদেকমাচার্য্যস্য মঙ্গলার্থং মৃষ্যতাম্। মাঙ্গলিক আচার্য্যো মহতঃ শাস্ত্রৌঘস্য মঙ্গলার্থং বৃদ্ধিশব্দমাদিতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে। মঙ্গলাদীনি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীরপুরুষকানি ভবন্ত্যায়ুষ্মৎপুরুষকাণি চাধ্যেতারশ্চ বৃদ্ধিযুক্তা যথা স্যুরিতি। সর্ব্বত্রৈব হি ব্যাকরণে পূর্ব্বোচ্চারিতঃ সংজ্ঞী পরোচ্চারিতা সংজ্ঞা। অদেঙ্‌গুণ ইতি যথা।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা যাহা, পূর্ব্বে উচ্চারিত হইবে, তাহাকে সংজ্ঞী জানিবে; আর যাহা পরে উচ্চারিত হইবে, তাহাকে সংজ্ঞা জানিতে হইবে।

কেন এইরূপ হইবে?

তাহার কারণ এই যে; কার্য্যী বিদ্যমান থাকিলেই তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। যেমন;—ব্যাকরণ ভিন্ন অন্যত্র অর্থাৎ লোকমধ্যেও ব্যবহার দেখা যায় যে, বিদ্যমান যে মাংসপিণ্ড, তাহারই 'দেবদত্ত' সংজ্ঞা করা হয়। অর্থাৎ যেমন হাতপাবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড পূর্ব্বে দেখাইয়া পরে, মনুষ্যগণ, তাহার 'দেবদত্ত' প্রভৃতি নাম রাখিয়া থাকেন, যাহার নাম রাখা হইবে, পূর্ব্বে তাহাকে না দেখাইয়া নাম রাখিতে পারেন না; সেইরূপ ব্যাকরণেও যাহার সংজ্ঞা করা হইবে, সেই সংজ্ঞীকে পূর্ব্বে দেখাইয়া পরে তাহার সংজ্ঞা রাখা হইয়াছে।

যদি এই নিয়মই সত্য হয়; তবে 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, সংজ্ঞাবাচক 'বৃদ্ধি'-শব্দ, কিরূপে পূর্ব্বে হইল?

আচার্য্যের (অত্যন্ত মাননীয় ঋষির) এই একটী প্রয়োগ বিরুদ্ধ হইলেও মঙ্গলাচরণের জন্য করিয়াছেন বলিয়া সহ্য করুন! কারণ, মঙ্গলকারী আচার্য্য, অত্যন্তমহৎ শাস্ত্র (সূত্র) সমূহের মঙ্গলাচরণের জন্য বৃদ্ধিশব্দ আদিতে প্রয়োগ করিয়াছেন। আদিতে মাঙ্গলিকশব্দবিশিষ্ট শাস্ত্রসমূহ, বিস্তীর্ণ (দেশ বিদেশে প্রচারিত) হয়। মাঙ্গলিক শব্দের ব্যবহারকর্ত্তা পুরুষও বীর হন এবং দীর্ঘায়ু হন। আর মঙ্গলাচরণবিশিষ্ট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, অধ্যয়নশীল বিদ্যার্থিগণও যাহাতে বৃদ্ধিসম্পন্ন হয়, এইজন্য 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, বৃদ্ধিশব্দ পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়াছেন। নতুবা ব্যাকরণের সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে উচ্চারিত শব্দ সংজ্ঞা এবং পরে উচ্চারিত শব্দ সংজ্ঞী দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন;—'অদেঙ্‌গুণঃ'।১।১।২। ('অৎ' অর্থাৎ হ্রস্ব অকার, 'এঙ্' অর্থাৎ 'এ'কার এবং 'ও'কার 'গুণ'সংজ্ঞক হয়) এইসূত্রে, পূর্ব্বোচ্চারিত 'অদেঙ্' শব্দ সংজ্ঞিবাচক এবং পরোচ্চারিত 'গুণ' শব্দ সংজ্ঞাবাচক হইয়াছে।

ভাষ্যমূল।—দোষবান্ খল্বপি সংজ্ঞাধিকারঃ অষ্টমেঽপি হি সংজ্ঞাঃ ক্রিয়ন্তে তস্য পরমাম্রেড়িতমিতি। তত্রাপীদমনুবর্ত্ত্যং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—আর 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, সংজ্ঞা শব্দের অধিকার করিলে, সেইটী দোষবিশিষ্টও হয় বটে; কারণ, তাহা হইলে আবার অষ্টমঅধ্যায়ে, 'তস্য পরমাম্রেড়িতম্'।৮।১।২। (দ্বিরুক্তের যে পরের রূপ, তাহার আম্রেড়িত সংজ্ঞা হয়; যেমন,—'পটৎ পটৎ' ইহার পরের 'পটৎ' আম্রেড়িত সংজ্ঞা-বিশিষ্ট) প্রভৃতি সংজ্ঞাবাচক সূত্রেও আবার সংজ্ঞাধিকার করিতে হইবে?

তাহা করিতে হইবে না; কারণ, সেখানেও ইহা (সংজ্ঞাধিকারক 'সংজ্ঞা' শব্দ) অনুবৃত্তিবিশিষ্ট হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথবাহস্থানেঽয়ং যত্নঃ ক্রিয়তে নহীদং লোকাদ্ভিদ্যতে। যদীদং লোকাদ্ভিদ্যেত ততো যত্নার্হং স্যাৎ। তদ্যথা। অগোজ্ঞায় কশ্চিদ্গাং সক্থনি কর্ণে বা গৃহীত্বোপদিশতি অয়ং গৌরিতি। ন চাস্যাচষ্টে ইয়মস্য সংজ্ঞেতি। ভবতি চাস্য সংপ্রত্যয়ঃ। তত্রৈতৎ স্যাৎ কৃতঃ পূর্ব্বৈরভিসম্বন্ধ ইতি। ইহাপি কৃতঃ পূর্বৈরভিসম্বন্ধঃ। কৈঃ। আচার্য্যৈঃ। তত্রৈতৎ স্যাৎ। যস্মৈ তর্হি সম্প্রত্যুপদিশতি তস্যাকৃত ইতি। লোকেঽপি যস্মৈ সম্প্রত্যুপদিশতি তস্যাকৃতঃ। অথ তত্র কৃতঃ। ইহাপি কৃতোদ্রষ্টব্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এই সকল যত্ন অস্থানেই (যত্ন করিবার অযোগ্য স্থানে) করা হইতেছে। কারণ, ইহা ত লোকবিরুদ্ধ হয় নাই। যদি ইহা ('বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্র) লোকবিরুদ্ধ হইত, তবে এই সকল যত্নযোগ্য হইত। যেমন;—কোন গোজ্ঞানরহিত ব্যক্তিকে, গোবিষয়ক জ্ঞান দেওয়ার জন্য কোনও ব্যক্তি কোনও গোর সক্থি (ঊরু) অথবা কর্ণে ধরিয়া উপদেশ করে যে, এইটী গো, কিন্তু ইহা তাহাকে বলে না যে, ইহা (এই গো শব্দ) ইহার (গোর) সংজ্ঞা। অথচ তাহাতেই তাহার (গোজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির) বোধও হইয়া থাকে।

সেই স্থলে, এইরূপ বলিব যে, পূর্ব্ব হইতেই ইহার (গো শব্দের) সম্বন্ধ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতেই প্রতীতি হইয়াছে? তবে আমরা বলিব যে, এখানেও পূর্ব্ব হইতেই (বৃদ্ধিশব্দ সংজ্ঞা এইরূপ) সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে?

কাহা দ্বারা সম্বন্ধ করা হইয়াছিল?

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—লিখিত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুত নরেন্দ্র, গিরিশ ঘোষ ডাক্তার সরকার ইত্যাদির কথোপকথন ও আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ভজনানন্দে—সমাধিমন্দিরে]

পরদিন ২৭এ অক্টোবর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, মঙ্গলবার, বেলা সাড়ে পাঁচটা।

আজ নরেন্দ্র,* ডাক্তার সরকার, শ্যামবসু, গিরীশ, ডাক্তার দোকড়ি, ছোট নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তার পীড়াসম্বন্ধীয় কথার পর ও শ্রীরামকৃষ্ণের ঔষধ সেবনের পর বলিলেন, 'তবে শ্যামবাবুর সঙ্গে তুমি কথা কও, আমি আসি।' শ্রীরামকৃষ্ণ ও একজন ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, 'গান শুনবেন ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'তুমি যে তিড়িং মিড়িং করে উঠ—ভাব চেপে রাখ্‌তে হবে।'

ডাক্তার আবার বসিলেন। তখন নরেন্দ্র মধুরকণ্ঠে গান করিতে লাগিলেন। তৎসঙ্গে তানপুরা ও মৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতে লাগিল। তিনি গাইতে লাগিলেন ;—

চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্ব-সংসার।
অযুত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন-হার,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময়, হায় পূর্ণ তোমারি ভাণ্ডার।
হে মহেশ, অগণনলোক গায় ধন্য ধন্য এই গীতি অনিবার।

নরেন্দ্র আবার গাইলেন ;—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।
অনন্ত আঁধারকোলে, মহা নির্ব্বাণহিল্লোলে,

* শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র—স্বামী বিবেকানন্দ।

১

চিরশান্তিপরিমল, অবিরত যায় ভ'সি।
মহাকালী রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধিমন্দিরে (ওমা) কে তুমি গো একা বসি;
অভয় পদ-কমলে, প্রেমের বিজলী জলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে, শোভে অট্ট অট্ট হাসি।

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিলেন, 'It is dangerous to him' (এ গান ঠাকুরের পক্ষে ভাল নয়, ভাব হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে)।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বল্‌ছে? তিনি উত্তর করিলেন, 'ডাক্তার ভয় কর্‌ছেন, পা'ছে আপনার ভাবসমাধি হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে বলিতে একটু ভাবস্থ হইয়াছেন; ডাক্তারের মুখপানে তাকাইয়া করযোড়ে বলিলেন, 'না, না, কেন ভাব হবে?' কিন্তু এ কথা বলিতে ব'লতে তিনি গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। শরীর স্পন্দহীন, নয়ন স্থির।—অবাক্, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট। বাহ্যজ্ঞানশূন্য। মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ। আর সে মানুষ নয়।

নরেন্দ্রের মধুর কণ্ঠে সেই মধুর গান চলিতে লাগিল। তিনি আবার গাইলেন;—

একি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ,
প্রেম উৎস উথলিল আজি—
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ।

তিনি আবার গাইলেন—

কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে,
যদি চরণ-সরোজে, পরাণ-মধুপ, চিরমগন না রয় হে।
অগণন ধনরাশি তায় কিবা ফলোদয় হে,
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে।
সুকুমার কুমার-মুখ দেখিতে না চাই হে,
যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাই হে।

কি ছার শশাঙ্কজ্যোতি, দেখি আঁধারময় হে,
যদি সে চাঁদপ্রকাশে তব প্রেম-চাঁদ নাই হয় উদয় হে।
সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে,
যদি সে প্রেমকনকে, তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে।
তীক্ষ্ণবিষা ব্যালী সম সতত দংশয় হে,
যদি মোহ পরমাদে, নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।
কি আর বলিব নাথ বলিব তোমায় হে;
তুমি আমার হৃদয়রতনমণি আনন্দনিলয় হে।

'সতীর পবিত্র প্রেম', গানের এই অংশ শুনিতে শুনিতে ডাক্তার অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়া উঠিলেন, আহা! আহা!

নরেন্দ্র আবার গাইলেন—

কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম বোল্‌বো হরিনাম,
নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন,
কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,
সংসার-বন্ধন হইবে মোচন,
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।
কবে পরশমণি করি পরশন,
লোহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন,
লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার।
হায়, কবে যাবে আমার ধরম করম,
কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম,
পরিহরি অভিমান লোকাচার—
মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্তপদধূলি,
কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি,
অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেমযমুনার।

প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব,
সচ্চিদানন্দসাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়া সকলে মাতাব,
হরিপদে নিত্য করিব বিহার॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যসংজ্ঞালাভ করিয়াছেন। গান সমাপ্ত হইল। তখন পণ্ডিত ও মূর্খের—বালক ও বৃদ্ধের—পুরুষ ও স্ত্রীর—আপামর সাধারণের সেই মনোমুগ্ধকরী কথা হইতে লাগিল। সভাশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ। সকলেই সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। এখন সেই কঠিন পীড়া কোথায়? মুখ এখন যেন প্রফুল্ল অরবিন্দ, যেন ঐশ্বরিক জ্যোতি বহির্গত হইতেছে। তখন তিনি ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "লজ্জা ত্যাগ কর। ঈশ্বরের নাম করবে, তাতে আবার লজ্জা কি? লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়।"

"আমি এত বড় লোক, আমি 'হরি হরি' বলে নাচ্‌ব? বড় বড় লোক এ কথা শুন্‌লে আমায় কি বল্‌বে? যদি বলে, 'ওহে ডাক্তারটা হরি হরি বলে নেচেছে। কি লজ্জার কথা!' এ সব ভাব ত্যাগ কর।"

ডাক্তার। আমার ও দিক্ দিয়েই যাওয়া নেই। লোকে কি বলবে, আমি তার তোয়াক্কা রাখি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার উটী খুব আছে। (সকলের হাস্য)।

[বিজ্ঞান কিরূপে হয়—ব্রহ্মদর্শন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, তবে তাঁকে জানতে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয়-বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। যেমন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে। সে কাঁটাটী তোল্‌বার জন্যে আর একটী কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটী তোল্‌বার পর দুটী কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান কাঁটাটী দূর কর্‌বার জন্য, জ্ঞানকাঁটা আনতে হয়। তার পর জ্ঞান অজ্ঞান দুটোই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান অজ্ঞানের পার! লক্ষ্মণ বলেছিলেন, রাম! একি আশ্চর্য্য! এত বড় জ্ঞানী

স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে অধীর হয়ে কেঁদেছিলেন! রাম বল্লেন ‘ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে, যার এক জ্ঞান আছে, তার অনেক জ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে। তিনি জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ-পুণ্যের পার, ধর্ম্মাধর্ম্মের পার, শুচিঅশুচির পার।’

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের গান আবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন;—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলেরে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি,
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞানসিন্ধুমাঝে ডুবাইবি।
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্যঘরে কবে শুবি,
তাদের দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামামারে পাবি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি,
তাদের জ্ঞানখড়্গে বলি দিয়ে উভয়ে কৈবল্য দিবি।
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি,
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয় ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি।
প্রসাদ বলে এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি,
তবে বাপু, বাছা, বাপের ঠাকুর মনের মত মন হবি।

[অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌; ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝান যায় না]

শ্যামবাবু। দুই কাঁটা ফেলে দেওয়ার পর কি থাকবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিত্যশুদ্ধবোধরূপং। তা তোমায় কেমন করে বুঝাবো? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ঘী কেমন খেলে। তাকে এখন কি করে বুঝাবো? হদ্দ বলতে পার, ‘কেমন ঘী, না যেমন ঘী।’ একটী মেয়েকে তার একটী সঙ্গী জিজ্ঞাসা করেছিল, তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা ভাই, স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয়? মেয়েটী বল্লে ‘ভাই তোর স্বামী হলে তুই জানবি, এখন তোর কেমন করে বুঝাব।’ পুরাণে আছে, ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন, তখন তাঁকে মা নানারূপে দর্শন দিলেন। গিরিরাজ সব রূপ দর্শন করে শেষে

ভগবতীকে বল্লেন, মা, বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এইবার আমার যেন সেই ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন ভগবতী বল্লেন, বাবা, ব্রহ্মদর্শন যদি কর্‌তে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর।

“ব্রহ্ম কি জিনিস মুখে বলা যায় না। একজন বলেছিল, সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। এর মানে এই যে, বেদ পুরাণ তন্ত্র আর সব শাস্ত্র মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, কেউ এ পর্য্যন্ত মুখে বল্‌তে পারে নাই। তাই ব্রহ্ম এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই। আর সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া, রমণ, যে কি আনন্দের, তা মুখে বলা যায় না। যার হয়েছে, সে জানে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[পণ্ডিত ও অহঙ্কার]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “দেখ, অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান হয় না। ‘মুক্ত হব কবে, আমি যাব যবে।’ ‘আমি’ ও ‘আমার’ এই দুইটী অজ্ঞান। ‘তুমি’ ও ‘তোমার’ এই দুইটী জ্ঞান। যে ঠিক ভক্ত, সে বলে, হে ঈশ্বর! তুমিই কর্ত্তা, তুমিই সব কর্‌ছো। আমি কেবল যন্ত্র। আমাকে যেমন করাও, তেমনি করি। আর এ সব তোমার ধন, তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার জগৎ। তোমার গৃহ পরিজন, আমার কিছু নয়। আমি দাস। তোমার যেমন হুকুম, সেইরূপ সেবা কর্‌বার আমার অধিকার।

“যারা একটু বৈ টৈ পড়েছে, অমনি তাদের অহঙ্কার এসে জোটে।—ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হয়েছিল। সে বলে, ‘ও সব আমি জানি।’ আমি বল্লুম, যে দিল্লী গিছিলো, সে কি বলে বেড়ায় আমি দিল্লী গিছি, আর জাঁক করে? যে বাবু, সে কি বলে, আমি বাবু?

শ্যামবসু। তিনি (—ঠাকুর) আপনাকে খুব মানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওগো বল্‌বো কি! দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে একটা মেথরাণীর যে অহঙ্কার! তার গায়ে দু-একখানা গহনা ছিল। সে যে পথ দিয়ে আস্‌ছিল, সেই পথে দু-একজন লোক তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। মেথরাণী তাদের বলে উঠ্‌লো, ‘এই! সরে যা।’ তা অন্য লোকের অহঙ্কারের কথা আর কি বল্‌বো!

[পাপ পুণ্য।]

শ্যামবসু। মহাশয়, পাপের শাস্তি আছে অথচ ঈশ্বর সব করছেন, এ কি রকম কথা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি তোমার সোণার বেণে বুদ্ধি!

নরেন্দ্র। সোণার বেণে বুদ্ধি অর্থাৎ Calculating বুদ্ধি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওরে পোদো, তুই আম খেয়েনে। বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটী পাতা আছে, এ সব হিসাবে তোর কায কি? তুই আম খেতে এসেছিস, আম খেয়ে যা! (শ্যাম বসুর প্রতি) তুমি এ সংসারে ঈশ্বরসাধন করবার জন্য মানবজন্ম পেয়েছ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর। তোমার এত শত কায কি? ফিলজফী (Philosophy) নিয়ে বিচার করে তোমার কি হবে? দেখ, আধ পো মদে তুমি মাতাল হতে পার। শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার?

ডাক্তার। আর ঈশ্বরের মদ infinite! সে মদের শেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যামবসুর প্রতি।) আর ঈশ্বরকে আম্মোক্তারী দাও না। তাঁর উপর সব ভার দাও। সৎ লোককে যদি কেউ ভার দেয়, তিনি কি অন্যায় করেন? পাপের শাস্তি দিবেন কি না দিবেন, সে তিনি বুঝবেন।

ডাক্তার। তাঁর মনে কি আছে, তিনিই জানেন। মানুষ হিসাব করে কি বলবে? তিনি হিসাবের পার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যামবসুর প্রতি) তোমাদের ঐ এক! কলকাতার লোকগুলো বলে, 'ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ!' কেন না, তিনি একজনকে সুখে রেখেচেন, আর একজনকে দুঃখে রেখেচেন। শালাদের নিজের ভিতরও যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে।

[লোকমান্য কি জীবনের উদ্দেশ্য?]

হেম দক্ষিণেশ্বর যেত। দেখা হলেই আমায় বলতো, 'কেমন ভট্টাচার্য্য মশাই, জগতে এক বস্তু আছে—মান?' ঈশ্বরলাভ যে মানুষজীবনের উদ্দেশ্য, তা কম লোকেই বলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(সূক্ষ্মশরীর।)

শ্যামবসু। সূক্ষ্মশরীর কেউ কি দেখিয়ে দিতে পারে? কেউ কি দেখাতে পারে যে, সেই শরীর বাহিরে চলে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যারা ঠিক ভক্ত, তাদের দায় পড়েছে তোমায় দেখাতে! কোন্ শালা মানবে আর না মানবে, তাদের দায়টি; একটা বড় লোক হাতে থাকবে, এ সব ইচ্ছা তাদের থাকে না।

শ্যামবসু। আচ্ছা, স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহ, এ সব প্রভেদ কি?

[স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ। পঞ্চভূত নিয়ে যে দেহ, সেইটা স্থূলদেহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিত্ত, এই নিয়ে সূক্ষ্মশরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়, সেইটী কারণ শরীর। তন্ত্রে বলে, ভাগবতী তনু। সকলের অতীত 'মহাকারণ' (তুরীয়)—মুখে বলা যায় না।

[সাধনের প্রয়োজন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেবল শুন্‌লে কি হবে? কিছু করো!

"সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বল্লে কি হবে? তাতে কি নেশা হয়? সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখ্‌লেও নেশা হয় না। কিছু খেতে হয়। কোন্‌টা একচল্লিশ নম্বরের সুতা, কোন্‌টা চল্লিশ নম্বরের, এ সব সুতার ব্যবসা না কর্‌লে কি বলা যায়? যাদের সুতার ব্যবসা আছে, তাদের পক্ষে অমুক নম্বরের সুতা বেছে দেওয়া কিছু শক্ত নয়। তাই বলি, কিছু সাধন কর। তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ কা'কে বলে, সব বুঝ্‌তে পারবে।

[ঈশ্বরে ভক্তি একমাত্র সার।]

"যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্‌বে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা কর্‌বে।

"অহল্যার শাপ মোচনের পর রামচন্দ্র তাঁকে বল্লেন, 'তুমি আমার কাছে বর লও।' অহল্যা বল্লেন, 'রাম, যদি বর দিবে, তবে এই বর দাও—আমার যদি শূকরযোনিতেও জন্ম হয়, তাতেও ক্ষতি নাই; কিন্তু হে রাম! যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে।'

"আমি মার কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাতযোড় করে বলেছিলাম, 'মা, এই নাও তোমার অজ্ঞান, এই নাও

তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।

"ধর্ম্ম কিনা দানাদি কর্ম্ম। ধর্ম্ম নিলেই অধর্ম্ম নিতে হবে। পুণ্য নিলেই পাপ নিতে হবে। জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান নিতে হবে। শুচি নিলেই অশুচি নিতে হবে। যেমন যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকারও বোধ আছে। যার এক বোধ আছে, তার অনেক বোধও আছে। যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে।

"যদি কাহারও শূকরমাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধন্য; আর হবিষ্য খেয়ে যদি সংসারে আসক্তি থাকে—

ডাক্তার। তবে সে অধম! এখানে একটী কথা বলি, বুদ্ধ শূকরমাংস খেয়েছিল। শূকরমাংস খাওয়া আর Colic ও (পেটে শূলবেদনা) হওয়া। এ ব্যারামের জন্য বুদ্ধ opium (আফিঙ) খেতো। নির্ব্বাণ টির্ব্বাণ কি জান, আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে থাক্‌তো, বাহ্যজ্ঞান থাক্‌তো না—তাই 'নির্ব্বাণ'।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ সম্বন্ধে এই নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন; আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থ ও নিষ্কাম কর্ম্ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যাম বসুর প্রতি) সংসার কর, তাতে দোষ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে, কামনাশূন্য হয়ে, কায কর্ম্ম করবে। এই দেখ না, যদি কারু পিঠে একটা ফোড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, হয়ত কাযকর্ম্মও করে, কিন্তু তার মন যেমন ফোড়ার দিকে পড়ে থাকে, সেইরূপ।

"সংসারে নষ্টমেয়ের মত থাক্‌বে। মন উপপতির দিকে, কিন্তু সে সংসারের সব কায করে।

(ডাক্তারের প্রতি) বুঝেছ?

ডাক্তার। ও ভাব যদি না থাকে, বুঝ্‌ব কেমন করে ?

শ্যামবসু। কিছু বোঝো বই কি ! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) আর ঐ ব্যবসা অনেক দিন ধরে কর্‌ছেন! কি বল? (সকলের হাস্য)।

[থিয়সফি Theosophy]

শ্যামবসু। মহাশয়! Theosophy (থিয়সফী) কি রকম বলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মোট কথা এই—যারা শিষ্য করে বেড়ায়, তারা হাল্‌কা থাকের লোক। আর যারা সিদ্ধাই অর্থাৎ নানা রকম শক্তি চায়, তারাও হাল্‌কা থাক। যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হয়ে যাব, এই শক্তি। আর একদেশে একজন কি কথা বল্‌ছে, তাই বল্‌তে পারা, এই এক শক্তি। এই সব লোকের ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হওয়া ভারি কঠিন।

শ্যামবসু। কিন্তু তারা (Theosophistরা) হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তাদের বিষয় ভাল জানি না।

শ্যামবসু। মর্‌বার পর জীবাত্মা কোথায় যায়—চন্দ্রলোকে, নক্ষত্রলোকে ইত্যাদি—এ সব থিয়সফিতে জানা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হবে, আমার ভাব কি রকম জান? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বল্লে, 'আমি বার, তিথি, নক্ষত্র, এ সব কিছু জানি না, কেবল এক রাম চিন্তা করি।' আমার ঠিক ঐ ভাব।

শ্যামবসু। তারা বলে, 'মহাত্মারা' সব আছেন। আপনার কি বিশ্বাস?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কথা বিশ্বাস করেন তো আছে। ও সব কথা এখন থাক্। আমার অসুখটা কম্‌লে আস্‌বে। যাতে তোমার শান্তি হয়, যদি আমায় বিশ্বাস কর—উপায় হয়ে যাবে। দেখ্‌ছো তো, আমি টাকা লিই না, কাপড় লিই না। এখানে প্যালা দিতে হয় না, তাই অনেকে আসে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) তোমাকে এই বলা, রাগ কোরো না—ও সবতো অনেক কর্‌লে—টাকা, মান, Lecture—এখন মনটা দিন কতক ঈশ্বরেতে দাও। আর এখানে মাঝে মাঝে আস্‌বে। ঈশ্বরের কথা শুন্‌লে উদ্দীপন হবে।

কিয়ৎকাল পরে ডাক্তার বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এমন সময়ে

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন ও ঠাকুরের চরণধূলি লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার। আমি থাক্‌তে উনি (গিরীশ বাবু) আস্‌বেন না। যাই চলে যাব যাব হয়েছি, অমনি এসে উপস্থিত। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) আমায় একদিন সেখানে (Science Associationএ) নিয়ে যাবে ?

ডাক্তার। তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে—ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কাণ্ড সব দেখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(গুরুপূজা।)

ডাক্তার। (গিরীশের প্রতি) আর সব কর--but do not worship him as God. এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্চ!

গিরীশ। কি করি মহাশয়! যিনি এ সংসার-সমুদ্র ও সন্দেহ-সাগর থেকে পার কর্‌লেন, তাঁকে আর কি কোর্‌বো বলুন। তাঁর গু কি গু বোধ হয় ?

ডাক্তার। গুর জন্যে হচ্চে না। আমা'র ও ঘৃণা নাই। একটা দোকানীর ছেলে এসেছিল, তা বাহে করে ফেল্লে। সকলে নাকে কাপড় দিলে! আমি তার কাছে আধ ঘণ্টা বসে। নাকে কাপড় দিই নাই। আবার মেথর যতক্ষণ মাথায় করে নিয়ে যায়, ততক্ষণ আমার নাকে কাপড় দেবার যো নাই। আমি জানি, সেও যা, আমিও তা, কেন তাকে ঘৃণা কর্‌ব ? আমি কি এঁর পায়ের ধূলা নিতে পারি না? এই দেখ, নিচ্চি। (শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ)।

গিরীশ। Angels (দেবগণ) এই মুহূর্ত্তকে ধন্য ধন্য কর্‌ছেন।

ডাক্তার। তা পায়ের ধূলা লওয়া কি আশ্চর্য্য! আমি যে সকলেরই নিতে পারি--এই দাও! এই দাও! (সকলের পায়ের ধূলা গ্রহণ।)

নরেন্দ্র। (ডাক্তারের প্রতি) এঁকে আমরা ঈশ্বরের মত মনে করি। কি রকম জানেন? যেমন Vegetable Creation (উদ্ভিদ্) ও Animal Creation (জীবজন্তুগণ) এদের মাঝামাঝি এমন একটী (point) স্থান আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ্ কি প্রাণী স্থির করা ভারি কঠিন। সেইরূপ Man-world (নরলোক) ও God-world (দেবলোক) এই দুয়ের মধ্যে এমন একটী স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ না ঈশ্বর।

ডাক্তার। ওহে, ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।

নরেন্দ্র। আমি God (ঈশ্বর) বল্‌ছি না, God-like man (ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি) বল্‌ছি।

ডাক্তার। ও সব নিজের নিজের ভাব চাপ্‌তে হয়। প্রকাশ করা ভাল নয়। আমার ভাব কেউ বুঝ্‌লে না! My best friends আমাকে কঠোর নির্দ্দয় মনে করে। এই তোমরা হয়তো আমায় জুতো মেরে তাড়াবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) সেকি! এরা তোমায় কত ভালবাসে! তুমি আস্‌বে বলে বাসক সজ্জা জেগে থাকে!

গিরীশ। Every one has the greatest respect for you.

ডাক্তার। আমার ছেলে—আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত—আমায় মনে করে hardhearted,—কেন না, আমার দোষ এই যে, আমি ভাব কারও কাছে প্রকাশ করি না।

গিরীশ। তবে মহাশয়, আপনার মনের কবাট খোলা তো ভাল—at least out of pity for your friends—এই মনে করে যে, তারা আপনাকে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না?

ডাক্তার। বল্‌বো কি! তোমাদের চেয়েও আমার feelings worked up হয়, (অর্থাৎ আমার ভাব হয়)।

(নরেন্দ্রের প্রতি) I shed tears in solitude!

(মহাপুরুষ ও জীবের পাপ গ্রহণ।)

ডাক্তার। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) ভাল, তুমি যে ভাব হয়ে লোকের গায়ে পা দেও, সেটা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি জান্‌তে পারি, কারু গায়ে পা দিচ্ছি কি না?

ডাক্তার। ওটা ভাল নয়, এটুকুতো বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার ভাবাবস্থায় আমার কি হয়, তা তোমায় কি বল্‌ব? সে অবস্থার পর এমন ভাবি, বুঝি রোগ হচ্চে ঐ জন্তে। ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়। উন্মাদে এরূপ হয়, কি কর্‌বো?

ডাক্তার। (শিষ্যগণের প্রতি) ইনি মেনেছেন। He expresses regret for what he does, কাযটা sinful এটা বোধ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) তুই তো খুব শঠ্‌ (বুদ্ধিমান)। তুই বল্‌ না, একে বুঝিয়ে দেনা।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মহাশয়, আপনি ভুল বুঝেছেন। উনি সে জন্য দুঃখিত হন্‌ নি। এঁর দেহ শুদ্ধ—অপাপবিদ্ধ। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ করে এঁর রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখনও কখনও ভাবেন। আপনার যখন Colic (শূল বেদনা) হয়েছিল, তখন আপনার কি regret (দুঃখ) হয় নাই, কেন রাত জেগে এত পড়্‌তুম? তা বলে রাত জেগে পড়াটা কি অন্যায় কায? রোগের জন্য regret হতে পারে, তা বলে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য স্পর্শ করাকে অন্যায় কায মনে করেন না।

ডাক্তার। (অপ্রতিভ হইয়া, গিরীশের প্রতি)। তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধূলা দাও (গিরীশের পদধূলি গ্রহণ)। (নরেন্দ্রের প্রতি) আর কিছু নয়, his intellectual power (গিরীশের বুদ্ধিমত্তা) মান্‌তে হবে।

নরেন্দ্র। (ডাক্তারের প্রতি) আর এক কথা দেখুন। একটা Scientific discovery কর্‌বার জন্য আপনি life devote কর্‌তে পারেন—শরীর অসুখ ইত্যাদি কিছুই মানেন না। আর ঈশ্বরকে জানা grandest of all sciences—এর জন্য ইনি health risk কর্‌বেন না?

(অবতারাদি।)

ডাক্তার। যত religious reformer (ধর্ম্মাচার্য্য) হয়েছে, Jesus (যীশু), Chaitanya (চৈতন্য), Buddha, (বুদ্ধ), Mohamed (মহম্মদ), সব শেষে অহঙ্কারে পরিপূর্ণ—বলে আমি যা বল্লুম, তাই ঠিক। একি কথা?

এই বলিয়া ডাক্তার বিদায় লইতে দণ্ডায়মান হইলেন।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মহাশয়, সেই দোষ আপনারও হচ্ছে।

আপনি একথা তাঁদের সকলের অহঙ্কার আছে, এ দোষ ধরাতে ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে।

ডাক্তার নীরব হইলেন।

নরেন্দ্র। (ডাক্তারের প্রতি) We offer to him worship bordering on divine worship.

মরণে জীবন।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ।)

শুনিনু সে সঙ্গীত মহান্—
গম্ভীর আকাশ হতে, বলে কেবা দিনেরেতে,
কি কাযে ঘুরিস ওরে মানবসন্তান ?

খুলে গেল আঁখি—
দেখিলাম জ্ঞাননেত্রে, এই মর কর্ম্মক্ষেত্রে,
দু দিনের তরে সব—ফাঁকি ফাঁকি ফাঁকি !

আমি আত্মা শুধু ভাবময়—
দেহ—সে বন্ধনমাত্র, ভরমের লীলাক্ষেত্র,
পদে পদে গাঁথা তাহে বিঘ্নবাধাচয়।

কেমনেতে মুক্ত তবে হই ?
কহে অশরীরী বাণী, মৃত্যু তার পথ জানি,
ভরসা থাকে তো যদি বিবরিয়া কই।

'মৃত্যু' শব্দে চমকিত মন।
এত লীলা খেলা ভবে, মরণের তরে তবে,
মরণে এ ব্রত উদ্‌যাপন ?

'মৃত্যু' পুন কহিল সে বাণী—
রহস্য ভেদিতে চাও, মৃত্যুর শরণ লও,
মুকতির এই পথ জানি।

হস্ত পদ অসাড় আমার।
ঘরে ভার্য্যা গুণবতী, অঙ্কে কন্যা স্নেহমতী,
বক্ষে পুত্র গুণের আধার।

বৃদ্ধ মুগ্ধ জনক জননী;
ছাড়িয়ে তাঁদের সেবা, মৃত্যুপথে যাবে কেবা
একি শুনি ভয়ঙ্কর বাণী?

কর্ত্তব্য সে পর উপকার;
সে মহান্ লক্ষ্য ছাড়ি, মৃত্যুপথ অনুসারী
হইলে, হইবে কিবা ফল সে আমার?

পুন বজ্রগম্ভীরস্বরে—
কহে অশরীরী বাণী—" 'মৃত্যু' এর পথ জানি—
যাও পুছ সদ্‌গুরুবরে।

"যাও নগরাজ হিমাচলে;
গুহামাঝে যোগিবর, ধ্যানমগ্ন নিরন্তর
মৃত্যুতত্ত্ব কহিবে সুধালে।"

এত কহি নীরব সে বাণী;
সঙ্গীতলহরী পুন, করে মোরে বিচেতন,
আনন্দের মদিরা প্রদানি।

মূর্চ্ছাভঙ্গে সব বিস্মরণ—
ভাসি গেল মোহমায়া, যায় যাবে যাক্ কায়া,
মন্ত্রের সাধন কিবা শরীর পতন।

এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া,
দৈববাণী অনুসারি, পদব্রাজী, বনচারী,
কত দিনে হিমালয়ে উতরিনু গিয়া।

গুরুদেব সনে দেখা হলো;
উপাসনা মৃত্যুমন্ত্রে (লেগে গেছে হৃদিতন্ত্রে)
করি বহুদিন হৃদে পাইয়াছি আলো।

জানিয়াছি, দেহত্যাগ বড়ই কঠিন।
বাসনার অধিকার, যতদিন পরিহার
না হইবে—পুনঃ পুনঃ জন্মের অধীন।

সমাধিরে মৃত্যু শাস্ত্রে কয়—
সমাধিমরণ হবে, মনেন্দ্রিয় মরে যাবে,
হইবে চৈতন্যচন্দ্র আনন্দে উদয়।

মরিবে সে বিষয়কামনা,
'আমি' তত্ত্ব মরে যাবে, সুখ দুঃখ মরে যাবে,
মরে যাবে রিপুকুল—মরিবে ভাবনা—

মরিবে সে স্নেহ বুকভরা,
ভালবাসা মরে যাবে— জগৎ শ্মশান হবে,
নাচিবে কেবল সেই আত্মা সারাৎসারা।

শূন্যময় হইবে ভুবন—
আমি তুমি ঘুচে যাবে— সব শূন্যময় হবে,
শুধু বহিবেক সেই প্রলয়গর্জ্জন—

যে আহ্বানে হয় জীব তোমার চেতন।
শুধু মৃত্যু নয়—এ যে মহান্ মরণ—
সর্ব্ববিস্মরণকারী মহা জাগরণ!
মৃত্যু নহে এ ত—এ যে মহান্ জীবন!!

যাহা অনন্ত, তাহাই সুখস্বরূপ; ক্ষুদ্র বিষয়ে সুখ নাই। যে অবস্থায় অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শুনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই অনন্ত বা ভূমাপদবাচ্য, আর যে অবস্থায় অন্য কিছু দেখা যায়, অন্য কিছু শুনা যায়, অন্য কিছু জানা যায়, তাহাই ক্ষুদ্র বা সান্ত বা অল্পপদবাচ্য। যাহা ভূমা, তাহা অমৃত; যাহা অল্প, তাহা মর্ত্ত্য। সেই ভূমা আপন মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত, অথবা তিনি কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত নহেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদে নারদের প্রতি
সনৎকুমারবাক্য।

পারা যায় না। কাহার সহিত তুলনায় উহার পরিণাম হইবে? অতএব সেই সমষ্টিই নিরপেক্ষ সত্তা, কিন্তু উহার অন্তর্গত প্রত্যেক অণুই নিরন্তর গতিশীল; এক সময়েই উহা অপরিণামী ও পরিণামী, সগুণ নির্গুণ উভয়ই। আমাদের জগৎ, গতি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণা আর তত্ত্বমসির অর্থ ইহাই। আমাদিগকে আমাদের স্বরূপ জানিতে হইবে।

সগুণ মানুষ তাহার উৎপত্তিস্থল ভুলিয়া যায়, যেমন সমুদ্রের জল সমুদ্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। এইরূপ আমরা সগুণ হইয়া, ব্যষ্টি হইয়া আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি আর অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে বিষমভাবাপন্ন জগৎকে ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় না, উহা কি, তাহাই বুঝিতে বলে। আমরা সেই অনন্ত পুরুষ, সেই আত্মা। আমরা জলস্বরূপ, আর এই জল সমুদ্র হইতে উৎপন্ন—উহার সত্তা সমুদ্রের উপর নির্ভর করিতেছে আর বাস্তবিক পক্ষে উহা সমুদ্র—সমুদ্রের অংশ নহে, সমুদয় সমুদ্রস্বরূপ, কারণ, যে অনন্ত শক্তিরাশি ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান, তাহার সমুদয়ই তোমার ও আমার। তুমি, আমি, এমন কি, প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন কতকগুলি প্রণালীর মত—যাহাদের ভিতর দিয়া সেই অনন্ত সত্তা আপনাকে প্রকাশ করিতেছে আর এই যে পরিবর্ত্তনসমষ্টিকে আমরা 'ক্রমবিকাশ' নাম দিই, তাহারা বাস্তবিকপক্ষে আত্মার নানারূপ শক্তিবিকাশমাত্র, কিন্তু অনন্তের এ পারে, সান্ত জগতে আত্মার সমুদয় শক্তির প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। আমরা এখানে যতই শক্তি, জ্ঞান বা আনন্দলাভ করি না কেন, উহারা কখনই এজগতে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। অনন্ত সত্তা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ আমাদের রহিয়াছে। উহাদিগকে যে আমরা উপার্জ্জন করিব, তাহা নহে, উহারা আমাদেরই রহিয়াছে, প্রকাশ করিতে হইবে মাত্র।

অদ্বৈতবাদ হইতে এই এক মহৎ সত্য পাওয়া যাইতেছে আর ইহা বুঝা বড় কঠিন। আমি বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, সকলেই দুর্ব্বলতা শিক্ষা দিতেছে; জন্মাবধিই আমি শুনিয়া আসিতেছি, আমি দুর্ব্বল। এক্ষণে আমার পক্ষে আমার স্বকীয় অন্তর্নিহিত শক্তির জ্ঞান কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু যুক্তি বিচারের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, আমাকে কেবল আমার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে মাত্র, তাহা হইলেই সব হইয়া গেল। এই জগতে আমরা যে সকল জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, তাহারা কোথা হইতে আসিয়া থাকে? উহারা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে।

দেশে কোন্ জ্ঞান আছে? আমাকে এক বিন্দুও দেখাও। জ্ঞান কখন জড়ে ছিল না; উহা বরাবর মনুষ্যের ভিতরই ছিল। কেহ কখন জ্ঞানের সৃষ্টি করে নাই; মানুষ উহা আবিষ্কার করে, উহাকে ভিতর হইতে বাহির করে। উহা তথায়ই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবৃক্ষ রহিয়াছে, তাহা ঐ সর্ষপবীজের অষ্টমাংশের তুল্য ঐ ক্ষুদ্র বীজে রহিয়াছে—ঐ মহাশক্তিরাশি তথায় নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি, একটী জীবাণুকোষের ভিতর অত্যদ্ভুত প্রখরা বুদ্ধি কুণ্ডলীভূত হইয়া অবস্থান করে; তবে অনন্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে পারিবে? আমরা জানি, ইহা সত্য। প্রহেলিকাবৎ বোধ হইলেও, ইহা সত্য। আমরা সকলেই একটী জীবাণুকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি আর আমাদের যাহা কিছু ক্ষুদ্রশক্তি রহিয়াছে, তাহা তথায়ই কুণ্ডলীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। তোমরা বলিতে পার না, উহা খাদ্য হইতে প্রাপ্ত; রাশীকৃত খাদ্য লইয়া খাদ্যের এক পর্ব্বত প্রস্তুত কর, দেখ, তাহা হইতে কি শক্তি বাহির হয়। আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব্ব হইতেই অন্তর্নিহিত ছিল, অব্যক্ত ভাবে, কিন্তু উহা ছিল নিশ্চয়ই। অতএব সিদ্ধান্ত এই, মানুষের আত্মার ভিতর অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, মানুষ উহার সম্বন্ধে না জানিলেও উহা রহিয়াছে। কেবল উহাকে জানিবার অপেক্ষামাত্র। ধীরে ধীরে যেন এই অনন্তশক্তিমান দৈত্য জাগরিত হইয়া আপনার শক্তিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতেছে, আর যতই সে এই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই তাহার বন্ধনের উপর বন্ধন খসিয়া যাইতেছে, শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাইতেছে আর এমন একদিন অবশ্য আসিবে, যখন এই অনন্তজ্ঞান পুনর্লাভ হইবে; তখন জ্ঞান ও শক্তিমান হইয়া এই দৈত্য দাঁড়াইয়া উঠিবে। এস, আমরা সকলে এই অবস্থা আনয়নে সাহায্য করি।

কর্ম্মজীবনে বেদান্ত।

চতুর্থ প্রস্তাব।

আমরা এ পর্য্যন্ত সমষ্টির আলোচনাই করিয়া আসিয়াছি। অদ্য প্রাতে আমি তোমাদের সমক্ষে ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধবিষয়ে বেদান্তের মত বলিতে চেষ্টা করিব। আমরা প্রাচীনতর দ্বৈতবাদাত্মক বৈদিক মত সকলে দেখিতে পাই, প্রত্যেক জীবের একটী বিশেষ সীমাবিশিষ্ট আত্মা আছে। প্রত্যেক

জীবে অবস্থিত এই বিশেষ আত্মা সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতবাদ আছে, কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ ও প্রাচীন বৈদান্তিকদিগের মধ্যে ইহাই প্রধান বিচারের বিষয় ছিল ;—বৈদান্তিকেরা স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মাতে বিশ্বাস করিতেন, বৌদ্ধেরা এরূপ জীবাত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতেন। আমি পূর্ব্বদিনই তোমাদিগকে বলিয়াছি, ইউরোপে দ্রব্যগুণসম্বন্ধে যে বিচার চলিয়াছিল, এ ঠিক তাহারই মত। একদলের মতে গুণগুলির পশ্চাতে দ্রব্যরূপী কিছু আছে, যাহাতে গুণগুলি লাগিয়া থাকে, আর একদলের মতে দ্রব্য স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, গুণই স্বয়ং থাকিতে পারে। অবশ্য আত্মাসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রাচীন মত অহংসারূপ্যগত যুক্তির উপর স্থাপিত—'আমি আমিই', কল্যকার যে আমি, অদ্যও সেই আমি, আর অদ্যকার আমি আবার আগামীকল্যের আমি হইব, শরীরে যাহা কিছু পরিণাম হইতেছে, তৎসমুদয় সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে, আমি সর্ব্বদাই একরূপ। যাঁহারা সীমাবদ্ধ অথচ স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মায় বিশ্বাস করিতেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান যুক্তি ছিল বলিয়া বোধ হয়।

অপরদিকে,প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ জীবাত্মা স্বীকারের প্রয়োজন অস্বীকার করিতেন। তাঁহারা এই তর্ক করিতেন, আমরা যাহা কিছু জানি, অথবা যাহা কিছু জানা সম্ভব, তাহারা এই পরিণামমাত্র। একটী অপরিণমী ও অপরিণামী দ্রব্যস্বীকার কেবল বাহুল্যমাত্র, আর বাস্তবিক যদিও এরূপ অপরিণামী বস্তু কিছু থাকে, আমরা কখনই উহা বুঝিতে পারিব না, আর কোনরূপেও কখন প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না। বর্ত্তমানকালেও ইউরোপে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানবাদী (Idealist) এবং আধুনিক প্রত্যক্ষবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদের ভিতর সেইরূপ বিচার চলিতেছে—একদলের বিশ্বাস—অপরিণামী পদার্থ কিছু আছে। ইঁহাদের সর্ব্বশেষ প্রতিনিধি—হার্ব্বাট স্পেন্সার—ইনি বলেন, আমরা যেন অপরিণামী কোন পদার্থের আভাস পাইয়া থাকি। অপর মতের প্রতিনিধি আধুনিক কোম্‌তের শিষ্যগণ ও আধুনিক অজ্ঞেয়বাদিগণ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিঃ হ্যারিসন ও মিঃ হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মধ্যে যে তর্ক হইয়াছিল, তোমাদের মধ্যে যাহারা উহা আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়াছিলে, তাহারা দেখিয়া থাকিবে, ইহাতেও সেই প্রাচীন গোল বিদ্যমান ; একদল পরিণামী বস্তুসমূহের পশ্চাতে কোন অপরিণামিসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, অপর দল এরূপ স্বীকার করিবার আবশ্যকতাই একেবারে অস্বীকার করিতেছেন। একদল

বলিতেছেন, আমরা অপরিণামী সত্তার ধারণা ব্যতীত পরিণাম ভাবিতেই পারি না, অপর দল যুক্তি দেখান, এরূপ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই ; আমরা কেবল পরিণামী পদার্থেরই ধারণা করিতে পারি। অপরিণামী সত্তাকে আমরা জানিতে, অনুভব করিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

ভারতেও এই মহান্ প্রশ্নের সমাধান অতি প্রাচীনকালে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, কারণ, আমরা দেখিয়াছি, গুণসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত অথচ গুণভিন্ন পদার্থের সত্তা কখনই প্রমাণ করা যাইতে পারে না ; শুধু তাহাই নহে, অহং-সারূপ্যগত আত্মার প্রমাণ, স্মৃতি হইতে যে আত্মার অস্তিত্বের যুক্তি, কালও যে আমি ছিলাম, আজও সেই আমি আছি, কারণ, আমার উহা স্মরণ আছে, অতএব আমি বরাবর আছি, এই যুক্তিও কোন কাযের নহে। আর একটী যুক্ত্যাভাস যাহা সচরাচর কথিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল কথার মারপ্যাঁচ মাত্র। 'আমি যাচ্চি', 'আমি খাচ্চি,' 'আমি স্বপ্ন দেখ্‌চি,' 'আমি ঘুমুচ্চি,' 'আমি চল্‌চি,' এইরূপ কতকগুলি বাক্য লইয়া তাঁহারা বলেন, করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা, এ সব বিভিন্ন পরিণাম, কিন্তু উহার মধ্যে 'আমি'টী নিত্য। এইরূপে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, এই 'আমি' নিত্য ও স্বয়ং একটী ব্যক্তি আর ঐ পরিণামগুলি শরীরের ধর্ম্ম। এই যুক্তি আপাততঃ খুব উপাদেয় ও সুস্পষ্ট বোধ হইলেও বাস্তবিক উহা কেবল কথার মারপেঁচের উপর স্থাপিত। এই আমি এবং করা যাওয়া স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি কাগজে কলমে পৃথক্ হইতে পারে, কিন্তু মনে কেহই ইহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারে না।

যখন আমি আহার করি, খাইতেছি বলিয়া চিন্তা করি, তখন আহারকার্য্যের সহিত আমার তাদাত্ম্যভাব হইয়া যায়। যখন আমি দৌড়াইতে থাকি, তখন আমি ও দৌড়ান দুইটী পৃথক্ বস্তু থাকে না। অতএব এই যুক্তি বড় দৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না। যদি আমার অস্তিত্বের সারূপ্য আমার স্মৃতিদ্বারা প্রমাণ করিতে হয়, তবে আমার যে সকল অবস্থা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, সেই সকল অবস্থায় আমি ছিলাম না, বলিতে হয়। আর আমরা জানি, অনেক লোক, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সমুদয় অতীত অবস্থা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। অনেক উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তি আপনাদিগকে কাচনির্ম্মিত অথবা কোন পশু বলিয়া ভাবিতে দেখা যায়। যদি স্মৃতির উপর সেই ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে সে অবশ্য কাচ অথবা পশুবিশেষ হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে ; কিন্তু বাস্তবিক যখন তাহা হয় নাই, তখন আমরা এই অহংসারূপ্য, স্মৃতিবিষয়ক

অকিঞ্চিৎকর যুক্তির উপর স্থাপিত করিতে পারি না। তবে কি ধারণা হইল? দাঁড়াইল এই যে, সীমাবদ্ধ অথচ সম্পূর্ণ ও নিত্য অহংএর সসীম আমরা গুণসমূহ হইতে পৃথক্‌ভাবে স্থাপন করিতে পারি না। আমরা এমন কোন সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব স্থাপন করিতে পারি না, যাহার পশ্চাতে গুণগুলি লাগিয়া রহিয়াছে।

অপর পক্ষে প্রাচীন বৌদ্ধদের এই মত দৃঢ়তর বলিয়া বোধ হয় যে, গুণ-সমূহের পশ্চাতে অবস্থিত কোন বস্তুর সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না এবং জানিতেও পারি না। তাঁহাদের মতে অনুভূতি ও ভাবরূপ কতকগুলি গুণের সমষ্টিই আত্মা। এই গুণরাশিই আত্মা আর উহারা ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল। অদ্বৈতবাদের দ্বারা এই উভয় মতের সামঞ্জস্য সাধন হয়।

অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত এই, আমরা বস্তুকে গুণ হইতে পৃথক্‌রূপে চিন্তা করিতে পারি না এ কথা সত্য আর আমরা পরিণাম ও অপরিণাম এ দুটীও একসঙ্গে ভাবিতে পারি না। এরূপ চিন্তা করা অসম্ভব। কিন্তু যাহাকে বস্তুই বলা হইতেছে, তাহাই গুণস্বরূপ। দ্রব্য ও গুণ পৃথক্ নহে। অপরিণামী বস্তুই পরিণামিরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এই অপরিণামী সত্তা, পরিণামী জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে। পারমার্থিক সত্তা ব্যবহারিক সত্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু নহে, কিন্তু সেই পারমার্থিক সত্তাই ব্যবহারিক সত্তা হইয়াছেন। অপরিণামী আত্মা আছেন আর আমরা যাহাদিগের অনুভূতি, ভাব প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকি, শুধু তাহাই নহে, শরীর পর্য্যন্তও সেই আত্মস্বরূপ আর বাস্তবিক আমরা এক সময়ে দুই বস্তুর অনুভব করি না, একটীরই করিয়া থাকি। আমাদের শরীর আছে, মন আছে, আত্মা আছে, এরূপ ভাবা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, আমাদের একটী যাহা হয় কিছু আছে, একটীরই এক সময়ে অনুভব হইয়া থাকে, দুই প্রকারের পর্য্যন্ত অনুভূত এক সময়ে হয় না।

যখন আমি আমাকে শরীর বলিয়া চিন্তা করি, তখন আমি শরীরমাত্র; 'আমি ইহার অতিরিক্ত কিছু' বলা বৃথামাত্র। আর যখন আমি আমাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করি, তখন দেহ কোথায় উড়িয়া যায়, দেহানুভূতি আর থাকে না। দেহজ্ঞান দূর না হইলে কখন আত্মানুভূতি হয় না। গুণের অনুভূতি চলিয়া না গেলে বস্তুর অনুভব কেহই করিতে পারেন না।

এইটী পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য অদ্বৈতবাদীদের প্রাচীন রজ্জুসর্পের

বলিতেছেন—গণ্য করা যাইতে পারে। যখন লোকে দড়িকে সাপ বলিয়া ভুল করে, তখন তাহার পক্ষে দড়ি উড়িয়া যায় আর যখন সে উহাকে যথার্থ দড়ি বলিয়া বোধ করে, তখন তাহার সর্পজ্ঞান কোথায় চলিয়া যায়, তখন কেবল দড়িটীই অবশিষ্ট থাকে। কেবলমাত্র বিশ্লেষণপ্রণালী অনুসরণ করাতেই আমাদের এই দ্বিত্ব বা ত্রিত্বের অনুভূতি হইয়া থাকে। বিশ্লেষণের পর পুস্তকে উহা লিখিত হইয়াছে। আমরা ঐ সকল গ্রন্থপাঠ করিয়া অথবা উহাদের সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছি যে, সত্যই বুঝি আমাদের আত্মা ও দেহ উভয়েরই অনুভব হইয়া থাকে—বাস্তবিক কিন্তু তাহা কখন হয় না। হয় দেহ নয় আত্মার অনুভব হইয়া থাকে। উহা প্রমাণ করিতে কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজে মনে মনে ইহা পরীক্ষা করিতে পার।

তুমি আপনাকে দেহশূন্য আত্মা বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর দেখ; তুমি দেখিবে, ইহা একরূপ অসম্ভব আর যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ইহাতে কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহারা দেখিবেন, যখন তাঁহারা আপনাদিগকে আত্মস্বরূপ অনুভব করিতেছেন, তখন তাঁহাদের দেহজ্ঞান থাকে না। তোমরা হয়ত দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, অনেক ব্যক্তি, বশীকরণ (Hypnotism) প্রভাব অথবা স্নায়ুরোগ বা অন্য কোন কারণে সময়ে সময়ে এক প্রকার বিশেষরূপ অবস্থা লাভ করেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তোমরা জানিতে পার, যখন তাঁহারা ভিতরের কিছু অনুভব করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান একেবারে উড়িয়া গিয়াছিল, মোটেই ছিল না। ইহা হইতেই বোধ হইতেছে, অস্তিত্ব একটী, দুইটী নহে। সেই একই নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন আর তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ আছে। কার্য্যকারণসম্বন্ধের অর্থ পরিণাম, একটী অপরটীতে পরিণত হয়। সময়ে সময়ে যেন কারণের অন্তর্দ্ধান হয়, তৎস্থলে কার্য্য অবশিষ্ট থাকে। যদি আত্মা দেহের কারণ হন, তবে যেন কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার অন্তর্দ্ধান হয়, তৎস্থলে দেহ অবশিষ্ট থাকে আর যখন শরীরের অন্তর্দ্ধান হয়, তখন আত্মা অবশিষ্ট থাকেন। এই মতে বৌদ্ধদের মত খণ্ডিত হইবে। বৌদ্ধেরা আত্মা ও শরীর এই দুইটী পৃথক্, এই অনুমানের বিরুদ্ধে তর্ক করিতেছিলেন। এক্ষণে অদ্বৈতবাদের দ্বারা এই দ্বৈতভাব অস্বীকৃত হওয়াতে এবং দ্রব্য ও গুণ একই বস্তুর বিভিন্নরূপ প্রদর্শিত হওয়াতে তাঁহাদের মত খণ্ডিত হইল।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, অপরিণামিত্ব কেবল সমষ্টি সম্বন্ধেই সত্য

হইতে পারে, ব্যষ্টিসম্বন্ধে নহে। পরিণাম—গতি, এই ভাবের সহিত ব্যষ্টির ধারণা জড়িত। যাহা কিছু সসীম, তাহাই পরিণামী, কারণ, অপর কোন সসীম পদার্থ বা অসীমের সহিত তুলনায় তাহার পরিণাম চিন্তা করা যাইতে পারে, কিন্তু সমষ্টি অপরিণামী, কারণ, উহা ব্যতীত আর কিছু নাই, যাহার সহিত তুলনা করিয়া তাহার পরিণাম বা গতি চিন্তা করা যাইবে। পরিণাম কেবল অপর কোন অল্প পরিণামী বা একেবারে অপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় চিন্তা করা যাইতে পারে।

অতএব অদ্বৈতবাদমতে, সর্ব্বব্যাপী, অপরিণামী, অমর আত্মার অস্তিত্ব যথাসম্ভব প্রমাণের বিষয়। ব্যষ্টিসম্বন্ধেই গোলমাল। তবে আমাদের প্রাচীন দ্বৈতবাদাত্মক মতসকলের কি হইবে, যাহারা আমাদের উপর এখনো ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করিতেছে? সসীম, ক্ষুদ্র, ব্যক্তিগত আত্মাসম্বন্ধে কি হইবে?

আমরা দেখিয়াছি, সমষ্টিভাবে আমরা অমর, কিন্তু প্রশ্ন এই, আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তিহিসাবেও অমর হইতে ইচ্ছুক। ইহার কি হইল? আমরা দেখিয়াছি, আমরা অনন্ত আর তাহাই আমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আমরা এই ক্ষুদ্র আত্মাকে ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে অমর করিয়া রাখিতে চাই। সেই সকল ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের কি হয়? আমরা দেখিতেছি, ইহাদের ব্যক্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব সদাই বিকাশশীল। এক বটে, অথচ পৃথক্। কালকার আমি আজকার আমিও বটি, আবার নাও বটি। ইহাতে দ্বৈত-ভাবাত্মক ধারণা অর্থাৎ পরিণামের ভিতরে একত্ব সূত্র রহিয়াছে, এইমত পরি-ত্যক্ত হইল আর খুব আধুনিক ভাব, যথা ক্রমবিকাশবাদ মত গ্রহণ করা হইল। সিদ্ধান্ত হইল, উহার পরিণাম হইতেছে বটে, কিন্তু এ পরিণামের ভিতরে একটী সারূপ্য রহিয়াছে; উহা নিত্য বিকাশশীল।

যদি ইহা সত্য হয় যে, মানুষ মাংসল জন্তুবিশেষের (Mollusca) পরি-ণামমাত্র, তবে সেই জন্তু ও মানুষ একই পদার্থ, কেবল মানুষ সেই জন্তুবিশেষের বহুপরিমাণে বিকাশমাত্র। উহা ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইতে হইতে অনন্তের দিকে চলিয়াছে, এক্ষণে মানুষরূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব সীমাবদ্ধ জীবা-ত্মাকেও ব্যক্তি বলা যাইতে পারে, তিনি ক্রমশঃ পূর্ণব্যক্তিত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তখনই লাভ হইবে, যখন তিনি অনন্তে পঁহুছিবেন, কিন্তু সেই অবস্থালাভের পূর্ব্বে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ক্রমাগত পরিণাম, ক্রমাগত বিকাশ হইতেছে।

অদ্বৈতবেদান্তের এক বিশেষ প্রকার গতি ছিল। অনেক সময় ইহাতে উহার অনেক উপকার হইয়াছিল আবার ইহাতে কখন কখন উহার গভীর তত্ত্বের অনেক ক্ষতিও হইয়াছে; সেই গতি এই—পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতের সহিত উহার সামঞ্জস্য সাধন করা। বর্ত্তমানকালে ক্রমবিকাশবাদীদের যে মত, তাঁহাদেরও সেই মত ছিল, অর্থাৎ তাঁহারা বুঝিতেন, সমুদয়ই ক্রমবিকাশের ফল আর এই মতের সহায়তায় তাঁহারা সহজেই পূর্ব্বে পূর্ব্ব প্রণালীর সহিত এই মতের সামঞ্জস্যবিধানে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মতই পরিত্যক্ত হয় নাই। বৌদ্ধমতের এই একটী বিশেষ দোষ ছিল যে, তাঁহারা এই ক্রমবিকাশবাদ বুঝিতেন না, সুতরাং তাঁহারা আদর্শে আরোহণ করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী সোপানগুলির সহিত তাঁহাদের মতের সামঞ্জস্য করিবার কোন চেষ্টা পান নাই। বরং সেগুলিকে নিরর্থক ও অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এরূপ গতি ধর্ম্মে বড় অনিষ্টকর হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি এক নূতন ও শ্রেষ্ঠতর ভাব কিছু পাইল। তখন সে তাহার পুরাতন ভাবগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিদ্ধান্ত করে, সেগুলি অনিষ্টকর ও অনাবশ্যক ছিল। সে কখন ইহা ভাবে না যে, তাহার বর্ত্তমান দৃষ্টি হইতে সেগুলিকে এখন যতই বিসদৃশ বোধ হউক না, তাহারা তাহার পক্ষে এক সময়ে অত্যাবশ্যকীয় ছিল, তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় পঁহুছিতে তাহাদের বিশেষ উপযোগিতা ছিল আর আমাদের প্রত্যেককেই সেইরূপ উপায়ে আত্মবিকাশ করিতে হইবে, সেই সকল ভাব গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে ভালটুকু লইতে হইবে তৎপরে উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ করিতে হইবে। এই জন্য অদ্বৈতবাদ প্রাচীনতম মতসমূহের উপর, দ্বৈতবাদের উপর এবং আর আর মত যাহা তাহারও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, সকলেরই প্রতি মিত্রভাবাপন্ন। এরূপ নয় যে, তিনি উচ্চমঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া সেগুলিকে যেন দয়ার চক্ষে দেখিতেছেন। তাহা নহে; তাঁহার ধারণা, সেগুলিও সত্য; একই সত্যের বিভিন্ন বিকাশ আর অদ্বৈতবাদ যে সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছেন, তাঁহারাও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

অতএব মানুষকে যে সকল সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া উঠিতে হয়, সেগুলির প্রতি পরুষ ভাষা প্রয়োগ না করিয়া বরং তাহাদের প্রতি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। এই জন্যই বেদান্তে এই সকল ভাব যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে, পরিত্যক্ত হয় নাই। আর এই জন্যই দ্বৈতবাদসম্মতপূর্ণজীবাত্মবাদও বেদান্তে স্থান পাইয়াছে।

সেখানে এরূপও ত হইতে পারে যে, যাহাকে (যে শিষ্যকে) সংপ্রতি উপদেশ করা হইতেছে, তাহার সহিত ত পূর্ব্বে কোন সম্বন্ধ করা হয় নাই ?

তাহা হইলে লৌকিক বিষয়েও এইরূপই বলিব যে, যে গোজ্ঞানরহিত ব্যক্তিকে সংপ্রতি গোর বিষয় উপদেশ করা হইতেছে, তাহার সহিতও সম্বন্ধ পূর্ব্বে করা হয় নাই ?

যদি বল যে, পূর্ব্বেই করা আছে ?

তবে এখানেও সেইরূপই করা আছে জানিবে।

বার্ত্তিকমূল।—সতো বৃদ্ধ্যাদিষু সংজ্ঞাভাবাত্তদাশ্রয় ইতরেতরাশ্রয়ত্বাদপ্রসিদ্ধিঃ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সংজ্ঞিবাচক বৃদ্ধ্যাদি সিদ্ধ বর্ণসমূহে, সংজ্ঞার ভাব প্রযুক্ত তদাশ্রয় হেতু, ইতরেতরাশ্রয় হইবে, সুতরাং অসিদ্ধি হইবে। *।

ভাষ্যমূল।—সতঃ সংজ্ঞিনঃ সংজ্ঞাভাবাত্তদাশ্রয়ে সংজ্ঞিনি বৃদ্ধ্যাদিষিতরেতরাশ্রয়ত্বাদপ্রসিদ্ধিঃ। কা ইতরেতরাশ্রয়তা। সতামাদৈচাং সংজ্ঞয়া ভবিতব্যং সংজ্ঞয়া আদৈচো ভাব্যন্তে। তদেতদিতরেতরাশ্রয়ং ভবতি। ইতরেতরাশ্রয়াণি চ কার্য্যাণি ন প্রকল্পন্তে। তদ্যথা। নৌর্নাবি বদ্ধানেতরত্রাণায় ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'বৃদ্ধিরেচি।৬।১।৮৮। (অ বর্ণের পরে, 'এচ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ থাকিলে, 'বৃদ্ধি' রূপ এক আদেশ হয়) এই সূত্রে, সংজ্ঞাবোধক 'বৃদ্ধি' শব্দের আদেশ হইয়াছে। এই স্থলে, সংজ্ঞাবাচক 'বৃদ্ধি' এই শব্দটী না বলিলে কি আদেশ হয়, তাহার কিছুই প্রতীতি হয় না, আবার, আ, ঐ, ঔ, ইহারা যে বৃদ্ধিসংজ্ঞাবাচক, তাহাও ইহারা বর্ত্তমান্ না থাকিলে, হইতে পারে না। অতএব সংজ্ঞী আ, ঐ, ঔ, ইহারা বর্ত্তমান না থাকিলে, বৃদ্ধিসংজ্ঞা হইতে পারে না, আবার সংজ্ঞাবাচক 'বৃদ্ধি' শব্দ উপস্থিত না থাকিলেও কোন্ কোন্ বর্ণের উপস্থিতি হইবে, তাহার প্রতীতি হয় না। এই জন্যই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে ;—পূর্ব্বে আ ঐ ঔ প্রভৃতি সংজ্ঞী বর্ত্তমান থাকিলে, পরে তাহা সংজ্ঞাভাব ধারণ করিবে, সুতরাং সংজ্ঞার আশ্রয়স্বরূপ সংজ্ঞীতে, আর 'বৃদ্ধি' এই সংজ্ঞাবোধক শব্দ উচ্চারণ করিলে পরে বোধ হয় যে (আ ঐ ঔ) সংজ্ঞী, তাহার আশ্রয় স্বরূপ 'বৃদ্ধি' প্রভৃতি সংজ্ঞাসমূহেতে, ইতরেতরাশ্রয় প্রযুক্ত অপ্রসিদ্ধি হইবে।

কিরূপে ইতরেতরাশ্রয়তা হইল ?

সংজ্ঞিবোধক আ ঐ ঔ বর্ত্তমান থাকিলে, পরে তাহার 'বৃদ্ধি' প্রভৃতি

সংজ্ঞা হইবে। আবার সংজ্ঞাবাচক 'বৃদ্ধি' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ করিলে পরে (বৃদ্ধিরেচি বৎ) আ ঐ ঔ প্রভৃতির উপস্থিতি হইবে। অতএব ইহারা এক অন্তকে পরস্পর আশ্রয় করিয়াছে।

ইতরেতর অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াছে, এমন যে শাস্ত্র, সে কোনও কার্য্যে প্রকল্পিত অর্থাৎ ব্যবহৃত হইতে পারে না। যেমন, এক নৌকা, অন্য নৌকাতে বদ্ধ থাকিলে, একটা অন্যটাকে ত্রাণ করিতে (স্রোত হইতে উদ্ধার করিতে) পারেনা। (১)

ভাষ্যমূল।—নমু চ ভোঃ ইতরেতরাশ্রয়াণ্যপি কার্য্যাণি দৃশ্যন্তে। তদ্‌-যথা। নৌঃ শকটং বহতি শকটং চ নাবং বহতি। অন্যদপি তত্র কিঞ্চিদ্ভবতি জলং স্থলংবা। স্থলে শকটং নাবং বহতি জলে নৌঃ শকটং বহতি। যথা তর্হি ত্রিবিষ্টব্ধকম্। তত্রাপ্যস্ততঃ সূত্রকং ভবতি। ইদং পুনরিতরেতরা-শ্রয়মেব।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বল যে, ওহে! (দোষদাতা!) ইতরেতরাশ্রয়-প্রযুক্ত কার্য্যও ত ব্যবহারে দেখা যায়?

যেমন,—নৌকা, শকট (গাড়ী) বহন করিয়া থাকে; আবার শকটও নৌকা বহন করিয়া থাকে (২)?

আর কিছু সেখানে আছে কি,—জল হউক বা স্থলই হউক? স্থলভাগে, শকট, নৌকাবহন করে; আর জলভাগে, নৌকা, শকট বহন করিয়া থাকে। অর্থাৎ যদি দুইটী বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে; তবেই ইতরেতরা-শ্রয় দোষ হইয়া থাকে; সুতরাং তৎপ্রযুক্ত কোন কার্য্যসিদ্ধিও সম্ভব হয় না।

---

(১) যদি কোনও স্রোত জলে দুই খানি নৌকা ভাসিয়া যায়; তবে তাহার একখানি নৌকাকে অবলম্বন করিয়া, আর একখানি পার হইতে পারে না। যেহেতু এইখানিও চায় ঐখানিকে ধরিয়া পার হইতে, আবার ঐখানিও চায় এইখানিকে ধরিয়া পার হইতে। অতএব দুইখানিই ভাসিয়া যায়, একখানিও পার হইতে পারে না।

(২) পূর্ব্বে রাজগণ, দিগ্বিজয় বা শত্রুদমনার্থ বহির্গত হইলে, শত্রু রাজার রাজধানীর চতুর্দ্দিকে যে কৃত্রিম গড় বা পরিখা কাটান থাকিত, সেই জলাশয় পার হইবার জন্য, গাড়ীতে করিয়া নৌকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। পরে সেই জলাশয়ে গাড়ী চলিতে পারে না বলিয়া নৌকায় গাড়ী রসদাদি উঠাইয়া তাঁহারা জলাশয় পার হইতেন।

কিন্তু নৌকা ও শকটের মধ্যে, কেবল ইহারা উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে নাই। ইহাদের মধ্যে আর অন্য আশ্রয় জল অথবা স্থল রহিয়াছে। সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়ও হয় নাই; কার্য্যের বাধাও হয় নাই।

তবে যদি 'ত্রিবিষ্টব্ধকের' (১) দৃষ্টান্ত বল, যে সেখানেও ত তিন খানি কাষ্ঠ, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে?

সেই স্থলেও কেবল তিনখানি কাষ্ঠই যে, দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা নহে। সেখানেও (মৃত্তিকার উপরে থাকে, এই সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও) অন্ততঃ পক্ষে কাষ্ঠ তিনখানি বাঁধিতে একগাছি সূত্র থাকে। সুতরাং সেখানেও ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয় নাই। এখানে ('বৃদ্ধি'এবং 'আদৈচ্' বিষয়ে) কিন্তু ইতরেতরাশ্রয়ই হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূল।—সিদ্ধংতু নিত্যশব্দত্বাৎ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—এইস্থলে, শব্দের নিত্যত্ব হেতুই সিদ্ধ হইবে।*।

ভাষ্যমূল।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। নিত্যশব্দত্বাৎ। নিত্যাঃ শব্দাঃ নিত্যেষু শব্দেষু সতামাদৈচাং সংজ্ঞাঃ ক্রিয়তে ন সংজ্ঞয়া আদৈচোভাব্যন্তে। যদি তর্হি নিত্যাঃ শব্দাঃ কিমর্থং শাস্ত্রম্।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা (প্রয়োগাদি) সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

শব্দের নিত্যত্ব হেতুই সিদ্ধ হইবে। যে সকল শব্দ সিদ্ধির জন্য এত যত্ন করা হইতেছে, তাহারা পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ আছে। কারণ, শব্দ হইয়াছে নিত্য-পদার্থ; অতএব নিত্য শব্দসমূহেই আকার ঐকার ঔকার প্রভৃতি শব্দের, সংজ্ঞা করা হইতেছে, কিন্তু 'বৃদ্ধি'প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কখনও আ, ঐ, ঔ প্রভৃতির উৎপত্তি করান হয় নাই।

শব্দ যদি নিত্যই হয়, তবে (ব্যাকরণাদি) শাস্ত্রের প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূল—কিমর্থং শাস্ত্রমিতি চেন্নিবর্ত্তকত্বাৎ সিদ্ধম্।*।

বার্ত্তিকানুবাদ।—শব্দ নিত্য হইলে শাস্ত্রের প্রয়োজন কি, যদি এই কথা জিজ্ঞাসা কর; তবে অসাধু প্রয়োগ নিবৃত্তির জন্য শাস্ত্র সিদ্ধ হইবে।*

ভাষ্যমূল।—নিবর্ত্তকং শাস্ত্রম্। কথম্। মৃজিরস্মায়বিশেষেণোপদিষ্টস্তস্য

(১) পূর্ব্বে প্রদীপ রাখিবার জন্য তিনখানি কাষ্ঠ আড়া আড়ি করিয়া বাঁধিয়া দীপাধার করা হইত, তাহাকে 'ত্রিবিষ্টব্ধক' বলা হইত।

সর্ব্বত্র মৃজিবৃদ্ধিঃ প্রসক্তা তত্রানেন নিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে। মৃজেঃকৃঙিৎসু প্রত্যয়েষু মৃজিপ্রসঙ্গে মার্জিঃ সাধুর্ভবতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—শব্দ নিত্য হইলেও, অসাধু প্রয়োগের নিবৃত্তির জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন।

কেন?

মৃজি ধাতু (মৃজূ শুদ্ধৌ) আচার্য্য পাণিনিকর্ত্তৃক অবিশেষরূপে (সাধারণতঃ) উপদিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং তাহার (মৃজিধাতুর) সর্ব্বত্রই মৃজি বৃদ্ধির প্রসঙ্গ হইয়াছে, সেই (অসঙ্গত সঙ্গত সকল স্থানের) সাধারণ বৃদ্ধি; এই শাস্ত্রদ্বারা (অসঙ্গতস্থানের বৃদ্ধি) নিবৃত্তি করা হয়।

যেমন; 'মার্ষ্টি,' এইস্থলে, 'মৃজি' ধাতুর প্রসঙ্গ রহিয়াছে। 'মৃজি'ধাতুর অবিশেষরূপে উপদেশ করাতে, 'মার্ষ্টি' এইরূপ সাধুপ্রয়োগ স্থলেও 'মৃষ্টি'এইরূপ অসাধু প্রয়োগ হইবে। এইজন্যই 'মৃজের্বৃদ্ধিঃ' ।৭।২।১১৪।

('মৃজি'ধাতুস্থিত, ইক্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের বৃদ্ধি হয়, ধাতুপ্রত্যয় পরে থাকিলে) এইরূপ শাস্ত্র (সূত্র) করিবার প্রয়োজন; যেন, ককার, ঙকার এবং গকার ইৎপ্রত্যয় ভিন্ন, অন্য প্রত্যয় পরে থাকিলে, মৃজিধাতুর প্রসঙ্গ হইলে, 'মার্জি' এইরূপ সাধু প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

বার্ত্তিকমূল।—প্রত্যেকংগুণবৃদ্ধিসংজ্ঞে ভবত ইতি বক্তব্যম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, গুণ এবং বৃদ্ধি যেখানেই আদেশ করা যাইবে, সেখানে একটী বর্ণের প্রতিই গুণ বা বৃদ্ধি সংজ্ঞা হইবে। *

ভাষ্যমূল।—কিং প্রয়োজনম্। সমুদায়ে মাভূতামিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রতি একটী বর্ণের প্রতি গুণ বা বৃদ্ধিসংজ্ঞা হয়; এইরূপ বলিবার প্রয়োজন কি?

সমুদায়ে সংজ্ঞা না হয়, ইহাই প্রয়োজন।

বার্ত্তিকমূল।—অন্যত্র সহবচনাৎ সমুদায়ে সংজ্ঞাপ্রসঙ্গঃ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অন্যত্র (অন্যান্য সূত্রে) 'সহ' এই বচন প্রয়োগ করাতেই জানিব যে, এইস্থলে, সমুদায়ে গুণ বৃদ্ধি প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রসঙ্গ প্রাপ্তি হইবে না। *।

ভাষ্যমূল।—অন্যত্র সহ বচনাৎ সমুদায়ে বৃদ্ধিগুণসংজ্ঞয়োরপ্রসঙ্গঃ। যত্রেচ্ছতি সহভূতানাং কার্য্যং করোতি তত্র সহগ্রহণম্। তদ্যথা। সহসুপা। উভে অভ্যস্তং সহেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অন্যান্য স্থানে 'সহ' এইবচন প্রয়োগ থাকাতে, সমুদায়ে গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞার প্রসঙ্গ হইবেনা। কারণ যেখানেই (পাণিনি ঋষি) একত্র মিলিত শব্দ সমূহের কার্য্য ইচ্ছা করিয়াছেন, সেখানেই 'সহ' শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন।

যেমন,—"সহসুপা।২।১।৪।" (সমর্থ পদের সহিত সুবন্ত পদের সমাস হইয়া থাকে; যথা,—অক্ষঃপর পরোক্ষম্)। "উভে অভ্যস্তং সহ। ৬।১।৫।" (ষষ্ঠ অধ্যায়স্থিত দ্বিত্ব প্রকরণে, যে দ্বিত্ব বিহিত হইয়াছে, তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া 'অভ্যস্ত'সংজ্ঞা হয়)।

ইত্যাদি সূত্রে 'সহ' শব্দের গ্রহণ হওয়াতে সমুদায়ের গ্রহণ হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূল।—প্রত্যবয়বং চ বাক্যপরিসমাপ্তেঃ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—কোনও বাক্যপ্রয়োগকালীন দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার প্রতি অবয়বেই বাক্য সমাপ্তি হইয়া থাকে, এইহেতুই জানিতে হইবে যে, গুণবৃদ্ধিসংজ্ঞাও সমুদায়ে না হইয়া প্রত্যেকে হইবে। *

ভাষ্যমূল।—প্রত্যবয়বং চ বাক্যপরিসমাপ্তির্দৃশ্যতে। তদ্যথা। দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তবিষ্ণুমিত্রা ভোজ্যন্তামিতি। ন চোচ্যতে প্রত্যেকমিতি। প্রত্যেকং চ ভুঞ্জঃ পরিসমাপ্যতে। ননু চায়মস্তি দৃষ্টান্তঃ। সমুদায়ে বাক্যপরিসমাপ্তি-রিতি। তদ্যথা। গর্গাঃ শতং দণ্ড্যন্তামিতি। অর্থিনশ্চ রাজানো হিরণ্যেন ভবন্তি। ন চ প্রত্যেকং দণ্ডয়ন্তি। সত্যেতস্মিন্ দৃষ্টান্তে যদি তত্র সহ গ্রহণং ক্রিয়তে। ইহাপি প্রত্যেকমিতি বক্তব্যম্। অথ তত্রান্তরেণ সহগ্রহণং সহভূতানাং কার্য্যং ভবতি। ইহাপি নার্থঃ প্রত্যেকমিতি বচনেন।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রতি অবয়বেও বাক্যপরিসমাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন;—'দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত বিষ্ণুমিত্রেরা ভোজন করুন' বলিলে, এই কথা বলে না যে, 'ইঁহারা প্রত্যেকে ভোজন করুন'; অথচ ভোজনক্রিয়া, প্রত্যেকেতে সমাপ্তি হইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ ভোজন করিয়া থাকে।

যদি বল যে, কেন, এই ত সমুদায়ে বাক্যপরিসমাপ্তির দৃষ্টান্ত রহিয়াছে,—যেমন,—'গর্গবংশীয় সন্তানদিগকে শতমুদ্রা দণ্ড কর;' রাজা এইরূপ আদেশ করিলে, যদিও রাজাগণ হিরণ্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে,তথাপি (শতমুদ্রা গর্গবংশের) প্রত্যেক লোককে দণ্ড করে না। অতএব এইরূপ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি সেখানে 'সহ' শব্দের গ্রহণ করা হইত, তবে এখানেও (গুণবৃদ্ধিসংজ্ঞাতে) 'প্রত্যেক'এর কথা বলা উচিত ছিল। আর যদি বিনা 'সহ' শব্দের গ্রহণেই

সহভূত (একত্র মিলিত সমুদায়) বিষয়ের গ্রহণ হয়, তবে এখানে (আ, ঐ, ঔ-এর প্রত্যেক বর্ণে) ও 'প্রত্যেক' এই বচন প্রয়োগের প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূল।—অথ কিমর্থমাকারস্তপরঃ ক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ। অনন্তর বক্তব্য এই যে, 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'আৎ' এই স্থলে 'ত'কার পর বিশিষ্ট কেন করা হইল?

বার্ত্তিকমূল।—আকারস্য তপরকরণং সবর্ণার্থম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'আৎ'এর আকার, তপরবিশিষ্ট করিবার প্রয়োজন, আকারের সবর্ণ অর্থাৎ আকারের তুল্য বর্ণ কেবল দীর্ঘ আকারস্থিত উদাত্তানুদাত্তাদির গ্রহণের জন্য। *।

ভাষ্যমূল।—আকারস্য তপরকরণং ক্রিয়তে। কিং প্রয়োজনম্। সবর্ণার্থম্। তপরস্তৎকালস্যেতি তৎকালানাং সবর্ণানাং গ্রহণং যথা স্যাৎ। কেষাম্। উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানাম্। কিঞ্চ কারণং ন স্যাৎ। ভেদকত্বাৎ স্বরস্য। ভেদকা উদাত্তাদয়ঃ। কথং পুনর্জ্ঞায়তে ভেদকা উদাত্তাদয় ইতি। এবং হি দৃশ্যতে লোকে। য উদাত্তে কর্ত্তব্যেঽনুদাত্তং করোতি খণ্ডিকোপাধ্যায়স্তস্মৈ চপেটাং দদাতি। অন্যত্ত্বং করোষীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আকারের 'ত', পরে করা হইয়াছে। ইহার প্রয়োজন কি?

সবর্ণের গ্রহণ জন্য—'তপরস্তৎকালস্য' ১।১।৭০। (১) এই সূত্রানুসারে, আকারের সমান কালবিশিষ্ট বর্ণসমূহের যাহাতে গ্রহণ হইতে পারে।

কাহাদের (কোন্ বর্ণের)?

উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত উচ্চারণবিশিষ্টবর্ণসমূহের।

'ত'পরে উচ্চারণ না করিয়া কেবলমাত্র আকারের উচ্চারণ করিলেই বা, কেন উদাত্তাদির গ্রহণ না হইবে?

উদাত্তাদি স্বরের পরস্পর ভেদকত্ব ধর্ম্ম রহিয়াছে বলিয়া। উদাত্তাদিস্বর পরস্পর পরস্পরের ভেদক হইয়া থাকে।

উদাত্তাদি স্বর যে পরস্পর ভেদক, তাহাই বা (ভবৎকর্ত্তৃক) কিরূপে জানা গেল?

লোকমধ্যে এইরূপ দেখিয়া। কারণ, লোকমধ্যে এইরূপ দেখা যায় যে;—যে বালক, উদাত্ত পাঠ কর্ত্তব্য হইলে, অনুদাত্ত পাঠ করিয়া থাকে, খণ্ডিক

(১) এইসূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

উপাধ্যায়, (১) ঐবালককে, "তুই অন্যরকম পাঠ করিতেছিস্" এই বলিয়া, চপেটাঘাত (চড়) প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে জানা যাইতেছে যে, উদাত্ত এবং অনুদাত্ত স্বরে, বিশেষত্ব রহিয়াছে; এই জন্যই অধ্যাপক তাহা বুঝিতে পারিয়া, বালককে চড় মারিয়াছে। অতএব 'আ'কার 'ত'পরবিশিষ্ট পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—অস্তি প্রয়োজনমেতৎ। কিং তর্হীতি। ভেদকত্বাৎ গুণস্যেতি বক্তব্যম্। কিংপ্রয়োজনম্। আনুনাসিক্যং নাম গুণঃ। তদ্ভিন্নস্যাপি গ্রহণং যথা স্যাৎ। কিং চ কারণং ন স্যাৎ। ভেদকত্বাদ্গুণস্য। ভেদকা গুণাঃ। কথং পুনর্জ্ঞায়তে ভেদকাগুণা ইতি। এবং হি দৃশ্যতে লোকে। একোঽয়মাত্মা উদকংনাম তস্য গুণভেদাদন্যত্বং ভবতি। অন্যদিদং শীতমন্যদিদমুষ্ণমিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার (আকারের 'ত'পর করণ করার) কি বাস্তবিকই প্রয়োজন?

তবে কি?

গুণের ভেদকত্ব হেতুও আকার 'ত'পর বিশিষ্ট বলা উচিত।

তাহার প্রয়োজন কি?

যাবতীয় স্বরবর্ণেরই অনুনাসিকত্ব নামক একটী গুণ (ধর্ম্ম) রহিয়াছে। অতএব 'আ'কার, 'ত'পর বিশিষ্ট করিবার প্রয়োজন এই যে, সাধারণতঃ নিরনুনাসিক আকার ভিন্ন সেই অনুনাসিক গুণবিশিষ্ট 'আ'কারেরও যাহাতে গ্রহণ হইতে পারে।

গুণের ভেদকত্ব হেতু, 'আ'কার, 'ত'পর বিশিষ্ট করা কর্ত্তব্য? গুণসমূহ পরস্পর পরস্পরের ভেদক?

(আপনাদ্বারা) কিরূপে জানা গেল যে, গুণসমূহ পরস্পর পরস্পরের ভেদক?

সংসারে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে,—'জল' নামক একটী পদার্থ, তাহার গুণ-ভেদে অন্যরূপ হইয়া থাকে।

যেমন,—এই জল শীতল, অতএব ইহা এক রকম, আবার এই জল উষ্ণ, সুতরাং ইহা অন্য রকম। এই জন্যই বলা হইল যে, গুণসমূহ, পরস্পর ভেদক।

ভাষ্যমূল।—ননু চ ভোঃ অভেদকা অপি গুণা দৃশ্যন্তে। তদ্যথা। দেবদত্তো

(১) যিনি বেদের বৃহৎ বৃহৎ মন্ত্রসমূহকে, বালকগণের সুবিধার জন্য, এক এক পদ বা দুই দুই পদে খণ্ড খণ্ড করিয়া উপদেশ দেন, তাঁহাকে 'খণ্ডিক উপাধ্যায়' বলে।

মুণ্ডাপি জটাপি শিখ্যপি স্বামাখ্যাং ন জহাতি। তথা বালো যুবা বৃদ্ধঃ বৎসো দম্যো বলীবর্দ্দ ইতি। উভয়মিদং গুণেষুক্তম্। ভেদকা অভেদকা ইতি। কিং পুনরত্র ন্যায্যম্। অভেদকাগুণা ইত্যেব ন্যায্যম্। কুত এতৎ। যদয়মস্থিদধিসক্থ্যক্ষ্ণামনঙুদাত্ত ইত্যুদাত্তগ্রহণং করোতি। তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যোঽভেদকা গুণাইতি। যদি ভেদকা গুণাঃ স্যুঃ উদাত্তমেবোচ্চারয়েৎ। যদি তর্হ্যভেদকাগুণাঃ অনুদাত্তাদেরন্তোদাত্তাচ্চ যদুচ্যতে তৎস্বরিতাদেঃ স্বরিতান্তাচ্চ প্রাপ্নোতি। নৈষদোষঃ। আশ্রীয়মাণো গুণো ভেদকো ভবতি। তদ্যথা। শুক্লমালভেত কৃষ্ণমালভেত। তত্র যঃ শুক্লমালভতে কৃষ্ণমালভতে নহি তেন যথোক্তং কৃতংভবতি।

ভাষ্যানুবাদ। যদি বল যে, ওহে, গুণসমূহত ত অভেদকও দৃষ্ট হয়; যেমন,—দেবদত্ত নামক কোনও ব্রাহ্মণ, মস্তককে মুণ্ডন করিলে, জটা ধারণ করিলে অথবা শিখা ধারণ করিলেও তাহার স্বকীয় 'দেবদত্ত' সংজ্ঞা পরিত্যাগ করে না। সেইরূপ কোন গোরুও, বালক হইলে তাহাকে বৎস, যুবা হইলে তাহাকে দম্য এবং বৃদ্ধ হইলে তাহাকে বলীবর্দ্দ বলা যায়; কিন্তু সে স্বকীয় গোত্ব গুণ পরিত্যাগ করে না।

গুণসমূহে ত দুই ধর্ম্মই বলা হইল,—ভেদক এবং অভেদক; কিন্তু এই স্থলে ন্যায্য কি?

'গুণসমূহ অভেদক'—ইহাই এই স্থলে ন্যায্য।

কেন এরূপ হইবে?

যেহেতু 'অস্থিদধিসক্থ্যক্ষ্ণামনঙুদাত্তঃ।৭।১।৭৫। (১) এই সূত্রে, 'উদাত্ত' গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই আচার্য্য (পাণিনি) জানাইতেছেন যে, গুণসমূহ পরস্পর অভেদক। যদি গুণসমূহ (উদাত্তানুদাত্ত স্বরিতাদি) পরস্পর ভেদকই হইত, তবে 'উদাত্ত' এই শব্দ পাঠ না করিয়া আচার্য্য পাণিনি, উদাত্ত স্বরই উচ্চারণ করিতেন।

তবে যদি গুণসমূহ অভেদকই হয়; তাহা হইলে, অনুদাত্তাদি এবং অন্ত উদাত্তবিশিষ্ট শব্দের উত্তর যে সকল বিধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে (২); তাহা, স্বরিত আদিবিশিষ্ট এবং স্বরিতান্ত বিশিষ্ট শব্দের উত্তরও প্রাপ্তি হইবে?

---

(১) অস্থি, দধি, সক্থি এবং অক্ষি শব্দের ইকার স্থানে 'অনঙ্' আদেশ হয়, টা প্রভৃতি স্বরবর্ণ আদিবিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে; এবং সেই 'অনঙ্' আদেশ উদাত্ত স্বরবিশিষ্ট হয়।

(২) (অনুদাত্তাদেরঞ্।৪।২।৪৪। (অনুদাত্ত স্বর আদি বিশিষ্ট যে শব্দ,

কালী।

(স্বামী বিবেকানন্দের Kali the Motherএর শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত অনুবাদ।)

নিবেছে নক্ষত্রপুঞ্জ,
ঘনাচ্ছন্ন ঘোর ঘন ;
তরঙ্গিত, শব্দমান্,
জীবন্ত আঁধার যেন।

ভীম ঘূর্ণিবায়ু মাঝে
অযুত উন্মাদকুল
সদ্য কারা-মুক্ত, যেন
তুলিছে ভীষণ রোল।

উন্মূলিত মহীরুহ
ভীমবেগ-ঝটিকায়।
সম্মুখে যা পড়ে, তাই
নিমিষে উড়িয়া যায়॥

সমুদ্র সে মহাযুদ্ধে
মিশিয়াছে ভীমবলে ;
ছোঁয় অধোলম্বী ব্যোম
পর্ব্বত-তরঙ্গ তুলে।

মলিন আলোক প্রভা
চৌদিকেতে প্রকাশয়—
কৃষ্ণ ধূলিধূসরিত
মৃত্যুর সহস্র ছায়'।

মড়ক ব্যেরাধি দুঃখ
ছড়ায়ে [illegible]—হায়,
আনন্দে নাচিছে মৃত্যু
ঘোর উন্মাদের প্রায়
এস মাগো ডাকিছি তোমায়॥

ভীমা তব নাম মাগো,
শ্বাসে তোর মৃত্যু বয় ;
প্রতি পদক্ষেপে তোর
জগৎ বিচূর্ণ হয়।
তুমি "কাল" প্রলয়রূপিনী,
এস, এস, জগৎজননী।

সন্তাষে বিপদ্ যেই,
ধ্বংসে যেই নাচে হাসে,
সুখে আলিঙ্গয়ে মৃত্যু,
তার কাছে মা প্রকাশে।

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

নবম অধ্যায়। আল্ওয়ান্দার।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [১০৫ পৃষ্ঠার পর।

কিছু দিন পরে বৃদ্ধ আল্ওয়ান্দার পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। শিষ্যগণ শয্যার চারি পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সেই জ্ঞান-ভক্তিময়-বিগ্রহ, মহাসত্ত্ব যামুনমুনি পীড়ায় অভিভূত হইয়াও ভগবদ্দাস্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিরস্ত হইলেন না। শিষ্যবর্গকে বার বার সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "যেরূপ পুষ্পের সার মধু, গাভীর সার ঘৃত, সেইরূপ ত্রিলোকের সার নারায়ণ। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে চতুর্বর্গলাভ হয়।" মহাপূর্ণ, তিরুকোটিয়ুর পূর্ণ প্রভৃতি শিষ্যগণ, আল্ওয়ান্দারের সমবয়স্ক স্যাসিচূড়ামণি তিরুবরাঙ্গ পেরুমল্ আরিয়ারকে স্ব স্ব সন্দেহভঞ্জনের জন্য তাঁহাদের হইয়া যামুনমুনিকে দু একটি প্রশ্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে তিরুবরাঙ্গ তাঁহাদের মুখস্বরূপ হইয়া শয্যাশায়ী মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসিলেন, "শ্রীমন্নারায়ণ, বাক্য মনের অতীত। কিরূপে তাঁহার সেবা করিতে হইবে?" যামুনমুনি উত্তর করিলেন, "ভক্তের সেবা করিলেই ভগবানের সেবা করা হয়। ভক্তের জাতি কুল নাই। তিনি ঈশ্বরের দৃশ্যমান বিগ্রহ। তোমরা সকলে চণ্ডালকুলোদ্ভব তিরুপ্পান্ আলো-

ন্যারের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা করিও, তাহাতেই নারায়ণের সেবা হইবে।" তিনি আরও কহিলেন, "শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ নিষ্ঠাভক্তিসহকারে নিরন্তর নারায়ণ ও তদীয় ভক্তগণের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা করিয়া থাকেন। দেখ, তিরুপ্পান আলোয়ার্ অনন্যমনে শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের বরদরাজের সেবায় কি নিষ্ঠা। ইহাঁরা সকলে মহাপুরুষ; ইহাঁদের ন্যায় আচরণ করিলে শ্রেয়ঃ হইবে। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'।" পরে তিরু-বরাঙ্গের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "রঙ্গনাথভক্ত তিরপ্পান আলোয়ার আমার একমাত্র আশ্রয়, তিনি আমার ভবপারের কর্ণধার হইবেন।" ইহা শুনিয়া তিরুবরাঙ্গ ব্যথিতহৃদয়ে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি শরীর ত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছেন?" যামুন কহিলেন, "যদিই ঈশ্বরেচ্ছায় এ শরীর আমার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে তোমার ন্যায় মহাপুরুষের কোনও ব্যথা পাওয়া উচিত নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যাহা হয়, তাহাই পরমমঙ্গলজনক, ইহাতে স্থির বিশ্বাস থাকা চাই। অহঙ্কারকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বলিস্বরূপে অর্পণ করিয়া, চিরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া যাও। অহঙ্কারই সকল দুঃখের মূল, নিরহঙ্কারই সকল সুখের মূল। নিরহঙ্কারী পুরুষকে কর্ম্ম কখনও বন্ধন করিতে পারে না। 'আমি তাঁহার দাস' এইভাব মনে দৃঢ়বদ্ধ হইলে অহঙ্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তাহা হইলেই মনুষ্য বুঝিতে পারেন যে, তিনি জন্ম মরণের অধীন নহেন, তিনি শ্রীমন্নারায়ণের নিত্যদাস; তখন তিনি, 'হে প্রভো, আমায় রক্ষা কর', এই বলিয়া আর ভগবৎশ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করেন না। তখনই তিনি নিষ্কাম ভাবে তাঁহার সেবা করিতে পারেন। তখনই তাঁহার ভক্তি অহৈতুকী হয়। তখনই তিনি ঈশ্বরের যথার্থ দাস হয়েন।"

তিরুপ্পান্ আলোয়ারের সেবায় তিরুবরাঙ্গের একান্ত নিষ্ঠা জানিয়া, যামুন তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি যাহা করিতেছ, তদ্দ্বারা অচিরেই অহৈতুকী ভক্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।" যখন এইরূপ কথা হইতেছে, তখন মহাপূর্ণ ও তিরু-কোটিয়ুর পূর্ণ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, আল্ওয়ান্দার দেহত্যাগ করিলেই তাঁহারা আত্মহত্যা করিবেন। সেই সময় অন্য একজন শিষ্য কহিলেন, "আপনার অদর্শনে আমরা কাহার আশ্রয়ে অবস্থান করিব? কে আমাদিগকে এরূপ মধুর ভাষায় আশ্বস্ত করিবেন?" ইহা কহিয়া তিনি অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহাতে যামুন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমরা কেহ উদ্বিগ্ন হইও না। শ্রীরঙ্গনাথ রহিয়াছেন; তিনি তোমাদের

আশ্রয় দিয়াছেন, দিতেছেন, এবং দিবেন। সর্ব্বদাই তাঁহাকে দর্শন করিও। মধ্যে মধ্যে তিরুপতিস্থ বালাজী এবং কাঞ্চীপুরস্থ বরদরাজকে দর্শন করিও। শ্রীরঙ্গম্, নারায়ণের ধাম; তিরুপতি, নারায়ণের পাদপদ্মপ্রাপক চরমশ্লোক *; এবং কাঞ্চিপুর, তারকমন্ত্র।"

তাঁহার অদর্শনে তদীয় দেহকে দগ্ধ বা সমাধিস্থ করা হইবে, তিরুবরাঙ্গ ইহা জিজ্ঞাসিলে তিনি কোন উত্তর দিলেন না, কারণ, তাঁহার মন সেই সময় ভগবৎপাদপদ্মে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অদর্শনে আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

পর দিবস শ্রীরঙ্গনাথ অসংখ্য সেবক সমভিব্যাহারে বায়ুসেবনার্থ মন্দির-বহিঃস্থ চতুষ্পথে বহির্গত হইলে শ্রীরঙ্গম্‌বাসী যাবতীয় নরনারী ভগবদ্দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। চতুষ্পথ জনাকীর্ণ হইয়া গেল। যামুনশিষ্যগণও গুরুর আদেশে মঠ হইতে রঙ্গনাথদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। সেই সময় জনৈক ভগবৎসেবক দেবতাবিষ্ট হইয়া মহাপূর্ণ ও তিরুকোটিয়ুর পূর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ কর। ইহা আমার অভিমত নয়।" ইহা কহিয়া তাঁহাদিগকে তিরুবরাঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে যামুনাচার্য্যের নিকট লইয়া গিয়া সমস্তই নিবেদন করিলে, সেই জ্ঞানগম্ভীর মহাপুরুষ কহিলেন, "আত্মহত্যা মহাপাপ। তোমাদের উপরে ঈশ্বরের সাতিশয় স্নেহ, সুতরাং তিনি স্বয়ং তোমাদের নিষেধ করিলেন। উক্ত সঙ্কল্প একেবারেই ত্যাগ কর।" কিঞ্চিৎ কাল নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ এই, ভগবৎপাদপদ্মে সর্ব্বদাই কুসুমাঞ্জলি অর্পণ, ও গুরূপদিষ্ট মার্গে বিচরণ করিবে, এবং ভক্তসেবা দ্বারা অহঙ্কারকে নাশ করিয়া পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে সচেষ্ট হইবে।" ইহা কহিয়া তিনি তিরবরাঙ্গের হস্তে সকল শিষ্যমণ্ডলিকে সমর্পণ করিলেন।

আল্‌ওয়ান্দার, সে যাত্রা সুস্থ হইয়া উঠিলেন, ও স্বয়ং এক দিবস শ্রীরঙ্গ-নাথের উৎসবে যোগ দিলেন। সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীর সহিত ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ-পূর্ব্বক মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং পূর্ব্ববৎ শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া সকলকে উন্নত করিতে লাগিলেন। এক দিবস তিনি শাস্ত্রের রহস্যার্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময় কাঞ্চিপুর হইতে দুইটি ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা

* সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

যামুনমুনির পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্দর্শন করিয়া আল্ওয়ান্দার অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং রামানুজের সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। বিপ্রদ্বয় কহিলেন, "রামানুজ এক্ষণে যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন এবং শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের নিদেশানুসারে ভগবদারাধনার্থ প্রতিদিন শালকূপ হইতে ঘট পূর্ণ করিয়া জল আনয়ন করিয়া থাকেন।" ইহা শুনিয়া যামুনের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তখনই আটটি প্রণামশ্লোক রচনা করিয়া ভগবানের অর্চনা করিলেন, এবং মহাপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি কালবিলম্ব না করিয়া শীঘ্র রামানুজকে এখানে আনয়ন কর। তাহার ভিতর ঈশ্বরত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাহাকে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত শ্রেয়ঃ।" ইহা শুনিয়া মহাপূর্ণ তৎক্ষণাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক কাঞ্চিপুরে যাত্রা করিলেন।

আল্ওয়ান্দার দুই চারি দিবস পরে পুনরায় পীড়াগ্রস্ত হইলেন। শিষ্যেরা পুনরায় তাঁহার জন্য সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এবার তাঁহার পীড়া কিছু অধিক ক্লেশজনক হইল। সেই পীড়িতাবস্থাতেই এক দিবস স্নান করিয়া মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথজীউকে দর্শন করিলেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করিয়া মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শিষ্যগুলি মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিলে, তিনি তাঁহার গৃহস্থ ভক্তগণকে আনয়ন করিবার জন্য, তাঁহাদের কতিপয়কে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইলে, তিনি যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা সকলে কহিলেন, "যদি ঈশ্বরের অপরাধ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে আপনারও অপরাধ সম্ভবে।" তিনি তাঁহাদের হস্তে তিরুবরাঙ্গ ও অন্যান্য শিষ্যগণের ভার অর্পণ করিয়া কহিলেন, "প্রতিদিন নিয়মিতরূপে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীউর সেবা দর্শন এবং প্রসাদী পুষ্প গ্রহণ করিও। তাহা হইলে মনবুদ্ধি নির্ম্মল হইবে এবং অচিরাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার পাইবে। সর্ব্বদা গুরুভক্তিপরায়ণ ও অতিথিসেবক হইও।" তাঁহারা সকলে বিদায় হইলেন। আল্ওয়ান্দারের এই অভিনবভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

গৃহস্থভক্তগণ প্রস্থান করিলে, আল্ওয়ান্দার্ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট করিলেন। সেই সময় তাঁহার শিষ্যগণ সুমধুর স্বরে ভগবন্নামমাহাত্ম্য সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন। মৃদু মৃদু বাদ্য-

ধ্বনির সহিত বংশীধ্বনি সেই সঙ্কীর্ত্তনকে অধিকতর সুমধুর করিয়া তুলিয়াছিল। এক প্রকার স্বর্গীয় শান্তি ও সুখ সেই সময় সকলের বদনকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। ভগবদ্ভক্তিতে সকলেই আত্মহারা হইয়াছিলেন। ক্রমে আল্‌ওয়ান্দার মনকে হৃদয় হইতে ভ্রূমধ্যে উত্থাপিত করিলেন। আনন্দাশ্রু নয়নের দুই পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বার দিয়া দেহনির্ম্মোক ত্যাগপূর্ব্বক পরমপদে বিলীন হইয়া গেলেন। সঙ্কীর্ত্তন সহসা থামিয়া গেল। তিরুকোটিয়ুর এবং অন্যান্য শিষ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শোকবেগ নিরস্ত হইলে. শিষ্যগণ আল্‌ওয়ান্দারনন্দন ছোটপূর্ণকে সঙ্গে লইয়া অন্তিমকর্ম্ম সম্পাদনের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। মৃতের দেহকে সুশীতল, পবিত্র জলে ধৌত করা হইল। পরে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া সুসজ্জিত খট্টায় স্থাপন পূর্ব্বক মৃদুপদসঞ্চারে কাবেরীতীরবর্ত্তী শ্মশান ক্ষেত্রের দিকে সকলে লইয়া চলিলেন। শ্রীরঙ্গমবাসী যাবতীয় নরনারী শবের অনুগমন করিলেন। শ্মশানক্ষেত্র জনতায় পরিপূর্ণ হইল। (ক্রমশঃ)

ভারতের ভবিষ্যৎ।

(শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় লিখিত।)

কোন তত্বজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, মনুষ্যের আত্মতত্ব অবগত হওয়াই পরম জ্ঞান। প্রাচীন হিন্দু আরও উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ঈশ্বরতত্বও অপরিজ্ঞাত নহে। এই উত্তর তত্ব প্রাচীন হিন্দু যে পরিমাণে আলোচনা করিয়াছেন, তেমন আর কোন জাতিকেই করিতে দেখি না। সেই জন্য প্রাচীন হিন্দুর ন্যায় জ্ঞানী ও উন্নত জাতি জগতে আর বিদ্যমান নাই বা তেমন কোন জাতির অভ্যুদয় হয় নাই। জ্ঞান দ্বিবিধ—আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক। প্রকৃতি অনুসারে কেহ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোচনা করে, কেহ বা আধিভৌতিক জ্ঞানালোচনায় রত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভূতের বোঝা বহন করাকেই জীবনের সার ব্রত মনে করেন; কিন্তু প্রাচীন হিন্দু এতদুভয়েরই অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। যে সমাজে বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি ধর্ম্ম এবং ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জলাদি দর্শন শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল,

সে সমাজ যে এক কালে অতি উন্নত এবং জগতের শিরোমণি ছিল, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় মহা মহা পণ্ডিতেরা গভীর গবেষণার দ্বারা এক্ষণে যে সকল জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতীয় মহর্ষিগণ তাহার চূড়ান্ত বিচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে হিন্দু জাতি আর নাই, এক্ষণে যে হিন্দুজাতি বিদ্যমান আছে, তাহা প্রাচীন হিন্দুর ছায়া মাত্র, প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্ন স্তূপ বিকৃতাবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে মাত্র। আমরা যে সমাজে ও যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের কিছুরই অভাব অপ্রতুল থাকিবার কথা নহে; কিন্তু আমাদিগের এমনই দুর্ভাগ্য যে, নিজগৃহে নানা ধন রত্ন থাকিতেও আমরা পরমুখাপেক্ষী, চক্ষু থাকিতেও পথভ্রান্ত। অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া আমরা যে দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য কি এবং সংসারে কি করিতে আসিয়াছি, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। মণিরত্ন সম্মুখে থাকিতে তাহা অবহেলা করিয়া আমরা কেবল লোষ্ট্রসংগ্রহে নিযুক্ত থাকিয়া অমূল্য জীবন ক্ষয় করিলাম! বহুপুণ্যফলে পবিত্র হিন্দুকুলে ঋষি তপস্বীর বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও আমরা জীবনের গন্তব্য পথ পাইলাম না, ইহা কি সামান্য বিড়ম্বনা?

ভারতীয় সাহিত্যে যত ধর্ম্মগ্রন্থ ও দর্শনশাস্ত্র আছে, তত আর কোন সাহিত্যে নাই এবং চিন্তা ও গবেষণার গভীরতায় তাহাদিগের সমকক্ষও কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার কত অমূল্য গ্রন্থ, বহু কালের চিন্তা ও ভূয়োদর্শনের মহামূল্য ফল যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এখনও যাহা আছে, তাহাতে জ্ঞানপিপাসা সম্পূর্ণ নিবারিত হয়। ধর্ম্মনীতি কেবল যে লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু পালিত হয় না, এমন নহে, ঈশ্বরানুগৃহীত পরম ধার্ম্মিক যোগী ঋষির কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতে যে পরিমাণ ধর্ম্মপ্রাণ লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তত আর কোথাও নাই; স্বয়ং ধর্ম্মবলে বলবান এবং সাধারণ লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত, এমন মহাত্মার সংখ্যাও অল্প নহে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই সকল মহামূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাদিগের সমীপবর্ত্তী থাকিয়াও আমরা ফলভাগী হইতে পারিলাম না।

কোন সমাজেই কোন কালে সকলেই ভোগস্পৃহাশূন্য পরম যোগী হইতে পারে না। প্রাচীন হিন্দু সমাজেও সকলেই যে ঋষি তপস্বী ছিলেন,

এমন নহে ; তবে সাহস করিয়া এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, তথায় যে পরিমাণ ধর্ম্মপ্রাণ লোক ছিলেন, তত আর কোন সমাজেই জন্মে নাই। অন্যান্য সমাজে সাধারণ লোকের সহিত ধর্ম্মপ্রাণ লোকের যে অনুপাত, প্রাচীন ভারতে তাহার অধিক ছিল। প্রাচীন ভারতের সাধারণ লোকেও সামান্য ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন না। যোগী ঋষি না হইলেও এবং ঈশ্বরের অধিক সমীপবর্ত্তী হইতে না পারিলেও তাঁহারা ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া অন্য পথে চলিতেন না। ধর্ম্মই সকলের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহার যেমন শক্তি, তিনি তেমনই ভোগসুখ ত্যাগ করিয়া পরোপকারী ছিলেন এবং শিক্ষা দীক্ষা অনুসারে সকলেই যথাসাধ্য পূজার্চ্চনা করিতেন। প্রায় সকলেই গুরু পুরোহিতের উপদেশ মতে যাগ যজ্ঞ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিতেন, দান ধ্যান ও অতিথিসৎকারপরায়ণ ছিলেন এবং সত্য ও ধর্ম্মপথে থাকিয়া ঈশ্বরচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যেক পরিবারই এক একটী ছোট খাট ধর্ম্মমন্দির ছিল। ঘোর সংসারের মধ্যে থাকিয়াও ইহাকে তাঁহারা স্বর্গতুল্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আত্মোৎসর্গ, গুরুজনে অচলা ভক্তি, সাধুসঙ্গে স্পৃহা, সৎপ্রসঙ্গে রতি, আহার ব্যবহারে সাত্বিকভাব, পর-দুঃখে কাতরতা ইত্যাদি সৎপথে চলিবার যাহা যাহা সম্বল, তৎসমস্তই প্রাচীন ভারতের সাধারণ লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হইত। হইতে পারে, সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না ; কিন্তু চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন না করিলেও দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা যাহা শিখিয়াছিলেন, অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তিও তাহার অধিক জানিতেন না। সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের অন্ধবিশ্বাস কিছু প্রবল ছিল, বৈজ্ঞানিক সূত্রের মধ্য দিয়া তাহা উপার্জ্জিত নহে ; কিন্তু সে ত্রুটিও অবিশ্বাস অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।

এক্ষণে সে দিন গিয়াছে, আমাদিগের সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। ভারতীয় ধর্ম্মজগতে একটা যে মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, যতই পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, ততই আমাদিগের ধর্ম্মভাবের তিরোভাব হইতেছে। কলিকাতায় হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত হইবার সময়ে অতি কুলগ্নেই হিন্দুসন্তানকে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা দিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষায় ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা হয় না এবং পাশ্চাত্য দর্শন অবিশ্বাসের বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত করিয়া দেয়। পশ্চিম হইতে যে সাম্য ও স্বাধীনতার তরঙ্গ আসিয়াছে,

তাহাতে আমাদিগের সমাজে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতির ভোগ বিলাসিতা ও ঘোর স্বার্থপরতা আমাদিগের পরিবারে প্রবেশ করিয়া তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার মধ্যে যে সত্য নাই, আমরা তাহা না বলিলেও যে কারণেই হউক, ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুর যে অতি উচ্চ স্তর হইতে পতন হইয়াছে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে হিন্দুর অবস্থা অতি উন্নত ছিল, আমরা এমন কথা বলি না; তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার তরঙ্গে যে পতনোন্মুখ হিন্দু সমাজের পতন সহজ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। যে দিন হইতে জ্ঞান সাধারণ সম্পত্তি না হইয়া ব্যক্তি বা শ্রেণী-বিশেষের সম্পত্তি হইয়াছে, যে দিন হইতে এক শ্রেণীর ধর্ম্মাধিকারী অন্য শ্রেণীকে হেয় জ্ঞান করিতে শিখিয়াছে, যে দিন হইতে ত্যাগ অপেক্ষা ভোগে হিন্দু সন্তানের আসক্তি জন্মিয়াছে, সেই দিন হইতে হিন্দুর পতন আরম্ভ হইয়াছে। তিল তিল করিয়া পড়িতে পড়িতে হিন্দু সন্তান এক্ষণে অবনতির সুগভীর নিখাতে পতিত হইয়াছে।

সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মের যে সকল মূল মন্ত্র, তাহাদের বিকৃতি হইয়াছে; এমন কি, বলিতে মর্ম্মাহত হইতেছি যে, ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজনীয়তাই অনেকে স্বীকার করেন না। ঈশ্বরকে আরাধনা উপাসনা দূরে থাকুক, অনেকের এমন অনেক দিন অতিবাহিত হয়, যে দিন একবারও তাঁহাকে স্মরণ করাও হয় না। অনেকে তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; ইঁহারা অধিক জ্ঞানী ও বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইতে যত্ন করিয়া থাকেন! ইঁহাদিগের অপেক্ষা যাঁহারা একটু অল্প জ্ঞানী, তাঁহারা সন্দেহদোলায় দোলায়-মান এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহার আরাধনা উপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় পতন আর কোথায় হইতে পারে! যোগ, প্রাণায়ামাদি ঈশ্বরলাভের যে সকল উপায় আছে, তাহারা এক্ষণে বাজীকরের বাজীতে পরিণত হইয়াছে। সিদ্ধ পুরুষগণের সিদ্ধি ভেল্কী বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। যোগিগণ দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহারা অতুল শক্তিশালী, তাহা কেহ বিশ্বাস করে না। কি ভক্তি, কি জ্ঞান, এখনকার সাধারণ হিন্দুর কিছুই নাই। থাকিবার মধ্যে আছে কেবল কর্ম্ম; কিন্তু এক্ষণে তাহা দেবোদ্দেশে নহে। এখনকার কর্ম্মের কেন্দ্র "আমি",

পরিধিও "আমি"। এখন জগতে কেবল "আমি" আছি, ঈশ্বরকে বহুদূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছি। আমাদিগের বাহ্যদৃষ্টি এক্ষণে নিতান্ত প্রবল, অন্তর্মুখী চিন্তা আর আসে না ; বাহ্য জগৎ লইয়াই এক্ষণে সংসার, বাহ্যাড়ম্বরই আমাদিগের অস্থি মজ্জা। যাহাতে কেবল তমোগুণের বৃদ্ধি হয়, আমরা এক্ষণে সেই পথ অবলম্বন করিয়াছি, সত্ত্বগুণের নিকটে ভুলিয়াও যাই না। কল কারখানার সাহায্যে বস্ত্রবয়নাদি কার্য্য যেমন সহজ হইয়াছে, নিতান্ত ধর্ম্মপিপাসু বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারাও ধর্ম্মকে তদ্রূপ কলে ফেলিয়া সহজ করিয়া লইয়াছেন। যে নৈতিক জীবনের মধ্য দিয়া না গেলে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না এবং যে চরিত্র গঠন করিতে না পারিলে পদে পদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা, তৎপ্রতি আমাদিগের দৃষ্টি নাই। যে ত্যাগে ধর্ম্মের আরম্ভ, যে নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রত ধর্ম্মের প্রাণ, যে সর্ব্বজীবে প্রেম ঈশ্বর লাভের উপায়, তাহা আমাদিগের নাই। শাস্ত্রে আমাদিগের রতি নাই, ঈশ্বরকথায় মন বসে না, ভক্তির ধার ক্রান্তি মাত্রও ধারি না, তাহার উপর গুরু বা উপদেষ্টা বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এমত অবস্থায় আমরা যে একটা হযবরল হইয়া পড়িব, তাহাতে বিচিত্রতা কোথায়? অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, বর্ত্তমান কালে হিন্দুসমাজের নিতান্ত দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, অবনতির অবধি নাই।

আমাদিগের ভবিষ্যৎ এক্ষণে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তার বিষয় হইয়াছে। বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিলেও আমরা প্রাচীন হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারিব কি না, স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়। ক্রমে ক্রমে আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইব কি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইব অর্থাৎ আমরা সনাতন ধর্ম্মচ্যুত হইয়া এক বিকটাবস্থা প্রাপ্ত হইব, ইহা বাস্তবিকই আলোচনার বিষয়।

ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় জাতিবিশেষেরও উত্থান পতন আছে। সমগ্র মনুষ্যসমাজের পক্ষেও ঐ নিয়ম; কিন্তু কথাটা সহজে বুঝিবার জন্য বিস্তৃত ক্ষেত্র ছাড়িয়া সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র লওয়া যাউক। শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু পরিবর্ত্তনের ন্যায় জাতিবিশেষের উন্নতি অবনতি অপরিহার্য্য। সৃষ্টির যাবতীয় সামগ্রী যে নিয়মের অধীন,মনুষ্য তাহা কি প্রকারে অতিক্রম করিবে? আমরা যে হিন্দু সমাজের কথা বলিতেছি, তাহারই যে এক ভাবে এই সহস্র সহস্র যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, এমন নহে। ইহার

উপর দিয়া কত প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কতবার ইহার পতন ও পুনরুত্থান হইয়াছে, ইতিহাস তাহার উত্তর দানে সমর্থ। সময়ে সময়ে ইহার বহু অবসাদের যুগ গিয়াছে ; কিন্তু মঙ্গলময় বিধাতার অপার কৃপায় ইহা তাহাকে অতিক্রম করিয়া আবার সত্য জ্ঞানের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মের গ্লানি হইলেই যুগে যুগে তিনি স্বয়ং অবিভূর্ত হইয়া উহার সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, কেবল ধর্ম্ম কেন, যে কোন বিষয়েই কোন সমাজ অবনত হইয়া পড়িলে এক এক জন অমানুষী প্রতিভাশালী ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া তাহার উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। যাহা সমাজের পক্ষে আপাত অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইতেই মঙ্গলের উদয় হয় ; যাহা অশিব, তাহার মধ্যেই শিব লুক্কায়িত দেখিতে পাই। পৃথিবী যখনই পাপভারে আক্রান্ত হয়, তখনই তাহার উদ্ধার নিকটবর্ত্তী বুঝিতে হইবে। প্রয়োজন অনুসারে কখন পূর্ণ কখন বা আংশিক শক্তি সহকারে শ্রীভগবান আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর পাপভার মোচন এবং অজ্ঞানতিমিরে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিয়া থাকেন। ইঁহারাই লোকের নিকট অবতার বলিয়া পরিচিত হন। কেবল ধর্ম্ম নহে, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, যখনই যে বিষয়ে সমাজ অবনত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখনই এক এক জন অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় তেজে সমাজকে বলবান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য ইঁহারা সকলেই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া জনসমাজকে রক্ষা করিয়াছেন, অজ্ঞানান্ধকার হইতে মনুষ্যকে জ্ঞানালোকে আনয়ন করিয়াছেন। মনুষ্য-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা মনুষ্যোচিত জীবনকালের অধিক পৃথিবীতে থাকেন না ; সাধারণ জীবন কালের মধ্যেই, এমন কি, তাহা অপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যেই, আপনার কার্য্য সমাধা করিয়া প্রস্থান করেন। সমস্ত পৃথিবীর সকল জাতিকে পরিত্রাণ করিবার জন্য তাঁহারা বসিয়া থাকেন না সত্য ; কিন্তু সমাজে তাঁহারা যে বল প্রয়োগ করিয়া যান, অনেক দিন ধরিয়া তাহার কার্য্য চলিতে থাকে এবং ক্রমে দিগ্দিগন্তে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। কেহ জ্বলন্ত মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া যেখানে গিয়া পড়েন, একেবারে সে স্থানকে আলোকিত করেন, আবার কেহ বা বিনা আড়ম্বর আস্ফালনে নীরবে সমাজশরীরে এমন বল প্রয়োগ করিয়া যান যে, বহুদিন পর্য্যন্ত সে বলের কার্য্য ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। এই সত্য হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোন সমাজেরই গতি চির দিন এক ভাবে বহিতে থাকে

না। মানুষ যেমন চির দিন সমান স্বাস্থ্যভোগ করে না, তেমনই সমাজ-শরীরের ধর্ম্মাঙ্গও সময়ে সময়ে রুগ্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে ও ঈশ্বরের করুণায় সমাজের সে অবস্থা বহুদিন থাকে না, অনন্ত তেজোময় পুরুষ আবির্ভূত হইয়া সমাজের ব্যাধি আরোগ্য করিয়া আবার তাহাকে নব বলে বলীয়ান করিয়া থাকেন।

আজ আমরা প্রাচীন হিন্দুর সমতুল্য নাই, আজ আমরা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া আবার যে উঠিব না, তাহা কে বলিল? যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে আমরা অবনতির নিম্ন স্তরে নামিয়া গিয়াছি বলিয়া নিতান্ত বিড়ম্বিত বলিয়া মনে করি, সেই পাশ্চাত্য শিক্ষাই যে আমাদিগের মঙ্গলের হেতু নহে, তাহা কে বলিতে পারে? পাশ্চাত্য জাতির ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে আমাদিগের জীবন ও সম্পত্তি যে প্রকার ছিল, তাহা অপেক্ষা কি এক্ষণে নিরাপদ নহে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কেন না বলিব যে, আমাদিগের মঙ্গলের জন্যই ঈশ্বর পাশ্চাত্য জাতিকে বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন? হয় ত এই পাশ্চাত্য তরঙ্গের সাহায্যেই আবার পতিত হিন্দু সমাজ উন্নত হইবে। সে উন্নতিস্রোত যে বহিতে আরম্ভ হয় নাই, তাহা কি প্রকারে বলিতে পার? পাশ্চাত্য জাতির আবির্ভাবের পূর্ব্বে আমাদিগের দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে কয় জনের দৃষ্টি ছিল, আর এখনই বা কত লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহার বিচার করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এখনই উন্নতির তরঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। সে সকল সামগ্রী আমাদিগের গৃহেই ছিল সত্য; কিন্তু পাশ্চাত্য আলোকের প্রভাতেই ত তাহা আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল! সে আলোক না পাইলে হয় ত সে সকল মহামূল্য সামগ্রী ক্রমে লোপ পাইয়া যাইত। তদ্ভিন্ন উন্নতি যে কেবল আমাদিগেরই আবশ্যক, পাশ্চাত্য জাতির নহে, এমন নহে। হয় ত সেই পাশ্চাত্য জাতিকেও হিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে উন্নত করিবার জন্য বিধাতা তাহাদিগকে ভারতে আনিয়া আর্য্যজাতির ধন রত্নে অধিকার দিতেছেন, হয় ত এক কারণের সাহায্যে নানা কার্য্য সমাধা করিতেছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে আমাদিগের কেবলই অবনতি হইয়াছে, আদৌ উন্নতি হয় নাই, এমন কথা বলা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। মানুষের উন্নতির এক মাত্র মার্গ নহে; কেবলই জ্ঞানালোচনায় উন্নতি নহে, জ্ঞানের সহিত কর্ম্মেরও বিশেষ আবশ্যক। পাশ্চাত্য জাতি কর্ম্মপ্রধান; সুতরাং তাহাদিগের

সংঘর্ষে আমাদিগের কর্ম্ম করিবার শক্তি যে পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিক্ষা প্রণালীরই দোষ গুণ আছে। দোষের ভাগ ত্যাগ করিয়া গুণাংশের সমবায়েই প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা। পাশ্চাত্যের শিল্প বাণিজ্যাদি কর্ম্মের সহিত প্রাচ্যের জ্ঞান কাণ্ডের সম্মিলনেই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ভরসা। ভারত এক দিন যাহা ছিল, তাহা চির দিন থাকিতে পারে না; পাশ্চাত্য জাতির সহিত সম্মিলনের পূর্ব্বেও হিন্দুসমাজে বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ভারতের সে দিন নাই; সুতরাং প্রাচীন প্রণালীতে আবার হিন্দুসমাজ সংগঠনের আশা বিড়ম্বনা মাত্র, পরিবর্ত্তন কালের অধীন; সুতরাং তাহা অপরিহার্য্য। প্রাচীনকালে এমন ছিল, এখন তেমন নাই বলিয়া আক্ষেপ করা বৃথা। প্রাচীনকে পুনরানয়ন করিবার চেষ্টা অপেক্ষা বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য; তবে পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া আত্মকার্য্য অবহেলা না করিয়া তদ্রূপ গৌরবান্বিত হইবার জন্য উন্নতির পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইবার চেষ্টাই যুক্তিযুক্ত। কি উপায়ে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির আগ্রহের সহিত আপনি আবিষ্কৃত হইবে। আন্তরিক আগ্রহ জন্মিলে প্রাণের আকর্ষণ বলে উপায়কে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হইবে না, পিপাসাতুরের নিকট জল স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইবে। এক্ষণে এই আগ্রহ সৃজন করাই প্রধান কর্ত্তব্য। আগ্রহসৃজনের পন্থাও বহু। তন্মধ্যে আমরা একটীর কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

মানুষ স্বভাবতঃ জ্ঞানপিপাসু, আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য নিয়ত সচেষ্ট। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কি নিমিত্ত আসিয়াছি এবং আমার পরিণাম কি, এ সকল তত্ত্ব জানিবার জন্য সকলেরই ঐকান্তিক ঔৎসুক্য। অজ্ঞান বা মায়াতে আচ্ছন্ন থাকাতে জ্ঞানের বিকাশ হয় না; সুতরাং আমরা আপনাকে চিনিতে পারি না এবং যখন আপনাকেই চিনিতে পারি না, তখন ব্রহ্মকে কি প্রকারে জানিব? মানুষ আপনাকে জানিবার জন্য যেমন ব্যগ্র, ঈশ্বরকে জানিবার জন্যও তদ্রূপ, কারণ আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব এক প্রকার অবিচ্ছিন্ন। যাহাতে এই তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা বৃদ্ধি হয়, এক্ষণে তাহা করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। সুতরাং হিন্দুর পক্ষে হিন্দুদর্শন ও বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের সমূহ আলোচনার আবশ্যক। জ্ঞান কেহ নিজস্ব করিলে চলিবে না, তাহার বিস্তার ও বিকাশ আবশ্যক। সুতরাং শাস্ত্র গ্রন্থের

বহু প্রচার এবং তৎপ্রতিপাদ্য বিষয় সকলের বহুল পরিমাণে প্রকাশ্য আলোচনার আবশ্যক। যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী, তাঁহারা পতিত ভারতের পরম বন্ধু। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শাস্ত্র গ্রন্থ যে প্রকার দুর্লভ ছিল, এক্ষণে তেমন নহে; সুতরাং তাহার ফলও ফলিতে দেখা যাইতেছে। একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যায় যে, পূর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুসন্তানের স্বধর্ম্মে অনুরাগ ও আত্মোন্নতি করিবার চেষ্টা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সুরাপান, ম্লেচ্ছ ব্যবহার, স্বধর্ম্মে বিরাগ প্রভৃতি যে সকল দুর্লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, শাস্ত্রগ্রন্থ দুর্লভ থাকাতে তৎকালে শাস্ত্রব্যবসায়ী কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতিরেকে অন্যের তাহা দৃষ্টিগোচর হইত না; সুতরাং তাহাতে কি আছে, তাহা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই জানিতেন না। এক্ষণে সে দিন অনেক পরিমাণে গিয়াছে, ভারতে ও অনুবাদিত হইয়া ইংলণ্ডে বেদাদি গ্রন্থের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্মালোচনার জন্য কয়েক খানা পত্র পত্রিকাও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার উপর ধর্ম্ম ও দর্শনাদি আলোচনার জন্য সভা সমিতি সংস্থাপিত হইতেছে এবং সাধারণকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য বৃত্তিরও ব্যবস্থা হইতেছে। এ সকল লক্ষণ অতি সুলক্ষণ বলিতে হইবে।—ইহার সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ আকাশের অনেক পরিমাণে মেঘ মুক্ত হইবার আশা জন্মিতেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজন্মমহোৎসব।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উনসপ্ততিতম জন্মমহোৎসব বেলুড়মঠে আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তাঁহার জন্মতিথি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এই দিন নিত্যপূজাসমাপনের পর বেলা নয়টা হইতে এই জন্মতিথিনিমিত্তক সর্ব্বদেবদেবীর পূজা আরম্ভ হইল। প্রথমে গুরুমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শোপচারে পূজা হইল। তৎপরে গণেশ, সূর্য্য, শিব,ও বিষ্ণুর অর্চ্চনা হইল। পরে বিষ্ণুর মৎস্য কূর্ম্মাদি দুএকটী অবতারের পূজাসমাপনান্তে তাঁহার জন্মমুহূর্ত্ত পড়াতে জন্মতিথি পূজা অগ্রে করিয়া লওয়া হইল। দশাবতারের পূজাসমাপনান্তে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, দত্তাত্রেয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কপিল, জগন্নাথ, শঙ্করাচার্য্য, এমন কি, নানক, মহম্মদ ও ঈশারও পূজা হইল। শ্রীরামচন্দ্রের পূজার সময় সীতাদেবী ও ভক্তপ্রবর হনুমানেরও পূজা সমাধা হয়। এই পূজা সমাপ্ত হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইল।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে নিত্য আরাত্রিক ও ভোগের পরে রাত্রি দশটা হইতে প্রত্যুষ পর্য্যন্ত মহামায়ার দশমহাবিদ্যারূপ দশরূপের পূজা হইল। পূজান্তে হোম আরম্ভ হইল। যে যে দেবদেবীর পূজা হইল, তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে আহুতি দিয়া পরিশেষে গুরুমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সকল দেবদেবী ও অবতারের সমষ্টিজ্ঞানে, তাঁহার নামে আহুতি দেওয়া হইল। পরে পূর্ণাহুতিদানের পর এই মহাপূজা সমাপন হইল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট সার্ব্বভৌমিক ভাবের যৎকিঞ্চিৎ উপলব্ধির চেষ্টা করাই তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে এই সকল দেবদেবী পূজার উদ্দেশ্য।

তৎপরের রবিবারে (২রা চৈত্র) সাধারণের জন্য বিরাট মহোৎসব হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি বৃহৎ চিত্রপট অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। দলে দলে প্রায় শতাধিক সঙ্কীর্ত্তনসম্প্রদায় আসিয়া তাঁহার সমক্ষে গাইতে লাগিলেন। বাউল, হরিনাম এবং গৌরাঙ্গ উপাসকসম্প্রদায় অনেক আসিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম উপলক্ষে তাঁহাকে অবতারজ্ঞানে তাঁহার নামে বিশেষ বিশেষ সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ লোক প্রায় ২০।২৫ হাজার হইয়াছিল। আহিরীটোলা ঘাট হইতে হোরমিলার কোম্পানীর তিনখানি জাহাজ বেলা আটটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনবরত বেলুড় মঠে যাতায়াত করিয়াছিল। জাহাজের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর হইয়াছিল। সমস্ত দিন সরবত ও নানাবিধ প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ এতদ্বিধ মহোৎসবকে হুজুক বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। আমাদের কিন্তু তাহা বোধ হয় না। প্রথমতঃ, মহোৎসবে কি উপকার হয় বলিয়া পরে শ্রীরামকৃষ্ণমহোৎসবের বিশেষত্ব বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রকৃত সাধনা নিজের নিজের অন্তরের ব্যাপার, সত্য কথা; কিন্তু সকলে সমবেত হইয়া মধ্যে মধ্যে ভগবদ্গুণ কীর্ত্তন করিলে অনেকে যথেষ্ট উপকার পাইয়া থাকেন, ইহা অনেকের প্রত্যক্ষ। মহোৎসবাদিতে অনবরত ভগবন্নাম শ্রবণ হইয়া মন যে কিছুক্ষণের জন্যও ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকে, তাহার সন্দেহ কি? অনেকের মন এইরূপ সঙ্কীর্ত্তনাদির ভাবে বিভোর হইয়া একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, দেখা যায়। তদ্ব্যতীত নানা স্থান হইতে পরিচিত অপরিচিত নানাবিধ ভক্তমণ্ডলীর একত্র সমাগমে ও আলাপে পরস্পরের অনেক আধ্যাত্মিক উপকার হয়, ইহা বলা বাহুল্য।

এক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণমহোৎসবের বিশেষত্ব বলিব। রামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক জীবনের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হইবে, এরূপ চক্ষু থাকিতে অন্ধ বোধ হয় খুব কম আছে। হিন্দুধর্ম্ম বেদবেদান্ত পুরাণ তন্ত্রাদির সংস্কৃত বচনাবলির ভিতর অথবা হয়ত কোন নিভৃত পর্ব্বতগুহায় কোন যোগীর হৃদয়াভ্যন্তরে গুপ্ত ছিল। যাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর সাধনায় সেই হিন্দুধর্ম্ম আমরা সকলে একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি, ঘোর সংসারে মগ্ন হইয়াও আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি, যাঁহার হৃদয়ের অমানুষিক উদারতায় আমরা এখন সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোককে ভ্রাতা বলিয়া বুঝিতে শিখিতেছি, যাঁহার অপূর্ব্ব ত্যাগের মোহনমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া কত কত যুবক আজ এই ভোগপ্লাবিত বঙ্গভূমির ভিতর ত্যাগের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেই মহাপুরুষের নামে যে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সাধারণে যোগ দিলে তাঁহাদের হৃদয়ে কিয়ৎক্ষণের জন্যও যে সেই মহাপুরুষের আভা পড়ে, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে?

এ মহোৎসব আবার যে সে স্থানে নহে অথবা যে সে ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠাতা নহে। ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব যাঁহাদিগকে পুত্রাধিক স্নেহবশে সাধনের গুহ্য রহস্য শিখাইয়া ও উপলব্ধি করাইয়া এই ঘোর কলির মধ্যে পাবন তীর্থ-স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই তাঁহার সাক্ষাৎ প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ইহার উদ্যোক্তা ও অনুষ্ঠাতা। দুর্ভাগ্যবশে সেই পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে বঞ্চিত আমাদের কি এমন শুভ মুহূর্ত্ত, পবিত্র মাহেন্দ্রক্ষণ উপেক্ষা করা উচিত?

কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! সাধু, গৃহী, ধনী, মধ্যবিত্ত, নির্ধন, শাক্ত, বৈষ্ণব সকলে এক ক্ষেত্রে আনন্দ করিয়া ভগবন্নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। মনে হয়, এক দিন সমগ্র ভারত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমায় দ্বেষাদ্বেষী ভুলিয়া সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত, মহামহিমাময় এক শ্রেষ্ঠজাতিতে পরিণত হইয়া আবার জগতে আপন গৌরব ঘোষণা করিবে। ইতি

জনৈক দর্শক।

মান্দ্রাজ-মঠেও মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। তথায় ঐ দিন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত পূজা ও ভজন; ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত বন্ধুবর্গ ও ৬০০০ কাঙ্গালী ভোজন, ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত হরিকথা, ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত 'বহুত্বে একত্ব' এই-বিষয়ে বক্তৃতা, এবং ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আরাত্রিক ও প্রসাদ বিতরণ হয়।

এই মতানুসারে মানুষের মৃত্যু হইলে সে অন্যান্য লোকে গমন করে; এই সকল ভাবও সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে, কারণ, অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া এই মতগুলিকেও তাহাদের যথাস্থানে রক্ষা করা যাইতে পারে, কেবল এই-টুকু মানিতে হইবে যে, উহারা প্রকৃত সত্যের আংশিক বর্ণনামাত্র।

যদি তুমি খণ্ড দৃষ্টিতে জগৎকে দেখ, তবে জগৎ তোমার নিকট এইরূপই প্রতীয়মান হইবে। দ্বৈতবাদীর দৃষ্টি হইতে এই জগৎ কেবল ভূতংবা শক্তির সৃষ্টিরূপেই দৃষ্ট হইতে পারে, উহাকে কোন বিশেষ ইচ্ছাশক্তির ক্রীড়ারূপেই চিন্তা করা যাইতে পারে আর সেই ইচ্ছাশক্তিকেও জগৎ হইতে পৃথকরূপেই ভাবনা সম্ভব। এই দৃষ্টি হইতে মানুষ আপনাকে আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টি, এই-রূপেই চিন্তা করিতে পারে আর এই আত্মা সসীম হইলেও পূর্ণ। এরূপ ব্যক্তির অমরত্ব ও অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহাও সেই আত্মাতেই প্রযুক্ত হইবে। এই জন্যই এই মত গুলিও বেদান্তে রক্ষিত হইয়াছে আর এই জন্যই দ্বৈতবাদীদের খুব প্রচলিত সাধারণ মত তোমাদের নিকট আমার বলা আবশ্যক।

এই মতানুসারে প্রথমতঃ অবশ্য আমাদের স্থূল শরীর রহিয়াছে। এই স্থূলশরীরের পশ্চাতে সূক্ষ্মশরীর। এই সূক্ষ্মশরীরও ভৌতিক, তবে উহা খুব সূক্ষ্মভূতে নির্ম্মিত। উহা আমাদের সমুদয় কর্ম্মের আশয়স্বরূপ। সমুদয় কর্ম্মের সংস্কার এই সূক্ষ্মশরীরে বর্ত্তমান—তাহারা সর্ব্বদাই ফলপ্রদানোন্মুখ হইয়া আছে। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, আমরা যে কোন কার্য্য করি, তাহাই কিছুকাল পরে সূক্ষ্মস্বরূপ ধারণ করে, যেন বীজভাব প্রাপ্ত হয়, আর তাহাই এই শরীরে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, কিছুকাল পরে আবার প্রকাশ হইয়া ফলপ্রদান করে। মানুষের সারা জীবনটাই এইরূপ। সে আপন অদৃষ্ট নিজেই গঠন করে। মানুষ আর কোন নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নহে, সে আপনার নিয়মে, আপনার জালে আপনি বদ্ধ। আমরা যে সকল কর্ম্ম করি, আমরা যে সকল চিন্তা করি, তাহারা আমাদের বন্ধনজালের সূত্রমাত্র। একবার কোন শক্তিকে চালনা করিয়া দিলে তাহার পূর্ণ ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। ইহাই কর্ম্মবিধান। এই সূক্ষ্মশরীরের পশ্চাতে সসীম জীবাত্মা রহিয়াছেন। এই জীবাত্মার কোন আকৃতি আছে কি না, ইহা অণু, বৃহৎ, বা মধ্যম আকারের, এই লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ইহা অণু, অপরের মতে ইহা মধ্যম, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতে ইহা বৃহৎ।

এই জীব সেই অনন্ত সত্তার এক অংশমাত্র আর ইহা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে। ইহা অনাদি, ইহা সেই সর্ব্বব্যাপী সত্তার এক অংশরূপে অবস্থান করিতেছে। ইহা অনন্ত। আর ইহা আপন প্রকৃত স্বরূপ শুদ্ধভাব প্রকাশ করিবার জন্য নানাদেহের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। জীব যে অবস্থা হইতে আসিয়াছে, যে কার্য্যের দ্বারা সে সেই অবস্থা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহাকে অসৎ কার্য্য বলে ; চিন্তাসম্বন্ধেও তদ্রূপ। আর যে কার্য্যের দ্বারা, যে চিন্তার দ্বারা তাহার স্বরূপপ্রকাশের বিশেষ সাহায্য হয়, তাহাকে সৎকার্য্য বা সচ্চিন্তা বলে। কিন্তু ভারতের অতি নিম্নতম দ্বৈতবাদী এবং অতি উন্নত অদ্বৈতবাদী, সকলেরই এই সাধারণ মত যে, আত্মার সমুদয় শক্তি ও ক্ষমতা তাহার ভিতরেই রহিয়াছে—উহারা অন্য কোথাও হইতে আইসে না। উহারা আত্মাতে অব্যক্তভাবে থাকে, আর সমুদয় জীবনের কার্য্য কেবল উহার অব্যক্তভাব বিকাশ করিবার জন্য।

তাঁহারা পুনর্জ্জন্মবাদও মানিয়া থাকেন—এই দেহের ধ্বংস হইলে জীব আর এক দেহ লাভ করিবেন আবার সেই দেহনাশের পর আর এক দেহ ; এইরূপ চলিবে। তিনি এই পৃথিবীতেও জন্মাইতে পারেন বা অন্যলোকেও জন্মাইতে পারেন। তবে এই পৃথিবীই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের মত এই, আমাদের সমুদয় প্রয়োজনের জন্য এই পৃথিবীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য লোকে দুঃখকষ্ট খুব কম আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা বলেন, সেই কারণেই সেই সকল লোকে উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবারও সুযোগ নাই। এই জগতে বেশ সামঞ্জস্য আছে ; খুব দুঃখও আছে, আবার কিছু সুখও আছে, সুতরাং জীবের এখানে কখন না কখন মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা, কখন না কখন তাহার মুক্তিলাভের ইচ্ছার সম্ভাবনা। কিন্তু যেমন এই লোকে খুব বড়মানুষদের উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবার খুব অল্পই সুযোগ আছে, সেইরূপ এই জীব যদি স্বর্গে গমন করে, তাহারও আত্মোন্নতির কোন সম্ভাবনা থাকিবে না, এখানে যে সুখ ছিল, তদপেক্ষা সুখ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে—তাহার যে সূক্ষ্মদেহ থাকিবে, তাহাতে কোন ব্যাধি থাকিবে না, তাহার আহার পান করিবারও কিছুমাত্র আবশ্যক থাকিবে না আর তাহার সকল বাসনাই পরিপূর্ণ হইবে। জীব সেখানে সুখের পর সুখ সম্ভোগ করে এবং আপনাকে ও উচ্চভাব সমুদয় ভুলিয়া যায়। তথাপি এই সকল উচ্চতর লোকে কতকব্যক্তি আছেন, যাঁহারা এই সকল ভোগসত্ত্বেও তথা হইতেও আরো উচ্চতর ভাবে

আরোহণ করেন। এক প্রকার স্থূলদর্শী দ্বৈতবাদীরা উচ্চতম স্বর্গকেই চরম লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া থাকেন—এই আত্মাগণ তথায় গমন করিয়া চিরকাল ভগবানের সহিত বাস করিবেন। তাঁহারা সেখানে দিব্যদেহলাভ করিবেন—তাঁহাদের আর রোগশোক মৃত্যু বা অন্য কোনরূপ অশুভ থাকিবে না। তাঁহাদের সকল বাসনা পরিপূর্ণ হইবে এবং তাঁহারা চিরকাল তথায় ভগবানের সহিত বাস করিবেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পৃথিবীতে আসিয়া দেহধারণ করিয়া লোকশিক্ষা দিবেন আর জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যগণ সকলেই এই স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভগবানের সহিত এক লোকে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু দুঃখার্ত্ত মানবজাতির প্রতি তাঁহাদের এতদূর কৃপা হইল যে, তাঁহারা এখানে আসিয়া পুনরায় দেহধারণ করিয়া মানুষকে স্বর্গের পথসম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে দেবলোকাদি বিভিন্ন লোকেও গমন করিয়া থাকেন।

অবশ্য অদ্বৈতবাদী বলেন, এই স্বর্গ কখন আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। সম্পূর্ণ বিদেহমুক্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। যেটী আমাদের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহা কখন সসীম হইতে পারে না। অনন্ত ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য হইতে পারে না, কিন্তু দেহ ত কখন অনন্ত হয় না। ইহা হওয়াই অসম্ভব, কারণ, সসীমতা হইতেই শরীরের উৎপত্তি। অনন্ত চিন্তা হইতে পারে না, কারণ, সসীম ভাব হইতেই চিন্তা আসিয়া থাকে। অদ্বৈতবাদী বলেন, আমাদিগকে দেহ এবং চিন্তারও বাহিরে যাইতে হইবে। আর আমরা অদ্বৈতবাদের সেই বিশেষ মতও পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এই মুক্তি—লাভ করিবার নয়, ইহা বর্ত্তমানই রহিয়াছে। আমরা কেবল উহা ভুলিয়া যাই ও উহাকে অস্বীকার করিয়া থাকি। এই পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে না, উহা বর্ত্তমানই রহিয়াছে। এই অমরত্ব ও অপরিণামিতা লাভ করিতে হইবে না, উহারা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান—উহারা বরাবর আমাদের রহিয়াছে।

যদি তুমি সাহস করিয়া বলিতে পার, 'আমি মুক্ত', এই মুহূর্ত্তে তুমি মুক্ত হইবে। যদি তুমি বল, 'আমি বদ্ধ', তবে তুমি বদ্ধই থাকিবে। যাহা হউক, দ্বৈতবাদী ও অন্যান্যবাদীদের বিভিন্ন মত কথিত হইল। তোমরা ইহার মধ্যে যাহা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করিতে পার।

বেদান্তের এই এক আদর্শ বুঝা বড় কঠিন, আর লোকে সর্ব্বদা ইহা লইয়া

বিবাদ করিয়া থাকে। প্রধান মুস্কিল হয় এইটুকু যে, ইহার মধ্যে যে একটী মত অবলম্বন করে, সে অপর মত একেবারে অস্বীকার করিয়া তন্মতাবলম্বীর সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। তোমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত, তাহা গ্রহণ কর; অপরের উপযোগী মত তাহাকে গ্রহণ করিতে দাও। যদি তুমি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব, এই সসীম মানবত্ব রাখিতে এতই ইচ্ছুক হও, তবে তুমি তাহা রাখিতে পার; তোমার সকল বাসনা রাখিতে পার ও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকতে পার। যদি মানুষভাবে থাকিবার সুখ তোমার নিকট এতই সুন্দর ও মধুর লাগে, তবে তুমি যতদিন ইচ্ছা, উহা রাখিয়া দাও, কারণ, তুমি জান, তুমিই তোমার অদৃষ্টের নির্ম্মাতা, কেহই তোমাকে বাধ্য করিতে পারে না। তোমার যতদিন ইচ্ছা, ততদিন মানুষ থাকিতে পার। কেহই তোমায় বাধ্য করিতে পারে না। যদি দেবতা হইতে ইচ্ছা কর, দেবতাই হইবে। এই কথা। কিন্তু এমন অনেক লোক থাকিতে পারেন, যাঁহারা দেবতা পর্য্যন্ত হইতে অনিচ্ছুক! তোমার তাঁহাদিগকে বলিবার কি অধিকার আছে যে, এ ভয়ানক কথা? তোমার এক শত টাকা নষ্ট হইবার ভয় হইতে পারে, কিন্তু এমন অনেক লোক থাকিতে পারেন, যাঁহাদের জগতে যত অর্থ আছে, সব নষ্ট হইলেও কিছু কষ্ট হইবে না। এইরূপ লোক পূর্ব্বকালে অনেক ছিলেন এবং এখনও আছেন। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার আদর্শানুসারে বিচার করিতে কেন যাও? তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জাগতিক ভাবে বদ্ধ হইয়া আছ। ইহাই তোমার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হইতে পারে। তুমি এই আদর্শ লইয়া থাক না কেন? তুমি যেমনটী চাও, তেমনটী পাইবে। কিন্তু তোমা ছাড়া এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সত্যকে দর্শন করিয়াছেন—তাঁহারা ঐ স্বর্গাদিভোগে তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আর উহাতে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে চান না; তাঁহারা সকল সীমার বাহিরে যাইতে চাহেন, জগতের কিছুতেই তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। জগৎ এবং উহার সমুদয় ভোগ তাঁহাদের পক্ষে গোষ্পদতুল্য। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহ কেন? এই ভাবটী একেবারে ছাড়িতে হইবে। প্রত্যেককে আপনার আপনার ভাবে চলিতে দাও।

অনেকদিন পূর্ব্বে আমি 'সচিত্র লণ্ডন সমাচার' (Illustrated London News) নামক সংবাদপত্রে একটী সংবাদ পাঠ করি। কতকগুলি জাহাজ *

* প্রশান্ত মহাসাগরস্থ সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের নিকট ব্রিটিশ জাহাজ ক্যালিওপ ও আমেরিকার কতকগুলি ম্যান অফ ওয়ার।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের নিকট ঝটিকাক্রান্ত হয়। ঐ পত্রিকায় ঐ ঘটনার একখানি চিত্রও ছিল। একখানি ব্রিটিশ জাহাজ ছাড়া সকলগুলিই ভগ্ন হইয়া ডুবিয়া যায়। সেই ব্রিটিশ জাহাজ খানি ঝড় কাটাইয়া চলিয়া আসে। আর ছবিখানিতে ইহা দেখাইতেছে, যে জাহাজগুলি ডুবিয়া যাইতেছে, তাহাদের ডেকে মজ্জমান আরোহিদল দাঁড়াইয়া যে জাহাজখানি ঝড় কাটাইতেছে, সেই জাহাজ খানির লোকগুলিকে উৎসাহ দিতেছেন। অপর লোককে টানিয়া নিজের ভূমিতে লইয়া যাইও না। আর এক নির্ব্বুদ্ধিতা লোকের দেখা যায় যে, যদি আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র আমিত্ব হারাইয়া ফেলি, তবে জগতে কোনরূপ নীতিপরায়ণতা থাকিবে না, মনুষ্যজাতির কোন আশাভরসা থাকিবে না। যেন যাঁহারা উহা বলেন, তাঁহারা সমগ্র মনুষ্যজাতির জন্য সর্ব্বদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন! যদি সকল দেশে অন্ততঃ দুইশত নরনারী বাস্তবিক দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী হন, তবে দুদিনে সত্যযুগ উপস্থিত হইতে পারে। আমরা জানি, আমরা মনুষ্যজাতির উপকারের জন্য কেমন মরিতে প্রস্তুত! এ সকল লম্বা লম্বা কথামাত্র—এ সকল কথা বলিবার কোন স্বার্থপূর্ণ অভিসন্ধি আছে। জগতের ইতিহাসে ইহা প্রকাশ যে, যাঁহারা এই ক্ষুদ্র আমিকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই মনুষ্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতকারী, আর যতই লোকে আপনাকে ভুলিবে, ততই পরোপকারে অধিক সমর্থ হইবে। উহার মধ্যে একটী স্বার্থপরতা, অপরটী নিঃস্বার্থপরতা। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগসুখে আসক্ত হইয়া থাকা এবং এইগুলিই চিরকাল থাকিবে মনে করাই অতিশয় স্বার্থপরতা। ইহা সত্যানুরাগ হইতে উৎপন্ন নহে, অপরের প্রতি দয়াও এই ভাবের উৎপত্তির কারণ নহে—উহার উৎপত্তির কারণ, ঘোর স্বার্থপরতা। আর কাহারো দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নিজেই সমস্ত ভোগ করিব, এই ভাব হইতে ইহার উৎপত্তি। আমার ত এইরূপই বোধ হয়। আমি জগতে প্রাচীন মহাপুরুষ ও সাধুগণের তুল্য চরিত্রবলশালী পুরুষ আরো দেখিতে চাই—তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র পশুর উপকারের জন্য শত শত জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন! নীতি ও পরোপকারের কথা কি বলিতেছ? ইহা ত আধুনিক কালের বাজে কথামাত্র!

আমি সেই গৌতমবুদ্ধের ন্যায় চরিত্রবলশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি ও সম্বন্ধে কখন প্রশ্নই করেন নাই, ও সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু যিনি সকলের

জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—সারা জীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারা জীবন অপরের হিত কিসে হয়, ইহাই যাঁহার চিন্তা ছিল। তাঁহার জীবনবৃত্তলেখক বেশ বলিয়াছেন যে, তিনি 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের মুক্তির জন্য পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে বনে গমন করেন নাই। জগৎ জ্বলিয়া গেল—কেহ উহা হইতে বাঁচিবার পথ না করিলে চলিবে কেন? তাঁহার সারা জীবন এই এক চিন্তা ছিল—জগতে এত দুঃখ কেন? তোমরা কি মনে কর, আমরা তাঁহার মত নীতিপরায়ণ?

* * * * * *

যীশু খ্রীষ্ট যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই খাঁটি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ও বেদান্ত-ধর্ম্মে অতি অল্পই প্রভেদ ছিল। তিনি অদ্বৈতবাদও প্রচার করিয়াছেন আবার সাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, তাহাদিগকে উচ্চতম আদর্শ ধারণা করাইবার সোপানস্বরূপে দ্বৈতবাদের কথাও বলিয়াছেন। যিনি 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' বলিয়া প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই আবার ইহাও বলিয়াছেন, 'আমি ও আমার পিতা এক।' আর তিনি ইহাও জানিতেন, এই স্বর্গস্থ পিতারূপে দ্বৈতভাবে উপাসনা করিতে করিতেই অভেদবুদ্ধি আসিয়া থাকে। তখন খ্রীষ্টধর্ম্ম কেবল প্রেম ও আশীর্ব্বাদপূর্ণ ছিল, কিন্তু অবশেষে নানাবিধ ভাব প্রবেশ করিয়া উহা বিকৃতভাব ধারণ করিল। এই যে ক্ষুদ্র 'আমি'র জন্য মারামারি, 'আমি'র প্রতি অতিশয় ভালবাসা, শুধু এ জীবনে নহে, মৃত্যুর পরও এই ক্ষুদ্র 'আমি', এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব লইয়া থাকিবার ইচ্ছা, ইহা ঐ ধর্ম্মের বিকৃত ভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, ইহা নিঃস্বার্থপরতা—ইহা নীতির ভিত্তিস্বরূপ! ইহা যদি নীতির ভিত্তি হয়, তবে আর দুর্নীতির ভিত্তি কি? স্বার্থপরতা নীতির ভিত্তি আর যে সকল নরনারীর নিকট আমরা অধিক জ্ঞানের প্রত্যাশা করি, তাঁহারা, এই ক্ষুদ্র 'আমি' নাশ হইলে একেবারে সব নীতি নষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া আকুল! সর্ব্বপ্রকার শুভের, সর্ব্বপ্রকার নৈতিক মঙ্গলের মূলমন্ত্র আমি নয়, তুমি। কে ভাবিতে যায়, স্বর্গনরক আছে কি না? কে ভাবিতে যায়, আমার আত্মা আছেন কি না? কে ভাবিতে যায়, কোন অপরিণামী সত্তা আছে কি না। এই সংসার পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা মহাদুঃখে পরিপূর্ণ। বুদ্ধের ন্যায় এই সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দাও, হয়, উহা দূর কর, নয় ঐ চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জ্জন কর। আপনাকে ভুলিয়া যাও; আস্তিকই হও, নাস্তিকই হও, অজ্ঞেয়বাদী হও বা বৈদান্তিক হও, খ্রীশ্চিয়ান হও বা মুসল-

মান হও, ইহাই প্রথম শিক্ষার বিষয়। এই শিক্ষা, এই উপদেশ সকলেই বুঝিতে পারে—নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু—অহং নাশ ও প্রকৃত আমির বিকাশ।

দুটী শক্তি সর্ব্বদা সমভাবে কার্য্য করিতেছে। একটী অহং, অপরটী নাহং। এই নিঃস্বার্থপরতা শক্তি শুধু মানুষের ভিতর নয়, তির্য্যগ্‌জাতির ভিতরও এই শক্তির বিকাশ দেখা যায়—এমন কি, ক্ষুদ্রতম কীটাণুগণের ভিতর পর্য্যন্ত এই শক্তির প্রকাশ। নরশোণিতপানে লোলজিহ্বা ব্যাঘ্রী তাহার শাবককে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। অতি দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি, যে অনায়াসে তাহার ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে, সেও তাহার অনাহারে মুমুর্ষু স্ত্রী অথবা পুত্র কন্যার জন্য সব করিতে প্রস্তুত। অতএব দেখা যায়, সৃষ্টির ভিতরে এই দুই শক্তি পাশাপাশি কার্য্য করিতেছে—যেখানে একটী শক্তি দেখিবে, সেখানে অপর শক্তিটীরও অস্তিত্ব দেখিবে। একটী স্বার্থপরতা, অপরটী নিঃস্বার্থপরতা। একটী গ্রহণ, অপরটী ত্যাগ। ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্য্যন্ত সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই এই দুই শক্তির লীলাক্ষেত্র। ইহা কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে—ইহা স্বতঃপ্রমাণ।

সমাজের এক সম্প্রদায়ের লোকের বলিবার কি অধিকার আছে যে, জগতের সমুদায় কার্য্য ও বিকাশ ঐ দুই শক্তির মধ্যে অন্যতম অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষণের উপর স্থাপিত? জগতের সমুদয় কার্য্য, রাগ দ্বেষ বিবাদ ও প্রতিযোগিতার উপর স্থাপিত, এ কথা বলিবার তাঁহাদের কি অধিকার আছে? এই সকল প্রবৃত্তি যে জগতের অনেকাংশকে পরিচালিত করিতেছে, ইহা আমরা অস্বীকার করি না। তাঁহাদের অপর শক্তিটীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কি অধিকার আছে? আর তাঁহারা কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, এই প্রেম, এই অহংশূন্যতা, এই ত্যাগই জগতের একমাত্র ভাবরূপিণী শক্তি? অপর শক্তিটী ঐ প্রেমশক্তিরই অন্যায় পরিচালন—ঐ প্রেমশক্তি হইতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎপত্তি। অশুভের উৎপত্তিও নিঃস্বার্থপরতা হইতে—অশুভের পরিণামও শুভ বই আর কিছুই নয়। উহা কেবল মঙ্গলবিধায়িনী শক্তির অপব্যবহার মাত্র। পথে যে ব্যক্তি ঐ আর এক ব্যক্তিকে হত্যা করিল, সেও হয়ত আপন সন্তানের প্রতি স্নেহবশতঃ ঐ কার্য্য করিল। তাহার প্রেম অন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি হইতে গুড়াইয়া তাহার সন্তানের উপর পড়িয়া সসীম ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সীমাবদ্ধই হউক বা অসীমই হউক, উহা সেই ভগবান বই আর কিছুই নহে।

১৫ই চৈত্র ১৩০৮।] উদ্বোধন।

অতএব সমগ্র জগতের পরিচালক, জগতের মধ্যে একমাত্র প্রকৃত ও জীবন্ত শক্তি সেই অদ্ভুত জিনিষ—উহা যে কোন আকারে ব্যক্ত হউক না, উহা সেই প্রেম, নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ। বেদান্ত এই স্থানেই দ্বৈতবাদ ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতের উপর ঝোঁক দেন। আমরা এই অদ্বৈত ব্যাখ্যার উপর বিশেষ জোর দিই এই জন্য যে, আমরা জানি, আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের অভিমান সত্ত্বেও আমরা জানি যে, একটী কারণ দ্বারা যেখানে কতকগুলি কার্য্যের ব্যাখ্যা করা যায়, আবার অনেকগুলি কারণ দ্বারাও যদি সেই কার্য্যগুলির ব্যাখ্যা করা যায়, তবে সেই অনেকগুলি কারণ,পূর্ব্বোক্ত এক কারণের সহিতই সমান হইয়া পড়িল। এখানে যদি আমরা কেবল স্বীকার করি যে, সেই একই অপূর্ব্ব সুন্দর প্রেম, সীমাবদ্ধ হইয়াই অসৎরূপে প্রতীয়মান হয়, তবে আমরা এক প্রেমশক্তি দ্বারা সমুদয় জগতের ব্যাখ্যা করিলাম। নচেৎ আমাদিগকে জগতের দুইটী কারণ মানিতে হইবে—একটী শুভশক্তি, অপরটী অশুভ শক্তি—একটী প্রেমশক্তি, অপরটী দ্বেষশক্তি। এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্‌টী অধিক ন্যায়সঙ্গত? অবশ্য—এক শক্তির দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা।

আমি এক্ষণে এমন সকল বিষয়ে গিয়া পড়িতেছি, যাহা সম্ভবতঃ দ্বৈতবাদী-দের মতসঙ্গত নহে। আমার বোধ হয়, আমি অদ্বৈতবাদে বেশীক্ষণ থাকিতে পারি না। আমার ইহাই দেখান উদ্দেশ্য যে, নীতি ও নিঃস্বার্থপরতার উচ্চতম আদর্শ, উচ্চতম দার্শনিকধারণার সহিত অসঙ্গত নহে। আমার ইহাই দেখান উদ্দেশ্য যে, নীতিপরায়ণ হইতে গেলে তোমার দার্শনিক ধারণাকে খাট করিতে হয় না। বরং নীতির ভিত্তিভূমি প্রাপ্ত হইতে গেলে তোমাকে উচ্চতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণাসম্পন্ন হইতে হয়। মনুষ্যের জ্ঞান, মনুষ্যের শুভের বিরোধী নহে। বরং জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। জ্ঞানই উপাসনা। আমরা যতই জানিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। বেদান্তী বলেন, এই আপাতপ্রতীয়মান অশুভের কারণ,—অসীমের সীমাবদ্ধ ভাব। যে প্রেম সীমাবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইয়া যায় ও অশুভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই আবার চরমাবস্থায় ব্রহ্মপ্রকাশ করে। আর বেদান্ত ইহাও বলেন, এই আপাতপ্রতীয়মান সমুদয় অশুভের কারণ আমাদের ভিতরই রহিয়াছে। কোন অপ্রাকৃতিক পুরুষের নিন্দা করিও না অথবা নিরাশ বা বিষণ্ণ হইয়া পড়িও না, অথবা ইহাও মনে করিও না, আমরা গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া আছি—যতক্ষণ না অপর কেহ আসিয়া আমাদিগকে সাহায্য

ইহা দোষ নহে। কারণ, আশ্রীয়মাণ (যে উদাত্ত প্রভৃতি গুণকে আশ্রয় করিয়া আদেশ হইয়া থাকে) গুণ, ভেদক হইয়া থাকে। যেমন ;—'শুক্লমাল-ভেত কৃষ্ণমালভেত'। বেদে যে স্থলে, এই সকল আদেশবাক্যে, শুক্ল বা কৃষ্ণ পশু লাভের (যথার্থ পশু সংগ্রহের) আদেশ করা হইয়াছে ; সেখানে, যে শুক্ল পশু লাভ কর্ত্তব্য হইলে, কৃষ্ণ পশু লাভ (সংগ্রহ) করিয়া থাকে, তাহার তদ্দ্বারা (কৃষ্ণপশু দ্বারা) বেদের যথোক্তরূপ বিধান প্রতিপালন করা হয় না। সুতরাং, যেহেতু উদাত্তাদি স্বরে কোনও ভেদ নাই ; সেহেতু উদাত্তাদির গ্রহণ জন্য 'আ'কার 'ত'পরবিশিষ্ট করিবার প্রয়োজন হইতে পারে না।

ভাষ্যমূল। অসন্দেহার্থস্তর্হি তকারঃ। ঐজিত্যুচ্যমানে সংদেহঃ স্যাৎ কিমিমাবৈচাবোহোস্বিদাকারোঽপ্যত্র নির্দ্দিশ্যত ইতি। সন্দেহমাত্রমেতদ্-ভবতি। সর্ব্বসন্দেহেষু চেদমুপতিষ্ঠতে। ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণমিতি। ত্রয়াণাং গ্রহণমিতি ব্যাখ্যাস্যামঃ। অন্যত্রাপি হ্যমেবং-জাতীয়কেষু সন্দেহেষু ন কঞ্চিদ্‌যত্নং করোতি। তদ্‌যথা। ঔতোঽম্‌শসোরিতি।

বঙ্গানুবাদ।—তবে, সন্দেহ না হয়, এই জন্য 'ত'কার উচ্চারণ প্রয়োজন। কারণ, 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'আদৈচ্' না বলিয়া, কেবল 'ঐচ্' বলিলে সন্দেহ হইবে যে, কেবল কি ইহা 'ঐচ্'ই অথবা ইহার মধ্যে 'আ'কারও নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে (আ+ঐচ্=ঐচ্)। এই সন্দেহ নিবারণের জন্যই 'ত'পর-বিশিষ্ট 'আদৈচ্' এইরূপ নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

কেবলমাত্র সন্দেহের জন্য 'আ'কার, 'ত'পরবিশিষ্ট করা কর্ত্তব্য ? সকল সন্দেহেই ইহা (পরিভাষা) উপস্থিত হইবে যে,—ব্যাখ্যান দ্বারাই বিশেষ জ্ঞান জন্মে, সন্দেহ মাত্র দ্বারা কখনও তাহা অলক্ষণ হয় না। অতএব এখানেও তিন বর্ণের অর্থাৎ আকার, ঐকার, ঔকারেরই গ্রহণ হয় ; এইরূপ ব্যাখ্যা করিব। তাহা হইলে, (ব্যাখ্যা দ্বারা প্রতিপত্তি করিতে হইলে) অন্যত্রও এই এই প্রকার জাতীয় সন্দেহসমূহে, কোনও যত্ন করিতে হইবে না। যেমন ;—"ঔতোঽম্ শসোঃ ।৬।১।৯৩। (ওকারের পরে, অম্ এবং শস্ প্রত্যয়ের

তাহার উত্তর 'অঞ্' প্রত্যয় হয়। যেমন,—কপোত+অঞ্=কাপোতম্। ময়ূর+অঞ্=মায়ূরম্) এইস্থলে যেমন, অনুদাত্তাদিবিশিষ্ট শব্দের উত্তর 'অঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে ; সেরূপ স্বরিতাদিবিশিষ্ট শব্দের উত্তরও প্রাপ্তি হইবে।

'অচ্' থাকিলে, 'আ'কার একাদেশ হয়) এই স্থলেও যে, আ+ঔতঃ=ঔতঃ; (ঔতঃ+অম্শসোঃ=ঔতোঽম্শসোঃ) হইয়াছে, কেবল 'ঔতঃ'ই নহে, ইহাও ব্যাখ্যা দ্বারাই প্রতিপত্তি হইবে।

ভাষ্যমূল।—ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। আন্তর্য্যতস্ত্রিমাত্রচতুর্মাত্রাণাং স্থানিনাং ত্রিমাত্রা চতুর্মাত্রা আদেশা মা ভূবন্নিতি। খট্বা ইন্দ্রঃ খট্বেন্দ্রঃ। খট্বা উদকম্ খট্বোদকম্। খট্বা ঈষা খট্বেষা। খট্বা ঊঢ়া খট্বোঢ়া। খট্বা এলকা খট্বৈলকা। খট্বা ওদনঃ খট্বৌদনঃ। খট্বা ঐতিকায়নঃ খট্বৈতিকায়নঃ। খট্বা ঔপগবঃ খট্বৌপগব ইতি। অথ ক্রিয়মাণেঽপি তকারে কস্মাদেব ত্রিমাত্রচতুর্মাত্রাণাং স্থানিনাং ত্রিমাত্রচতুর্মাত্রা আদেশা ন ভবন্তি। তপরস্তৎকালস্যেতি নিয়মাৎ। নমু তঃ পরো যস্মাৎ সোঽয়ং তপরঃ নেত্যাহ। তাদপি পরস্তপরঃ। যদি তাদপি পরস্তপরঃ ঋদোরবিতি ইহৈব স্যাৎ। যবঃ স্তবঃ। লবঃ পব ইত্যত্র ন স্যাৎ। নৈষ তকারঃ। কস্তর্হি। দকারঃ। কিমত্র দকারে প্রয়োজনম্। অথ কিং তকারে। যদ্যসংদেহার্থস্তকারঃ দকারোঽপি। অথ মুখার্থস্তকারঃ দকারোঽপি। বৃদ্ধিরাদৈচ্।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে ইহাই তপর করণের প্রয়োজন যে,—আন্তর্য্য (সদৃশতমতা) প্রযুক্ত, তিনমাত্রা বা চারিমাত্রা বিশিষ্ট যে স্থানি, তাহার স্থানে তিনমাত্রা বা চারিমাত্রা আদেশ না হইতে পারে। যেমন,—খট্বা+ইন্দ্রঃ=খট্বেন্দ্রঃ (৩ মাত্রা), খট্বা+উদকং=খট্বোদকম্ (৩ মাত্রা), খট্বা+ঈষা=খট্বেষা (৪ মা); খট্বা+ঊঢ়া=খট্বোঢ়া (৪ মা), খট্বা+এলকা=খট্বৈলকা (৪ মা), খট্বা+ওদনঃ=খট্বৌদনঃ (৪), খট্বা+ঐতিকায়নঃ= খট্বৈতিকায়নঃ (৪), খট্বা+ঔপগবঃ=খট্বৌপগবঃ (৪), এই সকল স্থলে, দুই মাত্রা বিশিষ্ট 'খট্বা' শব্দের আকারের পরে, 'ইন্দ্র' ইত্যাদি এক মাত্রা বা দুইমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ থাকিলে, একত্রমিলিত হইয়া তিনমাত্রা বা চারিমাত্রা আদেশ হইবে না।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, 'আ'কার 'ত'পরবিশিষ্ট করিলেও, কেন তিনমাত্রা চারিমাত্রা বিশিষ্ট স্থানিবর্ণ সমূহের স্থানে, তিনমাত্রা বা চারিমাত্রা আদেশ হইবে না?

'তপরস্তৎকালস্য' (১) এই নিয়ম দ্বারাই তিনমাত্রা বা চারিমাত্রা আদেশ হইবে না।

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

যদি বল যে, 'ত'কার আছে পরে যার, এমন যে বর্ণ, সেই তপর ; তাহা হইলেত 'আদৈচ্' এর 'ত'কারের পরে 'ঐ'কার থাকাতেও দুইমাত্রা বিশিষ্ট 'আ'কারেরই মাত্র গ্রহণ হইবে ; কিন্তু দুই মাত্রা বিশিষ্ট 'ঐ'কার 'ঔ'কারের গ্রহণ হইবে না ?

কেবল 'ত'কার আছে পরে যাহার, সেই যে 'ত'পর, তাহা বলা হইবে না। 'ত'কারের পরে যে বর্ণ আছে, তাহাকেও 'ত'পর বলা হইবে। তাহা হইলেই 'আদৈচ্'এর, 'ত'কারের পরে 'ঐ'কার'ঔ'কার থাকাতে, ত্রিমাত্রিক বা চারিমাত্রিক আদেশ 'খট্টৈ্তিকায়ন' প্রভৃতির 'ঐ'কারের সম্ভাবনা থাকিলেও তাহার প্রাপ্তি না হইয়া, দুইমাত্রিক 'ঐ'কারাদির প্রাপ্তি হইবে। (১)

যদি 'ত'কারের পরে যে বর্ণ, তাহাকেও তপর বলা যায় ; তবে "ঋদোরপ্" (২) ৩।৩।৫৭। এই সূত্রে, 'ঋৎ'এর তকারের পর হ্রস্ব 'উ'কার থাকাতে, একমাত্রা-বিশিষ্ট হ্রস্ব 'উ'কারান্ত 'যু'ধাতু এবং 'স্তু'ধাতুরই উত্তর 'অপ্'প্রত্যয় হইয়া 'যবঃ''স্তবঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে ; কিন্তু দ্বিমাত্রাবিশিষ্ট দীর্ঘ 'উকারান্ত 'লূ' এবং 'পূ' ধাতুর উত্তর 'অপ্' প্রত্যয়ও প্রাপ্তি হইবে না ; সুতরাং 'লবঃ' 'পবঃ' প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না ?

এই দোষ এখানে প্রাপ্তি হইবে না। কারণ, ইহা (ঋদোরপ্) 'ত'কার নহে।

তবে কি ?

'দ'কার।

এখানে, 'দ'কারের প্রয়োজন কি ?

পুনরায় আমিও জিজ্ঞাসা করিব—আপনারই বা 'ত'কারের ('ঋদোরপ' সূত্রে) প্রয়োজন কি ?

যদি সন্দেহ ('ঋ'কারে 'উ'কারে মিলিয়া ক্র এবং তৎপরে 'অপ' করিয়া 'র্বপ্' সূত্র করিলে সন্দেহ হইতে পারে যে, কোন্ ২ বর্ণ মিলিয়া 'র্বপ্' হইয়াছে) না হয়, এইজন্য 'ত'কার করিবার প্রয়োজন হয় ; তবে 'দ'কারও সেই জন্যই

(১) 'খট্বৈন্দ্র' হইতে, 'খট্টৌঢ়া' পর্য্যন্ত চারিটী প্রয়োগ, 'অদেঙ্ গুণঃ' সূত্রের দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল বিচারই পুনঃ 'অদেঙ্গুণঃ' সূত্রেও উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া, পুনরুক্তি ভয়ে আর ভাষ্যকার 'অদেঙ্ গুণঃ' সূত্রের স্বতন্ত্র ভাষ্য করেন নাই ; ইহারই মধ্যে অন্তর্ভাব করিয়াছেন।

(২) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রয়োজন। আর যদি মুখসুখার্থ 'ভ'কারের প্রয়োজন হয়, তবে 'হ'কারও সেই জন্যই (মুখের সুখের জন্যই) প্রয়োজন।

এই 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের ভাষ্য সমাপ্ত হইল।

সূত্রমূল।—ইকো গুণবৃদ্ধী ১।১।৩।

ইকঃ। ৬। গুণবৃদ্ধী। ১। (১)

সূত্রার্থ।—'গুণ'শব্দ এবং 'বৃদ্ধি'শব্দ দ্বারা, যে স্থলে গুণ এবং বৃদ্ধি কার্য্য বিধান করা যাইবে; সেই স্থানে, সেই গুণ ও বৃদ্ধিরূপ কার্য্য, 'ইক্' প্রত্যাহার-স্থিত বর্ণসমূহের স্থানে হয়, এইরূপ জানিতে হইবে।

ভাষ্যমূল।—ইগ্ গ্রহণং কিমর্থম্। ইগ্ গ্রহণমাৎসন্ধ্যক্ষরব্যঞ্জননিবৃত্ত্যর্থম্ *। ইগ্গ্রহণং ক্রিয়তে। কিং প্রয়োজনম্। আকারনিবৃত্ত্যর্থং সন্ধ্যক্ষরনিবৃত্ত্যর্থং ব্যঞ্জননিবৃত্ত্যর্থঞ্চ। আকারনিবৃত্ত্যর্থং তাবৎ। যাতা বাতা। আকারস্য গুণঃ প্রাপ্নোতি। ইগ্ গ্রহণান্ন ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সূত্রে, সকল বর্ণের গ্রহণ না করিয়া, কেবল ইক্ প্রত্যাহারের গ্রহণ কেন করা হইল? (অর্থাৎ এইসূত্র কেন করা হইল?)

ইক্ গ্রহণ করা হইয়াছে, আকার, সন্ধি অক্ষর এবং ব্যঞ্জন-বর্ণ নিবৃত্তির জন্য। *। ইক্ প্রত্যাহারের গ্রহণ করা হইয়াছে কি প্রয়োজনে?

গুণ ও বৃদ্ধিরূপ কার্য্য—আকারেতে নিবৃত্তির জন্য,—সন্ধ্যক্ষরেতে (এ, ও, ঐ, ঔ তে) নিবৃত্তির জন্য, এবং ব্যঞ্জন বর্ণেতে নিবৃত্তির জন্য। আকার নিবৃত্তির জন্য যথা, যাতা,বাতা (যদি ইক্ ভিন্ন সর্ব্বত্রই গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত; তবে এই স্থলেও 'আ'কারের গুণ হইয়া, 'অ'কার হইয়া যাইত, এবং 'যতা' প্রভৃতি অশুদ্ধ প্রয়োগ হইতে লাগিত) ইত্যাদিস্থলে 'আ'কারের গুণ প্রাপ্ত হইত; ইক্ প্রত্যাহারের (গুণবৃদ্ধিকার্য্যে) গ্রহণ করাতে, তাহা হইল না।

ভাষ্যমূল।—সন্ধ্যক্ষরনিবৃত্ত্যর্থম্। গ্লায়তি, ম্লায়তি। সন্ধ্যক্ষরস্য গুণঃ প্রাপ্নোতি। ইগ্ গ্রহণান্ন ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—সন্ধ্যক্ষর (২) নিবৃত্তির জন্য, যথা;—গ্লায়তি, ম্লায়তি।

---

(১) এক হইতে সাত পর্য্যন্ত যে কোন অঙ্ক থাকিবে, সেই শব্দকে সেই বিভক্তি এবং বিন্দুদ্বারা একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন জানিবে।

(২) অ ই, এবং অ উ যোগে, প্রযত্ন ভেদে, এ, ঐ, ও, ঔ হয়; সন্ধি অর্থাৎ বর্ণদ্বয় সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া ইহাকে সন্ধ্যক্ষর বলে।

ইক্‌প্রত্যাহার ভিন্ন সকল বর্ণে, গুণ ও বৃদ্ধি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, মৈ ও ম্লৈ ধাতুর ঐকারের গুণ প্রাপ্ত হইয়া, 'এ'কার আদেশ হইত, অথচ 'আয়্' আদেশ হইয়া, ম্লায়তি, ম্লায়তি পদসিদ্ধ হইত না), সন্ধ্যক্ষরের গুণপ্রাপ্ত হইত। ইক্‌প্রত্যাহার গ্রহণ হেতু তাহা হইল না।

ভাষ্যমূল।—ব্যঞ্জননিবৃত্ত্যর্থম্। উম্ভিতা। উম্ভিতুম্। উম্ভিতব্যম্। ব্যঞ্জনস্য গুণঃ প্রাপ্নোতি। ইগ্ গ্রহণান্ন ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ব্যঞ্জন বর্ণে (গুণ, বৃদ্ধি) নিবৃত্তির জন্য। যথা;—উম্ভিতা, উম্ভিতুম্, উম্ভিতব্যম্, (এই স্থলে 'ভ'কারের ওষ্ঠ স্থান বলিয়া, গুণ হইয়া, 'ও'কার প্রাপ্ত হইত) এইস্থলে ব্যঞ্জনের গুণ প্রাপ্ত হইত; 'ইক্' গ্রহণ হেতু, তাহা হইবে না।

ভাষ্যমূল।—আকারনিবৃত্ত্যর্থেন তাবন্নার্থঃ। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি নাকারস্য গুণোভবতীতি। যদয়মাতোঽনুপসর্গে ক ইতি 'ক'কারমনুবন্ধং করোতি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। কিৎকরণে এতৎ প্রয়োজনম্, কৃ্ঙিতীত্যাকারলোপো যথা স্যাৎ। যদি চাকারস্য গুণঃ স্যাৎ কিৎকরণমনর্থকং স্যাৎ। গুণে কৃতে দ্বয়োরকারয়োঃ পররূপেণ সিদ্ধং রূপং স্যাদ্ গোদঃ কম্বলদ ইতি। পশ্যতি ত্বাচার্য্যো নাকারস্য গুণো ভবতীতি। ততঃ 'ক'কারমনুবন্ধং করোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আকার নিবৃত্তির জন্য, 'ইক্' গ্রহণের প্রয়োজন নাই; কেন না, আকারে যে গুণ হয় না, তাহা, শাস্ত্রের অন্যান্য স্থলে, আচার্য্যের (পাণিনির) প্রবৃত্তিই (প্রয়োগ), জ্ঞাপন করিতেছে; যেমন এই আতোঽনুপসর্গে কঃ।৩।২।৩। ('আ'কারান্ত ধাতুর উপসর্গরহিত কর্ম্ম উপপদে থাকিলে, 'ক'প্রত্যয় হয়; অণ্ প্রত্যয় হয় না) সূত্রে, 'ক'কার অনুবন্ধ করিয়াছেন।

('ক'কার অনুবন্ধ করাতে আচার্য্যের প্রবৃত্তি) কিরূপে জ্ঞাপক হইল? উক্ত সূত্রে, 'ক'কার ইৎ বিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, ('ক'কার 'গ'কার 'ঙ'কার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে, ধাতুর আকারের লোপ হয় (১) 'ক'কার ইৎ নিমিত্ত আকার লোপ যাহাতে হয়। যদি 'আ'কারের গুণই হয়; তবে এইসূত্রে, 'ক'কার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় করা অনর্থক হয়, ('অ'প্রত্যয় করিলেই), 'আ'কারের গুণ করিলে পর ('আ'কারের গুণে,

(১) ইহার বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বে, "আতোলোপ ইটি চ।৬।৪।৬৪। সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এক অকার, আর প্রত্যয়ের এক অকার) দুই 'অ'কারের পরবং এক 'আ'কার হইয়া, গোদ, কম্বলদ, এইরূপ (পদ) সিদ্ধ হইবে। আচার্য্য (পাণিনি) দেখিয়াছেন যে, 'আ'কারের গুণ হয় না; এবং সেই হেতুই 'ক'কার অনুবন্ধ করিয়াছেন।

ভাষ্যমূল।—সন্ধ্যক্ষরনিবৃত্ত্যর্থেনাপি নার্থঃ। উপদেশসামর্থ্যাৎ সন্ধ্যক্ষরস্য গুণো ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—সন্ধ্যক্ষর (এ, ও, ঐ, ঔ তে গুণ) নিবৃত্তির জন্যও 'ইক্' গ্রহণের প্রয়োজন নাই। কেন না (অই, অ উ, র সংযোগেই যখন এ, ও, ঐ, ঔ, হইয়াছে, তখন পুনঃ এ ও ঙ্, ঐঔচ্ উপদেশ করা হইয়াছে কেন?) এচ্এর উপদেশ হেতুই সন্ধ্যক্ষরের (এ ও ঐ ঔ র) গুণ হইবে না। অর্থাৎ যদি এ ঐ প্রভৃতি বর্ণের গুণই হইত; তবে ইহাদের উচ্চারণের কোন প্রয়োজন ছিল না।

ভাষ্যমূল।—ব্যঞ্জননিবৃত্ত্যর্থেনাপি নার্থঃ। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ন ব্যঞ্জনস্য গুণোভবতীতি। যদয়ং জনের্ডং শাস্তি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। ডিৎকরণে এতৎ প্রয়োজনং ডিতীতি টিলোপো যথা স্যাৎ। যদি ব্যঞ্জনস্য গুণঃ স্যাদ্ ডিৎ-করণমনর্থকং স্যাৎ। গুণে কৃতে ত্রয়াণামকারাণাং পররূপেণ সিদ্ধং রূপং স্যাদুপ-সরজোমন্দুরজ ইতি। পশ্যতি ত্বাচার্য্যোন ব্যঞ্জনস্য গুণোভবতীতি ততোজনের্ডং শাস্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—ব্যঞ্জনবর্ণসমূহে, গুণবৃদ্ধিনিবারণের জন্যও 'ইক্' গ্রহণের প্রয়োজন নাই। যেহেতু, ব্যঞ্জনবর্ণের যে গুণ হয় না, তাহা আচার্য্যের (পাণিনির) অভিপ্রায়ানুসারেই জানা যাইতেছে। কেন না, তিনি (পাণিনি), 'জন' ধাতুর উত্তর, 'ড' প্রত্যয় শাসন (বিধান) করিয়াছেন।

'ড্'প্রত্যয় বিধানে, কিরূপে জানা গেল যে, ব্যঞ্জনের গুণ হয় না?

এই স্থলে, 'ড্'কার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, 'ড্ক'ার ইৎপ্রযুক্ত (১) 'টি' (২) র, যাহাতে লোপ হয়। যদি ব্যঞ্জনেরও গুণ হয়; তবে ড্ ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় করা অনাবশ্যক হইয়া থাকে। (যদি ব্যঞ্জনের গুণ হইত, তবে 'উপ'পূর্ব্বক 'সর'শব্দ পূর্ব্বক 'জন' ধাতু এবং 'মন্দুর' শব্দ পূর্ব্বক 'জন'ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয় না করিয়া, কেবলমাত্র 'অ'প্রত্যয়

(১) 'ড'কার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় পরে হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী 'টি'র লোপ হয়।

(২) শব্দের অন্ত্যাবর্ত্তী যে 'অচ্' (স্বরবর্ণ), তদবধি শেষ পর্য্যন্ত যে সকল বর্ণ, তাহার 'টি' সংজ্ঞা হয়।

করিলেই, 'জন'ধাতুর 'ন্'কারের গুণে 'অ'কার, 'ন'কারস্থিত 'অ'কার, আর প্রত্যয়ের 'অ'কার,) 'ন'কারের গুণ করিলে পর, এই তিন 'অ'কারের স্থানে, পর 'অ'কার রূপ একটী মাত্র অকার হইয়া, উপসরজ, মন্দুরজ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে। (যদি 'অ'প্রত্যয় করাতেই প্রয়োজনীয় প্রয়োগ সিদ্ধি হয়, তবে'ড্' ইংবিশিষ্ট প্রত্যয়ের কোন প্রয়োজন থাকে না।) আচার্য্য (পাণিনি) দেখিয়াছেন যে, ব্যঞ্জনের গুণ হয় না, তজ্জন্য 'জন' ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয়, বিধান করিয়াছেন।

ভাষ্যমূল।—নৈতানি সন্তি জ্ঞাপকানি। যত্তাবদুচ্যতে। কিৎকরণং জ্ঞাপকং নাকারস্য গুণো ভবতীতি উত্তরার্থমেতৎ স্যাৎ। তুন্দশোকয়োঃ পরিমৃজাপনু-দোরিতি। যত্তর্হি গাপোষ্টগিত্যনন্তার্থং ককারমনুবন্ধং করোতি।

এই সকল (ক্ ইৎ, ড্ ইৎ প্রত্যয় করা দ্বারা) আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রকাশ (জ্ঞাপন) করেনা।

যাহা উক্ত হইয়াছে যে, (আতোঽনুপসর্গে কঃ। এইসূত্রে) 'ক'কার ইৎ-বিশিষ্ট প্রত্যয় করাতে জানা যাইতেছে যে, আকারের গুণ হয় না; তাহা নহে। কেন না, এইস্থলে 'ক'কার ইৎ করা হইয়াছে, উত্তরোত্তর সূত্রে অনু-বৃত্তি (১) হইবার জন্য। "তুন্দশোকয়োঃপরিমৃজাপনুদোঃ" এইসূত্রে 'ক'কারইৎ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি হইয়া যাহাতে প্রয়োগ সিদ্ধি হইতে পারে।

আতোঽনুপসর্গে কঃ, এইসূত্রে 'ক'ইৎ'গ্রহণ না হয়, অন্য সূত্রে চরিতার্থ ("তুন্দশোকয়োঃ" সূত্রে) হইল। কিন্তু তবে "গাপোষ্টক্ ৩।২।৮" (উপসর্গ পূর্ব্বে না থাকে, অথচ কর্ম্মপদ পূর্ব্বে থাকে, এমন যে, 'গা' ধাতু এবং 'পা'ধাতু, তাহাদের উত্তর টক্‌প্রত্যয় হয়। সামং গায়তীতি সামগঃ=সাম—গা+টক্। এইস্থলে, টক্‌প্রত্যয় 'ক'কার ইৎবিশিষ্ট করিবার, 'গা' ধাতুর 'আ'কার লোপ ভিন্ন, অন্য কোনও প্রয়োজন নাই।) এইসূত্রে, অন্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও যে, 'ক'কার অনুবন্ধ (ইৎ) করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, 'আ'কারের গুণ হয় না।

ভাষ্যমূল।—যদপ্যুচ্যতে। উপদেশসামর্থ্যাৎ সন্ধ্যক্ষরস্য গুণো ন ভবিষ্যতীতি। যদি যদৎসন্ধ্যক্ষরস্য প্রাপ্নোতি তত্তদুপদেশসামর্থ্যাদ্বাধ্যতে। আয়াদয়োপি

(১) একটী সূত্রের সম্যক্ অংশ বা কতক অংশ পরবর্ত্তী সূত্রের পশ্চাৎ গমন করিয়া যে, সেই পরবর্ত্তী সূত্রের সম্যক্ অর্থ করিয়া থাকে, তাহাকে 'অনুবৃত্তি' বলে।

তহি ন প্রাপ্নুবন্তি। নৈষ দোষঃ। যং বিধিং প্রত্যুপদেশোঽনর্থকঃ স বিধির্বাধ্যতে। যস্য তু বিধের্নিমিত্তমেব নাসৌ বাধ্যতে। গুণং চ প্রত্যুপদেশোঽনর্থকঃ। আয়াদীনাং পুনর্নিমিত্তমেব।

ভাষ্যানুবাদ।—অ+ই=এ, অ+উ=ও। এ ঐ ও ঔ এই সকল বর্ণ,—'অ'কার, 'ই'কার, বা 'উ'কার যোগ হইয়াই যখন হইয়াছে, তখন পুনরায় "এ ওঙ্। ঐ ঔচ্।" এইসূত্র করিবার কোনও প্রয়োজন ছিলনা। (যেমন সূত্রে 'ক' একবার গ্রহণ করিয়া ষ পুনঃ গ্রহণ করাতে, 'ক্ষ' বলিয়া স্বতন্ত্র কোনও বর্ণ গ্রহণ করে নাই; যেহেতু, যখন যাহার প্রয়োজন হইবে, তখন 'ক,ষ' যোগ করিয়াই 'ক্ষ'এর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। সেইরূপ) এইস্থলে অ ই উ ণ্, এই সূত্র উপদেশের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইলেও যখন পুনঃ "এ ও ঙ্। ঐ ঔ চ্।" এই সন্ধিঅক্ষর (যুক্ত অক্ষর) উচ্চারণ করা হইয়াছে, তখনই জানা যাইতেছে যে, সন্ধিঅক্ষরের গুণ হয় না।

এই বলা হইল যে, উপদেশ-সামর্থ্য হেতুই সন্ধি অক্ষরের (এ, ও, ঔ, ঔর) গুণ হইবে না; তবে এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে,—যদি সন্ধিঅক্ষরসমূহের যাহা যাহা বিধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা উপদেশবলেই নিষেধ হয়; তবে ঐকারাদির স্থানে যে 'আয়্' প্রভৃতি আদেশ (স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, ঐকার স্থানে আয়্, ঔকারের স্থানে আব্ হয়, যেমন,—নৈ+অক=নায়ক) তাহাও প্রাপ্তি হইবেনা?

ইহা দোষ নহে। কারণ, যে বিধির প্রতি, ঐকারাদিসন্ধ্যক্ষর উপদেশ অনর্থক, সেই বিধিকেই বাধা করিবে; কিন্তু যে বিধির প্রতি ইহা (সন্ধ্যক্ষর) নিমিত্ত হইবে, তাহা (আয়্ প্রভৃতি আদেশ) বাধ করিবে না। গুণের প্রতি ঐ ঔ প্রভৃতি সন্ধ্যক্ষর উপদেশ অনর্থকই হইবে। আর আয়্ প্রভৃতি আদেশের প্রতি ঐ ঔ প্রভৃতি নিমিত্তই হয়।

ভাষ্যমূল।—যদ্যপুচ্যতে জনের্ড বচনং জ্ঞাপকং ন ব্যঞ্জনস্য গুণো ভবতীতি। সিদ্ধের্বিধিরারভ্যমানো জ্ঞাপকার্থো ভবতি। ন চ জনের্গুণেন সিধ্যতি। কুতোহ্যেতৎ। জনের্গুণ উচ্যমানোঽকারোভবতি ন পুনরেকারো বাস্যাদোকারো বেতি আন্তর্য্যতোঽমাত্রিকস্য ব্যঞ্জনস্য মাত্রিকোঽকারোভবিষ্যতি। এবমপ্যনুনাসিকঃ প্রাপ্নোতি। পররূপেণ শুদ্ধো ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইল যে, "আচার্য্য পাণিনি কর্ত্তৃক 'জন'ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয় করাতেই ইহা জ্ঞাপক হইয়াছে যে,—ব্যঞ্জনের গুণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—লিখিত।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব।

[সমাধি-মন্দির—সঙ্কীর্ত্তনানন্দে]

আজ ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাগানে আসিয়াছেন। রবিবার, জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি, ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর সকাল নয়টা হইতে ভক্ত সঙ্গে আনন্দ করিতেছেন।

সুরেন্দ্রের বাগান কলিকাতার নিকটস্থ কাঁকুড়গাছী নামক পল্লীর অন্তর্গত। নিকটেই রামের বাগান—যে বাগানে ঠাকুর প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আজ সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব হইতেছে।

সকাল হইলেই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কীর্ত্তনীয়াগণ মাথুর গাহিতে-ছিল। গোপীদিগের প্রেম, শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীমতীর শোচনীয় অবস্থা সমস্ত বর্ণিত হইতেছিল। ঠাকুর মুহুর্ম্মুহুঃ ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। ভক্তগণ উদ্যানগৃহ-মধ্যে চতুর্দ্দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

উদ্যানগৃহ মধ্যে প্রধান প্রকোষ্ঠে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল। ঘরের মেজেতে সাদা চাদর পাতা ও মাঝে মাঝে তাকিয়া রহিয়াছে। এই প্রকোষ্ঠের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে একটী করিয়া কামরা এবং উত্তরে ও দক্ষিণে বারাণ্ডা আছে। উদ্যানগৃহের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে একটী বাঁধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। গৃহ ও পুষ্করিণীঘাটের মধ্যবর্ত্তী উদ্যানপথ পূর্ব্বপশ্চিমে যাইতেছে। পথের দুই ধারে পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ রহিয়াছে। উদ্যান-গৃহের পূর্ব্বধারে পূর্ব্ব হইতে উত্তরে ফটক পর্য্যন্ত আর একটী রাস্তা গিয়াছে। লাল সুরকির রাস্তা। তাহারও দুই পার্শ্বে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ। ফটকের নিকট ও রাস্তার পূর্ব্ব ধারে আর একটী বাঁধাঘাট পুষ্করিণী। পল্লীবাসী সাধারণ লোকে এখানে স্নানাদি করে এবং পানীয় জল লয়। উদ্যানগৃহের পশ্চিম ধারেও উদ্যানপথ, সেই পথের দক্ষিণপশ্চিমে রন্ধনশালা। আজ এখানে খুব ধুমধাম, ঠাকুর ও ভক্তদের সেবা হইবে। সুরেশ ও রাম সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন।

উদ্যানগৃহের বারাণ্ডায়ও ভক্তদের সমাবেশ হইয়াছে। কেহ কেহ বা

বন্ধুসঙ্গে প্রথমোক্ত পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ বাঁধাঘাটে মাঝে মাঝে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তনগৃহমধ্যে ভক্তের জনতা হইয়াছে। ভবনাথ, নিরঞ্জন, রাখাল, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার, মহিমাচরণ ও মণিমল্লিক ইত্যাদি অনেকেই উপস্থিত আছেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্তও উপস্থিত। তন্মধ্যে প্রতাপও আছেন।

* * * * * *

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া অতি করুণ স্বরে, আঁখর দিতেছেন—"সখি, হয় প্রাণবল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয়, নয় আমাকে সেখানে রেখে আয়"। ঠাকুরের রাধাভাব হইয়াছে। কথাগুলি বলিতে বলিতেই ঠাকুর নির্ব্বাক্ হইলেন ; দেহ স্পন্দহীন, অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য ; ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। আবার সেই করুণস্বর। বলিতে-ছেন, "সখি, তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে ; তুইতো আমাকে কৃষ্ণ-প্রেম শিখায়েছিলি।"

কীর্ত্তনীয়াদিগের গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি, যমুনায় জল আন্‌তে আমি যাব না। কদম্বতলে আমি প্রিয় সখীকে দেখেছিলাম, সেখানে গেলেই আমি বিহ্বল হই।"

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাতর হইয়া বলিতেছেন, 'আহা' 'আহা'।

কীর্ত্তনান্তে কীর্ত্তনীয়ারা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, প্রভু আবার দণ্ডায়মান। সমাধিস্থ। কতক সংজ্ঞা লাভ করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "কিষ্ট" কিষ্ট" (কৃষ্ণ কৃষ্ণ)। ভাবে মগ্ন ; নাম সম্পূর্ণ উচ্চারণ হইতেছে না।

এইবারে নাম সঙ্কীর্ত্তন। তাহারা খোল করতালি সঙ্গে গাইতে লাগিল, "রাধে গোবিন্দ জয়।" ঠাকুর আঁখর দিতেছেন,

'ধনি দাঁড়ালোরে।
অঙ্গ ভঙ্গ হেলাইয়ে ধনি দাঁড়ালোরে।
শ্যামের বামে ধনি দাঁড়ালোরে !
তমাল বেড়ি বেড়ি ধনি দাঁড়ালোরে।

ভক্তেরা সকলেই উন্মত্ত ! ঠাকুর নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। মুখে, "রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(সরলতা ও ঈশ্বরলাভ)

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে একটু উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে একটী অল্পবয়স্ক ভক্ত আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আনন্দে বিস্ফারিতলোচনে সস্মিতমুখে বলিয়া উঠিলেন, "তুই এসেছিস্"!

(মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, এ ছোকরাটি বড় সরল। সরলতা পূর্ব্ব জন্মে অনেক তপস্যা না কর্‌লে হয় না। কপটতা পাটোয়ারি এ সব থাক্‌তে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"দেখ্‌ছ না, ভগবান যেখানে অবতার হয়েছেন, সেইখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ—শ্রীকৃষ্ণের বাবা—কত সরল। লোকে বলে, "আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দঘোষ।"

ঠাকুরের ভক্তেরা সরল! ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আবার ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন?

(ভগবানের সেবা ও সংসারের সেবা)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সরল ছোকরা ভক্তের প্রতি)। দেখ্, তোর মুখে যেন একটা কাল আবরণ পড়েছে, তুই আফিসের কায করিস কিনা, তাই পড়েছে। আফিসে হিসাব পত্র করতে হয় আরও নানা রকম কায আছে; সর্ব্বদা ভাব্‌তে হয়।

"সংসারী লোকেরা যেমন চাকরি করে, তুইও চাক্‌রি কর্‌ছিস্, তবে একটু তফাৎ আছে। তুই মার জন্য চাকরি স্বীকার করেছিস্—মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ী-স্বরূপা। যদি মাগ্ ছেলের জন্য চাকরি কত্তিস্, তা হলে আমি বল্‌তুম, "ধিক্ ধিক্! শত ধিক্!

(মণিমল্লিকের প্রতি) "দেখ, এই ছোক্‌রাটি ভারি সরল। তবে আজ কাল একটু আধটু মিথ্যা কথা কয়, এই যা দোষ। সে দিন বলে গেল যে আস্‌বে, আর এলো না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোপী-প্রেম।)

ঠাকুর পশ্চিমের কামরায় দু চার জন ভক্তের সহিত এইবার কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। সেই ঘরে টেবিল চেয়ার কয়েকখানা জড় করা ছিল, ঠাকুর টেবিলে ভর দিয়া অর্দ্ধেক দাঁড়িয়েছেন, অর্দ্ধেক বসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আহা, গোপীদের কি অনুরাগ! তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ হয়ে গেল।

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ! গৌরাঙ্গের ঐ রকম হয়েছিল। বন দেখে বৃন্দাবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবেছিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা, সেই প্রেমের যদি এক বিন্দু কারুর হয়! কি অনুরাগ! কি ভালবাসা! শুধু ষোল আনা অনুরাগ নয়, পাঁচ সিকা পাঁচ আনা। এরই নাম প্রেমোন্মাদ। কথাটা এই, তাঁকে ভালবাস্‌তে হবে। তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে হবে। তা তুমি যে পথেই থাকো, সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই বিশ্বাস কর—ভগবান মানুষ হয়ে অবতার হন, এ কথা বিশ্বাস কর আর না কর, তাঁতে অনুরাগ থাক্‌লেই হোল। তখন তিনি যে কেমন, তিনি নিজেই জানিয়ে দেবেন।

"যদি পাগল হতে হয়, সংসারের জিনিস নিয়ে কেন পাগল হবে? যদি পাগল হতে হয়, তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ভক্তসঙ্গে হরিকথাপ্রসঙ্গে]

ঠাকুর হলঘরে আবার ফিরিলেন। তাঁহার বসিবার আসনের কাছে একটী তাকিয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর বসিবার সময় "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাকিয়া স্পর্শ করিলেন। বিষয়ী লোকেরা এই বাগানে আসা যাওয়া করে ও এই সকল তাকিয়া ব্যবহার করে, এই জন্য বুঝি ঠাকুর ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাধানটী শুদ্ধ করিয়া লইলেন! ভবনাথ, মাষ্টার প্রভৃতি কাছে বসিয়া।

বেলা অনেক হইয়াছে, এখনও খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয় নাই। ঠাকুর বালকস্বভাব। বলিতে লাগিলেন, "কৈগো, এখনও যে দেয় না! সুরেন্দ্র কোথায়?"

একজন ভক্ত। (ঠাকুরের প্রতি) মহাশয়, রাম বাবু অধ্যক্ষ। তিনি সব দেখ্‌ছেন। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) রাম অধ্যক্ষ! তবেই হয়েছে!

একজন ভক্ত। আজ্ঞা, রামবাবু যেখানে অধ্যক্ষ, সেইখানে, এই রকমই হয়ে থাকে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) সুরেন্দ্র কোথায়? আহা, সুরেন্দ্রের বেশ স্বভাবটী হয়েছে। বড় স্পষ্টবক্তা—কারুকে ভয় করে কথা কয় না। আর দেখ খুব মুক্তহস্ত। কেও যদি তার কাছে সাহায্যের জন্য যায়, ত শুধু হাতে ফেরে না।

[ভগবান দাস বাবাজী]

(মাষ্টারের প্রতি)। তুমি ভগবান দাসের কাছে গিয়াছিলে, কি রকম দেখ্‌লে?

মাষ্টার। আজ্ঞা, কালনায় গেছিলাম। ভগবানদাস খুব বুড়ো হয়েছেন। রাত্রে দেখা হয়েছিল, কাঁথার উপর শুয়েছিলেন। প্রসাদ এনে একজনে খাইয়ে দিতে লাগ্‌লো, চেঁচিয়ে কথা কইলে শুন্‌তে পান। আপনার নাম শুনে বল্‌তে লাগ্‌লেন, তোমাদের আর ভাবনা কি? সেই বাড়ীতে নামব্রহ্ম ঠাকুরের পূজা হয়।

* * * * * *

ভবনাথ (মাষ্টারের প্রতি) আপনি অনেক দিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। ইনি আমাকে দক্ষিণেশ্বরে আপনার বিষয় জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন আর বল্‌ছিলেন যে, মাষ্টারের কি অরুচি হয়ে গেল! (এই বলিয়া ভবনাথ হাসিতে লাগিলেন।)

ঠাকুর উভয়ের কথোপকথন সমস্ত শুনিতেছিলেন। তিনি মাষ্টারের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন, হাঁগো, তুমি অনেক দিন যাও নাই কেন বল দেখি?

মাষ্টার তো তো করিতে লাগিলেন।

এমন সময় মহিমাচরণ আসিয়া উপস্থিত। মহিমাচরণ কাশীপুরবাসী, ঠাকুরকে ভারি শ্রদ্ধা ভক্তি করেন ও সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরে যান। ব্রাহ্মণসন্তান, কিছু পৈতৃক বিষয় আছে। স্বাধীনভাবে থাকেন, কাহারও চাকরী করেন

না; সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা ও ঈশ্বরচিন্তা করেন। কিছু পাণ্ডিত্যও আছে। ইংরাজি সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমার প্রতি) একি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত! (সকলের হাস্য)

"এমন যায়গায় ডিঙ্গি টিঙ্গি আস্‌তে পারে, এ যে একেবারে জাহাজ। (সকলের হাস্য)। তবে একটা কথা আছে। এটা আষাঢ় মাস (সকলের হাস্য)।

মহিমাচরণের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমার প্রতি) আচ্ছা, লোককে খাওয়ান এক রকম তাঁরিই সেবা করা, কি বল? সব জীবের তিনি অগ্নিরূপে রয়েছেন। খাওয়ান, কি না, তাঁহাকে আহুতি দেওয়া।

"কিন্তু তা বলে অসৎ লোককে খাওয়াতে নেই। এমন লোক, যারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক করেছে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক, এরা যেখানে বসে খায়, সে যায়গার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়।

"হৃদে একবার লোক খাইয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই খারাপ লোক। আমি বল্লুম, 'দেখ্ হৃদে, ওদের যদি তুই খাওয়াস, তবে এই তোর বাড়ী থেকে চল্লুম।'

(মহিমার প্রতি) আচ্ছা, আমি শুনেছি, তুমি আগে লোকদের খুব খাওয়াতে, এখন বুঝি খরচা বেড়ে গেছে? (সকলের হাস্য)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে।]

এইবার পাতা হইতে লাগিল। দক্ষিণের বারাণ্ডায়। ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিলেন, আপনি একবার যাও, দেখ ওরা সব কি কর্‌ছে; আর না হয় একটু পরিবেশন কর্‌লে!

মহিমাচরণ হুঁ হুঁ করিয়া একটু দালানের দিকে গেলেন, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পরমানন্দে আহার করিতে বসিলেন। আহারান্তে ঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ভক্তেরাও দক্ষিণের পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে

আচমন করিয়া পান খাইতে খাইতে আবার ঠাকুরের কাছে আসিয়া জুটিলেন। সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন।

বেলা ২ টার পর প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন ব্রাহ্মভক্ত। আসিয়া ঠাকুরকে অভিবাদন করিলেন, ঠাকুরও মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন।

প্রতাপের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

প্রতাপ। মহাশয়, আমি পাহাড়ে গিয়েছিলুম (অর্থাৎ দারজিলিঙ্গে)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু তোমার শরীর ত তত ভাল হয় নি। তোমার কি অসুখ হয়েছে?

প্রতাপ। আজ্ঞা, তাঁর (কেশবের) যে অসুখ ছিল, আমারও সেই অসুখ হয়েছে।

কেশবের কথা হইতে লাগিল। প্রতাপ বলিতে লাগিলেন, কেশবের বৈরাগ্য বাল্যকাল থেকেই দেখা গিছিল। তাঁকে আহ্লাদ আমোদ কত্তে প্রায় দেখা যেত না। হিন্দু কলেজে পড়্‌তেন, সেই সময়ে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়। আর ঐ সূত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয়। কেশবের দুইই ছিল। যোগও ছিল, ভক্তিও ছিল। তাঁর ভক্তির সময়ে সময়ে এত উচ্ছ্বাস হতো যে, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা হতো। গৃহস্থদের ভিতর ধর্ম্ম আনা তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

[লোকমান্য ও অহঙ্কার]

একটি মহারাষ্ট্রদেশীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

প্রতাপ। এ দেশের মেয়েরাও কেউ কেউ বিলেতে গেছে। একটি মহারাষ্ট্র দেশের মেয়ে খুব পণ্ডিত, বিলেতে গিছিল। তিনি কিন্তু খ্রীষ্টান হয়েছেন। মহাশয় কি তার নাম শুনেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তবে তোমার মুখে যা শুনলুম, তাতে বোধ হচ্ছে যে, তাঁর লোক-মান্য হবার ইচ্ছে।

(ভক্তদের প্রতি) এরূপ অহঙ্কার ভাল নয়। 'আমি কচ্ছি' এটি অজ্ঞান থেকে হয়; 'হে ঈশ্বর, তুমি ক'রছ' এইটী জ্ঞান। ঈশ্বরই কর্ত্তা আর সব অকর্ত্তা।

"আমি আমি করলে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাব্‌লে বুঝ্‌তে

পারবে। বাছুর 'হাম্ মা হাম্ মা' (আমি আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল টান্‌তে হচ্ছে, রোদ নাই বৃষ্টি নাই। হয়ত কষাই কেটে ফেল্লে। মাংসগুলো লোক খাবে। ছালটা চামড়া হবে; সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ার হবে। লোকে তার উপর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয়নি। চামড়ায় ঢাক্ তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাটি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কিনা নাড়ি ভুঁড়ি গুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে। যখন ধুনুরীর তাঁত তোয়ের হয়, তখন ধোনবার সময় তুঁহু তুঁহু বলে। আর 'হাম্ মা, হাম্ মা' বলে না। তুঁহু তুঁহু বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। আর কর্ম্মক্ষেত্রে আস্‌তে হয় না।

"জীবও যখন বলে, 'হে ঈশ্বর আমি কর্ত্তা নই, তুমিই কর্ত্তা—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী,' তখনই জীবের সংসার-যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্ম্মক্ষেত্রে আস্‌তে হয় না।"

একজন ভক্ত। জীবের অহঙ্কার কেমন করে যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে দর্শন না কর্‌লে অহঙ্কার যায় না। যদি কার অহঙ্কার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।

একজন ভক্ত। মহাশয়, কেমন করে জানা যায় যে, ঈশ্বর দর্শন হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন করেছে. তার চারটী লক্ষণ হয়—(১) বালকবৎ (২) পিশাচবৎ (৩) জড়বৎ (৪) উন্মাদবৎ।

"যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই। আবার শুচি অশুচি তার কাছে দুই সমান—তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত কভু কাঁদে; এই বাবুর মত সাজে গোজে, আবার খানিকপরে ন্যাংটা; বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে, তাই উন্মাদবৎ। আবার কখন বা জড়ের ন্যায় চুপ করে বসে আছে।

একজন ভক্ত। ঈশ্বর দর্শনের পর কি অহঙ্কার একেবারে যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কখন কখন তিনি অহঙ্কার একেবারে পুঁছে ফেলেন—যেমন সমাধি অবস্থায়। আবার প্রায় অহঙ্কার একটু রেখে দেন। কিন্তু সে অহঙ্কারে দোষ নাই। যেমন বালকের অহঙ্কার। পাঁচ বছরের বালক 'আমি' 'আমি' করে, কিন্তু কারো অনিষ্ট কর্‌তে জানে না।

"পরশমণি ছুঁলে লোহা সোণা হয়ে যায়। লোহার তরোয়াল্ সোণার তরোয়াল্ হয়ে যায়। তরোয়ালের আকার থাকে, কারুর অনিষ্ট করে না। সোণার তরোয়ালে মারা কাটা চলে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[বিলাত ও কাঞ্চনের পূজা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রতাপের প্রতি) তুমি বিলাতে গিয়েছিলে, কি দেখ্‌লে, সব বল।

প্রতাপ। বিলাতের লোকেরা আপনি যাকে কাঞ্চন বলেন, তারি পূজা করে। তবে অবশ্য কেউ কেউ ভাল লোক—অনাসক্ত লোক—আছে। কিন্তু সাধারণতঃ আগা গোড়া রজোগুণের কাণ্ড। আমেরিকাতেও তাই দেখে এলুম।

[বিলাত ও কর্ম্মযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। বিষয় কর্ম্মে আসক্তি শুধু যে বিলাতে আছে, এমন নয়। সব যায়গায় আছে। তবে কি জান? কর্ম্মকাণ্ড হচ্ছে আদি কাণ্ড। সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া এই সব) না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কাযের আড়ম্বর হয়। তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কায জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। আর কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে।

"তবে কর্ম্ম ত্যাগ কর্‌বার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই বলেছে, অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা—কি না কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করবে না। যেমন পূজা জপ তপ করছো, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয়, কিম্বা পুণ্য কর্‌বার জন্য নয়।

"এরূপ অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। ভারি কঠিন। একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায়। মনে করছি, অনাসক্ত হয়ে কায করছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জান্‌তে দেয় না। হয়তো পূজা মহোৎসব করলুম, কি অনেক গরিব কাঙালদের সেবা করলুম, মনে কর্‌লুম যে, অনাসক্ত হয়ে করেছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছে হয়েছে, জান্‌তে দেয় না।

"তবে একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল, যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন, তাঁর।

এক জন ভক্ত। যাঁরা ঈশ্বরকে লাভ করেন নাই, তাঁদের উপায় কি? তাঁরা কি বিষয় কর্ম্ম সব ছেড়ে দেবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিতে ভক্তিযোগ। নারদীয় ভক্তি। ঈশ্বরের নাম গুণ গান করা ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা—'হে ঈশ্বর, আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও';

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। তাই প্রার্থনা কর্‌তে হয়, 'হে ঈশ্বর, আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও। আর যে টুকু কর্ম্ম রেখেছো, সেটুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হয়ে কর্‌তে পারি। আর যেন বেশী কর্ম্ম জড়াতে না ইচ্ছা হয়'।

"কর্ম্ম ছাড়্‌বার যো নাই। আমি চিন্তা কর্‌ছি, আমি ধ্যান কর্‌ছি, এও কর্ম্ম।

"ভক্তিলাভ কর্‌লে বিষয়কর্ম্ম আপনা আপনি কমে যায়। বিষয় কর্ম্ম আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরীর পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায়?

একজন ভক্ত। বিলেতের লোকেরা কেবল 'কর্ম্ম কর' 'কর্ম্ম কর' করে। কর্ম্ম তবে জীবনের উদ্দেশ্য নয়?

[জীবনের উদ্দেশ্য কি? কর্ম্ম না ঈশ্বর লাভ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম্মতো আদি কাণ্ড। কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম একটী উপায়,—উদ্দেশ্য নয়।

"শম্ভু বল্লে, এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, যা টাকা আছে, সে গুলি সদ্ব্যয়ে যায়—হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারী করা, রাস্তা ঘাট করা, কুয়ো করা এই সব। আমি বল্লুম, এ সব কর্ম্ম অনাসক্ত হয়ে করতে পাল্লে ভাল, কিন্তু তা বড় কঠিন। আর যাই হক, এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ; হাঁসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারী করা নয়। মনে কর, ঈশ্বর তোমার সামনে এলেন। এসে বল্লেন, তুমি বর লও, তাহলে তুমি কি বল্‌বে, 'আমায় কতকগুলো হাঁসপাতাল ডিসপেন্‌সারী করে দাও,' না, বল্‌বে, 'হে ভগবান, তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাই'।

"হাঁসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারী এ সব অনিত্য বস্তু। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। তাঁকে লাভ হলে আবার বোধ হয়, তিনিই কর্ত্তা, আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কায বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভ হলে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারি হতে পারে।

['এগিয়ে পড়']

"তাই বল্‌চি, কর্ম্ম আদিকাণ্ড। কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সাধন করে আরও এগিয়ে পড়। সাধন কর্‌তে কর্‌তে আরও এগিয়ে পড়্‌লে শেষে জান্‌তে পারবে যে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

"একটা গল্প বলি শুন। একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাট্‌তে গিছ্‌লো। হঠাৎ একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হলো। ব্রহ্মচারী বল্লেন, 'ওহে, এগিয়ে পড়।' কাঠুরে বাড়ীতে ফিরে এসে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে বল্লেন কেন?

"এই রকমে কিছুদিন যায়। একদিন সে বসে আছে, এমন সময়ে সেই ব্রহ্মচারীর কথাগুলি মনে পড়্‌লো। তখন সে মনে মনে বল্লে, আজ আমি আরও এগিয়ে যাবো। বনে গিয়ে আরো এগিয়ে দেখে যে, অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাঠ নিয়ে এলো; আর বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হয়ে গেল। এই রকমে কিছুদিন যায়। আবার একদিন মনে পড়্‌লো, ব্রহ্মচারী বলেছেন, 'এগিয়ে পড়'। তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে, নদীর ধারে রূপোর খনি! এ কথা সে কখন স্বপ্নেও ভাবে নি। তখন খনি থেকে কেবল রূপো নিয়ে গিয়ে বিক্রী করতে লাগ্‌লো। এত টাকা হলো যে, আণ্ডিল হয়ে গেল।

"আবার কিছুদিন যায়। একদিন বসে ভাব্‌ছে, ব্রহ্মচারী তো আমাকে রূপার খনি পর্য্যন্ত যেতে বলেন নাই—তিনি যে আমাকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তখন সে ভাব্‌লে, ওহো! তাই ব্রহ্মচারী বলেছিলেন, এগিয়ে পড়!

আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, হীরে মাণিক রাশীকৃত পড়ে আছে। তখন তার কুবেরের ঐশ্বর্য্য হলো।

"তাই বল্‌ছি যে, যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরো ভাল জিনিষ পাবে। একটু জপ তপ করে উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে কোরো না, যা হবার তা হয়ে গেছে। কর্ম্ম কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরো এগোও, তাহলে

কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্‌তে পার্‌বে। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম বড় কঠিন। তাই ভক্তি করে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, 'হে ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও', আর কর্ম্ম কমিয়ে দাও, আর যে টুকু কর্ম্ম রাখ্‌বে, সেটুকু কর্ম্ম যেন নিষ্কাম হয়ে কর্‌তে পারি।

"আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্ত্তা হবে।"

কেশবের স্বর্গলাভের পর মন্দিরের বেদী লইয়া যে বিবাদ হয়, এইবারে তাহার কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। শুন্‌ছি তোমার সঙ্গে বেদী নিয়ে কি নাকি ঝগড়া হয়েছে। যারা ঝগড়া করেছে, তারা তো সব হরে প্যালা পঞ্চা (সকলের হাস্য)।

(ভক্তদের প্রতি)। "দেখ, প্রতাপ, অমৃত, এ সব শাঁক বাজে। আর যা সব শুন, তাদের কোন আওয়াজ নাই। (সকলের হাস্য)।

প্রতাপ। মহাশয়, বাজে যদি বল্লেন তো আঁবের কশিও বাজে।

* * * * *

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রতাপের প্রতি) দেখ, তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের লেক্‌চার শুন্‌লে লোকটার ভাব বেস বোঝা যায়। এক হরিসভায় আমায় নিয়ে গিছ্‌লো। আচার্য্য হয়েছিলেন একজন পণ্ডিত, তার নাম সামাধ্যায়ী। বলে কি, আমাদের ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেম ভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস করে নিতে হবে। এই কথা শুনে আমি অবাক্। তখন একটা গল্প মনে পড়্‌লো। একটি ছেলে বলেছিল, আমার মামার বাড়ীতে অনেক ঘোঁড়া আছে, এক গোয়াল ঘোঁড়া। এখন গোয়াল যদি হয়, তাহলে কখন ঘোঁড়া থাকৃতে পারে না, গরু থাকাই সম্ভব। এরূপ অসম্ভব কথা শুন্‌লে লোকে কি ভাবে? এই ভাবে যে, ঘোঁড়া টোঁড়া কিছুই নেই (সকলের হাস্য)।

একজন ভক্ত। ঘোঁড়া তো নেইই। গরুও নেই (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ দেখিন্, যিনি রসস্বরূপ, তাঁকে কি না বল্‌ছে নীরস।

এতে এই বোঝা যায় যে, ও ব্যক্তি ঈশ্বর যে কি জিনিষ, তা কখনও অনুভব করে নাই।

(প্রতাপের প্রতি উপদেশ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রতাপের প্রতি) দেখ তোমায় বলি। তুমি লেখা পড়া জান, বুদ্ধিমান, গম্ভীরাত্মা! কেশব আর তুমি ছিলে যেন গৌর নিতাই দু ভাই। এসব তো অনেক হলো, লেক্‌চার দেওয়া, তর্ক, ঝগড়া, বাদ, বিসম্বাদ, অনেক তো হলো। আর কি এসব তোমার ভাল লাগে? এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দেও। ঈশ্বরেতে এখন ঝাঁপ দেও।

প্রতাপ। আজ্ঞা হাঁ, তার সন্দেহ নাই, তাই করা কর্ত্তব্য। তবে এসব করা তাঁর নামটা যাতে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাঁসিয়া)। তুমি বল্‌ছো বটে, তাঁর নাম রাখ্‌বার জন্য সব কচ্ছো; কিন্তু কিছু দিন পরে এ ভাবও থাক্‌বে না। একটা গল্প শুন।

"একজন লোকের একটা পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। কুঁড়ে ঘর; অনেক মেহনত করে ঘরখানি করেছিল। কিছু দিন পরে একদিন ভারি ঝড় এলো। কুঁড়ে ঘর টল্‌ টল্‌ কর্ত্তে লাগ্‌লো; তখন সে ঘররক্ষার জন্য ভারি চিন্তিত হলো। বল্লে, হে পবন দেব, দেখো যেন ঘরটী ভেঙ্গনা বাবা! পবন দেব কিন্তু শুন্‌ছেন না। ঘর মড়্‌ মড়্‌ কর্ত্তে লাগ্‌লো। তখন লোকটা ফিকির ঠাওরালে—তার মনে পড়্‌লো যে, হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে পড়া, অমনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠ্‌লো—বাবা! ঘর ভেঙ্গনা, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার। কিন্তু ঘর তবুও মড় মড় করে। কেবা তার কথা শুনে! অনেক বার 'হনুমানের ঘর' হনুমানের ঘর' করার পর দেখ্‌লে যে কিছু হলো না। তখন বল্‌তে লাগ্‌লো, বাবা, লক্ষ্মণের ঘর, লক্ষ্মণের ঘর। তাতেও হোলো না। তখন বলে, বাবা, রামের ঘর, রামের ঘর, দেখো বাবা ভেঙ্গ না, দোহাই তোমার। তাতেও কিছু হলো না, ঘর মড়্‌ মড়্‌ করে ভাঙ্গ্‌তে আরম্ভ হলো। তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌বার সময় বল্‌তে লাগ্‌লো, যা! শালার ঘর!

(প্রতাপের প্রতি) কেশবের নাম তোমায় রক্ষা কর্ত্তে হবে না। যা কিছু হয়েছে, জান্‌বে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতে হলো, আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে, তুমি কি কর্‌বে?

[জীবনের উদ্দেশ্য; ডুব দাও।]

"তোমার এখন কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও।"

এই কথা বলিয়া ঠাকুর সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মধুর গান গাইতে লাগিলেন।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন।
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বল্‌বে সদা অনুক্ষণ।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন্‌জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ।

(প্রতাপের প্রতি)। "গান শুন্‌লে? লেক্‌চার, ঝগড়া, ওসব তো অনেক হলো, এখন ডুব দেও। আর এ সমুদ্রে ডুব দিলে মর্‌বার ভয় নাই। এ যে অমৃতের সাগর। মনে কোরোনা যে, এতে মানুষ বেহেড্ হয়। মনে কোরোনা যে, বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর কল্লে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলাম—

প্রতাপ। মহাশয়, নরেন্দ্র কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও আছে একটি ছোক্‌রা। তাই বল্‌ছি, আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম, দেখ্, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছে হয় না কি যে, এই সাগরে ডুব দিই? আচ্ছা, মনে কর্, একখুলি রস আছে, আর তুই মাছি হইছিস্। তা কোন্ খানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বল্‌লে, আমি খুলির কিনারায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, কেন? কিনারায় বস্‌বি কেন? সে বল্লে, বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব, আর প্রাণ হারাব। তখন আমি বল্লুম, বাবা, সচ্চিদানন্দসাগরে সে ভয় নাই, এ যে অমৃতের সাগর। ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়। ঈশ্বরেতে পাগল হলে মানুষ বেহেড্ হয় না।

(ভক্তদের প্রতি)। 'আমি' আর 'আমার' এইটির নাম অজ্ঞান। কালীবাড়ী রাসমণি করেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে, ঈশ্বর করেছেন। ব্রাহ্মসমাজ অমুক লোক করে গেছেন। এ কথা আর কেউ বলে না যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এটি হয়েছে। আমি কচ্ছি, এইটির নাম অজ্ঞান—হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা, আর আমি অকর্ত্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, এই·

টির নাম জ্ঞান। হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়—এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ী আমার নয়, এ সমাজ আমার নয়, এসব তোমার জিনিস—এ স্ত্রী পুত্র পরিবার এ সব কিছুই আমার নয়, সব তোমারি জিনিস।

"আমার জিনিস, আমার জিনিস, বলে সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সব্বাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোক-গুলিকে ভাল বাসি, কি শুধু পরিবারদের ভাল বাসি, এর নাম মায়া; শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া, সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্ম্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।

"মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান্ থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ এঁরা দয়া রেখেছিলেন"।

* * * * *

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(ব্রাহ্মসমাজ ও কামিনী কাঞ্চন।)

প্রতাপ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মহাশয়, যাঁরা আপনার কাছে আসেন, তাঁদের ক্রমে ক্রমে উন্নতি হচ্ছেতো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি বলি যে, সংসার কত্তে দোষ কি ? তবে সংসারে দাসীর মত থাক।

[গৃহস্থের সাধন।]

"দাসী মনিবের বাড়ীর কথায় বলে, 'আমাদের বাড়ী।' কিন্তু তার নিজের বাড়ী হয়তো কোন পাড়াগাঁয়ে। মনিবের বাড়ীকে দেখিয়ে মুখে বলে, 'আমা-দের বাড়ী'। কিন্তু মনে জানে যে, ও বাড়ী আমাদের নয়, আমাদের বাড়ী সেই পাড়াগাঁয়ে। আবার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে, আর বলে, 'হরি আমার বড় দুষ্টু হয়েছে', 'আমার হরি মিষ্ট খেতে ভাল বাসে না'। কিন্তু আমার হরি, মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে যে, হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে।

"তাই যারা আসে, তাদের আমি বলি, সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই; তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর; জেনো যে, বাড়ী ঘর পরিবার আমার নয়, এ সব ঈশ্বরের, আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে; আর বলি যে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে সর্ব্বদা প্রার্থনা করবে"।

* * * *

বিলাতের কথা আবার পড়িল। একজন ভক্ত বলিলেন, মহাশয়, আজ-কাল বিলাতের পণ্ডিতেরা নাকি ঈশ্বর আছেন, এ কথা মানেন না ?

প্রতাপ। মুখে তাঁরা যে যা বলুন, আন্তরিক তাঁরা যে কেউ নাস্তিক, তা আমার বোধ হয় না। এই জগতের ব্যাপারের পেছনে যে একটা মহাশক্তি আছে, এ কথা অনেকেরই মান্‌তে হয়েছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হলেই হলো, শক্তিতো মান্‌ছে? নাস্তিক কেন হবে?

প্রতাপ। তা ছাড়া ইউরোপের পণ্ডিতেরা moral government (সৎকার্য্যের পুরস্কার আর পাপের শাস্তি এই জগতে হয় এ কথা) ও মানেন।

* * * *

অনেক কথাবার্ত্তার পর প্রতাপ বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। আর কি বল্‌বো তোমায়? তবে এই বলা যে, আর ঝগড়া বিবাদের ভিতর থেকো না।

"আর এক কথা, কামিনী কাঞ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। সে দিকে যেতে দেয় না—এই দেখনা, সকলেই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে (সকলের হাস্য)। তা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্। যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমার পরিবারটি কেমন গা, অমনি বলে, আজ্ঞে, ভাল—

প্রতাপ। তবে আমি আসি।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা সমাপ্ত হইল না। সুরেন্দ্রের বাগানের বৃক্ষস্থিত পত্রগুলি দক্ষিণবায়ু সংঘাতে দুলিতেছিল ও মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল, কথাগুলি সেই শব্দের সঙ্গে মিশাইয়া গেল। একবার মাত্র ভক্তদের হৃদয়ে আঘাত করিয়া গেল। অবশেষে অনন্ত আকাশে লয় প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু প্রতাপের হৃদয়ে কি একথা একেবারেই প্রতিধ্বনিত হয় নাই?

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমুদয় ব্রহ্ম। সমুদয় জগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহাতেই লয় হয় জানিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিবে।

তিনি মনোময়, প্রাণশরীর, প্রকাশস্বরূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, নিষ্কাম ও বাক্যশূন্য।

এই আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন। তিনি ব্রীহি, যব, শ্যামাক অথবা শ্যামাক তণ্ডুল হইতেও সূক্ষ্ম। হৃদয়াভ্যন্তরস্থ এই আত্মা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ এমন কি, সমুদয় লোক হইতেও বৃহৎ।

সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, নিষ্কাম, বাক্যশূন্য এই আত্মা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে বিরাজিত। ইনি ব্রহ্ম; আমি মৃত হইয়া ইহাঁর স্বরূপ হইব। এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

ইতি ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যা।

করেন, ততক্ষণ তাহা হইতে উঠিতে পারিব না। বেদান্ত বলেন, অপরের সাহায্যে আমাদের কিছু হইতে পারে না। আমরা গুটিপোকার মত। আমরা আপনার শরীর হইতে আপনি জাল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এ বদ্ধভাব চিরকালের জন্য নয়। আমরা উহা হইতে প্রজাপতি হইয়া বাহির হইয়া মুক্ত হইব। আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে এই কর্ম্মজাল জড়াইয়াছি। আমরা অজ্ঞানবশতঃ মনে করিতেছি,আমরা যেন বদ্ধ ; আর কখন কখন সাহায্যের জন্য চীৎকার ও ক্রন্দন করিতেছি। কিন্তু বাহির হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, সাহায্য পাওয়া যায় ভিতর হইতে। জগতের সকল দেবগণের নিকট উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে পার। আমি অনেক বৎসর ধরিয়া এইরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলাম ; অবশেষে আমি দেখিলাম, আমি সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু এই সাহায্য ভিতর হইতে আসিল আর ভ্রান্তিবশতঃ এতদিন নানারূপ কর্ম্ম করিতেছিলাম। সেই ভ্রান্তিকে নিরাস করিতে হইল। ইহাই এক মাত্র উপায়। আমি নিজে যে জালে আপনাকে জড়াইয়াছিলাম,তাহা আমাকেই ছিন্ন করিতে হইবে আর তাহা ছিন্ন করিবার শক্তিও আমার ভিতরেই রহিয়াছে। এ বিষয় আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, আমার জীবনের সদসৎ কোন প্রবৃত্তিই বৃথা যায় নাই—আমি সেই অতীত শুভাশুভ উভয় কর্ম্মেরই সমষ্টিস্বরূপ। আমি জীবনে অনেক ভুলচুক করিয়াছি, কিন্তু এইগুলি না করিলে আমি আজ যাহা, তাহা কখনই হইতাম না। আমি এক্ষণে আমার জীবন লইয়া বেশ তুষ্ট আছি। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, তোমরা বাড়ীতে যাও, গিয়া তথায় নানাপ্রকার অন্যায় কর্ম্ম করিতে থাক। আমার কথা এইরূপে ভুল বুঝিও না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই, কতকগুলি ভুলচুক হইয়া গিয়াছে বলিয়া একেবারে বসিয়া পড়িও না, কিন্তু জানিও, পরিণামে তাহাদের ফল শুভই হইবে। অন্যরূপ হইতেই পারে না, কারণ, শিবত্ব ও শুদ্ধত্ব আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম, আর, কোন উপায়েই সেই প্রকৃতির ব্যত্যয় হয় না। আমাদের যথার্থস্বরূপ সর্ব্বদাই একরূপ।

আমাদের ইহা বুঝা আবশ্যক যে, আমরা দুর্ব্বল বলিয়াই নানাবিধ ভ্রমে পড়িয়া থাকি, আর অজ্ঞান বলিয়াই আমরা দুর্ব্বল। আমি পাপ শব্দ ব্যবহার না করিয়া ভ্রমশব্দ ব্যবহার করা অধিক পছন্দ করি। আমাদিগকে অজ্ঞানে ফেলিয়াছে কে ? আমরা আপনারাই আপনাদিগকে অজ্ঞানে ফেলিয়াছি। আমরা আপনাদের চক্ষে আপনি হাত দিয়া অন্ধকার বলিয়া চীৎকার করি-

তেছি। হাত সরাইয়া লও, তাহা হইলে দেখিবে, সেই জীবাত্মার স্বপ্রকাশ স্বরূপের আলোক রহিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি বলিতেছেন, তাহা কি দেখিতেছ না? এই সকল ক্রমবিকাশের হেতু কি? বাসনা। কোন পশু যে ভাবে অবস্থিত, সে তদতিরিক্ত অন্য কিছুরূপে থাকিতে চায়—সে দেখে, সে যে সকল অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, সেগুলি তাহার উপযোগী নহে—সুতরাং সে একটী নূতন শরীর গঠন করিয়া লয়। তুমি সর্ব্বনিম্নতম জীবাণু হইতে নিজ ইচ্ছাশক্তিবলে উৎপন্ন হইয়াছে—আবার সেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কর, আরো উন্নত হইতে পারিবে। ইচ্ছা সর্ব্বশক্তিমান। তুমি বলিতে পার, যদি ইচ্ছা সর্ব্বশক্তিমান হয়, তবে আমি অনেক কায যাহা ইচ্ছা করি, তাহা করিতে পারি না কেন? তুমি যখন এ কথা বল, তখন তুমি তোমার ক্ষুদ্র আমির দিকে লক্ষ্য করিতেছ মাত্র। ভাবিয়া দেখ, তুমি ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে এই মানুষ হইয়াছে। কে তোমাকে এই মানুষ করিল? তোমার আপন ইচ্ছাশক্তি। তুমি কি অস্বীকার করিতে পার, ইহা সর্ব্বশক্তিমান? যাহা তোমাকে এতদূর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরো অধিক উন্নত করিবে। আমাদের প্রয়োজন চরিত্র, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা—উহার দুর্ব্বলতা নহে।

অতএব যদি আমি তোমাকে উপদেশ দিই যে, তোমার প্রকৃতিই অসৎ আর তুমি কতকগুলি ভুল করিয়াছ বলিয়া তোমাকে অনুতাপ ও ক্রন্দন করিয়া জীবন কাটাইতে উপদেশ করি, তাহাতে তোমার বিশেষ কিছুই উপকার হইবে না, বরং উহা তোমাকে অধিকতর দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে, আর তাহাতে তোমাকে ভাল হইবার পথ না দেখাইয়া বরং আরো মন্দ হইবার পথ দেখান হইবে। যদি সহস্র বৎসর ধরিয়া এই গৃহ অন্ধকারময় থাকে আর তুমি সেই গৃহে আসিয়া হায়, বড় অন্ধকার, বড় অন্ধকার বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ কর, তবে কি অন্ধকার চলিয়া যাইবে? একটী দেয়াশলাই জ্বালিলেই এক মুহূর্ত্তে গৃহ আলোকিত হইবে। অতএব সারা জীবন 'আমি অনেক দোষ করিয়াছি, আমি অনেক অন্যায় কায করিয়াছি,' বলিয়া চিন্তা করিলে তোমার কি উপকার হইবে? আমরা যে নানাদোষে দোষী, ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। জ্ঞানের আলো জ্বাল, এক মুহূর্ত্তে সব অশুভ চলিয়া যাইবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ কর, প্রকৃত 'আমি'কে, সেই জ্যোতির্ম্ময়, উজ্জ্বল, নিত্যশুদ্ধ 'আমি'কে—প্রকাশ কর—প্রত্যেক ব্যক্তিতে সেই আত্মাকে প্রকাশ কর। আমি ইচ্ছা করি, সকল ব্যক্তিই এমন অবস্থা লাভ করুন যে,

অতি জঘন্য পুরুষকে দেখিলেও তাহার বাহিরের দুর্ব্বলতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার হৃদয়াভ্যন্তরবর্ত্তী ভগবানকে দেখিতে পারেন আর তাহার নিন্দা না করিয়া বলিতে পারেন, 'হে স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়, উঠ; হে সদাশুদ্ধস্বরূপ, উঠ; হে অজ, অবিনাশী, সর্ব্বশক্তিমান, উঠ, আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি যে সকল ক্ষুদ্র ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, তাহা তোমাতে সাজে না।' অদ্বৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনার উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাই একমাত্র প্রার্থনা—নিজস্বরূপ স্মরণ, সদা সেই অন্তরস্থ ঈশ্বরের স্মরণ, তাঁহাকে সর্ব্বদা, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান, সদাশিব, নিষ্কাম বলিয়া স্মরণ। এই ক্ষুদ্র অহং তাঁহাতে নাই, ক্ষুদ্র বন্ধনসমূহ তাঁহাতে নাই। আর তিনি অকাম বলিয়াই অভয় ও ওজঃ-স্বরূপ, কারণ, কামনা, স্বার্থ হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। যাহার নিজের জন্য কোন কামনা নাই, সে কাহাকে ভয় করিবে? কোন্ বস্তুই বা তাহাকে ভীত করিতে পারে? মৃত্যু তাহাকে কি ভয় দেখাইতে পারে? অশুভ, বিপদ্ তাহাকে কি ভয় দেখাইতে পারে? অতএব যদি আমরা অদ্বৈতবাদী হই, আমাদিগকে অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে যে, আমরা এই মুহূর্ত্ত হইতেই মৃত। তখন আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ এ সকল ভাব চলিয়া যায়, ওগুলি কেবল কুসংস্কারমাত্র—অবশিষ্ট থাকেন সেই নিত্যশুদ্ধ, নিত্য ওজঃস্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞস্বরূপ আর তখন আমার সকল ভয় চলিয়া যায়। কে এই সর্ব্বব্যাপী আমার অনিষ্ট করিতে পারে? এইরূপে আমার সমুদয় দুর্ব্বলতা চলিয়া যায়; তখন আর সকলের ভিতর সেই শক্তির উদ্দীপনা করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র কার্য্য হয়। আমি দেখিতেছি, তিনিও সেই আত্মাস্বরূপ, কিন্তু তিনি তাহা জানেন না। সুতরাং আমার তাঁহাকে শিখাইতে হইবে, তাঁহার সেই অনন্তস্বরূপ প্রকাশে আমাকে সহায়তা করিতে হইবে। আমি দেখিতেছি, জগতে ইহাই বিশেষরূপ আবশ্যক। এই সকল মত অতি পুরাতন—সম্ভবতঃ অনেক পর্ব্বতও তখন উৎপন্ন হয় নাই, যখন এই সকল মত প্রথম প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। সকল সত্যই সনাতন। সত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। কোন জাতি, কোন ব্যক্তিই উহা নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। সকল আত্মার প্রকৃতিই সত্য। কোন ব্যক্তিবিশেষের উহার উপর বিশেষ দাবী নাই। কিন্তু উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, সরলভাবে উহার প্রচার করিতে হইবে, কারণ, তোমরা দেখিবে, উচ্চতম সত্যসকল অতি সহজ ও সরল। খুব সহজ ও সরলভাবে

উহার প্রচার আবশ্যক, যাহাতে উহা সমাজের সর্ব্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিতে পারে—যাহাতে উহা উচ্চতম মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাধারণ মনের পর্য্যন্ত অধিকারের বিষয় হইতে পারে, যাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা উহা জানিতে পারে। এই সকল ন্যায়ের কূট বিচার, দার্শনিক মীমাংসাবলি, এই সকল মতবাদ ও ক্রিয়াকাণ্ড এক সময়ে উপকার দিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আইস, আমরা এক্ষণে ধর্ম্মকে সহজ করিবার চেষ্টা করি আর সেই সত্যযুগ আনিবার সহায়তা করি, যখন প্রত্যেক ব্যক্তিই উপাসক হইবেন আর প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরস্থ সত্যই তাঁহার উপাস্য দেবতা হইবেন।
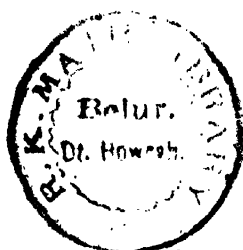
সমাপ্ত।

জ্ঞানযোগের বিশেষ বিজ্ঞাপন।

জ্ঞানযোগ সমাপ্ত হইল। যে সকল গ্রাহক মহোদয় উদ্বোধন হইতে খুলিয়া ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাঁধাইবেন, তাঁহারা চার পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে ইহার সূচী, ভূমিকা ও টাইটেলপেজ পাইবেন।

একটী স্বপ্ন।

গভীরা রজনী নাহি জীব সাড়া,
আঁধারের কোলে যেন মৃতধরা
সূচীভেদ্য অন্ধকার,　　সাগরের নাহি পার,
উত্তাল তরঙ্গে ভাসে ফেনরূপী তারা।

অঘোরে ঘুমায় শ্রান্ত, কর্ম্মী, ভোগী,
জাগ্রত স্বপন দেখিতেছে যোগী;
মহাপ্রলয়ের মূর্ত্তি,　　হৃদয়ে পাইল স্ফূর্ত্তি,
শ্মশান আসনে বসি অটল বিরাগী।

উছলিল সমুদ্র মহান্,
জলে জলে ধরা ভাসমান;
গ্রহতারা লক্ষ লক্ষ,　　রবিশশী চ্যুতকক্ষ,
দেবতা মানব সঙ্ঘ ভয়ে হতজ্ঞান।

ভেঙ্গে পড়ে দিক্, দেশ, কাল,
অন্ধকারগরভে বিশাল;
জল বায়ু বহ্নিব্যোম—　　একাকার,—মহাস্তোম,
"হতোহস্মি" অর্ব্বুদকণ্ঠে উঠিছে ভয়াল।

জীব জন্তু দেবতা মানব,
নিমিষেতে পূতিগন্ধ শব।
তেয়াগী মার্কণ্ডমুনি,　　নাহি মরে মহাজ্ঞানী,
নাশিতে তাঁহায় প্রলয়ের পরাভব।

তেয়াগী গেয়ানী নাহি মরে,
তাঁরে দেখি প্রলয় শিহরে;
বটপত্রে ভাসমান্　　বলে প্রভু ভগবান্
"আমি তুমি অভিন্ন জানিও অতঃপরে"।

চমকি বিরাগী উঠিল সে ভাসে,
প্রলয়ের ছবি কোথা গেল ভেসে ;
যে শ্মশান সে শ্মশান, হুড় হুড় করে প্রাণ
ভাঙ্গে স্বপ্ন—দেখা দিল আলো পূর্ব্বাকাশে।

তর্কবুদ্ধি।

সুবর্ণগ্রামে এক অদ্বিতীয় পণ্ডিতের বাস। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য জ্যোতিষ, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত, উপনিষদাদি তাঁহার জিহ্বাগ্রে বিরাজ করিত। সকলে বলিত, ইনি নিশ্চয়ই সরস্বতীর বরপুত্র। তাহা না হইলে—এত বিদ্যা একজনের কিরূপে আয়ত্ত হইতে পারে? পণ্ডিত-মহাশয় সাধকও ছিলেন। কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া পরে কোন তান্ত্রিক গুরুর নিকট গোপনে পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তান্ত্রিকাভিমানী স্বেচ্ছাচারিগণের ন্যায় ছিলেন না। তিনি তন্ত্রোক্ত নিয়মে প্রত্যহ গভীর রাত্রে স্বীয় ইষ্ট দেবতার পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইতেন। স্বহস্তে পুষ্পচয়ন, স্বহস্তে ভোগ প্রস্তুত প্রভৃতি পূজার আয়োজন সব নিজে করিতেন। শেষে আসনশুদ্ধি, প্রাণায়াম, নানাপ্রকার ন্যাস প্রভৃতি নানা অঙ্গসহকারে পূজা করিয়া শেষে প্রসাদ পাইতেন। দিবাভাগে শাস্ত্রালাপন, রাত্রে এইরূপ পূজার্চ্চনা। ব্রাহ্মণের নিদ্রা অতি অল্প ছিল।

এই সকল নানাগুণ সত্তেও ব্রাহ্মণের এক দোষ ছিল। তিনি তর্কে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্বপক্ষকে পরাস্ত না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। যিনি যে কোনরূপ পূর্ব্বপক্ষ করুন না কেন, তিনি তাহাতে দোষ দর্শাইয়া বিপরীত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেন। তাঁহার মেধার নিকট গ্রামের সকল পণ্ডিত পরাজয় মানিল।

একদিন পণ্ডিত মহাশয় বিষণ্ণমনে, অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছেন! বুঝি, ইহাঁর সংসারে থাকিতে আর রুচি নাই। ভাবিতেছেন, 'কই, কেহই ত আমায় কিছুই বুঝাইতে পারিল না। তবে এ সব ভূতের ব্যাগার কি বহিতেছি? সমুদয়ই কি মিথ্যা? শাস্ত্রের ত কোন মীমাংসাই করিতে পারিলাম না। ক্রিয়াই বা করা কেন? এও বোধ হয় পণ্ডশ্রম।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চিত্তের বেগ এতদূর প্রবল হইল যে, তিনি একবস্ত্রে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

ঐ যে গৈরিকবসনধারী দীর্ঘকায়, প্রতিভাদীপ্তমুখ, ওই সন্ন্যাসী কে?

সন্ন্যাসীর মুখ যেন চিন্তাপূর্ণ বোধ হইতেছে। সন্ন্যাসী আজ কাশীরাজের দ্বারে অতিথি। ইনি কুমারিকা হইতে হিমালয় ও আসাম হইতে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত পর্য্যটন করিয়াছেন—সকল পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীকেই তর্কে পরাস্ত করিয়াছেন। শুনিয়াছেন, কাশীরাজের গুরু অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী। তাঁহার নিকট সন্দেহ ভঞ্জন হইবে আশা করিয়া তিনি এই দ্বারে অতিথি। আর তাঁহার তর্কে বড় রুচি নাই, এখন একটু শিখিতে ইচ্ছা—প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে।

কাশীরাজগুরু বলিলেন, 'আপনি যদি আমার নিকট কিছু শিখিতে ইচ্ছা করেন, তবে অন্ততঃ সাত দিন আমার নিকট কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না; ইহাতে স্বীকৃত হইলে তবে আপনাকে শিখাইতে পারি।' তত্ত্বপিপাসায় ইনি এখন ব্যাকুল, কাযেই স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ ভুলিয়া পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিবার প্রয়াস পান আর গুরু-দেব অমনি সংশোধন করিয়া দেন।

গুরু নূতন কিছুই বলিলেন না। জগতে নূতন কিছু আছে কি? তিন দিন অতীত হইলে শিষ্য গুরুচরণে প্রণত হইয়া বলিলেন, 'প্রভু, আমি জ্ঞান-লাভ করিয়াছি। আমার দোষ বুঝিয়াছি। আপনার কৃপায় আমার চৈতন্য হইল—আপনাকে প্রণাম।'

কৃষ্ণচন্দ্র তর্কপঞ্চানন বা বিবিদিষানন্দ স্বামী হিমালয়ের নিভৃত গহ্বরে ধ্যানমগ্ন হইয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিলেন।

ইন্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ।

প্রজাপতি বলিতেন, নিষ্পাপ, অজর, অমর, অশোক, ক্ষুৎপিপাসারহিত, সত্য-কাম, সত্যসঙ্কল্প আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকে জানিতে হইবে। যিনি তাঁহাকে জানেন, তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন। দেবাসুর উভয়েরই এই বাক্য শুনিয়া আত্মজ্ঞানলাভে ইচ্ছা হইল। দেবতারা ইন্দ্রকে এবং অসুরেরা বিরোচনকে তাঁহাদের প্রতিনিধি করিয়া আত্মবিদ্যাশিক্ষার্থ প্রজাপতির নিকট পাঠাইলেন। তাঁহারা প্রজাপতির নিকট গিয়া বত্রিশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করিলেন। বত্রিশ বর্ষ পরে প্রজাপতি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁহারা যখন তাঁহাদের আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছা নিবেদন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, এই চক্ষে যে পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, তিনিই

আত্মা; ইনিই অমৃত, অভয় ও ব্রহ্মস্বরূপ। তাঁহারা উভয়ে প্রজাপতিবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন, তিনি ছায়াকেই আত্মা বলিতেছেন। এই মনে করিয়া তাঁহারা বলিলেন, জলে যে ছায়া দেখা যায়, তাহাই আত্মা, না, আরসীতে যাহা দেখা যায়, তাহাই আত্মা? প্রজাপতি বলিলেন, তিনি এই সমুদায়েই আছেন। এক সরা জল লইয়া তাহাতে আত্মাকে দেখ। যদি তখনও না জানিতে পার, তবে আমায় বলিও। তাঁহারা তাহা দেখিয়া বলিলেন, আমরা যেমন, লোম হইতে নখ পর্য্যন্ত তাহার অবিকল প্রতিরূপ দেখিতেছি। তখন প্রজাপতি তাঁহাদিগকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া জলে দেখিতে বলিলেন, তাঁহারাও দেখিয়া বলিলেন, আমরা যেমন সজ্জিত হইয়াছি, ঠিক সেইরূপ জলে আপনাদিগকে দেখিতেছি। তখন তিনি বলিলেন, ইনিই অমৃত ও অভয়স্বরূপ; ইনিই ব্রহ্ম। তাঁহারা কৃতার্থম্মন্য হইয়া চলিয়া গেলেন। প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন, হায়, দেবাসুর উভয়েই আত্মজ্ঞান না পাইয়া চলিয়া গেল। বিরোচন ত অসুরদের নিকট যাইয়াই তাহাদিগকে বলিল, প্রজাপতির উপদেশ, এই দেহই আত্মা। অসুরেরা সেই উপদেশ গ্রহণ করাতে অসুর-সম্প্রদায় এখনও দানরহিত, শ্রদ্ধাশূন্য, ভোগনিষ্ঠ ও দৈহিকপরায়ণ।

ইন্দ্রও দেবগণের নিকট ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার বিচার উপস্থিত হইল যে, এই দেহ যখন সুন্দর বসন ভূষণে শোভিত হইলে তাহার ছায়াও তদ্রূপ হয়, সেইরূপ কোন অঙ্গহীন হইলে ইহার ছায়াও ত অঙ্গহীন হইবে—অতএব এই ছায়া কখন আত্মা হইতে পারে না। এই মনে করিয়া গুরুর নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইলে গুরু আর বত্রিশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া যে পুরুষ স্বপ্নে নানাবিধ অনুভব করেন, তিনিই আত্মা, এই উপদেশ দিলেন। ইহাতে ইন্দ্র প্রথমতঃ তৃপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার সন্দিগ্ধ হইয়া গুরুকে নিবেদন করিলেন, স্বপ্নাবস্থায় মন দেহের ধর্ম্মে লিপ্ত নহেন বটে, কিন্তু নানাপ্রকার দুঃখে মনের শোক ও চাঞ্চল্য ঘটে। গুরু তাঁহাকে আরো বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া স্বপ্নশূন্য সুষুপ্তিই আত্মার প্রকৃত অবস্থা বলিয়া উপদেশ দিলেন। ইন্দ্র তাহাতেও যখন তৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন, সুষুপ্তাবস্থায় 'আমি' জ্ঞানই যখন থাকে না, তখন উহাকে কি করিয়া অমৃতস্বরূপ আত্মা বলা যায়? তখন প্রজাপতি তাঁহাকে আর পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া আত্মার স্বরূপতত্ত্ব উপদেশ করিলেন।

হয় না," তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, কোনও বিধি যদি (স্বভাবতঃ বা প্রকারান্তরে) সিদ্ধই থাকে; এবং তখন যদি কোনও বিধির আরম্ভ করা যায়, তবে তাহা জ্ঞাপকের জন্য হইয়া থাকে; কিন্তু 'জন'ধাতুর 'ন'কারের গুণ করিলে ত (উপসরজ) পদ সিদ্ধ হয় না। কারণ 'জন' ধাতুর 'ন'কারের গুণ করিলে, 'ন'কারের স্থানে, কেবল মাত্র গুণসংজ্ঞক 'অ'কারই হইবে, আর 'একার' অথবা 'ওকার' হইবে না।

অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট ব্যঞ্জনের (জন ধাতুর নকার প্রভৃতির) গুণসংজ্ঞক কোনও বর্ণ হইলে, তাহার সদৃশতমতা প্রযুক্ত একমাত্রাবিশিষ্ট একারই হইবে; (১) দুইমাত্রাবিশিষ্ট একার বা ওকার (সদৃশতম নহে বলিয়া) হইবে না।

এইরূপ হইলেও (নকারের স্থানে সদৃশতম অকার হইলেও) অধিক সদৃশতম অনুনাসিক (অকার) বর্ণ প্রাপ্ত হইবে?

তাহা হইলেও অনুনাসিক বর্ণের পর সবর্ণ (২) হইয়া প্রয়োগ শুদ্ধ হইবে। অর্থাৎ 'জন' ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয় না করিয়া 'অ'প্রত্যয় করিলেও, নকারের গুণে অনুনাসিক 'অঁ'কার হইলে, তাহার পররূপ 'অ'প্রত্যয়ের 'অ'কার হইয়া, 'উপসরজ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—গমেরপ্যয়ং ডো বক্তব্যঃ। গমেশ্চ গুণ উচ্যমান ওকারঃ প্রাপ্নোতি। তস্মাদিগ্‌গ্রহণং কর্ত্তব্যম্।

যদীগ্‌গ্রহণং ক্রিয়তে। দ্যোঃ পন্থাঃ স ইমমিতি এতেঽপীকঃ প্রাপ্নুবন্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—'ড' প্রত্যয় ব্যর্থ নহে। কারণ, 'গম' ধাতুর জন্য (মকার ইৎএর জন্য) ও 'ড' প্রত্যয় বক্তব্য। নতুবা, 'গম' ধাতুর গুণ হয়; এইরূপ বলিলে, 'ম'কারের গুণ হইয়া 'ও'কার প্রাপ্তি হইবে। (৩) অতএবই 'ইক্' গ্রহণ কর্ত্তব্য।

মন্তব্য।—'জন' ধাতুর 'ন'কারের স্থানপ্রযুক্ত সদৃশ 'গুণসংজ্ঞক (অ, এ, বা ওকারের মধ্যে) কোনও বর্ণ নাই বলিয়া, অপেক্ষাকৃত মাত্রাসাদৃশ্যপ্রযুক্ত, একার ওকার না হইয়া, অকারই হইতে পারে। কিন্তু মকারের ত স্থানপ্রযুক্ত

(১) স্থানেঽন্তরতমঃ ১।১।৫০। বহুবর্ণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, সদৃশতম যে বর্ণ, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(২) অতোগুণে ৬।১।৯৭। পদান্ত ভিন্ন অকারের পরে গুণসংজ্ঞক বর্ণ থাকিলে পররূপ এক আদেশ হয়।

(৩) মকারের ওষ্ঠ স্থান; অতএব ওষ্ঠস্থানবিশিষ্ট ওকারই হইবে।

সাদৃশ্য, 'ও'কারেতেই রহিয়াছে ; অতএব, অনেক প্রকারের সাদৃশ্যের মধ্যে, স্থানপ্রযুক্ত সাদৃশ্যই বলবান্ হয় বলিয়া, অকার না হইয়া 'ও'কারই হইবে (১)। অতএব, যেহেতু 'ড'প্রত্যয় ব্যর্থ নহে, (চরিতার্থের অবকাশ আছে বলিয়া) সেই হেতুই 'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রে, 'ইক্' গ্রহণ কর্ত্তব্য।

যদি 'ইক্' গ্রহণ করা যায়, তবেও দোষ হইবে। কারণ, দ্যৌঃ (২), পন্থাঃ (৩), সঃ (৪), ইমম্ (৫) ইত্যাদি স্থলেও 'ইক্' প্রত্যাহারের প্রাপ্তি হইবে ?

বার্ত্তিকমূল।—সংজ্ঞয়া বিধানে নিয়মঃ * ।

বার্ত্তিকানুবাদ।— গুণ বা বৃদ্ধি সংজ্ঞা দ্বারা গুণ বা বৃদ্ধি বিধান করিলেই এই নিয়ম ('ইক্'এর উপস্থিতি) হইয়া থাকে ।*

ভাষ্যমূল।—সংজ্ঞয়া যে বিধীয়ন্তে তেষু নিয়মঃ। কিং বক্তব্যমেতৎ। নহি। কথমনুচ্যমানং গংস্যতে। গুণবৃদ্ধিগ্রহণসামর্থ্যাৎ। কথং পুনরন্তরেণ গুণ-বৃদ্ধিগ্রহণমিকো গুণবৃদ্ধী স্যাতাম্। প্রকৃতং গুণবৃদ্ধিগ্রহণমনুবর্ত্ততে। ক প্রকৃতম্। বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণ ইতি। যদি তদনুবর্ত্ততে। অদেঙ্ গুণবৃদ্ধিশ্চেত্যদেঙাং বৃদ্ধি-সংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। সংবন্ধমনুবর্ত্তিষ্যতে। বৃদ্ধিরাদৈচ্। অদেঙ্ গুণঃ। বৃদ্ধিরা-

---

(১) যত্রানেকবিধমান্তর্য্যং তত্র স্থানত আন্তর্য্যং বলীয়ঃ।

(২) দিব ঔৎ।৭।১।৮৪। ('দিব্' এই প্রাতিপদিকের উত্তর 'ঔ' হয়, 'সু'বিভক্তি পরে থাকিলে।) এখানে বৃদ্ধিসংজ্ঞক ঔকার, 'দিব্'এর 'ই'কার স্থানে প্রাপ্তি হইবে ; কিন্তু অবশ্য কর্ত্তব্য 'ব'কার স্থানে প্রাপ্তি হইবে না।

(৩) পথিমথ্যভুক্ষামাৎ।৭।১।৮৫। পথিন্ মথিন্ ঋভুক্ষিন্ শব্দের 'আ'-কারান্ত আদেশ হয়, 'সু'বিভক্তি পরে থাকিলে। এই স্থলে, বৃদ্ধি আদেশ 'ইক্'-এর হয় বলিয়া, আকাররূপ বৃদ্ধি আদেশ ও পথিন্ শব্দের ইকারেরই প্রাপ্ত হইবে। অন্তের হইবে না।

(৪) ত্যদাদীনামঃ।৭।২।১০২। (ত্যদ্ প্রভৃতি অর্থাৎ ত্যদ্ শব্দ আদিতে, যে গণপঠিত শব্দের, তাহাদের অকারান্ত আদেশ হয়।) এই সূত্রে ইক্এর গ্রহণ প্রাপ্তি হইলে, তদ্ শব্দের মধ্যে ইক্এর অভাব হেতু, (গুণরূপ) অকারান্ত আদেশও হইবে না, 'সঃ' এইরূপ প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

(৫) এই পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে, ত্যদাদিগণ পঠিত 'ইদম্' শব্দেরও অকারান্ত আদেশ না হইয়া, গুণসংজ্ঞক 'অ'কার আদেশ, ইদম্ শব্দের ইকারের হইবে ; সুতরাং 'ইমম্' এরূপ বিশুদ্ধ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

দৈচ্। তত ইকো গুণবৃদ্ধী ইতি। গুণবৃদ্ধিগ্রহণমনুবর্ত্ততে। অদেঙাদৈজ্‌গ্রহণং নিবৃত্তম্।

ভাষ্যানুবাদ।—সংজ্ঞাদ্বারা অর্থাৎ গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞাদ্বারা বিহিত যে আদেশ, তাহাতেই নিয়ম করা হইয়াছে। বিশেষার্থ, গুণশব্দ উচ্চারণ করিয়া যেখানে গুণ কার্য্য করা হইবে অথবা বৃদ্ধি শব্দ উচ্চারণ করিয়া যেখানে বৃদ্ধি কার্য্য করা হইবে, সেখানেই এই নিয়ম করা হইবে যে, গুণ এবং বৃদ্ধি কার্য্য 'ইক্'এর স্থানেই হয়। তাহা হইলে, 'দিব ঔৎ' সূত্রের ঔকারও, বৃদ্ধি শব্দের উচ্চারণ না করিয়া, ঔকার মাত্র উল্লেখ করাতেই, 'দ্যৌঃ' প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

ইহা কি আবার বলিতে হইবে? অর্থাৎ 'গুণ' 'বৃদ্ধি' সংজ্ঞা দ্বারা বিধান করিলেই যে নিয়ম প্রাপ্তি হইবে, তাহার জন্যও কি আবার একটী সূত্র বা বার্ত্তিক করিবার প্রয়োজন হইবে?

নিশ্চয়ই না।

না বলিলে, কিরূপে জানা যাইবে?

('ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রে) গুণ এবং বৃদ্ধি শব্দের গ্রহণ বলেই জানা যাইবে যে, ইকেরই হয়।

যদি এইরূপই হয়, তবে গুণ এবং বৃদ্ধি শব্দের গ্রহণ ভিন্নই কিরূপে 'ইক্'-এর যে গুণ বা বৃদ্ধি হয়, তাহা বোধ হইবে?

এই প্রকরণে যে, গুণ এবং বৃদ্ধি শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার অনুবৃত্তি হইবে। তাহা হইলেই গুণ এবং বৃদ্ধি যে ইক্এরই হয়, তাহাও বোধ হইবে।

কোথায় প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে?

'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, বৃদ্ধি শব্দ, এবং 'অদেঙ্গুণঃ' সূত্রে গুণ শব্দ, উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সূত্রদ্বয় হইতে 'বৃদ্ধি' ও 'গুণ' শব্দের অনুবৃত্তি আনিয়া কার্য্যসিদ্ধ করা হইবে।

যদি তাহাদের অনুবৃত্তি করা যায়, তবে এই দোষ হইবে যে,—'অদেঙ্গুণঃ' সূত্রেও 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্র হইতে, 'বৃদ্ধি' শব্দের অনুবৃত্তি আসিয়া, 'অদেঙ্'এর (অকার, একার, ওকারের) ও বৃদ্ধি সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে?

তাহা হইবে না; কারণ, সম্বন্ধ অর্থাৎ কেবল 'বৃদ্ধি' শব্দের অনুবৃত্তি না করিয়া একত্র মিলিত যে 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' ('বৃদ্ধি' শব্দ এবং 'আদৈচ্' শব্দ একত্র মিলিত) সূত্রের অনুবৃত্তি করা হইবে। তাহা হইলেই, 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' 'অদেঙ্-

গুণঃ' এইরূপ সূত্র হইবে। সুতরাং 'বৃদ্ধি' হইলে 'আদৈচ্' (আ, ঐ, ঔ)এরই হইবে ; অদেঙ্ (অ, এ, ও) এর হইবে না। পূর্ব্বসূত্রে এইরূপ অর্থ হইবার পর, 'ইকো গুণবৃদ্ধী' এইরূপ সূত্র করা হইবে। আর এই সূত্রে, পূর্ব্ব সূত্রদ্বয়ের মধ্যে যে, 'গুণ' এবং 'বৃদ্ধি' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদেরই অনুবৃত্তি হইবে ; কিন্তু 'অদেঙ্' এবং 'আদৈচ্'এর যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদের নিবৃত্তি করা হইবে। তাহা হইলেই সর্ব্বত্র 'ইক্'এর গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্যমূল।— অথবা মণ্ডূকগতয়োঽধিকারাঃ। যথা মণ্ডূকা উৎপ্লুত্য উৎপ্লুত্য গচ্ছন্তি তদ্বদধিকারাঃ।

অথবা একযোগঃ করিষ্যতে। বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণঃ। ততইকো গুণবৃদ্ধী ইতি। ন চৈকযোগেঽনুবৃত্তির্ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা অধিকার (অনুবৃত্তি) সমূহ মণ্ডূকের (ভেকের) গতির ন্যায়ও হইয়া থাকে ; এইরূপ জানিতে হইবে। যেমন মণ্ডূকগণ লাফাইয়া লাফাইয়া গমন করে, সেইরূপ অধিকারসমূহও হইয়া থাকে। সুতরাং 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রেও 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্র হইতে 'বৃদ্ধি' শব্দ এক লাফে 'অদেঙ্ গুণঃ' সূত্র অতিক্রম করিয়া গিয়া পড়িবে। তাহা হইলেই উদ্দেশ্যও সিদ্ধি হইবে।

অথবা তিন সূত্রই একত্র সংযোগ করা হইবে। অর্থাৎ'বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণঃ' এবং তৎপরে 'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্র, এই তিন সূত্র একত্র সংযোগ করা হইবে।

অতএব একত্র সংযোগ হওয়াতে অনুবৃত্তিও হইবে না। এইরূপে কার্য্যও সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথবান্যবচনাচ্চকারাকরণাচ্চ প্রকৃতাপবাদো বিজ্ঞায়তে যথোৎসর্গেণ প্রসক্তস্যাপবাদো বাধকো ভবতি। অন্যস্যাঃ সংজ্ঞায়া বচনাচ্চকারস্য চানুকর্ষণার্থস্যাকারণাৎ প্রকৃতায়া বৃদ্ধিসংজ্ঞায়া গুণসংজ্ঞা বাধিকা ভবিষ্যতি। যথোৎসর্গেণ প্রসক্তস্যাপবাদো বাধকো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা সূত্রসমূহ পৃথক্ পৃথক্ই করিব ; কিন্তু 'বৃদ্ধি' সংজ্ঞা করিয়া পুনঃ 'গুণ'রূপ অন্য বচন করাতে এবং গুণ শব্দের পরে 'চ'কার না করাতেই জানা যাইতেছে যে, ইহা (গুণ শব্দ), প্রকরণাগত বৃদ্ধি শব্দের অপবাদক। যেমন,—উৎসর্গ (সাধারণ) সূত্র দ্বারা কোনও বিধির প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হইলে, অপবাদ (বিশেষ) সূত্র, তাহার বাধক হইয়া থাকে। অর্থাৎ অন্যসংজ্ঞাবোধক (অদেঙ্ গুণঃ) বচন আরম্ভ করাতে এবং অনুবৃত্তির অর্থ-

প্রকাশক চকার 'অদেঙ্গুণঃ' সূত্রের পরে) না করাতেই প্রকরণাগত বৃদ্ধি সংজ্ঞার বাধিকা, গুণসংজ্ঞা হইবে। যেমন,—সাধারণতঃ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত উৎসর্গ সূত্রের প্রসঙ্গাগত বিধি, অপবাদক বিশেষ সূত্র বাধক হইয়া থাকে। এই স্থলে, যদিও 'বৃদ্ধি' সূত্র, সাধারণতঃ সর্ব্বত্র প্রাপ্তি হইতে পারে বটে; তথাপি 'অদেঙ্-গুণঃ' বিশেষ সূত্র করাতে, এবং এই পর সূত্রান্তে 'চ'কার না করাতে, পূর্ব্ব সূত্রকে বাধ করিয়া, অ, এ, ওরই গুণসংজ্ঞা হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথবা বক্ষ্যত্যেতৎ। অনুবর্ত্তন্তে চ নাম বিধয়ো ন চানুবর্ত্তনা-দেব ভবন্তি। কিং তর্হি। যত্নাত্তবন্তীতি। অথবা উভয়ং নিবৃত্তং তদপেক্ষিষ্যামহে।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা এইরূপই বলা হইবে অর্থাৎ যেরূপ সূত্র আছে,সেরূপই বলা হইবে। তাহা হইলে, বিধিসমূহেরও অনুবৃত্তি হইবে; কিন্তু কেবল অনুবৃত্তি দ্বারাই কার্য্য হইবে না।

তবে কি?

যত্নবিশেষের দ্বারা হইবে। অর্থাৎ সূত্রের মধ্যে এমন কোনও চেষ্টা-বিশেষ করিতে হইবে, যদ্দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু 'অদেঙ্গুণঃ' সূত্রে, সেরূপ কোনও চেষ্টা না দেখিতে পাওয়াতে, বৃদ্ধিকার্য্যও হইবে না।

অথবা 'বৃদ্ধি' এবং 'গুণ' উভয়ের অনুবৃত্তির নিবৃত্তি করিয়া, তন্নিবন্ধন মনোগত ভাবের, 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, অপেক্ষা করিব। তাহা হইলেই কার্য্যও সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—কিং পুনরয়মলোহন্ত্যশেষঃ। আহোস্বিদলোহন্ত্যাপবাদঃ। কথং চায়ং তচ্ছেষঃ স্যাৎ কথং বা তদপবাদঃ। যদ্যেকং বাক্যং তচ্চেদং চ। অলোহন্ত্যস্য বিধয়ো ভবন্তি। ইকো গুণবৃদ্ধী অলোহন্ত্যস্যেতি। ততোয়ং তচ্ছেষঃ।

অথ নানাবাক্যম্। অলোহন্ত্যস্য বিধয়ো ভবন্তি। ইকোগুণবৃদ্ধী অন্ত্যস্য চানন্ত্যস্য চেতি। ততোয়ং তদপবাদঃ।

কশ্চাত্র বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে যে, 'ইক্'-এর গুণ এবং বৃদ্ধি বিধান করা হইয়াছে, তাহা কি 'অলোহন্ত্যস্য'(১) সূত্রের সহিত মিলিত হইয়া, অন্ত্যবর্ণ যদি 'ইক্' হয়, তাহারই গুণ এবং বৃদ্ধি হইবে? না, 'অলোহন্ত্যস্য' সূত্রের অপবাদক হইবে?

(১) ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে আদেশ, তাহা, তাহার অন্ত্যবর্ণ স্থানে হয়।

তচ্ছেষ পক্ষ (অর্থাৎ অন্ত্য ইক্‌এর স্থানে গুণবৃদ্ধি) অবলম্বন করিলেই বা কিরূপ হইবে, আর তদপবাদ পক্ষ (আদি, অন্ত্য কিংবা মধ্য, যে কোন স্থানে 'ইক্' থাকিলেই হইল) অবলম্বন করিলেই বা কিরূপ হইবে ?

যদি তাহা (অলোঽন্ত্যস্য) এবং ইহা (ইকোগুণবৃদ্ধী), এক বাক্য করা যায়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে যে, যাবতীয় বিধি অন্ত্যবর্ণেরই হয় ; সুতরাং 'ইক্'এর গুণ বা বৃদ্ধি হইতেও অন্ত্যবর্ণেরই হইবে। অতএব এইটী 'তচ্ছেষ-পক্ষ' হইল।

আর যদি নানা বাক্য হয়, অর্থাৎ উভয় সূত্র ভিন্ন ভিন্ন বাক্যবিশিষ্ট হয় ; তবে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আদেশ, অন্ত্যবর্ণের স্থানে হইবে। আর ইক্‌এর স্থানে গুণ এবং বৃদ্ধি আদেশ, অন্ত্যেরও হইবে, অনন্ত্য অর্থাৎ আদি মধ্যেরও হইবে। সেই হেতু এইটী 'তদপবাদ'পক্ষ হইবে।

পক্ষদ্বয়ে বিশেষ (প্রভেদ) কি ?

বার্ত্তিকমূল।—বৃদ্ধিগুণাবলোঽন্ত্যস্যেতি চেন্মিদিমৃজিপুগন্তলঘূপধর্চ্ছিদৃশিক্ষিপ্র-ক্ষুদ্রেষ্বিগ্‌গ্রহণম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি বল যে, বৃদ্ধি এবং গুণাদেশ অন্ত্যবর্ণেরই হয়, তবে মিদি, মৃজি, পুগন্ত, লঘু উপধাবিশিষ্ট ঋচ্ছ এবং দৃশ্ এই সকল ধাতু, আর ক্ষিপ্র, ক্ষুদ্র প্রভৃতি শব্দে, 'ইক্'প্রত্যাহারের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। *।

ভাষ্যমূল।—বৃদ্ধিগুণাবলোঽন্ত্যস্যেতি চেন্মিদিমৃজিপুগন্তলঘূপধর্চ্ছিদৃশিক্ষিপ্র-ক্ষুদ্রেষ্বিগ্‌গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। মিদের্গুণঃ। ইক ইতি বক্তব্যম্। অনন্ত্যত্বাদ্ধি ন প্রাপ্নোতি। পুগন্তলঘূপধস্য গুণঃ। ইক ইতি বক্তব্যম্। অনন্ত্যত্বাদ্ধি ন প্রাপ্নোতি। ঋচ্ছেলিটি গুণঃ। ইক ইতি বক্তব্যম্। অনন্ত্যত্বাদ্ধি ন প্রাপ্নোতি। ঋদৃশোঽঙি গুণঃ। ইক ইতি বক্তব্যম্। অনন্ত্যত্বাদ্ধি ন প্রাপ্নোতি। ক্ষিপ্র-ক্ষুদ্রয়োর্গুণঃ। ইক ইতি বক্তব্যম্। অনন্ত্যত্বাদ্ধি ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বৃদ্ধি এবং গুণ আদেশ অন্ত্য ইক্‌বিশিষ্ট বর্ণেরই হয় ; তবে যে সকল শব্দের অন্তে ইক্ নাই, যেমন ;—মিদি ধাতু, মৃজি ধাতু, পুক্ অন্ত এবং লঘু উপধাবিশিষ্ট ধাতু, ঋচ্ছ ধাতু, দৃশি ধাতু, ক্ষিপ্র শব্দ এবং ক্ষুদ্র প্রভৃতি শব্দের, পূর্ব্ব-ইক্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ সমূহের, গুণ বা বৃদ্ধি হওয়ার জন্য, 'ইকঃ' অর্থাৎ ইক্‌এর স্থানে গুণ বা বৃদ্ধি হয় ; এইরূপ বলা কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক দৃষ্টান্তের স্থল দেখান যাইতেছে, মিদের্গুণঃ।৭।৩৮২। (মিদ্ ধাতুর ইক্‌এর গুণ হয়, ইৎসংজ্ঞাবিশিষ্ট শকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে,

'মেদ্যতে') এই স্থলে, যাহাতে পূর্ব্ব ইক্এরও গুণ প্রাপ্তি হয়, এজন্ত 'ইকঃ' (ইক্এর স্থানে হয়) এইরূপ বলা উচিত। কারণ, অন্যথা মিদ্ ধাতুর অন্ত্যবর্ণ ইক্ না হওয়াতে, গুণপ্রাপ্তি হইবে না।

মৃজের্বৃদ্ধিঃ ।৭।২।১১৪। (মৃজ্ ধাতুর ইক্এর বৃদ্ধি হয়, ধাতুপ্রত্যয় পরে থাকিলে, 'মার্ষ্টি') এই স্থলে, 'ইকঃ' এইরূপ বলা উচিত। কারণ, অন্যথা 'মৃজ্' ধাতুর অন্তে, ইক্ না থাকাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না।

পুগন্তলঘূপধস্য চ ।৭।৩।৮৬। (পুক্ আছে অন্তে যার, এমন যে ধাতু, আর লঘু উপধাবিশিষ্ট যে ধাতু, তাহার অঙ্গস্থিত ইক্ প্রত্যাহারের গুণ হয়, সার্ব্বধাতুক এবং আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, 'বিভেদ') এই স্থানে, 'ইকঃ' এইরূপ বলা উচিত। অন্যথা, যেহেতু লঘু উপধাবিশিষ্ট ধাতুর অন্তে কথনও 'ইক্' থাকিতে পারে না, সেইহেতু গুণও প্রাপ্তি হইবে না।

ঋচ্ছত্যৃতাম্ ।৭।৪।১১। (তুদাদিগণীয় ঋচ্ছ ধাতু, ঋ ধাতু এবং ঋৎধাতুর গুণ হয়, লিট্ বিষয়ক প্রত্যয় পরে থাকিলে, 'আনর্চ্ছ') এইসূত্রানুসারে, 'ঋচ্ছ'ধাতুর লিট্এ, গুণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইস্থলে, 'ইকঃ' এইরূপ বলা উচিত। অন্যথা 'ঋচ্ছ'ধাতুর অন্তে ইক্ নাই বলিয়া গুণও প্রাপ্তি হইবে না।

ঋদৃশোঽঙি গুণঃ ।৭।৪।১৬। (ঋবর্ণান্ত ধাতু এবং দৃশ ধাতুর গুণ হয়, অঙ্ পরে থাকিলে, 'অদর্শৎ') এইস্থলে, 'ইকঃ' এইরূপ বলা উচিত। অন্যথা 'দৃশ্'ধাতুর অন্তে ইক্ না থাকাতে, গুণ হইবে না।

স্থূলদূরযুবহ্রস্বক্ষিপ্রক্ষুদ্রাণাং যণাদিপরং পূর্ব্বস্য চ গুণঃ ।৬।৪।১৫৬। (এই সকল শব্দের যণাদি পরক কার্য্যের লোপ হয়, আর পূর্ব্বের গুণ হয়, ইষ্ঠন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে) এইসূত্রানুসারে, ক্ষিপ্র এবং ক্ষুদ্র শব্দের গুণ হইয়া থাকে। এইস্থলে, 'ইকঃ' এইরূপ বলা উচিত। অন্যথা, 'ক্ষিপ্র'ও 'ক্ষুদ্র'শব্দের অন্তে 'ইক্' না থাকাতে, গুণ প্রাপ্ত হইবে না।

'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, তচ্ছেষ পক্ষ অর্থাৎ অন্ত্য ইকের গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত সূত্রসমূহে 'ইকঃ' (পূর্ব্ব ইকের স্থানে আদেশ হইবার জন্য) এইরূপ ষষ্ঠ্যন্তপদ, পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূল।—সর্ব্বাদেশপ্রসঙ্গশ্চানিগন্তস্য। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি অন্ত্য ইকেরই গুণ বা বৃদ্ধি হয়, তবে সর্ব্বাদেশপ্রসঙ্গও 'ইক্' অন্ত্য ভিন্ন অন্য বর্ণের হইবে। *

ভাষ্যমূল।—সর্ব্বাদেশশ্চ গুণোঽনিগন্তস্য প্রাপ্নোতি। যাতা। বাতা। কিং কারণম্। অলোঽন্ত্যস্যেতি ষষ্ঠী চৈব হ্যন্ত্যমিকমুপসংক্রান্তা। অঙ্গস্যেতি চ স্থান-ষষ্ঠী। তদ্‌যদিদানীমনিগন্তমঙ্গং তস্য গুণঃ সর্ব্বাদেশঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। যথৈব হ্যলোঽন্ত্যস্যেতি ষষ্ঠী অন্ত্যমিকমুপসংক্রান্তা এবমঙ্গস্যেত্যপি স্থানষষ্ঠী। তদ্‌যদিদানীমনিগন্তমঙ্গং তত্র ষষ্ঠ্যেব নাস্তি কুতো গুণঃ কুতঃ সর্ব্বাদেশঃ। এবং তর্হি নায়ং দোষসমুচ্চয়ঃ। কিং তর্হি পূর্ব্বাপেক্ষোঽয়ং দোষঃ। হ্যর্থে চায়ং চঃ পঠিতঃ। মিদিমৃজপুগন্তলঘূপধর্চ্ছিদৃশিক্ষিপ্রক্ষুদ্রেষ্বিগ্‌গ্রহণং সর্ব্বাদেশ-প্রসঙ্গো হ্যনিগন্তস্যেতি। মিদের্গুণঃ ইক ইতি বচনাদন্ত্যস্য ন। অলোঽন্ত্যস্যেতি বচনাদিকো ন। উচ্যতে চ গুণঃ স সর্ব্বাদেশঃ প্রাপ্নোতি। এবং সর্ব্বত্র।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি ইক্‌এর সহিত অন্ত্যবর্ণেরই সম্বন্ধ হয়; তবে যেখানে, ষষ্ঠী আছে, কিন্তু ইক্ নাই, সেখানে, 'অনেকাল্ শিৎ সর্ব্বস্য' (অনেক বর্ণ বা শকার ইৎ বিশিষ্ট আদেশ হইলে, তাহা সমুদায় বর্ণের স্থানে হয়) এই সূত্রানু-সারে, সর্ব্বাদেশ গুণও অনিগন্তেরই প্রাপ্তি হইবে। যেমন,—'যাতা' 'বাতা', এই স্থলে, আর্ধধাতুক 'যা' ধাতুর এবং 'বা' ধাতুর সমুদায় অঙ্গের গুণ হইবে।

ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ এই যে, 'অলোঽন্ত্যস্য' এই সূত্রস্থিত ষষ্ঠী ও অন্ত্য ইক্‌কেই উপসংক্রমণ (অধিকার) করিয়াছে। আর এ দিকে 'অঙ্গস্য'।৬।৪।১। এই অধিকারবাচক ষষ্ঠীও স্থানবোধিকা। সুতরাং যে স্থলের অন্ত্যবর্ণ ইক্ নহে, সেখানে 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রও প্রাপ্তি হইবে না। 'অঙ্গস্য' এই ষষ্ঠীর স্থানে কোনও আদেশ প্রাপ্ত হওয়া চাই, সুতরাং এই যে, ইগন্ত ভিন্ন অঙ্গ (যা, বা), ইদানীং তাহার সমুদায় অঙ্গের, অবাধে গুণাদেশ প্রাপ্তি হইবে। 'অলো-ঽন্ত্যস্য সূত্র,' 'অনেকাল্ শিৎ সর্ব্বস্য' সূত্রের বাধক হইবে না, যে হেতু তাহা অন্ত্য 'ইক্' কে বিধান করিয়া থাকে।

এই দোষ এখানে প্রাপ্তি হইবে না। কারণ, যেমন নাকি 'অলোঽন্ত্যস্য' এইষষ্ঠী, অন্ত্য ইক্‌এর সহিত উপসংক্রামিত হইয়াছে (মিলিত হইয়াছে); সেইরূপ 'অঙ্গস্য', এই স্থানবোধিকা ষষ্ঠীর সহিতও মিলিত হইয়াছে। অত-এব এক্ষণে যদি, 'ইক্' অন্তে না আছে, এমন অঙ্গের গুণ আদেশ হয়; তবে, যখন সেখানে ষষ্ঠীই নাই, তখন গুণই বা কোথা হইতে হইবে, আর সর্ব্বাদেশই বা কোথা হইতে হইবে?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—লিখিত।

সিঁতি ব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার দর্শন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি উপদেশ ও তাঁহাদের সহিত আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[সমাধিমন্দিরে।]

আবার ব্রাহ্মভক্তেরা সিঁতির ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইলেন। ৺কালী পূজার পরদিন, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, ইংরাজি ১৯শে অক্টোবর, ১৮৮৪ সাল। এবার শরতের মহোৎসব। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে আবার ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইল। প্রাতঃকালের উপাসনাদি হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বেলা চারিটা সাড়ে চারিটার সময় আসিয়া পহুঁছিলেন। তাঁহার গাড়ি আসিয়া বাগানের মধ্যে দাঁড়াইল। অমনি দলে দলে ভক্ত আসিয়া মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘেরিতে লাগিলেন। প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে সমাজের বেদী রচনা হইয়াছে। তাহারই সম্মুখে দালান। সেই দালানে পরমহংসদেব উপবেশন করিলেন। অমনি ভক্তগণ চারিধারে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। বিজয়, ত্রৈলোক্য ও অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত একজন সদরওয়ালাও (Sub Judge) আছেন।

সমাজগৃহ মহোৎসব উপলক্ষে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। কোথাও নানাবর্ণের পতাকা, মধ্যে মধ্যে হর্ম্ম্যোপরি বা বাতায়নপথে নয়নরঞ্জন, সুন্দর পাদপ-বিভ্রমকারী বৃক্ষপল্লবরাশি। সম্মুখে পূর্ব্বপরিচিত সেই সরোবরের স্বচ্ছ সলিল মধ্যে শরতের সুনীল নভোমণ্ডল প্রতিভাসিত হইতেছে। উদ্যান-স্থিত রাঙ্গা রাঙ্গা পথগুলির দুই পার্শ্বে সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ফল-পুষ্পের বৃক্ষ-শ্রেণী। আজ ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই বেদধ্বনি ভক্তেরা আবার শুনিতে পাইবেন—যে ধ্বনি আর্য্য-ঋষিদের মুখ হইতে বেদাকারে এককালে বহির্গত হইয়াছিল—যে ধ্বনি আর একবার নররূপধারী পরমসন্ন্যাসী, ব্রহ্মগতপ্রাণ, জীবের দুঃখে কাতর, ভক্তবৎসল, ভক্তাবতার হরিপ্রেমবিহ্বল Jesusএর মুখ হইতে তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য সেই নিরক্ষর মৎস্যজীবিগণ শুনিয়াছিলেন—যে ধ্বনি

পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকারে এককালে বহির্গত হইয়াছিল—যে মেঘ-গম্ভীরধ্বনিমধ্যে বিনয়-নম্র, ব্যাকুলতাপূর্ণ, 'গুড়াকেশ কৌন্তেয়' শিষ্যের ভাবে সমরক্ষেত্রে সারথিবেশধারী মানবাকার সচ্চিদানন্দগুরু শ্রীমুখাৎ এই কথামৃত পান করিয়াছিলেন।—

"যদক্ষরং ব্রহ্মবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।
কবিং পুরাণং অনুশাসিতারং
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেৎ যঃ
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
প্রয়াণ-কালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিয়াই সমাজের সুন্দররচিত বেদীপানে দৃষ্টিপাত করিয়াই অমনি নতশির হইয়া প্রণাম করিলেন। বেদী হইতে শ্রীভগবানের কথা হয়—তাই তিনি দেখিতেছেন যে, বেদীক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র। দেখিতেছেন, এখানে অচ্যুতের কথা হয়, তাই সর্ব্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। আদালতগৃহ দেখিলে যেমন মোকদ্দমা মনে পড়ে ও জজ মনে পড়ে, সেইরূপ এই হরিকথার স্থান দেখিয়া তাঁহার ভগবানের উদ্দীপন হইল।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান গাহিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, হাঁগা, ঐ গানটী তোমার বেশ, 'দে মা পাগল করে,' ঐটী গাও না। তিনি গাইলেন;—

"আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ী)
আর কায নাই জ্ঞান বিচারে।
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
ওমা ভক্তচিত্ত-হরা, ডুবাও প্রেমসাগরে।
তোমার এ পাগলা-গারদে, কেহ হাসে, কেহ কাঁদে,

কেহ নাচে আনন্দভরে ;
ঈশা মুসা, শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, ওমা মিশে তার ভিতরে।
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে ;
তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর মা ধনী কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে।"

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। একেবারে সমাধিস্থ—'উপেক্ষিয়া মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব সর্ব্ব তত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপন আপনে'। কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার সমস্তই যেন পুঁছিয়া গিয়াছে। দেহমাত্র চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বিদ্যমান। একদিন ভগবান্ পাণ্ডবগণের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ শ্রীকৃষ্ণগতান্তরাত্মা পাণ্ডবগণ কাঁদিয়াছিলেন। তখন আর্য্যকুলগৌরব ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত থাকিয়া অন্তিমকালে ভগবানের ধ্যাননিরত ছিলেন। তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সহজেই কাঁদিবার দিন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমাধি-প্রাপ্ত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া পাণ্ডবেরা কাঁদিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন তিনি বুঝি দেহত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[হরিকথাপ্রসঙ্গে।]

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবাবস্থায় ব্রাহ্মভক্তদের উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই ঈশ্বরীয় ভাব খুব ঘনীভূত ; যেন বক্তা মাতাল হইয়া কি বলিতেছেন। ভাব ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, অবশেষে পূর্ব্বের ঠিক সহজাবস্থা।

["আমি সিদ্ধি খাব"]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভাবস্থ) মা! আমি কারণানন্দ চাই না। আমি সিদ্ধি খাব।

[গীতা ও অষ্টসিদ্ধি]

"সিদ্ধি কি না, বস্তু লাভ। অষ্টসিদ্ধির সিদ্ধি নয়। সে (অণিমা লঘিমাদি) সিদ্ধির কথা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, 'ভাই, যদি দেখকে

অষ্টসিদ্ধির একটী সিদ্ধি কারও আছে, তা'হলে জেনো যে, সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না'। কেন না, সিদ্ধাই থাকলেই অহংকার থাকবে, আর অহংকারের লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

[ঈশ্বর লাভ কি?]

"আর এক আছে, প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। যে ব্যক্তি সবে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সে প্রবর্ত্তকের থাক্। সে সব লোক ফোঁটা কাটে, তিলক মালা পরে, বাহিরে খুব আচার করে। যে ব্যক্তি সাধক, সে আরো এগিয়ে গেছে। লোক-দেখান ভাব কমে গিয়েছে। ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম ক'রে, তাঁকে সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করে। সিদ্ধ কে? যাঁর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হ'য়েছে যে, ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব ক'রছেন, যিনি ঈশ্বরকে দর্শন ক'রেছেন। 'সিদ্ধের সিদ্ধ' কে? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রেছেন। শুধু দর্শন নয়, কেউ পিতৃভাবে, কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে।

'কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে, এই বিশ্বাস এক রকম, আর কাঠ থেকে আগুন বার ক'রে ভাত রেঁধে, খেয়ে, শান্তি আর তৃপ্তিলাভ করা আর এক এক জিনিস।

'ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না। তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে।

(ব্রাহ্মসমাজ ও নিরাকারবাদ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভাবস্থ) এরা ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী। তা বেশ।

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) "একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে নয় নিরাকারে। দৃঢ় হ'লে সাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ ক'রবে, নিরাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ ক'রবে।

"মিছরীর রুটী সিদে ক'রে খাও আর আড় ক'রে খাও, মিষ্ট লাগবে। (সকলের হাস্য)।

[বিষয়ীর ঈশ্বর; ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর লাভ।]

"কিন্তু দৃঢ় হ'তে হবে, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকতে হবে। বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জান? যেমন খুড়ী জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে, আমার ঈশ্বরের দিব্য। আর যেমন কোন ফিট্ বাবু পান চিবুতে চিবুতে হাতে ষ্টিক (stick) ক'রে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে

একটী ফুল তুলে বন্ধুকে বলে, 'ঈশ্বর কি Beautiful ফুল ক'রেছেন।' কিন্তু এ বিষয়ীর ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।

"তাই বলছি, একটার উপর দৃঢ় হতে হবে। ডুব দাও, ডুব না দিলে সমুদ্রের ভিতরে রত্ন পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাসলে পাওয়া যায় না।"

এই বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে গানে কেশবাদি ভক্তদের মন মুগ্ধ করিতেন, সেই গান—সেই মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগিলেন। সকলের বোধ হইল, যেন স্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন।

গীত।

"ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবিরে প্রেম রত্নধন॥
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বল্‌বে সদা অনুক্ষণ॥
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে।]

(ব্রহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাস্‌তে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। দেখ, তোমাদের উপাসনা শুনেছি। কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অত বর্ণনা কর কেন? 'হে ঈশ্বর, তুমি আকাশ ক'রিয়াছ, বড় বড় সমুদ্র করিয়াছ, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক সব ক'রেছ', এ সব কথা আমাদের কায কি?

"সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক্—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি, এই সব দেখেই অবাক্! কিন্তু কই, বাগানের মালিক যে বাবু, তাঁকে খোঁজে ক জন? বাবুকে খোঁজে দুই একজনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা ক'চ্চি। সত্যি বলছি। এ কথা কারেইবা বলছি, কেবা বিশ্বাস করে!

[শাস্ত্র না প্রত্যক্ষ (The Law or Revelation)?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র প'ড়ে হদ্দ অস্তিমাত্র বোধ হয়। কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। ডুব দেবার পর, তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সব সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধর্‌তে পার্‌বে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পার্‌বে কিন্তু তাঁকে পাবে না।

"শাস্ত্র, বই, শুধু এ সব তাতে কি হবে? তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হয়ে তার চেষ্টা করো। কৃপা হলে তাঁকে দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।

[ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য; ঈশ্বরের 'বৈষম্য-দোষ'।]

সদরওয়ালা। মহাশয়, তাঁর কৃপা কি একজনের উপর বেশী আর এক জনের উপর কম? তা'হলে যে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেকি! ঘোড়াটাও টা আর সরাটাও টা! তুমি যা ব'ল্‌ছো, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ঐ কথা বলেছিল। ব'লেছিল, মহাশয়, তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন, কারুকে কম দিয়েছেন? আমি বল্লাম, তিনি বিভুরূপে সকলের ভিতর আছেন—আমার ভিতরও যেমনি, পীঁপ্‌ড়েটীর ভিতরেও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে, তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখ্‌তে এসেছি? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে, তাই দেখ্‌তে এসেছি! তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পাণ্ডিত, এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে আছে, তাই তোমার অত নাম। দেখ না, এমন লোক আছে যে, সে একলা একশো লোককে হারাতে পারে, আবার এমন আছে, একজনার ভয়ে পালায়।

"যদি শক্তিবিশেষ না হয়, তাহ'লে কেশব সেনকে লোকে এত মান্‌তো কেন?

"গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে—তা বিদ্যার জন্যই হউক বা গাওনা বাজনার জন্যই হউক বা Lecture দেওয়ার জন্যই হউক বা আর কিছুর জন্যই হউক—নিশ্চয় জেনো যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।

একজন ব্রাহ্মভক্ত (সদরওয়ালার প্রতি)। মহাশয়, ইনি যা বল্‌চেন মেনে নেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তের প্রতি)। তুমি কি রকম লোক! কথায় বিশ্বাস না ক'রে শুধু মেনে লওয়া যে কপটতা! তুমি ঢং কাচ দেখ্‌ছি!

ব্রাহ্মভক্তটী অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত কেশব ও নির্লিপ্ত সংসার; সংসার-ত্যাগ।)

সদরওয়ালা। মহাশয়, সংসার কি ত্যাগ কর্‌তে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, তোমাদের ত্যাগ কেন করতে হবে? সংসারে থেকেই হতে পারে। তবে আগে দিন কতক নির্জ্জনে থাকৃতে হয়। নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বরের সাধনা করতে হয়। এমন একটী বাড়ীর কাছে আড্‌ডা করতে হয়, যেখানে থেকে বাড়ীতে এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পার। কেশব সেন, প্রতাপ, এরা সব বলেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। আমি বল্লুম, জনকরাজা অমনি মুখে বল্লেই হওয়া যায় না। জনকরাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে আগে নির্জ্জনে কত তপস্যা করেছিল। তোমরা কিছু কর, তবেতো জনক রাজা হবে। অমুক খুব তর্‌তর্ করে ইংরাজি লিখ্‌তে পারে, তাকি একেবারেই লিখ্‌তে পেরেছিল? সে গরিবের ছেলে, আগে একজনের বাড়ীতে থেকে তাদের রেঁধে দিতো, আর দুটী দুটী খেতো, অনেক কষ্টে লেখা পড়া শিখেছিলো, তাই এখন তর্‌তর্ করে লিখ্‌তে পারে।

"কেশব সেনকে আরও বলেছিলুম, নির্জ্জনে না গেলে শক্ত রোগ সার্‌বে কেমন করে? রোগটা হয়েছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার তেঁতুল আর জলের জালা। তা রোগ সারবে কেমন ক'রে? আচার তেঁতুল—এই দেখো, ব'লতে ব'লতে আমার মুখে জল এসেছে। (সকলের হাস্য)। সম্মুখে থাক্‌লে কি হয়, সকলেই তো জান। মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার তেঁতুল, আবার ভোগ-বাসনা জলের জালা। বিষয়-তৃষ্ণার শেষ নাই, আর সেই বিষয় রোগীর ঘরে। এতে কি বিকার রোগ সারে? দিন কতক ঠাঁইনাড়া হয়ে থাকৃতে হয়, যেখানে আচার তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই। তার পর নীরোগ হয়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নাই। তাঁকে লাভ কোরে সংসারে এসে থাক্‌লে আর কামিনী কাঞ্চনে কিছু কর্‌তে পারে না। তখন জনকের মত নির্লিপ্ত হ'তে পার্‌বে।

"কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জ্জনে থেকে সাধন করা চাই। অশ্বত্থগাছ যখন চারা থাকে, তখন চারিদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগল গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়ার দরকার হয় না। তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু করতে পারে না। যদি নির্জ্জনে সাধন কোরে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ কোরে, বল বাড়িয়ে, বাড়ী গিয়ে সংসার কর, তাহলে কামিনীকাঞ্চন তোমার কিছু করতে পারবে না।

"নির্জ্জনে দৈ পেতে মাখম্ তুলতে হয়। জ্ঞানভক্তিরূপ মাখম্ যদি একবার মনরূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তা হলে সংসাররূপ জলের উপর রাখলে নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায়—দুধের অবস্থায়, যদি সংসাররূপ জলের উপর রাখ, তা হলে দুধে জলে মিশে যাবে। তখন আর মন নির্লিপ্ত হয়ে ভাসতে পারবে না।

"ঈশ্বরলাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, আর এক হাতে কায করবে। যখন কায থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, তখন নির্জ্জনে বাস করবে, তাঁর কেবল চিন্তা আর সেবা করবে।

সদরওয়ালা (আনন্দিত হইয়া)। মহাশয় এ অতি সুন্দর কথা! নির্জ্জনে সাধন চাই বই কি! কিন্তু ঐটী আমরা ভুলে যাই; মনে করি বুঝি একেবারে জনক রাজা হ'য়ে পড়েছি। (শ্রীরামকৃষ্ণের ও সকলের হাস্য)। সংসারত্যাগের যে প্রয়োজন নাই, বাড়ীতে থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এ কথা শুনেও আমাদের শান্তি ও আনন্দ হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ত্যাগ তোমাদের কেন ক'রতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতে হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ করা ভাল। ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে; খিদে তৃষ্ণা এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসারে থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলে না, ঈশ্বর টীশ্বর সব ঘুরে যাবে।

"এক জন তার মাগ্‌কে বলেছিল, 'আমি সংসার ত্যাগ কোরে চল্লুম'। মাগ্‌টী একটু জ্ঞানী ছিল। সে তাকে বল্লে, 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। তা যদি হয়, তাহলে এই এক ঘরই ভাল।'

"তোমরা ত্যাগ কেন করবে? বাড়ীতে আরও বরং সুবিধা। আহারের

জন্ম ভাব্তে হবে না। ভ্রমণ স্বদারায়, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটী দরকার, কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা কর্‌বার লোক কাছে পাবে।

"জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ এঁরা জ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিলেন, এঁরা দুখানা তরবার ঘুরাতেন। একখান জ্ঞানের, একখান কর্ম্মের।

[জ্ঞানীর লক্ষণ।]

সদরওয়ালা। মহাশয়, জ্ঞান যে হয়েছে, তা কেমন করে জান্‌বো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান হলে তাঁকে (ঈশ্বরকে) আর দূরে বোধ হয় না। তিনি আর তিনি বোধ হয় না। তখন ইনি। হৃদয়মধ্যে তাঁকে দেখা যায়। তিনি সকলেরই ভিতরে আছেন, যে খুঁজে, সেই পায়।

সদরওয়ালা। মহাশয়, আমি পাপী, কেমন করে বলি যে, তিনি আমার ভিতরে আছেন ?

(ব্রাহ্মসমাজ, খৃষ্টধর্ম্ম ও পাপবাদ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সদরওয়ালার প্রতি) ঐ কেবল তোমাদের পাপ আর পাপ! এ সব বুঝি খ্রীষ্টানী মত। আমায় একজন একখান বই (Bible) দিলে, একটু পড়া শুন্‌লুম, তা তাতে কেবল ঐ এক কথা! পাপ আর পাপ! আমি তাঁর নাম করেছি, ঈশ্বর কি রাম কি হরি বলেছি—আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই।

সদরওয়ালা। মহাশয়, কেমন করে ঐ বিশ্বাস হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁতে অনুরাগ কর। তোমাদেরই গানে আছে, "প্রভু, বিনে অনুরাগ, কোরে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা"। যাতে এরূপ অনুরাগ, এরূপ ঈশ্বরে ভালবাসা হয়, তার জন্যে তাঁর কাছে গোপনে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর আর কাঁদ। মাগের ব্যামো হলে, কি টাকা লোক্‌সান হলে, কি কর্ম্মের জন্য লোকে এক ঘটী কাঁদে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদ্‌ছে বল দেখি ?

"আম্মোক্তারী দাও"।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। মহাশয়, এঁদের সময় কই ? ইংরেজের কর্ম্ম করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সদরওয়ালার প্রতি) আচ্ছা তাঁকে আম্মোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে ? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক। তিনি যা কায কত্তে দিয়েছেন, তাই করো।

"বিড়ালছানার পাটওয়ারি বুদ্ধি নাই, মা মা করে। মা যদি হেঁশালে রাখে সেইখানেই প'ড়ে আছে। কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাকে। আবার যখন মা গৃহস্থের বিছানায় রাখে, তখনও সেই ভাব। নিশ্চিন্ত, মা মা করে।

সদরওয়ালা। মহাশয়, আমরা গৃহস্থ, কতদিন এ সব কর্ত্তব্য ক'র্‌তে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমাদের কর্ত্তব্য আছে বৈ কি ? ছেলেদের মানুষ ক'র্‌তে হবে। স্ত্রীকে ভরণ ক'র্‌তে হবে, ও অবর্ত্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় করে রাখ্‌তে হবে। তা যদি না কর, তুমি নির্দ্দয়। দয়া শুকদেবাদি রেখেছিলেন। দয়া যার নাই, সে মানুষ নয়।

সদরওয়ালা। সন্তান প্রতিপালন কত দিন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত। পাখী বড় হ'লে যখন সে আপনার ভার নিতে পারে, তখন তাকে ধাড়ী ঠোকরায়, কাছে আস্‌তে দেয় না। (সকলের হাস্য)

(গৃহস্থের কর্ত্তব্য ; জ্ঞানোন্মাদ ও কর্ত্তব্য।)

সদরওয়ালা। স্ত্রীর প্রতি কি কর্ত্তব্য ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে ধর্ম্মোপদেশ দেবে, ভরণ পোষণ কর্‌বে। যদি সতী হয়, তা হলে তোমার অবর্ত্তমানে তার খাবার যোগাড় কর্‌তে হবে।

"তবে জ্ঞানোন্মাদ হলে আর কর্ত্তব্য থাকে না। তখন কালকার জন্য তুমি না ভাব্‌লে ঈশ্বর ভাবেন। জ্ঞানোন্মাদ হলে তিনি তোমার পরিবারদের জন্য ভাব্‌বেন। যখন জমীদার নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন অছী সেই নাবালকের ভার লয়। (সদরওয়ালার প্রতি) এ সব আইনের ব্যাপার, তুমি তো সব জানো ?

বিজয় গোস্বামী। আহা ! আহা ! কি কথা ! যিনি অনন্যমন হয়ে তাঁর চিন্তা করেন, যিনি তাঁর প্রেমে পাগল, তাঁর ভার ভগবান্ নিজে বহন

করেন! নাবালকের অমনি 'অছী' এসে জোটে! আহা কবে সেই অবস্থা হবে? যাঁদের হয়, তাঁরা কি ভাগ্যবান্!

ত্রৈলোক্য। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) মহাশয়, সংসারে যথার্থ কি জ্ঞান হয়? ঈশ্বর লাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) কেন গো, তুমি তো সারে মাতে আছ (সকলের হাস্য)। ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে আছো তো। কেন সংসারে হবে না? অবশ্য হবে।

(জ্ঞানীর লক্ষণ; জীবন্মুক্ত।)

ত্রৈলোক্য। সংসারে জ্ঞান লাভ হয়েছে, তার লক্ষণ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হরিনামে ধারা আর পুলক। তাঁর মধুর নাম শুনেই শরীর রোমাঞ্চ হবে আর চক্ষু দিয়ে ধারা বেয়ে প'ড়্‌বে।

"যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ দেহ-বুদ্ধি যায় না। বিষয়াসক্তি যত কমে, ততই আত্মজ্ঞানের দিকে চলে যেতে পারা যায়; আর দেহবুদ্ধি কমে। বিষয়াসক্তি একেবারে চলে গেলে আত্ম-জ্ঞান হয়, তখন আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। নারিকেলের জল না শুকুলে দা দিয়া কেটে শাঁস আলাদা, মালা আলাদা করা কঠিন হয়। জল যদি শুকিয়ে যায়, তা হলে নড়্‌নড়্‌ করে, শাঁস আলাদা হয়ে যায়। একে বলে খোড়ো নারিকেল। ঈশ্বর লাভ যদি হয়ে থাকে, তা হলে লক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি খোড়ো নারিকেলের মত হয়ে যায়—দেহাত্মবুদ্ধি চলে যায়। দেহের সুখ দুঃখে আত্মার সুখ দুঃখ বোধ হয় না। সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না। কামিনী-কাঞ্চনের সুখ চায় না। সে জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়ায়। "কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।"

"যখন দেখ্‌বে, ঈশ্বরের নাম ক'র্‌ত্তেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জান্‌বে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বর লাভ হয়েছে। দেশলাই যদি শুক্‌নো হয়, একটা ঘস্‌লেই দপ ক'রে জলে উঠে। আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা ঘস্‌লেও কিছু হয় না। কেবল কাটীগুলো ফেলা যায়। বিষয়রসে র'সে থাক্‌লে, কামিনী-কাঞ্চনরসে মন ভিজে থাক্‌লে, ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় না। হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম। বিষয়রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়।

(উপায় ব্যাকুলতা ;—আপনার মা।)

ত্রৈলোক্য। বিষয়রস শুকাবার উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মার কাছে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকো। তাঁর দর্শন হ'লে বিষয়-রস শুকিয়ে যাবে। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চলে যাবে। আপনার মা বোধ থাক্‌লে এক্ষুণি হয়। তিনি তো ধর্ম্মমা নন। তিনি আপনারই মা। ব্যাকুল হ'য়ে মার কাছে আবদার কর। ছেলে ঘুড়ী কিন্‌বার জন্য মার আঁচল ধ'রে পয়সা চায়—মা হয় তো আর আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে। প্রথমে মা কোনমতে দিতে চায় না। বলে, 'না, তিনি বারণ ক'রে গেছেন, তিনি এলে ব'লে দিব, এক্ষুণি ঘুড়ী নিয়ে একটা কাণ্ড কর্ব্বি'। যখন ছেলে কাঁদ্‌তে সুরু করে, কোনমতে ছাড়ে না, তখন মা অন্য মেয়েদের বলে, 'রোস মা, এ ছেলেটাকে একবার শান্ত ক'রে আসি'। এই কথা ব'লে চাবীটা দিয়ে কড়াং কড়াং কোরে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়। তোমরাও মার কাছে আবদার করো, তিনি অবশ্য দেখা দিবেন। আমি শিখদের (Sikhs) ঐ কথা বলছিলাম। তারা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটিতে এসেছিল, মা কালীর মন্দিরের সুমুখে বসে তাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তারা বলেছিল, "ঈশ্বর দয়াময়," আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, কিসে দয়াময় ? তারা বল্লে, 'কেন মহারাজ, তিনি সর্ব্বদা আমাদের দেখ্‌ছেন, আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ, সব দিচ্ছেন, আমাদের আহার যোগাচ্ছেন'। আমি বল্লুম, যদি কারো ছেলেপুলে হয়, তাদের খপর তাদের খাওয়ার ভার বাপে নেবে না, তো কি বামুনপাড়ার লোকে এসে নেবে নাকি ?

সদরওয়ালা। মহাশয়, তবে কি তিনি দয়াময় নন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা কেন গো ? ও একটা বল্লুম, তিনি যে বড় আপনার লোক, তাঁর উপর আমাদের জোর চলে। আপনার লোককে এমন কথা পর্য্যন্ত বলা যায়, 'দিবি না রে শালা ?'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(অহঙ্কার ও সদরওয়ালা)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সদরওয়ালার প্রতি) আচ্ছা, অভিমান, অহঙ্কার জ্ঞানে হয়—না অজ্ঞানে হয় ?

"অহঙ্কার তমোগুণ, অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। এই অহঙ্কার আড়ালে আছে ব'লে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল'।

"অহঙ্কার করা বৃথা। এ শরীর, এ ঐশ্বর্য্য, কিছুই থাক্‌বে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখ্‌ছিল। প্রতিমার সাজ গোজ দেখে বলছে, 'মা, যতই সাজো, গোজো, দিন দুই তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দিবে' (সকলের হাস্য)। তাই সকলকে বল্‌ছি, জজই হও আর যেই হও, সব দুদিনের জন্য। তাই অভিমান, অহঙ্কার ত্যাগ কর্‌তে হয়।

(ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য; লোক ভিন্নপ্রকৃতি।)

"সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণ। তিন গুণের তিন রকম স্বভাব। তমোগুণীদের লক্ষণ, অহঙ্কার, নিদ্রা, বেশী ভোজন, কাম, ক্রোধ এই সব। রজোগুণীরা বেশী কায জড়ায়, কাপড় পোষাক ফিট্‌, ফাট্‌, বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বৈঠকখানায় Queen এর ছবি, যখন ঈশ্বর চিন্তা করে, তখন চেলী গরদ পরে; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তার মাঝে মাঝে একটী একটী সোনার রুদ্রাক্ষ; যদি কেউ ঠাকুর-বাড়ী দেখ্‌তে আসে, তবে সঙ্গে ক'রে ক'রে দেখায়, আর বলে, 'এদিকে আসুন আরো আছে, শ্বেত পাথরের, মার্ব্বেল পাথরের মেজে আছে, ষোল ফোকর নাট মন্দির আছে'। আবার দান করে লোককে দেখিয়ে। সত্ত্বগুণী লোক অতি শিষ্ট শান্ত, কাপড় যা তা; রোজকার পেট্‌ চলা পর্য্যন্ত; কখনও লোকের তোষামোদ করে ধন নেয় না; বাড়ীতে মেরামত নাই; ছেলেদের পোষাকের জন্য ভাবে না; মান সম্ভ্রমের জন্য ব্যস্ত হয় না; ঈশ্বর-চিন্তা, দান, ধ্যান, সমস্ত গোপনে—লোকে টের পায় না; মশারির ভিতর ধ্যান করে, লোকে ভাবে বাবুর রাতে ঘুম হয় নাই, তাই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাচ্চেন। সত্ত্বগুণ সিঁড়ির শেষ ধাপ, তার পরেই ছাদ। সত্ত্বগুণ এলেই ঈশ্বর লাভের আর দেরী হয় না—আর একটু এলেই তাঁকে পাবে।

(সদরওয়ালার প্রতি) তুমি বলেছিলে, সব লোক সমান, এই দেখ, কত ভিন্ন প্রকৃতি!

(মানুষ কত রকম।)

"আরও কত রকম থাক্‌ থাক্‌ আছে;—(১) নিত্য জীব, (২) মুক্তজীব, (৩) মুমুক্ষু জীব, (৪) বদ্ধজীব—এই চার রকম মানুষ। নারদ শুকদেব এঁরা সব নিত্য জীব, যেমন Steam-boat (কলের জাহাজ) আপনিও পারে যেতে পারে, আবার বড় জীব জন্ত, হাতী পর্য্যন্ত পারে নিয়ে যায়। নিত্যজীবেরা

নায়েবের স্বরূপ ; একটা তালুক শাসন করে—আর একটা তালুক শাসন কর্‌তে যায়। আবার মুমুক্ষুজীব আছে, যারা সংসার জাল থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌ছে। এদের মধ্যে দুই একজন জাল থেকে পালাতে পারে ; তাদের বলে মুক্ত জীব। নিত্যজীবেরা এক একটা সিয়ানা মাছের মত কখনও জালে পড়ে না।

[বদ্ধজীব]।

"কিন্তু বদ্ধজীব—সংসারী জীব—তাদের হুঁস নাই, তারা জালে পড়েই আছে, অথচ জালে বদ্ধ হয়েছি, এরূপ জ্ঞানও নাই। এরা হরি-কথা সম্মুখে হলে সেখান থেকে চলে যায়—বলে, হরিনাম মর্‌বার সময় হবে, এখন কেন ? আবার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, পরিবার কিম্বা ছেলেদের বলে, 'প্রদীপে অত সল্‌তে কেন, একটা সল্‌তে দাও, তা না হলে তেল পুড়ে যাবে' ; আর পরিবার ও ছেলেদের মনে ক'রে কাঁদে আর বলে, হায় ! আমি মলে এদের কি হবে ! আর, বদ্ধজীব যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, তাই আবার করে ; যেমন উটের কাঁটা-ঘাস খেতে খেতে মুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ে, তবু কাঁটা ঘাস ছাড়্‌বে না। এদিকে ছেলে মারা গেছে, শোকে কাতর, তবু আবার বছর বছর ছেলে হবে ; মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হলো, আবার বছর বছর ছেলে মেয়ে হবে ; বলে, কি কর্‌বো, অদৃষ্টে ছিল ! যদি তীর্থ কর্‌তে যায়, নিজে ঈশ্বর চিন্তা কর্‌বার অবসর পায় না—কেবল পরিবারদের পুঁটলী বইতে বইতে প্রাণ যায়, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে আর গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। বদ্ধজীব নিজের পেটের জন্য আর পরিবাদের পেটের জন্য দাসত্ব করে—আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ কোরে ধন উপায় করে। যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, যারা ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়, বদ্ধজীব তাদের পাগল বোলে উড়িয়ে দেয়। (সদরওয়ালার প্রতি) মানুষ কত রকম দেখ, তুমি সব এক বল্‌ছিলে, তা দেখ, কত ভিন্ন প্রকৃতি, কারুর বেশী শক্তি, কারুর কম।

[মৃত্যুকাল ও ঈশ্বরের নাম।]

"সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপ্‌লে, গঙ্গাস্নান করলে, তীর্থে গেলে কি হবে ! সংসার আসক্তি ভিতরে থাক্‌লে মৃত্যুকালে সেটী দেখা দেয়। কত আবল তাবল বকে, হয়তো বিকারের খেয়ালে হলুদ পাঁচ ফোড়ন তেজপাত বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। শুক-পাখী সহজবেলা রাধাকৃষ্ণ বলে ; বিল্লি ধর্‌লে নিজের বুলি—ক্যাঁ ক্যাঁ করে।

"গীতায় আছে, মৃত্যুকালে যা মনে কর্‌বে, পরলোকে তাই হবে। ভরত রাজা হরিণ হরিণ করে দেহত্যাগ করেছিল, তাই হরিণ জন্ম হলো। ঈশ্বর চিন্তা করে দেহ ত্যাগ কর্‌লে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আস্‌তে হয় না।

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয় অন্য সময় ঈশ্বর চিন্তা করেছে, কিন্তু মৃত্যু সময় করে নাই বলে, কি আবার এই সুখদুঃখময় সংসারে আস্‌তে হবে? কেন, আগে তো ঈশ্বর চিন্তা করেছিল!

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীব ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, আবার ভুলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়। যেমন এই হাতীকে স্নান করিয়ে দিলে আবার ধূলা কাদা মাখে। মন মত্তকরী। তবে হাতীকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে সাঁধ করিয়ে দিতে পার, তা হলে আর ধূলা কাদা মাখ্‌তে পারে না। যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা করে, তাহলে শুদ্ধ মন হয়, আর সে মন কামিনী কাঞ্চনে আবার আসক্ত হবার অবসর পায় না।

"ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাই এতো কর্ম্মভোগ। লোকে বলে যে গঙ্গাস্নানের সময় পাপ গুলো গঙ্গার তীরের গাছের উপর বসে থাকে। যাই তুমি গঙ্গাস্নান করে তীরে উঠ্‌ছ, অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে (সকলের হাস্য)।

"দেহত্যাগের সময় যাতে ঈশ্বর চিন্তা হয়, তাই তার আগে থাকৃতে উপায় কর্‌তে হয়। উপায়—অভ্যাসযোগ। ঈশ্বর চিন্তা কর্‌তে রোজ অভ্যাস কর্‌তে কর্‌তে শেষের দিনেও তাঁকে মনে পড়্‌বে।

ব্রাহ্মভক্ত। বেশ কথা হলো। অতি সুন্দর কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি এলোমেলো বল্লুম, তবে আমার ভাব কি জান? আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী; আমি ঘর, তিনি ঘরণী; আমি গাড়ী, তিনি Engineer আমি রথ তিনি রথী; যেমন চালান, তেমনি চলি; যেমন করান, তেমনি করি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[সঙ্কীর্ত্তনানন্দে]

ত্রৈলোক্য আবার গান গাহিলেন। সঙ্গে খোল করতালি বাজিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কতবার সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন; স্পন্দহীন দেহ, স্থিরনেত্র, সহাস্য বদন, কোন প্রিয় ভক্তের স্কন্ধদেশে হাত দিয়া আছেন।

আবার ভাবান্তে মত্ত মাতঙ্গের স্থায় নৃত্য। বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া গানের আখর দিতে লাগিলেন ;—

"নাচ মা, ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে ;
আপনি নেচে, নাচাও গো মা ;
(আবার বলি) হৃদিপদ্মে একবার নাচ মা ;
নাচ গো ব্রহ্মময়ী ;
সেই ভুবন-মোহনরূপে (একবার নাচ মা)।

সে অপূর্ব্ব দৃশ্য ! মাতৃগত প্রাণ, প্রেমে মাতোয়ারা সেই স্বর্গীয় বালকের নৃত্য ! ব্রাহ্মভক্তেরা তাঁকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন, যেন লোহাকে চুম্বকে ধরিয়াছে। সকলে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মনাম করিতেছেন আবার ব্রহ্মের সেই মধুর নাম, মা—নাম করিতেছেন। অনেকে বালকের মত মা মা বলিতে বলিতে কাঁদিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। এখনও সমাজের সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হয় নাই। হঠাৎ এই কীর্ত্তনানন্দে সমস্ত নিয়ম কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ রাত্রে বেদিতে বসিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে।

সকলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও আসীন। সম্মুখে বিজয়। বিজয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও অন্যান্য মেয়েভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবেন ও তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবেন বলিয়া সম্বাদ পাঠাইলে, তিনি একটী ঘরের ভিতর গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বিজয়কে বলিলেন, দেখ, তোমার শাশুড়ীর কি ভক্তি! তা বলে, 'সংসারের কথা আর বলবেন না, এক ঢেউ যাচ্চে, আর এক ঢেউ আস্‌ছে'। আমি বল্লুম, 'ওগো তোমার আর তাতে কি! তোমার তো জ্ঞান হয়েছে।' তোমার শাশুড়ী তাতে বল্লে, 'আমার আবার কি জ্ঞান হয়েছে! এখনও বিদ্যামায়া আর অবিদ্যা মায়ার পার হই নাই. শুধু অবিদ্যার পার হলে তো হবে না, আবার বিদ্যার পার হতে হবে, তবে তো জ্ঞান হবে! আপনিই তো ও কথা বলেন।'

এ কথা হইতেছে, এমন সময় শ্রীযুক্ত বেণীপাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেণীপাল। (বিজয়ের প্রতি) মহাশয়, তবে গাত্রোত্থান করুন, অনেক দেরি হয়ে গেছে, উপাসনা আরম্ভ করুন।

বিজয়। মহাশয়, আর উপাসনায় কি দরকার! আপনাদের এখানে আগে পায়েসের ব্যবস্থা, তারপর কড়ার ডাল ও অন্যান্য তরকারীর ব্যবস্থা। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিয়া) যে যেমন ভক্ত, সে সেইরূপ আয়োজন করে। সত্বগুণী ভক্ত পায়েস দেয়, রজোগুণী ভক্ত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ দেয়; তমোগুণী ভক্ত ছাগ ও অন্যান্য বলি দেয়।

বিজয় উপাসনা করিতে বেদির উপর বসিবেন কি না ভাবিতে লাগিলেন।

* * * * *

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিজয়। (রামকৃষ্ণের প্রতি) আপনি অনুগ্রহ করুন, তার পর আমি বেদি থেকে বল্‌বো!

(বিজয়ের প্রতি উপদেশ।)

[ব্রাহ্মসমাজ ও Lecture। আচার্য্যের কার্য্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। অভিমান গেলেই হলো। 'আমি লেক্‌চার্ দিচ্চি, তোমরা শুন,' এ অভিমান না থাক্‌লেই হলো। অহঙ্কার জ্ঞানে হয় না, অজ্ঞানে হয়। যে নিরহঙ্কার, তারই জ্ঞান হয়; নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে যায়।

"যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানও হয় না, আর মুক্তিও হয় না। এই সংসারে ফিরে ফিরে আস্‌তে হয়। বাছুর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) করে, তাই অত যন্ত্রণা। কষায়ে কাটে, চামড়ায় জুতা হয়; আবার ঢোল ঢাকের চামড়া হয়; সে ঢাক কত পেটে, কষ্টের শেষ নাই! শেষে নাড়ী থেকে তাঁত হয়, সেই তাঁতে যখন ধুনুরীর যন্ত্র তৈয়ার হয়, আর ধুনুরীর তাঁতে তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) বল্‌তে থাকে, তখন নিস্তার হয়। এখন আর হাম্বা, হাম্বা (আমি, আমি) বলছে না; বল্‌ছে তুঁহু, তুঁহু (তুমি, তুমি) অর্থাৎ হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমিই সব।

[গুরুবাদ।]

"গুরু, বাবা ও কর্ত্তা, এই তিন কথায় আমার গায়ে যেন কাঁটা বেঁধে। আমি মার ছেলে, আমি চিরকাল বালক, আমি আবার 'বাবা' কি? ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র।

"যদি কেউ আমায় গুরু বলে, আমি বলি, 'দুর শালা, গুরু কিরে?' এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা আর কোন উপায় নাই! তিনিই একমাত্র এই ভবসাগরের কাণ্ডারী।

(বিজয়ের প্রতি) আচার্য্যগিরি করা বড় কঠিন। ওতে নিজের হানি হয়। অমনি দশজন মান্‌চে দেখে, পায়ের উপর পা দিয়ে বলে, 'আমি বলছি আর তোমরা শুন।' এই ভাবটা বড় খারাপ! ঐ একটু মান, লোকে হদ্দ বল্‌বে, আহা, 'বিজয় বাবু বেশ বল্লেন, লোক্‌টা খুব জ্ঞানী'। 'আমি বল্‌ছি,' এ জ্ঞান কোরো না। আমি মাকে বলি, 'মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও, তেমনি বলি।"

বিজয়। (বিনীতভাবে) আপনি বলুন, তবে আমি বেদীর উপর গিয়ে বোস্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) আমি কি বোল্‌বো; চাঁদা মামা সকলেরই মামা। যদি আন্তরিক হয়, তা হলে কোন ভয় নাই।

বিজয় আবার অনুনয় করাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "যাও, যেমন পদ্ধতি আছে, তেমনি করোগে। আন্তরিক তাঁর উপর থাক্‌লেই হোলো।"

* * * * *

তদনন্তর বিজয় বেদীতে আসীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিলেন। বিজয় প্রার্থনার সময় মা মা করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সকলেরই মন দ্রবীভূত হইল।

উপাসনান্তে ভক্তদের সেবার জন্য ভোজনের আয়োজন হইতে লাগিল। সতরঞ্চ, গালিচা সমস্ত উঠাইয়া পাতা হইতে লাগিল, ভক্তেরা সকলেই বসিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণেরও আসন হইল, তিনিও বসিয়া শ্রীযুক্ত বেণীপাল প্রদত্ত উপাদেয় লুচি, কচুরি, পাঁপর, নানাবিধ মিষ্টান্ন, দধি ক্ষীর ইত্যাদি সমস্ত ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

* * * * *

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মা।

আহারান্তে সকলে পান খাইতে খাইতে বাটী প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যাইবার পূর্ব্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিজয়ের সহিত একান্তে বসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। সেখানে মাষ্টারও ছিলেন।

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের মাতৃভাব। Motherhood of God]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি) তুমি তাঁকে মা মা বলে প্রার্থনা কর্‌ছিলে, এ খুব ভাল। কথায় বলে, মায়ের টান্‌ বাপের চেয়ে বেশী।

"মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর জোর চলে না। ত্রৈলোক্যের মায়ের জমীদারী থেকে গাড়ী গাড়ী ধন আস্‌ছিল, সঙ্গে কত লাল পাকড়িওয়ালা লাঠী হাতে দ্বারবান্‌। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে জোর ক'রে ধন সব কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে তেমন নালিস চলে না।

বিজয়। ব্রহ্ম যদি মা, তাহলে তিনি সাকার না নিরাকার ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী (আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কায করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেল্‌চে দুল্‌চে, শক্তি বা কালীর উপমা এই। কালী কি না—যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ করেন। কালী 'সাকার আকার নিরাকার।' তোমার যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস হয়, তুমি কালীকে সেইরূপে চিন্তা করবে। একটা দৃঢ় করে তাঁর চিন্তা কর্‌লে, তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পোঁছিলে তেলীপাড়াও জান্‌তে পার্‌বে। তখন জান্‌তে পার্‌বে যে, তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্‌) তা নয়। তিনি তোমার কাছে এসে কথা কবেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো, সব হয়ে যাবে। আর একটী কথা ;—তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস হয়, তাই বিশ্বাস দৃঢ় করে করো। কিন্তু মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বোলো না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। বলো 'আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আরো কত কি হতে পারেন তিনি জানেন, আমি জানি না ; বুঝ্‌তে পারি না।' মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায় ? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে ? তিনি যদি কৃপা করে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তাহলে বুঝা যায় ; নচেৎ নয়।

(কালী ও ব্রহ্মে কখন অভেদ)

যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। অভেদ।

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।

সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বোঝনারে মন ঠারে ঠোরে।"

'আমি তত্ত্ব করি যাঁরে' অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মকে তত্ত্ব কর্‌ছি। তাঁরেই মা মা বলে ডাক্‌ছি। আবার রামপ্রসাদ ঐ কথাই বল্‌ছে,—

"আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।"

"অধর্ম্ম কিনা অসৎ কর্ম্ম। ধর্ম্ম কিনা বৈধী ধর্ম্ম—এতো দান কর্‌তে হবে, এতো ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব ধর্ম্ম।"

বিজয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ কর্‌লে কি বাকী থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুদ্ধা ভক্তি। আমি মাকে বলেছিলাম, মা, এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। দেখ, আমি জ্ঞান পর্য্যন্ত চাই নাই। আমি লোকমান্যও চাই নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়লে শুদ্ধাভক্তি—অমলা, নিষ্কাম, অহৈতুকী ভক্তি—বাকী থাকে।

(ব্রাহ্মসমাজ ও আদ্যাশক্তি।)

ব্রাহ্মভক্ত। তিনি আর তাঁর শক্তি কি তফাৎ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ। যেমন মণির জ্যোতি আর মণি অভেদ। মণির জ্যোতি ভাব্‌লেই মণি ভাব্‌তে হয়। দুধ আর দুধের ধবলত্ব যেমন অভেদ। একটাকে ভাব্‌লেই আর একটাকে ভাব্‌তে হয়। কিন্তু এ অভেদজ্ঞান পূর্ণ জ্ঞান না হলে হয় না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চলে যেতে হয়—অহংতত্ত্বও থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না। নেমে এসে একটু আভাসের মত বলা যায়। যখন সমাধি ভঙ্গের পর 'ওঁ ওঁ' বলি, তখন আমি একশো-হাত নেমে এসেছি। ব্রহ্ম বেদ বিধির পার, মুখে বলা যায় না। সেখানে 'আমি' নাই।

"যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ আমি প্রার্থনা কি ধ্যান কর্‌ছি, এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ 'তুমি' (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুন্‌চো, এ জ্ঞানও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ আছে। তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ, তুমি মা, আমি ছেলে, এ বোধ থাক্‌বে। এই ভেদ-বোধ, আমি একটী, তুমি একটী। এ ভেদবোধ তিনিই করাচ্চেন। তাই পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার, এই সব ভেদবোধ হচ্চে। যতক্ষণ এই ভেদবোধ, ততক্ষণ শক্তি (Personal God) মান্‌তে হবে। তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রেখে

দিয়েছেন, হাজার বিচার কর, 'আমি' আর যায় না। আর তিনি তখন ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন।

"তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে, যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বল্‌বার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মান্‌তে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি বলে গেছে।

[ব্রাহ্মসমাজ ও বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম।]

বিজয়। এই আদ্যাশক্তি দর্শন আর ঐ ব্রহ্মজ্ঞান কি উপায়ে হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো। আর কাঁদো। এই রূপে চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে। তখন নির্ম্মল জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখ্‌তে পাবে। ভক্তের আমিরূপ আর্সীতে সেই সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তিকে দর্শন কর্‌বে। কিন্তু আগে আর্সী খুব পোঁছা চাই। ময়লা থাক্‌লে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়্‌বে না।

"যতক্ষণ 'আমি' জলে সূর্য্যকে দেখ্‌তে হয়, আর সূর্য্যকে দেখ্‌বার কোন্‌-রূপ উপায় হয় না, আর যতক্ষণ প্রতিবিম্বসূর্য্য বই সত্যসূর্য্যকে দেখ্‌বার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যই ষোল আনা সত্য। যতক্ষণ আমি সত্য, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যও সত্য—ষোল আনা সত্য। সেই প্রতিবিম্ব সূর্য্যই আদ্যাশক্তি।

'ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও—সেই প্রতিবিম্ব ধরে সত্যসূর্য্যের দিকে যাও। সেই সগুণ ব্রহ্ম যিনি প্রার্থনা শুনেন, তাঁরেই বল, তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন। কেন না, যিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনিই শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ।

"মা ব্রহ্মজ্ঞানও দেন। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। আর জ্ঞানযোগ বড় কঠিন পথ! ব্রাহ্মসমাজের তোমরা জ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। যারা জ্ঞানী, তাদের বিশ্বাস যে, ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ। আমি তুমি সব স্বপ্নবৎ।

(ব্রাহ্মসমাজ ও বিদ্বেষভাব)

"তিনি অন্তর্য্যামী। তাঁকে সরল মনে, শুদ্ধ মনে প্রার্থনা কর। তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন। অহংকার ত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হও, সব পাবে।

'আপনাতে আপনি থেকো মন, যেওনাকো কার ঘরে;
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।

পরমধন ঐ পরশ মণি, যা চাবি তা দিতে পারে ;
কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

"যখন বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশ্‌বে, তখন সকলকে ভাল বাস্‌বে ; মিশে যেন এক হয়ে যাবে—বিদ্বেষ ভাব আর রাখ্‌বে না। ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না ; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না ; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রীষ্টান, এই বোলে নাক সিঁটকে ঘৃণা কোরো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জান্‌বে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে যতদূর পার। আর ভালবাস্‌বে। তার পর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দভোগ কর্‌বে। 'জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।' নিজের ঘরে স্ব স্বরূপকে দেখ্‌তে পাবে।

"রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, তখন গরু সব মাঠে গিয়ে এক হয়ে যায়। এক পালের গরু। আবার যখন সন্ধ্যার সময় নিজের নিজের ঘরে যায়, তখন আবার পৃথক্ হয়ে যায়। নিজের ঘরে 'আপনাতে আপনি থাকে।'

(সন্ন্যাস ও সঞ্চয়, অর্থের সদ্ব্যবহার)

রাত্রি দশটার পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিলেন। সঙ্গে দুই একজন সেবক ভক্ত। গভীর অন্ধকার, গাছতলায় গাড়ী দাঁড়িয়ে। শ্রীযুক্ত বেণীপাল রামলালের * জন্য লুচি মিষ্টান্নাদি লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিলেন।

বেণীপাল। মহাশয়, রামলাল আস্‌তে পারেন নাই, তাঁর জন্য কিছু খাবার এঁদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুমতি করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া) ও বাবু বেণীপাল! তুমি আমার সঙ্গে ও সব দিও না। ওতে আমার দোষ হয়। আমার সঙ্গে কোন জিনিস সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে নাই। তুমি কিছু মনে করবে না।

বেণীপাল। যে আজ্ঞা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ খুব আনন্দ হলো। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ! যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়ে মানুষ নয়। মানুষের আকৃতি কিন্তু পশুর ব্যবহার। ধন্য তুমি! এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে।

* রামলাল—ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীমন্দিরের পূজারী।

সমালোচনা।

রাজর্ষিকুমার। শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার প্রণীত। মূল্য আট আনা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য। ধ্রুবোপাখ্যান অবলম্বনে বিচরিত একখানি ক্ষুদ্র কাব্য। ধ্রুবোপাখ্যান কোন কালে হিন্দুর নিকট পুরাতন হইবার নয়। আমরা ইহা এক্ষণে আধুনিক কবিতার আকারে পাইয়া—পরম আনন্দিত হইলাম। ইহাতে অঙ্কিত চিত্রগুলি অতি মনোরম হইয়াছে। পাঠক ইহা পাঠ করিয়া যেমন সুন্দর কাব্যরস আস্বাদন করিবেন, তেমনই উচ্চধর্ম্মভাবে বিভোর হইবেন। আমরা একস্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ধ্রুব আনন্দময়ের উপলব্ধি করিয়া আনন্দের গান গাহিতেছেন,—

"আহা কি মধুর আনন্দ অপার,
শান্তির হিল্লোল প্রাণের মাঝার!
আমি নাই,—শুধু আনন্দ কেবল,—
অনন্ত আনন্দ গভীর অচল!
আনন্দে পূরিত নক্ষত্রের পুরী,
ধরাতলে বহে আনন্দ লহরী।
নাহি দিক্‌দেশ—নাহি কালক্ষণ,
চিন্ময় আনন্দ জ্যোতি অতুলন।
পূর্ণানন্দ-পূর্ণ অনন্ত অম্বর,
পূর্ণানন্দ-পূর্ণ বিশ্বচরাচর।
অনন্ত আনন্দ রাশির মাঝার,
কেন্দ্রভূত এক ক্ষুদ্র অহঙ্কার।
ক্ষণে ক্ষণে কেন্দ্র হয়ে যায় হারা,
কেবল আনন্দ আপনা-পাশরা।
স্থির ধীর সেই আনন্দের রাশি!
স্থির সুধাময় এক পূর্ণ হাসি।
পূরিয়ে অন্তর পূরিয়ে বাহির,
এক অদ্বিতীয় অচল গভীর,—
অনন্তের অন্ত, অসীমের সীমা
মিলায়ে, সেথায় অপূর্ব্ব মহিমা!

ব্রহ্মাণ্ড পূরিত হাসিময় প্রাণ,
জাগ্রত প্রহরী মহাজ্যোতিষ্মান্!
চন্দ্র সূর্য্য তারা পাখী ফুল অলি,
এক প্রাণ সূত্রে গ্রথিত সকলি!
আনন্দ আনন্দ আনন্দ কেবল,
হাসির পাথার অনন্ত অচল!
নাহি জন্ম জরা নাহিক মরণ,
বিশ্ব পরিপূর্ণ এক সনাতন!
মহাকেন্দ্র এক অসীম শকতি,
অসীম জগৎ তাহার বিভূতি।
মহাকেন্দ্রভূত মহাবীজ সেই,
অনন্ত জগতে বিকশিত যেই।
সেই কেন্দ্রে লীন অনন্ত জগত,
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম মহতে মহত।
যেই মহাবীজে অনন্তের লয়,
তাহাতে আবার অনন্ত উদয়!
জয় জয় জয় ব্রহ্ম শকতির,
জয় জয় জয় অনন্ত শান্তির,
জয় জয় জয় অনন্ত জ্ঞানের,
জয় জয় জয় অনন্ত প্রাণের।"

প্রেরিত পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উদ্বোধন সম্পাদক মহাশয়েষু—

মহাশয়, বিগত ২৭শে ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে ঢাকাস্থ "রামকৃষ্ণমিশন" গৃহে আসনোপরি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক রামকৃষ্ণ পুঁথি হইতে ঠাকুরের স্তোত্র ও জন্মকথা পাঠ করা হয়। তৎপর হরিসংকীর্ত্তন ও কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত মণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নিং রামকৃষ্ণমিশনের সভ্যগণ, ঢাকা।

বিজ্ঞাপন।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় জ্যৈষ্ঠ মাসের উদ্বোধন বন্ধ রহিল। পর সংখ্যা আষাঢ়ে বাহির হইবে।

তাৎপর্য্যার্থ এই যে, 'অনেকাল্ শিৎ সর্ব্বস্য' সূত্র ষষ্ঠী বিভক্তির অধিকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে ষষ্ঠীবোধক 'অলোহন্ত্যস্য', 'ইকোগুণবৃদ্ধী' 'অনেকাল্ শিৎ সর্ব্বস্য' এই যাবতীয় সূত্র একত্র মিলিত হইয়া যদি 'ইগন্ত অঙ্গের' বিধান করে; তবে ষষ্ঠীই অবশিষ্ট কোথায় থাকিবে যে, গুণ বা সর্ব্বাদেশ প্রাপ্তি হইবে? অতএব এইপ্রকারে, এই দোষসমূহও প্রাপ্তি হইবে না।

তাহাতেই বা কি হইল, পূর্ব্বের সহিত আপেক্ষিক এই দোষ বলিব। 'সর্ব্বাদেশপ্রসঙ্গশ্চানিগন্তস্য' এই বার্ত্তিকে যে, 'চ'কার পাঠ করা হইয়াছে, তাহা 'হি' শব্দের অর্থে। সুতরাং এক্ষণে এইরূপ অর্থ হইবে যে, মিদি, মৃজি, পুগন্ত, লঘুপধ, ঋচ্ছি, দৃশি, ক্ষিপ্র, এবং ক্ষুদ্র প্রভৃতি স্থলে;—'হি' অর্থাৎ যেহেতু ইগন্তাঙ্গ নাই, সেইহেতু অনিগন্তাঙ্গেরই সর্ব্বাদেশ প্রসঙ্গ হইবার সম্ভাবনা; এইজন্য 'ইক্' প্রত্যাহারের গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন,— 'মিদের্গুণঃ' এইস্থলে, 'মিদ্' ধাতুর অন্তে, 'ইক্' না থাকাতে, আর গুণাদেশ ইকের হয় বলিয়া, অন্ত্য 'দ'কারের গুণ হইবে না। আবার, 'অলোহন্ত্যস্য' সূত্রে অন্ত্যবর্ণের গুণ হয় বলিয়া, 'মিদ্' ধাতুর অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্বে 'ইক্' থাকাতে 'ই'কারেরও গুণ হইবে না। অথচ 'মিদের্গুণঃ' সূত্রে গুণের কথাও বলা হইয়াছে; সুতরাং তাহারও প্রাপ্তি হওয়া চাই; অতএব সর্ব্বাদেশ অর্থাৎ 'মিদ্' এই সমুদায় বর্ণের গুণপ্রাপ্তি হইবে। কেবল এইস্থলেই নহে, 'মৃজ'ধাতু প্রভৃতি যাবতীয় স্থলে, এইরূপ দোষ হইবে।

ভাষ্যমূল।—অস্তু তর্হি তদপবাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে তদপবাদ পক্ষই হউক।

বার্ত্তিকমূল।—ইগু মাত্রস্যেতি চেজ্জুসি সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকহ্রস্বাদ্যোর্গুণেষ্বনন্ত্যপ্রতিষেধঃ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—গুণ বা বৃদ্ধি কার্য্য যদি 'ইক্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ মাত্রেরই হয়; তবে, 'জুস্' প্রত্যয় পরে থাকিলে, সার্ব্বধাতুক ও আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে, হ্রস্বাদির গুণপ্রাপ্তি হইলে, সেই সকল অন্ত্য ইকেরই কেবল না হয়, এইরূপ বলিতে হইবে। *

ভাষ্যমূল।—ইগু মাত্রস্যেতি চেজ্জুসি সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকহ্রস্বাদ্যোর্গুণেষ্বনন্ত্যপ্রতিষেধো বক্তব্যঃ। জুসি গুণঃ। স যথেহ ভবতি। অজুহবুঃ। অবিভয়ুরিতি। এবমনেনিজুঃ পর্য্যবেবিষুঃ। অত্রাপি প্রাপ্নোতি।

সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োর্গুণঃ। স যথেহ ভবতি কর্ত্তা হর্ত্তা নয়তি তরতি ভবতি। এবমীহিতা ঈহিতুং ঈহিতব্যমিত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

হ্রস্বস্য গুণঃ। স যথেহ ভবতি হে অগ্নে হে বায়ো ইতি। এবং হে অগ্নিচিৎ। হে সোমসুৎ। ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

জসি গুণঃ। স যথেহ ভবতি অগ্নয়ো বায়ব ইতি। এবং অগ্নিচিতঃ সোমসুতঃ ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

ঋতোঙি সর্ব্বনামস্থানয়োর্গুণঃ। স যথেহ ভবতি কর্ত্তরি কর্ত্তারৌ কর্ত্তার ইতি। এবং সুকৃতি সুকৃতৌ সুকৃত ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

ঘের্ঙিতি গুণঃ। স যথেহ ভবতি। অগ্নয়ে বায়বে ইতি। এবং অগ্নিচিতে সোমসুতে ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

ওর্গুণঃ। স যথেহ ভবতি বাভ্রব্যোমাণ্ডব্য ইতি। এবং সুশ্রুৎ সৌশ্রুত ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

নৈষ দোষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—ইও্ মাত্র অর্থাৎ 'বৃদ্ধি' বা 'গুণ' আদেশ করিতে যদি যাবতীয় 'ইক্' বর্ণেরই গ্রহণ হয়; তবে, জুস্ প্রত্যয় বা সার্ব্বধাতুক আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে, অথবা হ্রস্বাদির গুণ কর্ত্তব্য হইলে, তাহা অন্ত্য ইক্ বর্ণের না হয়; এইরূপ প্রতিষেধ করিতে হইবে।

জুসি চ।৭।৩।৮৩। (অচ্ আদিতে আছে যার, এমন জুস্ প্রত্যয় পরে থাকিলে, ইক্ অন্ত বিশিষ্ট অঙ্গের গুণ হয়) এই সূত্রানুসারে, 'জুস্' প্রত্যয় পরে থাকিলে; যেমন,—'অজুহবুঃ' 'অবিভয়ুঃ' (১) প্রভৃতি স্থলে গুণ হইয়া থাকে; সেইরূপ—'অনেনিজুঃ' 'পর্য্যবেবিষুঃ' (২) এই সকল স্থলেও গুণপ্রাপ্তি হইবে।

সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ।৭।৩।৮৪। (সার্ব্বধাতুক এবং আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে, ইক্ অন্তবিশিষ্ট অঙ্গের গুণ হয়) এইসূত্রানুসারে, যেমন,—'কর্ত্তা' 'হর্ত্তা' 'নয়তি' 'তরতি' 'ভবতি' (৩) প্রভৃতি স্থলে গুণ হইয়া থাকে;

(১) 'হু'দানাদানয়োঃ। 'হু'ধাতুর লিঙে, 'ঝি'র জুসে, অজুহবুঃ। 'ঞিভী'ভয়ে 'ঞিভী'ধাতুর জুসে প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

(২) নিজির্ পোষণে। নিজ্ ধাতু লিঙ্ এর জুস। অনেনিজুঃ। 'বিষ্‌ল'ব্যাপ্তৌ ধাতু। লিঙের জুস 'পর্য্যবেবিষুঃ'।

(৩) কৃ, হৃ, নী, তৃ এবং ভূ ধাতুর স্থানে যথাক্রমে গুণ হইয়া কর্ত্তা ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়াছে।

তেমন 'ঈহিতা' 'ঈহিতুম্' 'ঈহিতব্যম্' (১) এই সকল স্থলেও গুণপ্রাপ্তি হইবে।

হ্রস্বস্য গুণঃ।৭।৩।১০৮। (হ্রস্বের গুণ হয়, সম্বোধনে) এই সূত্রানুসারে, যেমন,—'হে 'অগ্নে', 'হে বায়ো' প্রভৃতি স্থলে, গুণ হইয়া থাকে; সেরূপ,—'হে অগ্নিচিৎ' 'হে সোমসুৎ' এইসকল স্থলেও গুণপ্রাপ্ত হইবে।

জসি চ।৭।৩।১০৯। (হ্রস্বান্ত যে অঙ্গ, তাহার গুণ হয়, 'জস্' বিভক্তি পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, যেমন,—'অগ্নয়ঃ' 'বায়বঃ' এই সকল স্থলে গুণ হইয়া থাকে; সেরূপ,—'অগ্নিচিতঃ' 'সোমসুতঃ' এই সকল স্থলেও গুণ প্রাপ্তি হইবে।

ঋতোঙি সর্ব্বনামস্থানয়োঃ।৭।৩।১১০। (ঙি বিভক্তি এবং সর্ব্বনামস্থান-সংজ্ঞক বিভক্তি অর্থাৎ সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্, প্রভৃতি বিভক্তি পরে থাকিলে, ঋদন্তাঙ্গের গুণ হয়) এইসূত্রানুসারে; যেমন,—'কর্ত্তরি' 'কর্ত্তারৌ' 'কর্ত্তারঃ' ইত্যাদি স্থলে গুণ হয়; সেরূপ,—'সুকৃতি' 'সুকৃতৌ' 'সুকৃতঃ' প্রভৃতি স্থলেও গুণ প্রাপ্ত হইবে।

ঘের্ঙিতি।৭।৩।১১১। (ঘিসংজ্ঞা বিশিষ্ট যে শব্দ, তাহার উত্তর ঙিৎ অর্থাৎ ঙ কার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় এবং সুপ্ বিভক্তি পরে থাকিলে, 'গুণ' হয়;) এইসূত্রানুসারে, যেমন,—অগ্নয়ে, বায়বে, প্রভৃতি স্থলে গুণ হয়; সেরূপ,—'অগ্নিচিতে' প্রভৃতি স্থলেও 'গুণ' প্রাপ্ত হইবে।

ওর্গুণঃ।৬।৪।১৪৬। (উবর্ণান্তবিশিষ্ট 'ভ' সংজ্ঞক শব্দের গুণ হয়, তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, যেমন,—'বাভ্রব্য' 'মাণ্ডব্য' প্রভৃতি স্থলে 'উ'কারের গুণ হইয়া থাকে; সেরূপ 'সুশ্রুৎ' শব্দের উত্তরও (তদ্ধিত বিহিত 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া) সৌশ্রুত হইলে, 'শ্রু'র 'উ'কারের 'গুণ' প্রাপ্ত হইবে।

এই সকল দোষ প্রাপ্ত হইবে না।

বার্ত্তিকমূল।—পুগন্তলঘূপধগ্রহণমনন্ত্যনিয়মার্থম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—পুক্ অন্ত এবং লঘু উপধা গ্রহণ, অনন্ত্যের নিয়মের জন্য। *।

ভাষ্যমূল।—পুগন্তলঘূপধগ্রহণমনন্ত্যনিয়মার্থং ভবিষ্যতি। পুগন্তলঘূপ-

(১) 'ঈহ' ধাতুর উত্তর শতৃ, তুমন্ এবং তব্য প্রত্যয় করিয়া যথাক্রমে ঈহিতা ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়াছে।

ধন্তৈবানন্ত্যস্য নান্যস্যানন্ত্যস্যেতি। প্রকৃতস্যৈব নিয়মঃ স্যাৎ। কিং চ প্রকৃতম্। সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োরিতি। তেন ভবেদিহ নিয়মান্ন স্যাৎ ঈহিতা ঈহিতুম্ ঈহিতব্যমিতি। হ্রস্বান্ত্যোর্গুণস্তু নিয়তঃ সোঽনন্ত্যস্যাপি প্রাপ্নোতি। অথাপ্যেবং নিয়মঃ স্যাৎ। পুগন্তলঘূপধস্য সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োরেবেতি।

এবমপি সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োর্গুণোঽনিয়তঃ সোঽনন্ত্যস্যাপি প্রাপ্নোতি। ঈহিতা ঈহিতুম্ ঈহিতব্যমিতি। অথাপ্যুভয়তো নিয়মঃ স্যাৎ। পুগন্তলঘূপধস্যৈব সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োরেব পুগন্তলঘূপধস্যেতি। এবমপ্যয়ং জুসি গুণোঽনিয়তঃ সোঽনন্ত্যস্যাপি প্রাপ্নোতি। অনেনিজুঃ পর্য্যবেবিষুরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'পুগন্তলঘূপধস্য চ'(১) এই সূত্রে, লঘু উপধা গ্রহণ,—অন্ত্য 'ইক্'এর গুণ না হয়, এই নিয়ম করিবার জন্য জানিতে হইবে। অর্থাৎ যদি কোনও স্থানে অন্ত্য 'ইক্' ভিন্ন অন্য 'ইক্'এর গুণ হয়; তবে কেবলমাত্র তাহা, লঘু উপধাবিশিষ্ট 'ইক্'এরই হইবে; এতদ্ভিন্ন (লঘুউপধা ভিন্ন) অন্য কোনও অন্ত্যরহিত 'ইক্'এর গুণ হইবে না।

প্রকরণবশতঃ পূর্ব্বাপর সকল 'ইক্'এরই গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা (পুগন্তলঘূপধস্য চ) তাহাতে (প্রকরণপ্রাপ্তবিষয়ে) নিয়ম করিল।

সেই প্রকরণটি কি?

সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ(২) এই সূত্রানুসারে যাবতীয় ইগন্ত অঙ্গমাত্রেরই গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই হেতু এই 'পুগন্ত' ও 'লঘু উপধার' জন্য নিয়ম করাতে, 'ঈহিতা, ঈহিতুম্, ঈহিতব্যম্' এই সকল স্থলে, 'ঈহ্' ধাতুর 'ঈ'কার উপধাভূত হইলেও লঘু না হইয়া গুরু হওয়াতে (৩) গুণ প্রাপ্তি হইল না; সুতরাং প্রয়োগসমূহও সিদ্ধ হইল।

ঐ সকল প্রয়োগ সিদ্ধ হইলেও, (হে অগ্নে, হে বায়ো, অগ্নয়ঃ, বায়বঃ ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া) 'হে অগ্নিচিৎ', 'হে সোমসুৎ,' ইত্যাদির যে উল্লেখ

(১) এই সূত্রের এক প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; প্রকারান্তরে করা হইবে।

(২) অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

(৩) দীর্ঘের গুরু সংজ্ঞা হয়; এবং সংযুক্তবর্ণ পরে থাকিলে হ্রস্বেরও গুরুসংজ্ঞা হয়।

করা হইয়াছে, সে সকল স্থলে, হ্রস্ব স্বর সমূহের গুণের ত কোন নিয়ম করা হয় নাই ; সুতরাং সেই স্থলে ত অনন্ত্য বর্ণেরও গুণ প্রাপ্তি হইবে ?

এই দোষ নিবারণ জন্য এইস্থলে, এইরূপ নিয়ম করা হইবে যে,—পুগন্ত-লঘূপধস্য সূত্রানুসারে·যদি কোথাও লঘু উপধার গুণ হয় ; তবে 'সার্বধাতুক' এবং 'আর্ধধাতুক' পরে থাকিলেই হয় ; সুতরাং 'অগ্নিচিৎ' 'সোমসুৎ' প্রভৃতি স্থলে, সার্বধাতুক বা আর্ধধাতুক পরে নাই বলিয়া লঘু উপধারও গুণ হইবে না।

এইরূপ লঘু উপধার নিয়ম করিলেও কিন্তু সার্বধাতুক বা আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, যে পূর্ব্বেরই গুণ হইবে, কি মধ্যেরই হইবে, কি পরেরই হইবে, তাহার কোন নিয়ম করা হয় নাই, সুতরাং তাহা অন্ত্য ভিন্ন অন্য বর্ণেরও 'গুণ' প্রাপ্তি হইবে ? অতএব 'ঈহিতা', 'ঈহিতুম্', 'ঈহিতবাম্' ইত্যাদি স্থলেও 'ঈ'কারের গুণ হইতে থাকিবে ?

এইরূপ দোষ হইলে তদ্দোষ নিবারণ জন্য, অনন্তর উভয় পক্ষেই নিয়ম করা হইবে ;—'পুগন্ত' এবং 'লঘু উপধার' যদি গুণ হয় ; তবে 'সার্বধাতুক' এবং 'আর্ধধাতুক' পরে থাকিলেই হইবে। আর 'সার্বধাতুক' এবং 'আর্ধ-ধাতুক' পরে থাকিলে, যদি গুণ হয় ; তবে 'পুগন্ত' এবং 'লঘু উপধার'ই হইবে।

এইরূপ নিয়ম করিলে, অন্যত্র বারণ হইলেও 'জুসি চ', এই সূত্রানুসারে, যেখানে 'জুস্' প্রত্যয় পরে থাকিলে, গুণ প্রাপ্তি হয়; সেখানে কোন নিয়ম করা হয় নাই বলিয়া, অন্ত্য হয় নাই এমন যে 'ইক্', তাহারও গুণ প্রাপ্তি হইবে। যেমন,—'অনেনিজুঃ' 'পর্য্যবেবিষুঃ' ইত্যাদি।

ভাষ্যমূল।—এবং তর্হি নায়ং তচ্ছেষঃ নায়ং তদপবাদঃ। অন্যদেবেদং পরিভাষান্তরমসম্বন্ধমনয়া পরিভাষয়া। পরিভাষান্তরমিতি চ মত্বা ক্রোষ্ট্রীয়াঃ পঠন্তি। নিয়মাদিকো গুণবৃদ্ধী ভবতো বিপ্রতিষেধেনেতি। যদি চায়ং তচ্ছেষঃ স্যাত্তেনৈব তস্যাযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। অথাপি তদপবাদঃ। উৎসর্গা-পবাদয়োরপ্যযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। তত্র নিয়মস্যাবকাশঃ। রাজ্ঞঃ ক চ। রাজকীয়ম্। ইকোগুণবৃদ্ধী ইত্যস্যাবকাশঃ। চয়নং চায়কো লবনং লাবক ইতি। ইহোভয়ং প্রাপ্নোতি মেদ্যতি মার্ষ্টীতি। ইকোগুণবৃদ্ধী ইত্যেতদ্ভবতি বিপ্রতিষেধেন।

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ হইলে, তবে বলিব যে, ইহা না 'তচ্ছেষ' না 'তদপবাদ' ; ইহা একটী অন্য পরিভাষান্তর ; ইহার সহিত কাহারও সম্বন্ধ

নাই। আর ইহা একটী পরিভাষান্তর, এই মনে করিয়াই ক্রোষ্ট্রীয় ঋষিগণ পাঠ করিয়া থাকেন যে;—বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ তুল্যবল বিরোধ হেতু নিয়ম অর্থাৎ 'অলোহন্ত্য' সূত্র দ্বারা অন্ত বর্ণের যে নিয়ম করা হইয়াছে, তদপেক্ষা 'ইকোগুণবৃদ্ধী' বিধানপর বলিয়া গুণ বা বৃদ্ধিই হইবে।

যদি ইহা 'তচ্ছেষ' অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণের আদেশ হইত; তবে 'বিপ্রতিষেধ' বলাই অসঙ্গত হইত। আর যদি 'তদপবাদ' অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণ বিধির বাধক হইত; তবে, উৎসর্গ (সাধারণ বিধি) এবং অপবাদ (বিশেষ বিধি) ইহাদের বিপ্রতিষেধও অসঙ্গত।

তত্র অর্থাৎ অন্যত্র নিয়মের (অলোহন্ত্যবিধির) অবকাশ রহিয়াছে; যেমন;—রাজ্ঞঃ ক চ ৪।২।১৪০। (বৃদ্ধ সংজ্ঞা প্রযুক্ত 'ছ'প্রত্যয় সিদ্ধ হইলে, তাহার সহিত সংযোগে, মাত্র 'ক'কার আদেশ বিধান হইয়া থাকে) এই সূত্রানুসারে, 'রাজন্' শব্দের অন্তস্থিত নকার স্থানে 'ক'কার হইয়া যাইবে; সুতরাং 'রাজকীয়ম্' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

আর 'ইকোগুণবৃদ্ধী' এই সূত্রের অবকাশ চিঞ্ চয়নে, ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্'প্রত্যয় করিলে 'চয়ন' আর 'ণক', প্রত্যয় করিলে 'চায়ক', এইরূপ পূঞ্ পবনে ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিলে 'পবন' এবং 'ণক' প্রত্যয় করিলে 'পাবক' হইবে) চয়নং ('চি'ধাতুর 'ই'কারের গুণ করিয়া), চায়কং ('চি' ধাতুর 'ই'কারের বৃদ্ধি করিয়া), পবনং ('পূ' ধাতুর ঊর গুণে), পাবকঃ (ঊকারের বৃদ্ধিতে), ইত্যাদি স্থলে হইবে। কিন্তু 'মেদ্যতি' এবং 'মাষ্টি' ইত্যাদি স্থলে উভয় অর্থাৎ 'অলোহন্ত্য' এবং 'ইকো গুণবৃদ্ধী' প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং এইস্থলেই তুল্যবল বিরোধ হওয়াতে, পরকার্য্য 'ইকোগুণবৃদ্ধী' হইবে।

ভাষ্যমূল।—নৈষযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। বিপ্রতিষেধে পরমিত্যুচ্যতে। পূর্ব্বশ্চায়ং যোগঃ পরো নিয়মঃ।

ইষ্টবাচী পরশব্দঃ। বিপ্রতিষেধে পরং যদিষ্টং তদ্ভবতীতি। এবমপ্যযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। দ্বিকার্য্যযোগো হি বিপ্রতিষেধঃ। ন চাত্রৈকো দ্বিকার্য্যযুক্তঃ। নাবশ্যং দ্বিকার্য্যযোগ এব বিপ্রতিষেধঃ। কিং তর্হ্যসম্ভবোপি। স চাস্ত্যত্রাসম্ভবঃ।

কোহসাবসম্ভবঃ। ইহ তাবন্মৃক্ষেভ্যঃ প্লক্ষেভ্য ইতি। একঃ স্থানী দ্বাবাদেশৌ ন চাস্তি সম্ভবঃ। যদেকস্য স্থানিনো দ্বাবাদেশৌ স্যাতাম্। ইহেদানীং মেদ্যতি মেদ্যতঃ মেদ্যন্তি ইতি। দ্বৌ স্থানিনৌ এক আদেশঃ।

ন চাপি সংভবঃ। দ্বয়োঃ স্থানিনোরেক আদেশঃ স্যাদিত্যেষোঽসম্ভবঃ। সত্যেতস্মিন্নসম্ভবে যুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। এবমপ্যযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। দ্বয়োর্হি সাবকাশয়োঃ সমবস্থিতয়োর্বিপ্রতিষেধো ভবতি। অনবকাশশ্চায়ং যোগঃ। ননু চ ইদানীমেবাস্যাবকাশঃ প্রকৢপ্তঃ। চয়নং চায়কো লবনং লাবক ইতি। অত্রাপি নিয়মঃ প্রাপ্নোতি। নাপ্রাপ্তে নিয়মেঽয়ং যোগ আরভ্যতে। যাবতা চ নাপ্রাপ্তে নিয়মেঽয়ং যোগ আরভ্যতে ততস্তস্যাপবাদোঽয়ং যোগো ভবতি। উৎসর্গাপবাদয়োশ্চাযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এইস্থলে বিপ্রতিষেধ কথনও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্ ।১।৪।২।' (তুল্যবলবিরোধে পরকার্য্য হইয়া থাকে) এইসূত্রে, 'বিপ্রতিষেধে পরং' এইরূপ বলা হইয়াছে। আর এখানে এই যোগ অর্থাৎ 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্র পূর্ব্বে করা হইয়াছে, কিন্তু নিয়ম অর্থাৎ 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্র পরে করা হইয়াছে। অতএব, 'ইকোগুণবৃদ্ধী' কার্য্য পূর্ব্বে হইতে পারে না।

এইস্থলে দোষ হইবে না; কারণ, 'পর'শব্দ ইষ্টার্থবাচক বলিব, তাহা হইলেই 'বিপ্রতিষেধে পরং' এই বাক্যদ্বারা, যাহা অভীষ্ট, তাহাই হইবে।

এইরূপ করিলেও 'বিপ্রতিষেধ' বলা অসঙ্গত। যে হেতু দুইটী কার্য্য একত্র সংযোগ হইলেই 'বিপ্রতিষেধ' হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে ত একস্থানে দুই কার্য্যের সংযোগ হয় নাই ?

অবশ্য কেবল মাত্র একস্থলে দুই কার্য্যের সংযোগ হইলেই বিপ্রতিষেধ হয় না।

তবে কি ?

অসম্ভব হইলেও বিপ্রতিষেধ হয়। সেই অসম্ভবই এইস্থলে হইয়াছে।

এই অসম্ভবের দৃষ্টান্ত কোথায় ?

'বৃক্ষেভ্যঃ' 'প্লক্ষেভ্যঃ' প্রভৃতি এই সকল স্থলে,'স্থানী' এক (১) অথচ আদেশ দুইটী; সুতরাং ইহা কথনও সম্ভব হইতে পারে না।

---

(১) সুপি চ ।৭।৩।১০২ (যঞ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ আদিবিশিষ্ট সুপ্ পরে থাকিলে, অকারান্ত অঙ্গের দীর্ঘ হয়) এইসূত্রানুসারে, 'বৃক্ষ'শব্দের অন্ত্য 'অ'কারের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ছিল। আর 'বহুবচনে ঝল্যেৎ ।৭।৩।১০৩।' (বহুবচনস্থিত 'ঝল্'প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ আদি বিশিষ্ট 'সুপ্'বিভক্তিস্থিত শব্দ পরে থাকিলে, অকারান্ত অঙ্গের স্থানে একার হয়) এইসূত্রানুসারে, 'বৃক্ষ' শব্দের

যদি একটী স্থানীর দুই আদেশই প্রাপ্তি হয়; তবে সংপ্রতি 'মেদ্যতি' 'মেদ্যতঃ' 'মেদন্তি' (১) এই সকল স্থলে, দুই স্থানীরও এক আদেশ প্রাপ্তি হউক!

ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। দুই স্থানীর যে এক আদেশ হয়; ইহা একান্তই অসম্ভব। অতএব এরূপ অসম্ভব হইলে বিপ্রতিষেধ হওয়া সঙ্গতই হইবে।

এরূপ করিলেও বিপ্রতিষেধ অসঙ্গত হইবে। কারণ দুইটী সূত্রের অন্যান্য স্থানে প্রাপ্তির অবকাশ থাকিলে, সেই সকল স্থলে কার্য্য করিয়া, যদি আসিয়া একস্থলে প্রাপ্তি সম্ভব হয়, তবেই বিপ্রতিষেধ হইয়া থাকে; কিন্তু এই যোগ অর্থাৎ ইকো গুণবৃদ্ধী সূত্র, অন্যত্র প্রবর্ত্তিত হইতে অবকাশ পায় নাই।

যদি বল যে, এক্ষণই ইহার অবকাশ উল্লেখ করা হইল;—যেমন,—'চয়নং' 'চায়কঃ' 'লবনং' 'লাবকঃ' ইত্যাদি ?

এই সকল স্থলেও নিয়ম ('অলোঽন্ত্যস্য'সূত্র) প্রাপ্তি আছে? অর্থাৎ 'চি' ধাতু এবং 'পু'ধাতুর মধ্যে যখন দুইটী 'ইক্' বর্ণ নাই, কেবল একটী করিয়া ইকার এবং উকার রহিয়াছে, আবার সেই ইকার উকারও ধাতুর অন্তেই অবস্থান করিতেছে; তখন এখানে 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াও গুণবৃদ্ধি কার্য্য সমাধা হইয়া, 'চয়নং' 'চায়কঃ' 'লবনং' 'লাবকঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু যেখানে নিয়মের ('অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রের) প্রাপ্তি নাই, সেখানেই এইযোগ (ইকোগুণবৃদ্ধী সূত্র) আরম্ভ করা হইয়াছে।

যেহেতু, নিয়মের অলোন্ত্যসূত্রের অপ্রাপ্তিতে এই যোগ ('ইকোগুণবৃদ্ধী সূত্র') আরম্ভ করা হইয়াছে; সেইহেতু ইহা, ঐসূত্রের ('অলোন্ত্য' সূত্রের) অপবাদক। অতএব 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্র উৎসর্গ (সাধারণ বিধি) হওয়াতে,

'ভ্যস্' প্রত্যয় পরে থাকাতে 'এ'কারও প্রাপ্তি ছিল। অতএব এ স্থলে একমাত্র স্থানী 'বৃক্ষ' শব্দের 'অ'কার স্থানে 'দীর্ঘ'ত্ব এবং 'এ'ত্ব দুই আদেশ প্রাপ্তি হইয়াছিল।

(১) 'মিদ্' ধাতুর, 'ইক্'এর গুণ হয় বলিয়া 'ই'কারের গুণ; আর অন্ত্যবর্ণের গুণ হয় বলিয়া 'দ' কারের গুণ, এই উভয় কার্য্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল।

বিজ্ঞাপন :—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গত জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যাদ্বয় বন্ধ থাকার দরুন ১৫ই বৈশাখের অষ্টম সংখ্যার পর একেবারে ১লা আষাঢ়ের উদ্বোধন নবম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইল।

হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ।

শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত "বেদ" বুঝা যায়। ধর্ম্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য, যে পর্য্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্য্যন্ত।

"সত্য" দুই প্রকার। (১) যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত। (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে "বিজ্ঞান" বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে "বেদ" বলা যায়।

"বেদ" নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং যাহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন।

এই অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, তাহার নাম "বেদ"।

এই ঋষিত্ব ও বেদদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই যথার্থ ধর্ম্মানুভূতি। যতদিন ইহার উন্মেষ না হয়, ততদিন "ধর্ম্ম" কেবল "কথার কথা" ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রথম সোপানেও পদস্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে।

সমস্ত দেশ কাল পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন, অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র "বেদ"।

অলৌকিক জ্ঞানবেতৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদি দেশীয় ধর্ম্মপুস্তক সমূহে যদিও বর্ত্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্ব্ব প্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্য্যজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ "বেদ" নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোচ্চ স্থানের

অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকের প্রমাণভূমি।

আর্য্যজাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদ নামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে, তাহাই "বেদ"।

এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফল মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে বলিয়া দেশ, কাল, পাত্রাদি নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতি নীতিও এই কর্ম্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবে। লোকাচার সকলও সংশাস্ত্র এবং সদাচারের অবিসম্বাদী হইয়া গৃহীত হইবে। সংশাস্ত্রবিগর্হিত ও সদাচারবিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্ত্তী হওয়াই আর্য্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।

জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্ত ভাগই নিষ্কামকর্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়-তায় মুক্তিপ্রদ এবং মায়াপারনেতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশ, কাল, পাত্রা-দির দ্বারা অপ্রতিহত বিধায় সার্ব্বলৌকিক, সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক ধর্ম্মের এক মাত্র উপদেষ্টা।

মন্বাদি তন্ত্র কর্ম্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া দেশ কাল পাত্র ভেদে অধিক ভাবে সামাজিক কল্যাণকর কর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। পুরাণাদি তন্ত্র, বেদান্তনিহিত তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া অবতারাদির মহান্ চরিত বর্ণন মুখে ঐ সকল তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যান করিতেছেন; এবং অনন্ত ভাবময় প্রভু ভগবানের কোন কোন ভাবকে প্রধান করিয়া সেই সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট বৈরাগ্যবিহীন একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণ-বুদ্ধি আর্য্যসন্তান, এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ-শিক্ষার জন্য আপাত-প্রতি-যোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধিমানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূল-ভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্ম্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্ম্মকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্র-দায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া, যখন এই ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরক ভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—

তখন আর্য্যজাতির প্রকৃত ধর্ম্ম কি? এবং সতত বিবদমান আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা বিভক্ত সর্ব্বথা-প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন,

স্বদেশীয় ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীয় ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম্মনামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মখণ্ড সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়? এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বলৌকিক ও সার্ব্বদৈশিক স্বরূপ, স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ লোকের হিতের জন্য আপনাকে প্রদর্শন করিতে

শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনাদি বর্ত্তমান সৃষ্টি স্থিতি ও লয়কর্ত্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্তসংস্কার ঋষিহৃদয়ে আবির্ভূত হন, তাহা দেখাইবার জন্য ও এবপ্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার পুনঃ স্থাপন ও পুনঃ প্রচার হইবে, এই জন্য বেদমূর্ত্তি ভগবান এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।

বেদ অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মের এবং ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ধর্ম্মশিক্ষকত্বের রক্ষার জন্য ভগবান্ বারম্বার শরীর ধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়; পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়; প্রত্যেক পতনের পর আর্য্যসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্য্যবান হইতেছে। ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক পতনের পর পুনরুত্থিত সমাজ, অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছেন; এবং সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

বারম্বার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারম্বার ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।

কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্ত্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

এবং সেই জন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্য্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্য্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য্য, বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।

পতনাবস্থায় সনাতনধর্ম্মের সমগ্রভাবসমষ্টি অধিকারিহীনতায় ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আকারে পরিরক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

এই নবোত্থানে, নব বলে বলীয়ান মানবসন্তান, বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টীকৃত করিয়া, ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে; এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে; ইহার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ, শ্রীভগবান পরম কারুণিক, সর্ব্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্ব্বভাবসমন্বিত, সর্ব্ববিদ্যাসহায়, যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্ব্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্তভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

এই নব যুগধর্ম্ম, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান; এবং এই নবযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ পূর্ব্বগ শ্রীযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।

মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্ব্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সেরূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও।

যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্ব্বলতা ও দাসজাতি-সুলভ ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর।

আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক; এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

ক্রমাভিব্যক্তিবাদ।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকে ক্রমাভিব্যক্তিতেই (Evolution) জড় ও প্রাণিজগতের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে চাহেন। উনবিংশ শতাব্দীর

শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানবের মনে সেই ক্রমবিকাশবাদ এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জড়জগতের ক্রমোন্মেষণ যখনি জীবজগতে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, সে স্থলে আগন্তুক চৈতন্যের কারণানুসন্ধানে অপারগ হইলেও, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে সকল যুক্তিকৌশল অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় মত পোষণ করিয়াছেন, তাহা অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও গভীর গবেষণার পরিচায়ক। ঐ মতের দোষগুণ বিচারে আমাদের প্রয়োজনাভাব। এতন্মতে জীবজগতে সুখদুঃখানুভব (Feeling) অনুধ্যান (Reflection) এবং জ্ঞান (Knowledge) বিকাশের ক্রমভেদ বিচার করিয়া দেখিলে ক্রমোন্মেষণবাদী দার্শনিকগণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। ইঁহারা বলেন, সুখদুঃখানুভব মানবজীবনের প্রথম স্ফুরণাবস্থা। যদিও অন্তর্নিহিত কথঞ্চিৎ জ্ঞানের অভাবে সুখ দুঃখাদির অনুভব কল্পনার অযোগ্য হয়, তথাপি অনুভূতির প্রাবল্য দেখিয়া মানবমনের তাদৃশ প্রাথমিক স্ফুরণ অদোষ বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। মানবশিশুর যুগপৎ হাস্যক্রন্দনরূপ বিরুদ্ধ ভাবগুলিকে ইঁহারা জ্ঞানের অঙ্কুরাবস্থা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আদিম অসভ্য জাতি, যাহা মানবসমাজের শৈশবাবস্থা, তাহা আজ সুসভ্য সমাজে পরিণত। ঐ সকল অসভ্য জাতির মধ্যে ভাবপ্রবণতার প্রবল উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও অসভ্য জাতির মধ্যে সামান্য কারণেই আকস্মিক ভাবপ্রবণতা দৃষ্ট হয়। পেলগ্রেভ সাহেব বলেন, আফ্রিকার আদিমনিবাসিগণ এক পেনির জন্য হয়ত একজনকে হত্যা করিয়া পরমুহূর্ত্তেই অন্য জনকে এক পাউণ্ড দান করিয়া ফেলিবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন; অসভ্যজাতির অনুভবশক্তি এত প্রবল যে, পদচিহ্ন দেখিয়া ইহারা ব্যক্তিবিশেষকে তখনি নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে। বালক ও অসভ্যজাতি এ উভয়েই দূরকারণানুমানে নিরতিশয় অপটু। প্রত্যক্ষই ইহাদের লীলাভূমি। কিন্তু বালকের বা অসভ্য জাতির বয়োবৃদ্ধি এবং মস্তিষ্কের ক্রমোন্মেষণের সঙ্গে সঙ্গেই অনুধ্যানের (Reflection) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অনুধ্যানের সুশৃঙ্খল প্রবাহ ক্রমে জ্ঞানে (Knowledge) পরিণত হয়। সর্ব্বদেশীয় মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও (Psychologist) বলিয়া থাকেন, অনুভূতি (Feeling) হইতেই অনুধ্যান (Reflection) এবং অনুধ্যান হইতে জ্ঞান (Knowledge) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ক্রমোন্মেষণবাদী পণ্ডিতেরা যে বলিয়া থাকেন, সুখদুঃখাদ্যনুভব মানবজীবনের জ্ঞানের অঙ্কুরাবস্থা, ইহার প্রকৃত অর্থ কি? সকলেই বুঝিতে পারেন

যে, সুখদুঃখাদ্যনুভব বাহ্যবস্তুসাপেক্ষ। সুখ দুঃখাদি স্বতই উৎপন্ন হইতে পারে না। তাই প্রোক্তমতে বাহ্য বস্তুর সত্তা স্বীকার্য্য। জ্ঞাতা যখন জ্ঞেয় পদার্থ দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, তখনি সে জ্ঞেয় পদার্থের ভাবে রঞ্জিত হইয়া থাকে। বাহ্যজগৎ বা জ্ঞেয় পদার্থ কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া পড়াই জ্ঞানের অঙ্কুরাবস্থা। এ অবস্থায় মনের বহির্মুখী বৃত্তি নিরতিশয় প্রকাশ; সুতরাং বহির্জগদনুসন্ধানে সবিশেষ যত্নবতী। দৃশ্যজগৎ দ্রষ্টাকর্ত্তৃক নানাভাবে অনুভূত হইয়াই প্রত্যেক জাতির আদিমাবস্থায় বোধ হয় সুখদুঃখাদ্যনুভবদ্যোতক কাব্যযুগের অবতারণা করিয়াছিল। যেন এ যুগে দ্রষ্টা দৃশ্যপদার্থের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া ক্রীতদাসের ন্যায় তাহারই স্তব স্তুতিতে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা জ্ঞেয় বা দৃশ্য পদার্থকে ক্রমেই অধীন করিয়া ফেলে; এবং অবশেষে বাহ্যদৃশ্যকে দ্রষ্টা স্বীয় অস্তিত্বে লীন করিয়া ফেলে; তখন আর দ্বৈতভানের সম্ভাবনা কোথায়? ইহার নামই বেদান্তমতে অদ্বৈত জ্ঞান।

প্রোক্তমতের পরিপোষকরূপে প্রবীণ দার্শনিক ভট্টমোক্ষমূলর আর্য্যজাতির বেদের ক্রমবিকাশ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেদের ১ম ভাগে সেই জন্য ভাবপ্রবণ স্তব স্তুতি ও বাহ্যপদার্থ বর্ণনে অসাধারণ কবিত্বশক্তির স্ফুরণ দৃষ্ট হয়। কর্ম্মকাণ্ডে তাহা ক্রমে অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া উপনিষদ্ ভাগে তাহার প্রবল অন্তর্মুখী গতি দেখিতে পাওয়া যায়। সুখদুঃখাদ্যনুভবে যাহার প্রাথমিক বিকাশ, কর্ম্মাদিতে যাহার অনুধ্যান, নিরপেক্ষ অদ্বৈতজ্ঞানেই তাহার পর্য্যাপ্তি; ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুমত যুক্তি।

ইহা অবিতথ সত্য যে, সর্ব্ব কালে এবং সর্ব্ব দেশেই ক্রমোন্মেষিত বুদ্ধি স্বতই ঐক্যে (Unity) বা অদ্বৈততত্ত্বানুসন্ধানে ধাবমান। সেই নিরপেক্ষ ঐক্যতে মিশিবার জন্য যে সকল চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাদের নামই বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র। ইহাদের মধ্যে যে শাস্ত্রগুলি বাহ্য বা জড়পদার্থ আলোচনায় তৎপর, তাহাদের নাম প্রাকৃতবিজ্ঞান; আর যাহারা মনোবিজ্ঞান আলোচনায় তৎপর, তাহাদের নাম দর্শন শাস্ত্র। এই উভয় প্রস্থানই ক্রমে অদ্বৈততত্ত্বে অবগাহনোন্মুখ। তবে যে বিজ্ঞান বা দর্শন সেই ঐক্যতত্ত্বে যত অগ্রসর, সেই বিজ্ঞান ও দর্শন জগতে তত সমাদৃত হইয়াছে ও হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন গুলির মধ্যে যে দর্শন মানবমনের স্বাভাবিকী জ্ঞান-পিপাসার নিবৃত্তি করিয়া দিয়াছে; তাহাই অস্মদ্দেশীয় বেদান্ত শাস্ত্র। অন্যান্য

দর্শনগুলি সকলেই সেই বেদান্তবেদ্য অদ্বৈতজ্ঞানের অল্লাধিক পরিপোষক হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে য়ুরোপীয় দার্শনিক মতগুলি প্রায়ই তর্ক-প্রতিষ্ঠিত এবং অস্মদ্দেশীয় মতগুলি সরসতর্ক এবং আপ্তোপদেশ উভয়দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদিগকে ঐক্যতত্ত্বলাভে যেন সমধিক আশ্বস্ত করিয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সুখদুঃখানুভব বাহ্য বা জ্ঞেয় পদার্থের অস্তিত্ব-সাপেক্ষী। বস্তুতঃ আপাতপ্রতীয়মান বাহ্যপদার্থের অস্তিত্বে কেই বা সহসা সন্দিহান্ হইতে পারে? তাই অপ্রত্যক্ষপ্রমাণ আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, একমাত্র প্রত্যক্ষজগৎকে নিত্যজ্ঞান করিয়া চার্ব্বাকগণ কান্তালিঙ্গনাদিসুখ-সাধনকেই পরমপুরুষার্থ স্থির করিয়াছিলেন। চার্ব্বাকগণ জ্ঞানরাজ্যের নবজাত শিশু। বালকের ন্যায় সামান্য সুখদুঃখানুভব ভিন্ন অন্য কোন উচ্চ অনুষ্ঠানের শক্তি চার্ব্বাকদর্শনে স্ফুরিত হয় নাই। শিশু বা অসভ্যজাতির ন্যায় চার্ব্বাকগণের বর্ত্তমানই বিলাসভূমি। প্রত্যক্ষ হইতে সামান্যযুক্তিবলে অনুমানে যাইবারও তাহাদের সামর্থ্য জন্মে নাই। তাই চার্ব্বাকগণ প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদী। কিশোর বৌদ্ধগণ চতুর্ব্বিধ অবান্তর শাখাভেদ সত্বেও বয়সাধিক্য বশতঃ সমধিক চিন্তাশীল। তাই তাহারা অনুভূতি (Perception) হইতে অনুধ্যানে (Reflection), বা প্রত্যক্ষ হইতে অনুমানে উপস্থিত হইয়াছিল। চতুর্ব্বিধ ভাবনাদ্বারা সমস্তই ক্ষণিকজ্ঞানে বৌদ্ধগণ সর্ব্বশূন্যবাদে উপস্থিত হইয়া ঐক্যানুসন্ধিৎসা পিপাসায় একপ্রকার নিবৃত্তি করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু চিন্তাশীলগণের জ্ঞানতৃষা সেখানেও মিটে নাই। বেদবিরোধী লৌকিক যুক্তি-প্রধান শূন্যবাদ মানবানুধ্যানের পর্য্যাপ্ত পরিসীমা হইতে পারে না। কারণ, ক্ষণিক বিধায় পূর্ব্বাপর বিচার্য্য বিষয়ের অন্যোন্য সম্বন্ধ (Reciprocal association) থাকে না। এতদ্দেশীয় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন ঐক্যানুসন্ধিৎসার যুবাবস্থা। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দপ্রমাণবাদী প্রোক্তদর্শনদ্বয় অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরূপ ঐক্যতত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যুবক যেমন স্বতঃই নিজসামর্থ্যে একান্তবিশ্বাসী হইয়া পরোপদিষ্ট উপদেশ তেমন গ্রাহ্য করিতে চাহে না, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সেইরূপ প্রায়ই লৌকিক তর্কদ্বারা স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। আপ্তবাক্যের প্রমাণপরতা স্বীকার করিয়াও তাহার বেদান্তবিরোধী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন মানবানুধ্যানেরই প্রৌঢ়াবস্থা। ইহার প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞান, বেদান্ত-সিদ্ধান্তিত নিরপেক্ষ অদ্বৈতজ্ঞানেরই ভূমিকাস্বরূপে যেন উপন্যস্ত হইয়াছে।

উপনিষদ্‌বেদ্য অদ্বৈততত্ত্ব মানবানুধ্যানের বৃদ্ধাবস্থা। যে ঐক্যানুসন্ধিৎসা বহির্মুখী হইয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণাপেক্ষী হইয়াছিল, তাহাই আবার নানা অনুধ্যান সংযোগে বলবতী হইয়া অবশেষে অদ্বৈততত্ত্বরূপ মহাসাগরে সুদ্ধগান হইয়াছে। অনুভূতিতে যাহার আরম্ভ, অনুধ্যানে যাহার পরিপুষ্টি, তাহাই আবার প্রত্যক্ষানুভূত ঐক্যতত্ত্বে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে।

সত্যাদিযুগচতুষ্টয়ের ন্যায়, দর্শনেরও ৪টী যুগ কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রথমটী ব্যবহারিক যুগ (Empirical stage); ২য়টী অনুধ্যান যুগ (Reflective stage); ৩য়টী আধ্যাত্মিকযুগ (Spiritual stage) এবং ৪র্থটী ঐক্য-যুগ (Unitarian stage)। এতদ্দেশীয় ব্যবহারযুগে চার্ব্বাক ও বৌদ্ধগণ; অনুধ্যানযুগে নৈয়ায়িক ও কাণাদগণ, অধ্যাত্মযুগে সাংখ্য ও পাতঞ্জলগণ এবং ঐক্যযুগে মীমাংসকগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ষড়্‌দর্শনেও মানবচিন্তার ক্রমোন্মেষণপ্রণালী পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়। ষড়্‌দর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্যও এই উপায়ে নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

যাহারা নিতান্ত শিশু, তাহাদের বুদ্ধিতে সাধারণ জ্ঞান (Generalisation) ঝটিতি উৎপন্ন হয় না। একটী গো দর্শন করিয়া 'গোত্বের' জ্ঞান হয় না। তাই শিশু ভূয়োদর্শন করিতে করিতে পরে 'গোত্ব' জ্ঞান লাভ করে। 'গোত্বের' জ্ঞান হইতে পরে হয়ত জীবত্বে, জীবত্ব হইতে বস্তুত্বে, বস্তুত্ব হইতে ভূতত্বে, ভূতত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্রত্বে এবং অবশেষে জাতিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা একত্বে অবস্থিত হওয়াই জ্ঞানের ক্রমোন্মেষণের পর্য্যাপ্ত পরিসীমা। বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ সাধারণ জ্ঞানে বা একত্বে অবস্থিতি হওয়াই ক্রমোন্মেষণের চরম ফল। ভারতীয় দর্শনরাজ্যেও এই ক্রমবিকাশের পরিস্ফুট আভা চিন্তাশীল মাত্রেই দেখিতে পাইবেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার বৈশেষিক ভাষ্যোপক্রমণিকায় কাণাদদর্শনকেই ষড়্‌দর্শনের প্রথম দর্শন বলিয়া সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ ন্যায়প্রস্থানই যে দার্শনিক রাজ্যের প্রথম সন্তান, সে বিষয়ে সমালোচকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু পদার্থাদি বিচার প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলে গৌতমপ্রণীত ন্যায় দর্শনকেই প্রাথমিক দর্শন বলিয়া মনে হয়। শিশু যেমন বহু পদার্থ দেখিয়া পরে জাতিজ্ঞান লাভ করে, সেইরূপ যে যত অধিক পদার্থ স্বীকার করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়, সে দর্শনরাজ্যে তত প্রাথমিক। তাই প্রমাণ প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থবাদী গৌতমন্যায়কেই প্রাচীনতম দর্শন

বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। সপ্তপদার্থবাদী কণাদ সেই ষোড়শপদার্থ-কেই সপ্ততত্ত্বে পরিণত করিয়া ন্যায়োক্ত সমস্ত তত্ত্বই তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করত জ্ঞানের ক্রমোন্মেষণ দেখাইয়াছেন। যে দর্শনের ষোড়শ পদার্থে আরম্ভ, তাহাই সাধারণজ্ঞানে (Generalisation) কণাদের নিকট সপ্ততত্ত্বে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। অথচ ন্যায়োক্ত কোন পদার্থই বৈশেষিক দর্শনে অস্বীকৃত হয় নাই।

বিশেষ নামক (Differentia) কোন পদার্থ স্বীকার করিয়া ষট্পদার্থবাদী হইলেও কাণাদদর্শন বৈশেষিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের মতে সেজন্য বৈশেষিক দর্শনই ন্যায়ের পরবর্ত্তী দর্শন বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

ভারতীয় দর্শনের দ্বিতীয় যুগে কপিল ও পতঞ্জলি দুই সহোদর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে কপিলকেই অগ্রজ বলিয়া অনুমিত হয়। ইনি সপ্ত পদার্থকে ভাঙ্গিয়া দ্বিতত্ত্বে পর্য্যাপ্ত করিয়াছেন। তদুক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এক প্রকৃতিরই বিভিন্ন পরিণাম। কিন্তু জড়াত্মিকা প্রকৃতির পুরুষসান্নিধ্য ভিন্ন স্বতঃ পরিণমন অসম্ভব বিধায় বিচার ক্রমে তিনি প্রকৃতি পুরুষরূপ দ্বিতত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছেন। পাঠকগণ দেখিবেন, যাহার ষোড়শ পদার্থে আরম্ভ, তাহাই সাংখ্যোক্ত দ্বিতত্ত্বে পরিণমিত হওয়ায় জাতিজ্ঞান ক্রমেই একত্বাভিমুখী হইতেছে! পতঞ্জলি দৃষ্টতঃ ত্রিতত্ত্ববাদী হইলেও তিনি কপিল দেবের কনিষ্ঠ। কারণ, নিরীশ্বর সাংখ্যের পরিণামী চিন্তা সাধারণের ধারণার অবিষয় হইয়াছিল। তাহারা "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" শুনিয়াই কপিলকে বেদবিরোধী বলিয়া মনে করিল! সেই জন্য ভগবান্ পতঞ্জলি যোগসূত্রে "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈ-রপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ" সূত্রে ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও অলক্ষ্যে সাংখ্যতত্ত্বই উপদেশ দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা উভয়েই দ্বিতত্ত্ববাদী।

তৃতীয়যুগের দর্শনকার জৈমিনি ও বেদব্যাস সাংখ্যোক্ত দ্বিতত্ত্বকেই আবার একতত্ত্বে পরিণত করিয়াছেন। তবে শিষ্য জৈমিনি তাহা কর্ম্ম বা ধর্ম্মরূপ একতত্ত্বে এবং গুরু বেদব্যাস তাহা ব্রহ্ম বা আত্মারূপ একতত্ত্বে পর্য্যাপ্ত করিয়া-ছেন। জৈমিনি কেবল মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগকেই 'বেদ' নির্দ্ধারণ করিয়া কর্ম্মদ্বারা মুক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞানশরীর বেদব্যাস উপনিষৎকাণ্ডেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আত্মা বা ব্রহ্মরূপ একতত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইঁহারা উভয়েই একতত্ত্ববাদী। শিষ্য হইলেও জৈমিনিদর্শনকেই আবার উভয়ের মধ্যে প্রাচীনতর দর্শন বলিয়া অনুমিত হয়। সাধারণ জীবের ধর্ম্মাদির

প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাসশিষ্য বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা করিয়াছেন। পরম-জ্ঞানীর বিশ্রামস্থল নির্দ্দেশ জন্য বেদব্যাস বেদান্তদর্শন রচনা করিয়াছেন। পঞ্চাঙ্গী বিচার বা অধিকরণ উভয় দর্শনেরই একরূপ। গুরুশিষ্যের বিরোধ আপাত প্রতীয়মান হইলেও তাহা অধিকারিবিশেষের উপকার নিমিত্ত বা ক্রমোন্নতি কল্পেই রচিত। শ্রীরামানুজ স্বামী তাঁহার শ্রীভাষ্যে এইজন্য উভয় মীমাংসাদর্শনকেই এক পুস্তকের দুই অধ্যায় রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জৈমিনির মতে বেদোক্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে, ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণ রহিত হওয়ায় একত্বরূপ মুক্তিতত্ত্বে অবস্থান ঘটে। বেদব্যাস তাহা পরম্পরাপক্ষে সহায়ী কারণ স্বীকার করিয়াও একত্বাবস্থিতিকে নিরপেক্ষ (Absolute) বলিয়া সিদ্ধান্তিত করেন। সে একত্ব কার্য্যকারণরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে; তাহা স্বতঃসিদ্ধ। একত্ব জ্ঞানের পর আর জাতি জ্ঞানের প্রসার নাই। ইহাই দার্শনিক জ্ঞানের চরম উন্নতি। এজন্য ক্রমোন্মেষণ মতে ব্যাস-দর্শন এতদ্দেশীয় দর্শনসমূহের শেষ দর্শন বলিয়া নির্ভয়ে সমর্থিত হইতে পারে।

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

দশম অধ্যায়। দেহদর্শন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] [১৬৩ পৃষ্ঠার পর।

মহাপূর্ণ গুরুপাদপদ্ম হইতে বিদায় লইয়া কাঞ্চিপুরে যাত্রা করিলেন। ভিক্ষাকাল মাত্র গৃহস্থের গৃহে অপেক্ষা করিয়া সমস্ত দিন গমন করিতে লাগিলেন। রজনীকাল কোনও ভাগ্যবান্ গৃহস্থের অলিন্দে যাপন করিতেন। এইরূপে চারি দিবসে কাঞ্চিপুরে উপনীত হইলেন, এবং শ্রীবরদরাজকে দর্শন করিয়া মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। কাঞ্চিপূর্ণ তাঁহার আগমন কারণ অবগত হইয়া সেই রজনী তাঁহার আশ্রমে তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। মহাপূর্ণ নানাবিধ শিষ্টালাপে তথায় রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে কাঞ্চিপূর্ণের সহিত শালকূপের অভিমুখে গমন করিলেন।

পথিমধ্যে কলসস্কন্ধ রামানুজকে দূর হইতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। কাঞ্চিপূর্ণ কহিলেন, "আমায় এক্ষণে মন্দিরে গমন করিতে হইবে, সুতরাং আমি বিদায় হই। আপনি রামানুজসমীপে গমন করিয়া আপনার মন্তব্য ব্যক্ত

করুন।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। মহাপূর্ণ সেই দুরন্ত, পূর্ণকলসংস্কন্ধ, পরম মনোহর, দিব্যদীপ্তিবিশিষ্ট, বিষ্ণুভক্তির অদ্বিতীয় আধার, নরাকার দেবতাকে সন্দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বদন হইতে স্বতঃই এই ভগদ্গুণাবলি নিঃসৃত হইল,

বশী বদান্যো গুণবানৃজুঃ শুচিঃ
মৃদুর্দয়ালুর্ম্মধুরঃ স্থিরঃ সমঃ।
কৃতী কৃতজ্ঞস্ত্বমসি স্বভাবতঃ
সমস্তকল্যাণগুণামৃতোদধিঃ॥

ক্রমে শ্রীমান্ রামানুজ অতি সমীপবর্ত্তী হইলেন। মহাপূর্ণ আনন্দভরে ভগবৎপাদপদ্মে এই বলিয়া প্রণাম করিলেন।

নমো নমো বাঙ্মনসাতিভূময়ে
নমো নমো বাঙ্মনসৈকভূময়ে।
নমো নমোঽনন্তমহাবিভূতয়ে
নমো নমোঽনন্তদয়ৈকসিন্ধবে॥

তিনি যামুনরচিত আরও কতিপয় শ্লোক পাঠ করিলেন। গতি স্থির করিয়া চিত্রাপিতের ন্যায় রামানুজ দণ্ডায়মান হইলেন এবং একাগ্রচিত্তে তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে লাগিলেন; পরে অতি বিনীতভাবে, সুমধুর ভাষায় সেই পূজার্হ, কাষায়ধারী, বয়োবৃদ্ধ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"এই সকল অতুলনীয় শ্লোকের রচয়িতা কে? আমি তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি, এবং আপনার ন্যায় মহানুভবকেও বার বার নমস্কার করি। অদ্য আমার সুপ্রভাত, কারণ, আপনার পবিত্র মুখ হইতে এই পবিত্র গাথা শ্রবণ করিয়া আমি আপনাকে পবিত্র বলিয়া মনে করিতেছি।" মহাপূর্ণ কহিলেন, "এই শ্লোকগুলি আমার প্রভু শ্রীমান্ যামুনাচার্য্য কর্তৃক বিরচিত।" যামুনাচার্য্যের নাম শুনিয়া রামানুজ সাতিশয় আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়, শুনিয়াছি, মহর্ষি পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার শরীর কুশলে আছে তো? আপনি তাঁহার পদচ্ছায়া হইতে কতদিবস বঞ্চিত আছেন?" মহাপূর্ণ কহিলেন, "আমি সম্প্রতিই তাঁহার পদপ্রান্ত হইতে আগমন করিতেছি। আমি যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লই, তখন তাঁহার শরীর আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।" তাহাতে রামানুজ কহিলেন,"আপনার এখানে আসিবার কারণ কি? আপনি অদ্য কোথায় ভিক্ষা করিবেন? যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে এ অধমের

গৃহে ভিক্ষা করিয়া দাসকে কৃতার্থ করুন, এই আমার প্রার্থনা।" মহাপূর্ণ কহিলেন, "যাঁহার জন্য মহর্ষি যামুনমুনি সর্ব্বদাই চিন্তিত, তাঁহার অপেক্ষা কৃতার্থ ও ভাগ্যবান্ পুরুষ আর কে আছে? হে মহাত্মন্, মদীয় প্রভুর আদেশে আমি তোমারই নিকট আসিয়াছি।" রামানুজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর জীবকে সেই দেবতুল্য মহাপুরুষ স্মরণ করিয়াছেন? আমি কি তাঁহার স্মরণের যোগ্য? কি অভিপ্রায়ে তিনি আমায় স্মরণ করিয়াছেন?" মহাপূর্ণ কহিলেন, "আমার প্রভু তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করেন। সেই জন্যই তিনি আমায় তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার শরীর রোগের আক্রমণে অতি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আপাততঃ কিঞ্চিৎ সুস্থ আছেন। সুতরাং যদি তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কালবিলম্ব না করিয়া তদ্দর্শনার্থ গমন করা উচিত।" এই সুসম্বাদে শ্রীমান্‌রামানুজের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি মহাপূর্ণকে কহিলেন, "ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি এই জলপূর্ণ কলসটি মন্দিরে রক্ষা করিয়া আসি, পরে উভয়েই শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিব।" এই বলিয়া রামানুজ দ্রুতপদসঞ্চারে মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। মহাপূর্ণ যামুনাচার্য্যের প্রতি রামানুজের স্বাভাবিক প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং এরূপ শুদ্ধ-ভক্তের সহিত বাক্যালাপ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। তিনি গাহিলেন ;—

> তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং
> ভবনেষস্ত্বপি কীটজন্ম মে।
> ইতরাবসথেষু মাস্মভূৎ
> অপি মে জন্ম চতুর্মুখাত্মনা॥

অনতিবিলম্বে রামানুজ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত। মহাপূর্ণ জিজ্ঞাসিলেন, "গৃহে সমাচার দিবে না? তোমার অবর্ত্তমানে গৃহকর্ম্ম যাহাতে সুশৃঙ্খলে চলে, তদ্বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া আসা কি উচিত নয়?" রামানুজ কহিলেন, "অগ্রে ভগবান্ ও তদ্ভক্তের আজ্ঞাপালন, তৎপরে গৃহকর্ম্ম। আমার মন যামুনমুনিকে দর্শন করিবার জন্য নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া এখনই যাত্রা করিতে অনুমতি করুন।" মহাপূর্ণ ইহা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি রামানুজকে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রীতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইলেন। উভয়েই মহাপুরুষ সন্দর্শনার্থ

ব্যগ্র হইয়া দ্রুতপদসঞ্চারে গন্তব্যস্থানের দিকে চলিতে লাগিলেন। দিবাভাগে কোন গৃহস্থের ভবনে ভিক্ষা করিয়া, রজনীযোগে কাহারও অলিন্দে বিশ্রাম করিয়া চারি দিবসে কাবেরীতীরে অবস্থিত শ্রীশিরঃপল্লিতে (Trichinopoly) উপনীত হইলেন। কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা কাবেরীর পর পারে উত্তীর্ণ হইলেন এবং শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীউর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী মঠাভিমুখে যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সম্মুখে মহাজনতা দেখিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতাদৃশ জনতার কারণ কি?" জনৈক ব্যক্তি উত্তর করিল, "মহাশয়, বলিব আর কি? পৃথিবী আজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার হইতে বঞ্চিতা হইয়াছেন। মহাত্মা আল্‌ওয়ান্দার্‌ পরমপদলাভ করিয়াছেন।" ইহা শ্রবণ করিয়াই রামানুজ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং মহাপূর্ণ উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্ব্বক স্বীয়ললাটে করাঘাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হা প্রভো, দাসকে কি এইরূপে বঞ্চিত করিতে হয়? এই জন্যই কি আমায় কাঞ্চিপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন?" ইহা কহিয়া অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য লাভ করিয়া সংজ্ঞাহীন রামানুজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া জল আনয়নপূর্ব্বক মূর্চ্ছিতের নয়নে ও বদনে অর্পণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "বৎস, কি করিবে? যাহা ভবিতব্য, তাহা হইবেই। সকলই নারায়ণের ইচ্ছা। যে মহাপুরুষের জন্য আমরা শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, তাঁহারই বাক্যানুসারে সকলই মঙ্গলের জন্য হয়। শ্রীমন্নারায়ণের ইচ্ছার অনুগামী হইতে তিনি আমাদের বরাবর উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার অদর্শনে তাঁহার উপদেশের প্রতি অনাস্থা করা কোন রূপেই উচিত নয়। চল, সমাধিগর্ভে অদৃশ্য হইয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পবিত্র বিগ্রহকে শেষদর্শন করিয়া লই।" রামানুজ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যলাভ করিয়া মহাপূর্ণের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা অনতিবিলম্বে শিষ্যসম্বাবৃত আল্‌ওয়ান্দারের দেহমন্দিরের পার্শ্বে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, মহাপুরুষ দীর্ঘনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। মহাপূর্ণ পাদপ্রান্তে পতিত হইয়া স্বীয় নয়নজলে তাহা ধৌত করিতে লাগিলেন। রামানুজ অবাক্‌ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়েরই শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। রামানুজ

স্থিরনেত্রে সেই পরম পবিত্র, সাত্বতপ্রধানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলেন। চিরনিদ্রিতের বদনে গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, সর্ব্বলাবণ্যহর মৃত্যুর তামসিক ছায়া সেই পবিত্র দেহে পতিত হয় নাই। মৃত্যুর সাধ্য কি যে, সে ভগবদ্ভক্তকে স্পর্শ করে? রামানুজ এক দৃষ্টিতে সেই মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। যেন অন্তরে অন্তরে দুজনে কি কথা কহিতেছেন। সকলে নিস্তব্ধ; তাদৃশ জনতার মধ্যে কাহারও বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। সকলে অবাক্ হইয়া সেই যুগলমূর্ত্তির—সেই জীবিত ও মৃতের সমাগম দেখিতেছেন।

কিয়ৎকাল পরে শ্রীরামানুজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখিতেছি, মহর্ষির দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আছে। জীবদ্দশাতেও কি এরূপ থাকিত?" পার্শ্বস্থ শিষ্যগণ কহিলেন, "না, উঁহার অঙ্গুলি সকল সাধারণ অঙ্গুলির ন্যায় সহজভাবেই থাকিত। অধুনা এরূপ থাকিবার কারণ আমরা কিছুই অনুমান করিতে পারিতেছি না।" ইহা শুনিয়া রামানুজ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

"অহং বিষ্ণুমতে স্থিত্বা জনানজ্ঞানমোহিতান্।
পঞ্চসংস্কারসম্পন্নান্ দ্রাবিড়াম্নায়পারগান্।
প্রপত্তিধর্ম্মনিরতান্ কৃত্বা রক্ষামি সর্ব্বদা॥"

"আমি বিষ্ণুমতে থাকিয়া অজ্ঞানমোহিত জনগণকে পঞ্চসংস্কারযুক্ত, দ্রাবিড়বেদবিশারদ, এবং নারায়ণের শরণাগত করিয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিব।"

ইহা বলিবামাত্র একটি অঙ্গুলি খুলিয়া সরল হইয়া গেল। রামানুজ আবার কহিলেন,—

"সংগৃহ্য নিখিলানর্থান্ তত্ত্বজ্ঞানপরং শুভম্।
শ্রীভাষ্যঞ্চ করিষ্যামি জনরক্ষণহেতুনা॥"

"আমি লোকরক্ষার জন্য সর্ব্বার্থ সংগ্রহ করিয়া মঙ্গলময়, তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিপাদক শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করিব।" ইহা বলিবামাত্র আর একটি অঙ্গুলি খুলিয়া সরল হইয়া গেল। রামানুজ আবার কহিলেন,—

"জীবেশ্বরাদীন্ লোকেভ্যঃ কৃপয়া যঃ পরাশরঃ।
সন্দর্শয়ন্ তৎস্বভাবান্ তদুপায়গতীস্তথা।
পুরাণরত্নং সংচক্রে মুনিবর্য্যঃ কৃপানিধিঃ।

তস্য নাম্না মহাপ্রাজ্ঞবৈষ্ণবস্য চ কস্যচিৎ।
অভিধানং করিষ্যামি নিষ্ক্রয়ার্থং মুনেরহম্॥

"যে কৃপাময়, মুনিবর পরাশর লোকের প্রতি দয়াবশতঃ জীব, ঈশ্বর, জগৎ, তাহাদের স্বভাব, ও তাহাদের উন্নতিপথ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়া পুরাণ-রত্ন (বিষ্ণুপুরাণ) রচনা করিয়াছেন, তাঁহার ঋণপরিশোধ করিবার জন্য আমি কোন এক মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে তন্নামে অভিহিত করিব।" ইহা বলিবামাত্র অবশিষ্ট অঙ্গুলিটি খুলিয়া সরল হইয়া গেল! ইহা দেখিয়া সকলে নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং ঐ যুবকই যে কালে আল্‌ওয়ান্দারের আসন গ্রহণ করিবেন, ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না।

সমাধিগর্ভে দেহকে স্থাপিত করিবার পূর্ব্বেই শ্রীরামানুজ কাঞ্চিপুরের দিকে যাত্রা করিলেন। আল্‌ওয়ান্দারশিষ্যগণ তাঁহাকে শ্রীরঙ্গনাথজীউ দর্শন করিয়া যাইতে বলায়, তিনি অভিমানভরে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন, "যে ভগবান্ আমার অভীষ্ট পূর্ণ করিলেন না, যিনি আমার হৃদয়ের আরাধ্যদেবতাকে চিরদিনের জন্য অপহরণ করিয়া লইলেন, আমি সেই নিষ্ঠুর ভগবান্‌কে দেখিতে চাই না।" ইহা বলিয়া আপনার মনে, কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কাহারও কোনও অনুরোধ রক্ষা না করিয়া রামানুজ স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সেই দিবস হইতে তাঁহার স্বাভাবিক স্মিতবিকসিত বদন হইতে হাস্যরেখা অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি যথা-সময়ে কাঞ্চিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাল্যচপলতা গিয়া এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্কের গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিল। অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে যাপন করিতেন। সহধর্ম্মিণীর সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেন না। তাঁহার সঙ্গ যথাসাধ্য ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেন। কেবল কাঞ্চিপূর্ণের সহবাসে কিছু আনন্দ পাইতেন।

(ক্রমশঃ)

সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ।

(কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)

গীতায় ভগবান বলিতেছেন, ইহলোকে নিষ্ঠা দ্বিবিধ। ১ম, জ্ঞানযোগ, ২য়, কর্ম্মযোগ। পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয় না এবং জ্ঞান-

প্রাপ্ত না হইলেও কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না। কর্ম্মত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র বাঁচিবার উপায় নাই। ইচ্ছা না থাকিলেও প্রাকৃতিক গুণ মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। তুমি নিয়ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর—কর্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না ইত্যাদি।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বেদের প্রতিজ্ঞা কি। বেদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় কি, তাহাই বলেন। আত্মজ্ঞান কাহাকে বলে, কি উপায়েই বা উহা লাভ হইতে পারে, বেদ সেই বিষয়ই বলেন। বেদ বলেন, সকলের ভিতর তিনি রহিয়াছেন। জীবজন্তু কীটপতঙ্গের ভিতর তিনি; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রের ভিতরও তিনি। তিনি এই সমস্ত সৃষ্টিকার্য্যের ভিতর রহিয়াছেন।

তাঁহাকে কে লাভ করিতে পারে? দৃঢ়তা যাহার আছে, যে সাহসী, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে সক্ষম। যে দুর্ব্বলদেহ, যাহার মন নিস্তেজ, এই আত্মজ্ঞান তাহার লাভ হওয়া কঠিন। তেজীয়ান হইতে হইবে; তাহা হইলেই ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায়। বেদ সনাতন ধর্ম্মের বিষয়ই বলেন। সনাতন ধর্ম্মের অর্থ এই:—যে ধর্ম্ম, কি দেবতা, কি মনুষ্য, সকলের মধ্যেই এক; যাহা সকল জাতিতে, সকল সময়ে এক, অপরিবর্ত্তনীয়। আর পুরাণাদি যুগধর্ম্মের বিষয় বর্ণনা করেন। দেশকালপাত্র বিবেচনায় নানাপ্রকার যুগধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম কি, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহা এই:—নিজ ধর্ম্মমতে নিষ্ঠা রাখিবে, কিন্তু অপরের ধর্ম্মকেও ভাল বাসিবে, ঘৃণা করিবে না। ইহা তিনি শুধু বলিয়াছেন, তাহা নয়; তিনি নিজ জীবনে সাধন দ্বারা উহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, যত মত, তত পথ। সকল ধর্ম্মই সত্য; তবে যে যেরূপ অধিকারী, সে সেইরূপ পথ বাছিয়া লয়।

শাস্ত্রে বলে, সৃষ্টি অনাদি। সৃষ্টির আদি স্বীকার করিলে ভগবানে অপূর্ণতা দোষ হয়। যদি বলা যায়, তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে পূর্ণ ছিলেন, তবে সৃষ্টির পর তিনি পূর্ণতর হইলেন, বলিতে হয়। আর যদি বলা যায়, সৃষ্টির পর তিনি পূর্ণ হইলেন, তবে সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি অপূর্ণ ছিলেন, বলিতে হয়। এ উভয় পক্ষেই দোষ রহিয়াছে। 'পূর্ণতর' কথাটাই স্ববিরোধী আর যাহা পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইল, তাহা বাস্তবিক অপূর্ণই ছিল, বলিতে হয়। পূর্ণের আবার বিকাশ কি? সৃষ্টির আদি স্বীকার করিলে তাঁহাকে আবার নিষ্ঠুরতাদোষে দোষী

করা হয়। দেখা যায়, জগতে কেহ বা দরিদ্র, রুগ্ন ও মূর্খ; কেহ বা ধনী, সুস্থকায় ও বিদ্বান্। ভগবান্ যদি বিভিন্ন ব্যক্তিকে এইরূপ বিভিন্ন অবস্থাপন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাতে পক্ষপাতিতা ও নিষ্ঠুরতা দোষ অনিবার্য্য রূপে আসিয়া পড়ে। এই হেতু শাস্ত্র বলেন, সৃষ্টি অনাদি।

যখন ইহা সূক্ষ্মভাবে বীজরূপে থাকে, তখন ইহার প্রলয়াবস্থা, যখন স্থূলভাবে প্রকাশ, তখন সৃষ্টি। এইরূপ এক সৃষ্টি ও এক প্রলয় হইয়া এক কল্প। সৃষ্টি ও প্রলয় এইরূপ প্রবাহরূপে অনাদিকাল বর্ত্তমান। ইহা ভগবান ছাড়া কিছু নয়; তিনিই এই হইয়াছেন। শাস্ত্র বলেন, তিনি ঈক্ষণ করিলেন, (আলোচনা করিলেন) আমি প্রজারূপে বহু হইব; আর তিনি এই সৃষ্টিরূপে বহু হইলেন। এই সৃষ্টি করিবার ভগবানের কোন উদ্দেশ্য নাই। তিনি পূর্ণ, তাঁহার কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। উদ্দেশ্য কাহার থাকে? যাহার কোন অভাব আছে। সেই অভাবমোচনের জন্য সে নানাবিষয়ের সাহায্য লয়। ভগবানের কোন অভাব নাই। তাঁহার কিছু পাইবার আবশ্যক নাই, কারণ, তিনি পূর্ণ। অতএব তাঁহার এই সৃষ্টি করিবার কোন উদ্দেশ্যও নাই। পাশ্চাত্যেরা ইহা বুঝিতে পারে না। এই সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য নাই বলিলে তাহারা মনে করে, ইহার কোন নিয়ম নাই, ইহা একটা পাগলামি মাত্র। উদ্দেশ্যহীন কোন কার্য্য হইতে পারে, ইহা তাহারা মনে করিতে পারে না। কারণ, তাহারা নিজেদের অপূর্ণত্ব হইতে দেখিয়া থাকে, উদ্দেশ্যহীন কার্য্য সাধারণ মনুষ্যের দ্বারা কোন কালে হয় না। তাহাদের অভাব আছে বলিয়াই তাহারা কার্য্য করে। অতএব তাহারা অনুমান করে, সৃষ্টিকার্য্যও এইরূপে হইয়াছে। ভগবান কোন এক মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হইয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই যুক্তিগুলি ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কারণ, ইহাতে ভগবান মনুষ্যতুল্য, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের কোন উদ্দেশ্য নাই, ইহা তাঁহার খেলা, ইহা তাঁহার লীলামাত্র। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন হইলে কখন কি কার্য্য হইতে পারে? শাস্ত্রকারেরা বলেন, অবশ্য হইতে পারে। দৃষ্টান্ত বালক। বালক যেরূপ পথে যাইতে যাইতে পতঙ্গ দেখিয়া তাহাই ধরিতে যায়, উদ্দেশ্যহীন অথচ নানাকার্য্য করে, ভগবানের সৃষ্টিকার্য্যও তদ্রূপ। তিনি নানারূপ সাজিয়াছেন—ইহা তাঁহার খেলা।

দেখিতে পাই, সংসারে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ সুখী, কেহ দুঃখী;

কেহ মূর্খ, কেহ পণ্ডিত। এই বৈষম্যের কারণ কি? শাস্ত্র বলেন, ইহার কারণ কর্ম্ম। এই 'কর্ম্ম' শব্দ শাস্ত্রে অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শাস্ত্র বলেন, পৃথিবী নক্ষত্রাদি কর্ম্মসম্ভূত। এ কথার অর্থ কি? এখানে কর্ম্মের অর্থ বীজভাব হইতে কার্য্যকারণরূপে প্রকাশিত অবস্থায় পরিণত হওয়া এবং এই পরিণতিকেই কর্ম্ম বলে। সৃষ্টি যখন অনাদি হইল, তখন সৃষ্টি-বৈষম্যের কারণ 'কর্ম্ম'ও অনাদি।

কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। যে কর্ম্ম কর না কেন, তাহার ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। কেহই ইহার অন্যথা করিতে পারে না। মনে কোন চিন্তার উদয়রূপ মানসিক কর্ম্মেরও ফল আছে। কোন পাপচিন্তা উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার ফলস্বরূপ মন কলুষিত হয় এবং যখন এই পাপচিন্তা প্রবল হয়, তখন ইহা শারীরিক কার্য্যরূপে বাহিরে প্রকাশিত হয়। আমরা অনেক সময় কর্ম্মের ফল দেখিতে না পাইলেও কোন না কোনরূপে তাহা বর্ত্তমান আছে, ইহা নিশ্চিত। শরীরসম্বন্ধীয় অনিয়ম রোগরূপে আমাদের কষ্ট দেয়। রোগ ঔষধ দিয়া উপশম হয়। ইহাতে শারীরিক অনিয়মের ফল, ঔষধসেবনরূপ অন্য এক কর্ম্মফল দ্বারা রূপান্তর ধারণ করিল মাত্র। দুইটী ভিন্ন কর্ম্মের ফলই আমাদের উপভোগ করিতে হইল। কোনটীর বিনাশ হইল না, উভয় কর্ম্মফল মিলিয়া একটী কর্ম্মফলরূপে প্রতীয়মান হইল, এইমাত্র প্রভেদ। যেরূপ নৌকার মাস্তুলে দড়ি বাঁধিয়া উভয় তীর হইতে গুণ টানিলে নৌকা কোন তীরে না গিয়া নদীর মধ্য দিয়া যাইতে থাকে, সেইরূপ দুই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের সংযোগে এক বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হয়, এই মাত্র। কিন্তু কর্ম্মফলের নাশ কখনও নাই।

অনেকের বিশ্বাস, কোন এক অবতার বিশ্বাস করিলে আমাদের সমুদয় পাপ মোচন হইয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। স্বয়ং হরি, হর বা ব্রহ্মা তোমার উপদেষ্টা হইলেও তোমার মোক্ষ তোমার নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে। তবে অবতারাদি কি করেন? তাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মপরিণত জীবন আমাদের সম্মুখে ধরিয়া আমাদের কি করিতে হইবে, তাহাই দেখান। আমাদের সম্মুখে একটী তয়েরী জীবন রাখিয়া দেন, যাহা দেখিয়া আমরা তদনুরূপ হইতে পারি। তাঁহারা একটী আদর্শ দেখাইয়া যান এবং উহা মনুষ্যজীবনে পরিণত করিবার সহজ উপায় বলিয়া দেন, যাহার প্রভাবে এক লক্ষ জন্মের কার্য্য শত জন্মে, এমন কি, এক জন্মে ভোগ হইয়া মানুষ ধর্ম্মের

চরম সীমায় উপনীত হয়। এ কথা স্বয়ং ভগবান গীতাদি শাস্ত্রে বারবার বলিয়া গিয়াছেন। অতএব শাস্ত্র বলেন, কর্ম্ম ও তাহার ফল নিত্যসম্বন্ধ— কার্য্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ। প্রলয়কালে ইহা বীজভাবে ও সৃষ্টিকালে বিকাশ-ভাবে থাকে ; এই মাত্র প্রভেদ।

সচরাচর চারিপ্রকৃতির মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ জ্ঞানপ্রধান প্রকৃতির লোক। তাঁহারা বিচার ভিন্ন কোন তত্ত্বই গ্রহণ করিতে চান না। লোকের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া কোন কার্য্য করিতে চান না। ২য়, ভক্তি-প্রধান প্রকৃতির লোক। ইঁহারাও বিচার করেন বটে, কিন্তু কেহ সত্য বলিতেছে দেখিলে তাহার উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন। ৩য়, কর্ম্মপ্রধান প্রকৃতির লোক। তাঁহারা পরোপকারাদি ধর্ম্মই একমাত্র কর্ত্তব্য-বোধে সর্ব্বদা কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ৪র্থ, যোগপ্রধান প্রকৃতির লোক। ইঁহারা মানসিক শক্তিসমূহের তন্ন তন্ন বিচার করিয়া উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হন। মানুষ এই চারিটী ভাবের একটী মাত্র লইয়া অবস্থান করে, এরূপ বলা ভ্রম। তবে উহার মধ্যে একটী ভাব প্রত্যেকের মনে অধিক প্রবল থাকে, এই মাত্র। যাহার যে ভাব প্রবল থাকুক না কেন, এবং যে, যে পথ অবলম্বন করিয়া চলুক না কেন, উন্নতির চরম সীমায় সকলেই ভগবানের সহিত একতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং শাস্ত্র এই একতা উপলব্ধির চারিটী বিশেষ পথ উপদেশ করিয়া থাকেন। উহাদের নাম জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ ও রাজযোগ। ভগবানের সহিত আমাদিগকে যুক্ত করে বলিয়াই এই চারি মার্গ 'যোগ' শব্দে অভিহিত হয়। তন্মধ্যে সংক্ষেপে কর্ম্মযোগের বিষয় বলিতেছি। অহংভাব পরিত্যাগ করিয়া বাসনাশূন্য হইয়া ভগবানের জন্য কর্ম্ম করার নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। আহার বিহার প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম করিবে, ভগবানের জন্য করিতেছি, এই ভাব মনে করিবে। আমি কিম্বা আমার জন্য ইহা করিতেছি, ইহা না ভাবিয়া ভগবানের জন্য করিতেছি, এই ভাবিবে।

বৈরাগ্য না উন্মত্ততা ?

একজন বিএ পাশ করা যুবকের মনে হঠাৎ কোন কারণে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। যুবক বড়মানুষের ছেলে—বাপ লাখপতি জমীদার। কল্‌কেতায়

তাঁদের মস্ত বাড়ী ছিল। বাপ মা ভাই ভগিনী সব বর্ত্তমান—শুধু তা নয়, বছর চেরেক হইল বিবাহও হইয়াছে—ঘরে সেই যুবতী স্ত্রী। ছেলে পুলে কিছু হয় নাই। বয়স এখন বছর ২২।২৩ হবে। শরীরে কোন রোগ ছিল না—বেশ সুবলিষ্ঠ; বাড়ীর কারুর সঙ্গে একটু বকাবকি হবার সম্ভাবনাই ছিল না। তবে হঠাৎ এরকম কেন হল? একদিন কাউকে কিছু না বলে কোয়ে কোথা চলে গেছেন। সকলে কেঁদে আকুল। তাঁর বাপ মার ত আজ চারদিন অবধি কিছু খাওয়া দাওয়া নেই। আমরা ত সকলে মহাদুঃখিত—দাদাবাবুর অদর্শনে। দাদাবাবু আমার কখনো একটা চড়া কথা কাউকে বলেন না। মহাবুদ্ধিমান, অতি দয়ালু, নম্র প্রকৃতির লোক। আমি যতদিন এ সংসারে আছি, ততদিনের ভিতর এমন শোকাবহ ঘটনা কখন হয় নি।

বলিয়া রাখি, আমি এ বাড়ীর একজন পুরাতন সরকার; দশ বার বছর যাবৎ আছি, কিন্তু এমন সুখে আর কোথাও চাকরী করি নাই। আমরা সকলে এইরূপ ম্রিয়মাণ অবস্থায় আছি, এমন সময় কর্ত্তাবাবু তাড়াতাড়ি একদিন এসে আমায় ডেকে বল্লেন, 'রাম, একটা গোপনীয় কথা আছে।' আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম। কর্ত্তাবাবুর মুখ যেন একটু প্রফুল্ল। বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি দরজা বন্ধ করিতে বলিলেন।

আমি মনে করিলাম, বুঝি দাদাবাবুর কোন খবর আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দাদাবাবুর কি কোন খবর পাইয়াছেন?' 'হাঁ, পাইয়াছিও বটে, আবার পাই নাইও বটে।' আমি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলাম। কর্ত্তাবাবু বলিতে লাগিলেন, 'রাম, শোন, এই বয়সে এমন পুত্ররত্ন হারাইতে বসিয়াছি। যে কোনরূপে হউক, তোমায় তাহাকে আমার নিকট আনিয়া দিতেই হইবে।' কর্ত্তার চক্ষে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। 'নগেনের হঠাৎ এই লেখাটী পাইয়াছি। তুমি ভাল করিয়া তাহার খাতাপত্র খোঁজ—কিছু লিখিয়া গিয়া থাকিতে পারে।' লেখাটী লইয়া পড়িলাম; পড়িয়া তাঁহার খাতাপত্র খোঁজার স্পৃহা কতকটা হ্রাস হইল। বাবু বলিলেন, 'কি বুঝিতেছ?' বলিলাম, 'ফেরান দায়। দাদা বাবুর বিবেক জন্মিয়াছে। আশ্চর্য্য, আমরা এতদিন কিছু টের পাই নাই।' খাতাপত্র খুঁজিলাম, কিছুই সন্ধান করিতে পারিলাম না। সমুদয় কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। পুরস্কার ঘোষণা করা হইল। কোন ফল হইল না।

* * * * *

দশ বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। ক্রমে একটু একটু করিয়া সকলের শোক কমিল। কিন্তু স্মৃতি গেল না। একদিন এক তেজঃপুঞ্জকায় সন্ন্যাসী উপস্থিত। দেখিয়া চিনিলাম—সকলে চিনিলেন। শোক আনন্দ একত্রে উথলিল। মুখ প্রশান্ত; সুখে দুঃখে যেন অটল। ভক্তিজ্ঞান যেন মুখ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বৃদ্ধ পিতা মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, বলিলেন, 'ভগবানকে জীবনের লক্ষ্য কর, তাঁহাকে লাভ করা ভিন্ন জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আর সব বাজে কাযমাত্র।' আমাদের সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। দু একটী কথা যাহা কহিলেন, যেন মধুমাখা। বলিলেন, 'সদসৎ বিচার ভুলো না; তাহলে ক্রমশঃ সতের সঙ্গে দেখা হবে, পরমানন্দলাভ হবে।'

ঘণ্টা কয়েক থাকিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া আবার কোথায় চলিয়া গেলেন। সেই অবধি আমার মনে যেন একটা দাগ থাকিয়া গেল। আমি পূর্ব্ব হইতেই দাদাবাবুর লেখা সেই কাগজগুলি কাছে রাখিয়াছিলাম। একটু মন খারাপ হলেই সেগুলি পড়ি—তাঁহার বৈরাগ্য দেখিয়া ও তাঁহার বৈরাগ্যো-দ্দীপক লেখাগুলি পড়িয়া আমার মনে—আমি সংসারী হইলেও—বেশ এক এক বার চৈতন্য হয়। তাই মনে করিলাম, যদি সেইগুলি পড়িয়া অপর কোন সংসারীর কিছু উপকার হয়, তাই লেখাটী বেশ সুপ্রণালী ক্রমে বিন্যস্ত না হইলেও পাঠকগণকে উপহার দিলাম। বোধ হয়, দাদাবাবু কোন দিন নিজের ভাবে বিভোর হইয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিয়া লিখিতেছিলেন—

ইতি, কোন সরকার।

"কেন ঘুরিয়া মরি!—

লোকে সচরাচর ধর্ম্মপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই বলিয়া থাকে, আমাদের সংসারের কাযে দিন রাত ব্যস্ত থাকতে হয়, ঈশ্বরচিন্তা করি কখন? যেন তাঁদের কে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছে, সংসারের কায কর্‌রে বাবা কর্‌, না কর্‌লে মহাভারত অশুদ্ধ হবে। আচ্ছা, এঁদের কি কখন এক একবার চকিতের মত মনে উদয় হয় না যে, এইযে সব কাযে ব্যস্ত রয়েছি, এ আমার নিজের দোষে—আমি নিজে কায না কোরে থাকতে পারিনি বোলে। আমাকে যদি কেউ জোর করে সব কায ছাড়িয়ে দিয়ে খালি বলে ঈশ্বরচিন্তা কর, তা হলে আমি হাঁফিয়ে মরি। এ চিন্তা কি কখন তাঁদের উদয় হয় না?

শুভ মুহূর্ত্তে অবশ্য সকল প্রাণে ক্ষীণ বা স্পষ্ট স্বরে এই বাণী উচ্চারিত হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষ উহাকে চাপা দিয়ে নানারকম হেত্বাভাস দিয়ে ঢেকে রাখ্‌তে চায়—আর দোষ চাপায়—সমাজের উপর, ঘটনাচক্রের উপর, আবার সর্ব্বোপরি—বিধাতার উপর। কেন ঘুরে মরি? ঘুরিতে সুখ পাই বলিয়া। সংসারের কর্ম্মে কেন এত ব্যস্ত? সংসারের কর্ম্মে সুখ পাই বলিয়া। মোহ বলে একটা জিনিষ আছে—সেইটে আমাদের টেনে টেনে নিয়ে বেড়ায়—একটু রূপ দেখ্‌লে একেবারে উন্মত্ত হই—এতটুকু জিহ্বার স্বাদের জন্য, এতটুকু সুগন্ধের জন্য, এতটুকু সুখস্পর্শের জন্য আমরা বিচার ভূলে যাই। স্থিরভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া কায করা কথার কথামাত্র; যত ভাবা চিন্তা যায়, তত কায কমে যায়। যা কিছু কায হয়, তাও বড় পবিত্র ভাবে হয়।

এখন কথা হচ্চে এই, স্রোতে গা ভাসান দেওয়া ভাল, না বিচার করে—সদসং বিচার করে বুঝে শুঝে চলা ভাল? বিচার যদি না কল্লুম, তা হলে পশু আর আমি ত এক।

মানুষের মনুষ্যত্ব কোন্ খানে? মানুষের বিচারশক্তিতে। মানুষ কায করিতে করিতে এক একবার চকিতের মত পেছন দিকে চেয়ে কি কচ্চি ভাব্‌তে পারে বলে, মানুষের ভিতর চৈতন্যশক্তির কিঞ্চিৎ বিকাশ আছে বলে। তা না হলে জড়ের সঙ্গে মানুষের সমান ভাব হোতো। মানুষ আপনাকে আপনি প্রশ্ন করতে পারে বলেই জড়ের সঙ্গে তার প্রভেদ। মানুষের ভিতর দেবতা অসুর দুইই আছে। অসুর রূপরসের জন্য উন্মত্ত—দেবতা বলেন, ভাবিয়া কায কর—ভাবো। দেবতা ভাবময়—দেবতা কেবল অসুরের কার্য্যের সমালোচনা করে। দেবতা কেবল বলে—কি কোচ্চো?

মানুষ সর্ব্বদা ভোগে মাতিয়া থাকিতে পারে না। ভোগটা যেন নেশার মত; ত্যাগটা যেন আকাশের মত পবিত্র, স্বচ্ছ, নির্ম্মল। মানুষের মন হাজার অসৎ দিকে যাক্ না কেন, ত্যাগে আকৃষ্ট হবেই। তাই সহস্র কষ্ট সত্ত্বেও ত্যাগের জীবনের, সন্ন্যাসিজীবনের শ্রেষ্ঠতা সকলেই এক বাক্যে ঘোষণা করেছেন। শঙ্করাচার্য্য লিখ্‌ছেন—'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।' বাস্তবিক, যার অগাধ ঐশ্বর্য্য আছে, বিষয়মদিরা পানে যে অন্ধ,সে নহে, যার এই মদের নেশা ছুটেছে, যার ঘুম ভেঙ্গেছে,যার সব স্বপ্ন বোধ হয়েছে,সেই সুখী। সেই আনন্দময় পুরুষ। আর সকলে আনন্দকে ভেংচাইতেছে মাত্র। পঞ্চাশ পর্দ্দার ভেতর দিয়ে সেই আনন্দের ঝিকিমিকি।

মানুষ মাতিয়া যায়, তাই ঘোরে। একটুখানি রূপ, একটুখানি রস, একটুখানি গন্ধ, একটুখানি শব্দ, একটুখানি স্পর্শ মানুষকে কুহকমন্ত্রে ভুলাইতে সমর্থ। কে এ যাদুকর, যে এই সব দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখে ? মন, এ চিন্তা কি কখন করেছ ? না করে থাক, কর, থাম ; কোথায় সামনের দিকে ছুটেছ, একবার পেছনে চেয়ে দেখ। একবার দেখ, কোথায় চলেছ। এ আলেয়ার আলো—কোথায় তেপান্তর মাঠে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হবে। আপনার তেজ আপনি বোঝ্‌বার চেষ্টা কর—সমুদয় কর্ম্মের রহস্য বুঝ্‌তে পার্‌বে। তোমার যা নিজের আনন্দ আছে, তোমার যা নিজের তেজ আছে, তাই তোমার নিজস্ব। তুমি কেন অপরের ধনে গৃধ্নু হও ? তুমি নিজেকে অপূর্ণ মনে কর্‌ছো—তাই তোমার এত ঘোরাঘুরি, তাই তোমার এত কর্ম্ম। কিন্তু একবার যদি কর্ম্মের রহস্য বুঝ্‌তে পার, তা হলে দেখ্‌বে, তুমি সর্ব্বশক্তিমান হয়ে, সর্ব্বজ্ঞানময় হয়ে, ক্ষুদ্র শক্তি ক্ষুদ্র জ্ঞানের গরিমা করে বেড়াচ্চ। অভিমান কিসের ? যে এত বড় লোক যে, তার তুলনা হয় না, তার কোটি মুদ্রার অভিমান কিসের ? যে স্বয়ং সুন্দরের সুন্দর, অতি সুন্দর, যার সৌন্দর্য্যে জগৎ আলো, তার এত টুকু রূপের অভিমান কেন ? মন, জান না কি,ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, সেখানে সূর্য্যের জ্যোতি জোনাকির আলো। তাই বলি মন, 'আপনাতে আপনি থেকো, যেয়ো না কো কারু ঘরে, যা চাবি, তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে'। কর্ম্মাভিমানিন্, কত কর্ম্ম কর্‌বে ? তোমা থেকেই যে সব কর্ম্ম—তোমা থেকেই যে সব। মন, যখন স্থির হয়ে ভাবি, তখন হাসি পায় তোর চেষ্টা দেখে। শাস্ত্রে বলেছেন, তুই অন্ধ। তা ঠিকই বটে। তুই যদি চক্ষুষ্মান্ হতিস্, তা হলে তোর এত দিন লজ্জা উপস্থিত হত। তুই নটীর মত নাচ্চিস্ আর আমাকেও তার সঙ্গে জড়িয়েছিস্—তাইতে আমিও নাচ্চি বোধ হচ্চে, আমি ত তুই নই। তুই নাচ্‌বি নাচ্। আমি জেনে রাখ্‌ব, বুঝে রাখ্‌ব, তোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তুই ত সত্ত্ব, রজঃ, তমের নানা রকম ক্রিয়া দেখাবি। দেখা না, দেখি আর আনন্দ করি।

একটী কবিতায় পড়েছিলুম, একের পৃষ্ঠে শূন্য দি যত, শূন্যের মূল্য বাড়ে তত, একে ভুলি, শূন্যগুলি সারজ্ঞান করেছি।' বাস্তবিক আমাদের হয়েছে তাই। আমাকে নিয়েই আমার যত জ্ঞান, যত চেষ্টা, যত কর্ম্ম, যত ঘোরাঘুরি ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই 'আমি'কে ভুল হয়ে গিয়েছে—এখন 'আমার' লইয়া ব্যস্ত। ভাবোচ্ছ্বাসের কথা বলিতেছি না, কাযের কথা বলিতেছি।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে 'আমার' কি আছে? তবু এই ভ্রান্তবুদ্ধি যায় না।

একবার আমি কোন লোকের ছাতা নিয়ে এসেছিলাম। সেই ছাতাটী তাকে ফিরিয়ে দিতে গেলাম। গিয়া খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া উঠিব বলিয়া উঠিয়াছি, একটু বাহিরে আসিয়া দেখি, ছাতাটী 'আমার' মনে করিয়া হাতে করিয়া আসিয়াছি। এইরূপ হওয়াতে হাসি আসিল। এই কথার আলোচনা করিতে করিতে ফের রাখিতে গেলাম—ফের উঠিয়া আবার ছাতা লইয়া আসিতে উদ্যত। অল্প খানিক সঙ্গে থাকাতে এত 'আমার' বুদ্ধি! কি ভয়ানক! ভাবিয়া দেখিলে সুখকে সুখ বলিয়া বোধ হইবে না। যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হইবে। সুখ প্রলোভনকে বিভীষিকাময়, ভ্রান্তিময়, মায়াময় পিশাচিনী বোধ হইবে। কি ভয়ানক! ইহারি মধ্যে বাস! মোহ যাবে কিসে? ঘোরা-ঘুরি নিবৃত্তি হবে কিসে?

উপায় আছে।

উপায় আছে। যে সংসারের রহস্য বুঝিয়াছে, তাহাকে চিরকাল এই যন্ত্রণায় থাকিতে হইবে না। তাহার পক্ষে আশাবাণী আছে। ওই যে প্রাণের ভিতর—কেমন করে মায়ার পারে যাব, এই ইচ্ছা হয়েছে, ঐ হচ্চে প্রমাণ যে, পারে যেতে পারা যাবে। যে পরিমাণে এই ইচ্ছার, এই শুভ বাসনার বিকাশ, সেই পরিমাণে উহার উপলব্ধি।

সংসারের কপটতাটা আগে ছাড়্‌তে হবে। আমাদের জীবন বড় আইন কানুন সভ্যতা শিষ্টাচারে বেষ্টিত কিন্তু এই সভ্যতা শিষ্টতা, বাহিরে মধুর হাসি, সুখের রাশির ভিতর কি? ভেতরে জ্বল্‌ছে তুষানল, যেগুলিকে নীচ প্রবৃত্তি বলে অথবা যাহাকে নীচ প্রকৃতি বলা যায়,—তারই রাজত্ব। কামনা যার আছে, সে নীচ, ছোট লোক, তা আর বোল্‌তে। মন, একবার ভরসা করে, ভেতরবার এক করে ফেল দেখি। বলুক লোকে পাগল, বলুক লোকে ভ্রান্ত, লোকের তোয়াক্কা কি? লোকে তোকে কি সাহায্য কত্তে পারে? তুই আপনি ভাল থাক্‌লেই জগৎ ভাল, সব ভাল।

সত্য কি, জান্‌লুম না, কেবল ঘুরে মলুম। সময় পেলুম না, সত্য কি জান্‌তে আর সব কাযের সময় পেলুম। হায় হায়, আপনার গালে আপনি চড়াতে ইচ্ছা করে যে। মন, এখনো বোঝ্‌, বিচারবান পুরুষদের সঙ্গ কর্। একটু স্থির হয়ে ভাব্‌তে শেখ্‌—কর্ম্মতত্ত্ব বুঝ্‌তে শেখ্‌।"

ভাষ্যানুবাদ। কি প্রকার বিশেষণযুক্তপুরুষকে প্রাপ্ত হয়, তাহাই বলা হইতেছে। "কবি" অতীতদর্শী (অর্থাৎ) সর্ব্বজ্ঞ, "পুরাণ" চিরন্তন, "অনুশাসিতা" সকল জগতের প্রশাসিতা, "অণু" সূক্ষ্ম হইতেও "অণীয়ান্" সূক্ষ্মতর, "সকলের ধাতা" সকল প্রকার কর্ম্মফলের বিভাগকারী, বিচিত্র কর্ম্মফলনিচয়ের যথাযোগ্য বিভাগপূর্ব্বক প্রদাতা, "অচিন্ত্যরূপ" যাঁহার রূপ নিয়ত হইলেও কেহই চিন্তা করিয়া উঠিতে পারে না, "আদিত্যবর্ণ" আদিত্যের ন্যায় নিত্যচৈতন্য প্রকাশরূপ বর্ণ যাঁহার আছে, তিনিই আদিত্যবর্ণ; এই প্রকার বিশেষণযুক্ত পুরুষকে যে কোন ব্যক্তি অনুসরণ করে, সেই সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই পূর্ব্ব বাক্যের সহিতই ইহার সংবন্ধ আছে। ৯।

প্রয়াণকালে মনসাহচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ১০॥

অন্বয়। প্রয়াণকালে অচলেন মনসা ভক্ত্যা যোগবলেন চ যুক্তঃ ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য চ স তং পরং দিব্যং পুরুষং উপৈতি। ১০।

মূলানুবাদ। মরণকালে নিশ্চলহৃদয় সেই ব্যক্তি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে সম্যক্ আবিষ্ট করিয়া ভক্তি এবং যোগবলে সেই আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০।

ভাষ্য। কিঞ্চ প্রয়াণকালে মরণকালে মনসাহচলেন চলনবর্জ্জিতেন ভক্ত্যা যুক্তো ভজনং ভক্তিঃ তয়া যুক্তো যোগবলেন চৈব যোগস্য বলং যোগবলং তেন সমাধিজসংস্কারপ্রচয়জনিতচিত্তস্থৈর্য্যলক্ষণং যোগবলং তেন চ যুক্ত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং হৃদয়পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য চিত্তং তত ঊর্দ্ধগামিন্যা নাড্যা ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য স্থাপয়িত্বা সম্যক্ অপ্রমত্তঃ সন্ সএবং বুদ্ধিমান্ যোগী কবিং পুরাণমিত্যাদিলক্ষণং তং পরং পুরুষং উপৈতি প্রতিপদ্যতে দিব্যং দ্যোতনাত্মকম্। ১০।

ভাষ্যানুবাদ। প্রয়াণকালে অর্থাৎ মরণকালে নিশ্চলহৃদয়ে ভক্তিযুক্ত ও যোগবলযুক্ত হইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে, ঊর্দ্ধগামিনী নাড়ীদ্বারা ভূমিজয়ক্রমে প্রাণকে আবিষ্ট করিয়া সম্যক্ অপ্রমত্ত সেই বুদ্ধিমান যোগী, সেই কবিপুরাণ ইত্যাদি নামের প্রতিপাদ্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই পুরুষ দিব্য—অথ

স্রোতনাম্মা। এই শ্লোকে ভক্তিশব্দের অর্থ ভজন, যোগের বল এই তাৎপর্য্যে যোগবল এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, সমাধিসংস্কারসমূহের দ্বারা উৎপাদিত যে চিত্তৈশ্বর্য্য, তাহাই এই স্থলে যোগবল শব্দের অর্থ। যোগীর এই প্রকার অবস্থার পূর্ব্বে হৃদয়পুণ্ডরীকে ধারণা দ্বারা চিত্তকে বশীকৃত করিতে হয়, তাহার পর ভূমিজয় ও সুষুম্না নাড়ী দ্বারা প্রাণকে ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিতে হয়। (ভূমি-জয় শব্দের অর্থ পঞ্চভূতের বশীকরণ)। ১০।

যদক্ষরং বেদবিদোবদন্তি
বিশন্তি যদ্যতয়োবীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১॥

অন্বয়। বেদবিদঃ যৎ অক্ষরং বদন্তি বীতরাগা যতয়ঃ যৎ বিশন্তি যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ পদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। ১১।

মূলানুবাদ। বেদবিদ্গণ যে অবিনাশি বস্তুর বর্ণনা করিয়া থাকেন, বীতরাগ সন্ন্যাসিগণ যে পদে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা করিয়া (ব্রহ্মচারিগণ) ব্রহ্মচর্য্যব্রত করিয়া থাকেন, আমি তোমাকে সংক্ষেপে সেই (ব্রহ্ম)পদ বিষয়ে প্রকৃষ্ট উপদেশ প্রদান করিতেছি। ১১।

ভাষ্য। পুনরপি বক্ষ্যমানেন উপায়েন প্রতিপিৎসিতস্য ব্রহ্মণো বেদবিদ্-বদনাদিবিশেষণবিশেষ্যস্যাভিধানং করোতি ভগবান্। যদক্ষরং ন ক্ষরতীত্য-ক্ষরং অবিনাশি বেদবিদো বেদার্থজ্ঞা বদন্তি। "তদ্বাএতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি"। ইতি শ্রুতেঃ। সর্ব্ববিশেষনিবর্ত্তকত্বেন অভিবদন্তি। অস্থূলমনণু ইত্যাদি। কিঞ্চ বিশন্তি প্রবিশন্তি সম্যগ্দর্শনপ্রাপ্তৌ সত্যাং যদ্যতয়ঃ যতন-শীলাঃ সংন্যাসিনঃ বীতরাগা বিগতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ। যচ্চাক্ষর-মিচ্ছন্তো জ্ঞাতুমিতি বাক্যশেষঃ। ব্রহ্মচর্য্যং গুরৌ চরন্তি তত্তে পদং তদক্ষরাখ্যং পদং পদনীয়ং তে তুভ্যং সংগ্রহেণ সংগ্রহঃ সংক্ষেপঃ তেন সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে কথয়িষ্যামি। ১১।

ভাষ্যানুবাদ। যাহাকে বুঝিবার জন্য, অর্জ্জুন, অভিলাষী বেদবিদ্গণ যাহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন, ইত্যাদি নানা বিশেষণের যাহা বিশেষ্য, সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব বক্ষ্যমাণ উপায়ের দ্বারা ভগবান্ পুনর্ব্বার প্রতিপাদন করিতেছেন। যাহার ক্ষরণ অর্থাৎ ধ্বংস হয়, তাহাকে ক্ষর কহে; যাহা ক্ষর নহে, তাহাই অক্ষর।

"বেদবিদ্" বেদার্থজ্ঞব্যক্তিগণ যাহাকে "অক্ষর" অবিনাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (কারণ) শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, "হে গার্গি, ব্রাহ্মণগণ এই পরমাত্মাকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন" অর্থাৎ সকল প্রকার ভেদবিনির্ম্মুক্ত, এইকারণ তাহা স্থূল নহে সূক্ষ্মও নহে, ইত্যাদি প্রকারে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। আরও 'যতি' প্রযত্নপর সংন্যাসিগণ "বীতরাগ" (অর্থাৎ যাহাদের রাগ নিবৃত্ত হইয়াছে) হইয়া সম্যক্ জ্ঞানপ্রাপ্তির পরে যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। যে অক্ষরকে ("বুঝিবার জন্য" এই অংশটুকু বাক্যের মধ্যে পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে) অভিলাষ করিয়া (ব্রহ্মচারিগণ) গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই "অক্ষরনামকপদ" (চরমগন্তব্য বস্তু) আমি তোমাকে সংগ্রহে বলিতেছি—সংগ্রহ শব্দের অর্থ সংক্ষেপ অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতেছি; ইহাই তাৎপর্য্য। ১১।

ভাষ্য। "স যোঽহবৈ তদ্ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত কতমং বাব স তেন লোকং জয়তি ইতি তস্মৈ স হোবাচ এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ" ইত্যুপক্রম্য "যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ ওমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত" ইত্যাদিনা বচনেন "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ" ইতি চ উপক্রম্য "সর্ব্বে বেদাযৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওঁ ইত্যেতৎ ॥" ইত্যাদিভিশ্চবচনৈঃ পরস্য ব্রহ্মণো বাচকরূপেণ প্রতিমাবৎপ্রতীকরূপেণ চ পরব্রহ্মপ্রতিপত্তিসাধনত্বেন মন্দমধ্যমবুদ্ধীনাং বিবক্ষিতস্য ওঁকারস্য কালান্তরে মুক্তিফলমুক্তং যত্তদেব ইহাপি "কবিং পুরাণমনুশাসিতারং" "যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি" ইতি চ উপন্যস্তস্য পরস্য ব্রহ্মণ পূর্ব্বোক্তরূপেণ প্রতিপত্ত্যুপায়ভূতস্য ওঁকারস্য কালান্তরমুক্তিফলমুপাসনং যোগধারণাসহিতং বক্তব্যং প্রসক্তানুপ্রসক্তঞ্চ যৎকিঞ্চিদিত্যেবমর্থ উত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে (আশয় ভাষ্য)—। ১২।

ভাষ্যানুবাদ। "হে ভগবন্, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই যে ব্যক্তি মরণকাল পর্য্যন্ত ওঁকারের ধ্যান করিয়া থাকে, সে কোন্ লোককে জয় করিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ তিনি তাহাকে বলিলেন যে, হে সত্যকাম! এই যে ওঁকার, ইহা পর ও অপর" উপক্রমে এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি এই ত্রিমাত্র ওঁকারের দ্বারা সেই পরম পুরুষকে ধ্যান করিবে," ইত্যাদি; আবার শ্রুতির অন্যস্থানে—"যাহা ধর্ম্মের দ্বারা পাওয়া

যায় না ও যাহা অধর্ম্মের দ্বারাও পাওয়া যায় না" এই প্রকার উপক্রম করিয়া পরে অভিহিত হইয়াছে যে, "সকল বেদ যে পদকে প্রকাশ করিয়া থাকে, সকল তপস্যা যাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করে, যাহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সেই পদ আমি তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি। ওঁকারই সেই পদ"। এই সকল বচন দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ওঁকার পরব্রহ্মের বাচক এবং প্রতিমাদির ন্যায় ওঁকার পরব্রহ্মের ধ্যেয়মূর্ত্তি। যাহারা মন্দবুদ্ধি অথবা মধ্যমবুদ্ধি, তাহাদের পক্ষে এইভাবে ওঁকারের উপাসনা কালান্তরে মুক্তিরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই যে বিষয়টী বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহাই এইক্ষণে প্রতিপাদন করিবার জন্য উত্তর গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে। (শুধু বেদে কেন) এই গীতা শাস্ত্রেও "কবি পুরাণ ও অনুশাসিতা" "বেদবিদ্গণ যে অক্ষর বিষয়ে উপদেশ দেন" ইত্যাদি বাক্যে যে পরব্রহ্মের উপন্যাস করা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মের প্রতিপত্তির সাধন ওঁকার পূর্ব্বোক্তপ্রকারে হইয়া থাকে, সেই ওঁকারের উপাসনা কালান্তরে মুক্তিরূপফলের সাধন হয়, তাহাই এইক্ষণে যোগধারণার সহিত বলিতে হইবে এবং তাহার প্রসঙ্গে আরও কিছু বলিতে হইবে, এই কারণে উত্তর গ্রন্থের আরম্ভ করা হইতেছে, (দ্বাদশ শ্লোকের আশয় ভাষ্য)। ১২।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২॥

অন্বয়। সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য হৃদি মনো নিরুধ্য আত্মনঃ প্রাণং মূর্দ্ধ্নি আধায় চ যোগধারণামাস্থিতঃ (ভবেৎ)। ১২।

মূলানুবাদ। সকল ইন্দ্রিয়দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া হৃদয়পুণ্ডরীকে অন্তঃকরণকে সমাহিত করিয়া ও আত্মপ্রাণ মূর্দ্ধদেশে আহিত করিয়া (সাধক) যোগ ধারণাকে অবলম্বন করিবে।

ভাষ্য। সর্ব্বদ্বারাণি সর্ব্বাণি চ তানি দ্বারাণি চ সর্ব্বদ্বারাণি উপলব্ধৌ, তানি সর্ব্বাণি সংযম্য সংযমনং কৃত্বা মনোহৃদি হৃদয়পুণ্ডরীকে নিরুধ্য নিরোধং কৃত্বা নিষ্প্রচারতামাপাদ্য তত্র বশীকৃতেন মনসা হৃদয়াদূর্দ্ধগামিন্যা নাড্যা ঊর্দ্ধমারুহ্য মূর্দ্ধনি আধায় আত্মনঃ প্রাণমাস্থিতঃ প্রবৃত্তো যোগধারণাং ধারয়িতুং। ১২।

ভাষানুবাদ। সর্ব্বদ্বার অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ ইন্দ্রিয়রূপ সকল দ্বারকে সংযত করিয়া হৃদয়পুণ্ডরীকে মনকে নিরুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ তাহার

বিক্ষেপ বন্ধ করিয়া সেইস্থানে বশীকৃত অন্তঃকরণের দ্বারা হৃদয় হইতে উৰ্দ্ধ-গামিনী নাড়ীর ভিতর দিয়া উৰ্দ্ধে মূৰ্দ্ধদেশে আপনার প্রাণকে তুলিয়া যোগ-ধারণা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত (হইবে)। ১২।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩॥

অন্বয়। ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ (তথা) মাং অনুস্মরন্ দেহং ত্যজন্ যঃ প্রযাতি স পরমাং গতিং যাতি। ১৩।

মূলানুবাদ। (তাহার পর) ওঁ এই অক্ষররূপ ব্রহ্মটী উচ্চারণ করত আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহপরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, সে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। ১৩।

ভাষ্য। তত্রৈব চ ধারয়ন্ ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽভিধানভূত-মোঙ্কারং ব্যাহরন্ উচ্চারয়ন্ তদর্থভূতং মামীশ্বরং অনুস্মরন্ অনুচিন্তয়ন্ যঃ প্রয়াতি ম্রিয়তে স ত্যজন্ পরিত্যজন্ দেহং শরীরং ত্যজন্ দেহমিতি প্রয়াণ-বিশেষণার্থং দেহত্যাগেন প্রয়াণমাত্মনো ন স্বরূপনাশেন ইত্যর্থঃ। স এবং ত্যজন্ যাতি গচ্ছতি পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিম্। ১৩।

ভাষ্যানুবাদ। সেই স্থানেই প্রাণকে স্থাপিত করিয়া যে ব্যক্তি ওঁ এই একটী অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্ম অর্থাং ব্রহ্মের বাচকশব্দটীকে উচ্চারণ করিয়া এবং সেই ওঁকারের অর্থ ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে চিন্তা করিতে করিতে "দেহ" শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রয়াণ করে অর্থাং মৃত্যুলাভ করে, এখানে দেহ পরিত্যাগ করা বিষয়ে যে কথা বলা হইল, তাহা দ্বারা মৃত্যুরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দেহের সহিত সম্বন্ধনাশই আত্মার মৃত্যু; আত্মার স্বরূপ নাশের দ্বারা মৃত্যু হইতে পারে না (কারণ আত্মা অবিনাশী) এই প্রকার-ভাবে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে প্রয়াণ করে, সে "পরম" প্রকৃষ্ট গতিকে লাভ করিয়া থাকে। ১৩।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪॥

অন্বয়। হে পার্থ! সততং অনন্যচেতাঃ (সন্) যো মাং নিত্যশঃ স্মরতি তস্য নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ। ১৪।

মূলানুবাদ। হে পার্থ, সর্ব্বদা অনন্যচেতা হইয়া যে ব্যক্তি আমাকে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্মরণ করে, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ হই। ১৪।

ভাষ্য। কিঞ্চ অনন্যচেতাঃ নান্যবিষয়ে চেতো যস্য সোঽয়মনন্যচেতা যোগী সততং সর্ব্বদা যোমাং পরমেশ্বরং স্মরতি নিত্যশঃ। সততমিতি নৈরন্তর্য্য-মুচ্যতে নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালত্বমুচ্যতে। ন ষণ্মাসং সংবৎসরং বা কিংতর্হি যাবজ্জীবং নৈরন্তর্য্যেণ যো মাং স্মরতীত্যর্থঃ। তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য সদা সমাহিতস্য যোগিনঃ। যত এবমতো-ঽনন্যচেতাঃ সন্ ময়ি সদা সমাহিতো ভবেৎ। ১৪।

ভাষ্যানুবাদ। আরও "অনন্যচেতাঃ" অন্য বিষয়ে যাহার চিত্ত থাকেনা। সেই ব্যক্তিই অনন্যচেতাঃ। এইরূপ অনন্যচেতাঃ যে যোগী "সতত" সর্ব্বদা আমাকে (অর্থাৎ) পরমেশ্বরকে নিত্য স্মরণ করিয়া থাকে। সতত এই শব্দের দ্বারা নৈরন্তর্য্য কথিত হইতেছে. নিত্যশঃ এই শব্দের অর্থ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া। ছয়মাস নহে, একবৎসর নহে, কিন্তু যতদিন বাঁচিবে, ততদিন নিরন্তর যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করিবে. ইহাই তাৎপর্য্য। সেই "নিত্যযুক্ত" সর্ব্বদা সমাহিত যোগীর, হে পার্থ, আমি সুলভ অর্থাৎ অনায়াসলভ্য। যে কারণ এইরূপ, এই-জন্য আমাতে অনন্যচেতা হইয়া সর্ব্বদা সমাহিত হইবে।১৪।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়। মহাত্মানঃ মাং উপেত্য পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ (সন্তঃ) দুঃখালয়ং অশাশ্বতং জন্ম পুনর্ন প্রাপ্নুবন্তি। ১৫।

মূলানুবাদ। মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পরমসিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক আর দুঃখপূর্ণ অনিত্য জন্মলাভ করেন না। ১৫।

ভাষ্য। তব সৌলভ্যেন কিং স্যাদিত্যুচ্যতে শৃণু তন্মম সৌলভ্যেন যদ্-ভবতি মামুপেত্য মাং ঈশ্বরমুপেত্য মদ্ভাবমাপদ্য পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তিং ন প্রাপ্নুবন্তি কিং বিশিষ্টং পুনর্জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তীতি তদ্বিশেষণমাহ দুঃখালয়ং দুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনাং আলয়ং আলীয়ন্তে যস্মিন্ দুঃখানি ইতি দুঃখালয়ং জন্ম। ন কেবলং দুঃখালয়মশাশ্বতং অনবস্থিতস্বরূপং চ নাপ্নুবন্তীদৃশং পুনর্জন্ম মহাত্মানঃ যতয়ঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাং পরমাং প্রকৃষ্টাং গতাঃ প্রাপ্তাঃ। যে পুনর্মাং ন প্রাপ্নুবন্তি তে পুনরাবর্ত্তন্তে। ১৫।

ভাষ্যানুবাদ। তুমি সুলভ হইলে কি হয়? ইহারই উত্তর দেওয়া যাইতেছে। আমি সুলভ হইলে যাহা হয়, তাহা (বলিতেছি) শ্রবণ কর। আমাকে (অর্থাৎ) ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ আমার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া "পুনর্জন্ম" পুনরুৎপত্তি লাভ করে না। সে পুনর্জন্ম কিরূপ, যাহাকে প্রাপ্ত হয় না? তাহার বিশেষণ বলিতেছেন, "দুঃখালয়" আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ত্রিবিধ দুঃখের আলয়; যাহাতে সকলপ্রকার দুঃখ আলীন থাকে, সেই জন্মকেই দুঃখালয় বলা যায়। কেবল দুঃখালয়ই যে, তাহা নহে, "অশাশ্বত" অনবস্থিতস্বভাব। যাহারা "মহাত্মা" যতি সংন্যাসী, তাঁহারা এই প্রকার পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন না। (কেন?) যে হেতুক তাঁহারা মোক্ষনামক প্রকৃষ্টসংসিদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হয়, তাহারাই সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিয়া থাকে। ১৫।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। হে অর্জ্জুন, আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ (ভবন্তি) হে কৌন্তেয়, মাং উপেত্য তু পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ১৬।

মূলানুবাদ। হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোকের সহিত সকললোকই এ সংসারে পুনর্ব্বার আবর্ত্তন করে। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ১৬।

ভাষ্য। কিং পুনস্ত্বত্তোঽন্যৎপ্রাপ্তাঃ পুনরাবর্ত্তন্তে? ইত্যুচ্যতে আব্রহ্ম-ভুবনাৎ ভবন্তি যস্মিন্ ভূতানি ইতি ভুবনং ব্রহ্মভুবনং ব্রহ্মলোকঃ। ইত্যর্থঃ। আব্রহ্মভুবনাৎ সহ ব্রহ্মভুবনেন লোকাঃ সর্ব্বে পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবর্ত্তনস্বভাবাঃ; হে অর্জ্জুন, মামেকমুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তির্নবিদ্যতে। ১৬।

ভাষ্যানুবাদ। তবে তুমি ছাড়া অন্য কাহাকেও পাইলে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়? তাহারই উত্তর এই হইতেছে যে, "ব্রহ্মভুবন" যাহাতে প্রাণিগণ উৎপত্তি লাভ করে, তাহার নাম ভুবন; ব্রহ্মের (চতুরাননের) ভুবন ব্রহ্মভুবন অর্থাৎ ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মভুবন হইতে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের সহিত আর সকল লোকই পুনরাবর্ত্তী অর্থাৎ পুনরাবর্ত্তনস্বভাব। হে অর্জ্জুন! আমাকে প্রাপ্ত হইয়া কিন্তু হে কৌন্তেয়, পুনরুৎপত্তি হয় না। ১৬।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণোবিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তামহোরাত্রবিদোজনাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। অহোরাত্রবিদোজনা যৎ সহস্রযুগপর্য্যন্তং তদ্ব্রহ্মণঃ অহর্বিদুঃ (তথা) যুগসহস্রান্তাং (ব্রহ্মণো) রাত্রিং বিদুঃ ১৭।

মূলানুবাদ। অহোরাত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ জানিয়াছেন যে, ব্রহ্মার দিন এক সহস্র যুগ পর্য্যন্ত, এবং ব্রহ্মার রাত্রিও এক সহস্র যুগ পর্য্যন্ত। ১৭।

ভাষ্য। ব্রহ্মলোকসহিতা লোকাঃ কস্মাৎ পুনরাবর্ত্তিনঃ কালপরিচ্ছিন্নত্বাৎ কথম্ সহস্রযুগপর্য্যন্তং সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তঃ পর্য্যবসানং যস্যাহ্নঃ তদহঃ সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ প্রজাপতের্বিরাজঃ বিদুঃ রাত্রিমপি যুগসহস্রান্তাং অহঃপরিমাণামেব। কে বিদুরিত্যাহ তে অহোরাত্রবিদঃ কালসংখ্যাবিদঃ জনা-ইত্যর্থঃ। যত এবং কালপরিচ্ছিন্নাস্তেহতএব পুনরাবর্ত্তিনঃ লোকাঃ। ১৭।

ভাষ্যানুবাদ। ব্রহ্মলোকের সহিত সকল লোকই কেন পুনরাবর্ত্তন করে? যেহেতুক সকললোকই কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিরূপ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন? তাহাই বলা হইতেছে। "সহস্র যুগ পর্য্যন্ত" সহস্র যুগ যাহার পর্য্যন্ত অর্থাৎ পর্য্যবসান, তাহার নাম সহস্রযুগপর্য্যন্ত। অহঃ অর্থাৎ দিন, ব্রহ্মা অর্থাৎ প্রজাপতিবিরাজের দিনের পরিমাণ এক সহস্র যুগ, তাঁহার রাত্রিও এইরূপ যুগসহস্রপর্য্যন্ত অর্থাৎ তাঁহার দিনের যাহা পরিমাণ, রাত্রিরও সেই পরিমাণ। এই পরিমাণ কাহারা জানে? সেই অহোরাত্রবিদ্ অর্থাৎ কাল-পরিমাণজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই প্রকার ব্রহ্মার দিন রাত্রির পরিমাণ জানেন। যে কারণে ঐ সকল লোক কালপরিচ্ছিন্ন, এই কারণেই তাহারা পুনরাবর্ত্তন-স্বভাব, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৭।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। অহরাগমে সর্ব্বাব্যক্তয়ঃ অব্যক্তাৎ প্রভবন্তি রাত্র্যাগমে তত্রৈব অব্যক্তসংজ্ঞকে প্রলীয়ন্তে। ১৮।

মূলানুবাদ। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকলব্যক্তিই সেই ব্রহ্মের দিনকালে অব্যক্ত হইতে প্রকাশিত হয় এবং রাত্রির আগমনে আবার তাহারা সেই অব্যক্তে বিলীন হয়। ১৮।

ভাষ্য।—প্রজাপতেরহনি যদ্ ভবতি রাত্রৌ চ তদুচ্যতে। অব্যক্তাৎ অব্যক্তং-

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [২৭১ পৃষ্ঠার পর।

একাদশ অধ্যায়। দীক্ষা।

এই অনিষ্টপাতের অন্যূন ছয় মাস পূর্ব্বে রামানুজকে আর এক বিষম মর্ম্মবেদনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। পুত্রপ্রাণা পতিপরায়ণা কান্তিমতী পুত্রের মায়া কাটাইয়া পতিপদতলে প্রস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজপত্নী জমাম্বা এক্ষণে গৃহিণী। তিনি পরমরূপবতী ছিলেন। স্বাভাবিক পতিভক্তি থাকিলেও, বাহ্যিক আচার প্রতিপালনে বা দেহের শৌচ ও সৌষ্ঠব বিধানে তাঁহার অধিকতর ভক্তি ছিল। আপনার স্বার্থে হস্ত না পড়িলে, তিনি সেবা ও শুশ্রূষা দ্বারা পতিকে যথাসাধ্য প্রীত ও সন্তুষ্ট করিতে যত্নবতী হইতেন।

কাঞ্চিপুর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অবধি রামানুজের গৃহকর্ম্মে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়া জমাম্বা অন্তরে তাদৃশ সুখী ছিলেন না। কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। হৃদয়ে রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইলেও, বাহিরে তাহার কোনও আকার প্রকাশ করিতেন না।

রামানুজ অধিকাংশ কালই শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের নিকট থাকিতেন। তাঁহার বদন সর্ব্বদাই মলিন, মনে তাদৃশ সুখ নাই। কাঞ্চিপূর্ণ ইহা দেখিয়া একদা তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, "বৎস, মনে কষ্ট পাইও না। শ্রীবরদরাজে ভক্তিমান্ হও। তাঁহার সেবার জন্য যেমন প্রতিদিন জল আনয়ন করিতেছ, সেইরূপ কর। তাঁহার প্রসাদে পরম মঙ্গল হইবে। আল্‌ওয়ান্দারের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল, এইজন্যই তিনি শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে নিত্যশান্তি লাভ করিয়াছেন। তুমি তাঁহার সম্মুখে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এক্ষণে তাহা সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হও।" ইহাতে রামানুজ কহিলেন, "আপনি আমায় শিষ্য করুন। আপনার পদচ্ছায়ায় আমায় বিশ্রাম করিবার অনুমতি দিন।" এই বলিয়া তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। কাঞ্চিপূর্ণ তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া কহিলেন, "তুমি এরূপ ব্যস্ত হইও না। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র। শূদ্রের ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদানের অধিকার নাই। ভবিষ্যতে আর আমার সম্মুখে এরূপ প্রণাম করিও না। শ্রীমন্নারায়ণ তোমার জন্য শীঘ্রই গুরু প্রেরণ করিবেন। তজ্জন্য চিন্তিত হইও না।" ইহা কহিয়া কাঞ্চিপূর্ণ মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রামানুজ মনে মনে ভাবিলেন যে, ইনি আমায় হীন-অধিকারী বিবেচনা করিয়া কৃপা করিতেছেন না। যাহা হউক, আমি উঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব। যিনি বরদরাজের সহিত অহরহ বিহার করেন, তাঁহার আবার জাতি কুল কি? তাঁহার কটাক্ষে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে।" ইহা ভাবিয়া তিনি সেই দিবস সায়ংকালে কাঞ্চিপূর্ণের নিকট গমন করিয়া অতি অনুনয় সহকারে পরদিবস তাঁহার আলয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন ও বলিলেন, "কল্য আমি তোমার ন্যায় পরমভক্তের অন্নগ্রহণ করিয়া রজস্তমোময় আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলিব এবং তাহা হইলে শ্রীমন্নারায়ণ আর কখনও আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারিবেন না। অহো! আমার পরম সৌভাগ্য!

শ্রীরামানুজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গৃহিণীকে পরদিবস প্রাতঃকালে উত্তম পাক করিতে কহিলেন। তিনি মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া জমাম্বা স্নান সমাপনান্তে পাক আরম্ভ করিলেন। বেলা এক প্রহর না হইতে হইতেই নানাবিধ ব্যঞ্জন সহিত অন্ন রন্ধন করিয়া ফেলিলেন। রামানুজ তাহা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং কাঞ্চি-পূর্ণকে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে শ্রীমদ্বরদরাজসেবক রামানুজের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অন্যপথ দিয়া তদীয় ভবনে উপনীত হইলেন, এবং জমাম্বাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মাতা, অদ্য আমায় শীঘ্র শীঘ্র মন্দিরে যাইতে হইবে; যাহা কিছু পাক হইয়াছে, তাহাই সন্তানকে অর্পণ করুন। আমি কালবিলম্ব করিতে পারিতেছি না। আপনার ভর্ত্তা কোথায়?" জমাম্বা ইহা শুনিয়া কহিলেন, "মহাত্মন্, তিনি আপনার অন্বেষণেই গমন করিয়াছেন, এখনই আসিবেন, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।" কাঞ্চিপূর্ণ কহিলেন, "না মা, আমি এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে পারিব না, আমি স্বীয় উদর ভরণার্থ প্রভুর সেবায় অবহেলা করিতে পারিব না।" জমাম্বা ইহা শুনিয়া, পাছে অভ্যাগত বিমুখ হইয়া যান, সেইভয়ে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, কাঞ্চিপূর্ণকে আসন ও পানার্থ-উদক অর্পণ করিলেন, এবং যাহা রন্ধন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় একে একে পরিবেশন করিয়া নিমন্ত্রিতকে বহুসমাদরে ভোজন করাইলেন। আহার শেষ হইলে কাঞ্চিপূর্ণ স্বয়ং উচ্ছিষ্ট পত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করতঃ স্থানকে গোময়লিপ্ত

করিলেন এবং মুখশুদ্ধি গ্রহণপূর্ব্বক জমাম্বাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। গৃহিণী আহার্য্যের অবশিষ্টাংশ কোনও শূদ্রকে দিয়া পাত্রাদি মার্জ্জিত করিয়া লইলেন, এবং পাকগৃহ সংস্কার পূর্ব্বক স্নান করিয়া আসিয়া ভর্ত্তার জন্য পুনঃ পাক আরম্ভ করিলেন।

রামানুজ প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে, তাঁহার গৃহিণী সদ্যঃস্নাতা হইয়া পুনরায় পাককার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, এবং যাহা কিছু পাক করা হইয়াছিল, তাহার লেশমাত্রও অবশিষ্ট নাই। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ কি আসিয়াছিলেন? তুমি পুনরায় পাক করিতেছ কেন? প্রাতঃকাল হইতে যাহা রন্ধন করিয়াছিলে, সে সমুদয় কোথায়?" জমাম্বা উত্তর করিলেন, "মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণ আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলাম কিন্তু তিনি ভগবৎসেবার জন্য শীঘ্র মন্দিরে যাইবেন বলিয়া এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না, সুতরাং আমি তোমার অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহাকে, যাহা পাক করিয়াছিলাম, তৎ-সমুদয়ই দিয়াছি। তাঁহার ভোজন সমাপ্তির পর তিনি স্বয়ংই স্থান পরিষ্কার করিলেন, এবং আমিও যে সকল অন্ন ব্যঞ্জন অবশিষ্ট ছিল, তাহা শূদ্র প্রতি-বেশিনীকে দিয়াছি এবং তোমার জন্য পুনরায় স্নান করিয়া পাক করিতেছি। শূদ্রের ভুক্তাবশিষ্ট তোমায় কি করিয়া দিই বল?" ইহাতে রামানুজ নিরতিশয় ব্যথা পাইলেন, এবং অতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "অয়ি মুগ্ধে, তোমার কোনও কার্য্যাকার্য্য বিচার নাই। তুমি মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণের প্রতি শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া অতি ক্ষুদ্রচিত্তের কর্ম্ম করিয়াছ। আমার অদৃষ্টে সেই মহাপুরুষের প্রসাদ ঘটিল না। আমি নিতান্তই ভাগ্যহীন।" এই বলিয়া ক্ষোভে মস্তকে করাঘাতপূর্ব্বক গৃহের বাহিরে বৃক্ষমূলে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

এদিকে কাঞ্চিপূর্ণ বরদরাজকে ব্যজন করিতে করিতে কহিলেন, "প্রভো, এ তোমার কি ব্যবহার? আমি তোমার ও তোমার ভক্তের দাস্য করিয়া জীবন অতিবাহিত করিব, তাহা না হইয়া কি না আমায় একটা মহাপুরুষ করিয়া তুলিলে? সাক্ষাৎ রামানুজের অবতার শ্রীমান্ রামানুজ আমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। আমার উচ্ছিষ্ট ভোজনের জন্য লালায়িত হইয়া, অদ্য আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কোথায় আমি তোমার ও তোমার ভক্তগণের নিরন্তর পূজা করিব, তাহা না হইয়া স্বয়ংই পূজ্য হইতে চলিলাম? অনুমতি কর, আমি তিরুপতিতে গিয়া তোমার বালাজী মূর্ত্তির সেবা করি।" বরদরাজ

আজ্ঞা দিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ তিরুপাততে গমন করিয়া বালাজীর সেবায় ছয় মাস কাল অতিবাহিত করিলেন। পরে এক দিবস নারায়ণ তাঁহাকে কহিলেন, "কাঞ্চিপুরে গ্রীষ্মাতিশয়ে আমি অতিশয় কষ্টভোগ করিতেছি। তুমি সেইখানে যাইয়া আমাকে ব্যজন কর।" ইহাতে কাঞ্চিপূর্ণ পুনরায় কাঞ্চিপুরে আগমন করিলেন।

ইতিমধ্যে এক তৈলস্নান দিবসে* আহারাভাবে শীর্ণকলেবর শূদ্রদাস রামানুজের অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতে আসিলে, তাহাকে দেখিয়া তাঁহার করুণার সঞ্চার হইল। তিনি গৃহিণীকে কহিলেন, "যদি গতদিবসের পর্য্যুষিত অন্ন থাকে, তাহা হইলে এই দরিদ্রদাসকে দাও। ইহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন এ তিন চারিদিবস অনাহারে রহিয়াছে।" তাহাতে গৃহিণী উত্তর করিলেন, "পর্য্যুষিত অন্ন কিছুই নাই। এত প্রাতে অন্ন কোথায় পাইব?" ইহা কহিয়া তিনি স্নানার্থ প্রস্থান করিলেন। শ্রীরামানুজ ভার্য্যার বাক্যে সন্দেহ করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, প্রভূত পর্য্যুষিত অন্ন রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তৎসমুদায় দাসকে দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তিপূর্ব্বক তৈলমর্দ্দন করিতে অনুমতি দিলেন।

কাঞ্চিপূর্ণ তিরুপতি হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া রামানুজ তাঁহাকে দর্শনার্থ গমন করিলেন। বহুকালের পর পরমমিত্রকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা উভয়ে উভয়কে দেখিয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন। নানাবিধ বাক্যালাপের পর রামানুজ বরদসেবককে কহিলেন, "মহাত্মন্, কতিপয় সন্দেহ আমার হৃদয়কে নিরন্তর উদ্বেলিত করিতেছে। আপনি বরদরাজকে কহিয়া সেই সকল সন্দেহ দূর করিয়া দিলে, আমি শান্তি লাভ করি। নতুবা বড়ই কষ্ট পাইতেছি। দুঃখের কথা আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকে কহিব?" কাঞ্চিপূর্ণ কহিলেন, "আমি প্রভুকে এবিষয় নিবেদন করিব।"

পর দিবস রামানুজ কাঞ্চিপূর্ণের নিকট গমন করিলে তিনি কহিলেন, "বৎস, তোমার সম্বন্ধে গতরজনীতে শ্রীবরদরাজ এইরূপ কহিয়াছেন,—

"অহমেব পরং ব্রহ্ম জগৎকারণকারণম্।
ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদঃ সিদ্ধ এব মহামতে॥

* প্রতি সপ্তাহে আপাদমস্তক তৈলে সিক্ত করিয়া উষ্ণোদকে স্নান দাক্ষিণাত্যবাসিদের চিরন্তন প্রথা। ইহাকেই তৈলস্নান কহে।

মোক্ষোপায়ো ন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম্।
মদ্ভক্তানাং জনানাঞ্চ নান্তিমস্মৃতিরিষ্যতে॥
দেহাবসানে ভক্তানাং দদামি পরমং পদম্।
পূর্ণাচার্য্যং মহাত্মানং সমাশ্রয় গুণাশ্রয়ম্।
ইতি রামানুজার্য্যায় ময়োক্তং বদ সত্বরম্॥"

"(১) আমিই জগৎকারণ প্রকৃতির কারণ, পরব্রহ্ম। (২) হে মহামতে, জীব ও ঈশ্বরে ভেদ স্বতঃসিদ্ধ (৩) মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের ভগবৎপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণই একমাত্র মুক্তির কারণ। (৪) মদীয় ভক্তগণ অন্তিম সময়ে আমায় স্মরণ করিতে না পারিলেও, তাঁহাদের মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী। (৫) দেহ ত্যাগ হইলেই আমার ভক্তগণ পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। (৬) সর্ব্বগুণসম্পন্ন, মহাত্মা, মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি এই সকল কহিয়াছি, ইহা শীঘ্র তুমি রামানুজাচার্য্যকে গিয়া বল।"

ইহা শুনিয়া রামানুজ উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িলেন। যে ছয়টি সন্দেহ তাঁহার হৃদয়ে অশান্তির রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে উন্মূলিত হইয়া গেল। এ সমুদয় সন্দেহের কথা তিনি কাঞ্চিপূর্ণকে কিছুই বলেন নাই। উক্ত মহাপুরুষ সত্যই বরদরাজের মুখস্বরূপ। নিষেধ করিলেও তিনি সেই মহাত্মার পদপ্রান্তে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন, এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া, শ্রীরঙ্গমে মহাপূর্ণের নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

এদিকে আলওয়ান্দারের অদর্শনের পর হইতে, শ্রীরঙ্গমের মঠে সেরূপ সুমধুরভাবে শাস্ত্রের রহস্যার্থ ব্যাখ্যা করিতে আর কেহই সমর্থ হইতেন না। তিরুবরাঙ্গ মঠের অধ্যক্ষ। তিনি পরম ভাগবত ও বহুশাস্ত্রদর্শী, কিন্তু শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় তাঁহার তাদৃশ পটুতা ছিল না। তাঁহার অধিকাংশ সময় ভগবদারাধনাতেই যাইত। তাঁহার পরমদাস্য ভাবে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। কাহাকেও কোন আদেশ করা দূরে থাকুক, তিনি সর্ব্বদাই অন্যের আদেশ-পালনে ব্যগ্র। তাঁহার দেবতুল্যস্বভাব সকলকেই বশীভূত করিয়াছিল। মঠে বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় প্রকারেরই ভক্ত থাকিতেন। বিবাহিতগণের ভার্য্যা মঠের বাহিরে, নগরে বাস করিতেন। মধ্যে মধ্যে ভক্তবন্দনার্থ তথায় আসিতেন। মঠস্থ ভক্তগণ ভগবদারাধনা ও তন্নামসঙ্কীর্ত্তনে দিবস অতিবাহিত

করিতেন। এইরূপে প্রায় এক বৎসর চলিয়া গেল। পরে একদিবস তিরু-বরাঙ্গ সমুদয় ভক্তগণকে মিলিত করিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ, অদ্য একবৎসর হইল, আমাদের প্রাণস্বরূপ, মহাত্মা যামুনমুনি পরমপদে লীন হইয়াছেন। তাঁহার অদর্শনাবধি আমরা সেই সুমধুর ভাষায় ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন, ও শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্মের ব্যাখ্যা শ্রবণে বঞ্চিত রহিয়াছি। যদিও সেই মহাপুরুষ এই ক্ষুদ্র দাসের উপর তোমাদের পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, এবং সুতরাং ইহা বহনযোগ্য, তথাপি এক্ষণে বুঝিতেছি,আমার ন্যায় হীনবল ব্যক্তির পক্ষে ইহা সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বহনীয়। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, মহামুনি দেহত্যাগের পূর্ব্বে কাঞ্চিপুরস্থ শ্রীমান্ রামানুজকে দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য মহাপূর্ণকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমার বিবেচনায় সেই শুদ্ধসত্ব, পণ্ডিতপ্রবর, কাঞ্চিপূর্ণপ্রিয়, যামুনমুনিনির্ব্বাচিত মহাপুরুষই এইভার বহন করিবার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। আমাদের মধ্যে কেহ যাইয়া তাঁহাকে পঞ্চসংস্কার-যুক্ত করতঃ দীক্ষা দিয়া এখানে আনয়ন করুন। তিনিই যামুনমুনির মত সমগ্রভারতবর্ষে প্রচার করিবেন। সমাধি-স্থলে তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্য এবং মুনিবরের মুষ্টিমোচন এখনও আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।"

সমবেত ভক্তমণ্ডলি ইহা শুনিয়া একবাক্যে তাঁহার মতের অনুমোদন করিলেন, এবং রামানুজকে দীক্ষা দিয়া শ্রীরঙ্গমে আনয়ন করিবার জন্য মহা-পূর্ণকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন ; "যদি কাঞ্চিপূর্ণের সহবাস ত্যাগ করিতে আপাততঃ তাঁহার অনিচ্ছা দেখ, তাহা হইলে তাঁহাকে আসিবার জন্য কোনও অনুরোধ করিও না। শ্রীরঙ্গনাথের ইচ্ছায় তাঁহাকে এখানে আসিতেই হইবে, শীঘ্রই হউক, বা কিছু বিলম্বেই হউক। তুমি তাঁহাকে তামিলপ্রবন্ধ অধ্যয়ন করাইয়া তাহাতে বিশেষ পারদর্শী করিও। তজ্জন্য তোমার অন্যূন একবৎসরকাল তথায় থাকিতে হইবে। আমাদের ইচ্ছা যে, তুমি তোমার সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে লইয়া যাও। আমরা যে তোমায় তাঁহাকে এখানে আন-য়নের জন্য প্রেরণ করিয়াছি, ইহা যেন তিনি কিছুই জানিতে না পারেন।" এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া মহাপূর্ণ সস্ত্রীক কাঞ্চিপুরে যাত্রা করিলেন। দিবস-দ্বয় গমন করিয়া তাঁহারা মধুরান্তক নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই নগরস্থ শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে এক সুবৃহৎ সরোবর। তাহারই তীরে তিনি সস্ত্রীক বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন যে, যাঁহার জন্য তিনি মঠ ত্যাগ

করিয়া কাঞ্চিপুরে গমন করিতেছেন, যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যগ্র হইয়াছিল, সেই রামানুজ স্বয়ংই আসিয়া তাঁহার পাদ বন্দনা করি-লেন। অকস্মাৎ প্রিয় ব্যক্তিকে সম্মুখে পাইয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। পরে রামানুজকে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, আমি তোমায় এখানে দেখিতে পাইব, এরূপ আশাই করি নাই। সকলই শ্রীমন্নারায়ণের কৃপা। তোমার এস্থানে আসিবার কারণ কি?" রামানুজ কহিলেন, "সত্যই ইহা নারায়ণের অত্যন্ত কৃপা। আমি আপনারই শ্রীপাদপদ্ম লক্ষ্য করিয়া কাঞ্চিপুর ত্যাগ করিয়াছি। বিধাতা অনায়াসেই তাহা মিলাইয়া দিলেন। শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের মুখ দিয়া সাক্ষাৎ বরদরাজ আপনা-কেই আমার গুরুরূপে স্থির করিয়াছেন। আপনি অবিলম্বে আমায় দীক্ষা-দ্বারা পবিত্র করুন।" মহাপূর্ণ কহিলেন, "চল, আমরা সকলে কাঞ্চিপুরে গিয়া বরদরাজের সম্মুখে এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করি।" ইহাতে রামানুজ কহিলেন, "মহাত্মন্, আমার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে রুচি হইতেছে না।

স্বপন্তম্বাপি ভুঞ্জানং গচ্ছন্তমপি বর্ত্মনি।
যুবানমপি বালম্বা স্ববশে কুরুতে বিধিঃ॥

দেখুন, মৃত্যুর সময়াসময় জ্ঞান নাই। মনুষ্য নিদ্রিতই হউক, ভোজনই করুক, পথেই গমন করুক, যুবকই হউক, বা বালকই হউক, মৃত্যু সকল অব-স্থাতেই তাহাকে আপনার বশে আনয়ন করেন। আপনার সহিত, কত আশা করিয়া, যামুনমুনিকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু হায়, দগ্ধ বিধাতা সে আশা আমার পূর্ণ করে নাই। এখনই বা তাহাকে বিশ্বাস কি? সুতরাং আপনি এই মুহূর্ত্তেই আমায় আপনার পদতলের ছায়ায় আশ্রয় দিন।" মহাপূর্ণ এই সুমধুর বৈরাগ্যপূর্ণ উক্তি শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন, এবং শ্রীবিষ্ণুর সম্মুখে বৃহৎ সরোবরতীরস্থ বহুশাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট কুসুমিত, সৌরভসমাকীর্ণ পরমরমণীয় বকুলতরুর মূলে, আহবনীয়াগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে দুইটি আয়সী মুদ্রা স্থাপন করিলেন। তাহাদের মধ্যে একটী চক্রচিহ্নিত ও একটি শঙ্খচিহ্নিত। মুদ্রাদ্বয় উত্তপ্ত হইলে, মহাপূর্ণ শ্রৌত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক চক্রচিহ্নিতের দ্বারা রামানুজের দক্ষিণবাহুমূল এবং শঙ্খচিহ্নিতের দ্বারা বামবাহুমূল অঙ্কিত করিলেন, ও পরিশেষে আল্‌ওয়ান্দারের শ্রীচরণধ্যান পূর্ব্বক তাঁহার দক্ষিণ কর্ণে বৈষ্ণব মন্ত্র অর্পণ করিলেন। এইরূপে দীক্ষিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুবন্দনপূর্ব্বক রামানুজ, গুরু এবং গুরুপত্নীর সহিত কাঞ্চিপুরে গমন করিলেন।

শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ, মহাপূর্ণের শুভাগমনসম্বাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। ভক্তসম্মিলনে পরম আনন্দের উদয় হইল। রামানুজের অনুরোধে মহাপূর্ণ তাঁহার পত্নী জমাম্বাকেও শঙ্খ ও চক্রদ্বারা অঙ্কিত করিলেন। এইরূপে পতি পত্নী উভয়েই দীক্ষিত হইয়া, মহাপূর্ণের ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিলেন। রামানুজ স্বীয় গৃহের অর্দ্ধাংশে মহাপূর্ণের আবাসবাটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহার যাবতীয় ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিতে লাগিলেন, এবং প্রতিদিন তাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া তামিল্ প্রবন্ধ পাঠ করিতে থাকিলেন। (ক্রমশঃ)

ধ্রুবচরিত্র।

প্রথম অঙ্ক।—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(সুনীতির কুটীর, ভূমিতলে অর্দ্ধশয়ানা সুনীতি।)

সুনী। কি জানি কোন্ দিকে ভেসে যায় প্রাণ।
না মানে উজান, না মানে তুফান।

(গাহিতে গাহিতে তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। সাগরসঙ্গমে বুঝি হয় ধাবমান ?

সুনী। সাগরে তুফান আছে, যাবনা সাগর কাছে,
ভাঙ্গিবে হৃদয়তরী তরঙ্গ প্রহারে ;

তপ। প্রেম নাবিক হৃদয়ে, আছে যার সে কি ভয়ে,
ফিরায় তরণী সই তরঙ্গ নেহারে।

সুনী। সাগর লবে না তরী, ডুবাবে নয় দিবে ফিরি,
ডুবিলে অতল জলে কে রাখে আমারে ;

তপ। হরে মুরারে, হরে মুরারে ॥

তপ। ম্লান কেন হেরি আজ ও মুখ পঙ্কজ ?
কেন সই এত ভাব দিবানিশি ?
গোমুখীর জলস্রোত
বহে অবিরাম নয়ন হইতে ;
সম্বর সম্বর সই নীরব রোদন।
চেয়ে দেখ মম মুখপানে, সই,

শোক দুঃখ পরাজয় মানিয়াছে,
তাই, আনন্দে নাচিছে প্রাণ দিবানিশি।

সুনী। ভগিনি!
নহে এ নীরব দুঃখের রোদন;
শোকে সুধু বারিধারা বহে না নয়নে;
জান ত, সজনি!
প্রেমানন্দে কভু কভু আঁখি ভাসে নীরে।
আজি মম বিগত প্রেমের জোয়ার,
হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গি,
দুকূল নয়ন বহি বহে অবিরত।
ভগিনি! ভাবি দিবানিশি,—
বিরহ যন্ত্রণা নহে এ ভাবনা।
বনবাস ক্লেশে,
ভাবি সেই স্বামীর চরণ দুটী;
এ ভাবনা অনন্ত সুখের—
অমৃতের মহা সিন্ধু;
তাহে প্রাণ দিতেছে সাঁতার।
সত্য বটে, বারি ধারা ঝরিছে নয়নে,
সত্য বটে, দিবানিশি
বহিছে সুদীর্ঘ শ্বাস,—
কিন্তু এ ক্রন্দনে, নীরব নিশ্বাসে,
ঢালে প্রাণে মধুর আরাম।

তপ। ধন্যা নারী তুমি!
স্বামী তোমা দিল বনবাসে,
তথাপিও একদিন
তিলমাত্র অসন্তোষ নাহি প্রকাশিলে।
বনবাস—বিনা দোষে বনবাস!
স্ত্রৈণ রাজা, রূপের কিঙ্কর,
নাহি জানে গুণের মহিমা,
নাহি জানে প্রণয় কি ধন;

২

তোমা হেন অমূল্য রতন
চিনিতে নারিল রাজা !

স্থনী। নাহি নিন্দ হেন ভাবে স্বামীরে আমার।
ভগিনি ! স্বামী চেয়ে নহি আমি জ্ঞানী ;
স্বামী বুঝিবেন যাহা,
আমি নারী—কি বুঝিব তাহা ?
যা কিছু করেন স্বামী, আমারই মঙ্গল তরে।
আমি জানি, স্বামী মম
বাম নহে আমা প্রতি।

তপ। তাই তোমা দিল বনবাস ?

স্থনী। বনবাস নহে ইহা স্বর্গবাস মোর ;
পরিহাস নাহি কর।

তপ। ভাল ; পরিহাস না করিব আর ;
ফিরে চল রাজার নিকটে,
রাজারে বুঝায়ে মোরা,
স্থাপিব তোমায় পুনঃ রাজসিংহাসনে।

স্থনী। না, ভগিনি ! না ;
হেন শিক্ষা দিও না আমারে ;
স্বামী আজ্ঞা নারিব লঙ্ঘিতে,
বনবাস থাকুক আমার।

তপ। স্ত্রৈণ স্বামী তব ;
ঘোর মোহাচ্ছন্ন,
তা, না হ'লে, স্থরুচির কথা শুনি
হেন রত্ন দিল পায়ে ঠেলে।

স্থনী। জন্মে জন্মে হেন স্বামী হউক আমার ;
জন্মে জন্মে হোক স্থরুচি আবার,
জন্মে জন্মে থাকি বনবাসে আমি,
পূর্ণ হোক স্বামিমনোরথ।
ক্ষতি নাই আমি মরি,—
স্বামীর চরণে কাঁটা দিব না ফুটিতে ;

যাব না স্বামীর কাছে।
সুখী রাজা সুরুচি প্রণয়ে,
আমি গেলে কণ্টক হইব সুখে।

তপ। এস ভগ্নি!
তবে আমার স্বামীরে ভজ;
পাবে হৃদে অনন্ত আরাম।

সুনী। কেন কর উপহাস?
আজন্ম কুমারী তুমি;
কে তোমার স্বামী?
আজি এ নূতন কথা শুনি তব মুখে।

তপ। বিবাহ হ'য়েছে মোর;
জনম অবধি স্বামী আছে,
নিগূঢ় প্রণয়ে বদ্ধ আছি তাঁর সনে।

সুনী। ভাল, না দেখিনু একদিনও স্বামীরে তোমার।
কি রূপ তাঁহার?
কিবা নাম ধরে?

তপ। প্রভাত প্রকাশে, পূরব আকাশে,
জ্যোতির্ম্ময় স্বামী মোর খল খল হাসে,
নব রাগ ভরে, দিক আলো করে,
জাগায় জগৎজীব রূপের উচ্ছ্বাসে।

সুনী। এ ত সূর্য্য। সূর্য্য কি তোমার স্বামী?

তপ। না; এ তাঁর একটী রূপ মাত্র।

সুনী। অন্য রূপ কিছু আছে?

তপ। কোটী কোটী—অনন্ত অনন্ত।
নীলাতপ তলে, যামিনী আইলে,
চন্দ্র হ'য়ে স্বামী বসেন আমার,
তারা সিংহাসনে, জ্যোৎস্না ভূষণে,
রাজ রাজেশ্বর রূপে খুলে দরবার।
নীচেতে সাগর, তটিনী নির্ঝর,
কল কল স্বনে বন্দী রূপে গায়;

তরঙ্গ উত্তাল, মৃদঙ্গের তাল,
ধাইয়া আঘাত করে তটগায়॥

স্নী। এ ত আকাশ, নক্ষত্র, সাগর, নদী, চন্দ্র; এই সব কি তোমার স্বামী?

তপ। না, সুধু তা নয়; স্বামী রাজা, স্বামীই ভূষণ, স্বামীই বন্দী; তিনি সর্ব্বরূপে এই বিশ্বমাঝে প্রকাশিত। স্বামী আমার আপনি রাজা, আপনি বন্দী, আপনি মৃদঙ্গ, আপনি গান; আপনার সঙ্গীতে আপনিই মোহিত।

স্নী। এ গভীর ভাব ভাল বুঝ্‌তে পাল্লুম না।

তপ। কুয়াসা আবৃত তপনের মত আব্‌ছা আব্‌ছা দেখা যায়। আবার শোন, আরও স্পষ্ট দেখ্‌বে।

বন উপবনে, বিহঙ্গম সনে,
সমীরণে স্বামী বাঁশরী বাজায়,
ফুলের পরাগ, করিয়া সোহাগ,
সমীরে মিশায়ে অঙ্গে মাখায়।
ঐ বাজে পাতা, স্বামী কয় কথা,
ঐ ডাকে মোরে, দুলায়ে শাখা;
যে দিকেতে চাই, দেখিবারে পাই
স্বামীর মূরতি জগতে আঁকা;
বিশ্বগায়ে হেরি স্বামী নাম লেখা॥

স্নী। এ ত অনেক।

তপ। না, স্বামী এক, একমাত্র;
ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাঁর।
বিকাশিত স্বামী
বিশ্বমাঝে অনন্ত আকারে;
পূজ তাঁরে ভক্তিভরে।

স্নী। পূজিব তাঁহায়,
কিন্তু নারিব ভুলিতে মোর বিবাহিত স্বামী।
তিনি মোর গৃহের দেবতা;
গৃহদেবতায় পূজি অগ্রে
বিশ্বদেবতায় পাব তবে;

স্বামী মোর
স্ফটিক নির্ম্মিত স্বচ্ছ দেবমূর্ত্তি ;
হেন দেবতার মধ্য দিয়া
হেরিব সে বিশ্বস্বামী শ্রীমধুসূদন।

তপ। ভাল দুই স্রোত একাধারে হউক মিলিত ;
স্বামিপ্রেমে হরিপ্রেমে হোক আলিঙ্গন।
এস ভগ্নি! গাই দোঁহে প্রেমগান।

উভয়ে। হরে মুরারে, মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

তপ। জয় প্রাণেশ্বর, প্রেমের আকর,
জয় জয় স্বামী মুকুন্দ মুরারে।

সুনী। নির্ঝর সাগর, চন্দ্র দিবাকর,
খেচর ভূচর গাও সমস্বরে,
"হরে মুরারে হরে মুরারে।"

উভয়ে। গাও মেঘদল, চপলা চঞ্চল,
গাও গরজিয়া হরে মুরারে,
গাও গাও প্রাণ এ গম্ভীর গান,
গাও মেঘ সনে গরজ গভীরে॥

(গাইতে গাইতে তপস্বিনীর প্রস্থান ও কুটীর মধ্যে
সুনীতির প্রবেশ।)

(ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রধ্বনি)

(উত্তানপাদের প্রবেশ)

উত্তান। কি ভীষণ ঝড়!
মহীরুহ দলে করে কোলাকুলি,
কেহ কেহ চুম্বে পৃথ্বীতল।
ঘন ঘন মেঘের গর্জ্জন,
ঝকমকি চমকে চিকুর,
ধূলিরাশি উঠে শূন্যদেশে ;
ঘোর অন্ধকার!
কোথা যাই—পথ নাই,

দৃষ্টি নাহি চলে ;
কোথা ছিনু কোথা বা আইনু,
রথ রথী অনুচর কোথা পলাইল,
ছিন্ন ভিন্ন হ'ল সৈন্যদল!
দিক্ ভ্রম জন্মিল আমার!
কোথা স্থান পাই ;
কে দিবে আশ্রয়—
এ নিবিড় বনমাঝে
লোকালয় পাই কোথা?

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া)

ঐ দূর কুটীর ভিতরে
জ্বলে ক্ষীণ দীপালোক ;
কে আছ কুটীরে
বিপন্নে আশ্রয় দেহ—
কে আছ—কে আছ—
দুয়ারে অতিথি আশ্রয় মাগিছে।
যাই দ্বারে ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।

(কুটীরের নিকট যাইয়া দ্বারে আঘাত)

(সুনীতির বাহিরে আগমন ও নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান)

কে তুমি এ বনমাঝে বনদেবী রূপে?
নিস্পন্দ প্রতিমা সম কেন দাঁড়াইলে?
কি দেখিছ একদৃষ্টে চাহি মোর পানে?
দেবী না দানবী বুঝিতে না পারি,
শঙ্কিত হইল প্রাণ ;
কথা কও—না পাই উত্তর কেন?

সুনী। (স্বগতঃ) একি! একি আজ হেরি আচম্বিতে!
চির অন্ধকার অদৃষ্ট আকাশে
উদিল অযুত ভানু!
রাজা, স্বামী, প্রিয় প্রাণেশ্বর
উপনীত দুঃখিনী কুটীরে।

উত্তান। কি ভাবিছ? কথা কও; দেহ পরিচয়।

সুনী। (স্বগতঃ) কি দিব উত্তর?

আত্মপরিচয় দিব কি রাজায়?

যদি নাম শুনি মোর,

ঘৃণা করি না লন আশ্রয়,

অধিনী কুটীরে,

তবে ফুটন্ত আশার ফুল,

মুকুলেই হইবে মুদিত।

ব্যাকুল, কাতর রাজা, পরিচয় জানিবারে।

উৎকণ্ঠায় স্বামী দুঃখ পায় কত—

আত্মসুখতরে,

স্বামীরে এ দুঃখ দেওয়া উচিত ত নয়।

দিই পরিচয়—

যা হয় অদৃষ্ট লিপি হোক।

(পদতলে পতিত হইয়া)

মহারাজ! প্রাণনাথ!

কি ভাবিব আর—

ভাবি তব চরণপঙ্কজ।

প্রভো! নহি দেবী আমি,—

চিরদাসী তব চরণ আশ্রিত।

তব শুভ আগমনে,

কৃতার্থ হইল প্রাণ;

কৃতার্থ কুটীর,—কৃতার্থ সুনীতি।

উত্তান। সুনীতি! সুনীতি!

একি! একি! তুমি কি সুনীতি?

এই তপোবনে বাস তব?

আহা! বহুদিন পরে

মিলাইল বিধি

নির্ব্বাসিতা সুনীতির প্রিয় দরশন।

সুনী। যদি বিধি বহু পুণ্যবলে মম,

মিলাইল রাজদরশন দুঃখিনী কুটীরে,
কৃপা করি দেহ অনুমতি প্রভো !
করি তব শ্রীচরণ পূজা।
মুনিপত্নীগণ পাশে,
ভিক্ষা করি, করি জীবন ধারণ ;
ভিক্ষা করি আনি ফল মূল,
দিব তব পদে উপহার।
রাজোচিত শয্যা নাহিক আমার—
নব কিশলয় পাতি শয্যা বিরচিব।
কি আছে আমার—
আমি দীন ভিখারিণী দাসী তব।
কৃপা করি,
কুটীর ভিতরে আসি করুন বিশ্রাম।
(কুটীর মধ্যে উভয়ের প্রবেশ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উত্তান পাদের কক্ষ।

উত্তান। (স্বগতঃ) মৃগয়ায় হেন ক্লেশ কভু নাহি পাই,
কভু দেখি নাই হেন ঝঞ্ঝাবাত ;
ছিন্ন ভিন্ন কৈল মোর সৈন্যরাশি ;
মন্ত্রী আদি অনুচর কে কোথায় গেল,
নাহিক উদ্দেশ।
(রাজার অজ্ঞাতসারে সুরুচির আগমন)
আমি নিরাশ্রয়, বিপন্ন সে বনমাঝে,
কুটীরে পাইনু স্থান।
কে দিল আশ্রয় ?—
আহা সেই সুনীতি—
আমার সেই নির্ব্বাসিতা স্ত্রী।
সেই দিন আমি চিনিয়াছি তারে ;
আহা,—কত তার ভালবাসা,

কত যত্ন, কত ভক্তি,
এক রাত্রে দেখাইল মোরে।
সুনীতিহৃদয়ে এত প্রেম গভীরে নিহিত,
কভু নাহি জানি—
জানিলাম সেই দিন।
কিন্তু আমি কি কোরেছি তার ?
প্রতিদান প্রণয়ের কি দিয়েছি আমি ?
দিয়াছি তাহায় বনবাস নারীর কথায়।
সুনীতি !—সুনীতি ! কত ক্লেশ দিতেছি তোমায় ;
চিনি নাই আমি তোমা—চিনিয়াছি এবে।
তুমি দেবী—আমি নরাধম।

(সুরুচির সম্মুখে আগমন)

সুরু। একি মহারাজ !
উন্মাদের প্রায়
প্রলাপ কহিছ আপনা আপনি ;
কোন্ নারী লভিয়াছে হৃদয় তোমার ?

উত্তান। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ !
সুরুচি শুনেছে বুঝি সব।
পড়িনু সঙ্কটে এবে।

সুরু। কি ভাবিছ রাজা ?
কেন নাহি দিতেছ উত্তর ?
বুঝিয়াছি আমি।
অন্তরালে থাকি
শুনিয়াছি তব গুপ্ত প্রণয়ের কথা।
মনে মনে তব এত কুটিলতা ?
আমি নারী—সরল হৃদয়,
জানি সুধু সরল প্রণয় ;
জানিতাম তব হৃদি সরল—অমৃতমাখা ;
জানিলাম আজি অমৃতে গরল ভরা।
ছি ছি রাজা !

তেয়াগিলে যেই সুনীতীরে,
যাহারে ঘৃণিত বলি দিলে বনবাস,
যাহার প্রণয়ে তুমি দিলে জলাঞ্জলি,
তাহারই দুয়ারে হইলে অতিথি ?
তাহারই কুটীরে যাপিলে যামিনী ?
সাক্ষাতে আমার প্রণয় উচ্ছ্বাস দেখাও নিরত,
অসাক্ষাতে মম,—গোপনে গোপনে
প্রাণ তব ধায় সুনীতির পানে।
ভাল রাজা! থাক তুমি সুনীতি সহিত
চলিলাম আমি।

উত্তান। রাণি! রাণি! রাণি!
কোথা যাও—কোথা যাও ?
নাহি কর রোষ,
ক্ষম মোরে চন্দ্রাননে!

সুরু; দাও ছাড়ি রাজা!
তোমার আলয়ে না চায় থাকিতে প্রাণ।
যাই চলে দেশ ছাড়ি দুনয়ন যায় যথা।

উত্তান। (পদতলে পতিত হইয়া)
সম্বর পঙ্কজমুখি! সম্বর এ রোষ!
প্রিয়ে! প্রাণেশ্বরি! ধরি রাঙ্গাপায়,
ক্ষম মোরে ক্ষম লো মানিনি!
দোষী যদি হোয়ে থাকি চরণে তোমার,
প্রায়শ্চিত্ত করিব তাহার;
বিধান করহ বিধুমুখি!

সুরু। রাজা! গিয়েছিলে তুমি সুনীতির পাশে,
ভাল, যদি তার গর্ভে, জন্মে পুত্র তোমার ঔরসে,
কহ সত্য করি, তারে না করিবে রাজা;
নাহি দিবে তারে তিল অংশ রাজত্বের ভোগ ?
সুনীতিরে কভু নাহি দিবে স্থান প্রাসাদে তোমার ?
কহ মোরে সত্য করি, আমরণ বনবাসে রাখিবে তাহায়।

উত্তান। (নিরুত্তর)

সুরু। একি রাজা!
কেন নাহি দিতেছ উত্তর?
বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি,
প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি তোমার।
যাও পুনঃ সুনীতির পাশে
নাহি প্রয়োজন আমাতে তোমার।
(প্রস্থানোদ্যত)

উত্তান। মহিষি! মহিষি! যেও না—যেও না,
দেহ ক্ষণকাল ভবিষ্যৎ ভাবিতে আমায়—
বিবেচনা করি দিতেছি উত্তর।

সুরু। কি হইবে রাজা ভাবিলে এখন?
ভবিষ্যৎ বিবেচনা ভবিষ্যতে হবে;
বর্ত্তমান প্রতীকার করহ এখন!
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করি করহ প্রতিজ্ঞা,
নতুবা বিশ্বাস আমি করি না তোমায়—
অবিশ্বাসী তুমি রাজা!
প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা রাজা;
অন্য কথা না শুনিব আর।

উত্তান। (স্বগত) অস্থির হইল প্রাণ!
চিন্তাস্রোত হইল বর্দ্ধিত;
ঘুরে উঠে মস্তক আমার।
পতিব্রতা সাধ্বী সুনীতির আজীবন বনবাস!
আহা! এখনও যে পড়ে মনে তার
মলিন বিষাদ ভরা সেই মুখখানি
প্রদোষ পঙ্কজ যথা রবির বিহনে।
রূপ আছে—গর্ব্ব নাই,
আভা আছে—জ্যোতিঃ নাই,
শীতের শিশির মাখা শশীর কিরণ যথা।
না, না, পারিব না—পারিব না প্রতিজ্ঞা করিতে।

কিন্তু—কি করি উপায় ?
সম্মুখে সুরুচি মহাভয়ঙ্করী
রোষে আছে যেন বিস্তারিয়া ফণা দংশিতে আমায়;
কুটিল ভ্রূভঙ্গী দেখিয়া উহার আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ ;
কি বলি এখন ?

সুরু। মহারাজ ! আর কতক্ষণ
লইবে সময় চিন্তা করিবারে ?
বিলম্ব করিতে নারি।

উত্তান। রাণি ! আজি প্রাণ অসুস্থ আমার,
আজি আমি না পারিব প্রতিজ্ঞা করিতে।

(বেগে প্রস্থান)

সুরু। মহারাজ ! কোথা যাও—কোথা যাও প্রতিজ্ঞা না করি ?

(প্রস্থান।)

ইতি প্রথমাঙ্ক।

আসল ও নকল।

সব জিনিষেরই আসল ও নকল আছে। গয়লা দুধে জল দেয়—ঘিওলা ঘিয়ে চর্ব্বি মিশায়—মিঠাইওয়ালা পূর্ব্বদিনের অবিক্রীত বস্তুগুলি দ্বারা নূতন করিয়া খাবার তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করে। সেইরূপ নকল মানুষ আছে—নকল সাধু আছে, নকল বৈরাগ্য আছে, নকল জ্ঞান আছে, নকল যোগসিদ্ধি আছে—নকল ভক্তি আছে, নকল দেশহিতৈষিতা আছে। ফল কথা, সব জিনিষেরই নকল আছে।

এক দল লোক আছেন, তাঁরা সংসারে নকল দেখে দেখে ব্যথিত হয়ে বিরক্ত হয়ে ভীত হয়ে নিরাশ হয়ে গেছেন। তাঁদের এমন হয়েছে যে, সত্য কিছু দেখ্‌লেও ভান বোধ হয়। তাঁরা সহজে সত্য বলে কিছু নিতে চান না। এমন কি, অনেকের এমন পর্য্যন্ত যেন ধারণা হয়ে যায় যে, সত্য বুঝি বাস্তবিকই কিছু নাই।

এ শ্রেণীর লোককে আমরা দোষ দিতে পারি না। তাঁরা নিজে ভুগে ভুগে ঠেকে ঠেকে এইরূপ শিখেছেন—তাই সদাই ভয়, সদাই আতঙ্ক। দেখ্‌লেন,

আজ একটা বিশ্বাস করিলেন—কাল সেই বিশ্বাসে এমন আঘাত লাগিল যে, এইরূপ সকল অবলম্বন গুলিই তাঁদের ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া এখন তাঁরা যেন নিরবলম্ব হয়ে বসে আছেন।

'যেন' বলিবার মানে আছে। বাস্তবিক্ নিরবলম্ব থাকিবার যো নাই। নকল কথাটা দ্বারাই আসলের অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে। যাহার আসল নাই, তাহার নকল হইবে কিরূপে? তুমি আসল জিনিষ খুঁজিয়া পাও নাই, একথা সত্য হইতে পারে, তাই বলিয়া উহার অস্তিত্বের অপলাপ করিও না—আসল নাই বলিয়া লোককে আসলের অন্বেষণে বিরত হইতে উপদেশ দিও না। আসল জিনিষ অতিশয় আয়াসলভ্য—কঠোর সাধনলভ্য। কোথায় তোমার সেই আয়াস? কোথায় তোমার সেই সাধন?

নকলকে ক্রমাগত গালাগাল দিয়া বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে আসল জিনিষ পাইবার চেষ্টা কর—আসল মানুষ নিজে হইবার চেষ্টা কর। এই নকলের রাজ্যে, এই মায়ার রাজ্যে অতি সুন্দর জিনিষও অতি কুৎসিৎ রূপ ধারণ করে। অদ্বৈতবাদ নাস্তিকতায়, শুষ্কতায় ও অহম্মন্যতায়, যোগসিদ্ধি বুজরুকিতে, ভক্তি ভণ্ডামীতে, সন্ন্যাস যথেচ্ছাচারে, ক্রিয়াকলাপ কপটাচারে, নিষ্ঠা গোঁড়ামীতে পরিণত হয়। এ হইবেই; এ কেউ বারণ করিতে পারে না। কোনরূপ আইন কানুন করিয়াই কেহ প্রকৃতির গতিরোধ করিতে পারে নাই। তাই বলিয়া সদা অতিসাবধানী হইয়া উন্নতির কেহ চেষ্টা করিবে না—উচ্চ চিন্তার রাজ্যে, উচ্চ ভাবের রাজ্যে বিচরণ করিতে প্রয়াস পাইবে না—একথা বলা বৃথা। সর্ব্বদা দুর্ব্বলতার সাজসজ্জা করিয়া বসিয়া থাকা কাপুরুষের লক্ষণ। পেট খারাপ করিবে বলিয়া চিরকাল মাছের ঝোল ভাত খাইলে পেটের পরিপাক-শক্তির চির অবনতি সাধিত হয়।

উচ্চ ভাব আছে—উচ্চ লোক আছে, এ বিশ্বাস যত্নসহকারে অর্জ্জনীয়। যার এ বিশ্বাস নাই, তার কিছুই নাই; তার ভবসাগর পারের সম্বল মোটেই নাই। উন্নতির সম্ভবনীয়তায় যার বিশ্বাস নাই, সে উন্নতি করিবে কি করিয়া?

বিজ্ঞান যে সকল নব নব আবিষ্কার করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে, তাহার মূলে কি এই প্রবল বিশ্বাস নাই? বৈজ্ঞানিক Quack অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুই একজন এমন থাকিতে পারেন, যাঁহারা আজ উপহাসাস্পদ হইলেও শতবর্ষ পরে জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া চিরপূজ্য হইবেন।

এই কারণে যাঁহারা সকল বিষয়ে আপাত অসম্ভব বিষয়ের চর্চ্চায় রত, তাঁহারা উপহাসাস্পদ না হইয়া উৎসাহের যোগ্য। সমুচিত প্রণালী সহকারে তাঁহাদের অন্বেষণকে সংযত কর, তাঁহাদের অনুসন্ধানপ্রণালী সম্বন্ধেও তোমার অভিজ্ঞতালব্ধ সৎপরামর্শ দাও, কিন্তু উড়াইয়া দিও না।

অদ্বৈতবাদী এইরূপ এক মহা অসম্ভব বিষয়ে প্রয়াসী। তিনি মানুষে ভগবানে এক করিতে চান। তাঁর বড় আশা। কে জানে—তাঁহার এ আশা পূর্ণ হইবে কি না? কে জানে, তাঁহার সোহহং কেবল কল্পনামাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে অথবা একদিন সত্যে পরিণত হইবে? বলিতে না পারিলেও তিনি উৎসাহযোগ্য, কারণ, তিনি মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষার, সকল বাসনার চরম তৃপ্তি করিতে চাহিতেছেন—তাঁহাকে তাঁহার অনুসন্ধানে সহায়তা কর, তাঁহার ভাবগুলি ধারণার চেষ্টা কর—বাধা দিও না।

যোগী যোগবলে প্রকৃতি বিজয় করিতে চান। কেন না তিনি আমাদের সম্মানাস্পদ হইবেন? তাঁহার উদ্ভাবিত সাধন প্রণালী সকল নিজ নিজ তর্কশোধিত করিয়া অনুষ্ঠান করুক, Experiment করিতে থাকুক—বংশানুক্রমে পুরুষপরম্পরায় চলুক যোগানুষ্ঠান। দেখ, তাহাতে প্রকৃতি বিজয় হউক না হউক, অন্ততঃ দেহ মনের উপর ক্রমশঃ কিছু কিছু আধিপত্য হয় কি না।

ভক্ত ভাবে মাতুক না—দেখ না কতদূর মাতিতে পারে, কতদূর সমাধিস্থ হইতে পারে। তোমরাও ত নানা বিষয়ে মাতিয়া বিহ্বল হইতেছ; তাহার এই নিরবলম্ব নিরীহ মাতামাতিতে তুমি এত বিরক্ত কেন? দেখ, ভাবাবেশে মন কতদূর মজে।

আর সন্ন্যাসী? দাও, তাহাদিগকে চেষ্টা করিতে; দেখ, তাহারা কামকাঞ্চন কতদূর জয় করিতে পারে। কামের উচ্ছেদ কতদূর সম্ভব, দেখ; তুমিও না হয়, তাহার পথে একটু একটু চেষ্টা কর। সে ভোগবিলাস ত্যাগ করুক, সব জিনিষের অবলম্বন একটু একটু করিয়া ছাড়ুক। তাহাকে আরো ত্যাগ করিতে উপদেশ দাও। কোন বিষয়ে বিফল হইয়াছে বলিয়া তাহাকে নিজ ভূমিতে টানিয়া আনিবার অন্যায় চেষ্টা করিও না।

দুর্ব্বলতা দূর কর—ভরসায় বুক বাঁধ। দুর্ব্বল যে, সে কি পারে? সে যে কিছু পারে না। তার কি জগতে স্থান আছে? যে যোগ্যতম, সেই জগতে স্থান পাইবে। অতএব হে সাধু, আদর্শের ভান করিয়া অনেককে দেহপুষ্টি করিতে দেখিলে তুমি বিরক্ত না হইয়া এই টুকু মনে করিয়া মনকে প্রবোধ

দাও—জগতে এখনও আদর্শের নামটাও আছে। ভেকটা দেখিয়া কাহারও না কাহারও আসলে রুচি ও চেষ্টা হইলে হইতে পারে। আর তুমি তোমার সাধ্যমত সেই সত্যানুসন্ধানের চেষ্টায় লোকের মন ফিরাও। ভুল দেখাইয়া লোককে ব্যতিব্যস্ত করিও না। ভুল ভ্রান্তি আছে—সকলে জানে। পেটের দায়ে অনেকে ভণ্ডামী করিয়াও থাকে। তোমার পেটের দায় না থাকে, একবার সাহসে বুক বাঁধিয়া সত্যের জ্যোতি প্রকাশ কর—দুর্ব্বল জগতে শক্তি সঞ্চার কর।

সাধকের স্বগতোক্তি।

ভগবানের নাম করিতে করিতে এ দেহ যায় যাক্, থাকে থাক। ছাই, তাই ভগবানের নামই বা কই হচ্চে? আবল তাবল নানা রকম যে ভাব্‌চি। না, ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং—এই আসনে মনকে লইয়া বসিলাম—দেখি, জয় করিতে পারি কি না। জয় করিতে পারিলে ত আনন্দের সীমাই নাই—না করিতে পারিলেও দেখিয়া গেলাম ত, যত্নদ্বারা কতদূর হইতে পারে—মনের আক্ষেপ ত মিটিবে। যাক সকল সংসার আমার মন থেকে ভেসে—পিতা মাতা ভাই ভগ্নী স্ত্রীপুত্র তোমরা একেবারে চিরকালের জন্য বিদায় হও। দয়াময়—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম—হরিঃ ওঁ হরি ওঁ সর্ব্বব্যাপী, বিরাট, আকাশস্বরূপ—নিরাকার, নিরঞ্জন—তুমিই একমাত্র উদিত থাক।

মনটা ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্চে যে! প্রভু, তুমি এসে পূর্ণ কর—পূর্ণ কর দয়াময়। আমার শূন্য হৃদয়কুটীর পূর্ণ কর—আমার আঁধার ঘরে আলো জ্বাল। তুমি আমার পিতা হয়ে শাসন কর—মা হয়ে আমার আবদার সহ্য কর, আমার সব অভাব পূরণ কর, পূরণ কর।

এঁ্যা; পাগল হব নাকি? এ শূন্যে কার সঙ্গে কথা কচ্চি—এ ত ক্রমশঃ কল্পনাসাগরে ভেসে ভেসে চলেছি। না, না, সত্য দেখি—চোখ খুলে দেখি সত্যের জগৎ। ঐ যে নীল নীল নীলাকাশ—অনন্ত অনন্ত পানে চলেছে—কোথা ওর অন্ত কে জানে, অন্ত নিয়ে ত থাক্‌তে পারিনি; প্রাণ যে অনন্তের দিকে দৌড়ুচ্চে। অনন্তকে জান্‌তে পার্‌বো না জানি, কিন্তু না জানি, তাতে ত তৃপ্ত বোধ হয় না। জান্‌লেই যেন মনটা খাটো হয়ে যায়। প্রাণ জান্‌তে চায় না, প্রাণ বিহ্বল হতে চায়। তবে চল্ মন—চল্—এ ক্ষুদ্র আকাশকে জেনে

কি হবে—চল্ আকাশের মূলে। ওই যে সোনার বরণ পাখী উড়ছে, ও ওই আকাশের কোলে কোলে চলেছে—ওই ওই আর ত দেখা যায় না, কোথায় মিশিয়ে গেল। ওই হাওয়া বইচে—ও ত অনুভব করছি, ওত নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ভিতরে আস্‌চে বাইরে যাচ্চে—ও যেন ভেতরে গিয়ে আমার হৃদয়ে মিশে যাচ্চে—ওও বুঝি অনন্তে মিশে যাচ্চে। এই অনন্তই ভগবানের নাম—এই অনন্তই সত্য। কল্পনা হতে যাবে কেন?

এই ত জ্ঞান—এই ত সুখ; যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি। মন, এই সচ্চিদানন্দ। মজ মজ এই প্রাণারামেতে মজ—মজে বিভোর হয়ে থাক আনন্দ আনন্দ আনন্দ—মাতোয়ারা, এই ত তাঁকে পেয়েছি। আর ছেড়ে দোব না—বুকের ভিতর ধরে রেখে দোব। এই আনন্দ নিয়ে—এই কেবলানন্দ—এই স্বরূপানন্দ—নিয়ে মেতে থাক্‌বো। দেহ যাক, ক্ষতি নেই। এ আনন্দ নিত্য—এ আনন্দের ধ্বংস নাই, মরেও আনন্দ পাব।

ঐ যা, আবার যেন স্বপন ভাঙ্গার মত ভেঙ্গে গেল যে! একি লুকোচুরী খেলা প্রভু? এই রকম করে কি কষ্ট দিতে হয়? না, না, নিজের দোষেই হারিয়েছি। সাধনা ক্রমাগত কত্তে হবে—ক্রমাগত নাম কোত্তে হবে, তবেই হবে। হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ—আবার প্রাণ জুড়িয়ে আস্‌ছে। ছাড়া হবে না নাম—নাম কোত্তে কোত্তেই মোর্ব্বো—পাই না পাই। আর কোর্ব্বো কি? কোন্ দিকে যাব? মিথ্যার সংসার—কপট সংসার, এসকলের ছলনায় ভুল্‌বো—মজ্‌বো? না, তা হতে পারে না। যখন একবার লেগেছি, তখন ছাড়্‌চি না।

ইতি জনৈক সাধকস্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজন্মোৎসব।

জেলা যশোহরের অন্তর্গত চেঙ্গটীয়া গ্রামের ধর্ম্মাশ্রমে বিগত ১০ই চৈত্র দোলের দিন সপ্তম বার্ষিক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৪০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল। সমস্ত দিবস সঙ্কীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল।

প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থা তস্মাদব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ ব্যজ্যন্তে ইতি ব্যক্তয়ঃ স্থাবরজঙ্গম-লক্ষণাঃ প্রভবন্তি অভিব্যজ্যন্তে অহ্নআগমঃ অহরাগমঃ তস্মিন্ অহরাগমে কালে ব্রহ্মণঃ প্রবোধকালে তথা রাত্র্যাগমে ব্রহ্মণঃ স্বাপকালে প্রলীয়ন্তে সর্ব্বাব্যক্তয়ঃ তত্রৈব পূর্ব্বোক্তে অব্যক্তসংজ্ঞকে। ১৮।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতির দিবসে ও রাত্রিতে যে কার্য্য হয়, তাহাই বলা হইতেছে—প্রজাপতির নিদ্রাবস্থাকে অব্যক্ত বলা যায়, সেই অব্যক্ত হইতে সকল ব্যক্তি অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গমস্বরূপ আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। দিনসের আগমনে অর্থাৎ প্রজাপতির জাগরণ কালে, এইরূপ রাত্রির আগমনে অর্থাৎ প্রজাপতির নিদ্রাকালে, সেই সকল স্থাবরজঙ্গমলক্ষণ আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু,পূর্ব্বোক্ত অব্যক্তসংজ্ঞক প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে।১৮।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থঃ প্রভবত্যহরাগমে। ১৯।

অন্বয়। স এবায়ং ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা অবশঃ (সন্) রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে, হে পার্থ! (পুনঃ) অহরাগমে প্রভবতি। ১৯।

মূলানুবাদ। সেই এই প্রাণিসমূহ (কর্ম্মবশে) বারম্বার জন্মলাভ করিয়া ব্রহ্মার রাত্রিকাল আসিলে অবশ হইয়া আবার সেই অব্যক্তে লীন হইয়া থাকে। আবার হে পার্থ, ব্রহ্মার দিন আসিলে পুনর্ব্বার উৎপত্তি লাভ করিয়া থাকে। ১৯।

ভাষ্য। অকৃতাভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশদোষপরিহারার্থং বন্ধমোক্ষশাস্ত্রপ্রবৃত্তি-সাফল্যপ্রদর্শনার্থং অবিদ্যাদিক্লেশমূলকর্ম্মাশয়বশাৎ চ অবশোভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ইত্যতঃ সংসারে বৈরাগ্যপ্রদর্শনার্থঞ্চেদমাহ। ভূতগ্রামঃ ভূতসমুদায়ঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণোযঃ পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে আসীৎ স এবায়ং নান্যো ভূত্বা ভূত্বা অহরাগমে প্রলীয়তে পুনঃ পুনঃ রাত্র্যাগমে, অহ্নঃ ক্ষয়ে অবশঃ অস্বতন্ত্রঃ এব প্রভবতি অবশএবাহরাগমে। ১৯।

ভাষ্যানুবাদ। যে কর্ম্ম করিল না, তাহার ফল লাভ হইল আর যে কর্ম্ম করিল, তাহার কোন লাভ হইল না, এইরূপ দোষ পরিহার করিবার জন্য, বন্ধ ও মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে লোকের প্রবৃত্তি হয় সেই প্রবৃত্তির সাফল্য প্রদর্শন করিবার জন্য, এবং অবিদ্যাদি ক্লেশনিমিত্ত কর্ম্মা-শয়ের বশে অস্বতন্ত্র প্রাণিনিচয় পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করিয়া মরিয়া যায়,

এই কারণে সংসারে বৈরাগ্য হয়, ইহাও প্রদর্শন করাইবার জন্ম (ভগবান্) বলিতেছেন যে—"ভূতগ্রাম" প্রাণিসমুদায়, স্থাবর ও জঙ্গম এই উভয়বিধ, যাহা পূর্ব্ব কল্পে ছিল, তাহাই আবার এই পরিদৃশ্যমানরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্য নহে। দিনের আগমন হইলে এইরূপে ভূতগ্রাম উৎপন্ন হইয়া রাত্রির আগমনে পুনঃ পুনঃ বিলীন হইয়া যায়। "অবশ" অস্বতন্ত্র; আবার দিবসের আগমনে সেইরূপ অবশ হইয়াই উৎপত্তি লাভ করে। ১৯।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি। ২০।

অন্বয়। তস্মাৎ অব্যক্তাৎ তু অন্যঃ যোহব্যক্তঃ সনাতনঃ ভাবঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি। ২০।

মূলানুবাদ। সেই পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত হইতে বিলক্ষণস্বরূপ যে অব্যক্ত সনাতন সত্তারূপ ভাব বিদ্যমান আছে, এই ভূতনিচয় বিনষ্ট হইলেও তাহা বিনষ্ট হয় না। ২০।

ভাষ্য। যদুপন্যস্তমক্ষরং তস্য প্রাপ্ত্যুপায়ো নির্দ্দিষ্ট ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেত্যাদিনা অথইদানীং অক্ষরস্যৈব স্বরূপনির্দ্দিদিক্ষয়া ইদমুচ্যতে অনেন যোগমার্গেণ ইদং গন্তব্যমিতি পরোব্যতিরিক্তঃ ভিন্নঃ। কুতঃ? তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ তুশব্দোহক্ষরস্য বিবক্ষিতস্য অব্যক্তাদ্বৈলক্ষণ্যবিশেষণার্থঃ। ভাবোহক্ষরাখ্যং পরংব্রহ্ম। ব্যতিরিক্তত্বে সত্যপি সালক্ষণ্যপ্রসঙ্গোহস্তীতি তদ্বিনিবৃত্ত্যর্থমাহঅন্য ইতি অন্যো বিলক্ষণঃ স চাব্যক্তোহনিন্দ্রিয়গোচরঃ পরস্তস্মাদিত্যুক্তং কস্মাৎ পুনঃ পরঃ পূর্ব্বোক্তাদ্ ভূতগ্রামবীজভূতাদবিদ্যালক্ষণাদব্যক্তাৎ। সনাতনশ্চিরন্তনঃ যঃ স ভাবঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু—ব্রহ্মাদিষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি। ২০।

ভাষ্যানুবাদ।— যে অক্ষরের বিষয় বলা হইয়াছে, "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা, তাহার প্রাপ্তির উপায়ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে যে প্রকার যোগমার্গ দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে অগ্রে সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলিতেছেন যে—"পর" ব্যতিরিক্ত,—ভিন্ন, কাহা হইতে? সেই পূর্ব্বোক্ত (অব্যক্ত) হইতে। যাহার বিষয়ে বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম যে অব্যক্ত হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ তাহাই তু শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে। "ভাব" অক্ষরাখ্য পর ব্রহ্ম অব্যক্ত

হইতে বিলক্ষণ হইলেও তাহার সহিত অব্যক্তের সাধর্ম্ম্য থাকিতে পারে, এই সম্ভাবনার নিরাকরণ করিবার জন্য বলিতেছেন,—"অন্য" অন্য (শব্দের অর্থ) বিলক্ষণ, সেইব্রহ্মও "অব্যক্ত" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন, তাহা হইতে পর, ইহা বলা হইয়াছে। কাহা হইতে পর? সেই পূর্ব্বোক্ত ভূতগ্রামের বীজভূত অবিদ্যালক্ষণ অব্যক্ত হইতে। "সনাতন" চিরন্তন। এই প্রকার যে "ভাব", তাহা ব্রহ্মাদি সকল জগৎ নষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না। ২০।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। ২১।

অন্বয়।—অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি (যো ভাবঃ) উক্তঃ তং পরমাং গতিং আহুঃ। যং (ভাবং) প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম। ২১।

মূলানুবাদ।—যে ভাব, অব্যক্ত ও অক্ষর শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাকেই পরম গতি বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। ২১।

ভাষ্য।—অব্যক্ত ইতি যোঽসৌ অব্যক্তঃ অক্ষর ইত্যুক্তঃ তমেবাক্ষরসংজ্ঞকং অব্যক্তং ভাবং আহুঃ পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিম্। যং ভাবং প্রাপ্য গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে সংসারায় তদ্ধাম স্থানং পরমং প্রকৃষ্টং মম বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ। ২১।

ভাষ্যানুবাদ।—অব্যক্ত ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যে সেই অব্যক্তকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই অক্ষর নামক অব্যক্ত ভাবকে "পরম" প্রকৃষ্ট গতি বলিয়া (শাস্ত্রকারগণ) উল্লেখ করিয়াছেন। যে ভাবকে প্রাপ্ত হইয়া আর সংসারভোগ করিতে লোক পুনরাগমন করে না, সেই "পরম" প্রকৃষ্ট স্থানই আমার ধাম অর্থাৎ তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। ইহাই অর্থ। ২১।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্। ২২।

অন্বয়।—হে পার্থ, ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি যেন ইদং সর্ব্বং ততং স পরঃ পুরুষঃ অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ। ২২।

মূলানুবাদ।—হে পার্থ, ভূতসমূহ যাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, যিনি এই নিখিল জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরম পুরুষ (কেবল) অনন্য ভক্তি-দ্বারাই লভ্য। ২২।

ভাষ্য। তল্লব্ধেরুপায় উচ্যতে—পুরুষঃ পুরিশয়নাৎ পূর্ণত্বাদ্বা, স পরঃ পার্থ পরোনিরতিশয়ো যস্মাৎ পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ স ভক্ত্যা লভ্যস্তু জ্ঞানলক্ষণয়া অনন্যয়া আত্মবিষয়য়া। যস্য পুরুষস্যান্তঃস্থানি মধ্যস্থানি কার্য্যভূতানি ভূতানি। কার্য্যং হি কারণস্যান্তর্বর্ত্তি ভবতি। তেন পুরুষেণ সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং আকাশেন ইব ঘটাদি। ২২।

ভাষ্যানুবাদ। তাঁহাকে পাইবার উপায় বলা হইতেছে। "পুরুষ" (দেহরূপ) পুরে শয়ন করেন বলিয়া অথবা স্বয়ং পূর্ণ বলিয়া (তাঁহাকে পুরুষ বলা যায়) হে পার্থ, সেই "পর" নিরতিশয় "যেহেতু তাঁহা হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কোন বস্তুই নাই সেই" পুরুষ, সেই কেবল অনন্য ভক্তি (এই ভক্তি শব্দের অর্থ জ্ঞান) দ্বারাই লভ্য (হইয়া থাকেন)। (এখানে যে অনন্য শব্দ আছে, তাহার অর্থ আত্মবিষয়) এই কার্য্যস্বরূপ ভূতনিচয় যাহার "অন্তঃস্থ" মধ্যবর্ত্তী। কার্য্য কারণেরই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। যে পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ, ঘটাদি যেমন আকাশ দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ২২।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ। ২৩।

অন্বয়।—হে ভরতর্ষভ! যোগিনঃ যত্র কালে প্রযাতাঃ আবৃত্তিং অনাবৃত্তিং চ গচ্ছন্তি তং কালং বক্ষ্যামি। ২৩।

মূলানুবাদ।—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, যোগিগণ যে কালে মৃত্যুলাভ করিলে এসংসারে পুনরাবৃত্তি করেন অথবা অপুনরাবৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন, আমি সেই কালের বর্ণন করিতেছি। ২৩।

ভাষ্য।—প্রকৃতানাং যোগিনাং প্রণবাবেশিতব্রহ্মবুদ্ধীনাং কালান্তরমুক্তিভাজাং ব্রহ্মপ্রতিপত্তয়ে উত্তরো মার্গঃ বক্তব্যঃ। ইতি যত্র কালে ইত্যাদি বিবক্ষিতার্থসমর্পণার্থমুচ্যতে। আবৃত্তিমার্গোপন্যাস ইতরমার্গস্তুত্যর্থঃ—যত্র কালে প্রযাতা ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। যত্র যস্মিন্ কালে তু অনাবৃত্তিং অপুনর্জন্ম আবৃত্তিং তদ্বিপরীতাং চৈব। যোগিন ইতি যোগিনঃ কর্ম্মিণশ্চ উচ্যন্তে, কার্ম্মিণস্তু গুণতঃ কর্ম্মযোগেন যোগিনাং ইতি বিশেষণাৎ যোগিনঃ যত্র কালে প্রয়াতা মৃতা যোগিনঃ অনাবৃত্তিং যান্তি যত্র চ কালে প্রযাতা আবৃত্তিং যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ। ২৩।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রণবে যাহারা ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া থাকে, সেই সকল যোগি-

গণই এখানে প্রকৃত, তাহাদের দেহপাতের পর কালান্তরে মুক্তি হইয়া থাকে। তাহাদের এই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ উত্তর মার্গ এক্ষণে বলিতে হইবে। এই কারণেই যত্র কালে ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বিবক্ষিত অর্থ প্রতিপাদন করিবার অনুকূল বস্তুর বর্ণন করা হইতেছে। আবৃত্তি মার্গের উপন্যাস দ্বারা ইতরমার্গেরই স্তুতি করা হইয়াছে। "যে কালে" ইহার "প্রয়াত" এই দূরস্থিত পদের সহিত সম্বন্ধ। "যত্র" যে কালে "অনাবৃত্তি" অপুনর্জন্ম "আবৃত্তি" তাহার বিপরীত অর্থাৎ পুনর্জন্ম, "যোগী" এইশব্দের দ্বারা যোগী ও কর্ম্মী এই উভয়ই প্রতি-পাদিত হইতেছে। কর্ম্মিগণই গুণযোগে যোগী হইয়া থাকে। "কর্ম্মযোগের দ্বারা যোগিগণের" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা কর্ম্মিগণই যোগী বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। (তাৎপর্য্য এই হইতেছে যে) যে কালে "প্রয়াত" মৃত হইয়া যোগিগণ অনাবৃত্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যে কালে মৃত হইয়া আবৃত্তিকে প্রাপ্ত হন, হে ভরতর্ষভ, আমি তোমাকে সেই কালের বিষয়ে এক্ষণে বলিতে উদ্যত হইতেছি। ২৩।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ। ২৪।

অন্বয়। অগ্নিঃ জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণং (চ) ব্রহ্মবিদোজনা প্রয়াতাঃ (সন্তঃ) তত্র ব্রহ্ম গচ্ছন্তি। ২৪।

মূলানুবাদ।—সগুণব্রহ্মের উপাসকগণ মৃত হইলে, যথাক্রমে অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্ল পক্ষ, ষণ্মাস ও উত্তরায়ণ এই কয়জন কালাভিমানিনী দেবতাগণের দ্বারা অধিষ্ঠিত পথ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৪।

ভাষ্য।—তৎকালমাহ। অগ্নিঃ কালাভিমানিনী দেবতা তথা জ্যোতি-র্দেবতৈব কালাভিমানিনী। অথবা অগ্নিজ্যোতিষী যথাশ্রুতে এব দেবতে। ভূয়সাং তুনির্দ্দেশঃ যত্র কালে তংকালমিতি আম্রবণবৎ। তথা অহর্দেবতা অহঃ শুক্লঃ শুক্লপক্ষদেবতা। ষণ্মাসা উত্তরায়ণং তত্রাপি দেবতা এব মার্গভূতা। ইতি স্থিতোঽন্যত্রন্যায়ঃ তত্র তস্মিন্ মার্গে প্রয়াতা মৃতাগচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মোপাসনপরাজনাঃ। ক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ। ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং গতিরাগতির্বা ক্বচিদস্তি। ন তস্য প্রাণাউৎক্রামন্তীতি শ্রুতেঃ ব্রহ্মসংলীনপ্রাণাএব তে ব্রহ্মময়া ব্রহ্মভূতা এব তে। কর্ম্মণা তু গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ। ২৪।

ভাষ্যানুবাদ।—সেই কাল বলিতেছেন। "অগ্নি" অগ্নিতে অভিমান যাহার আছে, সেই দেবতাই (অগ্নিশব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছেন) এই প্রকার "জ্যোতি" ও কালাভিমানিনী দেবতা। অথবা অগ্নি ও জ্যোতিঃ ইহাঁরা যথাশ্রুত দেবতাই। যাহা বেশী, তাহা দ্বারাই নির্দ্দেশ হয়, এই প্রকার ন্যায় আছে বলিয়া অগ্নি ও জ্যোতিঃ ইহারা কালাভিমানিনী দেবতা না হইলেও, "সেই কাল বলিতেছি" এই উপক্রমে পঠিত কতকগুলি কালাভিমানিনী দেবতার মধ্যে অগ্নি ও জ্যোতির নাম করা হইয়াছে বলিয়া এই দুই দেবতাও কালশব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকেন। কালাভিমানিনী দেবতাই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির মার্গভূত হইয়া থাকেন, এই নিয়ম অন্যত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন আমের গাছ অধিক থাকিলে অন্য গাছ থাকিলেও লোকে আম্রবণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করে, এইখানেও কালশব্দের উল্লেখও তদ্রূপ। সেইরূপ অহঃ এইশব্দের অর্থ দিনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শুক্ল শব্দের অর্থ শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, ষণ্মাস ও উত্তরায়ণ শব্দের অর্থও তদভিমানিনী দেবতা। সেই এই মার্গে ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মোপাসনাপর যোগিগণ ব্রহ্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ক্রমেই হয়, ইহাই বাক্যের শেষাংশ। যাহারা সদ্যোমুক্তিভাক্ অর্থাৎ যাহারা সম্যগ্দর্শননিষ্ঠ তাহাদের কোন স্থানে গমন বা আগমন সম্ভবপর নহে। কারণ, তাহাদের বিষয়ে শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, "তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না"। তাহাদের প্রাণ ব্রহ্মে সংলীন হয়, তাহারা ব্রহ্মভূত, ব্রহ্মময়ই হইয়া যায়। যাহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসক, তাহারাই ক্রমে কর্ম্মের ফলে অগ্নি প্রভৃতি মার্গানুসারে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়। ২৪।

ধূমোরাত্রিস্তথাকৃষ্ণঃ ষণ্মাসাদক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে। ২৫।

অন্বয়। ধূমঃ রাত্রি তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্—তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য যোগী নিবর্ত্ততে। ২৫।

মূলানুবাদ। ধূমাভিমানিনী দেবতা। রাত্রিদেবতা কৃষ্ণদেবতা ষণ্মাস দক্ষিণায়ণ দেবতা এই প্রকার যে মার্গক্রম আছে, সেই পথে যাইয়া কেবল কর্ম্মপর যোগী চন্দ্রলোকের ভোগ অনুভব করিয়া পুনর্ব্বার সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে। ২৫।

ভাষ্য। ধূম ইতি ধূমো রাত্রির্ধূমাভিমানিনী রাত্র্যভিমানিনী চ দেবতা তথা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণপক্ষদেবতা। ষণ্মাসাদক্ষিণায়নমিতি চ পূর্ব্ববদ্দেবতৈব। তত্র চন্দ্রমসি ভবং চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ ফলমিষ্টাদিকারী যোগী কর্ম্মী প্রাপ্য ভুক্ত্বা তৎক্ষয়ান্নিবর্ত্ততে। ২৫।

ভাষ্যানুবাদ।—ধূম ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। ধূম ও রাত্রি (শব্দের অর্থ) ধূমাভিমানিনী ও রাত্র্যভিমানিনী দেবতা। সেইরূপ কৃষ্ণ এই শব্দের অর্থ কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা। এইরূপ ষণ্মাস ও দক্ষিণায়ন শব্দেরও অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় দেবতা। সেই এইপথে কেবল কর্ম্মপর যোগী (অর্থাৎ) "যাগাদির অনুষ্ঠানকর্ত্তা" চান্দ্রমস জ্যোতি অর্থাৎ চন্দ্রলোকোদ্ভব কর্ম্মফলসুখভোগ করিয়া সেই কর্ম্মের ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার (এই সংসারে। প্রত্যাবর্ত্তন করে। ২৫।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ। ২৬।

অন্বয়।—জগত এতে শুক্লকৃষ্ণে গতী শাশ্বতে মতে একয়া অনাবৃত্তিং যাতি অন্যয়া পুনঃ আবর্ত্ততে। ২৬।

মূলানুবাদ।—জগতের এই শুক্ল ও কৃষ্ণ দ্বিবিধ গতি চিরন্তন আছে বলিয়া সম্মত, এই দুইটী গতির মধ্যে একটী গতির দ্বারা অনাবৃত্তি লাভ করা যায়, আর অন্য গতিটীর দ্বারা পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়। ২৬।

ভাষ্য।—শুক্লেতি। শুক্লকৃষ্ণে শুক্লা চ কৃষ্ণা চ, শুক্লকৃষ্ণে, জ্ঞানপ্রকাশকত্বাৎ শুক্লা তদভাবাৎ কৃষ্ণা। এতে শুক্লকৃষ্ণে হি গতী জগত ইতি অধিকৃতানাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ ন জগতঃ সর্ব্বস্যৈতে সম্ভবতঃ। শাশ্বতে নিত্যে সংসারস্য নিত্যত্বান্মতে অভিপ্রেতে। তত্র একয়া শুক্লয়া যাতি অনাবৃত্তিমন্যয়া ইতরয়া আবর্ত্ততে পুনর্ভূয়ঃ। ২৬।

ভাষ্যানুবাদ।—শুক্ল ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। শুক্ল এবং কৃষ্ণ (এই অর্থে) শুক্লকৃষ্ণে (এই শব্দটী) ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্ঞানের প্রকাশক বলিয়া প্রথম গতিটীকে শুক্লগতি বলা যায়, তাহা না থাকায় দ্বিতীয় গতিটীকে কৃষ্ণ বলা যায়। এই শুক্ল ও কৃষ্ণনামক গতিদ্বয় জগতের অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গে অধিকারী জীবগণের পক্ষে "শাশ্বত," নিত্য বলিয়া "মত" অভিপ্রেত, জগতে সকল জীবেরই ত আর দুই প্রকার গতি সম্ভবপর নহে। সংসার নিত্য, এই জন্য এই দুইটী গতিও নিত্য। এই দুইটী গতির মধ্যে একটী অর্থাৎ শুক্লগতির

দ্বারা অনাবৃত্তি লাভ করে, ইহার গতিটীর দ্বারা পুনঃ আবৃত্তি (অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম) লাভ করিয়া থাকে। ২৬।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তোভবার্জ্জুন।। ২৭।

অন্বয়।—হে পার্থ এতে সৃতী জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি তস্মাৎ হে অর্জ্জুন সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তোভব। ২৭।

মূলানুবাদ।—হে পার্থ, যে কোন যোগী এই দুইটী গতির বিষয় অবগত আছে, সে কখনও মোহলাভ করে না, সেই কারণ, হে অর্জ্জুন, তুমি সকল সময়েই যোগযুক্ত হও। ২৭।

ভাষ্য—নৈতে ইতি নৈতে যথোক্তে সৃতী মার্গৌ পার্থ জানন্ সংসারায় একা অন্যা মোক্ষায় চেতি যোগী মুহ্যতি কশ্চন কশ্চিদপি তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ সমাহিতো ভবার্জ্জুন। ২৭।

ভাষ্যানুবাদ।—নৈতে ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। এই যথোক্ত "সৃতি" মার্গদ্বয়কে জানিয়া—একটী মার্গ সংসারে ফিরিয়া আসিবার আর অন্যটী মোক্ষলাভের জন্য এই প্রকার জানিয়া কোন যোগী মোহপ্রাপ্ত হয় না। সেই কারণে হে অর্জ্জুন, তুমি সকল সময়েই "যোগযুক্ত" সমাহিত হও। ২৭।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎসর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্। ২৮।

অন্বয়।—বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চ দানেষু চ এব যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টং যোগী ইদং বিদিত্বা তৎসর্ব্বমত্যেতি (তথা) আদ্যং পরং স্থানং উপৈতি চ। ২৮।

মূলানুবাদ।—সমুদায় বেদপাঠে, সকল যজ্ঞের সম্পাদনে, সকল তপস্যার অনুষ্ঠানে এবং সকল প্রকার দান করিলে যে পুণ্যফল হয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, এই পূর্ব্বোক্ত বিষয়টী জানিলে যোগী ঐ সকল পুণ্যফলেরও অতিক্রমণ করে এবং সেই আদ্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। ২৮।

ভাষ্য। শৃণু যোগস্য মাহাত্ম্যং বেদেষু সম্যগধীতেষু যজ্ঞেষু চ সাদ্গুণ্যে-নানুষ্ঠিতেষু তপঃসু চ সুতপ্তেষু সম্যগ্‌দত্তেষু চ যদেতেষু পুণ্যফলং পুণ্যস্য ফলং পুণ্যফলং প্রদিষ্টং শাস্ত্রেণ অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতি তৎসর্ব্বংফলজাতং ইদং

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] [২৯৬ পৃষ্ঠার পর।

দ্বাদশ অধ্যায়। সন্ন্যাস।

এইরূপে ছয়মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিবস মহাপূর্ণ ও রামানুজ উভয়েই গৃহ হইতে কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছেন। গৃহে জমাম্বা স্নান করিয়া রন্ধনের আয়োজন করিতেছেন। সমুদয় আয়োজন করিয়া কলসকক্ষে নিকটবর্ত্তী কূপে জল আনয়ন করিতে গমন করিলেন। ইত্যবসরে মহাপূর্ণকুটুম্বিনীও রন্ধনের জল আনিবার জন্য কলস লইয়া সেই কূপেই গিয়াছিলেন। উভয়েই সমকালে স্ব স্ব কলস কূপে নিক্ষেপ করিলেন এবং পূর্ণ হইলে রজ্জু সহযোগে উত্তোলন করিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে মহাপূর্ণজায়ার কলস হইতে দুই চারি বিন্দু জল জমাম্বার কলসে পতিত হইল। তাহাতে জমাম্বা ক্রোধে অধীরা হইয়া রূঢ়বাক্যে গুরুপত্নীকে কহিলেন, "তুমি কি চোখের মাথা খাইয়াছ? দেখ দেখি, তোমার অসাবধানতায় এক কলস জল নষ্ট হইয়া গেল। গুরুপত্নী বলিয়া বুঝি একবারে স্কন্ধের উপর উঠিতে হয়? তুমি কি জাননা, তোমার পিতার অপেক্ষা আমার পিতা কত শ্রেষ্ঠকুলোদ্ভূত? তোমার স্পৃষ্টজল কি করিয়া আমি ব্যবহার করি? মূর্খ ভর্ত্তার হস্তে পড়িয়া জাতিকুল সকলই হারাইলাম।" এই দুরুক্তি শুনিয়া মহাপূর্ণকুটুম্বিনী অতি বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় শান্তস্বভাবা এবং সুশীলা। যদিও তাঁহার মনে অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল, তথাপি তিনি তাহা গোপন করিয়া গৃহে চলিয়া আসিলেন, এবং কলস ভূমিতে স্থাপন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণপরে মহাপূর্ণ গৃহে আসিলেন। তিনি জায়াকে রোদন করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করতঃ সকলই অবগত হইলেন, এবং কহিলেন, "নারায়ণের আর ইচ্ছা নয় যে, আমরা এখানে অবস্থান করি। তাই তিনি জমাম্বার মুখ দিয়া তোমায় রূঢ় কথা শুনাইয়াছেন। দুঃখিত হইও না। প্রভু যাহা করেন, সকলই মঙ্গলের জন্য। চল, আমরা কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে গমন করি। অনেক দিবস তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করি নাই। সেই জন্যই তিনি দুরুক্তি করিয়াছেন।" ইহা কহিয়া সেই ক্রোধহীন মহাপুরুষ পত্নীর সহিত

তন্মুহূর্ত্তেই শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন। রামানুজের জন্য অপেক্ষা করিলেন না, কারণ, শ্রীরঙ্গনাথের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তিনি সকলই বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

দীক্ষিত হইবার পর হইতে রামানুজের যাবতীয় মানসিক কষ্ট অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি যজ্ঞ, অঙ্কন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, মন্ত্র, এবং দাস্যনাম, এই পঞ্চ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। মহাপূর্ণের প্রসাদে তিনি পরম শান্তিলাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ন্যায় জগতে আর তাঁহার কে হিতকারী আছেন? ইহা তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার গুরু-ভক্তির তুলনা ছিল না। গুরুর ভুক্তাবশিষ্ট না গ্রহণ করিয়া কখনও ভোজন করিতেন না। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই অগ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। পরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সেই মহাত্মার পদপ্রান্তে উপবেশন পূর্ব্বক তামিল প্রবন্ধমালা অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ছয় মাসের মধ্যে পোইহে রচিত একশত, পূদত্ত রচিত একশত, পে রচিত একশত, পেরিয়া আলোয়ার রচিত ত্রিসপ্তত্যুত্তর চতুঃশত (৪৭৩), অণ্ডাল্ রচিত ত্রিচত্বারিংশদুত্তর শত (১৪৩), কুলশেখর-রচিত পঞ্চোত্তর শত (১৪৫), তিরুমড়িশি-রচিত ষোড়শোত্তর দ্বিশত (২১৬) তোণ্ডারাড়িপ্পোড়ি-রচিত পঞ্চ পঞ্চাশৎ (৫৫), তিরুপ্পান্-রচিত দশ, মধুর কবিরচিত একাদশ, তিরুমঙ্গই-রচিত ষষ্ট্যুত্তর ত্রয়োদশশত (১৩৬০) নম্মাআলোয়ার রচিত ষণ্ণবত্যুত্তর দ্বাদশ-শত (১২৯৬), সমুদয়ে প্রায় চারি সহস্র সুমধুর ভক্তিরসপরিপ্লুত, সন্তাপনাশক, পরম পবিত্র শ্লোক, মহাপূর্ণের নিকট পাঠ করিলেন। এই সকল শ্লোকমালা তিরুবাই মুড়ি নামে প্রসিদ্ধ।

অদ্য তিনি তিরুবাই মুড়ি সমাপ্ত করিয়াছেন। সুতরাং গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য আপণে গিয়া ফল, তাম্বুল, পুষ্প, নববস্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। অদ্য গুরুদম্পতিকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গৃহে আসিয়াছেন। কিন্তু গুরুগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, তথায় কেহই নাই। তিনি ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কোনও তত্ত্ব না পাইয়া, সম্মুখস্থ এক প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, মহাপূর্ণ স্ত্রীর সহিত শ্রীরঙ্গমে গমন করিয়াছেন। সহসা এরূপ গমনের কারণ কি, ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া পত্নীর নিকট গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলে, তিনি কহি-লেন, "অদ্য প্রাতঃকালে কূপে জল আনিতে গিয়া তোমার গুরু [illegible]

আমার কলহ হইয়াছিল। আমি কোনও বিশেষ রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করি নাই। তাহাতেই মহাপুরুষের এত ক্রোধ যে, সস্ত্রীক দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, সাধু হইলে অক্রোধ হয়েন। ইনি এক নূতন প্রকারের সাধু। তোমার সাধুর পদে কোটি কোটি নমস্কার।" তিনি ইহা শুনিয়া আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কহিলেন, "অয়ি পাপিনি, তোর মুখদর্শন করিলেও মহাপাপ হয়।" ইহা কহিয়া ফল, তাম্বুল, বস্ত্র প্রভৃতি যাহা আনিয়াছিলেন, তৎসমুদয় লইয়া শ্রীবরদরাজের অর্চ্চনা করিবার জন্য তদীয় মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

রামানুজ গমন করিবার কিয়ৎকাল পরে এক জন শীর্ণকলেবর ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ দ্বারদেশ হইতে গৃহিণীর নিকট কিঞ্চিৎ অন্ন ভিক্ষা করিলেন। একে জমাম্বা পতির রূঢ়বাক্যে দগ্ধ হইতেছিলেন, তাহার উপর চুল্লির উত্তাপে তাঁহার সর্ব্বশরীরকে স্বেদযুক্ত করিয়াছিল, সুতরাং ভিক্ষুকের প্রার্থনা তাঁহার কর্ণে বজ্রধ্বনির ন্যায় প্রতিভাত হইল। তিনি রোষকষায়িতলোচনে, তারস্বরে কহিলেন, "যাও, যাও, অন্যত্র গমন কর। এখানে কে তোমায় অন্ন দিবে?" ব্রাহ্মণ দুঃখিতহৃদয়ে মৃদুপদসঞ্চারে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, বরদরাজের মন্দিরের দিকে গমন করিলেন। পথিমধ্যে মন্দির হইতে প্রত্যাগত রামানুজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি ব্রাহ্মণের শীর্ণকলেবর দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপ্র, আপনার অদ্য আহার হয় নাই বোধ হয়।" বিপ্র কহিলেন, "আমি আপনার গৃহেই অতিথি হইতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার ব্রাহ্মণী আমায় অন্ন দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছি।" রামানুজ কহিলেন, "না, আপনাকে ফিরিতে হইবে না। আপনি আমার সহিত অনুগ্রহ করিয়া আপণে আসুন; আপনার হস্তে আমি এক পত্র, হরিদ্রা, ফল, তাম্বুল, এবং একখানি নূতন বস্ত্র দিব। তাহা লইয়া আমার পত্নীকে দিবেন, এবং কহিবেন যে, আপনি তাঁহার পিত্রালয় হইতে আসিয়াছেন। তাহা হইলেই আপনাকে যথেষ্ট সমাদর করাইয়া ভোজন করাইবেন।" ইহা কহিয়া তিনি আপণ হইতে ঐসকল দ্রব্যক্রয় করতঃ বিপ্রের হস্তে দিলেন। এবং স্বীয় শ্বশুরের নাম স্বাক্ষর করিয়া এইরূপে একখানি পত্র লিখিলেন।

বৎস, আমার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। সেইজন্য তুমি জমাম্বাকে এই লোকের সহিত মদীয় ভবনে প্রেরণ করিও। যদি কার্য্যগৌরব

না থাকে, তাহা হইলে তুমিও এখানে আগমন করিলে আমি যারপরনাই প্রীতিলাভ করিব। জমাম্বা না আসিলে আমায় অতিশয় কষ্টে পড়িতে হইবে, কারণ, বহুকুটুম্ব সমাগত হইলে তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ করা তোমার শ্বশ্রূর পক্ষে অতীব দুরূহ হইবে। ইতি।

পত্রখানি বিপ্রের হস্তে দিয়া তিনি তাঁহাকে স্বীয় পত্নীর নিকট প্রেরণ করিলেন। বিপ্র গিয়া তাঁহাকে সেই সমস্ত দ্রব্য ও পত্র দিয়া কহিলেন, "আপনার পিতা আমায় প্রেরণ করিয়াছেন।" জমাম্বা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, এবং অতি সমাদরে বিপ্রকে স্নানার্থ উদক আনিয়া দিলেন। ইত্যবসরে রামানুজ গৃহে আসিলেন। অতি বিনীতভাবে পত্রখানি জমাম্বা রামানুজ হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "পিতা তোমায় এই পত্র দিয়াছেন।" রামানুজ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন, এবং কহিলেন, "আমার কোনও বিশেষ কার্য্য আছে। গমনে অনেক ক্ষতি হইবে। সুতরাং তুমিই আহারাদি করিয়া এই বিপ্রের সহিত পিত্রালয়ে গমন কর। কার্য্য শেষ হইলে আমিও পশ্চাৎ যাইতে চেষ্টা করিব। শ্বশুর শ্বশ্রূর পদে আমার প্রণাম জানাইও।" জমাম্বা স্বীকৃতা হইলেন।

আহারান্তে পতিপদে প্রণাম করিয়া বিপ্রের সহিত রামানুজপত্নী পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন, এবং রামানুজও গৃহত্যাগ করিয়া বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে রামানুজ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "পাপানাং আকরাঃ স্ত্রিয়ঃ। বহুকষ্টে পিশাচিনীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি। হে নারায়ণ, দাসকে শ্রীপাদপদ্মে স্থান দান কর।"

কিয়ৎক্ষণ পরে হস্তিগিরিপতির (বরদরাজ) সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং কহিলেন, "হে নাথ, অদ্য হইতে আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার হইলাম; আমায় গ্রহণ কর।" ইহা কহিয়া কাষায় বস্ত্র ও দণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক বরদরাজের শ্রীপাদপদ্মে স্পর্শ করাইয়া, মন্দিরসম্মুখস্থ অনন্তসরোবর তীরে গমন করিলেন। স্নানান্তে তথায় আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে চিত্তৈষণা, দারৈষণা প্রভৃতি যাবতীয় এষণা আহুতি দিলেন। বরদাবিষ্ট শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ তাঁহাকে সেই সময় "যতিরাজ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এইরূপে সর্ব্ববিধ এষণা দগ্ধ করিয়া কায়মন ও বাক্যকে সর্ব্বদা বশে রাখিবার জন্য ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলেন। সেই অরুণবসনধারী যতিরাজ সেই সময় নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ।

(রামকৃষ্ণ মিশন, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)

শাস্ত্রে কর্ম্ম শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ, মানুষ যাহা কিছু করে, তাহাকেই কর্ম্ম বলা হইয়াছে, কিন্তু শাস্ত্র যেখানে বলিতেছেন, কর্ম্ম হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, কর্ম্ম হইতে সূর্য্য চন্দ্র হইয়াছে, সেখানে কর্ম্ম শব্দ, যে অচিন্তনীয় কার্য্যকারণপ্রবাহ সমগ্র জগৎকে বীজাবস্থা হইতে বিশিষ্ট নামরূপ দ্বারা প্রকাশিত করিতেছে, সেই কার্য্যকারণপ্রবাহকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। অদৃষ্ট অবস্থা হইতে দৃষ্ট অবস্থান্তর প্রাপ্তিকেই কর্ম্ম বলা হইয়াছে, অতএব গতিশক্তিই কর্ম্মের প্রধান লক্ষণ।

কর্ম্ম দ্বিবিধ;—সকাম ও নিষ্কাম। শাস্ত্র কোন কর্ম্মকেই মিথ্যা বলেন নাই। অনেকে বলেন, 'সংসারে থাকিয়া ভগবান পাওয়া যায় না। সংসারে মানুষ যাহা কিছু কর্ম্ম করিতেছে, সব মিথ্যা। তাহা দ্বারা কখনও ভগবদ্দর্শন হইতে পারে না। সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়।' কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। শাস্ত্র অবস্থাবিশেষে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। সংসারকে ছোট ও সন্ন্যাসকে বড় করেন নাই। অবস্থাবিশেষে সংসার কাহারও পক্ষে ঠিক আবার সন্ন্যাস কাহারও পক্ষে ঠিক, এই কথা বলিয়াছেন। সকল কর্ম্মই আমাদিগকে ভগবানের দিকে লইয়া যাইতেছে। কোন কর্ম্মই মিথ্যা নয়। যাহা অত্যন্ত স্বার্থপর কর্ম্ম, তাহা করিতে করিতে লোকে বহুদর্শিতা লাভ করে ও অবশেষে নিষ্কাম কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হয়। নিষ্কাম ভাব কালে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে স্বভাবতঃ সন্ন্যাস আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই যথার্থ সন্ন্যাস। ইহা ভোগ ও ত্যাগ, এই দুই লক্ষণের অধিকারভুক্ত নয়। ইহা ঐ দুয়ের বাহিরে। একেবারে কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে মানুষ অগ্রসর হইতেই পারিবে না। পরমহংসদেব বলিতেন, শরীরের চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইলে শুষ্ক চর্ম্ম আপনিই খসিয়া পড়ে। কিন্তু আরোগ্যলাভ হইবার পূর্ব্বে চর্ম্ম উঠাইতে প্রয়াস পাইলে যন্ত্রণা, রক্তপাত ও ক্ষতবৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

তিনি আরো বলিতেন, সংসার, সন্ন্যাস, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সকলই মনুষ্যের উন্নতির মাত্রায় সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই জন্য যাহার যেরূপ শরীর ও মনের অবস্থা, তাহার পক্ষে সেইরূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে ছেলের

যেরূপ স্বাস্থ্য, তাহা বুঝিয়া মা তাহার জন্য উপযোগী পথ্য ব্যবস্থা করেন। আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ। কোন কর্ম্মই ধর্ম্ম ছাড়া নয়, তবে যাহার যেরূপ অধিকার, তাহার পক্ষে সেইরূপ ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। কোন এক ধর্ম্ম সকলের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না।

শাস্ত্রে দুটী মার্গের বর্ণনা আছে,—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। যাহার সুখভোগের ইচ্ছা প্রবল, সে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে গেলে স্বভাবতঃ যাগযজ্ঞাদিলক্ষণ সকাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ সুখাদি ভোগের পর যখন সে দেখিবে, কালে তাহার প্রাণ অন্য কিছু উচ্চ বস্তু চাহিতেছে, তখন সে আপনিই ইহা ছাড়িয়া নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিবে। রাজা যযাতি পুরুর নিকট হইতে তাহার যৌবন গ্রহণ করিয়া সহস্র বৎসর ভোগ করতঃ যখন আবার তাহাকে ঐ যৌবন ফিরাইয়া দিতেছেন, তখন বলিতেছেন, কামের উপভোগে কাম কখন পরিতৃপ্ত হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যযাতির এই বৈরাগ্য তাঁহার সহস্র বৎসর বিষয়োপভোগ ও সকাম কর্ম্মের দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছিল।

পরমহংসদেব বলিতেন, এই প্রবৃত্তিমার্গ ছাতের সিঁড়িস্বরূপ; ইহা অবলম্বন করিয়া নিবৃত্তিমার্গে—ছাতের উপরে—উঠিতে হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, কাহার কিরূপ কর্ম্ম করা উচিত, তাহা কে নির্দ্ধারণ করিবে? ইহা নির্দ্ধারণ করিতে একমাত্র সদ্‌গুরুই সক্ষম। যাহার যেরূপ মানসিক অবস্থা, গুরু তাহার জন্য সেইরূপ ধর্ম্ম ব্যবস্থা করেন।

গুরুকরণ করিতে হইলে গুরুকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। ইহাই শাস্ত্রের মত। গুরুর পুত্রকেই গুরু করিতে হইবে, ইহা প্রামাণিক সৎশাস্ত্রানুমোদিত নহে। গুরুকে বিশেষ দেখিয়া তবে বিশ্বাস স্থাপন করিবে। কিন্তু একবার বিশ্বাস করিলে আর কোনরূপ সন্দেহ করিবে না। পরমহংসদেব তাঁহার নিজের সম্বন্ধে বলিতেন, খুব বাজিয়ে নে। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি শাস্ত্র ছাড়া কোন কায করিতেন না। তাঁহার জীবন বেদবেদান্তের টীকাস্বরূপ। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মবীর মহাপুরুষগণ ধর্ম্ম রক্ষা করিতেই আসেন। হিন্দু খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের মহাপুরুষগণই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্র ও ধর্ম্মের রক্ষণের জন্য আসিয়াছেন, কোনও শাস্ত্র বা ধর্ম্ম ধ্বংসের জন্য তাঁহাদের শরীর পরিগ্রহ নহে।

নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ—স্বার্থশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা—আপনাকে ভুলিয়া নিজের সুখের দিকে দৃষ্টি না করিয়া ভগবানের জন্য কায করা। যাহার যেরূপ অবস্থা, সে সেইরূপ স্বার্থশূন্য হইয়া কায করিতে পারে। এই স্বার্থশূন্য হইয়া কায করার নাম কর্ম্মযোগ। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, স্বার্থপরতা কখনও কাহারও কি নিঃশেষে ত্যাগ হইতে পারে? আমরা দেখিতে পাই, কাহারও স্বার্থ নিজের উপর আবদ্ধ, কাহারও নিজের পরিবারের উপর, কাহারও দেশের উপর, আবার কাহারও বা সমুদয় জগতে বিস্তৃত। বুদ্ধদেব একটা ছাগলের জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন। তাহাতেও কি স্বার্থপরতা নাই? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, স্বার্থবিস্তৃতি ও নিঃস্বার্থতা একই বস্তু। যাহার মন বুদ্ধি নিজের শরীর মনের উপর আবদ্ধ,সেই যথার্থ স্বার্থপর ও কৃপাপাত্র। নিজের শরীর মন ছাড়িয়া অপরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া রূপ স্বার্থই নিঃস্বার্থতা নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, সে স্বার্থ বন্ধনের কারণ না হইয়া মনুষ্যকে মনুষ্যনামের উপযুক্ত করে ও ভগবানের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। মনুষ্য যে পরিমাণে উন্নত হইতে থাকে, তাহার দৃষ্টি সেই পরিমাণে শরীর মন প্রভৃতির ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইতে থাকে। পরিশেষে ক্ষুদ্র আমি এককালে চলিয়া গিয়া তাহার স্থলে এক মহান্ আমির সমাবেশ হয়,যাহার ঘাত প্রতিঘাত সমগ্র জগৎ জুড়িয়া হইতে থাকে। ইহাকেই ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থা বা মুক্তি বলে।

আমরা তিন প্রকারে অপরের উপকার করিতে পারি। কেহ ক্ষুধার্ত্ত হইলে অন্ন দিয়া তাহার ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে পারি। কিন্তু এই উপকার শরীরসম্বন্ধীয় ও ক্ষণস্থায়ী। ছয় ঘণ্টা পরে আবার তাহার ক্ষুধার উদ্রেক ও অভাব বোধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিতে পারি, যাহাতে সে নিজের জীবনোপায় নিজে করিয়া লইতে পারে। এই উপকার অনেক দিন স্থায়ী ও মানসিক। তৃতীয়;—আধ্যাত্মিক উপকার; ইহার ফল আরো বিস্তৃত। ইহার প্রভাবে তাহার অভাব চিরজীবনের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই উপকার—ধর্ম্মোন্নত মহাপুরুষেরাই কেবল করিতে পারেন।

একদিন খ্রীষ্ট রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া একটা কূপের নিকট বসিয়া আছেন। একজন নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক জল লইতে আসিল। খ্রীষ্ট তাহার নিকট জল চাহিলে সে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, আমার হাতে আপনি জল পান করিবেন? [illegible] জল পান করিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে

যে জল দিব, তাহাতে তোমার চিরজীবনের মত তৃষ্ণা মিটিয়া যাইবে। এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের শাস্ত্রে ও শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ প্রভৃতি অবতারদের চরিত্রে এবং পওহারী বাবা, ত্রৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষগণের জীবনে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা যে কাযই করি না কেন, ভগবানের জন্য করিতেছি, নিজের জন্য নয়, এইরূপ ভাবিয়া করিতে হইবে। সামান্য রাস্ত ঝাঁট যে দেয়, সে যদি ভাবে যে, সাধুলোকের যাইবার জন্য বা সকল লোককে ভগবানের অংশবোধে তাহাদের সেবার জন্য রাস্তা ঝাঁট দিতেছে, তাহা হইলে তাহার কোন কষ্ট থাকে না। এরূপ কোন কর্ম্মই নাই, যাহা সম্পূর্ণ ভাল, যাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। আমরা যে ভগবচ্চর্চ্চা করিতেছি, তাহাতেও সকলে উপকৃত হইতেছে না, মুখনিঃসৃত উষ্ণ বায়ুতে বায়ুসাগরে ভাসমান কত কীটাণুর মৃত্যু হইতেছে। সকল কাযই এইরূপ ভালমন্দমিশ্রিত হইলেও যদি নিঃস্বার্থভাবে করা যায়, তাহার দোষ আমাদিগকে স্পর্শ করে না। শরীর রক্ষার উপযোগী আহারশয়নাদি সম্বন্ধেও যদি ভাবা যায় যে, আহারশয়নাদির উদ্দেশ্য শরীররক্ষা, শরীর থাকিলে তবে ভগবৎসাধনা হইবে, অতএব আহারশয়নাদিও ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্যই করিতেছি, তবে ঐগুলিও নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইল। এরূপ করিলে আর কর্ম্মফলের দিকে দৃষ্টি থাকিবে না ও তজ্জনিত সুখদুঃখে আক্রান্ত হইতে হইবে না এবং কর্ম্মও বন্ধনের কারণ হইবে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কর্ম্ম অনাদি। এই কর্ম্মের দ্বারাই শাস্ত্র জগতের বৈষম্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কর্ম্মের জন্যই এই বৈষম্য হইয়াছে। যাহার যেরূপ কর্ম্ম, সে সেইরূপ অবস্থা পাইয়াছে। কেহ কেহ এই বৈষম্যের অন্য কারণ নির্দ্দেশ করেন। ১ম, কেহ বলেন, জন্মসময়ে গ্রহাদি যেরূপ থাকে, মানুষ সেইরূপ অবস্থাপন্ন হয়। শুভগ্রহ থাকিলে উত্তম জন্ম হয়, অশুভগ্রহ থাকিলে কুৎসিৎ জন্ম হয়। ইহার উত্তরে এই তর্ক উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, আমারই বা অশুভগ্রহে জন্ম হইল কেন, অপরেরই বা শুভগ্রহে কেন জন্ম হইল? এই শুভাশুভ গ্রহ আমার জন্মগতির নির্দ্দেশক হইতে পারে, কিন্তু কারণ হইতে পারে না। ইহার কারণ অবশ্য আর কিছু আছে, যাহার জন্য আমার অশুভ জন্ম হইতেছে ও অপরের শুভ জন্ম হইতেছে। ইহাকেই শাস্ত্র পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম বলেন। ২য়, কেহ কেহ বলেন, পিতামাতার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সন্তানে গিয়া বর্ত্তে। পিতামাতার

রোগাদি সন্তানে প্রাপ্ত হয়, অতএব পিতামাতাই এই বৈষম্যের কারণ (Hreditary Transmission)। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তাহা হইলে সন্তানের জন্মে পিতামাতার মানসিক শক্তির ক্ষয় হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হয় না আর সামান্যশক্তিশালী পিতামাতা হইতেই বা অদ্ভুতগুণ-সম্পন্ন সন্তান কিরূপে উৎপন্ন হয়? শুদ্ধোদনের ন্যায় অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধদেবের ন্যায় সন্তান কিরূপে উৎপন্ন হইল, যিনি বাল্যকালেই সমাধিমগ্ন হইতেন? এইরূপ খ্রীষ্টের বিষয় বলা যাইতে পারে। পরমহংসদেবের বিষয় অনেকেই জানেন। ইহা কোথা হইতে হয়? কার্য্য কারণ হইতে অধিক শক্তিসম্পন্ন কখন হইতে পারে না। আমরা এই কর্ম্ম-বাদে অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারি, কিন্তু বংশানুক্রমিকসঞ্চারবাদে তাহা করা যায় না। আর আমাদের এইরূপ প্রকৃতি যে, অন্যের উপর দোষারোপ করিতে পারিলে নিজে দোষ গ্রহণ করিতে চাই না। আমার এই কষ্টের কারণ কে? হয় ভগবান, নয় গ্রহনক্ষত্র, নয় পিতামাতা ইত্যাদি, কিন্তু আমি স্বয়ং যে আমার কষ্টের কারণ, তাহা একবারও বলি না। যে শক্তিদ্বারা আমি এই কষ্ট পাইতেছি, আবার তাহারই দ্বারা আমি উন্নত হইতে পারি। পাপ করিয়াছি, তাহাতে ভয় কি? আবার চেষ্টা কর, অনন্ত শক্তি তোমার ভিতর আবার জাগরিত হইবে। সাহস চাই, তেজ চাই; নির্জ্জীব মনের, নির্জ্জীব শরীরের ধর্ম্মলাভ হয় না। নির্ভয় হও, আবার চেষ্টা কর, কর্ম্ম কর, আবার ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য।

(স্বামী ত্রিগুণাতীত।)

[প্রথম যে বৎসর কলিকাতায় প্লেগ প্রবেশ করে, সেই বৎসর ইহা কলি-কাতা, বাগবাজার, রামকৃষ্ণ মিশন সভায় পঠিত হয়।]

কম বেশ এক হাজার বৎসর গত হইল, কলির মানবের অবস্থা মলিন দেখিয়া, অতি ক্ষোভভরে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন—

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ
তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

হায়! বালককাল খেলায় কাটিয়া গেল, যৌবনে ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত, যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন নানাপ্রকার চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন; জীবনে আর কখন পরমব্রহ্মে মন লাগাইতে পারিলেন না।

মানবের আরও শোচনীয় অবস্থা শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিতেছেন—

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং॥

উঃ! কি দুর্ব্বিপাক! বৃদ্ধ হইল, শরীরে জরা আসিল, দেহ কুব্জ হইয়া যাইল, দন্ত সমস্ত পড়িয়া গেল, ক্রমশঃ অতিবৃদ্ধ হইল,—এমন কি, যষ্টি-ভরে চলিতেও কলেবর কম্পিত হইতে থাকে—মৃত্যু যখন শিয়রে উপস্থিত, তখনও সে বৃদ্ধ, ভোগ-আশা ছাড়িতে পারিল না!! ইহা অপেক্ষা মানবের আর অধিক দুর্দ্দশা কি হইতে পারে!!! শঙ্করাচার্য্য এক স্থলে বলিতে-ছেন,—

জন্তূনাং নরজন্মদুর্ল্লভম্।

যত প্রকার সৃষ্ট জীব আছে, তাহার মধ্যে মনুষ্যজন্ম সুদুর্ল্লভ। কেন সুদুর্ল্লভ? তাহার কারণ কি?—

যল্লাভান্নাপরো লাভো—যাহা লাভ করিলে, আর কিছু লাভ করিবার অবশিষ্ট থাকে না, যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং—যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার বাকি থাকে না, যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং—যাহা দর্শন করিলে আর কিছু দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় না, যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ—যাহা হইতে পারিলে আর পুনর্জন্ম হয় না;—এমন যে পদার্থ, তাহা কেবল একমাত্র মানবজাতিতেই লাভ করিতে পারে, অন্য প্রাণীতে পারে না, এই জন্যই নরজন্ম এত দুর্ল্লভ বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয়। এমন যে দুর্ল্লভ নর-জন্ম আমরা হেলায় হারাইতেছি; এমন যে অমূল্য মানব-জন্ম, তাহার সার্থকতা ও দায়িত্ব আমরা কিছুমাত্র উপলব্ধি না করিয়া, কেবল বিপরীত আচরণ দ্বারা নিজেদের যথেষ্ট অমঙ্গল নিজেরাই করিতেছি—ইহা অপেক্ষা আর বিড়ম্বনা কি হইতে পারে!! শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন,—

ইতঃ কো ন্বস্তি মূঢ়াত্মা, যস্তু স্বার্থে প্রমাদ্যতি।
দুর্ল্লভং মানুষং দেহং, প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষং॥

দুর্ল্লভ নরদেহ, বিশেষ পুরুষ-দেহ প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি মোক্ষ লাভের চেষ্টা না করিয়া পার্থিব অভীষ্ট-সাধনে তৎপর হয়, তাহার অপেক্ষা মূঢ় ব্যক্তি আর কে আছে? মোক্ষ-লাভের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, আমরা বরং, ক্রমশঃ অধিকতর মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছি। আজ মানবের এত মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবার কারণ কি? তাহাই সম্যক্‌রূপে নির্দ্দেশ করাই অদ্যকার সভার আলোচ্য বিষয়। যে মানব এক সময়ে রোগশূন্য ছিলেন, তিনি আজ কেন মারীভয়ে ভীত হয়েন? যে মানব এক কালে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন, তিনি আজ কেন পীড়নভয়ে পলায়ন করেন? যে মানব পূর্ব্বে একমনে "ন মে মৃত্যুশঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ" প্রভৃতি গাথা নিয়ত গাইতেন এবং তদনুরূপ ধারণা করিয়াছিলেন, তিনি আজ কেন নানা-প্রকার ভয়ে, নানাপ্রকার চিন্তায়, নিজের মনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া মহা অশান্তিসাগরে নিমগ্ন করাইতেছেন? কেন? ইহার কারণ কি?—ইহার কারণ আর কিছুই নহে, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। আজ সেই ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় কিছু আলোচনা করিব।

একদিন যে জন-সমাজে একটী শিশুসন্তান নিজ জ্ঞান-গর্ভ উত্তরের দ্বারা প্রশ্নকারী অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী মহাত্মাকেও স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন; যে জন-সমাজের মাঝে একদিন, নচিকেতাসম তেজস্বী বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যে মানবের ঔরসে এক সময়ে শুকদেব প্রভৃতি ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে মানবের দুর্দ্দশা আজ এরূপ হইল কেন? সে মানব আজ মূঢ় হইয়া নিজেকে নানাপ্রকার সঙ্কটাপন্ন মনে করে কেন?—ইহার কারণ, আমাদের সেই সনাতন তেজস্বিতার অভাব, সেই সনাতন বীর্য্যের অভাব, ইহার কারণ একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। বিনা ব্রহ্মচর্য্য কোনও বিষয়েই উন্নতি করা যায় না।

এক্ষণে দেখা যাউক, "ব্রহ্মচর্য্যে"র অর্থ কি? এবং ব্রহ্মচর্য্য বলিতে আমরা কি বুঝি? পতঞ্জলির যোগ-সূত্রের ভাষ্যে এক স্থলে দেখিতে পাই—"ব্রহ্মচর্য্যমুপস্থনিয়মো বীর্য্যধারণম্বা"। ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত অর্থ এবং প্রধান লক্ষণ হইতেছে বীর্য্যধারণ। ঐহিক, পারত্রিক বা পারমার্থিক সকল প্রক ক্ষেত্রে, যে কোনও বিষয়েতেই হউক উন্নতি সাধন করিতে গেলে, বী একমাত্র আবশ্যক। শরীর পালন বলুন, মন্ত্রসাধন বলুন, পরের বলুন, আত্মার উপকার করা বলুন, সকল কার্য্যই

সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। প্রসিদ্ধ ডাক্তার নিকল্‌স্‌ ঠিক ঐ রূপই কথা বলিয়াছেন ;—যথা "The suspension of the use of the generative organs is attended with a notable increase of bodily and mental vigour and spiritual life." অর্থাৎ বীর্য্যধারণ করিলে শারীরিক ও মানসিক তেজ এবং আধ্যাত্মিক শক্তিরও বৃদ্ধি হয়. ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। তাই বলি, বিনা ব্রহ্মচর্য্য মানবের কোনও জীবনেই, পার্থিব জীবনেই বলুন, আর ধর্ম্মজীবনেই বলুন, কোনও জীবনেই প্রকৃত মঙ্গলের আশা নাই। পরমহংসদেব বলিতেন, যেমন কাচের পৃষ্ঠে পারদ দিলে সেই কাচে প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি যিনি রেত ধারণ করিতে পারিয়াছেন, যিনি উর্দ্ধরেতা, তাঁহার বুদ্ধিতে ব্রহ্মের ছায়া পড়ে। যিনি প্রকৃত ব্রহ্মচারী, তাঁহাতে ব্রহ্মের ছায়া পড়ে। যে মানবের হৃদয়ে ব্রহ্মের ছায়া পড়ে, সে মানব যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারিবেন, যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, সেই কার্য্যই সুসম্পন্ন করিবেন, তাহার আর সন্দেহ কি? তাই বলি, বিনা ব্রহ্মচর্য্য, আমাদিগের জীবনই বৃথা।

'ব্রহ্মচর্য্য' এই কথার আভিধানিক অর্থ হইতেছে "ব্রহ্মণে বেদার্থং চর্য্যং আচরণীয়ং" এখানে "ব্রহ্ম" অর্থ "বেদ"। অর্থাৎ বেদ পাঠের জন্য যে আশ্রম আচরণীয়। বেদপাঠ সাধারণতঃ বালক কালেই করিয়া থাকে, এই জন্য চার আশ্রমের মধ্যে প্রথম আশ্রমের নাম "ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম"। এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সকলকার পক্ষে, বিশেষ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের, অবশ্য অবলম্বনীয়। "ব্রহ্মচারী" এই কথাটী 'ব্রহ্মচর' শব্দের উত্তর আবশ্যকে ণিনি প্রত্যয় করিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অবশ্য আচরণীয়। কেন? তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই যে, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে যাবতীয় মহৎ মহৎ গুণ অভ্যাস করান হয়, এবং অতি সহজেই অভ্যাস করিতে পারাও যায়। আজকাল অনেক দেশেরই প্রথা হইয়া পড়িয়াছে যে, বাল্যকালে কেবল অর্থকরী বিদ্যাই অভ্যাস করিতে দেওয়া। ব্রহ্মবিদ্যা তো দেওয়াই হয় না, আর চরিত্রগঠনের দিকেও বড় একটা বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় না। পূর্ব্বে কিন্তু, আমাদের দেশে এরূপ প্রথা ছিল না। প্রথমেই চরিত্রগঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল, পরে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা হইত, এবং অবশেষে কেহ কেহ অর্থকরী বিদ্যার উপদেশ দিতেন বটে। কিন্তু তখন সকলে জানিতেন যে, চরিত্র এবং জ্ঞানই বিশেষ

আবশ্যকীয়। চরিত্র এবং জ্ঞান যাহার আছে, তাহার অর্থ প্রভৃতি সমস্তই আপনা হইতেই আসিয়া যায়; চরিত্র ও জ্ঞান অর্থের অনুগামী নহে, অর্থ ইহাদিগের অনুগামী।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে যাবতীয় মহৎ মহৎ গুণ গুলি অভ্যাস করা যায় বলিয়াই, ইহা অবশ্য আচরণীয়। মনু বলিতেছেন—

সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্, ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং, তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥

ব্রহ্মচারী নিজের তপস্যাবৃদ্ধির জন্য গুরুগৃহে বাস করতঃ এবং ইন্দ্রিয় সমস্ত সংযমন করিয়া এই এই নিয়ম পালন করিবে। যথা গুরুশুশ্রূষা, জপ তপাদি, অহিংসা কঠোরতা প্রভৃতি।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সকল আশ্রমের মূল ভিত্তি। গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস তিন আশ্রমই, এক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যেমন কোন অট্টালিকার ভিত্তিমূল কাঁচা থাকিলে, সেই অট্টালিকা বৃহৎ ও সুন্দর হইলেও অস্থায়ী হয়; তেমনি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ভাল করিয়া পালন না করিলে, কোনও আশ্রমই সুসম্পন্ন হয় না—এমন কি, কোনও আশ্রমেরই অধিকারী পর্য্যন্তও হইতে পারা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ বলিতেছেন;—

এবং বৃহদ্ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োঽমলঃ॥
অথানন্তরমাবেক্ষন্ যথাজিজ্ঞাসিতাগমঃ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্ গুর্ব্বনুমোদিতঃ।
গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ॥

ব্রহ্মচারী যখন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের তীব্র তপস্যা হেতু ব্রহ্মতেজে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে থাকিবেন, এবং যখন তাঁহার সমস্ত বাসনা দগ্ধীভূত হইলে তিনি বিশুদ্ধচেতা হইবেন, তখন গুরু তাঁহাকে পরীক্ষা করিবেন; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি যে আশ্রমে ইচ্ছা সেই আশ্রমে যাইতে পারেন—গৃহস্থও হইতে পারেন, বানপ্রস্থীও হইতে পারেন, অথবা সন্ন্যাসীও হইতে পারেন। ফলকথা; বিনা ব্রহ্মচর্য্য কোন আশ্রমেই অধিকার নাই। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সকলকারই অবশ্য আচরণীয়।

ব্রহ্মচর্য্য এত উচ্চ, এত মহৎ ও এত আবশ্যকীয় যে, ইহা কেবল প্রথম আশ্রমের নাম নহে; ব্রহ্মচর্য্য যে কেবল বাল্যকালেই পালন করিতে হইবে, তাহা নহে। ব্রহ্মচর্য্য যে, কেবল মানবজীবনের ভিত্তিমূল অর্থাৎ বোনেদ্ প্রস্তুত করিয়া দিয়াই নিষ্কৃতি পান, তাহা নহে। ব্রহ্মচর্য্যের কার্য্য যে কেবল মানবজীবনের প্রথম সোপানেই শেষ হইয়া যায়, তাহা নহে। ইহার কার্য্য মনুষ্যের যাবজ্জীবন ব্যাপিয়া থাকে। বিনা চুন্ সুর্কী যেমন অট্টালিকা নির্ম্মাণ অসম্ভব, তেমনি ব্রহ্মচর্য্য বিনা মনুষ্যজীবনের গঠন বিড়ম্বনা মাত্র। ইমারতের কোন স্থানে চুন্ সুরকীর জোর কমিয়া যাইলে ইমারত যেমন সেই স্থলে ভগ্নপ্রায় হয়; সেইরূপ মানবজীবনের কোনও অংশে যদি ব্রহ্মচর্য্যের জোর হ্রাস হয়, সেই স্থলেই সে জীবনের পতন বলিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের যে সকল গুণ, প্রায় সে সমস্তই সকল আশ্রমেই প্রয়োজন হয়। প্রথম আশ্রম, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমের তো কথাই নাই. এমন কি, গার্হস্থ্য আশ্রমেও ব্রহ্মচর্য্য অত্যন্ত আবশ্যক। বিনা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য আশ্রম শাস্ত্র অনুসারে যাজন করা একেবারেই অসম্ভব। বিনা সংযমন, বিনা জিতেন্দ্রিয়তা, যাঁহারা গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই ব্যভিচার দোষে দূষিত হন, বেশ্যাগমন পাপে মগ্ন হন। যাহাতে যাঁহার অধিকার নাই, তাহা যদি তিনি গ্রহণ করেন বা ভোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যভিচার দোষ হয়। পরমহংসদেব গৃহস্থ প্রভৃতি সকল ব্যক্তিকেই বলিতেন, "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া সমস্ত কার্য্য কর,", আরও, খুঁটী ধরিয়া ঘোরা, চিঁড়ে কোটা, হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের জল আনা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর উপমা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেন যে, কিরূপে ও কি ভাবে গৃহস্থ আশ্রম পালন করিতে হয়। তাঁহার উপদেশ অনুসারে গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিতে গেলেই অগ্রে ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ অভ্যাস চাই; অগ্রে জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করা চাই; সংযমন বিদ্যা অভ্যাস করা চাই। এক কথায়, অগ্রে সাধু হইতে হয়। সেই জন্যই কোন কোন মতে গার্হস্থ্য আশ্রমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলে। গার্হস্থ্য আশ্রম অতি পবিত্র আশ্রম। গার্হস্থ্য আশ্রম পশুদিগের জন্য নয়; ইহা অতি পবিত্র—ইহা শুদ্ধচেতা ব্রহ্মচারীর নিমিত্ত। ঈশ্বর, পশুদিগের জন্য কোনও আশ্রম সৃষ্টি করেন নাই। কোনও শাস্ত্রে এরূপ নাই যে, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া গৃহস্থ-আশ্রম পালন করিবে। যে আশ্রমে সাধু, সন্ন্যাসী, এমন কি, স্বয়ং নারায়ণ আসিয়া দ্বারস্থ হইতেছেন, সে আশ্রম কত পবিত্র, মনে করুন. সে আশ্রমে কত সাবধানে থাকিতে হয়, ভাবুন। বিনা ব্রহ্মচর্য্য, কি ব্রহ্মচারী,

কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থী বা কি সন্ন্যাসী, কাহারও মঙ্গল নাই; দেশেরও মঙ্গল নাই; এবং জগতেরও শান্তি নাই।

শুধু যে আমাদের দেশে ও আমাদের ধর্ম্মেই ব্রহ্মচর্য্যের এত আধিপত্য এবং এত আবশ্যকতা, তাহা নয়। পৃথিবীর যাবতীয় দেশে ও যাবতীয় ধর্ম্মে, এই ব্রহ্মচর্য্যের গুণ সেই এক তানেই গাইতেছে। যে ব্রহ্মচর্য্য এই দেশে, সেই ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বত্রেই এক সুরে বলিতেছে। পূর্ব্বে, পৃথিবীর আর কোথাও ব্রহ্মচর্য্য ছিল না; বৈদিক ঋষিরাই ভারতবর্ষে প্রথম ব্রহ্মচর্য্য স্থাপন করেন। প্রশ্নোপনিষদে আছে, সুকেশা ভারদ্বাজ প্রভৃতি ছয়জন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যখন পিপ্পলাদ ঋষির নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিতে আসেন, ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা পুনরায় এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা করিয়া আইস, পরে তোমাদিগকে জ্ঞান-উপদেশ দিব।" তদ্ব্যতীত ছান্দোগ্যের ইন্দ্রবিরোচন সংবাদে কথিত আছে, প্রজাপতি ইন্দ্রকে ১০১ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া তবে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন।

এই ভারতবর্ষ হইতে সেই ব্রহ্মচর্য্যের বীজ ইজীপ্ট্ দেশে নিও-প্লেটোনিষ্টদিগের নিকট এবং গ্রীসদেশে পিথাগোরাস প্রভৃতির নিকট যায়। তাহার পরে ক্রমশঃ ইউরোপে স্থানে স্থানে কিছু কিছু করিয়া ছড়াইয়া পড়ে। এই তো গেল ইউরোপ আফ্রিকার কথা। এ দিকে এসিয়ার চারিদিকেও, এই ভারতবর্ষই, ব্রহ্মচর্য্যবীজ প্রেরণ করেন। পারস্য দেশে পার্সীগণ এখান হইতেই গ্রহণ করেন। পরে, বৌদ্ধগণ নানাদেশদেশান্তরে প্রেরণ করেন। বৌদ্ধগণের নিকট হইতে এসেনিসগণ গ্রহণ করেন। অবশেষে খ্রীষ্টানগণ কতক নিওপ্লেটোনিষ্টদিগের নিকট হইতে লয়েন, আর কতক এসেনিস্‌দিগের নিকট হইতে পান। পরে, খ্রীষ্টিয়ানগণও আর আর অনেক দেশে ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, যে যে দেশে এই ব্রহ্মচর্য্যের বীজ পরোক্ষে বা অপরোক্ষে যাইয়াছে, সেই সেই দেশ হইতে মহৎ মহৎ ব্যক্তি উদ্ভূত হইয়াছেন; এবং তাঁহারা স্ব স্ব দেশের ও জগতের যত হিতসাধন করিয়াছেন, তত তথাকার আর কেহ করিতে পারেন নাই। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেণ্ট পল্ ও সার আইজাক নিউটন্ প্রভৃতি মহাত্মাগণকে দেখুন। তাই বলি, যদি কেহ নিজের ও দেশের মঙ্গল চান তো, তিনি, যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, যেন ব্রহ্মচর্য্য চরণ করিতে না ছাড়েন।

ব্রহ্মচর্য্য শুধু ধার্ম্মিকের নিকটই যে আদরণীয়, তাহা নহে। যিনি ধর্ম্ম না

মানেন; যিনি ঈশ্বরবাদ, পুনর্জ্জন্মবাদ প্রভৃতি না মানেন; যিনি বেদ না মানেন, তাঁহার নিকটেও ব্রহ্মচর্য্য সমধিক ফলপ্রদ। কেন না, ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্ভূত শম দম তিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয়টী সম্পত্তি, পরলোকতত্ত্ব বা মুক্তিতত্ত্ব না মানিলেও, যাঁহারা জড়জ্ঞানবাদী এবং নিজের ও দেশের হিতৈষী, তাঁহাদিগের পক্ষেও সাতিশয় উপকারক। জড়বাদীদিগের মধ্যে যাঁহারা ভাল লোক এবং গুণী ও বড় লোক, তাঁহারাও এ ছয়টী সম্পত্তির সম্মাননা যথেষ্ট করেন। শম দম তিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয়টী সম্পত্তির কোন না কোন সম্পত্তিসম্পন্ন না হইলে কেহ কখনও কোনও মহৎ কার্য্য করিতে পারেন না। এই ছয়টী গুণ যথার্থই ছয়টী সম্পত্তি। শম দম যাহার অন্তরে আছে, তাহার আর ভাবনা কি? মহারাজাই হউন আর সম্রাটই হউন, তাঁহার ঘরে শম দম প্রভৃতি ছয়টী সম্পত্তি যদি না থাকে, তবে তো তিনি ভিখারী, তিনি অতি দরিদ্র। যাঁহার ঘরে টাকা আছে, যাঁহার বিষয় আছে, তাঁহাকে অহোরাত্র নানাপ্রকার চিন্তায়, নানাপ্রকার ভয়ে থাকিতে হয়; কিন্তু যাঁহার ঘরে শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি আছে, তিনি সম্রাটের অপেক্ষাও বড়; এমন কি, তিনি দেবগণেরও পূজ্য। প্রফুল্লতা ও সন্তোষ তাঁহার ঘরে আর ধরে না। বরং তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সেই ছয়টী সম্পত্তি অপর পাঁচ জনকে দুই হাত তুলিয়া দান করিতে পারেন। ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে? এই মহামারীর ভয়ে কত রাজা মহারাজা প্রভৃতি ধনিব্যক্তি প্রাণভয়ে আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবর্গকে নিরাশ্রয়ে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু যাঁহারা শম দমাদি ষট্‌সম্পত্তিসম্পন্ন, যাঁহাদের অন্তরে ব্রহ্মচর্য্যের বীজ নিহিত আছে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে অকুতোভয়ে রহিয়াছেন, এবং আর দশজনকে অভয় প্রদান করিতেছেন। ব্রহ্মচর্য্য যাঁহাদিগের ভিতরে আছে, তাঁহারাই যথার্থ দেশহিতৈষী, তাঁহারাই যথার্থ ধন্য।

এক্ষণে কেহ যেন ইহা না বুঝেন যে, "ব্রহ্মচারী" বলিতে কেবল ত্যাগী পুরুষকেই বুঝাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রহ্মচর্য্য চার আশ্রমেতেই আছে। কিন্তু প্রধানতঃ ব্রহ্মচারী তিন রকমের হইতে পারে। যথা, উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ব্রহ্মচারী এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী কাহাকে বলি?—(না) যিনি উপনয়নের পর গুরুগৃহে থাকিয়া বেদ-অধ্যয়ন করেন, সন্ধ্যাকর্ম্ম, অগ্নিকার্য্য, গুরুশুশ্রূষা এবং ভিক্ষাচর্য্যা করেন, অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য শেষ হইলে যিনি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করেন।

(২) গৃহস্থ ব্রহ্মচারী কাহাকে বলে,—

(না) ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত, তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

ইতি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অর্থাৎ গৃহস্থ (ব্রহ্মচারী) ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া, যে যে কর্ম্ম করিবেন, সে সমস্ত ব্রহ্মে অর্পণ করিবেন।

গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণং॥

অর্থাৎ যাহা করিবে, যাহা খাইবে, যাহা হোম করিবে, দান করিবে, তপস্যা করিবে, সে সমস্তই আমাতে অর্পণ কর। ভগবান আরও এক স্থলে বলিতেছেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোস্তকর্ম্মণি॥

অর্থাৎ একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, তাহার ফলে কোনও অধিকার নাই; তোমার যেন কর্ম্মফলে বাসনা না থাকে এবং অকর্ম্মে তোমার যেন কখন আসক্তি না হয়। পরমহংসদেব বলিতেন যে, মনীবের কার্য্য যেমন চাকরাণী লোকদেখানে আপনার বোধে করে, সেইরূপ ভাবে গৃহস্থের সংসার-কার্য্য করা কর্ত্তব্য। এবং ইহাকেই গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্য বলে।

(৩) সন্ন্যাসীদিগের মতন যাবজ্জীবন ত্যাগী পুরুষকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে।

এক্ষণে, এই ত্যাগী ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীদিগের সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বিবাহ না করিলে বা গৃহস্থ আশ্রম পালন না করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। ইহার উত্তর এই যে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই প্রধানতঃ দুইটী মার্গ চলিয়া আসিতেছে—প্রবৃত্তিমার্গ, আর নিবৃত্তিমার্গ। ইহা ঈশ্বর অভিপ্রেত। শ্রুতি বলিতেছেন, বৈরাগ্য যখনই আসিবে, তখনই ত্যাগ করিবে, তখনই সন্ন্যাস লইবে। তা বিবাহ করিবার আগেই হউক বা পরেই হউক। যথা, ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাৎ বা বনাৎ বা, যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ। সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, শুক প্রভৃতি ইহাঁরা আজন্ম সন্ন্যাসী।

কেহ বলিতে পারেন যে, বিবাহ এবং সন্তানাদি উৎপন্ন না করিয়া, সংসার ত্যাগ করিলে নানাপ্রকার ঋণে বদ্ধ থাকিতে হয়, আর মুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে ভাগবতে আছে (১১।৫।৩৭) (রাজর্ষি জনককে ঋষভদেবের পুত্র শ্রীকরভাজন বলিতেছেন)—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কৃত্যং ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে মুকুন্দদেবের শরণাগত হন, তাঁহার আর দেব, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব, মনুষ্য ও পিতৃগণের মধ্যে কাহারও নিকট ঋণ থাকে না।

মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে (১৬৭ । ২৬) নারদ ঋষি শুকদেবকে বলিতে-ছেন,—

পরিগ্রহং পরিত্যজ্য, ভব তাত জিতেন্দ্রিয়ঃ। অর্থাৎ বিবাহ না করিয়া জিতেন্দ্রিয় হও।

Jesus ও বলিতেছেন:—And there be eunuchs who have made themselves eunuchs for the kingdon of heaven's sake. Mathew XIX. 12.

ব্রহ্মচারী বলিতে আমরা আরও কি বুঝি?—ব্রহ্মচারী বলিতে বুঝিব, যাঁহার হৃদয়ে দয়া আছে। যিনি ব্রহ্মচারী, তিনি অবশ্যই দয়াবান হইবেন। পরমহংসদেবের জীবনে শুনিয়াছি যে, তিনি একদা ঘাসের উপর দিয়া যাইতেছিলেন ; যাইতে যাইতে পশ্চাদ্দিকে একবার ফিরিয়া দেখিলেন যে, যে ঘাস গুলির উপর হইতে পা তুলিয়া লইয়াছেন, সেই দলিত ঘাসগুলি অতি কষ্টে খাড়া হইয়া উঠিতেছিল। ইহা দেখিয়া পরমহংসদেব কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে লাগিলেন যে, উহাদিগেরও প্রাণ আছে, উহারা কতই কষ্ট পাইয়াছে। সেই অবধি আর তিনি ঘাসের উপর দিয়া যাইতে পারিতেন না।

আর এক সময় তাঁহার সম্মুখে, একটী লোক এক খানি নূতন থান ফাড়িয়া ফেলিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া চোমকে উঠিয়া বলিলেন, "ওরে, আমার বুক যেন ছিঁড়ে ফেল্লি ; আহা ! আস্তো ছিলো, আলাহিদা করে দিলি"।

প্রকৃত ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে এইরূপ দয়া আসা চাই। ব্রহ্মচারিগণের আর আর গুণ বলিতেছি,—তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষমাশীল হন, এবং সত্যভাষণ, মিষ্টভাষণ ও অহিংসা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হন। তাঁহারা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া থাকেন অর্থাৎ বিবেকী, বৈরাগ্যবান, মুমুক্ষু ও পূর্ব্বকথিত শমদমাদি-সম্পন্ন হন, এবং কাম ও ক্রোধকে সংযত করিতে থাকেন।

অনেকের ধারণা আছে যে, অবিবাহিত জীবন কাটাইতে গেলে নানা-প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। ইহা ভুল। Dr. Nichols বলিতেছেন—"It is a medical—a physiological fact that the best blood in the body goes to from the elements of reproduction, in both sexes. In a pure and orderly life this matter is absorbed. It goes back into the circulation ready to form the finest brain, nerve and muscular tissue. This life of man, carried back and diffused through his system, makes him manly, strong, brave, heroic. If wasted, it leaves him effiminate, weak and irresolute, intellectually and physically debilitated, and a prey to sexual irritation, disordered function, morbid sensation, disordered muscular movement, a wretched nervous system, epilepsy, insanity and death." অর্থাৎ রক্তের সারাংশ হইতে শুক্র প্রস্তুত হয়। যাঁহারা বিবাহ করেন নাই, তাঁহাদিগের শরীরে এই পদার্থ পুনরায় রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যাইয়া উৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও মাংসপেশী গঠিত করিয়া থাকে এবং শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া সেই মানবকে উদ্যমশীল, সাহসী ও বীর্য্যশালী করে। আর যিনি এই শুক্র নষ্ট করেন, তিনি ক্রমশঃ হতবীর্য্য হইয়া মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত, উন্মত্ত এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ভগবান শিব বলিতেছেন;—

ন তপস্তপ ইত্যাহু, ব্র'হ্মচর্য্যং তপোত্তমং।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু, সদেবো নতু মানুষঃ।

(জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র)।

অর্থাৎ তপস্যাকে তপস্যা বলি না। ব্রহ্মচর্য্যই উত্তম তপস্যা। যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধরেতা হন, তিনি দেবতা।

আমরাও সকলেই প্রায়, সচরাচর চাক্ষুষ দেখিতে পাই যে, যাহারা ইন্দ্রিয়

পরতন্ত্র, যাহারা কুকর্ম্মী, তাহারা কতই শক্তিবিহীন, ক্ষীণচেতা ও ক্ষুদ্রমনা হইয়া পড়ে; এবং কতই তাহারা দুঃখভাক্ ও নিরানন্দময় হইয়া পড়ে! আর দেখুন, যাঁহারা পুণ্যবান,যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারা কেমন নীরোগ, তাঁহাদিগের কত তেজ, কত বল, কত সাহস, কতই বা তাঁহাদিগের আনন্দ!

পরমহংসদেব বলিতেন, যিনি স্ত্রীত্যাগ করিতে পারেন, তিনি জগৎ ত্যাগ করিতে পারেন। অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়সুখের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর জগতে ত্যাগ করিতে বাকি কি আছে? যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় সুখ ত্যাগ করিয়াছেন, ইন্দ্রিয় পথে যাঁহার মন আর ধাবিত হয় না, যাঁহার হৃদয়ে মহামায়া আর তরঙ্গ উঠাইতে পারেন না; জানিবেন, সেই শান্ত হৃদয়ে ব্রহ্মের ছায়া পড়িতে আর দেরি নাই; জানিবেন, সেই অকিঞ্চনের নিকট হইতে ভগবান আর দূরে থাকেন না, ভক্তবৎসল হরি তাঁহার সম্মুখে আর প্রকাশ না হইয়া থাকিতে পারেন না। তখন সেই ভক্তের প্রত্যেক লোম-কূপে পরমানন্দের অনুভূতি হইতে থাকে। এত অভাবনীয় সুখের উদয় হয় যে, তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যান। তিনি সমাধিস্থ হন, অবিরত তৈল-ধারার ন্যায় সেই নিত্য সুখ ভোগ করিতে থাকেন। সেই পরমসুখের আশা করিতে গেলে—সেই নিত্য সুখ লাভ করিতে গেলে, মহদ্দুঃখের আকর স্বরূপ যে এই অনিত্য ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখ, তাহার লিপ্সা ত্যাগ করিতে হয়—একে-বারে ত্যাগ করিতে হয়,—দু এক দিনের জন্য কপট সংযম করিলে হয় না—হৃদয় হইতে একেবারে বাসনার মূল উচ্ছেদ করিয়া ফেলিতে হয়;—ফেলিলে, দেখিবেন—পূর্ব্বে সামান্য একটী ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক সুখভোগ করিতেছিলেন, এখন দেখিবেন যে, সর্ব্বাঙ্গে কোটি ইন্দ্রিয় সুখভোগ করিতেছেন,—প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া সেই পরম নিত্যসুখ শরীরের অন্তর্দ্দেশে প্রবেশ করিতেছে—সেই পরমসুখ, আপনার শরীরকে ওত-প্রোতঃ ভাবে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিবে,—আপনার শরীর তখন সুখময় হইয়া যাইবে—সুখময় শরীর তখন সুখসাগরে ভাসিতে থাকিবে। তখন এই লৌহময় অপকৃষ্ট দেহ সেই পরশ-মণির স্পর্শে কাঞ্চনময় দেবশরীর হইয়া যাইবে,—আপনি তখন দেবতা হইয়া যাইবেন, দেবপূজ্য হইবেন।

হায়! ভ্রান্ত মানব এমন নিত্যসুখ হেলায় ছাড়িয়া এক ক্ষণিক জঘন্য পৈশাচিক সুখের আশায় মত্ত হইয়া বেড়াইতেছে; নিজের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে না।

কতবার, কতপ্রকারের জন্ম গ্রহণ করিলাম। কত কোটি জন্ম জন্মাই-লাম। কৈ! কোনও জন্মেই ত জন্মাইবার মতন জন্মাইলাম না। কোনও জন্মে পশ্চাদ্ভাগে একবারের তরেও নিজের মঙ্গলের জন্য ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম না!

অনন্ত কালের সঙ্গে তুলনায়, এক জন্ম তো কিছুই নয়। সেই অনন্ত জন্মের মধ্যে একটা জন্মও তো ঈশ্বরপাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত করিলাম না! এতবার জন্মাইলাম, কৈ! কোন জন্মেও তো জগদীশ্বরের শরণাগত হইলাম না!

শরণ লইতে কিছু এত দীর্ঘ কাল লাগে না, তাঁহার পাদপদ্মে জীবন উৎসর্গ করিতে তো এক জন্মও লাগে না—এমন কি, এক মুহূর্ত্ত মাত্রও লাগে না—কেবল ইচ্ছা মাত্র আবশ্যক। এত সহজ—তাহাও পারি না!

উঃ! কি বিপরীত গতি! অল্প অল্প করিয়া কতদূর গহন অরণ্যের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছি! বিপরীত অন্যায় গতি! রোধ করুন! বিপরীত গতি রোধ করুন!

এখনও সময় আছে, এখনও উপায় আছে। ফিরুন, ফিরুন; আর বিপরীত অন্যায় গতিতে অগ্রসর হইবেন না। আত্মহত্যা করিবেন না, ও আর আর সকলকেও মারিবেন না। নিজেকে রক্ষা করুন, জগতের হিত-কামনা করুন।

ঐ দেখুন, শিয়রে শ্মশান রাবণের চুলির ন্যায় অনবরত ধু ধু. শব্দে জ্বলিতেছে। পিতাকে রাখিয়া আসিলাম, স্নেহময়ী মাতাকেও লইয়া যাইলাম; ভার্য্যা যাইল, বন্ধু বান্ধব গেল; প্রিয়তম পুত্রকেও জ্বালাইয়া আসিলাম! তবু চেতন নাই! এখনও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ছাড়িলাম না! নিজে তো ছাড়িতে পারিলাম না; আবার, কচি কচি বাচ্ছা-কন্যা পুত্রদিগকেও সেই ইন্দ্রিয়পর-তন্ত্রতায় মুগ্ধ করাইয়া দিতেছি। অতি শৈশব অবস্থাতেই বিবাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া দিতেছি! আবার কি না যদি না যায়, তো, বাপ মায় জোর করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে!

উঃ! নিজের শিশু কন্যা পুত্রকে রাক্ষস রাক্ষসীর গ্রাসে ফেলিয়া দিতেছে! কি বীভৎস ব্যাপার! ইহা অপেক্ষা আর পৈশাচিকতা কি হইতে পারে?

ক্রমশঃ পাপ-সংসার বৃদ্ধি হইতেছে। পাপে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। মা বসুন্ধরা, বোধ হয়, পিশাচদিগের ভার সহ্য করিতে না পারিয়াই এত

ভয়ঙ্কর কাঁপিয়া উঠিতেছেন। নিজের বক্ষে এই পৈশাচিক ব্যাপার দেখিয়াই বোধ হয় এক দীর্ঘনিঃশ্বাসে চট্টগ্রামকে উড়াইয়া দিলেন। বক্ষঃস্থলে আর আমাদিগকে স্থান দিতেছেন না, দেশ ছেড়ে সকলকে পালাইতে হইতেছে! আরও না জানি, আমাদিগের অদৃষ্টে কত আছে!

এখনও সময় আছে, এখনও উপায় আছে। এখনও ব্রহ্মচর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করুন। এক মাত্র ব্রহ্মবীর্য্য এক মাত্র ব্রহ্মতেজ বিনা আর কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান লক্ষণ হইতেছে বিবেক বৈরাগ্যের সহিত ইন্দ্রিয় সংযমন। যাঁহাদিগের অন্তরে ইচ্ছা আছে, তাঁহাদিগের পক্ষে ইন্দ্রিয় সংযমন বেশী কঠিন নয়।

স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞানই ইন্দ্রিয়দমনের একমাত্র প্রধান উপায়। আপনারা ছেলে বেলা হইতেই স্ত্রীলোককে অন্য চোখে দেখিতে শিখিয়া আসিতেছেন। স্ত্রীমাত্রকেই কখনও অন্তরের সহিত মা বলে ডাকেন নাই, তাই ইন্দ্রিয়দমন এত কঠিন। নিজেরা তো অধঃপথে গেছেন; ছেলেগুলোকে আর অধঃপথে ঠেলে পাঠাইবেন না। পুত্রের জনক হওয়া অতি সহজ, কিন্তু তাহাকে মানুষ করা অতি দায়িত্বের কায। ছেলে যদি খারাপ হয়, জানিবেন, নিশ্চয় জানিবেন, বাপ মাকেই আগে মহাপাপে মগ্ন হইতে হইবে। এ সমস্তের দায়িত্ব বাপ মার।

মানবের কর্ত্তব্য পূর্ব্বে নিজেকে তোয়ের করা এবং ছেলেকে কি কোরে শিক্ষা দিতে হয়, কি কোরে তোয়ের করিতে হয়, এ সমস্ত ভালরূপে শিক্ষা করা; তাহার পরে সন্তানাদি উৎপন্ন করিলে কোনও দোষের হয় না। সেই জন্যই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সকল আশ্রমের প্রথম আশ্রম, এবং অবশ্য আচরণীয়। ছেলে-দিগকে তো কত প্রকারের বিদ্যা শেখান। তাহার মধ্যে না হয়, ইন্দ্রিয় দমন আর একটা বিদ্যা শেখাইলেন—তাহাতে মহৎ উপকার বই তিলমাত্রও ক্ষতি নাই। যত বিদ্যা আছে, তাহার মধ্যে ইন্দ্রিয় দমন এক মহাবিদ্যা।

নিজেরাই এখন ইন্দ্রিয় দমন করিতে শেখেন নাই, তা আর, ছেলেদের শেখাইবেন কি? তাই বলি, নিজেরা প্রথমে এই মহাবিদ্যা শিখুন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদিগকেও প্রাণপণে শেখান। এই বেলা থেকে প্রাণপণে শেখান। এই বেলা থেকে সব বীর প্রস্তুত করিতে থাকুন। Spartan motherরা—Sparta দেশের মায়েরা যেমন নিজ নিজ পুত্রদিগকে বীরত্ব শেখাইতেন, আপনারাও সেইরূপ শেখান। ভারতমাতা হইতেছেন বীর-

প্রসবিনী। সেই ভারত এখন বীরশূন্য—সেই জন্যই এত দুর্দ্দশা! কিন্তু ভয় নাই। আবার ব্রহ্মচর্য্যকে পুনর্জ্জীবিত করুন। আবার সেই সনাতন ব্রহ্মতেজকে পুনরুদ্দীপিত করুন। এ সঙ্কট সময়ে ব্রহ্মতেজ বিনা গতি নাই।

সব নীচবৃত্তি ছাড়িয়া দিন। মনকে উর্দ্ধে তুলিয়া রাখুন। মনকে মূলাধার হইতে—নিম্নদেশ হইতে অনাহত বা সহস্রারে টানিয়া লউন। স্ত্রীমূর্ত্তিমাত্রেই দেবীমূর্ত্তি—সাক্ষাৎ দেবী মূর্ত্তি—ইট কাট মাটীর নয়—সাক্ষাৎ চৈতন্যময়ী ভাবুন। মা আমাদের সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী। এখনও চোখ ফুট্‌লো না? দেখুন দেখুন, মা আমাদের সাক্ষাৎ জগদম্বা। প্রাণভরে দেখিয়া লউন—দেখুন, বাহিরে দেখুন, আর ভিতরে দেখুন; বাহিরে দেখুন আর হৃদয়ে দেখুন;—দেখিয়া মস্তকে তুলিয়া রাখুন, সহস্রারে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, অতি যতনে রাখিয়া দিন।

কিন্তু খবরদার! মনকে মূলাধারে নাবিতে দিবেন না, মনকে নিম্নগামী কদাচ করিবেন না। তা হলেই জানিবেন সর্ব্বনাশ—অনন্ত নরক। পতঙ্গ হইয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া পড়িবেন না। মা আমাদের সাক্ষাৎ দেবী। সকল স্ত্রীমূর্ত্তিই আমাদের মা। খবরদার; অনন্ত নরক; নিজের মাকে অন্য চোখে দেখিবেন না, তাহা হইলেই অনন্ত নরক। দেবী মূর্ত্তি দেখিলেই যেমন প্রণাম করিতে ইচ্ছা যায়, পূজা করিতে ইচ্ছা যায়, মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা যায়; সেইরূপ স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলেই যেন আমাদের ভক্তির উদ্রেক হয়, অগ্রেই যেন ভিতর থেকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা যায়। স্ত্রীলোককে কখন রমণী বা কামিনী বলিয়া জানিবেন না; দেবীর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া জানুন। পূর্ব্বেকার সমস্ত সংস্কার দূর করিয়া টানিয়া ফেলিয়া দিন। জানিবেন, পূর্ব্বের সংস্কার সয়তানপ্রসূত এবং আসুরিক। এক্ষণে হৃদয়কন্দরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া তথায় নূতন সংস্কারের আয়োজন করুন। শঙ্করাচার্য্য বলিতেন, "দ্বারং কিমেকং নরকস্য"—নরকের এক দ্বার কি?—(না) নারী। দেখিবেন যেন, স্ত্রীলোককে এরূপ চোখে না দেখেন, যাহাতে হৃদয় একটী নরককুণ্ড হইয়া যায়। স্ত্রীলোককে এরূপ চোখে দেখুন, যাহাতে হৃদয়ের পঙ্কোদ্ধার করিয়া, তথায় দেবমন্দির স্থাপনা করিতে পারেন। আসুরিক বৃত্তির পরিবর্ত্তে শমদমাদি দৈবী সম্পত্তি লইয়া সেই হৃদয়কন্দরস্থ দেবমন্দিরে পূজার্থ গমন করুন। যিনি পিশাচীর উপাসনা করিতে চাহেন, যিনি পিশাচসিদ্ধ হইতে চাহেন, তিনি নরকে গমন করুন। এখানে তাঁর স্থান নাই। ভারত হইতে তাঁকে অবিলম্বেই পলায়ন করিতে হইবে জানিবেন। ভারতে দেবগণের বাস চিরকালই

থাকিবে। ভারত পিশাচগণকে বিনাশ করিয়া আবার নূতন সৃষ্টি করিয়া লইবেন। তাই বলি, পৈশাচিক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সদ্‌বৃত্তির উপাসনা করুন। ব্রহ্মচর্য্যের বায়ু অহরহ সেবন করিতে থাকুন ; সে বায়ু আপনাদিগের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় যাইয়া শরীরকে শোধন করিয়া যাবতীয় সাত্বিক বৃত্তির উদ্রেক করিয়া দিক। যদি হিন্দু হন, যদি শাস্ত্র মানেন, যদি ঈশ্বর অন্বেষণ করিতে ইচ্ছা থাকে, যদি নিজের মঙ্গল কামনা করেন, এবং যদি স্বদেশের হিত সাধন করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

রামকৃষ্ণমিশন (নিউইয়র্ক।)

৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কোন সংবাদদাতা নিউ ইয়র্ক হইতে লিখিতেছেন,—"এখানে রামকৃষ্ণমিশনের কার্য্য বেশ চলিতেছে। স্বামী অভেদানন্দের প্রাণপণ যত্নে বেদান্ত সভার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। তিনি গত তিন মাস ধরিয়া প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে অগ্রসর ছাত্রগণের উপযোগী, 'উপনিষদ্ হইতে 'মৃত্যুরহস্য' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন। বিষয় কঠিন হইলেও সভাস্থল প্রতিবারেই পূর্ণ হইয়া যায়। কার্ণেগি লিসিয়মে প্রতি রবিবার সময়ে সময়ে ৬০০ শ্রোতার সমক্ষে সাধারণোপযোগী বক্তৃতা হয়। বালক বালিকাগণের জন্য প্রতি শনিবার যে আর একটী ক্লাস হয়, তাহাতে তাহাদের এত উপকার হইতেছে যে, দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বাড়িতেছে : গত জানুয়ারি হইতে আগামী এপ্রিল পর্য্যন্ত যে সকল বক্তৃতা হইয়াছে ও হইবে, তাহাদের নাম দেওয়া গেল—বেদান্ত ও প্যানথিয়িজ্‌ম, প্রাণায়াম, খ্রীশ্চিয়ান সায়েন্স নামক আমেরিকার প্রচলিত নব্যমতটীতে কতটুকু সত্য আছে, একাগ্রতার শক্তি ; খ্রীষ্ট কি যোগী ছিলেন, আত্মসংযমের উপায়, প্রাচীন ও আধুনিক স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম, ব্রহ্মযোগ ; কর্ম্মরহস্য, কর্ত্তব্য বা কার্য্যের অভিসন্ধি, বংশানুক্রমিকতা (Horedity) ও পুনর্জ্জন্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বেদান্ত, জগন্মাতার উপাসনা, প্রার্থনা সফল হয় কি না, খ্রীষ্ট কি যোগী ছিলেন (পুনর্ব্বার), প্রেমবলে মুক্তিলাভ, ঈশ্বরের অবতার।"

এবং 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্র অপবাদ হওয়াতে; 'উৎসর্গে' এবং 'অপবাদে' বিপ্রতিষেধ (তুল্যবলবিরোধ) ই অসঙ্গত।

ভাষ্যমূল।—অথাপি কথঞ্চিদিকো গুণবৃদ্ধী ইত্যস্যাবকাশঃ স্যাৎ। এবমপি যথেহ বিপ্রতিষেধাদিকো গুণোভবতি মেদ্যতি মেদ্যতঃ মেদ্যন্তি ইতি। এবমিহাপি প্রাপ্নোতি। অনেনিজুঃ পর্য্যবেবিষুরিতি।

এবং তর্হি বৃদ্ধির্ভবতি গুণোভবতীতি যত্র ব্রূয়াদিক ইতি তত্র উপস্থিতং দ্রষ্টব্যম্। কিং কৃতং ভবতি। দ্বিতীয়া ষষ্ঠী প্রাদুর্ভাব্যতে। তত্র কামচারঃ। গৃহ্যমাণেন বেকং বিশেষয়িতুম্। ইকা বা গৃহ্যমাণম্।

যাবতা কামচারঃ। ইহ তাবন্মিদিমৃজিপুগন্তলঘূপধর্চ্ছিদৃশিক্ষিপ্রক্ষুদ্রেষু গৃহ্যমাণেনেকং বিশেষয়িষ্যামঃ। এতেষাং য ইগিতি। ইহেদানীং জুসি সার্বধাতুকার্ধধাতুকহ্রস্বাদ্যোগুণেষিকা গৃহ্যমাণং বিশেষয়িষ্যামঃ। এতেষাং গুণোভবতি ইকঃ। ইগন্তানামিতি।

অথবা সর্ব্বত্রৈবাত্র স্থানী নির্দ্দিশ্যতে। ইহ তাবন্মিদেরিত্যবিভক্তিকো নির্দ্দেশঃ। মিদ এঃ মিদেঃ মিদেরিতি। অথবা ষষ্ঠী সমাসো ভবিষ্যতি মিদইঃ মিদিঃ মিদেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদিও 'চয়নং' 'লবণং' ইত্যাদি স্থলে 'চি' ধাতু বা 'লূ' ধাতুর মধ্যে কেবল একটী মাত্র 'ইক্' থাকাতে, তাহাও আবার অন্ত্য বর্ণই হওয়াতে, 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রের দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে বটে; তথাপি কোনও প্রকারে 'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রেরও ত অবকাশ আছে? অর্থাৎ 'ইকো-গুণবৃদ্ধী' সূত্র যখন, পূর্ব্বাপর যাবতীয় 'ইক্' এরই 'গুণ' এবং 'বৃদ্ধি' করে, তখন 'চি' এবং 'লূ' ধাতুর 'ইক্' অন্ত্য বিশিষ্ট হইলে, তাহারওত 'গুণ' এবং 'বৃদ্ধি' 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রানুসারেই করিবে?

এইরূপ করিলেও যেইস্থলে, তুল্যবলবিরোধে পরকার্য্য হয়, বলিয়া পর (ইষ্ট) কার্য্য, 'ইক্' এর গুণ হইবে; যেমন, 'মিদ্' ধাতুর 'সার্বধাতুক' বা 'আর্ধ-ধাতুক' পরে থাকিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী 'ইক্' এর গুণ হয় বলিয়া, 'ই'কারের গুণ হইয়া, 'মেদ্যতি' 'মেদ্যতঃ' 'মেদ্যন্তি' প্রভৃতি প্রয়োগ হইয়াছে; সেরূপ 'অনে-নিজুঃ,' 'পর্য্যবেবিষুঃ' এহা 'নিজ' ধাতু 'বিষ' ধাতুর ও, 'নি'ব, 'বি'র উত্তরবর্ত্তী 'ইকারেরও গুণপ্রাপ্তি হইবে?

এরূপ দোষ হইলে,তবে যেখানে'বৃদ্ধি হয়''গুণ হয়'এইরূপ আদেশ করাহইবে, সেখানে 'ইকঃ' এইরূপ একটী'ষষ্ঠান্ত পদের'উপস্থিতি দেখিতে(জানিতে) হইবে।

কি হইবে ?

দ্বিতীয় একটী ষষ্ঠী বিভক্তির প্রাদুর্ভাব (আবির্ভাব) করিতে হইবে। তাহা হইলেই 'অঙ্গস্য' প্রভৃতি অধিকারবোধক সূত্রের উত্তর যেখানে, 'গুণ' বা 'বৃদ্ধি'র প্রাপ্তি সম্ভাবনা হইবে, সেখানে 'ইকঃ' এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পদের উপস্থিতি হইবে। আর সেস্থলেও উহা (ইকঃ) স্বকীয় ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা হইবে। তাহা হইলেই গৃহ্যমান ('মিদেগুর্ণঃ' প্রভৃতি) সূত্রের সহিত 'ইক্' এর বিশেষণ করিতে পারিব ; অথবা 'ইক্'এর সহিত গৃহ্যমান সূত্রসমূহের বিশেষণ করিতে সমর্থ হইব। আর যেহেতু নিজের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইব ; সেই হেতু, "মিদ্ ধাতু, মৃজ্ ধাতু, পুগন্তলঘূপধকধাতু, ঋচ্ছধাতু, দৃশ্ ধাতু, ক্ষিপ্র শব্দ" এই সকল স্থলে, 'মিদেগুর্ণঃ' প্রভৃতি গৃহ্যমাণ সূত্রসমূহের সহিত 'ইক্'এর বিশেষণ করিবে ; তাহা হইলেই এরূপ অর্থ হইবে যে, "এই সকল স্থলের যে 'ইক্,' তাহাদের 'গুণ' এবং বৃদ্ধি হয়।" আর, 'জুস্' পরে থাকিলে, 'সার্বধাতুক বা আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, যাহাদের গুণ হয়, অথবা 'হ্রস্বাদি'র যেখানে গুণ হয় ; সেখানে, এক্ষণে 'ইক্' এর সহিত এই সকল গৃহ্যমাণ ('জুসি চ' প্রভৃতি) সূত্রসমূহের বিশেষণ করিব। তাহা হইলেই ইহাদিগের যে 'গুণ' হইবে, তাহা 'ইক্'এর স্থানেই হইবে। সুতরাং 'জুসি চ' প্রভৃতি সূত্রে গুণ হইতে, 'ইক্' অন্তে আছে যাহাদের, তাহাদেরই হইবে। তবেই 'নিজ্' ধাতুর অন্ত্যবর্ণ 'ইক্' না হওয়াতে, 'অনেনিজুঃ' প্রভৃতি স্থানে কোন দোষও হইবে না।

অথবা এই সর্ব্বত্রই 'স্থানী'র নির্দ্দেশ করা হইবে। তাহা হইলে, 'মিদেগুর্ণঃ' এই সূত্রের বিভক্তিবিহীন নির্দ্দেশ করা হইবে। যেমন,—মিদ এঃ ('ই' ষষ্ঠীর একবচনে 'এঃ') 'মিদেঃ' অর্থাৎ ইহাতে সূত্রেই 'মিদ্' ধাতুর ইকারের গুণ 'গুণ' উল্লিখিত হইল ; অতএব 'মিদেঃ' সূত্রে এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

অথবা 'মিদেগুর্ণঃ' সূত্রে, ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করা হইবে। যেমন,—'মিদঃ' 'ইঃ' 'মিদিঃ' অর্থাৎ 'মিদ্' ধাতুর স্থিত যে ইকার, (মিদির ষষ্ঠীর এক বচনে) মিদেঃ অর্থাৎ সেই 'ই'কার স্থানে গুণ হয় ; এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—পুগন্তলঘূপধস্যেতি নৈবং বিজ্ঞায়তে পুগন্তাঙ্গস্য লঘূপধস্য চেতি। কথং তর্হি পুকি অন্তঃ পুগন্তঃ লঘ্বী উপধা লঘূপধা পুগন্তশ্চ লঘূপধা চ পুগন্তলঘূপধং পুগন্তলঘূপধস্যেতি। অবশ্যং চৈতদেবং বিজ্ঞেয়ম্। অঙ্গবিশেষণে সতীহ প্রসজ্যেত। ভিনত্তি ছিনত্তীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'পুগন্তলঘূপধস্য' এই সূত্রের দ্বারা এইরূপ অর্থ জানা যাইতেছেনা যে, —'পুক্' অন্তে আছে যার এমন যে অঙ্গ, সে 'পুগন্ত' এবং লঘু উপধা অন্তে আছে যার সে 'লঘূপধ'; এবম্ভূত পুগন্তাঙ্গের এবং লঘূপধার।

তবে কিরূপ ?

পুক্ পরে আছে এমন যে অন্ত, সে পুগন্ত; লঘু যে উপধা, সে লঘূপধা; পুগন্ত এবং লঘূপধা, সে পুগন্তলঘূপধ, তাহার, পুগন্তলঘূপধের। ইহা (এইসূত্র) এইরূপ (অর্থবিশিষ্ট) অবশ্য জানিতে হইবে। অন্যথা, অঙ্গের বিশেষণ করিলে 'ভিনত্তি' 'ছিনত্তি' প্রভৃতি শব্দে, 'ভি' এবং 'ছি'র 'ই'কারের, উপধাবিহীন হইলেও গুণপ্রাপ্তি সম্ভব হইবে।

ভাষ্যমূল।—ঋচ্ছেরপি প্রশ্লিষ্টনির্দ্দেশোঽয়ং ঋ ঋ ঋতাম্। ঋচ্ছত্যৄতামিতি।

দৃশেরপি যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। উরঙি গুণঃ। উঃ অঙি গুণোভবতি। ততো দৃশঃ। দৃশেশ্চাঙি গুণো ভবতি। উরিত্যেব।

ক্ষিপ্রক্ষুদ্রয়োরপি যণাদিপরং গুণ ইতীয়তাসিদ্ধম্। সোঽয়মেবং সিদ্ধে সতি যৎপূর্ব্বগ্রহণং করোতি তস্যৈতৎ প্রয়োজনম্। ইকো যথা স্যাদনিকো মা ভূদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'ঋচ্ছত্যৄতাম্' (১) সূত্রে, ঋচ্ছের উত্তর ও প্রশ্লিষ্ট (আক্ষিপ্ত বা উহ্য) নির্দ্দেশ—'ঋ ঋ ঋতাম্' এইরূপ জানিতে হইবে। তৎপরে ঐ 'ঋতাম্' শব্দ, ঋচ্ছতি শব্দের সহিত সমাস করিয়া 'ঋচ্ছত্যৄতাম্' এইরূপ পদ সিদ্ধ হইবে।

'ঋদৃশোঽঙি গুণঃ' (২) এই সূত্রে, 'দৃশের'ও যোগবিভাগ করা হইবে। তার এক ভাগ করা হইবে, 'উরঙি গুণঃ'; ঋকারের, অঙ্ পরে থাকিলে গুণ হয়। পর 'দৃশঃ' এইরূপ আর একভাগ করিব; অর্থ হইবে—অঙ্ পরে থাকিলে, দৃশ্ ধাতুরও গুণ হয়। আর পূর্ব্বোক্ত 'উরঙি গুণঃ' সূত্রের অনুবৃত্তি আনিয়া অর্থ এইরূপ হইবে যে, 'দৃশ্' ধাতুর গুণ, ঋকারেরই হয়।

স্থূলদূরযুব হ্রস্বক্ষিপ্রক্ষুদ্রাণাং যণাদিপরং পূর্ব্বস্য চ গুণঃ। ৬।৪।১৫৫। (এই সকল শব্দের উত্তর ইষ্ঠাদি প্রত্যয় হইলে, যণাদি পরে থাকিলে, তাহাদের লোপ হয় এবং পূর্ব্বের গুণ হয় যথা,—'ক্ষেপিষ্ঠঃ' 'ক্ষোদিষ্ঠঃ' ইত্যাদি) এই সূত্রে, 'ক্ষিপ্র এবং ক্ষুদ্র শব্দেরও যণাদি পরে থাকিলে গুণ হয়' এইরূপ বলিলেই গুণ সিদ্ধ হইত। সুতরাং তাহা এইরূপে সিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যখন সূত্রে, 'পূর্ব্বস্য চ গুণঃ' এইরূপ পূর্ব্বশব্দের গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার ইহাই প্রয়োজন

(১) (২) এই সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

যে,—পূর্ব্বে বর্ত্তমান আছে যে 'ইক্', তাহারই যাহাতে 'গুণ' হয়, এবং 'ইক্' ভিন্ন অন্য বর্ণের গুণ না হয়। এইরূপে সর্ব্বত্রই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথ বৃদ্ধিগ্রহণং কিমর্থম্। কিং বিশেষেণ বৃদ্ধিগ্রহণং চোদ্যতে ন পুনর্গুণগ্রহণমপি। যদি কিঞ্চিদ্গুণগ্রহণস্য প্রয়োজনমস্তি বৃদ্ধিগ্রহণস্যাপি তদ্ভবিতুমর্হতি। কো বা বিশেষঃ।

অয়মস্তি বিশেষঃ। গুণবিধৌ ন ক্বচিৎ স্থানী নির্দ্দিশ্যতে। তত্রাবশ্যং স্থানি-নির্দ্দেশার্থং গুণগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। বৃদ্ধিবিধৌ পুনঃ সর্ব্বত্রৈব স্থানী নির্দ্দিশ্যতে। অচোঞ্ণিতি। অত উপধায়াঃ। তদ্ধিতেষচামাদেরিতি।

অত উত্তরং পঠতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে,—'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন কি?

'বৃদ্ধি' শব্দে, 'গুণ' শব্দাপেক্ষা কি বিশেষ দেখিয়া, 'বৃদ্ধি' গ্রহণেরই উল্লেখ হইল, কিন্তু পুনঃ 'গুণ' গ্রহণেরও উল্লেখ হইল না? যদি 'গুণ' শব্দ গ্রহণের কিঞ্চিৎ প্রয়োজন হয়; তবে 'বৃদ্ধি' শব্দ গ্রহণেরও তাহাই প্রয়োজন হইতে সমর্থ হইতে পারে? ইহাতে আর বিশেষ কি আছে?

বিশেষ এই আছে যে,—গুণ বিধিতে কোথাও স্থানীর নির্দ্দেশ নাই; (যেমন,—'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' এই সূত্রে, সার্বধাতুক বা আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, কাহার স্থানে গুণ হইবে, এমন কোন স্থানীর উল্লেখ হয় নাই) অতএব সেই স্থলে স্থানীর নির্দ্দেশের জন্য, এইসূত্রে গুণ শব্দের গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু বৃদ্ধি বিধানে সর্ব্বত্রই স্থানীর নির্দ্দেশ হইয়াছে। যেমন,—অচোঞ্ণিতি। ৭।২।১১৫। (ঞ ইৎ এবং ণ ইৎ পরে থাকিলে অজন্তাঙ্গের বৃদ্ধি হয়) সূত্রে 'অচ্' এর স্থানে বৃদ্ধি হয়, এরূপ স্থানীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অত উপধায়াঃ। ৭।২।১১৬। (উপধাভূত যে অকার, তাহার বৃদ্ধি হয়, ঞিৎ এবং ণিৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রেও স্থানী 'অ'কারের উল্লেখ আছে।

তদ্ধিতেষচামাদেঃ।৭।২।১১৭। ('ঞ') ইৎ এবং 'ণ'ইৎ বিশিষ্ট তদ্ধিত পরে থাকিলে, অচ্ সমূহের মধ্যে যে আদি 'অচ্',তাহার বৃদ্ধি হয়) এই সূত্রেও স্থানী অচের উল্লেখ আছে। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, বৃদ্ধি শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন কি?

অনন্তর ইহার উত্তর (বার্ত্তিককার) পাঠ করিতেছেন।

বার্ত্তিকমূল। বৃদ্ধিগ্রহণমুত্তরার্থম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—উত্তর অর্থাৎ পরবর্ত্তী সূত্রে, অনুবৃত্তি হওয়ার জন্যই বৃদ্ধি গ্রহণ করা হইয়াছে।*

ভাষ্যমূল।—বৃদ্ধিগ্রহণং ক্রিয়তে উত্তরার্থম্। ক্ঙিতিপ্রতিষেধং বক্ষ্যতি স বৃদ্ধেরপি যথা স্যাৎ। কশ্চেদানীং ক্ঙিৎপ্রত্যয়েষু বৃদ্ধেঃ প্রসঙ্গঃ। যাবতা ঞ্ণিতীত্যুচ্যতে। তচ্চ মৃজ্যর্থম্। মৃজের্বৃদ্ধিরবিশেষেণোচ্যতে সেকো যথাস্যাদনিকো মাভূদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দের যে গ্রহণ করা হইয়াছে, উত্তর (পর) সূত্রে প্রয়োজন হইবার জন্য। ক্ঙিতি চ।১।১।৫ (গ ইৎ, ক ইৎ এবং ঙ ইৎ নিমিত্ত হইলে, গুণ এবং বৃদ্ধি হয় না) এই সূত্রানুসারে, গুণ এবং বৃদ্ধির নিষেধ বলা হইবে, সেই নিষেধ যাহাতে কেবলমাত্র গুণের না হইয়া, বৃদ্ধিরও হয়; এজন্যই 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দের গ্রহণ প্রয়োজনীয়।

এখন কোথায় গ, ক্ বা ঙ্ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে,বৃদ্ধির প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে? (যে জন্য নিষেধ করিতে পারে?) যাবতীয় স্থলে ত, 'ঞ' বা 'ণ' ইৎ হইলেই বৃদ্ধি বলা হইয়াছে?

বার্ত্তিকমূল।—মৃজ্যর্থমিতি চেদ্‌যোগবিভাগাৎ সিদ্ধম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি 'মৃজ্' ধাতুর জন্য, বৃদ্ধি শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন হয়; তবে তাহা যোগবিভাগ দ্বারাই সিদ্ধ হইবে।*

ভাষ্যমূল।—মৃজ্যর্থমিতি চেদ্ যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। মৃজের্বৃদ্ধিরচঃ। ততো ঞ্ণিতি। ঞ্ণিতি ণিতি চ বৃদ্ধির্ভবতি। অচইত্যেব। বন্যচো বৃদ্ধিরুচ্যতে। ন্যমার্ট্ অটোঽপি বৃদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি 'মৃজ' ধাতুর জন্যই 'বৃদ্ধি' শব্দগ্রহণের প্রয়োজন হয়; তবে যোগ বিভাগ করা হইবে। তাহা হইলে, এক ভাগ করা হইবে,—'মৃজের্বৃদ্ধিরচঃ' (অর্থ হইবে,—'মৃজ' ধাতুর অচ্‌এর বৃদ্ধি হয়), তার পরে, পরভাগ করা হইবে,—ঞ্ণিতি; অর্থ হইবে,—ঞ ইৎ এবং ণ ইৎ পরে থাকিলে, বৃদ্ধি হয়; আর সেই 'বৃদ্ধি' ও 'অচ্'এর স্থানেই হইবে।

যদি 'অচ্' বলিতে, যাবতীয় 'অচ্'এরই 'বৃদ্ধি' হয়; তবে 'ন্যমার্ট্' (নি+অমার্ট্, 'মৃজ' ধাতুর 'লুঙ্' এতে যেখানে, 'লুঙ্ লঙ্ লৃঙ্‌ক্ষ্বডুদাত্তঃ। ৬।৪।৭১।' সূত্রানুসারে, 'অট্' আগম করা হইয়াছে, সেখানেও) 'অট্' এর বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে?

বার্ত্তিকমূল।—অটি চোক্তম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'অট্' আগমেও যে কোন দোষ হইবে না, তাহা উক্ত হইয়াছে। *

ভাষ্যমূল।—কিমুক্তম্। অনন্ত্যবিকারেঽন্ত্যাসদেশস্য কার্য্যং ভবতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।- কি বলা হইয়াছে?

যে স্থলে অন্ত্যবর্ণের বিকার হয় নাই, সে স্থলে, অন্ত্যবর্ণের সদেশ অর্থাৎ অধিকতর নিকটবর্ত্তী বর্ণেরই কার্য্য হইয়া থাকে। (এজন্য 'ন্যমার্ট্'এর পূর্ব্ববর্ত্তী 'অট্' আগমের 'অ'কার অন্ত্যবর্ণের নিকটবর্ত্তী না হইয়া অনেক দূরবর্ত্তী হওয়াতে, 'বৃদ্ধি'র প্রাপ্তি হইবে না)।

বার্ত্তিকমূল। বৃদ্ধিপ্রতিষেধানুপপত্তিস্ত্বিক্প্রকরণাৎ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি 'অচ্'এর বৃদ্ধি বলা যায়; তবে 'ইক্' প্রকরণোল্লিখিত বৃদ্ধিরই নিষেধ হওয়াতে, অচ্ স্থানীক বৃদ্ধির নিষেধ প্রতিপন্ন হইবে না। *।

ভাষ্যমূল।—বৃদ্ধেস্তু প্রতিষেধো নোপপদ্যতে। কিং কারণম্। ইক্প্রকরণাৎ। ইগ্লক্ষণয়োর্গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধঃ। ন চৈবং সতি মৃজেরিগ্লক্ষণা বৃদ্ধির্ভবতি। তস্মান্মৃজেরিগ্লক্ষণাবৃদ্ধিরেষ্টব্যা। এবং তর্হি। ইহান্যে বৈয়াকরণা মৃজেরজাদৌ সংক্রমে বিভাষা বৃদ্ধিমারভন্তে। পরিমৃজন্তি। পরিমার্জন্তি। পরিমমৃজতুঃ। পরিমমার্জতুরিত্যাস্থর্থম্। তদিহাপি সাধ্যম্। তস্মিন্ সাধ্যে যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। মৃজের্বৃদ্ধিরচো ভবতি। ততোঽচি কিঙতি। অচিক্ঙিতি মৃজের্বৃদ্ধির্ভবতি। পরিমার্জন্তি। পরিমমার্জতুঃ। কিমর্থমিদম্। নিয়মার্থম্। অজাদাবেবক্ঙিতি নান্যত্র। কান্যত্র। মাভূৎ। মৃষ্টঃ। মৃষ্টবানিতি। ততো বা। বাচিক্ঙিতিমৃজের্বৃদ্ধির্ভবতি। পরিমৃজন্তি। পরিমার্জন্তি। পরিমমৃজতুঃ। পরিমমার্জতুরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—(ক্গ্ঙ্ ইৎ নিমিত্ত) বৃদ্ধি উপপন্ন হইবে না।

কারণ কি?

'ইক্' প্রকরণ হেতু। কারণ, ক, গ, বা ঙকার ইৎনিমিত্তক যে নিষেধ; তাহা, কেবল 'ইক্' লক্ষণক গুণ বা বৃদ্ধিরই হইয়া থাকে। যদি এইরূপ হয়, অর্থাৎ 'মৃজের্বৃদ্ধিঃ' সূত্রে 'অচ্'এর বৃদ্ধি হয়; তবে 'মৃজ্' ধাতুর, 'ইক্'-লক্ষণসম্পন্ন বৃদ্ধি হইবে না। সেই হেতুই 'মৃজ্' ধাতুর, 'ইক্' লক্ষণ সম্পন্ন বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়া।

এইরূপ হইলে অর্থাৎ 'অচ্'এর গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ না হইয়া 'ইক্'এর নিষেধপ্রাপ্তি হইতে পারে; এজন্যই যদি 'মৃজের্বৃদ্ধিঃ' সূত্রে, 'ইক্'এর বৃদ্ধি বাঞ্ছা করিয়া থাকেন; তবে এই পক্ষ গ্রহণ করিব যে, এইস্থলে অন্যান্য বৈয়াকরণগণ, অজাদির সহিত 'মৃজ্' ধাতুর সংক্রমণে (সংযোজনে) বিকল্পে বৃদ্ধির আরম্ভ করিয়াছেন। যেমন,—(বৃদ্ধ্যভাব পক্ষে) পরিমৃজন্তি। (বৃদ্ধি পক্ষে) পরিমার্জন্তি। এইরূপ, পরিমমৃজতুঃ, পরিমমার্জতুঃ, ইত্যাদি প্রয়োগের জন্য। তাহা (বিকল্প) এইস্থলেও সাধনীয়। সুতরাং তাহা সাধনীয় প্রতিপন্ন হইলে, যোগ বিভাগ করা হইবে। তাহার একাংশ হইবে;—'মৃজের্বৃদ্ধিরচোভবতি' অর্থাৎ 'মৃজ্' ধাতুর অচেরই বৃদ্ধি হয়। তৎপরে অপরাংশ করিব—'অচিক্ঙিতি,' সমুদায় মিলিয়া অর্থ এই হইবে যে, ক, গ, এবং ঙ ইৎবিশিষ্ট অজাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে, 'মৃজ' ধাতুর বৃদ্ধি হয়। যেমন,—'পরি'পূর্ব্বক 'মৃজ' লট্ এর 'ঝি' (অন্তি) করিয়া 'পরিমার্জন্তি' এবং 'লিট্'এর 'অতুস্' করিয়া 'পরিমমার্জতুঃ' প্রয়োগ হইবে।

ইহা কি জন্য?

ইহা এই নিয়ম করিবার জন্য যে, 'অচ্' আদিতে আছে যার, এমন 'ক' 'গ' এবং 'ঙ' ইৎ বিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে, তৎপ্রযুক্ত গুণ বা বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু অন্যত্র নহে।

অচ্ আদি বিশিষ্ট প্রত্যয় ভিন্ন অন্যত্র কোথায় প্রাপ্তি সম্ভব আছে?

'মৃষ্টঃ' 'মৃষ্টবান্,' (মৃজ ধাতুর উত্তর 'নিষ্ঠা' অর্থাৎ 'ক্ত' এবং 'ক্তবতু' প্রত্যয় করিয়া 'মৃষ্টঃ' 'মৃষ্টবান্' হইয়াছে) এই সকল হলাদি প্রত্যয় স্থলে যাহাতে বৃদ্ধি না হয়।

তদনন্তর 'বা' শব্দ সংলগ্ন করিব। এক্ষণে অর্থ এইরূপ হইবে যে, অচ্ পরে আছে এমন কিৎ, গিৎ বা ঙিৎ পরে থাকিলে, মৃজ্ ধাতুর বৃদ্ধি হয় বিকল্পে। তাহা হইলেই লট্এর ঝিতে) 'পরিমৃজন্তি', 'পরিমার্জন্তি'। 'পরিমমৃজতুঃ' 'পরিমমার্জতুঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ বিকল্পে সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—ইহার্থমেব তর্হি গিজর্থং বৃদ্ধিগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। সিচিবৃদ্ধির-বিশেষেণোচ্যতে সেকো যথাস্যাদনিকোমাভূদিতি। কস্য পুনরনিকঃ প্রাপ্নোতি। অকারস্য। অচিকীর্ষীৎ। অজিগীর্ষীৎ। নৈৎদন্তি। লোপোত্র বাধকো ভবিষ্যতি।

আকারস্য তর্হি প্রাপ্নোতি। অয়াসীৎ। অবাসীৎ। নাস্ত্যত্র বিশেষঃ। সত্যাবস্যাং বা।

সন্ধ্যক্ষরস্য তর্হি প্রাপ্নোতি। নৈব সংধ্যক্ষরমন্ত্যমস্তি। ননু চেদমস্তি ঢ-লোপে কৃতে উদবোঢাম্। উদবোঢম্। উদবোঢেতি। অসিদ্ধো ঢলোপঃ। তস্যাসিদ্ধত্বান্নৈতদন্ত্যং ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই স্থানের জন্য তবে সিজর্থে 'বৃদ্ধি' শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কারণ, সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু ৮২১। (ইগন্তাঙ্গের বৃদ্ধি হয় পরস্মৈপদ পরে থাকিলে, লুঙ্‌এর 'সিচ'এ) সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দ, কাহার স্থানে বৃদ্ধি হয়, এরূপ কিছু উল্লেখ না করিয়া অবিশেষ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সেখানে যাহাতে 'ইক্' বিশিষ্টেরই বৃদ্ধি হয়; এবং 'ইক্' রহিত বর্ণের যাহাতে বৃদ্ধি না হয়, এজন্য 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, বৃদ্ধি শব্দ গ্রহণ কর্ত্তব্য।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে কোন্ 'ইক্' রহিত বর্ণের বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইয়াছিল?

অকারের। 'কৃ' ধাতুর উত্তর 'সন্' প্রত্যয় করিয়া 'লুঙ্'এর 'তিপ্' প্রত্যয় করিলে; 'সন্'এর অন্ত 'ন'কার ইৎ হইবার পর, অকারের বৃদ্ধি হইবে; সুতরাং 'অচিকীর্ষীৎ,' 'অজিহীর্ষীৎ ইত্যাদি প্রয়োগও সিদ্ধি হইবে না?

ইহা হইতে পারে না। কারণ, এই স্থলে, 'অতোলোপঃ' ৬।৪।৪৮। (আর্দ্ধধাতুককালে যে 'অ'কারান্ত, সেই 'অ'কারের লোপ হয়, আর্দ্ধ-ধাতুক পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, 'সন্' প্রত্যয়ের 'অ'কার লোপ হইলে, লোপ বিধি সকলবিধি অপেক্ষা বলবান্ হয় বলিয়া, লোপ, বৃদ্ধির বাধক হইবে। তাহা হইলে প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

তবে আকারের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে যেমন।—আকারান্ত 'যা' ধাতু এবং 'বা' ধাতুর উত্তর, 'লুঙ্'এর 'সিচ্' এ অকারের বৃদ্ধি হইয়া, 'অয়াসীৎ' 'অবাসীৎ' প্রভৃতি স্থলে দোষ হইবে?

এই স্থলে কি দোষ হইবে? কারণ, এখানে 'বৃদ্ধি' হইলে, অথবা না হইলে, কোনও বিশেষ ত নাই। অর্থাৎ 'আ'কারের বৃদ্ধি করিলেও আবার 'আ'কারই হইবে। তবে সন্ধ্যক্ষরের (এ, ও, ঐ ঔ র) বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হইবে?

তাহা হইবে না, কারণ, সন্ধ্যক্ষর কাহারও (কোনও ধাতুর) অন্ত নাই।

যদি বল যে, 'বহ্' ধাতুর 'হ'কার স্থানে 'ঢ'কার করিবার পর লুঙ্ 'তিপ্'-

সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ।

(রামকৃষ্ণ মিশন, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)

নিঃস্বার্থ হইয়া ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে কর্ম্মযোগ বলে। কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিলে সুখ দুঃখাদি কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। একটী কর্ম্মফল আবার অন্য কর্ম্ম উৎপাদন করিবে। এইরূপে কর্ম্মফল নিয়ত চলিতে থাকিবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে কি মুক্তির সম্ভাবনা নাই? শাস্ত্র বলেন, আছে। নিষ্কাম হইয়া, নিঃস্বার্থ হইয়া কর্ম্ম কর; কর্ম্মফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কর্ম্ম কর। তাহা হইলে আর কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হইবে না। বলিতে পার, বাসনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম কি করা যায়? কোন না কোন বাসনা হইতেই কর্ম্মের জন্ম। ভগবদ্দর্শন করিব, ইহাও একটী বাসনা। পরমহংসদেব বলিতেন, ভগবদ্দর্শনবাসনা বাসনার মধ্যে নহে। যেমন মিছরি মিষ্টির মধ্যে নহে। অর্থাৎ মিষ্টান্ন ভক্ষণের যে অপকারিতা, তাহা মিছরিতে নাই বলিলেই হয়। তবে কি কর্ম্ম করাই দোষ? কর্ম্ম কি তবে বন্ধনের উপর বন্ধন আনিয়া মানুষের শ্রেষ্ঠতম জীবনোদ্দেশ্যের পথে নিয়ত বিঘ্ন বাধাই লইয়া আসে? শাস্ত্র বলেন, 'না', কর্ম্মে কোন দোষ নাই। তবে আমরা যে ভাবে কর্ম্ম করি, সেই ভাবানুযায়ী উহা গুণ ও দোষবিশিষ্ট হয়। কর্ম্মে স্বভাবতই যদি দোষ থাকিত, তবে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অসংখ্য নরহত্যা করিয়াও মানুষ বীরাগ্রণী বলিয়া পরিচিত হইত না। নিরাশ্রয় পথিকের প্রাণরক্ষা এবং অবলার প্রাণ ও সতীত্ব রক্ষার জন্য দস্যু ও লম্পটকে হত্যা করিয়াও মানুষ আমাদের পূজনীয় হইত না। দরিদ্রদুঃখকাতর সহৃদয় পুরুষেরাও নিজ জনদিগের সুখে উপেক্ষা করিয়া সমাজে যশোভাগী হইতেন না। ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিয়া আপন ও অপর জীবনের চরম সার্থকতা শিখিবার ও শিখাইবার জন্য আত্মীয় সমাজ প্রভৃতি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসিবর্গও আমাদের শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিতেন না। অতএব দেখা যাইতেছে, মানুষ খুন করারূপ কর্ম্মও যখন নিজ স্বার্থের জন্য কৃত না হইয়া কোন এক মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য সাধিত হয়, তখন তাহাতে দোষ হয় না।

অতএব কর্ম্মে কোন দোষ নাই। আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্ম্ম ভাল

মন্দ হইয়া থাকে—কর্ম্মস্বরূপে কোন দোষ নাই। অগ্নিতে রন্ধন ও গৃহ-দাহাদি উভয় কার্য্যই হইতেছে, তাহাতে অগ্নির কোন দোষ নাই। সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, সকল জলে পড়িতেছে, কিন্তু জলের নির্ম্মলতা অনুসারে প্রতিচ্ছায়ার তারতম্য হইয়া থাকে, ইহাতে সূর্য্যের কোন দোষ নাই। তবে কিরূপে কর্ম্ম করিলে আর দোষভাগী হইতে হইবে না? শাস্ত্র বলেন, যদি স্বার্থ না থাকে এবং কর্ম্মফলে আসক্তি না থাকে। কর্ম্মফলে আসক্তি না থাকিলে সুখ বা দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হইলে মন বিচলিত হইবে না। সুতরাং তাহা আর বন্ধনের কারণ হইবে না।

দেখা গিয়াছে, বাসনা হইতেই কর্ম্মের জন্ম। নিজ নিজ মনের দিকে দৃষ্টি করিলে মনে নানা বাসনা রহিয়াছে দেখা যায়। এমন কি, মনটীকেই বাসনাময়, নানা বাসনার সমষ্টি বলিয়াই বোধ হয়। সমুদয় বাসনা দূর হইলে মনের অস্তিত্ব থাকিবে কি না সন্দেহ উপস্থিত হয়। আবার বাসনার সকলগুলিই সমান তীব্র নয়। কোনটী 'এখনই সম্পন্ন হউক', মনে এইরূপ হয়; কোনটী হইলে ভাল, না হইলেও ভাল—অপর একটী না হয় তো ভাল হয়। এই প্রকার মন ভিন্ন ভিন্ন বাসনাসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিত, দেখা যায়। বাসনাটী মনে উঠিলেই আবার কার্য্য হয় না। এক দিন, দুই দিন, দশ দিন উঠিতে উঠিতে একদিন মন বলে, এটা না হইলেই নয় এবং শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহকে উহা যাহাতে সফল হয়, তদ্বিষয়ে নিয়োগ করে। ইহাকেই আমরা কর্ম্ম বলিয়া থাকি। অতএব ঘনীভূত বাসনাই কর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া পুরুষকে সুখদুঃখরূপ ফল আনিয়া দেয় এবং সেই সুখ দুঃখময় কর্ম্ম আবার অপর একটী সংস্কারের জনক হয়। মনে সঞ্চিত এই সূক্ষ্ম বাসনাই সংস্কার। সংস্কার সকলের সমান নহে। কাহারও কোনটী বাল্যকাল হইতে প্রবল। কাহারও কোন কোন সংস্কার আদৌ নাই। কেহবা সুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আজীবন সৎকার্য্যই করিয়া যাইল। আবার অন্য কেহ কুসংস্কার-চালিত হইয়া কুকার্য্যকরতঃ লোকের নিন্দাভাজন হইয়া গেল। কেহ বা বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক, যশস্বী, কেহ বা তাহার ঠিক বিপরীত হইল।

কোথা হইতে সংস্কার এত ভিন্ন ভিন্ন হইল? বাল্যকাল হইতেই যখন কাহাকেও সৎ, কাহাকেও অসৎ দেখিতেছি, তখন বাসনা ঘনীভূত হইয়া সেই সৎ বা অসৎ সংস্কাররূপে পরিণত হইবারই বা সময় কোথায়? অথবা কর্ম্ম ও সংস্কার যদি বৃক্ষবীজসম্বন্ধেই গ্রথিত ও প্রবাহিত হইয়া থাকে, তবে সে

কর্ম্মই বা কোথায়, যাহা শৈশবেও সংস্কাররূপে দেখা দিতে পারে? শাস্ত্র বলেন, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মই বাল্যসংস্কাররূপে দেখা দেয়। পূর্ব্ব জন্মের সৎ বা অসৎ অভ্যাস ইহজন্মের ভালমন্দ সংস্কাররূপে প্রকাশিত হয়। এই বাল্যসংস্কারসমূহকে আমরা 'স্বভাব' বলিয়া থাকি এবং 'স্বভাব' কথার বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া কখন ভগবানে, কখন সৃষ্টিকার্য্যে দোষারোপ করিয়া থাকি। কখন স্বভাবশব্দ কারণহীন অর্থে প্রয়োগ করি এবং কখনও বা কোন এক অদৃষ্ট অননুভূত কারণ, যাহার হস্তে মানুষ যন্ত্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, এইরূপ অর্থে প্রয়োগ করি। এইরূপ কুসংস্কারভারবাহী ঘোরতর অদৃষ্টবাদী বা কার্য্যকারণপ্রবাহের মূলোচ্ছেদ করিয়া নাস্তিকতার পথ অবলম্বন করিয়া যথার্থ সত্য হইতে বহুদূরে অপনীত হই।

কর্ম্মবাদ সত্য হইলে পুনর্জ্জন্মবাদও তাহার সঙ্গে অবশ্য সত্যরূপে উপস্থিত হয়। মৃত্যুকালে আত্মা এক দেহ হইতে দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্থূল দেহ পড়িয়া থাকে কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর সেই জন্মের সমুদয় সংস্কার লইয়া তদুপযোগী দেহ গঠন করেন। সেই দেহে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল আবার পরিস্ফুট হয়। আমরা দেখিয়াছি, পিতা মাতার দোষগুণ সন্তানের দেহ ও মন আশ্রয় করে। তাহার কারণ, সন্তানের কার্য্যফল, যে পিতামাতা তাহাকে সেইরূপ দোষ বা গুণযুক্ত সংস্কারসমূহ পরিস্ফুট হইবার উপযোগী দেহ দিতে পারেন, সেই খানেই তাহাকে আকর্ষণ করে। শাস্ত্র বলিতেছেন, জোঁকে যেমন এক পাতা হইতে অন্য পাতা আশ্রয় করে, আমরা সেইরূপ এক কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর আশ্রয় করিয়া থাকি। অতএব কর্ম্ম এরূপে করিতে হইবে, যাহাতে ক্রমে নিম্নতর হইতে উচ্চতর কর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারা যায়। যেমন অপর একটী অবলম্বন ত্যাগ না করিয়া পূর্ব্ব অবলম্বন ত্যাগ করা যায় না; সেইরূপ এক কর্ম্ম আশ্রয় না করিয়া অন্য কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না।

নীচ হইতে উচ্চ কর্ম্ম কিরূপে অবলম্বন করা যাইতে পারে? মহৎ হইতে মহত্তর উদ্দেশ্য অবলম্বন কর; দেখিবে, তোমার কর্ম্মও উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে প্রবাহিত হইতেছে। একেবারে সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করিতে পারিতেছ না বলিয়া হতাশ হইও না। ধীর কিন্তু দৃঢ়পদে, অসীম সাহসে বুক বাঁধিয়া শনৈঃ শনৈঃ ভগবানের প্রসাদ ও সাক্ষাৎকার লাভরূপ জীবনের মহান্ উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমাদের অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে যে, সংসারে থাকিলে ধর্ম্ম

হয় না, ভগবান লাভ হয় না। সংসার কাহাকে বলে? যে বস্তু আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে দেয় না, তাহাই সংসার নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বজন্মকৃত যে সকল সংস্কার আমাকে ঈশ্বরপথে অগ্রসর হইতে দিতেছে না, সর্ব্বদা সত্যোদ্দেশ্য হইতে বিচলিত করিতেছে, তাহাই আমার সংসার। এই-রূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সংসার বর্ত্তমান রহিয়াছে। কাহারো কাম, কাহারো ক্রোধ, কাহারও ধনচিন্তা ঈশ্বরপথের কণ্টক। এইরূপ বিশেষ বিশেষ সংসার হইতে মনের গতি ফিরাইতে কোন উচ্চ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিতে হইবে। করিলেই, যে কর্ম্মস্রোত নীচের দিকে যাইতেছিল, তাহার বেগ ফিরিয়া সে অন্য দিকে চালিত হইবে এবং যাহা পূর্ব্বে ঈশ্বরপথের প্রতি-বন্ধক ছিল, তাহাই আবার ঈশ্বরপথের সহায় হইয়া দাঁড়াইবে। এই সংসারে থাকিয়াই তাহা করিতে হইবে। আমাদের সকলেরই ভিতর মহাশক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা অজ্ঞানে আবৃত বলিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। সেই শক্তির অপব্যয় না করিয়া উচ্চতর পথে চালিত করিতে হইবে; তাহা হইলেই আমরা ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। দেখা গিয়াছে, কর্ম্মে কোন দোষ নাই; দোষ কেবল যে উদ্দেশ্য লইয়া আমরা কর্ম্ম করি। কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম কর, কর্ম্মকে ভাল বাসিয়া কর্ম্ম কর, ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিও না। তাহা হইলে কর্ম্ম আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইবেই যাইবে। ঈশ্বরের এই সৃষ্টিরচনা যদিও তাঁহার খেলা বটে, কিন্তু সেই খেলার ভিতর এই প্রণালী বিদ্যমান রহিয়াছে। এই রূপেই তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

এইরূপে কর্ম্ম করিলে যথার্থ নিঃস্বার্থতা আসিয়া উপস্থিত হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইলে আর কি সে কোন কর্ম্ম করিতে পারে বা করিয়া থাকে? শাস্ত্র বলেন, সমুদ্রগম্ভীর, সুমেরুস্থির নিঃস্বার্থ পুরুষ কেবল জগতের কল্যাণের নিমিত্ত কর্ম্ম করেন। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই সাক্ষাৎ ভগবান জানিয়া তিনি সেই বিরাট পুরুষের সেবা করেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, যদি কর্ম্মই আমাদিগকে বিশেষ বিশেষ পিতা মাতার দ্বারা দেহ ধারণ করায়, তাহা হইলে অবতারাদি সম্বন্ধে যে শাস্ত্রপ্রমাণ আছে যে, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের সহধর্ম্মিণীই পুনরায় তাঁহাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে এই নিত্যসম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হয়? ইহা কি সৃষ্টিপ্রণালীর একটী

বিশেষ নিয়ম? কার্য্যকারণময় কর্ম্মপ্রবাহের বেগ জগতের সর্ব্বত্র ধাবিত রহিয়াছে, ইহার মধ্যে বিশেষ নিয়ম কিরূপেই বা সম্ভবে? আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ভগবান যখন মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেই অবতীর্ণ হন, তখন নিজের সম্বন্ধে একটা বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তনা করিলে তাঁহার শিক্ষারই বা সার্থকতা থাকে কোথায়? স্বল্পশক্তি ভিন্ননিয়মাধীন মানবই বা সে শিক্ষা লইতে পারিবে কিরূপে? আমাদের পিতামাতার স্ত্রীপুত্রাদির সহিত ত নিত্যসম্বন্ধ বর্ত্ত-মান নাই। অবতারাদি সম্বন্ধে এরূপ হইবার কারণ কি? ইহার উত্তর, অব-তারাদির সাঙ্গোপাঙ্গগণ তাঁহাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিয়াছিল, সেই জন্য তাহারা তাঁহার সহিত নিত্যসম্বন্ধ। আমরা স্বার্থের জন্য ভালবাসি। পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি সকলেই আমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসিয়া থাকি। স্ত্রীর সুখের জন্য যদি তাহাকে ভালবাসিতাম, তাহা হইলে আমাদের সম্বন্ধ নিত্য হইত। কিন্তু আমরা কি তাহা করি? ভালবাসার স্বরূপ স্বাধীনতা— দাসত্ব নহে। নিঃস্বার্থতা, সুখলালসা নহে। যখনি কাহাকেও যথার্থ ভাল বাসিবে, তখনি তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। তাহার সুখ দেখিতে হইবে, নিজের সুখ দেখিলে চলিবে না। কিন্তু আমরা কি করিয়া থাকি? যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদিগকে আপনার অধীন করিতে যাই। আমার কথা শুনিবে, আমি যাহা ভাল বুঝি, তাহাকে তাহাই ভাল বুঝিতে হইবে। এইরূপে তাহাদিগকে ঘোরতর বন্ধনে বদ্ধ করিতে যাই। এই জন্যই আমাদের সম্বন্ধবন্ধন নিয়ত ছিন্ন হইতেছে এবং আমরা পরস্পর বিপরীত কেন্দ্রে উপস্থিত হইতেছি। বিদ্যুতাদি জড়শক্তিকে আয়ত্ত করিতে গেলেও যখন তাহার স্বভাব কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতি বিশেষরূপে জানিয়া সেই উপায়ে অগ্রসর হইতে হয়, তখন অনন্ত স্বাধীনতাস্বভাব মনুষ্যমনকে কি তাহার স্বভাববিরুদ্ধ প্রণালীতে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারা যায়? কোনও না কোন দিন তাহার সেই বন্ধন অসহ্য হইয়া উঠিবে এবং স্বভাবনিহিত নিদ্রিত শক্তি জাগরিত হইয়া সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিবে।

আমাদের দেশে এইরূপ ভালবাসা এখন অত্যন্ত প্রবল। দাসত্ববন্ধনই ইহার অপর নাম। সেই জন্য দেশেরও এত দুরবস্থা। শাস্ত্র বলেন, সমগ্র জগৎ এক সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। সেই জন্যই একের অপকারে অপরের অপকার হইতেছে। একের দোষে অপরে কষ্ট পাইতেছে। অন্যের অমঙ্গল হইলে আমাকেও তাহার জন্য কষ্ট পাইতে হয়। এরূপ নিয়ম

বর্ত্তমান থাকিতে অপরকে অধীন করিয়া নিজে উচ্চ হইবার চেষ্টা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম জড় হইতে চেতন পর্য্যন্ত সমগ্র জগতে মহাবেগে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। এক পরমাণু অপর হইতে বিযুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে। পৃথিবী সূর্য্য হইতে এবং সূর্য্য সূর্য্যান্তর হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। চোর এই স্বাধীনতার প্রেরণায় যথার্থ পথ না জানায় চুরী করিতেছে আবার সাধু মহাপুরুষেরা ঈশ্বরকৃপায় স্বার্থহীন বিশুদ্ধ ভালবাসাই এই স্বাধীনতালাভের একমাত্র পথ জানিয়া দিন দিন জীবনের মহান্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামই মনুষ্যকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করাইতেছে এবং অবশেষে পূর্ণ জ্ঞানভক্তিতে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত করিয়া তাঁহার অনন্ত শক্তির অধিকারী করিয়া দিতেছে। এ স্বাধীনতালোপ জগতে কে কাহারই বা করিতে পারে? স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, বন্ধু, গুরু প্রভৃতির সহিত যদি নিত্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে চাও, তো নিজের স্বার্থকে বলি দিয়া তাহাদের সুখে সুখী হও। ভগবানের মূর্ত্তি জানিয়া তাহাদের সেবায় রত থাক। জগতের যাবতীয় স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে ও পুরুষকে দেবতাজ্ঞানে দর্শন করিতে চেষ্টা পাও ও তাহাদের প্রতি তদ্রূপ সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন কর।

এখন বেদান্তের বিবর্ত্তবাদের বিষয় কিছু বলিয়া আজকার কার্য্য শেষ করিব। আমরা এই সৃষ্টিকার্য্য দুই দিক্ দিয়া অবলোকন করিতে পারি। ১ম, আমাদের মনুষ্যের দিক্ দিয়া দেখিলে আমরা সৃষ্টি, তাহার ক্রম, নিয়ম, শক্তি প্রভৃতি এবং পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, জ্ঞান অজ্ঞান, হিতাহিত প্রভৃতি দেখিতে পাই। কিন্তু যদি কল্পনা করিয়া ভগবানের দিক্ হইতে ইহা দেখিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে কি দেখি? সৃষ্টি ও সৃষ্টির ভিতরের কিছুরই বিদ্যমানতা দেখিতে পাই না। কারণ, সৃষ্টি ত সেই ভগবানেই রহিয়াছে। তিনি ছাড়া ত কিছু নয় বা নাই। অতএব যদি কেহ কোন উপায়ে ঈশ্বরদৃষ্টি লাভ করিতে পারে, সে আর কখনই জগৎকে আমাদের মত দেখিতে পারে না। জগৎকে দেখিতে হইলে আপনাকে জগৎ হইতে অন্ততঃ কিছু ভিন্ন, এ ভাব না হইলে কখন সম্ভবে না। অতএব সে তখন সৃষ্টি ও স্রষ্টার সহিত সর্ব্বতো-ভাবে একত্ব অনুভব করিতে থাকে। এই শেষোক্ত অবস্থাই বেদান্তের বিবর্ত্তবাদ নামে কথিত এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে জগতের অস্তিত্ব, পাপপুণ্য প্রভৃতি সমুদয় মানিয়া লইয়া বহুকাল কর্ম্মভক্তিজ্ঞানযোগাদি দৃঢ়

অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে। তবেই অবশ্য আত্মজ্ঞানে সম্পূর্ণ একত্ব আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন সেই বাক্যাতীত অবস্থার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ধ্রুবচরিত্র।

দ্বিতীয় অঙ্ক।—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(সুনীতির কুটীর, গাইতে গাইতে ধ্রুবের প্রবেশ)

ধ্রুব। মা! এনেছি কত ফুল তুলে,
দে না দে না মালা গেঁথে, ওমা
গেঁথে দে না এই ফুলে ফুলে।

সুনী। বাবা! এতক্ষণ কোথা ছিলি? দেখ দিকি নি, গায়ে কত ধূলো মেখেছিস্। দুঃখিনীর ধন! আয় কাছে আয়; (ধূলা মুছাইয়া দিয়া) আয় বাবা, আয়, একবার কোলে আয়।

ধ্রুব। ওমা! ওমা! আমাকে মালা গেঁথে দে না। কত ফুল এনেছি; আমি পোর্‌বো; দে না মা—শীগ্‌গির দে না মা।

সুনী। দোব বৈ কি বাবা! একবার দাঁড়া—তোকে প্রাণ ভোরে দেখি। তোকে যে অনেকক্ষণ দেখি নি বাবা।

ধ্রুব। না, শীগ্‌গির দে; নৈলে কোলে থাক্‌ব না।

সুনী। এই যে আমি দিচ্চি বাবা।

(মালা গাঁথিতে আরম্ভ)

ধ্রুব। ফুলের পোষাক পোর্‌বো আমি সাজিয়ে দেমা ভাল কোরে।
কোর্‌বো খেলা নেচে নেচে, পোষাক পোরে বনের ধারে॥
পোর্‌বো গলায় ফুলের মালা,
পোর্‌বো হাতে ফুলের বালা,
ধোর্‌বো মাথায় ফুলের ডালা, ফুল ছড়াব দ্বারে দ্বারে,
ফুল বিলাব ঘরে ঘরে॥

দৈববাণী। হরিনামের মালা গেঁথে বিলাইবি দ্বারে দ্বারে।

নেপথ্যে। ধ্রুব ধ্রুব, আয়্ খেল্‌বি আয়।

ধ্রুব। সাজিয়ে দেমা শীগ্‌গির কোরে,

খেলা হোলে আস্‌বো ফিরে,

কাঁদিস্ নে তুই আমার তরে।

(মালা গাঁথিয়া ধ্রুবকে সাজাইতে আরম্ভ)

সুনীতি। (কাঁদিতে কাঁদিতে)

আজ কিনা, বনফুল মালা

পরাই ধ্রুবের গলে !

আহা ! দুলিত এ গলে মুকুতার হার

অভাগীর বনবাস নাহি যদি হতো।

বুক ফেটে যায়—

সোনার কঙ্কন স্থানে

আজ কি না ফুলের কঙ্কন !

ধ্রুব। মা ! তুই কাঁদিস্ কেন ? তুই কাঁদ্‌লে আমি চলে যাব।

সুনী। (দীর্ঘশ্বাস) না—আমি কাঁদিনি,—ও আমি একটা কথা বল্‌ছিলুম।

ধ্রুব। হ্যাঁ মা ! বনবাস কি মা ? সোনা কি মা ? মুক্তো কি মা ?

সুনী। মুক্তো একটা ফলের নাম বাবা।

ধ্রুব। মা ! আমি খাব ; আমাকে খেতে দেনা মা।

সুনী। সে ফল খায়না বাবা—পোর্‌তে হয়।

ধ্রুব। তবে আমাকে পরিয়ে দেনা।

সুনী। (কাঁদিতে কাঁদিতে)

কোথা পাব মুকুতা রতন ?

অবোধ সন্তান !

সে যে বাছা রাজাদের ধন !

আমি অনাথিনী—নহি রাজরাণী ;

ভিখারিণী জননী তোমার।

আহা ! ফেটে যায় প্রাণ

চেওনা চেওনা আর ওরে যাদুমণি।

ধ্রুব। কাঁদিস্‌নে কাঁদিস্‌নে মা কাঁদিস্‌নে কো আর ;

চাব না কখন আমি মুকুতা রতন।

মুক্তার চেয়ে ফুল ভাল, চাইনে আমি মুক্তার হার।
চাইলে পরে মা কাঁদে, কাঁদাব না মাকে আর।
মা! মা! সাজান হয়েছে কি?

সুনী। একটু বাকি আছে বাবা, দাঁড়া।

ধ্রুব। কি বাকি মা?

সুনী। ফুলের মুকুট।

ধ্রুব। মুকুট কি মা?

সুনী। মাথায় পরে। সাজিয়ে দিই, দেখ্‌তে পাবি। (ফুল অন্বেষণ) তাই ত, আর যে ফুল নেই! ধ্রুব! আর ফুল নেই; মুকুট হোল না বাবা।

ধ্রুব। ফুল নেই? তবে ঐ লতার মুকুট কোরে দে মা। তাই আমি পোর্‌বো। আমাকে মুকুট পোর্‌তেই হবে।

সুনী। আচ্ছা বাবা, তাই দিচ্ছি। (লতার মুকুট পরাইয়া দেওন)

ধ্রুব। মা! আমাকে এখন কেমন দেখাচ্ছে?

সুনী। বেশ দেখাচ্ছে বাবা। এখন তুমি আমার সামনে নেচে নেচে গান গাও; আমি তোমাকে প্রাণ ভরে দেখি।

ধ্রুব। যাই মা খেলিতে নাচিতে নাচিতে
গাইতে গাইতে যাই
ঐ দেখ দূরে কত খেলা করে
পথের খেলুনি ভাই।

(গাইতে গাইতে তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। কোথা যাদুমণি যাইবে এখনি
আমি ত ছাড়িব নাই।

ধ্রুব। হয়ে গেল বেলা হবে না সে খেলা,
ছেড়ে দাও আমি যাই।

তপ। গান শুনি তোর হইনু বিভোর,
আবার শুনিতে চাই।

ধ্রুব। বেলা হলে পরে চলে যাবে ঘরে
সকল খেলুনি ভাই।

তপ। আমরা খেলুনি হইব বাছনি
খেলা কর এই ঠাঁই।

ধ্রুব। তাই তাই তাই গলাইয়া যাই
ধর দেখি মোরে মাই।

(প্রস্থান)

সুনী। ভগিনি!
বনবাস এতদিনে স্বর্গবাস মোর।
নহে এ কুটীর মম—রাজার প্রাসাদ।
ধ্রুব রাজা—আমি রাজমাতা
বিধি কৃপা করি
এ রতন দিয়াছেন মোরে;
দিবানিশি ডরি,
পাছে—অভাগিনী আমি—
হারাই এ অমূল্য রতন।

তপ। কি ভয় ভগিনি!
বিশ্বের প্রহরী সদা আছে জাগরিত,
ফিরে তার পাশে পাশে।
অনাথ বালক—অনাথরক্ষক আছে।
ভেব না ভগিনি! যাও তুমি গৃহকাযে।

(সুনীতির প্রস্থান)

তপ। গিরি উপবনে, গোপনে গোপনে,
চল লো চল লো নিঝুম প্রাণ।
দূর গিরি শিরে, নিরঝর তীরে,
প্রাণ নাথে ডাকি গাইব গান॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত।

(খেলা করিতে করিতে ধ্রুব ও বালকগণের প্রবেশ)

১ম বা। আয় সবে মিলি, ধূলো খেলা খেলি,
উঁচু দিকে আয় ছুড়ে দিই ফোল।

ধ্রুব। না ভাই না ভাই না, করি তোমায় মানা,
ধূলো দিওনা গায় বকিবে যে মা।

২য় বা। কেন ছোড় ধূলি এস ফুল তুলি,
ফুলে ফুলে ভাই গাঁথি মালাগুলি।

১ম বা। উড়্‌লো ধূলো দূরে, পোড়্‌ছে ঘুরে ঘুরে,
লাগ্‌বে তোদের গায় দাঁড়া সোরে সোরে।

ধ্রুব। ওকি ওকি ভাই, দেখিতে না পাই,
চোখ গেল মোর ধূলায় ধূলায়।

৪র্থ বা। কেন তুই ওর চোখে ধূলো দিলি বল্‌ দেখি নি? আহা, হা—আচ্ছা ছেলে ত তুই! ও সকলের ছোট বলে কি যা ইচ্ছে তাই কর্‌বি? আবার ধূলো দাও দিকিনি, এখনি তোমাকে মজা দেখাব।

১ম বা। আরে যা যা, ভারি মজাওলা হয়েছিস্‌, দেখাতে এলে আবার দেখ্‌তে হবে, তা জানিস্‌।

৩য়বা। কেন ভাই তোরা ঝগড়া কোচ্চিস্‌? যা ভাই,আর ঝগড়া করিসনে।

ধ্রুব। আয় ভাই—ঝগড়া করিস্‌ নে। আমায় লেগেছে, লেগেছে; যেতে দে ভাই; আমার না হয় একটু কষ্ট হল; তোরা কেন ঝগড়া কচ্চিস্‌? চল্‌ ভাই—ঐ পাহাড়ের ওপর উঠিগে—ফুল তুলি গে, ফল পাড়িগে,—ঐ ঝরণার ধারে বসি গে।

দেখ গিরি শিরে, নামে ধীরে ধীরে,
কল কল করি ঝরণা জল।

৩য় বা শিলায় শিলায়, জল ছুটে যায়,
ফুটে উঠে কত মুকুতা দল।

৪র্থ বা। পাখী দলে দলে, ডাকে কল কলে,
পাখীসনে গান গাইব চল।

১মবা। ফুলগুলি তুলি, ধরি পাখীগুল,
শাখায় শাখায় পাড়িব ফল!

সকলে। ঐ যে ভানু, মলিন তনু
পোড়্‌ছে ঢোলে মেঘের কোলে,
বেলা গেল, সন্ধ্যা হোল,
আয় খেলি ধরি গলে গলে।

১মবা। ভাই! এখানে সব চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয় না, ঐ বনের ভেতর যাই, পাখী ধরি গে, ফুল তুলিগে, ফল ছিঁড়িগে।

ধ্রুব। না ভাই! ফল ছিঁড়িস্, ফুল তুলিস্; পাখী ধরিস্ নে। আহা, দেখ্ দেখি, কেমন ওরা বনে বনে বেড়াচ্ছে,—কেমন মিষ্টি গান গাচ্ছে! ওদের ধল্লে পর আর কি ওরা অমন কোরে গান গাবে?

৪র্থবা। যা যা;—আর পাখী ধোর্ত্তে হবে না। খালি তোমার দুষ্টুমি।

ধ্রুব! আয় ভাই, আমরা ফুল তুলিগে।

৩য়বা। না ভাই, আর ফুল তুলে কায নেই। সন্ধ্যা হয়েছে; পড়া তৈরি কোর্ত্তে হবে,—নৈলে পাঠশালে গুরু মশায়ের কাছে মার খেতে হবে। তোরা সব চলে আয়। ধ্রুব! আয় ভাই।

১মবা। ধ্রুব গিয়ে কি পড়া তৈরি কোর্‌বে না কি? ও কি পাঠশালে যায় না কি?

২য়বা। হ্যাঁ ভাই ধ্রুব! তুই পাঠশালে যাস্‌নে কেন? তোর মা কি লেখা পড়া শেখায় না?

ধ্রুব। মা বলে—কি কোরে লেখা পড়া শেখাব বাবা; আমার কি আছে যে, তোকে কাপড় কিনে দোব, পাত্তাড়ি দোব, কলম দোব, কালি দোব; এ সব তোকে কে দেবে বাবা? এই কথা মা আমাকে কেবল বলে।

২য়বা। কেন, তোমার বাবার কাছে যাও না ভাই?

ধ্রুব। বাবা আমার কে, মা বৈ ত কাকেও জানি না।

মায়ের কাছে থাকি, মা মা বোলে ডাকি,
মা বৈ ত কাকেও জানি না।
ক্ষিদে পেলে, মা মা বোলে,
ঝাঁপিয়ে উঠি মায়ের কোলে,
মা ডাকে আমায় বাবা বোলে, আমি মাই খাই
আর বলি মা মা।

বাবা কি ভাই? আমার বাবা কে? মাই তো আমাকে বাবা বাবা বলে। বাবা কে ভাই?

সকলে। হা হা হা হা, বলিস্ কি রে?

ধ্রুব। ভাই! তোরা অত হাস্‌লি কেন?

১মবা। আরে দূর বোকা, তোর বাপ আছে; তুই তার নাম জানিস্ না বোধ হচ্ছে।

ধ্রুব। না ভাই, আমি জানি নি।

৪র্থ। আচ্ছা, কাল তুই তোর্ মাকে জিজ্ঞাসা কোরে আমাদের কাছে বলিস্।

১মবা। আর তুই যখন কাল আমাদের সঙ্গে খেলা কোত্তে আস্‌বি, তখন তুই একটুখানি কাপড় পোরে আসিস্ নে। একখানা ভাল কাপড় পোরে আস্‌বি আর কাঁধে একখানা উত্তরী নিয়ে আস্‌বি।

ধ্রুব। উত্তরী কেন?

৪র্থবা। ওরে, আমরা তোকে এ দেশের রাজার কাছে নিয়ে যাব। রাজার কাছ থেকে তোকে কিছু টাকা চেয়ে দোব; তা হোলে তোর লেখা পড়ার খরচ চোল্‌বে,—ভাল কাপড় হবে,—আমাদের সঙ্গে রোজ পাঠশালে যেতে পার্‌বি।

ধ্রুব। আচ্ছা, তাই কোর্‌বো।

৪র্থবা। এখন সন্ধ্যা হোয়েছে—বাড়ী যাবি, চল্।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুনীতির কুটীর।

সুনী। এ জীবনে আসিয়াছে যেন
নূতন জীবন।
বিশুষ্ক লতায়, ফুটিয়াছে একটী কুসুম,
আমোদিত প্রাণ সৌরভে তাহার।
বিধি কৃপাবলে, পাইয়াছি এই অমূল্য রতন;
কাঙ্গালিনী আমি—নাহি অন্য ধন,
হৃদয় কৌটায় পূরে সদা তাই রাখিতে বাসনা।
চন্দ্রানন হেরিয়া ধ্রুবের ভুলে যাই সকল যাতনা।
করিলে ধারণ বক্ষে ধ্রুবনিধি মোর
জুড়ায় সকল জ্বালা
সন্ধ্যা হোয়ে এল—
এখনও ধ্রুবমণি মোর কেন নাহি ফিরে এল?
বহুক্ষণ গিয়াছে খেলিতে;
আকুল হইল বড় প্রাণ।

(ধ্রুবের প্রবেশ)

সুনী। হাঁা বাবা! এতক্ষণ কোথায় ছিলি? মুখখানি শুকিয়ে গেছে। আয়—কিছু খাবি আয়।

ধ্রুব। (নিরুত্তর)

সুনী। চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? অনেকক্ষণ কিছু খাস্‌নি—আয় খাবি আয়।

ধ্রুব। না, আমি খাব না।

সুনী। কেন? তোর্ কি হোয়েছে?

ধ্রুব। কিছু না।

সুনী। তবে খাবিনি কেন?

ধ্রুব। তুই আমাকে একটা কথা বোল্‌বি বল—তবে খাব।

সুনী। কি কথা?

ধ্রুব। আমার বাবার নাম কি?

সুনী। (বিস্মিত হইয়া স্বগতঃ)

কে শিখালে হেন প্রশ্ন মোর বাছনিরে?
এ প্রশ্নের কি দিব উত্তর!

ধ্রুব। মা, বল্ না। বল্‌বিনি? বল্‌বিনি?

সুনী। নাহি জানি কি দিব উত্তর!

শুকাইল কণ্ঠ, রসনা নীরস,
ঘন ঘন বহে উষ্ণশ্বাস
শোণিত প্রবল বহে
হৃদ্‌পিণ্ড দুরু দুরু করিছে আমার ;
কি দিব উত্তর
শিশু নাহি জানে নিজ পিতৃনাম!

ধ্রুব। মা! নাম বল্‌না।

সুনী। আজ নয়—কাল বোল্‌বো।

ধ্রুব। না—এখনই বল্।

সুনী। (স্বগতঃ) কি করি?—বলিব কি?

বলিলে—জানিবে সন্তান
রাজার কুমার আমি।

অবোধ সন্তান, রাজপুত্র বলি
যথা তথা দিবে পরিচয় ;
কে বিশ্বাস করিবে উহায় ?
পরিশেষে লাভ উপহাস !
নাম যদি নাহি বলি—
অপযশ পরিণাম !
পুত্র নাহি জানে নিজ পিতৃনাম।
ছি ছি! কি লজ্জা!

ধ্রুব। ওমা! কি ভাব্‌ছিস্?—বল্‌না।

সুনী। তোর্ পিতার নাম উত্তানপাদ। হোয়েছে ত ; এখন আয়্— খাবি আয়।

ধ্রুব। মা! আর একটা কথা আছে।

সুনী। আবার কি ?

ধ্রুব। আমাকে কাল ভাল কাপড় পোরিয়ে দিতে হবে।

সুনী। ঐ যে কাপড় রোয়েছে বাবা ; আবার কাপড় কেন ?

ধ্রুব। না, ভাল কাপড় ; আর কাঁধে পর্‌বার উত্তরী চাই।

সুনী। উত্তরী কোথা পাব বাবা ; উত্তরী নেই।

ধ্রুব। না ; না দিলে আমার খেলুনিরা আমাকে নিয়ে খেলা কোর্‌বে না।

সুনী। উত্তরী নিয়ে কি আর খেলা করে! তোমার ঐ কাপড় পোরে খেলা কোরো বাবা।

ধ্রুব। তারা যে আমাকে উত্তরী নিয়ে যেতে বোলেছে।

সুনী। কোথা পাব বল্, তাই তোকে দোব ?

ধ্রুব। না, আমাকে দিতেই হবে। (জানুধারণ)

সুনী। বাবা! আমি দুঃখিনী ; তুই দুঃখিনীর ছেলে ; আমি পরের কাছে তোর ঐ ছোট কাপড় খানি ভিক্ষে কোরে এনেছি। বার বার ভিক্ষে কোত্তে লজ্জা হয় যে বাবা।

ধ্রুব। মা! তুই একবার ঘরের ভেতর খুঁজে দেখ্ না—যদি কিছু কাপড় থাকে ;

সুনী। (স্বগতঃ) বুক ফেটে যায়,

রাজার কুমার লালায়িত আজি এক খণ্ড বস্ত্র তরে।
রাশি রাশি বস্ত্র, দরিদ্র আতুরে
অকাতরে কত করিয়াছি দান—
আজ কি না প্রাণের সন্তানে
সামান্য উত্তরী খণ্ড নাহি পারি দিতে।
বিদীর্ণ হউক বক্ষঃ ; ছেড়ে যাক্ প্রাণ,
হতভাগী সুনীতির লুপ্ত হোক্ নাম ;
প্রাণের সন্তান বস্ত্র চাহে,
নাহি পারি দিতে।
(প্রকাশ্যে) আমি জানি বাবা, কিছুই নেই।

ধ্রুব। মা! তবে কাপড় আর উত্তরী হবে না ?

সুনী। বাবা! আর চাস্ নি—আর মা বোলে ডাকিস্ নি।

ধ্রুব। মা! তোর কাছে নইলে কার কাছে চাইব ?

সুনী। মা বসুন্ধরে! দ্বিধা হও,
লুকাই তোমার আঁধার জঠরে ;
লুকাইলে ধ্রুব আর পাবে না দেখিতে,
না চাহিবে বস্ত্র আর।
"মা! মা!" বলি রোদিবে যখন,
পৃথিবী জঠর হোতে করিব উত্তর
নাহি তোর মা—মা তোর মরিয়াছে।

ধ্রুব। মা! তুই কি বল্‌ছিস্?—তুই কি মরে যাবি বল্‌ছিস্? তবে আমি কোথায় দাঁড়াব ? তবে আর আমি কাপড় চাই নি।

সুনী। রাগ করিস্ নে, দোব এখন।

ধ্রুব। কোথা থেকে দিবি ?

সুনী। আমার এই পরা কাপড় থেকে এরই আঁচল ছিঁড়ে দোব।

ধ্রুব। না মা! তোর্ কাপড় ছিঁড়িস্‌নি, তুই কি পোর্‌বি ? আমি চাইনি—আমি কারু কাছে উত্তরী ভিক্ষে কোরে নোব।

সুনী। না বাবা, আমি বেঁচে থাক্‌তে তোকে ভিক্ষে কোত্তে দোব না। মা তোর্ মোরে যাক্, তার পর ভিক্ষে করিস। কাপড় থাক্‌তে ভিক্ষে কেন বাবা ?

ধ্রুব। না না, তোর্ আঁচল ছিঁড়িস্‌নি।

সুনী। আচ্ছা এখন আয়, খাবি আয়।

ধ্রুব। আর তুই কাঁদ্‌বিনি বল্।

সুনী। না, তুই আয়। [উভয়ের কুটীর মধ্যে প্রবেশ]

সাধনা।

বর্ত্তমান কালে সমুদয় ভারতে 'সাধনা,' 'সাধনা' বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে। উহা এক হিসাবে খুব শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। কিন্তু অপর দিকে, এই হুজুক ধরিয়া নানাপ্রকারের লোক নানারূপে আপন আপন স্বার্থ চরিতার্থের, প্রাধান্যলাভের ও স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক মতপোষণের চেষ্টা করিতেছে। অনেকে অজ্ঞাতসারে করিতেছে—তাহারা জানে না, ইহা কতদূর দায়িত্বের কার্য্য, অনেকে আবার জানিয়া শুনিয়া ধর্ম্মের বাজারে এই প্রতারণার জাল বিস্তার করিয়াছে। শাস্ত্রসমূহ ইহাঁদের হাতে পড়িয়া নানা অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। নানাপ্রকার সত্যমিথ্যামিশ্রিত আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি অদ্ভুত অর্থে শাস্ত্রের প্রকৃত মূর্ত্তি চেনা ভার হইয়া পড়িয়াছে। নবানুরাগীর এই সকল ধাঁধায় পড়িয়া দিগ্‌ভ্রমের বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছে।

আকাঙ্ক্ষা যদি বাস্তবিক জাগিয়া থাকে, আর যদি সাধক অপকট হন, তবে এই সকল জালের মধ্য হইতেও ঈশ্বরকৃপায় তিনি অবশ্যই প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেরূপ আকাঙ্ক্ষা কয় জনের হয়, কয় জনই বা একেবারে অকপট ঈশ্বরানুরাগী হইতে পারেন?

কেহ কেহ দুই একখানি যোগশাস্ত্র পড়িয়া হয়ত যোগবিভূতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রাণায়ামসাধনের অনুরাগী হইয়া পড়েন ও গ্রন্থবিশেষ হইতে শিখিয়া আপনিই প্রাণায়ামসাধনে প্রবৃত্ত হন। ভাগ্যে অধ্যবসায়হীনতাবশতঃ বেশী দিন ইহা করিতে পারেন না, তাই রক্ষা, নতুবা সংশয়াপন্ন ব্যাধি লইয়া ডাক্তার কবিরাজের শরণাপন্ন হইতে হয়। কেহ বা আমার মত গুরুর নিকট উহা শিক্ষা করিতে যান, যিনি আপনাকে আপনি বাঁচাইতে অক্ষম। ক্বচিৎ কেহ কৃতকর্ম্মা গুরুলাভ করিয়া অধ্যবসায়সহকারে সাধন করিতে পারেন। কিন্তু সাধন করিলেও প্রকৃত লক্ষ্য বিস্মৃত হওয়াতে দুই একটী সামান্য সিদ্ধি লাভ করিয়াই মনে করেন, বাস, আমি সিদ্ধ হইয়াছি।

কেহ বা গুরু অন্বেষণ করেন। শাস্ত্রে পড়িয়াছেন, জ্ঞানীরা জড়োন্মত্ত-পিশাচবৎ ভ্রমণ করেন, তাই পাগ্‌লা ভাবের লোক দেখিলেই সেই দিকে তাঁহাদের টান হয়। এইরূপ কাচে মণিভ্রম করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কাহারও কাহারও অদৃষ্টে প্রকৃত জ্ঞানিজনের মিলন না ঘটে, এমন নহে।

কেহ কেহ শুনিয়াছেন, সাধুমহাত্মারা নিবিড় পর্ব্বতগুহায়, হিমালয়ে বাস করেন। এই মনে করিয়া কেহ কেহ হিমালয়ে মহাত্মাদর্শনের জন্ত ধাবিত হন। বাড়ীতে হাহাকার উঠে। তিনিও হয় ত কিছুদিন এইরূপ মহাত্মার বিফল অনুসন্ধানের পর হয় ফের ঘোরসংসারে মগ্ন হন, নতুবা ভণ্ড সন্ন্যাসীর দলে মিশিয়া গাঁজা খাইতে ও বুজরুকি করিতে শিখেন।

ভক্তিপ্রবণ কেহ কেহ সঙ্কীর্ত্তনের দল করিয়া অথবা সংকীর্ত্তনের দলে মিশিয়া ভক্তিতে বিভোর হন। ক্রমশঃ দশাপ্রাপ্তি হইতে থাকে। ক্রমশঃ হয় নিজে একটী ছোটখাট কৃষ্ণ বিষ্ণু হইয়া দাঁড়ান, সাঙ্গোপাঙ্গ জুটে, নতুবা কোন অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গ হইয়া পড়েন।

জ্ঞানের অনুরাগী যাঁরা, তাঁহারা কতকগুলি বেদান্তের গ্রন্থ কিনিয়া মায়া, ব্রহ্ম প্রভৃতি লইয়া প্রবল চর্চ্চা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের বিচারের চোটে গগন ফাটিয়া যায়। অনবরত অস্তি, ভাতি, প্রিয়, সমাধি, সোঽহং প্রভৃতি বড় বড় শব্দ তাঁহাদের আলোচনার স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়।

এই সকল নানা গোলমাল দেখিয়া কেহ বা নূতন মত ছাড়িয়া সেই প্রাচীন কুলগুরুর নিকট মন্ত্র লইয়া সাধনপূজাদি আরম্ভ করেন। কেহ বা গোপনে তান্ত্রিক মতে শাক্তাভিষিক্ত, পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া নানামুদ্রা, ন্যাস, প্রাণায়ামাদি দ্বারা ও পঞ্চমকারের কোন কোন মকার অবলম্বনে সাধনা দ্বারা সাধনা করিতেছি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন।

ইহাঁদের মধ্যে আবার সংসারে থাকিয়া সাধনা করা উচিত অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করা উচিত. এই লইয়াও বিচার চলিয়া থাকে। অধিকাংশ লোক যে মতে বলে, সংসারে থাকিয়া সাধনা শ্রেষ্ঠ, সেই মতেই গমন করেন। দুই চারিজন বালক ও যুবক, কখন কখন দু এক জন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়াও থাকেন।

কেহ কেহ সাধনাকে এতদূর একটা গুহ্য ব্যাপার করিয়া তুলেন যে, তাহার মধ্যে বিন্দুবিসর্গ দন্তস্ফুট করিবার সামর্থ্যও থাকে না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হয়, হে সাধকগণ, ভগবানের জন্ত তোমাদের কাহারও প্রাণ কাঁদিয়াছে কি না? অথবা না কাঁদিয়া থাকে,

প্রাণকে কাঁদাইবার কোন উপায় করিতেছ কি না? মূল লক্ষ্য, ভগবানলাভ যদি সর্ব্বদা মনে থাকে, তবে মনে হয়, অতি সহজ সাধনায় তাঁহাকে পাওয়া যায়।

সাধনা সহজ বলিলাম, ইহার অর্থ কি? সহজ অর্থে সাধনা করিতে গেলে এত ঘুরিতে হয় না বা নানা গুপ্ত বা কুটিল তত্ত্ব জানিতে হয় না। ভগবান রামকৃষ্ণদেবের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যিনি যে কোন মত বা প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অপরে ভুল বলিলেও নিষ্ঠা সহকারে তাহা ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

তুমি কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছ। ক্ষতি কি? তুমি আবার আর একটা মন্ত্র লইবার জন্য ঘুরিতেছ কেন? ঐ মন্ত্রকে ভগবানের নাম বোধে সাধন কর দেখি। কেমন না হয়? সংসারের জন্য তুমি যে পরিশ্রম কর, তাহার শতাংশের একাংশও উহার জন্য কর দেখি, কিছু ফল হয় কি না। ভগবানকে ডাকিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী পাইতেছ না বলিয়া ভগবানকে ডাকা হইতেছে না, নহে। মনকে ঠিক করাই আসল সাধনা। সংসারের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে কঠোর যুদ্ধ করিতে করিতে মনকে ধরিবার চেষ্টা কর দেখি। তুমি কোন মন্ত্র লও নাই, আচ্ছা, ভগবানের যে নাম তোমার ভাল লাগে, তাই লইয়া তুমি খানিকক্ষণ করিয়া নির্জ্জনে বস দেখি। মনকে ধীরে ধীরে চিনিতে পারিবে, তখন মন ধীরে ধীরে জিত হইবে। ফস করিয়া একটা কিছু হইবে ভাবিও না। যেমন কঠোর সাধনায় লেখা পড়া শিখিয়াছ, যেমন কঠোর সাধনায় অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ, তদ্রূপ একটু চেষ্টা কর দেখি, ভগবানের জন্য। সাধনার বিঘ্ন আর কেহ নহে—সাধনার বিঘ্ন তোমার মন। এখান হইতে পালাইয়া তুমি কোথায় যাইবে? যেখানে যাইবে, মনকে ফেলিয়া ত পলাইতে পারিবে না। মনকে যখন ফেলিয়া পলাইতে সমর্থ হইবে, তখনই যথার্থ সংসারত্যাগ হইবে। নতুবা এখান হইতে সেখানে বসিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। তাহার জন্য চেষ্টা করিয়া অনর্থক শক্তিক্ষয় করিও না। তুমি সংসারী হইবে কি সন্ন্যাসী হইবে, এ ভাবনা ঈশ্বরের উপর দিয়া তুমি তাঁহাকে ভাবিতে চেষ্টা কর। দিনের মধ্যে খাইতে শুইতে বসিতে উঠিতে পড়িতে চাকরি করিতে যত তাঁকে ভাবিতে পার, ততই লাভ, ততই তুমি অগ্রসর হইতেছ। গুরুর জন্য চিন্তা তোমার? একে ওকে তাকে গুরু করিয়া কেন প্রতারিত হইতে যাইবে? তুমি গুরু চিনিবে কিরূপে? তাঁহাকে ডাকিবার শক্তি সকলের ভিতর আছে—তাঁহাকে ডাকিবার চেষ্টা

কর। মনকে স্থির করিবার চেষ্টা কর—রিপুবশ করিবার জন্য ক্রন্দন কর। ভগবান নিজে গুরু জুটাইয়া দিবেন, তিনি স্বয়ং গুরু হইয়া আসিবেন, তিনি স্বয়ং সাধনা শিখাইবেন। তোমার কার্য্য কেবল তাঁকে ডাকা।

আর একটী প্রকৃত সাধনা, যাহা আমরা সকলেই করিতে পারি, তাহা আমরা সকলে বড় ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি। এ সাধনা সর্ব্বত্রে হয়। এ সাধনায় কোন গুরূপদেশ বা গুহ্যোপদেশের আবশ্যক করে না। এ সাধনায় কিন্তু সকলেই ধন্য হইয়া যায়। শুন নাই কি শাস্ত্রে যে, সকলেই ভগবানের মূর্ত্তি? এই বুদ্ধিতে হে পুত্রকন্যাগণ, তোমরা কেন না তোমাদের পিতা-মাতার সেবা কর? হে ছাত্রগণ, কেন না, তোমরা তোমাদের গুরু শিক্ষকের সেবা কর? কেন না অতিথি অভ্যাগত আসিলে তাহাকে নারায়ণ জানিয়া প্রাণপণে তাহার সেবা কর? কেনা না, প্রতিবেশীর সুখে দুঃখে তাহার সর্ব্ববিধ সাহায্য করিয়া সাধক নাম ধন্য করিতে চেষ্টা কর? তোমার অর্থ নাই? শরীর ত আছে। তোমার শরীর নাই? বাক্য ত আছে। শোকের সময় কেন না শাস্ত্রের উপদেশ দানে শোক দূর কর? আজ যদি এই নিঃস্বার্থপরতা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমরা পরস্পরের সেবা আরম্ভ করি, তবে দেখ দেখি, এ সংসার নরককুণ্ড না হইয়া ইহাই স্বর্গে পরিণত হয় কি না? নিঃস্বার্থতাই ভগবান। যাহার প্রাণ সকলের জন্য কাতর হইয়াছে, যে নিঃস্বার্থ হইয়াছে, সে কোন যোগ না জানিলেও যোগী, কোনরূপ জ্ঞানে জ্ঞানী না হইলেও জ্ঞানী, কোনরূপ ভক্তিলক্ষণ তাঁহার অঙ্গে দেখা না যাইলেও তিনি মহাভক্তশিরোমণি। তাঁহার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম।

সমাজ সংস্কার।

আজকালকার হিন্দুসমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনের গতি প্রধানতঃ তিনটী দিকে প্রবাহিত। একদল বলেন, আমাদের প্রাচীন যাহা কিছু ছিল, সব ভাল; তাহাদের রক্ষণেই হিন্দুসমাজের মঙ্গল। দ্বিতীয় দল, সংস্কারের পক্ষপাতী। তৃতীয় দল বলেন, আমাদের প্রাচীন সমুদয় ভাব রক্ষা করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে বর্ত্তমানকালোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। প্রথম দলকে রক্ষণশীল, দ্বিতীয় দলকে উন্নতিশীল বলে। তৃতীয় দলের বিশেষ কোন নাম আছে কি না, বলিতে পারি না, আমরা সহজবোধার্থ ইহাদিগকে সমন্বয়কারী নাম প্রদান করিব।

এই তিন দলকে আপাততঃ পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু এই তিন দলের নেতৃগণের মতামত আলোচনা করিলে বোধ হয়, ইঁহারা কেহই পরিবর্ত্তনের বিরোধী নহেন আর কেহই একেবারে প্রাচীন ভাবসমুদয় উড়াইয়া দিবারও পক্ষপাতী নহেন। তবে ইঁহারা এক একটা দিকে বেশী ঝোঁক দেন, এই মাত্র। আর এক কথা এই, ইঁহারা কেহই সুস্পষ্টভাবে নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করেন না। অনেকেই কতকগুলি সাধারণ মূলসূত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হন, বিশেষ মীমাংসায় খুব কম ব্যক্তিই অগ্রসর হইয়া থাকেন। কিন্তু মনে হয়, এক্ষণে আমাদের সাধারণ ও বিশেষ উভয় ভাবেই সামাজিক সমস্যা মীমাংসা করিবার আবশ্যক হইয়াছে। শুধু ভাবোচ্ছ্বাসবশে পক্ষবিশেষ সমর্থন করিবার চেষ্টার সময় আর নাই—এখন স্থিরভাবে এই সকল বিষয় বিচার করিবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। আমি যে এ সম্বন্ধে নূতন কোন আলোক দিতে পারিব, সে আশা করি না। তবে চিন্তাশীলগণের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করানই আমার এ সামান্য উদ্যমের উদ্দেশ্য।

যাঁহারা প্রাচীনতন্ত্রের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আমার জিজ্ঞাস্য, প্রাচীন বলিতে তাঁহারা কি বুঝেন? তাঁহারা কি বৈদিক যুগের সমুদয় আচার পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে চান, না,পৌরাণিক যুগের? অথবা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বাপ পিতামহ যাহা করিতেন, তাহাই তাঁহাদের আদর্শ? তাঁহারা এ সম্বন্ধে স্থিরভাবে তাঁহাদের মন্তব্য ব্যক্ত করুন। হিন্দুর ভাগ্যচক্রের ইতিহাস কি তাঁহারা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন? তাঁহারা কি মানেন, হিন্দুসমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সামাজিক রীতিনীতির নানাবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? যদি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে,কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? সে সকল পরিবর্ত্তনের কর্ত্তা কে বা কাহারা? সে সকল পরিবর্ত্তনে শুভ না অশুভ ঘটিয়াছে? অথবা কি কোনটীতে শুভ, কোনটীতে অশুভ ঘটিয়াছে? তবে কোন্‌টীতেই বা শুভ,কোন্-টীতেই বা অশুভ ঘটিয়াছে? যাঁহারা প্রাচীন ভাবে সমাজকে গঠন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের অবশ্য ইহা স্বীকৃত সত্য যে, নব্য অশুভ ভাব কতকগুলি প্রবেশ করায় সমাজ বিকৃত হইয়াছে। সেই প্রাচীন সমাজের আদর্শটী কি? এবং নব্য কোন্ কোন্ অশুভ ভাব ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে? প্রাচীন-পক্ষপাতী নেতৃগণ যদি যথাসম্ভব শাস্ত্র ও ইতিহাসসাহায্যে এই সকল তত্ত্ব বেশ খুলিয়া বলিতে পারেন, তবে সমস্যা অনেকটা সোজা হইয়া আসে।

পরিবর্ত্তনপক্ষপাতী সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাস্য, তাঁহাদের আদর্শ কি? তাঁহারা

কি প্রাচীন হিন্দুর সমুদয় ভাবগুলিকে অশুভকর বলিয়া বিশ্বাস করেন? পাশ্চাত্য সমাজ কি তাঁহাদের চক্ষে নিখুঁত আদর্শ? পরিবর্ত্তন মাত্রই কি শুভ? অথবা তাঁহারা প্রাচীন প্রাচীনতর প্রাচীনতম হিন্দুসমাজের সকল অবস্থার মধ্যে কোন্ অবস্থার কোন্ প্রথাগুলিকে শুভকর ও কোন্গুলিকেই বা অশুভকর বলিয়া বোধ করেন? পাশ্চাত্যসমাজের কোন্ কোন্গুলিকে শুভ, কোন্ কোন্গুলিকেই বা অশুভ বলিয়া বিবেচনা করেন? সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন যদি শুভকর না হয়, তবে কি কি পরিবর্ত্তন কি প্রণালীতে সাধিত হওয়া উচিত? তাঁহাদের মতে মীমাংসা করিবার মধ্যস্থ কে? যুক্তি কি? যুক্তি কি সর্ব্ববাদিসম্মত হওয়া সম্ভব? অথবা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি যদি যুক্তি দেখাইয়া বিভিন্ন মত সমর্থন করেন, তবে সমাজসংস্কার ও গঠনেরই বা উপায় কি?

সমন্বয়কারিগণও এই সকল বিষয়ে তাঁহাদের স্থিরচিন্তাপ্রসূত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে ভাল হয়।

আমার বিবেচনায় এই সকল বিষয়ে মতগঠনের জন্য কতকগুলি সাধনার প্রয়োজন।

প্রথমতঃ পাশ্চাত্যমতে শিক্ষিতব্যক্তিগণের কতকগুলি সক্ষম ব্যক্তির কর্ত্তব্য—পাশ্চাত্য দেশসমূহ তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ, সেই সকল প্রদেশের বিভিন্ন রীতিনীতির বিশেষ করিয়া আলোচনা—আর পাশ্চাত্য জাতির সামাজিক রীতিনীতির বিকাশ ও পরিবর্ত্তনের ইতিহাস অধ্যয়ন ও আলোচনা। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদিগকে হিন্দুশাস্ত্রের বিভিন্ন বিকাশ প্রথমতঃ পরম্পরাগত প্রথামত পরম্পরাগত ভারপ্রাপ্ত গুরুগণের অর্থাৎ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিবর্গের নিকট অধ্যয়ন করিতে হইবে। তৎপরে স্বাধীন যুক্তিদ্বারা হিন্দুরীতিনীতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। তারপর আর একটী কার্য্য আছে। সমুদয় হিন্দুস্থান ভ্রমণ করিয়া এই সকল শাস্ত্রীয় তত্ত্ব সমগ্র ভারতবর্ষে কোথায় কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। এই সকল ব্যতীত তাঁহাকে চরিত্র গঠন এরূপ ভাবে করিতে হইবে, যেন তাঁহার মনে সত্যব্যতীত অন্য কোন দিকে bias অর্থাৎ ঝোঁক না থাকে। এইরূপ সাধনসম্পন্ন হইলে তবে নব্য সম্প্রদায় হিন্দুসমাজসম্বন্ধে একটা মতামত প্রকাশে অধিকারী হইবেন।

প্রাচীন সম্প্রদায় এ সম্বন্ধে কি করিতে পারেন? তাঁহারা ত সহজেই প্রাচীন শাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবেন। এতদ্ব্যতীত, একটু চেষ্টা করিয়া

ভারতীয় হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশতত্ত্ব তাঁহাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। তিনি অবশ্য পাশ্চাত্যপ্রদেশে যাইতে অস্বীকৃত। কিন্তু তিনি এখানে যথাসম্ভব পাশ্চাত্যসম্প্রদায়ের সহিত মিলিতে পারেন আর পাশ্চাত্য গ্রন্থসমূহ আলোচনায় তাঁহার বোধ হয় কোন আপত্তি হইবে না। তার পর তাঁহাকেও সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিতে হইবে এবং সত্যনিষ্ঠার সাধন করিতে হইবে। এইরূপ হইলে তিনিও সমাজসম্বন্ধে মত প্রকাশে অধিকারী হইবেন।

উভয়কেই সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে। অপর পক্ষকে খণ্ডন করিবার সময়—সকলেরই এইটী স্মরণ থাকা আবশ্যক যে, তাঁহার প্রতিপক্ষের মতে হয়ত কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে।

এইরূপভাবে সমাজসম্বন্ধে মতগঠনের কিছু চেষ্টা হইতেছে কি?

পাগলের প্রলাপ।

দুটী পথ মানুষের সম্মুখে খোলা—একটা হচ্চে নেওয়া, আর একটী হচ্চে দেওয়া। কেউ নিতে আসে; কেউ কেবল দিতে আসে। জগতে শুধু যে এই দুই চূড়ান্ত ভাবেরই লোক আছে, তা নয়, এই দুই ভাবের অল্পাধিক মিশ্রণ, সকল মানুষেরই ভিতর। এখন তুমি কোন্ দিকে লয় দেবে? শান্তি ত এই দুই ভাবের একটার চূড়ান্ত না হলে হবে না।

আপনার কোলে ঝোল টানিবার দিকে আমাদের বড় ঝোঁক। চেষ্টাও কচ্চেন অনেকে। শান্তি পেয়েছেন কি? অপরকে জিজ্ঞাসা না করে, নিজেকে জিজ্ঞাসা কর দেখি? অপরকে জিজ্ঞাসা করলে ঠিক ঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। বাইরের চাকচিক্য দেখে গোলমাল হয়ে যেতে হয়।

সুখ তখনই, যখনই আপনাকে ভুলতে পারা যায়। এ কথা আপাততঃ, রহস্যপূর্ণ বোধ হলেও সত্য—অতি সত্য। জীবনে যদি কোন সত্য থাকে ত এই একমাত্র সত্য—আত্মবিস্মৃতি। পরোপকারে, বিচারে, ভক্তিতে আত্মহারা হোতে পারা যায়। যে যাতে পার; কর। মোদ্দা—উদ্দেশ্য হচ্চে আত্মবিস্মৃতি। তুমি সর্ব্বশাস্ত্র বেদ পুরাণ তন্ত্র বাইবেল আলোড়ন কর, দেখ্‌বে, এই এক লক্ষ্য সবার। যে আপনাকে ভুল্‌তে পেরেছে, সেই সুখী, সেই দেবতা—শুধু, তাই নয়, সেই ভগবান। আপনাকে এক ক্ষুদ্রদেহে সীমাবদ্ধ বোধে যে কোন কায হয়, তাইতেই অশান্তি আর যখন কায হয় উচ্চ লক্ষ্য থেকে, আপনাকে বিশ্ব-

ব্যাপী বোধ কোরে, তখনই শান্তি। বিশ্বের সকলের সুখে আমার সুখ, সকলের দুঃখে আমার দুঃখ। এ ভাব একবার উপলব্ধি কর্‌বার ক্ষণিকও চেষ্টা কর, বুঝ্‌বে কি আনন্দ।

তুমি জগৎ থেকে এত পাবার দাবী কর কিসে? তোমার অধিকার কি আছে—জগৎ তোমাকে যা অনুগ্রহ করিয়া দেয়, তাইতেই সন্তুষ্ট হও—তুমি জগতের লোককে কিছু দেবার চেষ্টা কর। তোমায় কে ভালবাস্‌লে না বাস্‌লে, দেখো না, তুমি সকলকে ভালবাস্‌বার চেষ্টা কর।

তুমি ত বল্লে, সকলকে ভালবাস্‌বার চেষ্টা কর, তুমি বলেই খালাস। বল দেখি, কে জগতে করে? তোমার কি কাকেও নিঃস্বার্থ বোলে বোধ হয় না, না কি? যদি এরূপ লোক নাই পেয়ে থাক, এ কথা ত বুঝ্‌তে পাচ্চ, ঐটে একটা মস্ত আদর্শ? আদর্শ অনুসারে না চোল্লে উন্নতি কোর্‌বে কি করে? এক যায়গায় জড় হয়ে পড়ে থাকা ত হতে পারে না? কেন পারে না? এর কি উত্তর দোব? উন্নতিই হোল প্রাণের স্বভাব। প্রাণ সদাই চাচ্চে অগ্রসর হোতে। আচ্ছা, মানলাম, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হওয়া, সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হওয়া একটা শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কিন্তু হওয়া কি সম্ভব? যদি কখনই না হোতে পারে? যতটুকু চেষ্টা করা, ততটুকুতেই আনন্দ।

আচ্ছা, কেন এরূপ হয়, বোল্‌তে পার? যেটাকে 'আমি' 'আমি' কোচ্চো, সেটা প্রকৃত 'আমি' নয়। গাছের একটা ডাল মনে করে আপনাকে এই যে, ডালটুকু, এইটুকুই সমগ্র গাছটা। ডাল যদি আপনার ডালত্ব ভুলে গিয়া আপনাকে গাছ বোলে ভাবে, তখনই তার জ্ঞান হয়। তাই বোল্‌চি, আপনাকে পৃথক্ বোধই যত জঞ্জালের মূল। 'অহংটাকে একেবারে নাশ কোরে ফেল্‌তে হবে।' আমি কিছু কচ্চি, এ ভাবটা একেবারে তাড়াতে হবে। প্রভু, তুমি সব কোচ্চো, এই বোলে আপনার অভিমান একেবারে দূরে ফেলে দাও, তবেই তোমার অমরত্ব লাভ হবে। তুমি বুদ্বুদ, কেন তুমি আপনাকে সমুদ্র থেকে পৃথক্ মনে কোচ্চো? একবার প্রাণভরে বল, প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক—বল একবার প্রাণ ভরে সোঽহং—তখন দেখ্‌বে, যা কিছু কার্য্য, সবই ঈশ্বরের, সবই সেই প্রভুর।

এর 'ত' স্থানে 'ঢ' হইলে, সেই পরবর্ত্তী 'ঢ'কে নিমিত্ত করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ঢকারের, 'ঢো ঢে লোপঃ' ।৮।৩।১৩। ('ঢ'কার পরে থাকিলে, ঢকারের লোপ হয়) সূত্রানুসারে লোপ হইলে, 'সহি বহোরোদবর্ণস্য' ।৬।৩।১১। ('সহ্' ধাতু এবং 'বহ্' ধাতুর 'অ'বর্ণের স্থানে, 'ও'কার হয়, 'ঢ' লোপ হইলে) এই সূত্রানুসারে, বহ্ ধাতুর লোপাবশিষ্ট 'ব'কারের 'অ'কারের স্থানে 'ও'কার হইলে, ত এই স্থলে, সন্ধ্যক্ষর 'ও'কার পাওয়া যাইবে। যাহাদের, লুঙ্এ, 'উদবোঢাম, 'উদবোঢম্' উদবোঢ প্রভৃতি ('উৎ' উপসর্গের সহিত মিলিত হইয়া) প্রয়োগ হইয়া থাকে ?

ইহাও 'ও'কারান্ত নহে। যে হেতু 'ঢোঢে লোপঃ' সূত্র, অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের হওয়াতে ; আর 'সহিবহোরোদবর্ণস্য' এই 'ও'কারের বিধায়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের সূত্রের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ হইয়াছে। 'ঢ' সুতরাং 'ঢ'কার লোপ অসিদ্ধ বলিয়া, ইহা ('ও'কার) অন্ত্য হইবে না।

ভাষ্যমূল।—ব্যঞ্জনস্য তর্হি প্রাপ্নোতি। অভৈৎসীৎ। অচ্ছৈৎসীৎ। হলন্তলক্ষণা বৃদ্ধির্বাধিকা ভবিষ্যতি। যত্র তর্হি সা প্রতিষিধ্যতে নেটীতি। অকোষীৎ। অমোষীৎ। সিচিবৃদ্ধেরপ্যেষ প্রতিষেধঃ। লক্ষণং হি নাম ধ্বনতি ভ্রমতি মুহূর্ত্তমপি নাবতিষ্ঠতে। অথবা সিচি বৃদ্ধিঃ পরস্মৈ পদেষিতি সিচি বৃদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি। তস্যা হলন্ত লক্ষণাবৃদ্ধির্বাধিকা। তস্যা অপি নেটীতি প্রতিষেধঃ। অস্তি পুনঃ কচিদন্যত্রাপি অপবাদে প্রতিষিদ্ধে উৎসর্গোপি ন ভবতি। অস্তীত্যাহ। সুজাতে অশ্বসূনৃতে অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতম্। শুক্রং তে অন্যদিতি। পূর্ব্বরূপে প্রতিষিদ্ধোঽয়াদয়োঽপি ন ভবন্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সকল স্থলে না হইলে, তবে ব্যঞ্জনের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ? যেমন,—'ভিদ্' ধাতু এবং 'ছিদ্' ধাতুর উত্তর, লুঙ্এর 'সিচ্'এ, 'দ্'কারের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ; সুতরাং 'অভৈৎসীৎ' 'অচ্ছৈৎসীৎ' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না ?

এই স্থলে দোষ হইবে না। কারণ, 'বদব্রজ হলন্তস্যাচঃ' ৭।২।৩। (বদ ধাতু, ব্রজ ধাতু এবং হলন্তধাতুর অঙ্গস্থিত অচ্এর স্থানে বৃদ্ধি হয় পরস্মৈপদী সিচ্ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, হলন্ত ধাতুর অচের বৃদ্ধি হয় বলিয়া, 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' এই অবিশেষ সূত্রকে, বিশেষ সূত্র বাধ করিবে। সুতরাং অচ্এরই বৃদ্ধি হইবে। 'হল্'এর হইবে না।

তবে যে স্থলে, হলন্ত লক্ষণসম্পন্ন 'বদ ব্রজাদি' সূত্রের, 'নেটি'। ৭।২।৪।

(ইড়াদি সিচ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে, হলন্ত ধাতুর অচের বৃদ্ধি হয় না) এই সূত্র বাধক হইয়া থাকে, সেখানে কি হইবে? যেমন,—অকোষীৎ ('কুষ্' ধাতুর 'লুঙ্'এর 'সিচ্'এ) অমোষীৎ ('মুষ' ধাতু, 'লুঙ'এর 'সিচ্'এ) প্রভৃতি হলন্ত ধাতুর যখন 'অচ্'এর বৃদ্ধি নিষেধ করিতেছে, তখন ত পুনঃ 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' সূত্রানুসারে, সাধারণভাবে হলন্তেরও বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হইবে?

তাহা হইবে না, কারণ 'নেটি' সূত্র যে কেবল 'বদব্রজ' সূত্রেরই প্রতিষেধক তাহা নহে; কিন্তু 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' এই সাধারণ সূত্রেরও প্রতিষেধক। কারণ, প্রতিষেধ লক্ষণ-নামক সূত্র, তাহার আপনার অধিকারে অন্য কোন সূত্র না আসিতে পারে; এজন্য ধ্বনি (গর্জ্জন) করিতে থাকে, ভ্রমণ করিতে (পাহারা দিতে) থাকে, একমুহূর্ত্তও অবস্থান করে না (বসে না)।

অথবা সামান্য লক্ষণসম্পন্ন 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' সূত্রানুসারে, 'সিচ্' পরে থাকিলে, সামান্যতঃ সর্ব্বত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। 'বদব্রজ হলন্তস্যাচঃ' এই বিশেষ হলন্ত লক্ষণ সম্পন্ন সূত্র, তাহার সেই বৃদ্ধির দিকে বাধক হইবে। এবং এই হলন্ত লক্ষণসম্পন্ন বিশেষ সূত্রকেও তদপেক্ষা বিশেষ লক্ষণ সম্পন্ন 'নেটি' সূত্র, বাধ করিবে।

ইহা ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে, এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে কি যে, অপবাদ্ (বিশেষ সূত্র)কে বাধ করিলে, উৎসর্গ (সামান্য সূত্র) ও প্রবর্ত্তিত হয় না।

আমরা বলিব যে,—আছে। যেমন, সামবেদে এরূপ মন্ত্র আছে যে, "সুজাতে অশ্বসূনৃতে অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতম্,' শুক্রং তে অন্যৎ" ইত্যাদি স্থলে, 'এ'কারের পরে এবং 'ও'কারের পরে, 'অ'কার থাকিলে, এঙঃ পদান্তাদতি। ৬।১।১০৯। (পদান্তস্থিত 'এঙ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরে, 'অ'কার থাকিলে, পূর্ব্বরূপ এক আদেশ হয়) এই সূত্রকে বাধ করিয়া, 'সুজাতে অশ্বসূনৃতে' এইরূপ প্রকৃতিভাব হইলে, উৎসর্গ সূত্র 'এচোঽয়বায়াবঃ'। ৬।১।৭৮। (এচ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরে অচ্ থাকিলে, যথাক্রমে অয়্, অব্, আয়্, আব্, হইয়া থাকে) সূত্রানুসারে, অয়াদি আর প্রাপ্তি হয় নাই।

ভাষ্যমূল।—উত্তরার্থমেব তর্হি সিজর্থং বৃদ্ধিগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। সিচিবৃদ্ধির-বিশেষেণোচ্যতে। সাকৃিঙতি মাভূৎ। ন্যনুবীৎ। ন্যধুবীৎ। নৈতদস্তি-প্রয়োজনম্। অন্তরঙ্গত্বাদত্রোবঙাদেশে কৃতেঽনন্ত্যত্বাদ্বৃদ্ধির্ন ভবিষ্যতি।

যদি তর্হি সিচ্যন্তরঙ্গং ভবতি। অকার্ষীৎ। অহার্ষীৎ। গুণে কৃতে চান-ন্ত্যত্বাদ্বৃদ্ধির্ন প্রাপ্নোতি।

মা ভূদেবং হলন্তস্যেত্যেবং ভবিষ্যতি। ইহ তর্হিন্যস্তোরীৎ। ন্যদারীৎ। গুণেকৃতেহবাদেশে চানন্তাত্বাদ্বৃদ্ধির্ন প্রাপ্নোতি। হলন্ত লক্ষণায়াশ্চ নেটীতি প্রতিষেধঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' সূত্র, অবিশেষর রূপে (সামান্যতঃ) উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই বৃদ্ধি 'ক,' 'গ,' কিংবা 'ঙ' ইৎ হইলে না হয়, এইজন্য 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নতুবা, ন্যনুবীৎ (নি—ণু ধাতুর লুঙ্ এর সিচ্), ন্যধুবীৎ (নি—নূঞ্ ধাতু) ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না। কারণ, এই স্থলে বৃদ্ধি হইলে, উকারের বৃদ্ধিতে ঔকার হইত।

এই স্থানের জন্য 'বৃদ্ধি' গ্রহণের প্রয়োজন নাই। কারণ, 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' সূত্রে, বৃদ্ধি করিবার জন্য নিমিত্ত অনেক থাকাতে, আর 'অচিশ্নুধাতুভ্রুবাং য্বোরিয়ঙুবঙৌ'। ৬।৪।৭৭। (শ্নু প্রত্যয় অন্তে আছে যার, ইবর্ণ বা উবর্ণ অন্তে আছে যার এমন ধাতুর; আর 'ভ্রূ' শব্দের অঙ্গের, 'ইয়ঙ্' এবং 'উবঙ্' আদেশ হয়, 'অচ্' আদি বিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রে, 'উবঙ্' আদেশ করিবার জন্য; নিমিত্ত কম হইয়াছে; সুতরাং অন্তরঙ্গও হইয়াছে। অতএব অন্তরঙ্গ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গ শাস্ত্র অসিদ্ধ হয় বলিয়া, পূর্ব্বে 'উবঙ্' আদেশ হইলে, 'উ' কারান্ত ধাতু আর অন্তে না থাকাতে, স্বতঃই বৃদ্ধি হইবে না।

যদি বল যে, 'সিচ্' বিধিতেও অন্তরঙ্গ কার্য্য হয়; তবে 'অকার্ষীৎ' 'অহার্ষীৎ' ইত্যাদি প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে? কারণ, 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' সূত্রাপেক্ষা, 'সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ'। ৭৩৮৪।(১) সূত্র অন্তরঙ্গ বলিয়া, এই সূত্রানুসারে 'কৃ'ধাতু ও 'হৃ'ধাতুর 'ঋ'কারের গুণ করিলে (অকর্, অহর্) 'র'পরবিশিষ্ট শব্দ হইবে। তখন 'ঋ' অন্তে না থাকাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না। এইরূপ ('সিচিবৃদ্ধিঃ' সূত্রানুসারে) নাইবা হইল; পূর্ব্বোল্লিখিত 'বদব্রজ হলন্তস্যাচঃ' সূত্রানুসারে, 'হল্' (রেফ) অন্তবিশিষ্ট ধাতুরই বৃদ্ধি হইবে? তাহা হইলেই 'অকার্ষীৎ' 'অহার্ষীৎ' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে?

তবে 'ন্যস্তারীৎ' 'ন্যদারীৎ' এই সকল স্থলে দোষ হইবে। কারণ, 'স্তৃঞ্' ধাতু এবং 'দৄ'ধাতুর 'ঋ'কারের গুণ করিলে, 'র'পর বিশিষ্ট হইবে, সুতরাং 'ঋ' অন্তবিশিষ্ট না হওয়াতে, বৃদ্ধিও ('সিচিবৃদ্ধিঃ' সূত্রানুসারে,) প্রাপ্তি

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

হইবে না? ('বদব্রজ' সূত্রানুসারে) হলন্তলক্ষণসম্পন্ন ('র'পর বিশিষ্ট 'স্তর্' 'দর্') হওয়াতেও বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। কারণ, তাহাকেও আবার 'নেটি' সূত্র, নিষেধ করিবে। অতএব 'বৃদ্ধি' সর্ব্বতোভাবে নিষেধ হওয়াতে, 'অস্তারীৎ' 'অদারীৎ' ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না। (১)

এইরূপ ঋকারন্তও 'বৃঙ্' এবং 'বৃঞ্' ধাতুই কেবল অনিট্; আর যাবতীয় ঋকারান্ত ধাতু সেট্; অতএব, 'স্তৄ' এবং 'দৄ' ধাতুও ইডাদি হইয়াছে বলিয়া, 'অস্তারীৎ' 'অদারীৎ' প্রভৃতি স্থলে, দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—মাভূদেবম্। ল্রান্তস্যেত্যেবং ভবিষ্যতি। ইহ তর্হি অলাবীৎ। অপাবীৎ। গুণেকৃতেঽবাদেশে চানন্তাত্বাদ্বৃদ্ধির্ন প্রাপ্নোতি। হলন্তলক্ষণায়াশ্চ নেটিতি প্রতিষেধঃ। মাভূদেবম্। ল্রান্তস্যেত্যেবং ভবিষ্যতি। লান্তস্যেত্যুচ্যতে। নচেদং ল্রান্তম্। ল্রান্তেত্যত্র বকারোপি নির্দিশ্যতে। কিং বকারো ন শ্রূয়তে। লুপ্তনির্দ্দিষ্টো বকারঃ। যস্ত্বেবং মা ভবানবীৎ। মাভবান্ মবীৎ। অত্রাপি প্রাপ্নোতি।

অবিমব্যোরেতি বক্ষ্যামি। তদ্বক্তব্যম্। ন বক্তব্যম্। নিশ্বিভ্যাং তৌ নিমাতব্যৌ। যদ্যপ্যেতদুচ্যতে। অথবৈতর্হি নিশ্ব্যোঃ প্রতিষেধো ন বক্তব্যো ভবতি। গুণেকৃতেঽয়াদেশে চ যান্তানাং নেত্যেব প্রতিষেধো ভবিষ্যতি। এবং তর্হ্যাচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। ন সিচ্যন্তরঙ্গং ভবতীতি। যদয়মতো হলাদের্লঘোরিত্যকারগ্রহণং করোতি।

কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। অকারগ্রহণস্যৈতৎপ্রয়োজনম্। ইহ মাভূৎ। অকোষীৎ। অমোষীৎ। যদি সিচ্যন্তরঙ্গং স্যাৎ। অকারগ্রহণমনর্থকং স্যাৎ। গুণেকৃতে রপরত্বাদ্বৃদ্ধির্ন ভবিষ্যতি। পশ্যতি ত্বাচার্য্যো ন সিচ্যন্তরঙ্গং ভবতীতি ততোঽকার গ্রহণং করোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'স্তৄ' এবং 'দৄ' ধাতুর, 'ঋ'কারের গুণ হইয়া 'র'পর বিশিষ্ট ধাতু হইলে; এই পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রয়োগ সিদ্ধি নাইবা হইল। অতো ল্রান্তস্য।৭।২।২। (হ্রস্ব অকারের সমীপবর্ত্তী 'ল'কার এবং 'রেফ্', সেই 'রেফ্' 'লকার' অন্তে আছে যার তদন্তাঙ্গের 'অ'কারের বৃদ্ধি হয়, পরস্মৈপদী সিচ্ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, 'ল'কার রেফান্তের 'অ'কারের বৃদ্ধি হয়

(১) ত্বিষ্, তুষ্, দ্বিষ্, দুষ্, পুষ্য, পিষ, বিষ্, শিষ, শুষ্, শ্লিষ্যতয়ো, ঘসিঃ। (কৃষি) ষকারান্ত ধাতুর মধ্যে, ইহারাই 'অনিট্'। এতদ্ভিন্ন যাবতীয় 'ষ'কারান্ত ধাতু 'ইট্'।

বলিয়া, 'স্তৃ' ও 'দৃ' ধাতুর 'ঋ'কারের গুণ হইয়া রেফান্ত হইলেও, বৃদ্ধি হইয়া প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

যদি এইরূপই হয়; তবে 'অলাবীৎ' ('লুঞ্' ধাতু লুঙ্এর সিচ্এ), 'অযাবীৎ' (যু ধাতুর ঐরূপ) এই সকল স্থলে কি হইবে? কারণ 'লূ' এবং 'যু' ধাতুর গুণ করিলে অব্ আদেশ হইলে, 'উ'কার, অন্তে না হওয়াতে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না। 'বদব্রজ' সূত্রানুসারে হলন্ত লক্ষণের বৃদ্ধি করিতে গেলেও 'নেটি' সূত্রানুসারে প্রতিষেধ প্রাপ্ত হইবে।

এই প্রকারে নাইবা হইল, 'অতোল্‌রান্তস্য' সূত্রানুসারেই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

লরান্তস্য (রেফ্ লকারান্তের) বলিয়া সিদ্ধ বলিবে? ইহা ত 'ল'কারান্তও নয় রেফান্তও নয়?

ল্রান্ত এই স্থলে 'ব' কার ও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

'ব'কার শুনা যাইতেছে না কেন?

লোপ নির্দ্দিষ্ট বকার জানিতে হইবে; অর্থাৎ 'ব্ল্‌রান্তস্য' এইরূপ 'ব'কারাদি বিশিষ্ট সূত্র করা হইবে; কিন্তু 'লোপোব্যোর্বলি'। ৬।১।৬৬। ('ব'কার এবং 'য'কারের লোপ হয়, 'বল্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে) সূত্রানুসারে, 'ব'কারের লোপ জানিতে হইবে।

যদি এইরূপই হয়; তবে যে স্থলে 'অব' এবং 'মব' ধাতুর স্থলে, 'মাভবান্ অবীৎ, মাভবান্ 'মবীৎ' (১) প্রয়োগ হইয়াছে; সেই স্থলেও 'ব'কারান্ত ধাতুর 'অ'কারের বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে?

তাহা হইবে না। কারণ 'অব' ধাতু এবং মব' ধাতুর 'ব'কার পরে থাকিলে, 'অ'কারে বৃদ্ধি হয় না, এইরূপ বলিব।

তাহা হইলে, তাহাও ত বলিতে হইবে?

তাহা বলিতে হইলেও অতিরিক্ত কিছু বলা হইবে না। কারণ, 'নি' এবং 'শ্বি' দ্বারা তাহা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ 'হ্ম্যন্তক্ষণশ্বসজাগৃণিশ্ব্যেদিতাম্ ।৭।২।৫। (হ,ম এবং যকারান্তের, ক্ষণাদি ণ্যন্তের, শ্বি ধাতুরই দিতের, বৃদ্ধি হয় না, ইডাদি 'সিচ্' পরে থাকিলে) এই সূত্রের, নি, শ্বি পরিত্যাগ করিব, তৎপরিবর্ত্তে 'অব', 'মব' ধাতুর গ্রহণ করিব; তাহা হইলেই গৌরবও

(১) 'অব ধাতু' এবং 'মব' ধাতুর স্থানে, অবীৎ, এবং মবীৎ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

হইবে না ; অথচ প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে। আর যদি এইরূপ বলা যায় ; তবে 'ক্ষ্যন্ত * * *' সূত্রে, 'নি' এবং 'শ্বি'র প্রতিষেধও বলিতে হইবে না। কারণ 'নি' এবং 'শ্বি'র গুণ একার করিলে, 'এ'কার স্থানে 'অয়্' আদেশ হইলে ; সূত্রে, হকার, মকার এবং যকারান্তের বৃদ্ধি নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া, 'অয়্' আদেশও 'য'কারান্ত হওয়াতে, বৃদ্ধির প্রতিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

এইরূপ করিলে তবে, আচার্য্যের (পাণিনির) প্রবৃত্তি (সূত্রারম্ভের অভিপ্রায়)ই জ্ঞাপন করিবে যে, 'সিচ্' পরে থাকিলে, অন্তরঙ্গ কার্য্য হয় না। যেহেতু 'অতোহলাদের্লঘোঃ।৭।২।৭। ('হল্' আদিতে আছে এমন যে 'ধাতু', তাহার যে 'লঘু' অকার, তাহার বৃদ্ধি হয় বিকল্পে, 'ইট্' আদি বিশিষ্ট পরস্মৈপদী 'সিচ্'পরে থাকিলে) এই সূত্রে, 'অ'কারের গ্রহণ করিয়াছেন।

কেমন করিয়া (অকারগ্রহণ) জ্ঞাপক হইল ?

'অ'কার গ্রহণের ইহাই প্রয়োজন যে, 'অকোষীৎ' ('কুষ'ধাতু) অমোষীৎ ('মুষ' ধাতু) এই সকল স্থলে, 'উ'কার লঘু হইলেও 'অ'কার না হওয়াতে, 'বৃদ্ধি' না হয়। যদি 'সিচ্' বিষয়ে ও অন্তরঙ্গ কার্য্য হয় ; তবে 'অ'কারের গ্রহণই অনাবশ্যক হয়। কারণ, ('সার্বধাতুকার্ধকয়োঃ সূত্রানুসারে) গুণ করিলে, অর্থাৎ 'কোষ' 'মোষ' হইলে, লঘুত্বাভাবপ্রযুক্ত 'বৃদ্ধি' হইবে না। অতএব আচার্য্য ইহা দেখিয়াছেন যে, 'সিচ্' কার্য্যে, অন্তরঙ্গ হয় না ; সেই হেতুই 'অ'কার গ্রহণ (সূত্রে) করিয়াছেন।

ভাষ্যমূল।—নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। অস্ত্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্। যত্র গুণঃ প্রতিষিধ্যতে তদর্থমেতৎ স্যাৎ। ন্যকুটীৎ। ন্যপুটীৎ। যত্তর্হি শ্বিণ্যোঃ প্রতিষেধং শাস্তি তেন নেহান্তরঙ্গমস্তীতি দর্শয়তি। যচ্চ করোত্যকারগ্রহণং লঘোরিতি কৃতেঽপি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা ("অতো হলাদের্লঘোঃ" সূত্রে, 'অ'কার গ্রহণ) কখনও জ্ঞাপক হইতে পারে না। কারণ, বচনে (সূত্রে), ইহার ('অকার-গ্রহণের) অন্য প্রয়োজন আছে।

কি সেই প্রয়োজন ?

যেই স্থলে গুণের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, সেই স্থানের জন্য ইহা ('অ'কার-গ্রহণ) করা হইয়াছে। যেমন ;—'কুট'ধাতুর গুণনিষেধ (১) হওয়াতে, 'ন্যকুটীৎ' এবং 'পুট' ধাতুর গুণ নিষেধ হওয়াতে, 'ন্যপুটীৎ' (২) প্রয়োগ

(১) (২) গাঙ্কুটাদিভ্যো ঞ্ণিন্ ঙিৎ।১।২।১ (গাঙ্ আদের

সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব যেহেতু ণি এবং শ্বিতে বৃদ্ধির প্রতিষেধ করিয়াছেন, সেই হেতুই আচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, এই স্থলে ('সিচ্'এতে) অন্তরঙ্গ কার্য্য হয় না। আর যেহেতু, 'অতোহলাদের্লঘোঃ' সূত্রে, 'লঘু' গ্রহণ সত্ত্বেও 'অ'কার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ও আচার্য্য দেখাইয়াছেন যে 'সিচ্' বিষয়ে, অন্তরঙ্গ কার্য্য হয় না।

বার্ত্তিকমূল।—তস্মাদিগ্লক্ষণা বৃদ্ধিঃ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সেই হেতুই 'ইক্' লক্ষণসম্পন্নের বৃদ্ধি হইবে। *

ভাষ্যমূল।—তস্মাদিগ্লক্ষণাবৃদ্ধিরাস্থেয়া।

ভাষ্যানুবাদ।—সেই হেতুই, যাহাতে 'ইক্' লক্ষণসম্পন্ন বর্ণের বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য 'বৃদ্ধি' শব্দ ('ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রে) গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বার্ত্তিকমূলম্।—ষষ্ঠ্যাঃ স্থানে যোগত্বাদিগ্নিবৃত্তিঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত স্থানের যোগ রহিয়াছে বলিয়া, যাবতীয় 'ইক্'এর নিবৃত্তি হইয়া যাইবে।*

ভাষ্যমূল।—ষষ্ঠ্যাঃ স্থানে যোগত্বাৎ সর্ব্বেষামিকাং নিবৃত্তিঃ প্রাপ্নোতি। অদ্যাপি প্রাপ্নোতি। দধি। মধু। পুনর্বচনমিদানীং কিমর্থং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, 'ইকঃ' শব্দ ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'ষষ্ঠী স্থানে যোগা' ।১।১.৪৯ (যে ষষ্ঠী দ্বারা, কোন সম্বন্ধ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহার স্থানে হয়, এরূপ জানিতে হইবে) এই সূত্রানুসারে 'ইকঃ' এই ষষ্ঠী দ্বারা যাবতীয় 'ইক্' এরই স্থানে, 'গুণ' বা বৃদ্ধি' হইতে থাকিবে। অতএব 'ইক্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, কুত্রাপি দেখা যাইবে না। সুতরাং 'দধি' শব্দের 'ই'কার এবং 'মধু' শব্দের 'উ'কারও নিবৃত্তি হইয়া 'এ'কার এবং 'ও'কার (দধে, মধো) প্রাপ্ত হইবে।

যদি তাহাই হয় তবে পুনরায় বচন (সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রে, গুণবিধান প্রভৃতি) কি জন্য?

বার্ত্তিকমূল।—অন্যতরার্থং পুনর্বচনম্।*।

হইয়াছে এমন যে ধাতু তাহার, এবং কুটাদিগণ পঠিত ধাতুর, ঞ ইৎ এবং ণ ইৎ ভিন্ন প্রত্যয় পরে থাকিলে, ঙিৎ সংজ্ঞা হয়) এই সূত্রানুসারে, কুটাদি-গণপঠিত কুট এবং পুট ধাতুর ঙিৎ সংজ্ঞা হইয়াছে। অতএব 'ক্ঙিতি চ' সূত্রানুসারে, গুণের নিষেধ হইবে।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অন্যতর অর্থাৎ গুণ বা বৃদ্ধির মধ্যে কোনও একটী হওয়া জন্য পুনর্ব্বচন। *।

ভাষ্যমূল।—অন্যতরার্থমেতৎ স্যাৎ। সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োর্গুণ এবেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা ('ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রানুসারে গুণ এবং বৃদ্ধি প্রাপ্তি সত্ত্বেও, গুণ বা বৃদ্ধি বিধায়ক সূত্রে), গুণ বা বৃদ্ধিরূপ দুই কার্য্য একত্র না হইয়া, ইহার কোনও একটী কার্য্য হওয়ার জন্য করা হইয়াছে। যেমন,— 'সার্বধাতুকয়োঃ' সূত্রে, ইগন্তাঙ্গের গুণ বিধান করা হইয়াছে; অতএব এই স্থলে, যাহাতে গুণই প্রাপ্তি হয়; কিন্তু বৃদ্ধি প্রাপ্তি না হয়, এই জন্য, বচনের (সূত্রের) প্রয়োজন।

বার্ত্তিকমূল।—প্রসারণে চ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সংপ্রসারণেও যাবতীয় 'যণ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের নিবৃত্তি প্রাপ্তি হইবে? *

ভাষ্যমূল।—প্রসারণে চ সর্বেষাং যণাং নিবৃত্তিঃ প্রাপ্নোতি। অন্যাপি প্রাপ্নোতি। যাতা। বাতা।

পুনর্বচনমিদানীং কিমর্থং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—'সংপ্রসারণ' কার্য্যেও সকল 'যণ্'এর নিবৃত্তি প্রাপ্তি হইবে। অতএব 'যা' ধাতুর এবং 'বা' ধাতুর স্থানে 'য'কার বা 'ব'কারের সংপ্রসারণ হইয়া, 'ই'কার বা 'উ'কার প্রাপ্তি হইবে; সুতরাং 'যাতা,' 'বাতা' এইরূপ প্রয়োগেরও নিবৃত্তি প্রাপ্তি হইবে।

যদি তাহাই হয়; তবে এক্ষণে পুনরায় বচন (সূত্র) করিবার প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূল।—বিষয়ার্থং পুনর্বচনম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—প্রাপ্য বিষয় নির্ব্বাহের জন্য পুনরায় বচন (সূত্র) করা কর্ত্তব্য। *

ভাষ্যমূল।—বিষয়ার্থমেতৎ স্যাৎ। বচিস্বপিযজাদীনাং কিত্যেবেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যে স্থলে সংপ্রসারণের বিষয় প্রাপ্তি হওয়া উচিত, সেই স্থলেই যাহাতে সংপ্রসারণ হয়; সেইজন্য বচন (সূত্র) করা কর্ত্তব্য। যেমন;—'বচিস্বপিযজাদীনাং কিতি' ।৬।১।১৫। ('বচ্' ধাতু, 'স্বপ্' ধাতু এবং যজাদিধাতুর সংপ্রসারণ হয়, কিৎ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, কেবল 'ক'কার ইৎ পরে থাকিলেই, যাহাতে সূত্রোক্ত ধাতু সমূহের সংপ্রসারণ হয়, অন্যত্র না হয়, এই জন্য বচন করা কর্ত্তব্য।

সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ।

(রামকৃষ্ণ মিশন, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ ; রবিবার।)

পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে, আজ তাহার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিব। কারণ, তাহা হইলে সেই সকল বিষয় মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইবে। প্রথমে আমরা দেখিয়াছি, বেদ কাহাকে বলে। বেদ অর্থে জ্ঞান; ভগবানের অনন্ত জ্ঞান, যাহা তাঁহার সহিত অনন্তকাল অবস্থিত রহিয়াছে। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রে বলে, বেদ অনাদি। যদিও আমরা উহা পুস্তকাকারে লিখিত দেখিতে পাই, কিন্তু এই পুস্তকের বিষয় তিন কালেই বর্ত্তমান, তাহার আদি নাই। এই অনাদিজ্ঞান কখন কোন ভাগ্যবানের নিকট আবির্ভূত হন। যাঁহারা এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহাদিগকে ঋষি বলে। ঋষি অর্থে মন্ত্রদ্রষ্টা। এই জ্ঞান কেবল যে এক জাতীয় লোকের নিকটেই আবির্ভূত হন, তাহা নহে। বেদে অনেক স্ত্রীলোক ঋষি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সত্যকামাদি জারজ ব্যক্তিও ঐ জ্ঞানপ্রভাবে ঋষি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই জ্ঞান সকলেরই নিকট জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে উপস্থিত হইতে পারে। পূর্ব্বে বৈদিক কালে ব্রাহ্মণত্ব জাতিগত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহা গুণগত ছিল। বেদের অনেক স্থলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে একবর্ণ ছিল, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ কথা আছে যে, পূর্ব্বে কেবল ক্ষত্রিয় বর্ণ ছিল, পরে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইল। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বেদের প্রাচীন অংশ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যগণ কেবল পঞ্চনদের গুণ গান করিতেছেন এবং আপনাদের পূর্ব্ব বাসস্থান অত্যন্ত শীতল দেশ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। এই সময়ে তাঁহারা নূতন দেশে আসিয়া আদিমনিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন এবং স্বভাবতঃ ধর্ম্ম অনুসারে সকলে, ক্ষত্রিয় বল, ব্রাহ্মণ বল, এক জাতিই ছিলেন। পরে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত ও অধিক জ্ঞান সম্পন্ন হওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। প্রথমে এই ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব কতকগুলি গুণের সমষ্টি মাত্র হওয়াই সম্ভবে। অথবা স্বভাবপ্রেরিত গুণ যুদ্ধ বিগ্রহ, যজ্ঞোপাসনাদি কর্ম্মানুসারেই হওয়া সম্ভব। গুণ ও কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্বাদি চিরকালই জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে ও থাকিবে। কিন্তু জাতিগত ব্রাহ্মণত্ব মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতির সহিত ক্রমশঃ তিরোধান হইবে। এই ব্রাহ্মণত্ব

ক্ষত্রিয়ত্ব গুণ আবার ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বা পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন জাতি ব্রাহ্মণত্বগুণসম্পন্ন, যেমন প্রাচীন আর্য্যগণ ছিলেন। এবং ভারতে এখনো সত্ত্বগুণবিশিষ্ট যথার্থ ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন দুই চারিটী লোক দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশে ইহা আরো বিরল। এইরূপ আধুনিক ইউরোপীয় জাতিরা ক্ষত্রিয়গুণসম্পন্ন। ইংরাজ জাতিতে বৈশ্য গুণের অধিক সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন সময়ে কোন এক গুণ অধিক প্রবল দেখা যায়। বর্ত্তমান কাল বৈশ্য-গুণ-প্রধান। বৈশ্য গুণহীন লোকের একালে অধোগতি প্রাপ্তি হইতেছে। যাহাদের ঐ গুণ প্রবল, তাহারাই উন্নত হইতেছে। মহাভারতেও আমরা এই কথা দেখিতে পাই। পূর্ব্বে এক জাতি ছিল, পরে গুণ কর্ম্ম ভেদে জাতি-ভেদ হইয়াছে। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, গুণ ও কর্ম্মের বিভাগদ্বারা আমি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব সদ্গুণসম্পন্ন হইলেই বেদে অধিকার হইত ও এখনও হওয়া উচিত। আমরা দেখিয়াছি, বেদ দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হওয়ার কথা কথিত আছে। স্বর্গ অর্থে পৃথিবী অপেক্ষা কোন উচ্চতর লোক; যেখানে অধিককালস্থায়ী সুখ ভোগ করিতে পারা যায়। কিন্তু এই সুখ ভোগের পর আবার মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। আমাদের শাস্ত্রোক্ত দেবতা সকল ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, প্রভৃতি একটী একটী পদমাত্র। যে কেহ কর্ম্মদ্বারা উচ্চগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইন্দ্র হইয়াছেন ও সেই পদে কিছু দিন অবস্থান করিয়া আবার তাঁহার পতন হইয়াছে। মনুষ্য মাত্রেই কর্ম্মদ্বারা এই পদলাভ করিতে পারেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ড স্বর্গাদি লোক লাভের উপায় বলিয়া দেয়। কিন্তু ঐ সকল সুখও নিত্য নয়। সেই জন্য মনুষ্য তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। তাহার প্রাণ নিত্যবস্তুলাভের জন্য লালায়িত। বেদের জ্ঞানকাণ্ডে সেই নিত্য পদার্থের বিষয়ই বর্ণিত আছে। আমরা দেখিয়াছি, শাস্ত্রে সৃষ্টি অনাদি বলিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্মে সৃষ্টির আদি আছে, এরূপ কথা বলে। বলে, এমন এক সময় ছিল, যখন সৃষ্টি আদৌ ছিলনা। ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু বেদ তাহা বলেন না। সৃষ্টির আদি আছে বলিলে ভগবানে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ আসিয়া পড়ে। জগতের এই যে বিষমতা দেখিতেছি, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী ইত্যাদি, সৃষ্টির আদি থাকিলে ঈশ্বর তাহার কারণ হন। সুতরাং

পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। এবং ২য়তঃ তিনি নিষ্ঠুর হন। কিন্তু সৃষ্টি অনাদি হইলেও সৃষ্টির বিকাশাবস্থা অনাদি নহে। কখন প্রকাশিত কখন লুপ্তাবস্থায় বীজ ও বৃক্ষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া সৃষ্টি অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত রহিয়াছে। যেমন ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, আবার সেই বৃক্ষ কালে বীজে পরিণত হয়, সেইরূপ সৃষ্ট জগৎ কখন বীজরূপ ও কখন প্রকাশরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা ভগবান হইতে নির্গত, ভগবানেরই অংশ, তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। ভগবান বলিতেছেন, জগৎ আমার এক অংশ মাত্র। যদি সৃষ্টি অনাদি হইল, তবে এই বৈষম্যের কারণ কি? শাস্ত্র বলেন, এই বৈষম্যের কারণ কর্ম্ম। সুতরাং কর্ম্মও অনাদি। আমাদের সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইতেছে। কর্ম্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। কর্ম্মের সহিত তাহার ফল নিত্যসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। কর্ম্ম করিলে তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে; তবে মুক্তি কিরূপে সম্ভবে? নিষ্কাম ভাবে, নিঃস্বার্থ হইয়া কায করিলে কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতা সমগ্র বন্ধন নাশ করিয়া দেয়। ইহাকেই কর্ম্মযোগ কহে। এক কথায়, বলিতে গেলে স্বার্থশূন্য হওয়াই ধর্ম্ম। কি কর্ম্মযোগী, কি ভক্তিযোগী, কি জ্ঞানযোগী, সকলেই নিঃস্বার্থ হইতে চেষ্টা করিতেছে। কেহ আমি আমি করিয়া কেহ বা তুমি তুমি করিয়া পূর্ণ নিঃস্বার্থতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সকলেই ছোট স্বার্থপর 'আমি' জ্ঞান, ভূমা মহান্ আমিতে ডুবাইতে চেষ্টা করিতেছে। কেহবা সর্ব্বভূতে সেই এক আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সেই মহান্ আমিকে সকলের ভিতর দেখিতে চেষ্টা করিতেছে। অপর কেহ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানকেই সর্ব্বত্র দেখিতে চেষ্টা করিতেছে। বুঝিয়া দেখিলে দুই পথের উদ্দেশ্যই এক, কেবল নামের ভিন্নতা মাত্র প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখিয়াছি, কর্ম্মে কোন দোষ নাই। কর্ম্মের ভাল মন্দ গুণ আমাদের নিজের ভাব লইয়া হইয়া থাকে। আমরা যখন যে ভাবে কার্য্য করি, আমাদের কার্য্য সেই ভাবে ভাল বা মন্দ হইয়া থাকে। একটী কার্য্য আশ্রয় না করিয়া অন্য একটী কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারি না। নীচকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উচ্চতর কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ক্রমে নিঃস্বার্থ হইতে পারিব। যে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, সে বিবাহ করিলে তাহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত স্বার্থত্যাগই হইবে কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে বিবাহ তদ্বিপরীত স্বার্থপরতা বৃদ্ধিরই পরিচায়ক হইবে। একের পক্ষে যাহা

নিঃস্বার্থ কর্ম, অপরের পক্ষে তাহাই আবার স্বার্থপর কর্ম। যে যেমন অবস্থায় অবস্থিত, সেই অবস্থায় তাহার সম্বন্ধে যাহা ঈশ্বরপথে অগ্রসর হইবার প্রতিবন্ধকতা করে, তাহাই তাহার সম্বন্ধে সংসার। তাহার সেই সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। কাহার কাম কাহার ক্রোধ কাহার ধন ঈশ্বর পথের কণ্টক; তাহাকে তাহাই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু পরিত্যাগ করিতে হইলে পূর্ব্বে আর এক উচ্চতর বিষয় অবলম্বন করিতে হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় উঠিতে হইবে, নিঃস্বার্থ হইতে হইবে, পরে এমন অবস্থা উপস্থিত হইবে, যখন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া কার্য্য করিতে পারিবে। আমরা দেখিয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যেরূপ কার্য্য, পর পর জন্মে সেইরূপ দেহাদি প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসমূহ দ্বারা মনুষ্য এরূপ পিতামাতা প্রাপ্ত হয়, যাঁহারা তাহাকে ঐরূপ দোষ বা গুণযুক্ত দেহাদি প্রদান করিতে পারেন। আপাততঃ দেখিলে সন্তানে দোষ গুণ অনুক্রামিত হওয়ার কারণ পিতামাতাই বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক সন্তানের কর্ম্মই ঐরূপ পিতা মাতা অন্বেষণ করিয়া লয়। এই কর্ম্ম করিবার শক্তি কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? আমরা দেখিয়াছি, এই দৃষ্ট স্থূল ব্রহ্মাণ্ড এক বিরাট দেহ। আমাদের এই সকল ক্ষুদ্র দেহ সেই বিরাটেরই অংশ মাত্র। সেইরূপ আমাদের মনসমূহও সেই বিরাট মনের অংশ মাত্র। আমাদের শরীর ও মনের পুষ্টি সেই বিরাট শরীর ও মন হইতেই নিত্য হইতেছে। আহার ও নিশ্বাসের দ্বারা শরীরে যাহা গ্রহণ করি, তাহা সেই অনন্ত বিরাটেরই অংশ। আমরা না জানিলেও আমাদের মনের পুষ্টিও সেইরূপ বিরাট মন হইতেই হইয়া থাকে। নূতন জল যেমন আবর্ত্তে আসিতেছে ও যাইতেছে কিন্তু আবর্ত্ত একইরূপ দেখিতেছি, সেইরূপ দেহ ও মন একই রূপ দেখিতে থাকিলেও সেই বিরাট দেহ ও মন হইতে তাহাদের উপাদান আমরা অবিরত গ্রহণ করিতেছি। ভগবানের অনন্ত শক্তি সকলেরই অন্তরে নিহিত রহিয়াছে। তাঁহা হইতেই আমরা নিজ নিজ শক্তি গ্রহণ ও বিকাশ করিতেছি। এই শক্তির অপব্যয় না করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলেই জীবনের মহান্ লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিব।

মন্ত্রযোগ।

(শ্রীযুক্ত নারায়ণ ব্রহ্মচারী)

সর্ব্বজীবহিতকারী এবং অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পূর্ণ সনাতন ধর্ম্মে যত প্রকার ঈশ্বরোপাসনাসম্বন্ধীয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিকারী সাধন নিয়ম প্রচলিত আছে, আচার্য্যগণ সে সকলকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়াছেন যথা—

মন্ত্রযোগো লয়শ্চৈব রাজযোগো হঠস্তথা।
যোগশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তঃ যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

তত্ত্বদর্শী যোগিগণ যোগধ্যানের ক্রিয়াসিদ্ধাংশকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা, মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ এবং রাজযোগ।

উপস্থিত এই প্রবন্ধে প্রথম অধিকাররূপ মন্ত্রযোগের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এবং সাধন নিয়মাদি বর্ণন করা যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজের মধ্যে মন্ত্রযোগের সাধননিয়মসমূহের অধিক চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, আমরা প্রথমে এই পরমাবশ্যকীয় মন্ত্রযোগের লক্ষণাদি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি—

কার্য্যং যত্র বিভাব্যতে কিমপি তৎস্পন্দনং সব্যাপকম্
স্পন্দশ্চাপি তথা জগৎসুবিদিতঃ শব্দান্বয়ী সর্ব্বদা।
সৃষ্টিশ্চৈব তস্মাদিয়ম্ কৃতিবিশেষত্বাদভূৎ স্পন্দিনী—
শব্দশ্চোদভবত্তদা প্রণব ইত্যোঙ্কাররূপঃ শিবঃ॥

যে স্থলে কোন কার্য্য হয়, তাহা সর্ব্বদাই স্পন্দ (কম্পন) যুক্ত হইয়া থাকে এবং স্পন্দমাত্রই শব্দযুক্ত, ইহা জগতে বিদিত আছে। আদি সৃষ্টি কার্য্যবিশেষ বলিয়া স্পন্দবিশিষ্ট হইয়াছিল এবং সেই সময় যে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার নাম মঙ্গলাত্মক প্রণব অথবা ওঁকার।

সাম্যস্থপ্রকৃতের্যথৈব বিদিতঃ শব্দো মহানোমিতি
ব্রহ্মাদিক্রিয়াত্মকস্য পরমং রূপং শিবং ব্রহ্মণঃ।
বৈষম্যে প্রকৃতেস্তথৈব বহুধা শব্দাঃ শ্রুতাঃ কালতঃ
তে মন্ত্রাঃ সমুপাসনার্থম্ অভবন্ বীজানি নাম্না তথা॥

প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় শব্দ যে রূপ ব্রহ্মাদি ত্রিবেদাত্মক এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ ওঁকার উৎপন্ন হইয়াছিল, তদ্রূপ উক্ত প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থায়

কালক্রমে নানাবিধ শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। উক্ত শব্দ সকল উপাসনার উপযোগীমাত্র হইয়াছে এবং নামতঃ উহাদিগকে বীজমন্ত্র কহে।

জগতি ভবতি সৃষ্টিঃ পঞ্চভূতাত্মিকা যৎ
তদিহ নিখিলসৃষ্টিঃ পঞ্চভাগৈর্বিভক্তা।
শ্রুতিরপি বিধিরূপেণাদিশত্তীহ পঞ্চ
বিবিধবিহিতপূজারীতিভেদান্ জনানাম্॥

জগতের সমস্ত সৃষ্টি পঞ্চভূতাত্মিকা বলিয়া সমুদায় সৃষ্টিকে পঞ্চভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই হেতু শ্রুতিও লোকদিগের মঙ্গলার্থ পঞ্চবিধ বৈধ পূজার বিধান করিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছে। এজন্য সৌর, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর এবং গাণপত্য এই পঞ্চপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। উপরোক্ত শাস্ত্রীয় বর্ণন সমূহ পাঠ করিলে, পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ কিরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়া এই সর্ব্বজীবহিতকারী মন্ত্রযোগের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এখন দেখা যাউক, পঞ্চতত্ত্বসম্বন্ধীয় পঞ্চ উপাসনার সহিত পঞ্চপ্রকার সাধকের কিরূপ অধিকার নির্ণীত আছে। এই সম্বন্ধে কাপিল-তন্ত্ররাজে বর্ণিত আছে যে,—

নভসোঽধিপতির্বিষ্ণুরগ্নেশ্চৈব মহেশ্বরী।
বায়োঃ সূর্য্যঃ ক্ষিতেরীশো জীবনস্য গণাধিপঃ॥

বিষ্ণু আকাশের, মহেশ্বর অগ্নির, সূর্য্য বায়ুর, মহেশ্বর ক্ষিতির এবং গণাধিপ জলের অধিপতি, এইরূপ তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সাধকের প্রকৃতি আকাশতত্ত্বপ্রধান, তাহাকে বিষ্ণু উপাসনা, যাহার অগ্নিতত্ত্বপ্রধান, তাহাকে শক্তি উপাসনা, যাহার পৃথিবীতত্ত্বপ্রধান, তাহাকে শিব উপাসনা, যাহার বায়ুতত্ত্বপ্রধান, তাহাকে সূর্য্য উপাসনা এবং যাহার প্রকৃতি জলতত্ত্বপ্রধান, তাহাকে গণেশ উপাসনার উপদেশ দেওয়া তন্ত্রশাস্ত্রের অনুমোদিত। উপাসনার এই পঞ্চবিভাগ ব্যতীত প্রত্যেক বিভাগের বিস্তৃত অন্তর্বিভাগ থাকা নিবন্ধন, প্রত্যেক দেবতার নানারূপ মূর্ত্তি প্রচলিত আছে। যথা, শাক্তগণের মধ্যে দশমহাবিদ্যাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে; এবং সাধন অধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্রে দুই প্রকার পূজারীতি বর্ণনা আছে;—যথা বহিঃপূজা এবং মানসপূজা। এই প্রকার জপেরও তিন-প্রকার বর্ণনা আছে—যথা বাচনিক, উপাংশু এবং মানস জপ।

প্রকৃতিমিহ জনানাম্ সম্পরীক্ষ্য প্রবৃত্তিং
গুরুরিহ যদি দদ্যাৎ মন্ত্রশিক্ষাং যথাবদ্।
রুচিসমুচিতদেবোপাসনামাদিশেদ্বা
ব্রজতি লঘু স শিষ্যো মোহপারং মুমুক্ষুঃ॥

লোকসমূহের স্বাভাবিক প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া শ্রীগুরুদেব যদি যথাশাস্ত্র মন্ত্রশিক্ষা প্রদান করেন এবং প্রবৃত্তি অনুসারে বিশিষ্ট দেব উপাসনার উপদেশ করেন, তাহা হইলে তাহার মোক্ষাভিলাষী শিষ্য অতি শীঘ্রই মোহপারে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

শাস্ত্রকারেরা কোন বিষয়ই ছাড়িয়া দেন নাই। যদি শ্রীগুরুদেবের প্রত্যেক জিজ্ঞাসুর প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি পরীক্ষা করিবার অবসর না থাকে, তাহা হইলে সেই স্থলে মন্ত্রোদ্ধারের ও দেবতোদ্ধারের অন্যান্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এখন এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, শ্রীগুরুদেব কিরূপে শিষ্য-সমূহের প্রকৃতিবৈচিত্র্য পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন? এ সম্বন্ধে তন্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়,—

গুহ্যাৎ গুহ্যতরম্ ভেদম্ তত্ত্বজ্ঞানম্ বিশেষতঃ।
অনুকূলং দেবভাবং স্বরজ্ঞানাৎ বিচার্য্যতে॥

পুনশ্চ দেখিতে পাওয়া যায়—

যথা প্রজ্ঞানভাষন্তে, যথা নাস্তিঃ স্বরোদয়ঃ।
তথা কুলকুলম্ চক্রম্ সিদ্ধিদায়ি প্রকীর্ত্তিতং॥

অর্থাৎ গুহ্য হইতে অতিগুহ্য বিষয় সকল, বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞান এবং তত্ত্বের অনুকূল উপাস্য দেবতার নিরাকরণ স্বরোদয় শাস্ত্রের দ্বারা হইয়া থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ অধিকারীর নিয়ম বর্ণিত আছে যে, যাহার প্রজ্ঞারূপ পূর্ণ এবং অভ্রান্ত জ্ঞান প্রকাশ না পাইয়াছে, এরূপ গুরু স্বরোদয় শাস্ত্রের গ্রহণ করিবেন এবং যিনি উভয়েতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তিনি অন্যান্য জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় চক্রাদি দ্বারা শিষ্যের উপাসনা সম্বন্ধীয় অধিকারের পরীক্ষা করিয়া লইবেন। উক্ত চক্রাদির গণনা জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে হইয়া থাকে। এই চক্রের গণনা দ্বারা সাধক কোন্ দেবতার উপাসনা এবং মন্ত্রজপের উপযুক্ত, তাহা সহজেই জানা যায়।

শিশ্নোদরপরায়ণতা এবং ঘোর প্রমাদপূর্ণ এই বর্ত্তমান কাল প্রভাবে এখন আর কেহ দীক্ষা দিবার জন্য এত পরিশ্রম স্বীকার করেন না। এমন কি,

ভারতের অনেক স্থানে দীক্ষাদি ক্রিয়া একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে, এবং যদিও কোন কোন স্থানে আর্য্যসদাচারের শাসন অথবা সামাজিক শাসন অনুসারে কিছু কিছু দীক্ষাদি গ্রহণ রীতি আছে, তাহাও শিষ্যগণ এক তামসিক ক্রিয়ার ন্যায় মনে করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতনিবন্ধন পৃথিবীর বর্ত্তমান অন্যান্য উপধর্ম্মের রীত্যানুযায়ী নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ভাব প্রচার করণার্থ আপন আপন সাম্প্রদায়িক দেবতা ও মন্ত্রকে সর্ব্বজীবহিতকারী বিবেচনা করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং তাঁহাদিগের নিকট কোন জিজ্ঞাসু উপস্থিত হইলে উহাদিগকে আপনাদিগের সাম্প্রদায়িক মন্ত্র উপদেশ দিয়া দীক্ষাগুরুর সম্মানার্থে বার্ষিক বা মাসিক একটী করিয়া বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া থাকেন। তন্ত্রশিরোমণি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শ্রীভগবান সদাশিব জগন্মাতা পার্ব্বতীদেবীকে বলিয়াছেন, হে দেবি! করাল কলিকালে শিষ্যের সন্তাপহারক গুরু দুর্লভ হইবেন। এবং ঐ সময়ের উপদেষ্টাগণ কেবল শিষ্যের বিত্তাপহরণে তৎপর থাকিবেন। ফলতঃ শ্রীভগবানের ঐ আজ্ঞানুসারে আর্য্যজাতির মধ্যে এখন কার্য্যতঃ ঐরূপ উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

হা সনাতন ধর্ম্ম! বর্ত্তমান কালে তোমারও যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, আচার্য্য এবং দীক্ষাগ্রহীতাগণেরও তদ্রূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে!!

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা প্রধান আবশ্যকীয় এবং প্রথম অধিকারের সাধনরূপ মন্ত্রযোগ সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক লক্ষণাদি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, ভবিষ্যতে অন্যান্য যোগসাধনসম্বন্ধীয় লক্ষণ যথাক্রমে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

অভাব।

(শ্রীপার্ব্বতীচরণ মিত্র।)

এই পরিদৃশ্যমান জগতের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই যেন এক ঘোর অস্থিরতা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইতে নিম্নতম বিকাশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অস্থিরতা দৃষ্ট হয়। প্রাণীই হউক, অপ্রাণীই হউক, যেন কি এক অস্থিরতা দ্বারা অভিভূত হইয়া সকলেই নিজ নিজ গতিতে চলিতেছে; যেন অস্থিরতাই তাহাদের প্রকৃতি। ব্রহ্ম হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত

অস্থিরতাই যেন সকলের স্বরূপ। ব্রহ্ম কল্পপ্রারম্ভে কি যেন এক ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সৃজিত হন। যেই বিকাশ, সেই অস্থিরতা ; কারণ, যেস্থানে অস্থিরতা নাই, সেস্থানে বিকাশও নাই। বিকাশ থাকিলেও তাহা মানবমনের অগোচর। আমরা যাহা করি, তাহাতেই অস্থিরতা বিদ্যমান। দর্শনকালে দৃশ্য বস্তুর কম্পন দ্বারা নিকটবর্ত্তী অদৃশ্য পদার্থ ইথার (Ether) স্পন্দিত হইয়া, চক্ষুতে আঘাত করে। আঘাত স্নায়ুমণ্ডলিতে এক প্রকার কম্পন সৃজন করিয়া ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও আত্মা পর্য্যন্ত পৌঁছিলে, আমাদের দর্শনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই প্রকার যাহা স্পর্শ করি, কি শ্রবণ করি, কি আঘ্রাণ করি, কিম্বা যাহাই করি না কেন, অস্থিরতাই তাহার মূলে অবাস্থিত। ব্রহ্মের অস্থিরতা দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির সৃষ্টি। ব্রহ্মাদির অস্থিরতা হেতু পৃথিব্যাদির উৎপত্তি। আবার পৃথিব্যাদির অস্থিরতার শেষ নাই। চন্দ্র পৃথিবী হইতে, পৃথিবী সূর্য্য হইতে যেন দৌড়াইয়া পলাইতেছে, যেন কি এক অভাবনীয় জ্বালায় জ্বলিতেছে, যেন কোন শীতল সাগরে ডুবিয়া গাত্রজ্বালা নিবারণ করিবে। সেই রকম বৃক্ষ, লতা, মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতির দুর্দ্দমনীয় অস্থিরতা দেখা যায়। এই যে জগদ্ব্যাপী অস্থিরতা দেখা যায়, ইহার কারণ কি? যে অস্থিরতা আব্রহ্মস্তম্বের যেন স্বরূপ, তাহার মূল কি? ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, অভাবই ইহার মূল। যেখানে অভাব, সেখানেই অস্থিরতা। আকাশের কোন অংশ হইতে যন্ত্র দ্বারা বায়ু অপসরণ করিলে অমনি অন্যান্য অংশের বায়ুগুলি হু হু করিয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হয় ; জলরাশি হইতে কতক পরিমাণে জল সরাইয়া লইলে তৎক্ষণাৎ অন্য স্থান হইতে জল যেন প্রাণপণে দৌড়াইয়া সেস্থানে যায়, যেন ইহাদের মধ্যে কি এক ভয়ানক গণ্ডগোল উপস্থিত; যেন সেখানে না গেলেই নয়, সেখানে না গেলে আর প্রাণ বাঁচে না। মানবের মধ্যেও সেরূপ একজনের জন্ম হইলে অমনি সে সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত, অমনি তাহার অস্থিরতা আসিয়া উপস্থিত। জন্ম হওয়া মাত্র শিশু কাঁদিয়া উঠে। সে ত হাসিলেও পারিত, সে কাঁদিয়া উঠিল কেন? কাঁদা কিসের লক্ষণ? অভাব আসিলেই আমরা কাঁদিয়া থাকি। তবে বালকের কিসের অভাব? সে এইমাত্র জন্মিল, তাহার আবার অভাব কি? অভাব বুঝিতে হইলে বুদ্ধির আবশ্যক। তবে কি তাহার জন্মমাত্র বুদ্ধি জন্মিল? তাহা নয়, অভাব তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল, সে যেখানে যায়, অভাব তাহার

সাথে সাথে ছায়ার মত চলিয়া যায়, তাহার বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক, অভাব তাহার কাছছাড়া হইবে না। আরও তাহার অভাব দেখা যায়; স্তন মুখে দেওয়া মাত্র সে ঠাণ্ডা হয়, তাহার যেন সমস্ত জ্বালা চলিয়া যায়, সে দুধ টানিতে থাকে। কেন সে ঠাণ্ডা হয় ও দুধ টানে? তাহার অভাব আছে। তখন তাহার অভাব সেইরূপে প্রতীয়মান হওয়ায় ইহাদের দ্বারা নিবারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিছুকাল পরে স্তনে আর সকল সময়ে তাহার অভাব দূর হয় না, সে কখন হাত নাড়ে, কখন পা নাড়ে, তাহাতেই সে সুখ পায়, না নাড়িতে পারিলে ভয়ানক কষ্ট। ক্রমে কখন খেলানায়, কখন হুড়াহুড়িতে, কখন কথাবার্ত্তা ইত্যাদিতে সে আনন্দ পায়, অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে কখন মাতা পিতাকে, কখন ভাই ভগ্নিকে, কখন স্ত্রীপুত্রকে, কখন এটাকে, কখন ওটাকে, ভালবাসে। কিন্তু কোথাও তাহার শান্তি নাই, কোথাও তাহার জ্বালা নিবারিত হয় না। শান্তি পাইবে কি প্রকারে, গোড়ায় যে অভাব লাগিয়া রহিয়াছে। অভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে দৌড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু কোথাও জ্বালার শেষ নাই, কোথাও তাহার শান্তির উপায় নাই। সে একটী ছাড়িয়া অন্যটী ধরে, মনে করে, বড়ই শান্তি পাইবে, সকল জ্বালা নিবিয়া যাইবে। চেষ্টা উদ্যমের শেষ নাই, অবশেষে লাভ হইল; কিন্তু তাহার নিশ্চিন্ততা কোথায়? যে জ্বালা সে জ্বালা রহিয়া গেল! অভাব রূপান্তর ধারণ করিল। আবার তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য একটীর দিকে ধাবিত। কেন সে বিভিন্ন বস্তুর দিকে ধাবিত হয়? যাহাকে এক সময় প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসিতে চেষ্টা করিত, আবার তাহাকে সর্পের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া অন্যের প্রতি কেন সে ধাবিত হয়? কেন তাহার অভিলষিত বস্তু দ্বারা অভাব দূর হয় না? তাহার অভাব আছে সত্য, বিভিন্ন বস্তুও ত আছে, তবে কেন তাহার অভাব দূর হয় না? অভাব দূর হইবে কি প্রকারে? যাহার অভাব, তাহা না পাইলে অভাব দূর হইবে কি করিয়া? তবে কি এই জগতে কিছুই নাই যে, তাহার অভাব দূর করিতে পারে? প্রকৃত পক্ষে, ইহাই সত্য। জগতে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা কাহারও অভাব দূর করিতে পারে; যদিও কোন কোন বস্তু কোন কোন অভাব দূর করিতে বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু বাস্তবিক এই সকল অভাব আমাদের মোটেই নাই, দূর করিবে কিসে। অভাব যদি থাকিবেই, দূর হয় না কেন? অভাব আমাদের এক বস্তুর; কারণ, যাঁহাদের

অভাব দূর হইয়াছে, যাঁহারা শান্তি পাইয়াছেন, তাঁহারা কেবল এক বস্তু দ্বারাই শান্তি পাইয়াছেন। সুতরাং অভাব একটীর বই দুইটীর হইতে পারে না। যদিও বিভিন্ন বস্তুর অভাব দেখিতে পাই, তথাপি এই সকল আপাততঃ প্রতীয়মান অভাব আমাদের নাই। ইহারা মরীচিকাসদৃশ, আকাশকুসুম তুল্য, অস্তিত্বশূন্য, মায়া মাত্র। তবে আমাদের অভাব কিসের? যদি অভাব একটী বস্তুর হয়, তবে সে বস্তুটী কি? সে বস্তুটী মুক্তি, আমরা যাহা ছিলাম, আবার তাহা হওয়া। আমরা "শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপাবিদ্ধম্" ছিলাম, এখন মায়া দ্বারা জড়িত হইয়া উপাধিবিশিষ্ট হইয়াছি; আমরা যাহা ছিলাম, সে অবস্থা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি; একটুকু আভাস আমাদের মধ্যে আছে। তাহা দ্বারাই চালিত হইয়া আমরা ভুলক্রমে নানা স্থানে নানা ভাবে নানা সাজে উপস্থিত হইতেছি, আসল বস্তুর সহিত সম্পর্ক নাই। এই আভাস দ্বারা চালিত হইয়া পাপী পুণ্যবান্, পুণ্যবান্ পাপী, গৃহী সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী গৃহী, স্বাধীন অধীন, অধীন স্বাধীন হইতেছে, সকলেই দৌড়াদৌড়ী করিতেছে। প্রকৃত বস্তু না জানিতে পারাতেই এত গোল, এত হুড়াহুড়ি; জানিতে পারিলে আর গণ্ডগোল থাকে না, আর অভাব থাকে না, অস্থিরতা চলিয়া যায়। অচেতন পদার্থগুলি অপরিমেয় গতির সহিত দৌড়াইয়া অনন্ত সাগরে পড়িতে চায়, কিন্তু পথভ্রষ্ট হওয়ায় অনন্ত কাল ঘুরিয়া মরিতেছে। প্রাণিগণ ছট্‌ফট্ করিয়া, একজনকে ধরিয়া একজনকে বুকে চাপিয়া, আর একজনকে ছাড়িয়া দিয়া সেই সুখে, সেই সচ্চিদানন্দসাগরে ডুব দিতে চায় কিন্তু তাহার প্রকৃত অভাব কি না জানায় কেবল হুড়াহুড়ি করিতেছে, যে জ্বালা সে জ্বালা রহিয়া যাইতেছে। প্রকৃত অভাব জানিতে পারিলে অবিলম্বে স্বরূপত্ব লাভ হয়। তাহা হইলে আর অভাব থাকে না, আর অস্থিরতা রহে না, দৌড়াদৌড়ি চলিয়া যায়; অচল অটল হিমাদ্রির স্বরূপ হইয়া যায়, নিষ্কম্প সাগরত্ব লাভ হয়।

কয়েকটী অদ্ভুত দেশহিতকর কার্য্য।

বারাণসী দরিদ্রদুঃখপ্রতীকারসমিতি।

প্রবাদ আছে, ৺কাশীধামে কেহ উপবাসী থাকে না। একথার মধ্যে যে কতক পরিমাণে সত্য নিহিত আছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তথায় শত শত অন্নসত্রে প্রত্যহ অন্ন বিতরিত হইতেছে। কিন্তু নানা কারণে অনেক

উপযুক্ত ব্যক্তি যে বঞ্চিত হয়, ইহা একটু সামান্য অন্বেষণ করিলেই জানা যায়। তার পর মানুষের রোগ আছে। অনেকেই এখানে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন কোন মতে ভগবানের নাম করিয়া কাটাইবার জন্য আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের দূরদেশস্থ আত্মীয়গণের নিকট হইতে হয়ত যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য আসিয়া থাকে। কিন্তু রুগ্ন হইলে তাহাতে কুলায় না। আবার সেই অবস্থায়—বাড়ীওয়ালারা অতিশয় অত্যাচার করিয়া থাকে। হাঁসপাতালেরও সুবন্দোবস্ত নাই। তার পর মানুষের নানারূপ আপদ বিপদ্ আছে। সাধারণতঃ এখানকার হিন্দুগণ আজকাল সর্ব্বভূতসেবারূপ প্রকৃত ধর্ম্ম ভুলিয়া বাহ্য আচারনিষ্ঠা ও জ্ঞানের কচকচিতে রত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্বামী বিবেকানন্দের দুই জন ব্রহ্মচারী শিষ্য ৺কাশীবাসিগণের দুঃখ যথাসাধ্য প্রতীকার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েন। প্রথম অতি সামান্য ভাবে আরম্ভ হইয়া কিরূপে উহা ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। ইহাতে ১৯০০ সালের জুন মাস হইতে ১৯০১ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

প্রথমতঃ, ইহাঁরা কিরূপে আপনাদের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া আতুরগণের রক্ষা করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী ঘটনা উল্লিখিত হইল।

১৩ই জুন ১৯০০ সাল হইতে সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। নৃত্যকালী দাসী নাম্নী ৮০ বৎসর বয়স্ক, জাতি কায়স্থ, এক বৃদ্ধাকে দেবনাথপুরার পথে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্ত্রীলোক ১০৮৲ টাকা লইয়া এক যাত্রীতোলা বাড়ীতে উঠিয়াছিল। তাহার ব্যারাম হওয়াতে তাহাকে বাড়ীওয়ালা সর্ব্বস্বান্ত করিয়া গঙ্গার ঘাটে পরিত্যাগ করিয়া যায়। বৃদ্ধা ৪ দিবস অনাহারে ছিল। পরে বুকে হাঁটিয়া আসিয়া ঐস্থানে পড়িয়াছিল। যামিনীরঞ্জন তাহাকে একটি রোয়াকে তুলিয়া রাখিয়া সত্র হইতে ও অন্যান্য ভদ্রলোকের বাটী হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া তাহাকে আহার করান, বৃদ্ধার প্রাণরক্ষা হয়। পরদিন ঐ বৃদ্ধাকে পাঁড়েঘাটের একটি নালার নিকট বিষ্ঠাসংযুক্তগাত্রে পতিত দেখিতে পাওয়া যায়। তথা হইতে উঠাইয়া পাঁড়েঘাটের গঙ্গার ধারে ধর্ম্মশালায় রাখিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করা হয়, কিন্তু অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় বৃদ্ধার অতিশয় ক্লেশ হইয়াছিল, তাহার পদদ্বয় ফুলিয়াছিল। ৬দিবস পরে চিকিৎসার জন্য তাহাকে ভেলুপুর হাঁসপাতালে পাঠান হয়। খোরাকী জমা না দিলে এ হাঁসপাতালে রোগীকে রাখা হইবে না জানিতে পারায় ভিক্ষা করিয়া খোরাকী জমা দেওয়া

হয়। ১৪দিন চিকিৎসায় বৃদ্ধার আরোগ্যলাভ হয়। তখন তাহাকে কোথায় রাখা হইবে, এই চিন্তা উপস্থিত হইলে ভিঙ্গা মহারাজের অনাথালয়ে জিজ্ঞাসায় জানা গেল, তাঁহারা অথর্ব্ব রোগীদের স্থান দেন না। তৎকালে সমিতির নিজের কোনরূপ স্থান না থাকায় অগত্যা তাহাকে চৌকাঘাট Poor houseএ পাঠান হয়। এই চৌকাঘাট বরুণার পুলের ওপারে অবস্থিত (৺বারাণসীধামের বহির্ভূত) বলিয়া অনেক রোগী তথায় যাইতে অনিচ্ছুক; রাস্তায় মরা তাহারা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে।

১৬ই জুন। যামিনীরঞ্জন কেদার নামক দ্বাদশবর্ষবয়স্ক এক জলমগ্ন বালকের প্রাণরক্ষা করেন। প্রত্যুষে মাঝ গঙ্গায় ঐ বালক সাঁতার দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া জলমগ্নপ্রায় হইয়াছিল। শীতলাঘাটের পাণ্ডারা বা অপর কেহ তাহার প্রাণরক্ষায় যত্নশীল না হওয়ায় অগত্যা যামিনীরঞ্জন জলে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক বালকের নিকট যাইতে না যাইতে সে ডুবিয়া যাইল। শেষে ডুব দিয়া তাহার হস্তধারণে সক্ষম হইলে নিজের পরিধেয় বস্ত্রে পুনরায় পা জড়াইয়া যায়। ভগবৎকৃপায় এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া উলঙ্গ অবস্থায় বালককে বক্ষে লইয়া স্রোতের অনুকূলে ভাসিতে ভাসিতে কিনারায় উপস্থিত হয়। যামিনী-রঞ্জনের শরীর সে সময় অতিশয় দুর্ব্বল ছিল এবং এ কার্য্যে অত্যন্ত অসম-সাহসিকতা প্রকাশ হইয়াছিল।

২৭শে জুন। গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৬ বৎসর বয়স, ফরিদপুরে বাটী। এই বালক এখানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বাটী হইতে পলাইয়া আসে। তাহার দেশের পরিচিত একজন বিদ্যার্থী কোন বিখ্যাত সাধুর নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা করিত। গিরীন্দ্র তথায় আশ্রয় লয়। পরে তাহার জ্বর বিকার হইলে সেই সাধু তাহার উপর অতিশয় বিরক্ত হন। চিকিৎসাদি হইতেছে না ও যেস্থানে আছে, তাহা অতিশয় অস্বাস্থ্যকর দেখিয়া ঐ পাড়ায় একটি ঘরভাড়া করিয়া গিরীন্দ্রকে লইয়া চিকিৎসা করান হয়। পথ্যাদি অপর স্থান হইতে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে দেওয়া হইত এবং ৩। ৪ জন অনবরত সেবা শুশ্রূষা করিত। এই বালক কিছু আরোগ্য হওয়ায় একজন পরিচিত ব্যক্তির বাটীতে তাহাকে লইয়া যাওয়া হয়, তথায় তাহার পুনরায় পীড়া হয়। বিনামূল্যে ১৫ দিবসকাল রুক্মিণী কবিরাজ মহাশয় প্রত্যহ আসিয়া চিকিৎসা করিবার পর আরোগ্য হওয়ায় স্বদেশে চলিয়া যায়।

শ্যামাসুন্দরী দাসী, সোনারপুরানিবাসী, কায়স্থ, বয়স ৪০। ইহার রক্ত-

আমাশয় হওয়ায় বাড়ীওয়ালী চাবি বন্ধ করিয়া সমস্ত রাত্রি উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। যামিনীরঞ্জন তাহাকে মুক্ত করিয়া ভেলুপুর হাঁসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসার পর সে আরোগ্য হইয়া পুনরায় গৃহে যায়।

অমৃত দাসী, বয়স ৪০, শোথ ও বক্ষস্থলে ক্ষত, বাড়ীওয়ালা পথে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়—ইহাকে চৌকাঘাট হাঁসপাতালে দেওয়া হয়।

হরিদাসী, বয়স ৩০, পাঁড়েঘাটে পথে পাওয়া যায়, আমরক্ত পীড়াগ্রস্ত; ইহাকে চৌকাঘাটে পাঠান হয়।

হরমণিদাসী, বয়স ৭০, মুনসীঘাট—ইহার মধ্যে মধ্যে পেটের পীড়া হয়—বলিয়া বাড়ীওয়ালা রাস্তায় বসাইয়া দেয়। সপ্তাহে চাউল ও বাজার খরচ দেওয়া হইবে ও বিষ্ঠায় বাড়ী অপরিষ্কার হইলে পরিষ্কার করিতে হইবে, এই করারে বাড়ীওয়ালা পুনরায় বৃদ্ধাকে স্থান দেয়। শেষে এই স্ত্রীলোককে আশ্রমেও রাখিয়া দেওয়া হয়।

দুর্গামণি দাসী—কায়স্থ, বয়স ৬০। এই স্ত্রীলোককে একটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধযুক্ত অন্ধকার গৃহে পতিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কোনরূপ সঙ্গতি নাই। ২।৩ দিন অন্তর আহার জুটিত—প্রথমে বাড়ীওয়ালাকে প্রত্যেক সপ্তাহে চাউল ও বাজারখরচ দেওয়া হইবে, এই বন্দোবস্তে তাহার বাটীতে যাইয়া সেবা শুশ্রূষা করা হইত। পরে সমিতিগৃহে আনা হয়। এখানে মারা যাইলে সমিতি হইতে যথারীতি মণিকর্ণিকায় সৎকার করা যায়।

ঈশ্বরী ব্রাহ্মণী, দেবনাথপুরা, বয়স ৪০। এই অনাথা বিধবা স্ত্রীলোক বিনা চিকিৎসায় ১ মাস কাল পড়িয়াছিল। পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা; রুক্মিনী কবিরাজ মহাশয় প্রথমে চিকিৎসা করেন, শেষে ডাক্তার মন্মথনাথ বসু (এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন) আসিয়া বলেন, যকৃতে ফোড়া হইয়াছে, শীঘ্র অস্ত্র করা অত্যন্ত আবশ্যক এবং হাঁসপাতালে লইয়া না গেলে বাঁচিবার সম্ভাবনা কম। ইনি রোগীকে বুঝাইয়া বলায় সে হাঁসপাতালে যাইতে স্বীকৃতা হয়। অস্ত্র হইবার পর ১৩ দিবস সে হাঁসপাতালে জীবিতা ছিল। মৃত্যুর পর সমিতির খরচে ব্রাহ্মণের দ্বারা যথারীতি সৎকার করা হয়।

পঞ্চানন হাজরা, বয়স ৩৫, এই ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া নারদ ঘাটে পতিত ছিলেন। কোন লোক ইহাকে জলপর্য্যন্ত দিত না বা কাছে আসিত না। ডাক্তার মন্মথ বাবু নারদঘাটে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সমিতিবাটী হইতে আহার লইয়া প্রত্যেক দিবস প্রাতে ও

রাত্রে দিয়া আসা হইত। মধ্যে ইহার কলেরা হয়; যামিনীরঞ্জন সেবা করিয়াছিলেন; চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ হয়।

রহিমুদ্দীন—বয়স ৪৫—এই অন্ধ মুসলমান আমরক্তপীড়াগ্রস্ত হইয়া পথে পতিত ছিল, ইহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

বিহারী—৫৫—এই হিন্দুস্থানী মণিকর্ণিকা ঘাটে কাশ এবং প্রবল জ্বরগ্রস্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় পড়িয়াছিল; ডুলি করিয়া সমিতিগৃহে আনিয়া কবিরাজী চিকিৎসা করা হইয়াছিল, শেষে ভেলুপুর হাঁসপাতালে পাঠাইলে আরোগ্যলাভ হয়।

লক্ষ্মীকান্ত রায়—বাস সোণারপুরা, বয়স ৬৩, এই ব্রাহ্মণের আমরক্ত পীড়া হওয়ায় বাড়ীওয়ালা রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। ইহাকে সমিতিগৃহে লইয়া গিয়া সেবা শুশ্রূষা ও কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ কবিরঞ্জনের দ্বারা চিকিৎসা করায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে।

গিরিবালাদেবী, বয়স ২০—এই স্ত্রীলোক তাহার মাতার সহিত অসুখ অবস্থায় কাশী আসিয়া এক যাত্রীতোলা বাড়ীতে আশ্রয় লয়। শীঘ্রই অর্থ নিঃশেষিত হওয়ায় বাড়ীওয়ালা তাড়াইয়া দেয়। অগত্যা গিরিবালার মাতা সেই পল্লীতে একটি দুর্গন্ধযুক্ত অন্ধকার গৃহ ভাড়া করিয়া কন্যাকে তথায় রাখে। গিরিবালা, প্রবল জ্বর, আমরক্ত ও অর্শরোগে দুই বৎসর কাল ভুগিতেছিল! সমিতি হইতে কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দেখান হয়। তিনি তিন মাসকাল বহুমূল্য ঔষধ সকল বিনা মূল্যে দেন। স্বর্ণপটপটি ব্যবস্থা হওয়ায় খাঁটি দুগ্ধ সমিতি হইতে প্রতিদিন ২ সের ২॥০ সের করিয়া দুই মাসকাল যোগান হইয়াছিল। এই স্ত্রীলোক এক্ষণে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

গৌরীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ১৫—ইহার পিতা মাতা অত্যন্ত নিঃস্ব—কলেরারোগগ্রস্ত হইয়া বিকার অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় ছিল—সমিতির যত্নে ডাক্তার মন্মথ বসুর দ্বারা ইহার চিকিৎসা করান হয়।

হেরম্বচন্দ্র বাগ্‌চী, বয়স ৩০, বাড়ী পাংসা—পাছায় হাড়ের ভিতর অত্যন্ত বেদনা, এই ব্রাহ্মণ যুবক অসহায় অবস্থায় শয্যাগত ছিল—পার্শ্ব ফিরিবার শক্তি ছিল না। অসহ্য যন্ত্রণা। এক মাসকাল চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষা করায় ও পথ্যাদি দেওয়ায় আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

সরযূ তেওয়ারি—হিন্দুস্থানী বালক, বয়স ১২—জ্বরবিকারগ্রস্ত মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত ছিল, কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ কবিরঞ্জন অত্যন্ত যত্নের সহিত

চিকিৎসা করায় আরোগ্যলাভ করিয়াছে। ২৪ দিন যাবৎ, সাগু বার্লি ও অন্যান্য পথ্য ও ঔষধ সমিতি হইতে লইয়া গিয়া রোগীর বাটীতে দিয়া আসিতে হইত। প্রত্যহ ৬। ৭ বার রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ঔষধ খাওয়াইতে হইত।

হেমলতাদেব্যা, পক্ষাঘাত—বয়স ৩৫, এই রোগীকে কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ ২৷৷০ মাস কাল যাবৎ চিকিৎসা করিতেছেন। মকরধ্বজ প্রভৃতি বহুমূল্য ঔষধাদি দিতেছেন। এবং পথ্যাদির ব্যয় সমস্ত সমিতি হইতে দেওয়া হইতেছে।

পরমেশ্বরী সহায় বা প্রবোধানন্দ সরস্বতী, এই সন্ন্যাসী বহু দিন হইতে হাঁপানি কাশে ভুগিতেছিলেন। সমিতিতে প্রায় ৩ মাস কাল যাবৎ চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কবিরাজ খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর চিকিৎসাধীন ছিলেন; কবিরাজ মহাশয় বহুমূল্য ঔষধাদি দিয়াছিলেম।

রাজলক্ষ্মী দেব্যা, বয়স ৪৫, দেবনাথপুরার এক নিম্নতল গৃহে বিনা চিকিৎসায় ছিলেন। রোগ,—ডবল নিউমোনিয়া। ডাক্তার মন্মথ বাবুর চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ হইয়াছে। সমিতি হইতে ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যয় বহন করা হইয়াছে।

১৩ই জুন (১৯০০) হইতে ১২ই সেপ্টেম্বর সমিতির জন্য বাড়ীভাড়া হয় নাই। পথে ঘাটে ও রোগীদের বাটীতে সেবাশুশ্রূষা ও সাহায্য করা হইয়াছিল। ১৩ই সেপ্টেম্বর জঙ্গমবাড়া মহল্লায় ৫৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় ১ বাড়ী লওয়া হয়। সমিতির কার্য্যের সহায়তার জন্য স্বর্গীয় রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুরকে সভাপতি ও মোক্ষদাদাস মিত্র মহাশয়কে সম্পাদক মনোনীত করিবার জন্য ১৫ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালীটোলা স্কুল ভবনে এক সাধারণ সভা আহুত হয়, সেই সভায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিও গঠিত হয়। পূর্ব্বে ৭। ৮ জন যুবক এই সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহারাই সমস্ত কার্য্য করিতেছিলেন, ঐ দিন সাধারণকে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করা হয়। প্রমদাদাস বাবু যে দিন এই কার্য্যের বিষয় শুনিয়াছেন, সেই দিন হইতে সাহায্য করিয়াছেন।

১৯০০ সালের জুন হইতে ১৯০১ এপ্রিল পর্য্যন্ত সমিতিগৃহে আনিয়া ২৯ জনের সেবা করা হইয়াছে; তাহাদের বাসায় চাউল প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে ১৩৮ জনকে এবং হাঁসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে ৪২ জন। হাঁসপাতালে পাঠাইবার খরচ ও তথাকার পথ্যাদির ব্যয় সমিতি হইতে হইয়া থাকে। এই সময়ের মধ্যে আয় হইয়াছে ৬২৪৵৫, খরচ হইয়াছে ৪৮৬৴০, হাতে

ছিল ১৩৮/৫। এতদ্ব্যতীত, মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা অনেক চাউলও সংগৃহীত হইয়া বিতরিত হইয়াছিল। ১৯০১ এপ্রেল মাসে চাঁদা আদায় হইয়াছিল ৭২৸০। এককালীন দান ২৪৲ টাকা ও ব্যয় হইয়াছিল—৮১৵১৫।

সমিতি কি কি কার্য্য করেন, তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

(ক) সমিতি, রাস্তায় নিপতিত পীড়িত নিরাশ্রয় অনাথ অনাথাদিগকে নিজব্যয়ে হাঁসপাতালে প্রেরণ করেন, ও স্থানবিশেষে তাহাদিগের পথ্যাদির ব্যয় বহন করিয়া থাকেন।

(খ) হাঁস্পাতালে যাইতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিবর্গকে, তাহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী স্থানে বা সমিতির বাটীতে আশ্রয় দিয়া চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন।

(গ) যাহারা অনশনে প্রাণত্যাগ বিবেচ্য বোধে সাধারণ দানস্থলে যাইতে বিরত হন এবং যাহারা অন্ধ, অথর্ব্ব, রুগ্ন, চলৎশক্তিবিহীন এবং ভিক্ষায় অপারগ, সমিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাদের অবস্থা অবগত হইয়া, তাহাদিগের ভরণ পোষণের সাহায্য করিয়া থাকেন।

(ঘ) ভিক্ষাজীবী ও কায়িকশ্রমে অতিকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদনকারী ব্যক্তিবর্গ অসুস্থ হইলে, সমিতি—ডাক্তার, কবিরাজ ও ঔষধ পথ্যাদির দ্বারা তাহাদের আবাস স্থলে উপস্থিত হইয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন।

এই মহৎ লোক-হিতকর কার্য্যে. সর্ব্ব সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতিরেকে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব বিবেচনায়, সমিতি, সর্ব্বসাধারণের নিকট বিনীত প্রার্থনা করিতেছেন যে, প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী সাহায্য দ্বারা সমিতির উন্নতি সাধন করুন।

সমিতির বর্ত্তমান ঠিকানা, রামাপুরা, বেনারসসিটি। যে সকল সহৃদয় মহাত্মা এই মহৎ কার্য্যের জন্য কিছু দিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি উদ্বোধনসম্পাদক, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

উদাসীর ধর্ম্মসূত্র।

উদাসী বন্ধুটিকে এক দিন ধরিয়া বসিলাম, তোমার অমন আব্‌ছা আব্‌ছা কথায় আর চলিবে না। আজ তোমাকে যা জিজ্ঞাসা কোর্‌বো, তার সব পরিষ্কার জবাব দিতে হবে। বন্ধু একটু হাঁসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, রাজি। আমি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম ;—

আ। সহজে ধর্ম্মলাভ হয় কি না ?

উ। জ্যামিতি শিখিবার রাজপথ নাই।

আ। ঈশ্বর কি এমন নির্দ্দয় যে, তাঁর পুত্র কন্যাগণের মধ্যে কাউকে ধর্ম্ম করতে সক্ষম করেছেন, কাউকে করেন নাই ?

উ। সবার পথ খোলা ; যে যেমন করে, তার তেমনি হয়।

আ। তোমার মতে ধর্ম্ম জিনিসটা কি ?

উ। মনকে ধরাই ধর্ম্ম।

আ। ধর্ম্ম এক না বহু ?

উ। ধর্ম্ম এক, উহার প্রকাশ বহু।

আ। ভগবান কি ?

উ। জগতের অতীত অথচ জগৎস্বরূপ সচ্চিদানন্দই ভগবান।

আ। ভগবানকে দেখা যায় কি না ?

উ। তোমরা যাহাকে দেখা বল, সে রকম ভাবে দেখা যায় না, সাক্ষাৎকার কত্তে পারা যায়।

আ। সাক্ষাৎকারের দরকার কি ?

উ। তাঁকে সাক্ষাৎকার কল্লে সব কামনা চরিতার্থ হয়।

আ। কাম্য জিনিসগুলি পাওয়া যায় ? যেমন আমার যদি অর্থকামনা থাকে, তবে ভগবৎসাক্ষাৎকার হলে অর্থ লাভ হয় ?

উ। অর্থলাভের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ আনন্দলাভ, তাহা অনন্ত পরিমাণে হয় ; অর্থলাভের প্রয়োজন বোধ থাকে না।

আ। কি উপায়ে লাভ হয় ?

উ। যে চায়—সে পায়।

আ। বৈরাগ্যের লক্ষণ বল।

উ। ভগবান ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেই বৈরাগ্য।

আ। বৈরাগ্য হলেই কি সন্ন্যাসী হতে হয় ?

উ। তার কোন মানে নাই।

আ। তবে সন্ন্যাস আশ্রমকে বৈরাগ্য আশ্রম বলে কেন ?

উ। বৈরাগ্যভাব এলে লোকে প্রায় সন্ন্যাসী হয় আর সন্ন্যাস আশ্রমেই বৈরাগ্যভাবের চরিতার্থতার সুবিধা বেশী।

আ। সংসার ও সন্ন্যাস আশ্রমের তুলনা কর।

উ। সংসারে থাকা সাবধানীর কায, সন্ন্যাস অবলম্বন সাহসীর কায। সংসারে উন্নতির সম্ভাবনা কম, সন্ন্যাসীর উন্নতির সম্ভাবনা বেশী। আবার সংসারে পতনের আশঙ্কা কম, সন্ন্যাসে পতনের আশঙ্কা বেশী।

আ। ভক্তি কি ?

উ। ভগবানে অত্যন্ত অনুরাগই ভক্তি।

আ। শ্রদ্ধা কাকে বলে ?

উ। সদ্গুরুর বাক্যে অথবা সৎশাস্ত্রের কথিত বিষয়ে যে স্বাভাবিক বিশ্বাস, তার নাম শ্রদ্ধা।

আ। প্রেম কি ?

উ। ভগবানের অনুরাগে যখন সাধক আত্মহারা হয়ে যায়, যখন তার ঘৃণা লজ্জা ভয় থাকে না, তখনই প্রেম হয়।

আ। নির্ভর কি ?

উ। অহংজ্ঞানশূন্যতাই নির্ভর।

আ। ভাল বুঝিলাম না।

উ। প্রথমে লোকে আমি জ্ঞানে কর্ম্ম করে। নানান্ রকম চেষ্টা কত্তে থাকে। সাধন ভজন কর্‌বার সময়ও এই অহংভাব থাকে—মনে হয়, দুই লক্ষ জপ কর্‌বো; আসন, প্রাণায়াম কোর্‌বো; ধ্যান ধারণা কোর্‌বো; তবে তাঁকে পাব। এসব কত্তে কত্তে দেখ্‌তে পায়, যেটাকে আমি বল্‌ছি, সেটার মূলে আর এক মহাশক্তি কায কচ্চে। ঠিক যেমন পুত্‌লো বাজীর সময় একজন বাজীকর ভেতর থেকে কল টিপে কিন্তু বাহির থেকে দেখ্‌লে পুতুলগুলিকে নিজচেষ্টায় গতিশীল বোধ হয়। এই রকম বোধ হোলে সাধকের কি রকম একটা ঢিলে ভাব আসে—সেটা মহা শান্তির অবস্থা। পরমহংসদেব উদাহরণ দিতেন, যেমন অত্যন্ত পরিশ্রমের পর তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়িতে তামাক টানা। এরূপ নির্ভর ও আলস্য আকাশ পাতাল ব্যবধান। একজন সাধক নির্ভর ও সাধন তত্ত্বের সম্বন্ধ বোঝাবার জন্য বল্‌তেন, তাঁকে সাধন কল্লেও পাওয়া যায় না আবার সাধন না কল্লেও পাওয়া যায় না।

আ। যোগ ব্যাপারটা কি ?

উ। কোন অবলম্বনে অথবা বিনা অবলম্বনে চিত্ত স্থির করার নাম যোগ।

আ। জ্ঞান কি ?

উ। সর্ব্বত্রে ঐক্যানুভূতিই জ্ঞান।

আ। মায়া বল কারে ?

উ। যা সর্ব্বদা একরূপ থাকে না, আর জ্ঞান উদয় হোলে যা একেবারে লোপ হয়, তার নাম মায়া।

আ। মায়া সত্য কি মিথ্যা ?

উ। অজ্ঞানীর কাছে সত্য, জ্ঞানীর কাছে মিথ্যা।

আ। সাধু কাকে বলে ?

উ। যাঁর মন সর্ব্বদাই ভগবানে তদ্গত, তিনিই সাধু।

আ। সাধুসঙ্গে ফল আছে ?

উ। আছে।

আ। কি রকম ?

উ। সাধুর কার্য্যকলাপ দেখে, সাধুর বাক্য শুনে, আর প্রধানতঃ সাধুর আন্তরিক চিন্তার প্রভাবে সংসারী লোকের মনে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য ঈশ্বরীয় উদ্দীপনা উপস্থিত হয়।

আ। গুরু কাকে বলে ?

উ। যাঁর কাছ থেকে যে কিছু শিক্ষা পাই, তাঁকেই গুরু বলি। তবে ধর্ম্মজগতে যাঁর বিশেষ উপদেশ ও সহায়তায় আমাদের ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়, তাঁহাকেই প্রকৃত গুরু বলি।

আ। কুলগুরু কি ত্যাগ করা উচিত ?

উ। প্রকৃত ধর্ম্ম বা ঈশ্বরলাভ একটা সামাজিক অনুষ্ঠান নয়। যদি কুলগুরুর উপদেশে ভগবৎপ্রাপ্তির সাহায্য পাও, তবে তাঁহাকে খামকা কেন ত্যাগ কোত্তে যাবে ? সাহায্য না হোলে কাযেই অপর গুরুর আবশ্যক হয়।

আ। গুরুর সহায়তা ব্যতীত ধর্ম্ম লাভ অসম্ভব কি না ?

উ। অনেক স্থলেই অসম্ভব।

আ। গুরু কি এক হওয়া উচিত কি অনেক হইতে পারে ?

উ। অনেক হইতে পারে, তবে এক গুরু হইলে বিশেষ সুবিধা।

আ। গুরুতে ভগবান ভাবা দোষ কি ?

উ। না, দোষ নয়। যখন সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার কোর্‌তে হবে, তখন গুরুতে যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কোর্‌তে না পারে, তাহার ধর্ম্মলাভ বহুদূর। যারা ধর্ম্ম বাস্তবিক সাক্ষাৎকার কোর্‌তে চায় না, কেবল বাজে বকিয়া বেড়ায়,

তাহারাই শুরুতে ব্রহ্মবুদ্ধি কোত্তে নারাজ। আর এক কথা, প্রকৃত সদ্গুরু লাভ হইলে আর জোর কোরে তাঁতে ব্রহ্মবুদ্ধি কোত্তে হয় না; কারণ, তিনি ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্মস্বরূপ হোয়েছেন।

আ। অবতার কাকে বলে?

উ। সমুদায় জগতই ভগবানের অবতার। যেখানে বিশেষ প্রকাশ, সেই খানেই বিশেষ ভাবে অবতার সংজ্ঞা প্রযুক্ত হয়। আমার মনের ভাব এই। এ সম্বন্ধে অনেক মত আছে।

আ। বন্ধন কাকে বলে?

উ। আমি ছাড়া অন্য কোন বস্তুর উপর নির্ভর করাকেই বন্ধন বলে।

আ। যেমন?

উ। যেমন কাপড় খানা না হোলে আমার চোল্‌ছে না, ছাতাটা না হোলে আমার চোল্‌ছে না, ইত্যাদি। মোট কথা, যতক্ষণ অভাব বোধ আছে, ততক্ষণ বন্ধন।

আ। তা হোলে কাকে মুক্ত বল, তাও বুঝ্‌তে পেরেছি। যার অভাব বোধ নাই, সে মুক্ত।

উ। তবে ত গাছ পাথরের অভাব বোধ নাই।

আ। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) তাইত!

উ। শুধু অভাব বোধ নাই বোল্‌লে মুক্তের স্বরূপ ঠিক বোঝা যায় না। যিনি আপনার আনন্দে আপনি বিভোর হয়ে কোন অভাব বোধ করেন না, যিনি নির্ভীক, অসহায় হইয়াও মহাবল, নির্ধন হইয়াও সদাতুষ্ট, তিনিই মুক্ত।

আ। আত্মা কাকে বলা যায়?

উ। আত্মার স্বরূপ নিত্যচৈতন্য ও আনন্দ।

আ। তবে ঈশ্বর ও আত্মায় কি তফাৎ রইল?

উ। তফাৎ ত কিছু নেই, কেবল অজ্ঞানীই তফাৎ বোধ করে।

আ। তবে আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞানই মুক্তি?

উ। ঠিক বোলেছ। আচ্ছা বল দেখি, আত্মা এক না বহু?

আ। আপাততঃ ত বহু দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু বোধ হয়, প্রকৃত পক্ষে এক।

উ। হাঁ তাই। তবে বল দেখি, মুক্তি কার হয়?

আ। (অনেকক্ষণ ভাবিয়া) তাইত বিষম সমস্যা যে! গোলক ধাঁধায় ফেল্লে যে!

উ। শোন ; আত্মা বাস্তবিক সদামুক্ত, সদাব্রহ্মস্বরূপ ; তবে অজ্ঞানীর সেটী বোধ হোচ্চে না। বোধ হোলেই অনুভব হয়, আমার মুক্তিও নাই, বন্ধনও নাই।

আ। তুমি কি অদ্বৈতবাদী নাকি !

উ। এখনও দ্বৈতবাদী আছি। ভগবৎকৃপায় আশা করি, একদিন অদ্বৈতবাদী হইব। সকলেই প্রথমে দ্বৈতবাদী থাকে, যতক্ষণ ভগবান ও আমি পৃথক বোধ থাকে ; এক বোধ হইয়া গেলেই, তন্ময় হইয়া গেলেই সকলেই অদ্বৈতবাদী।

আ। আচ্ছা, বিবাহ করাটা ভাল কি মন্দ, এ সম্বন্ধে তোমার মত কি খুলে বল।

উ। বিবাহ না কোরে যদি ভগবৎসাধনা কোরে পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারা যায়, তবে সেই শ্রেষ্ঠ। তবে যে না পারে, তাকে কাযেই বিবাহ কত্তে হয়। শুধু বিবাহ না কোরে মনে দিন রাত অশান্তির আগুন জেলে রাখার চেয়ে বিবাহ করাই ভাল। তবে এটা ভোলা উচিত নয় যে, আমি শ্রেষ্ঠ জিনিসটা কোত্তে পার্‌চি না বলেই এইটে কোত্তে বাধ্য হোয়েছি।

আ। কিন্তু সকলেই যদি বিবাহ না করে, তবেত সৃষ্টিলোপ—

উ। আজ আর থাক্।

আ। আচ্ছা। আজ তোমায় ঢের বকান গেল। কিন্তু কি করি বল ? রাত্রের ট্রেনেই বাঁকিপুর যেতে হবে, তাত জান ? এখন কদ্দিনে ফিরি, ঠিক নেই। এখন তোমার কথাগুলি নিয়ে যথেষ্ট ভাব্‌বার সময় পাব, কিন্তু ভাই, আমি তোমাকে মাঝে মাঝে এক একটা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন কোরে সন্দেহ তুলে চিঠি লিখে বিরক্ত কোর্‌বো, তোমায় কিন্তু জবাব দিতে হবে।

উ। আচ্ছা, তা তখন দেখা যাবে।

বন্ধুর নিকট বিদায় হইয়া বাড়ী গিয়া সব কথাগুলি পকেট বুকে নোট করিয়া লইলাম। উদাসী বন্ধুকে ভারি শ্রদ্ধা করিতাম, পাঠক মহাশয় জানেন ত।

ইতি সংসারী।

আয়ুর্ব্বেদ ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা।

আয়ুর্ব্বেদ অতি প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র। আজ কাল আমরা যে সকল চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পদ্ধতি প্রচলিত দেখিতেছি, প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে

হইলে তৎসমুদয় চিকিৎসা বিজ্ঞান বা পদ্ধতির আদি ও মূলই একমাত্র আয়ুর্ব্বেদ। এক সময়ে এই সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া কোন প্রকার চিকিৎসাবিজ্ঞান বা চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল না, এমন কি, ভারতবর্ষবাসী মানবগণ একদিন চিকিৎসাবিজ্ঞানের নাম কিম্বা চিকিৎসাপদ্ধতির রীতি নীতি পর্য্যন্ত জানিত না।

অতি প্রাচীনতম কালে অর্থাৎ মানবসংস্থিতির প্রারম্ভ বা প্রথমাবস্থায় এই ভারতবর্ষের বায়ু, জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি অতি বিশুদ্ধ ছিল, এবং এই বিশুদ্ধ বায়ু, জল ও মৃত্তিকার জন্য ভারতবর্ষ যে অতি বিখ্যাত ছিল, তাহা বোধ হয়, কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং তৎকালে একমাত্র স্বাভাবিক ব্যাধি জরা মৃত্যু প্রভৃতি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অস্বাভাবিক ব্যাধি এককালেই উৎপন্ন হইত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এবং সেইজন্য তৎকালে কোন প্রকার চিকিৎসাবিজ্ঞানেরও আবশ্যকতা ছিল না।.. কালসহকারে মানব ও অন্যান্য প্রাণিগণের নিয়ত অধিবাস জন্য শরীর-নিঃসৃত মলসমূহের দ্বারা এই বিশুদ্ধ বায়ু, জল ও মৃত্তিকা প্রভৃতি প্রদূষিত হইয়া রোগসমূহ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়। ধর্ম্মহানিও এই রোগোৎপাদনের অন্যতম কারণ।

যৎকালে ভারতবর্ষবাসী মানবগণ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের প্রধান অন্তরায় স্বরূপ রোগ সমূহের ভীষণ যন্ত্রণায় উৎপীড়িত এবং অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে লাগিল,—প্রদূষিত জল, বায়ু ও মৃত্তিকা কালবিপর্য্যয়ে বিপর্য্যস্ত হইয়া জনপদ সকল বিধ্বস্ত হইতে লাগিল, সেই সময়ে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন,অমিততেজা, তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন, অনসাধ্যকর্ম্মা, উদারচেতাঃ আত্রেয়প্রমুখ আচার্য্য মহর্ষি-মণ্ডলী, স্নিগ্ধচ্ছায়পাদপরাজিপরিশোভিত, শান্তিপূর্ণ হিমালয়প্রদেশবিশেষে সমবেত হইয়া তত্রত্য প্রাণিসমূহের প্রতি দয়াবশতঃ স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগোপনাশ জন্য আয়ুর্বিজ্ঞানালোচনায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তদবধি অমানুষশক্তি-সম্পন্ন, যমনিয়মশীল জগতের একমাত্র মঙ্গলব্রতে ব্রতী কত শত মহর্ষি দৃঢ় অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে, আয়ুর্বিজ্ঞান, শরীরতত্ত্ব, দ্রব্যসমূহের নাম, রূপ, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব প্রভৃতি নিরূপণার্থ আপনাদের নশ্বর জীবন উৎসর্গ করিয়া এই নশ্বর জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ আমি যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, তৎকালে এই সমস্ত বিষয় এখনকার ন্যায় গ্রন্থাকারে লিখিয়া রাখিবার পদ্ধতি কিম্বা

লিখিবার উপাদানাদিও ছিল না। তখন দৃঢ়াধ্যবসায় ও প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন মহর্ষি-মণ্ডলীর অসাধারণ মেধা ও স্মৃতি বিশিষ্ট হৃদয়ই গ্রন্থবিশেষ ছিল, সুতরাং প্রথমাবস্থায় আয়ুর্ব্বেদেরও গ্রন্থাদি ছিল না। মহর্ষিভরদ্বাজশিষ্য অগ্নিবেশ ঋষিই প্রথমে এই সকল বিষয় গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করেন, সুতরাং অগ্নিবেশ ঋষিপ্রণীত গ্রন্থই আয়ুর্ব্বেদের আদি গ্রন্থ। ঋষিপ্রণীত গ্রন্থমাত্রেই সংহিতা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আজি যে আমরা চরকসংহিতা নামক গ্রন্থ দেখিতে পাইতেছি, তাহা সেই প্রাচীন গ্রন্থের নানা জন কর্তৃক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ মাত্র। অগ্নিবেশ ঋষির গ্রন্থপ্রণয়নানন্তর হারীত, পরাশর প্রভৃতি অনেকানেক ঋষি আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই সকল গ্রন্থ আজ, কালের অনন্ত ক্রোড়ে লীন হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর মহৎ দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? আজি যে আমরা কণামাত্রও দেখিতে পাইতেছি, সে কেবল ঐ মহাত্মাদের কৃপায়,নতুবা এতদিন হয়ত আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্ব লুপ্ত হইত!

সমালোচনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি অর্থাৎ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরিতামৃত। সম্পূর্ণ। শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন প্রণীত। ১১৫।২, গ্রেষ্ট্রীট, বসুমতী আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য আড়াই টাকা। এই গ্রন্থখানিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সাধন ভজন, ধর্ম্মপ্রচার এবং নানাভক্তের সহিত সম্মিলন কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের মত অতি সরল কবিতাকারে বর্ণিত আছে। পরমহংসদেবের যতগুলি জীবনী এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এইখানিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে তাঁহার জীবনের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনেক ঘটনা এবং তাঁহার অনেক উপদেশও জানিতে পারা যায়। শুষ্ক ইতিহাসচ্ছলে লিখিত না হইয়া সরস কবিতাকারে লিখিত হওয়াতে ইহা বঙ্গদেশের আপামর সাধারণের উপযোগী হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এ পুস্তক পণ্ডিতেরও উপেক্ষণীয় নহে। কারণ, মহাপুরুষের জীবনচরিতে ভাষার দিকে লক্ষ্য না থাকিয়া সেই জীবনের গভীর ভাবগুলির প্রতি লক্ষ্য থাকা উচিত। সাধকগণের যে এ গ্রন্থ পরম আদরণীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের যতই প্রচার হয়, ততই আনন্দের বিষয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—উরণ্ র পরে চ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—'উরণ্ র পরঃ' সূত্রপ্রযুক্ত, 'ঋ' স্থানে 'র' পরবিশিষ্ট 'অণ্' কার্য্যেও 'ঋ'কারের সর্ব্বত্রই নিবৃত্তি হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—উরণ্ পরে চ সর্বেষামৃকারাণাং নিবৃত্তিঃ প্রাপ্নোতি। অস্যাপি প্রাপ্নোতি। কর্তৃ। হর্তৃ॥

ভাষ্যানুবাদ।—'ঋ' স্থানে 'র' পর বিশিষ্ট 'অণ্' কর্ত্তব্য হইলে, তাহার কোন বিশেষ না বলাতে, যাবতীয় 'ঋ'কারের ই নিবৃত্তি হইয়া, 'র' পর বিশিষ্ট 'অণ্' প্রাপ্তি হইবে। অতএব 'কর্তৃ' শব্দ এবং 'হর্তৃ' শব্দের অন্ত্যস্থিত 'ঋ'কারেরও নিবৃত্তি হইয়া অর্ বা আর্ প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধন্তু ষষ্ঠ্যধিকারে বচনাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—ষষ্ঠী বিভক্তির অধিকারে, এই (সূত্র) বচন করাতে, ইহা সিদ্ধই আছে। *

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। ষষ্ঠ্যধিকারে ইমে যোগাঃ কর্ত্তব্যাঃ। একস্তাবৎ ক্রিয়তে। তত্রৈবেমাবপি যোগৌ ষষ্ঠ্যধিকারমনুবর্ত্তিষ্যেতে। অথবা ষষ্ঠ্যধিকারে ইমৌ যোগাবপেক্ষিষ্যামহে॥ অথবেদং তাবদয়ং প্রষ্টব্যঃ। সার্ব্বধাতু-কার্ধধাতুকয়োর্গুণো ভবতীতি। ইহ কস্মান্ন ভবতি। যাতা। বাতা। ইদং তত্রাপেক্ষিষ্যতে। ইকোগুণবৃদ্ধী ইতি॥ যথৈব তর্হি ইদং তত্রাপেক্ষিষ্যতে। এবমিহাপি তদপেক্ষিষ্যামহে। সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োরিকো গুণবৃদ্ধী ইতি॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলি-বিরচিতে ব্যাকরণ-মহাভাষ্যে
প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে তৃতীয়মাহ্নিকম্॥

ভাষ্যানুবাদ।—'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্র করিলেও এই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। কিরূপে?

এই যোগ অর্থাৎ সূত্রসমূহ ষষ্ঠীবিভক্তির অধিকারে করা হইবে। একটী ('উরণ-রপরঃ' সূত্র) ত 'ষষ্ঠী স্থানে যোগা' সূত্রের অধিকারে করাই হইয়াছে। সেই স্থলে এই যোগ অর্থাৎ সূত্র ('ইকোগুণবৃদ্ধী' এবং 'ইগ্যণঃ সংপ্রসারণম্') দুইটীও করিয়া ষষ্ঠীর অধিকারকে অনুবৃত্তি করা হইবে। অথবা সেই 'ষষ্ঠী স্থানে

যোগা' সূত্রের ষষ্ঠীর অধিকারে আমরা, এই সূত্রদ্বয়েরও ব্যাখ্যা করিবার জন্য অপেক্ষা করিব। তাহা হইলে কুত্রাপি কোনও দোষ হইবে না (১)।

অথবা এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে,—'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রানুসারে যে গুণ হয়, তাহা 'যাতা' 'বাতা' প্রভৃতি স্থলে, 'যা' ধাতু এবং 'বা' ধাতুর পরে আর্ধ ধাতু বর্ত্তমান সত্বেও কেন 'আ'কারের গুণ হয় না?

ইহার উত্তর এই যে,—সেই স্থলে ('সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রে), 'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রের অপেক্ষা করিতে হইবে; তাহা হইলেই 'যাতা' 'বাতা' ইত্যাদি স্থলে, 'যা' এবং 'বা' ধাতু ইগন্ত না হওয়ায় গুণও প্রাপ্তি হইবে না। অতএব কোন দোষও হইবে না।

তবে যেমন নাকি সেখানে ইহার ('ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রের) অপেক্ষা করা হইবে; সেইরূপ, এখানেও তাহার ('সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রের) অপেক্ষা করা হইবে। অতএব উভয় সূত্র একত্র মিলিয়া এইরূপই অর্থ হইবে যে, সার্বধাতুক বা আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, যদি কোথাও গুণ হয়, তবে তাহা 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রের সহিত মিলিত হইয়াই হয়।

শ্রীমৎভগবৎপতঞ্জলি-বিরচিত ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের
প্রথমপাদের তৃতীয় আহ্নিকানুবাদ সমাপ্ত।

---

(১) 'ষষ্ঠী স্থানে যোগা' প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের উনপঞ্চাশৎ সংখ্যক সূত্র, আর 'উরণরপরঃ' তাহার দুই সূত্র পরে অর্থাৎ একপঞ্চাশৎ সূত্র বলিয়া, উহার অধিকারে পড়িয়াছে; কিন্তু 'ইকোগুণবৃদ্ধী' তৃতীয় সূত্র বলিয়া অনেক পূর্ব্বে,আর 'ইগ্ যণঃ সংপ্রসারণম্' সূত্র, উহার চারি সূত্র পূর্ব্বে অর্থাৎ পঞ্চচত্বারিংশ সূত্র হইলেও অর্থ করিবার সময়, এই সকল সূত্র, 'ষষ্ঠী স্থানে যোগা' সূত্রের অধিকারে লইয়া গিয়া অর্থ করিব, তাহা হইলেই কোনও দোষ থাকিবে না। কারণ, এক্ষণে সূত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে;—'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। 'ইগ্ যণঃ সংপ্রসারণম্' ১।১।৪৫ (যণের স্থানে যে ইক তাহার সংপ্রসারণ সংজ্ঞা হয়)। 'উরণ্ রপরঃ' ১।১।৫২ ('ঋ' স্থানে যে 'অণ্' তাহা 'র' পর বিশিষ্ট হইয়া প্রবর্ত্তিত হয়।)

অথ চতুর্থ আহ্নিকঃ।

ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে ।১।১।৪।

ন ।১°। ধাতুলোপে ।৭°। আর্ধধাতুকে ।৭°।

ধাতুর অংশের লোপনিমিত্তক-আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, 'ইক্'এর গুণও হয় না এবং বৃদ্ধিও হয় না।

ভাষ্যমূলম্।—ধাতুগ্রহণং কিমর্থম্। ইহমাভূৎ। লুঞ্। লবিতা। লবিতুম্। পূঞ্। পবিতা। পবিতুম্।

আর্ধধাতুক ইতি কিমর্থম্। ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি।

কিং পুনরিদমার্দ্ধধাতুকগ্রহণং লোপবিশেষণম্। আর্দ্ধধাতুকনিমিত্তে লোপে সতি যে গুণবৃদ্ধী প্রাপ্নুত স্তে ন ভবত ইতি। আহোস্বিদ্‌গুণবৃদ্ধিবিশেষণমার্ধধাতুকগ্রহণং ধাতুলোপে সত্যার্ধাতুকনিমিত্তে যে গুণবৃদ্ধি প্রাপ্নুত স্তে ন ভবত ইতি।

কিং চাতঃ। যদিলোপবিশেষণম্। উপেদ্ধঃ। প্রেদ্ধঃ। অত্রাপি প্রাপ্নোতি।

অথ গুণবৃদ্ধিবিশেষণম্। ক্নোপযতীত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে' এই সূত্রে, 'ধাতু' এই শব্দটি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? যদি 'ধাতু' গ্রহণ না করা যাইত, তবে ধাতুর লোপ ভিন্ন যে কোন প্রকারের লোপ হইলেই গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না; সুতরাং 'লূঞ্' ধাতুর, কেবল উভয়পদী-সম্পাদনার্থ যে 'ঞ' অনুবন্ধ করা হইয়াছে, সেই 'ঞ'র লোপ হইলেই গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না; অতএব 'লূ' ধাতুর উকারের গুণ হইয়া 'লবিতা' 'লবিতুম্' ইত্যাদি প্রয়োগও সিদ্ধ হইত না। অথবা 'পূঞ্' ধাতুরও 'পবিতা,' পবিতুম্' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইত না।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সূত্রে 'আর্ধকধাতুক' শব্দ কি জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে?

'ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি' (তিন প্রকারে বদ্ধ হইয়া বৃষভ, অতিশয় ধ্বনি করিয়া থাকে) এই স্থানে, 'রোরবীতি' শব্দে, 'রু' ধাতুর উত্তর 'যঙ্' প্রত্যয় করিলে, 'যঙন্ত রুরুয়' ধাতুর 'য'কার লোপ প্রযুক্ত, ধাত্বংশ লোপ হইলেও, আর্ধধাতুক-নিমিত্তক-লোপ না হওয়াতে এবং তদনন্তর-বিধেয় 'তিপ্' প্রত্যয়, 'আর্ধধাতুক' না হইয়া সার্বধাতুক হওয়াতে, তন্নিমিত্তক (সার্বধাতুক গুণ

হইলেও আর্ধধাতুক নিমিত্তক) গুণ না হওয়াতে, এই স্থলে, গুণের বা বৃদ্ধির নিষেধ হইল না, অর্থাৎ 'রু'র গুণই হইয়া 'রোরবীতি' প্রয়োগ সিদ্ধ হইল।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে,—এই সূত্রে যে 'আর্ধধাতুক' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা কি লোপেরই বিশেষণ হইবে? অর্থাৎ এইরূপ অর্থ হইবে যে, আর্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হইলে, যেখানে যে গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্তি আছে, তাহা হইবে না?

অথবা গুণবৃদ্ধির বিশেষণবিশিষ্ট আর্ধধাতুক গ্রহণ করিব? অর্থাৎ যে কোন কারণে ধাত্বংশের লোপ হইলেই, আর্ধধাতুক-নিমিত্তক যে গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইত, তাহা হইবে না?

আচ্ছা, যদি লোপেরই বিশেষণ করি, তাহাতেই বা কি হইবে?

উপ পূর্ব্বক এবং প্র পূর্ব্বক 'ইন্ধী' ধাতুর 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে, ক্ত প্রত্যয়ের 'ক'কার ইৎ হইলে, 'অনিদিতাং হল উপধায়া ক্ঙিতি চ।৬।৪।২৪ (হলন্ত ইকার ইৎ বিহীন যে অঙ্গ, তাহার উপধাভূত 'ন'কারের লোপ হয়, ককার বা ঙকার ইৎ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে 'ন' কারের লোপ হইলে, আর্ধধাতুক নিমিত্ত গুণ না হওয়াতে গুণের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং 'উপেদ্ধঃ' 'প্রেদ্ধঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ হইবে না।

অনন্তর গুণবৃদ্ধিরই বিশেষণ করিব?

তাহা হইলেও 'ক্নূঞ' ধাতুর উত্তর 'ণিচ্' প্রত্যয় করিলে, তৎস্থানে 'পুক্' আগম হইলে, 'পুক্' অন্তের ধাতু সংজ্ঞা হওয়াতে, 'পূ' র উকার ধাত্বংশ লোপ হওয়াতে, 'ক্নু' 'উকারের 'গুণ' হইবে না; সুতরাং 'ক্নোপয়তি' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না। গুণের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—যথেচ্ছসি তথাস্ত॥ অস্ত লোপবিশেষণম্॥ কথম্ উপেদ্ধঃ প্রেদ্ধঃ ইতি॥

বহিরঙ্গো গুণোঽন্তরঙ্গঃ প্রতিষেধঃ। অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে।

যদ্যেবং, নার্থো ধাতুগ্রহণেন। ইহ কস্মান্ন ভবতি। লূঞ্। লবিতা। লবিতুম্।

আর্ধধাতুকনিমিত্তে লোপে প্রতিষেধঃ। ন চৈষ আর্দ্ধধাতুকনিমিত্তো লোপঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যেমন ইচ্ছা কর, তেমনই হউক্। হউক্ তবে লোপেরই বিশেষণ?

তবে 'ইন্ধী' ধাতুর 'ন'কার লোপ হইয়া 'ইদ্ধঃ' হইলে, 'উপ' উপসর্গের সহিত

মিলিত হইলে, 'আদ্‌গুণঃ' সূত্রানুসারে, 'উপ' এবং 'প্র' উপসর্গের 'অ'কারের পরে 'ইন্ধ'র ইকার থাকাতে, কিরূপে 'গুণ' হইবে এবং 'উপেদ্ধঃ' 'প্রেদ্ধঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে? এই স্থলে দোষ হইবে না; যেহেতু,—যখন 'ইন্ধ' ধাতুর 'ন'কারের লোপ হইয়া 'ক্ত' প্রত্যয় যোগ হইবে, তখন, 'উপ' বা 'প্র' উপসর্গ সংযোগ না হওয়াতে, 'আদ্‌গুণঃ' ৬।১।৮৭। (অ বর্ণের পরে 'অচ্‌' থাকিলে, পূর্ব্বাপরের স্থানে গুণ-রূপ এক আদেশ হয়, সংহিতা-বিষয়ে) সূত্রানুসারে গুণ-কার্য্য বহিরঙ্গ এবং গুণবৃদ্ধির নিষেধকার্য্য অন্তরঙ্গ হইবে। এক্ষণে, 'অন্তরঙ্গ-কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গকার্য্য অসিদ্ধ হয়,' এই পরিভাষানুসারে, বহিরঙ্গগুণ-কার্য্য অসিদ্ধ হইবে। সুতরাং যখন অন্তরঙ্গ নিষেধ বহিরঙ্গগুণ-কার্য্যকে দেখিতেই পাইবে না। অতএব পরে গুণ ও হইয়া যাইবে। 'উপেদ্ধঃ' 'প্রেদ্ধঃ' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

যদি এইরূপই হয়, তবে 'ন ধাতু লোপ আর্দ্ধধাতুকে' সূত্রে, 'ধাতু' শব্দ গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নাই?

যদি বল যে, 'ধাতু' গ্রহণ না করিলে, 'লূঞ' ধাতুর 'ঞ'কার ধাত্বংশ না হইলেও ত তাহার লোপ হওয়াতে, 'লু' ধাতুর উকারের গুণও হইবে না, 'অব্‌' আদেশ হইয়া 'লবিতা' 'লবিতুম্‌' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না?

এই স্থলেও দোষ হইবে না। কারণ, আর্দ্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হইলেই, গুণ বা বৃদ্ধির প্রতিষেধ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু এই স্থলে, 'ঞ' লোপ, আর্দ্ধধাতুক-নিমিত্তক হয় নাই। অতএব কোন দোষও হইবে না।

ভাষ্যমূলম্‌।—অথবা পুনরস্তু গুণবৃদ্ধিবিশেষণম্‌। নমু চ ক্নোপয়তীত্যত্রাপি প্রাপ্নোতীতি। নৈষ দোষঃ। নিপাতনাৎ সিদ্ধম্‌॥ কিং নিপাতনম্‌। চেলে ক্নোপেরিতি পরিগণনং কর্ত্তব্যম্‌।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা 'আর্দ্ধধাতুক' শব্দ, পুনশ্চ গুণবৃদ্ধিরই বিশেষণ হউক। যদি চ পূর্ব্বোক্ত 'ক্নোপয়তি' শব্দে, 'পুক্‌'এর 'উ'কার লোপনিমিত্তক, 'ক্নূ'র 'উ'কারের গুণ নিষেধ হইয়া, 'ক্নোপয়তি' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না, এইরূপ দোষ বল, তবে তাহাতেও কোন দোষ হইবে না। কারণ, তাহাও নিপাতনেই সিদ্ধ হইবে।

কি সেই নিপাতন?

'চেলে ক্নোপেঃ ।৩।৪।৩৩। এই সূত্রে যে হেতু সূত্রকার 'ক্নোপ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই জ্ঞাপকানুসারেই এইরূপ জানিতে হইবে যে, 'ক্নূঞ্‌' ধাতুর 'উ'কারের গুণ নিপাতনেই সিদ্ধ হইবে। তবেই 'ক্নোপয়তি' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

এক্ষণে, কোন্ কোন্ স্থলে গুণবৃদ্ধির নিষেধ হয়, তাহার গণনা করা কর্ত্তব্য।

বার্ত্তিকামূলম্।—যঙ্ যক্ক্যবলোপে প্রতিষেধঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—যঙ্, যক্, ক্যপ্ এবং বকার লোপবিষয়ে, গুণ বা বৃদ্ধির প্রতিষেধ হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্।—যঙ্যক্ক্যবলোপে প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। যঙ্। বেভিদিতা। মরীমৃজঃ॥ যক্। কুষুভিতা। মগধকঃ॥ ক্যচ্। সমিধিতা। দৃষদকঃ॥ বলোপে। জীরদানুঃ। কিং প্রয়োজনম্॥

বঙ্গানুবাদ।—যঙ্, যক্, ক্যপ্ এবং বলোপবিষয়ে, গুণবৃদ্ধির প্রতিষেধ বলিতে হইবে।

যঙন্তের দৃষ্টান্ত যথা;—ভিদির বিদারণে ধাতু। তদুত্তর যঙ্ প্রত্যয় করিলে বেভিদ্য হইলে পরে, তৃচ্ প্রত্যয় করিব। এক্ষণে 'যস্য হলঃ' ।৬।৪।৪৯। (হল্ এর পরস্থিত 'য'কারের লোপ হয়, আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে 'য'কারের লোপ হইলে, সেই ধাত্বংশ 'য'কারের লোপ নিমিত্ত 'ভিদ্'এর 'ই'কারের গুণ নিষেধ হইল। এইরূপ 'মৃজ্' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'মরিমৃজঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। ইহা, 'যঙোচিচ' ।২।৪।৭৪। (অচ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে, 'যঙ্'এর লুক্ হয়, এই সূত্রে 'চ'কার গ্রহণ করাতে তাহা বিনাও লুক্ হয়) সূত্রানুসারে, 'যঙ্'এর লুক্ হইয়া প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে।

'যক্' লোপের দৃষ্টান্ত যথা;—'কুষুভ' ও 'মগধ' ধাতু কণ্ড্বাদিগণ-পঠিত। কণ্ড্বাদিভ্যো যক্ ।৩।১।২৭। এই সূত্রানুসারে, কণ্ড্বাদিগণ-পঠিত, 'কুষুভ'ও 'মগধ' ধাতুর উত্তর, 'যক্' প্রত্যয় করিয়া, 'সনাদ্যন্তাধাতবঃ' ।৩।১।৩২। (সন্ আদি হইতে আরম্ভ করিয়া, 'কমের্ণিঙ্' স্থিত নিঙন্ত প্রত্যয় অন্তে আছে যাহাদের, তাহাদের ধাতু সংজ্ঞা হয়) এই সূত্রানুসারে, ধাতু সংজ্ঞা হইলে, তদুত্তর 'ণ্বুলতৃচৌ' সূত্রানুসারে 'তৃচ্' এবং 'ণ্বুল' প্রত্যয় করিব। এক্ষণে 'যস্য হলঃ' সূত্রানুসারে 'য'কারের লোপ হইলে, ধাত্বংশলোপনিমিত্তক গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না, সুতরাং 'তৃচ্' প্রত্যয়ে 'কুষুভিতা' এবং 'ণ্বুল্' প্রত্যয়ে, 'মগধকঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ক্য লোপের দৃষ্টান্ত যথা;—সমিধ এবং দৃশদ শব্দের উত্তর 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্'। (১) সূত্রানুসারে, ইচ্ছার্থে 'ক্যচ্' প্রত্যয় করিলে, তাহার ধাতু সংজ্ঞা করিবার

(১) ৩।১।৮ সূত্র। যদি ইচ্ছার্থক কর্ম্ম পদ, ইচ্ছার্থ কর্ত্তার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া সুবন্ত অর্থাৎ নাম হয়, তবে তাহার উত্তর ইচ্ছার্থে ক্যচ্ প্রত্যয় হয়।

পরে, 'ক্যস্যবিভাষা'। (১) সূত্রানুসারে, 'য'কারের লোপ করিলে, ধাত্বংশলোপ-নিমিত্তক গুণ-বৃদ্ধি না হইয়া 'তৃচ্' প্রত্যয়ে 'সমিধিতা' এবং 'ণ্বুল্' প্রত্যয়ে, দৃষদ্‌ক প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ব লোপের দৃষ্টান্ত যথা ;—'জীব' ধাতুর উত্তর উনাদিস্থিত 'রদানুক্' প্রত্যয় করিলে, 'লোপোব্যোর্বলি'। (২) সূত্রানুসারে, 'ব'কারের লোপ হইলে, সেই ধাত্বংশ 'ব'কারের লোপনিমিত্তক, (আর্ধধাতুক পরে থাকিলেও) গুণ হইবে না ; সুতরাং 'জীরদানু' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

ধাত্বংশ লোপ হইলে কোন্ কোন্ স্থলে, আর্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হয় না, তাহার গণনা করিবার প্রয়োজন কি ? অর্থাৎ যাবতীয় স্থলেই কেন ধাত্বংশ লোপে, গুণবৃদ্ধির নিষেধ হয় না ?

তাহা হইলে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে দোষ ঘটিবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—নুম্‌লোপস্রিব্যনুবন্ধলোপেষু প্রতিষেধার্থম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—নুম্ লোপে, স্রিব্ ধাতুর অংশ লোপে এবং অনুবন্ধলোপে গুণবৃদ্ধি নিষেধের প্রতিষেধ হইবার জন্য, পরিগণন করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—নুম্লোপে স্রিব্যনুবন্ধলোপে চ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ।

নুম্লোপে। অভাজি। রাগঃ। উপবর্হণম্। স্রিবেঃ। আস্রেমাণম্। অনুবন্ধলোপে। লুঞ্। লবিতা। লবিতুম্।

ভাষ্যানুবাদ।—নুম্ লোপে, স্রিব্ ধাতুর অংশ লোপে এবং অনুবন্ধ লোপে, যাহাতে গুণবৃদ্ধির প্রতিষেধ না হয়, অর্থাৎ গুণবৃদ্ধিই হয়, সেই জন্য পরিগণন করা কর্ত্তব্য।

'নুম্' লোপের দৃষ্টান্ত যথা ;—'ভন্‌জ' ধাতুর 'ন'কার, অর্থাৎ 'নুম্'এর লোপ হইলেও, অকারের বৃদ্ধি হইয়া আকার হয়, এইরূপে 'অভাজি' প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। 'রনজ্' ধাতুর 'নুম্' (নকার) লোপ হইলেও 'রাগ', প্রয়োগ 'অ'কারের বৃদ্ধি হওয়াতেই হইবে।

'উপ' পূর্ব্বক 'বৃহি' ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিলে, 'ইদিতো নুম্ ধাতো'

(১) ৬।৪।৫০। সূত্র। হল্ অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণের পরস্থিত ক্যচ্ এবং ক্যঙ্‌র লোপ হয় বিকল্পে, আর্ধধাতুক পরে থাকিলে।

(২) যকার এবং বকারের লোপ হয়, 'বল্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে।

৭।১।৫৮ সূত্রানুসারে, ইকারের স্থানে 'নুম্' হইলে, 'অচ্যনিটি' (অচ্ পরে থাকিলে 'ইট' বিশিষ্ট ভিন্ন, অন্য কোন ধাতুর 'নুম্'এর লোপ হয়;) কিন্তু তথাপি 'ঋ' কারের গুণ হইয়া 'উপবর্হণম্' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

'স্রিব' ধাতুর দৃষ্টান্ত যথা;—'আস্রেমাণম্' শব্দ বেদে পঠিত হইয়াছে। 'নঞ্' পূর্ব্বক 'স্রিব' ধাতু 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া, 'ব'কারের লোপ হইলেও ধাত্বংশ লোপ-নিমিত্তক গুণনিষেধ না হইয়া 'ই'কারের গুণ হওয়াতে, 'আস্রেমাণম্' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

অনুবন্ধ লোপের দৃষ্টান্ত যথা;—'লুঞ্' ধাতুর 'ঞ্'ধাত্বংশ লোপ হইলেও উকারের গুণ হইয়া, 'লবিতা,' 'লবিতুম্' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। পরিগণন না করিলে, এই সকল দোষ হইত।

ভাষ্যমূলম্।—যদি পরিগণনং ক্রিয়তে। স্যদঃ। প্রশ্রথঃ হিমশ্রথ ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

বক্ষ্যত্যেতৎ। নিপাতনাৎস্যদাদিষিতি। ততর্হি পরিগণনং কর্ত্তব্যম্।

ন কর্ত্তব্যম্।

হুল্লোপে কস্মান্নভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি পরিগণন করা যায়, তবেও ত 'স্যদঃ,' 'প্রশ্রথঃ,' 'হিমশ্রথঃ' (১) ইত্যাদি স্থলেও, গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ প্রাপ্তি হইবে না।

এই সকল স্থলেও দোষ হইবে না। কারণ, স্যদাদিতে, নিপাতনের দ্বারা প্রয়োগসিদ্ধি বলা হইবে।

তাহা হইলে তবে, পরিগণন করাই কর্ত্তব্য?

তাহাও কর্ত্তব্য নহে।

তবে 'নুম্'এর লোপ হইলে, কেন 'গুণ' বা 'বৃদ্ধি'র নিষেধপ্রাপ্তি হইবে না?

বার্ত্তিকমূলম্।—ইক্‌প্রকরণান্নলোপে বৃদ্ধিঃ।

---

(১) স্যন্দূ (প্রস্রবণে) ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া, নুম্ (নকারের) লোপ করিলে, 'স্যদঃ' এবং 'প্র' পূর্ব্বক শ্রন্থ (শ্রন্থগ্রন্থ সন্দর্ভে) ধাতু আর 'হিম' শব্দ পূর্ব্বক 'শ্রন্থ' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিলে (নুম্ লোপ হইয়া) 'প্রশ্রথঃ' 'হিমশ্রথঃ' প্রয়োগ হইবে। কিন্তু ইহারা 'ষণ্ড' লোপাদি গণনার মধ্যে পতিত না হওয়াতে, গুণবৃদ্ধির নিষেধও প্রাপ্তি হইবে না।

গুরুর প্রয়োজন।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।)

পরকাল চিন্তা করে না, এমন মনুষ্য নাই। মৃত্যুর পর কি হয়, এ চিন্তা সকলকেই ব্যাকুল করে। পরকাল নাই, এ কথা দৃঢ়রূপে বলিতে কেহ পারে না এবং পরকাল আছে, ইহা ঠিক ধারণা করা অতি অল্পলোকের ভাগ্যে ঘটে। প্রায়ই সন্দেহ একেবারে দূর হয় না। পরকাল চিন্তা করিতে ঈশ্বর চিন্তা আসে; ঈশ্বর আছেন কি না—এ সম্বন্ধে নানা বাদানুবাদ মনে উঠিতে থাকে। একেবারে নাস্তিক প্রায় কেহ হয় না এবং ঠিক আস্তিকও অতি বিরল। এখানেও সন্দেহ। নাস্তিকেরা বলেন, ঈশ্বর আছেন, তাহার প্রমাণ পাই না। বিষয় দুর্জ্ঞেয়, কালে কেহ প্রমাণ পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত প্রমাণ নাই। কিন্তু প্রমাণ নাই বলিয়া, নিশ্চিন্ত হওয়াও কঠিন। যিনি প্রমাণাভাব বলেন, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, একবার কল্পনা করুন, কিরূপ প্রমাণ পাইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন, তিনি সহজে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন না। অনেকেই চিন্তা না করিয়া বলিয়া দেন, যেমন চুণে হলুদে মিশাইলে লাল হয়, তাহা মিশাইয়া প্রমাণ করা যায়; আগুনে পোড়ে; এরূপ যদি প্রমাণ পাই, তাহা হইলে বিশ্বাস করি। কিন্তু তিনি স্থিরচিত্ত হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ হইতে পারে না। ঈশ্বর বলিলেই জড় হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বুঝায়, জড় পরীক্ষায়, জড় সম্বন্ধে সত্য প্রকাশ পায়, সে প্রমাণে যাহা চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করি, তাহা প্রামাণ্য হইতে পারে না। জড় সম্বন্ধে কোন সত্যের প্রমাণ ইন্দ্রিয়ের অগোচর নয়। দেখিলাম, বৈদ্যুতিক শক্তি বলে সূচিকা নড়িল। বুঝিলাম, বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা সূচিকা নড়ে; সূচিকা কি, জানি,—বৈদ্যুতিক শক্তি কি, তাহাও কতক বুঝিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন কিছু জানা নাই। যদি বলেন, ঈশ্বরকে দেখিলে বিশ্বাস করি, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, দেখা কাহাকে বলে? চোখে দেখিয়া? স্পর্শে? বা কিরূপ দেখিলে তিনি বিশ্বাস করেন? এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত আছে, চক্ষে দেখিয়া বিশ্বাস করিলেন, সে ব্যক্তি উপস্থিত। কিন্তু ঈশ্বর যদি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন, তিনি কিরূপে বুঝিবেন,—তিনি ঈশ্বর? কিরূপে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার ঠিক ধারণা হইবে?

আমরা অসীম, অনন্ত বলিয়া ঈশ্বরের উপাধি দিয়া থাকি। যাহা অনন্ত, তাহা চক্ষু বা স্পর্শ দ্বারা উপলব্ধি হইবে, এ কথা যুক্তিতে পরিহাসের বিষয়। তবে কিরূপ প্রমাণ আবশ্যক? যদি কল্পনা করেন, যে, কল্য টেলিগ্রাফ আসুক যে, তাঁহার পুত্রকে রুষেরা "জার" (Czar) পদে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর মানিবেন। এরূপ অসম্ভব ঘটনা সংঘটন হইলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত হইল না। কার্য্যকারণশৃঙ্খলে এরূপ ঘটনা সংবদ্ধ ছিল, তাহা অনায়াসে যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ হইবে। যেহেতু অকারণে রুষেরা তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবে না; কার্য্য হইলেই তাহার কারণ থাকিবে। মৃত ব্যক্তি জীবিত হইয়া আসিলেও, প্রথমতঃ সে সত্য মরিয়াছিল কি না, তাহার প্রতি সন্দেহ, যাহারা তাহাকে মরিতে দেখিয়াছিল, তাহাদের প্রতি অবিশ্বাস; স্বয়ং যদি কেহ দেখিয়া থাকেন, যে, এক ব্যক্তি মরিয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, তখনও তাহার মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে যে, হয় তো মরে নাই। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যাহাকে মৃত বলিয়া সকলে জানিয়াছিল, যাহাকে গোর দিতে অনেকে দেখিয়াছিল, শেষ প্রমাণ হইল যে, সে মরে নাই। চটুকে নভেলে পিতামাতা আত্মীয় সম্বন্ধে এরূপ কল্পনা অনেক আছে। পুরাবৃত্তে হঠাৎ একজনকে রাজা নির্ব্বাচন করার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ঈশ্বরসাহায্য ব্যতীত রাজা হওয়াও অনেক স্থলে কল্পিত হইয়াছে। যেমন আরব্যোপন্যাসে "আবুহোসেন" একদিন বাদসাহ হইয়াছিল।

এইরূপ শত শত অসম্ভব কল্পনা ফলবতী হইলেও, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হইল না। যাদু, ভেল্‌কী, প্রাকৃতিক নিয়ম প্রভৃতি যুক্তি আসিয়া, যাহা পূর্ব্বে অসম্ভব অনুমিত হইয়াছিল, তাহা সম্ভব করিয়া দিবে। শুনা যায়, একবার না কি জাহ্নবী জলশূন্য হইয়াছিল। এ ঘটনা ইতিহাসমূলক,—এ ঘটনার সম্বন্ধেও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। যদিও কোন্ নিয়মে ইহা হইয়াছিল, তাহা কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, তথাপি যে, এই ঘটনায় "ঈশ্বর ইচ্ছাই কারণ" এ কথা কেহ বলেন নাই। অজানিত প্রাকৃতিক ঘটনায় ইহা ঘটিয়াছে—ইহাই সকলের সিদ্ধান্ত। যত প্রকার অলৌকিক কার্য্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হউক না, সকলেরই কারণ অনুসন্ধান করি। অদ্ভুত কোন স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইলে আমরা বলি, কোটী কোটী স্বপ্ন দেখি, তাহার মধ্যে একটা মিলিয়াছে, এই মাত্র। অসাধ্য রোগের আরোগ্য হেতু

বিশ্বাস, কোন অলৌকিক দর্শনের হেতু মস্তিষ্কের বিকার। এই বৈজ্ঞানিক সময়ে বৈজ্ঞানিক কারণে এই সকল কার্য্য হইয়াছে, ইহাই স্থির করা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেরূপ সন্দেহ ছিল, সেইরূপ সন্দেহই থাকে।

তার পর এরূপ প্রমাণ চাওয়া অসঙ্গত। ঈশ্বর তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিবার নিমিত্ত ব্যাকুল নন। যদি এরূপ প্রমাণ দিতে তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর নন। বরং যাঁহাদের কাছে তিনি এরূপ প্রমাণ দেন, তাঁহারা তাঁর ঈশ্বর। মোট কথা এই, বুদ্ধি দ্বারা এরূপ প্রমাণ কল্পিত হইতে পারে না, যাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহা অসিদ্ধ, তাহা মানিব কেন? শাস্ত্র বলেন যে, মনোবুদ্ধির অগোচর ঈশ্বর, ভক্তের গোচর হন। শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস করিয়া যে মহাপুরুষ শাস্ত্রসঙ্গত অনুষ্ঠান করিয়াছেন,—তিনি বলেন, আমি ঈশ্বর পাইয়াছি। কেবল তিনি পাইয়াছেন, তাহা নয়, তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বর-লুব্ধ ব্যক্তি মাত্রেই, নিঃসন্দেহ ঈশ্বরলাভ করিবে। দেখা যায়, সে মহাপুরুষ নিষ্কাম, অথচ সাধারণ সকাম ব্যক্তির ন্যায় দ্বারে দ্বারে এ কথা প্রচার করিয়া থাকেন। তর্কের নিমিত্ত, ঈশ্বর আছেন স্বীকার করিলে, যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি অতি নির্ম্মল হইবেন, কল্পনা করা যায়। বস্তুতঃ দেখা গিয়াছে যে, যিনি ঈশ্বর আছেন, প্রচার করেন, তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল। যাঁহার ঈশ্বরলাভ হইয়াছে, তাহার সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হওয়া উচিত। বাস্তবিক প্রচারকও সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয়, ইহা শত পরীক্ষায় দেখা যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই, এই মহাপুরুষ সমাধিস্থ হইয়া, সেই ভূত ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত অনায়াসে জানিতে পারেন। ইহারও শত পরীক্ষায় শত শত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে ঈশ্বরলব্ধ ব্যক্তির যে সকল লক্ষণ আছে, সেই সকল লক্ষণ এই মহাপুরুষে প্রকাশ। অবশ্য এ কথা বলিতেছি না যে, ইহা দ্বারা ঈশ্বরের প্রমাণ পাইলাম, কিন্তু ঈশ্বর অসিদ্ধ, তাহা সাব্যস্ত করিবার বিশেষ বাধা জন্মিল। এক্ষণে সন্দিহানচিত্ত মনুষ্যের কি উপায় অবলম্বন করা উচিত? ঈশ্বর আছেন কি না, যাঁহার জানিবার সাধ, তাঁহার কর্ত্তব্য কি? সদ্‌যুক্তি অবশ্য বলিবে, এই মহাপুরুষের আশ্রিত হও। যদি ঈশ্বর চাও, এই গুরুর আনুগত্য ভিন্ন আর উপায় নাই। তিনি যাহা বলেন, তাহাই করো। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তিনি কোন নীতিবিরুদ্ধ কথা বলেন না। যে সকল আচার অবলম্বন করিতে তিনি আদেশ দেন

তাঁহাতে মানবহৃদয় অতি উচ্চ হয়। তিনি সত্যবাদী হতে বলেন, জিতেন্দ্রিয় হতে বলেন, হিংসাদ্বেষাদি পরিহার করিতে বলেন, নির্ম্মলচরিত্র ঈশ্বরের ধ্যান করিতে বলেন, এবং দৃঢ় করিয়া বলেন, এই সকল অনুষ্ঠানে, নিশ্চয় ঈশ্বর লাভ হইবে। সত্য যিনি ঈশ্বর লাভ করিতে চান, তিনি এই গুরুকে শত প্রণাম করিয়া তাঁহার উপদেশমত ব্রতী হইবেন নিশ্চয়। গুরু বলেন, এইরূপ অনুষ্ঠানে তোমার সন্দেহ দূর হইবে, স্বয়ং ঈশ্বর তোমার সন্দেহ দূর করিয়া দিবেন। গুরু বলেন, "আমার সন্দেহ তিনি দূর করিয়াছেন।"

সন্দিহানচিত্ত আপত্তি করিতে পারে, এ মহাপুরুষ অতি উচ্চ ব্যক্তি সত্য, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে ইনি তো ভ্রমে পড়েন নি? যেমন কি-না-কি একটা দেখিয়া লোকে বলে, ভূত দেখিয়াছে,—ইহাঁর তো সে অবস্থা নয়? এ আপত্তির উত্তর একটী আছে;—মনোবুদ্ধির অগোচর পরমাত্মাকে আত্মার দ্বারা উপলব্ধি করাই সম্ভব। এই মহাত্মা আত্মাতে পরমাত্মা অনুভব করিয়াছেন। আমাদের অন্তরে যাহা হইতেছে, তাহা আমরা অনুভব করি এবং তাহা ভুল নয়। ক্রোধ হইয়াছে, আমরা জানিতে পারি—ভুল নয়। দয়ার উদ্রেক হইয়াছে, তাহা জানিতে পারি—ভুল নয়! তবে যে, গুরু বলিতেছেন, অসীম অনন্ত ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত, তিনি অনুভব করিয়াছেন, সত্য-সেবী মহাপুরুষের কি সেইটী ভুল? সন্দেহ নির্ম্মূল না হইতে পারে, কিন্তু এরূপ চিন্তায় সন্দেহের বেশী জোর থাকে না; ইচ্ছা আপনি উদয় হয়, এই মহাপুরুষের অনুসরণ করি। শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বর লাভ হয়। ইনি বলেন, লাভ করিয়াছি। শাস্ত্র কত পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রবাক্য ইহাঁর জীবনে পরীক্ষিত। অতএব নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তি বুঝিবে যে, গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত, আমার আর উপায় নাই।

ধ্রুবচরিত্র।

তৃতীয় অঙ্ক।—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(অমাত্যগণবেষ্টিত উত্তানপাদ আসীন)

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। মহারাজ! মুনিপুত্রগণ

দাঁড়ায়ে দুয়ারে রাজদরশন হেতু।
রাজাজ্ঞা হইলে
আনয়ন করি হেথা।

উ। আন ত্বরা সম্মুখে আমার।

প্র। যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

(প্রস্থান)

(ধ্রুব ও মুনিবালকগণের প্রবেশ)

১ম বা। জয় হোক! মহারাজের জয় হোক।

উত্তান। কহ হে বালকগণ!
কি হেতু আসিলে আজি রাজসভা মাঝে?

১ম বা। রাজ দরশন হেতু মহারাজ!

উত্তান। (স্বগতঃ) পাংশু আচ্ছাদিত অনল সদৃশ
কেবা এই শিশু শিশুদের মধ্যস্থলে?
যত কাছে আসে
তত প্রাণ করে আকর্ষণ।
নিরখি শিশুরে
নাহি জানি কেন প্রাণের ভিতরে
স্নেহের আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিল!
ছায়াসম যেন কার মুখ পড়ে মনে;
কার মুখপ্রতিবিম্ব ইহা?
চল চল উজ্জ্বল নয়ন হেরি
যেন কার চক্ষু পড়ে মনে!
কার—ভাল মনে নাহি আসে।
আপনা আপনি ধায় বাহুদ্বয়
ধরিতে উহারে অঙ্কে
প্রাণ চাহে সম্ভাষিতে পুত্র বলি।
নাহি জানি কাহার কুমার এই শিশু।
(প্রকাশ্যে) কহ শিশু কিবা তব নাম?

ধ্রুব। ধ্রুব মম নাম।

উত্তান। (স্বগতঃ) শুনিয়াছি বীণার ঝঙ্কার,

নূপুর নিক্কণ;
কিন্তু শুনি নাই কভু
শিশুকণ্ঠে হেন সুমধুর ধ্বনি।
কহ শিশু, কিবা তব পিতৃনাম?

ধ্রুব। উত্তানপাদ।

উত্তান। কি কহিলে?—উত্তানপাদ! উত্তানপাদ!
কহ পুনঃ, না মানে প্রত্যয় মন—
কিবা তব পিতৃনাম?

ধ্রুব। সত্য মহারাজ! উত্তানপাদ মম পিতৃনাম।

উত্তান। (স্বগতঃ) আমিই কি তবে জনক ইহার?
না—না;—এও কি সম্ভবে!—
এক নামে দুই জন থাকিতে ত পারে!
অন্য প্রশ্ন করি,
সুধাই ইহার প্রসূতির নাম।
(প্রকাশ্যে) কহ শিশু! কিবা তব মাতৃনাম।

ধ্রুব। মা।

উত্তান। তাই ব'লে ডাক তাঁরে তুমি;
কিন্তু নাম কি তাঁহার?

ধ্রুব। "মা" "মা" ব'লে মাকে ডাকি;
"মা"ই আমার মায়ের নাম;
অন্য নাম নাহি জানি মার।

উত্তান। (স্বগতঃ) অতীব সরল শিশু!
সুধাই অন্য বালকেরে।
(প্রকাশ্যে) কহ শিশু, ধ্রুবের জননী নাম।

১ম বা। সুনীতি।

উত্তান। (স্বগতঃ) সুনীতি! সুনীতি!
আমার সেই নির্ব্বাসিতা, পতিব্রতা
সাধ্বী সুনীতিই জননী ইহার!
পড়ে মনে—পঞ্চবর্ষ আজি হইল বিগত
মৃগয়ায় গিয়াছিনু একদিন;

রজনীর সেই দারুণ দুর্য্যোগে
দেখা হ'ল সুনীতির সনে ;
যাপিনু যামিনী কুটীরে তাহার ;
এই সে সুন্দর শিশু ঔরসে আমার।
(প্রকাশ্যে) বৎস ! পিতা আমি তব ;
কোলে এস আনন্দ আমার,
কোলে এস প্রতিবিম্ব মোর,
চুমি তব ও চাঁদ বদন।

(ধ্রুবকে কোলে ধারণ)

(অন্তরাল হইতে সুরুচির প্রবেশ)

সুরু। একি রাজা !
কাহার সন্তান কোলে ?
ধ্রুব নাকি এর নাম ?
(কিয়ৎক্ষণ পরে) কি দেখিছ রাজা
মুখপানে চাহি স্তম্ভিত নয়নে ?
অন্তরালে থাকি শুনিয়াছি সব।
নির্ব্বাসিতা দাসী পুত্র আজি রাজ অঙ্কে ?
সোণার উত্তমে ফেলি
স্থাপিয়াছ অঙ্কে কি না দাসীর সন্তানে ?
রাজ অঙ্ক আজি করিলে ঘৃণিত ?
ছি ছি ! রাজা ! উত্তমে আমার
না করিও কোলে আর !

(রাজার ধ্রুবকে কোল হইতে নামাইয়া দেওন)

ধ্রুব। একি পিতা !
কোল থেকে কেন নামাইলে ?
এই পুত্র বলি লইলে যে কোলে—
আবার নামালে কেন ?

সুরু। ও রে রে নির্ব্বোধ শিশু !
ফিরে চা আমার পানে।
চেয়ে দেখ —কে আমি সম্মুখে তোর।

রাজ অঙ্কে চাহ বসিবারে ?

লালসা তোমার রাজসিংহাসনে ?

কেবা আমি নাহি জান তুমি ?

ধ্রুব। ও গো, নাহি জানি কেবা তুমি।

সুরু। নাহি জান কেবা আমি ?

শুন শিশু—রাণী আমি রাজ্যেশ্বরী;

রাজা না থাকিলে,

এ রাজ্য আমার সন্তান পাবে।

ধ্রুব। পাব না কি পিতৃকোলে বসিতে গো তবে ?

সুরু। ওরে মূর্খ !

নাহি জান কার গর্ভে ধোরেছ জনম ?

নাহি জান কে তোমার মা ?

ধ্রুব। মা—মা।

সুরু। ওরে মূর্খ শিশু !

মা তোর নির্ব্বাসিতা পাপিষ্ঠা সুনীতি,

রাজা যারে দিয়াছেন বনবাস।

নির্ব্বাসিতা দাসী পুত্র তুই ;

নাহি অধিকার তোর রাজসিংহাসনে ;

বুঝিলি এখন ?

উ। ক্ষান্ত হও রাণী।

সুরু। ক্ষান্ত হও রাজা !

বুঝাইয়া দিই অগ্রে নির্ব্বোধ বালকে।

তাই বলি, ওরে শিশু,

ফিরে যা আপন কুটীরে।

ধ্রুব। ভাই ! তোরা আমাকে কোথা নিয়ে এলি ? ভাই ! আমি কি দোষ কোরেছি ? রাণী আমাকে বোকুছে কেন ? ভাই ! আমার মাথা ঘুরুচে ; আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না, আমার কি হোচ্ছে। আমি কোথায় এসেছি ! মা ! মা ! ভাই ! আমার মা কোথা ? মা কোথা ? আমি আর দাঁড়াতে পাচ্চি না ; আমার বুকের ভেতর কেমন কোচ্চে। আমার বুক যেন ভেঙ্গে গেল।

(বক্ষে হস্ত দিয়া উপবেশন)

১ম বা। ধ্রুব! চোলে এস ভাই, আমরা বাড়ী যাই; আর এখানে থাক্‌বো না।

সুরু। ওরে দুষ্ট শিশু!
মায়ার রোদন কেন করিতেছ?
ছল করি বসিয়া পড়িলে?
সিংহাসনে এতই লালসা?
উঠে যা—উঠে যা ত্বরা।

উ। কি কর—কি কর রাণি!
এত অপমান
নাহি কর সরল বালকে;
মিষ্টভাবে বুঝাও উহারে।

সুরু। নীরবে তিষ্ঠহ রাজা!
ওরে ধ্রুব! শোন্ মন দিয়া—
যদি সিংহাসনে তোর এতই লালসা,
বনে বনে কান্তারে কান্তারে,
মরুভূমিমাঝে কিম্বা পর্ব্বতকন্দরে,
দিবানিশি অনাহারে অনিদ্রায়,
হরির সাধনা কর।
তুষ্ট যদি হন হরি সাধনায় তোর,
আসিয়া দিবেন দেখা;
এই বর চাহিবি তখন—
"হরি ইহ জন্ম ঘুচাও আমার,
জন্ম দেহ সুরুচি জঠরে।"
জন্ম যদি নিতে পার জঠরে আমার,
আকাঙ্ক্ষা করিও তবে রাজসিংহাসনে;
উত্তমের পার্শ্বে স্থান পাইবি তখন,
নতুবা মনের আশা মিশাও মনেতে।

উ। ছি ছি রাণি!
কলঙ্ক রাখিলে আজি জগৎ ভিতর!
কলঙ্ক নিজের নামে,

কলঙ্ক আমার নামে,
কলঙ্কে পূরিল দেশ ;
বিমাতা আদর্শ করিলে নিজেরে।

সুরু। কেন বৃথা কথা কও রাজা! উন্মাদের প্রায় ?

উ। হায়! কত কাল সব
রমণীর তিরস্কার!
(কিয়ৎক্ষণ পরে) কাহারও নাহিক দোষ
দোষ আপনার।
নিজে স্ত্রৈণ আমি ;
ইচ্ছা হয় নিবারি রাণীরে
কিন্তু নাহি পারি ;
কি এক আশঙ্কা হয় অন্তরে উদয় !
শিশু প্রতি হেন কঠোরতা
না পারি দেখিতে ; —
না পারি তিষ্ঠিতে আর হেথা।

(বেগে প্রস্থান)

ধ্রুব। পিতা! পিতা!
কোথা যাও—কোথা যাও ?
আমি যাব।

(গমন)

সুরু। (বাধা দিয়া) কোথা যাও—
কোথা যাও দুষ্ট শিশু ?
যাও ত্বরা আপন আলয়ে।

১ম বা। ধ্রুব! আয় ভাই—আয় আমরা বাড়ী যাই। আমরা তোকে তোর মার কাছে নিয়ে যাই।

ধ্রুব। ফিরে যা ফিরে যা তোরা, আমি যাব নারে ভাই।
যাকে তোরা বলিস্ গিয়ে ধ্রুব তোমার বেঁচে নাই ॥
মা যখন কাঁদ্‌বে ধ্রুব বোলে,
ভাস্‌বে যখন নয়নজলে,

মুছিয়ে দিও মার মুখ অঞ্চলে, কাঁদতে দিও না মাকে ভাই,
বোলো মাকে হরি সাধনায় যাই ॥
(বালকগণ সহ ধ্রুবের প্রস্থান)

সুরু। (স্বগতঃ) আরে রে নির্ব্বোধ!
সিংহাসনে চাও বসিবারে?
রাজসিংহাসনে তুই বসিবি যদ্যাপি,
মা তোর নির্ব্বাসিতা কেন হোল তবে?
দাসীপুত্রে নাহি শোভে রাজসিংহাসন!
পুত্রস্নেহে রাজা বিগলিত হৃদি;
হইয়াছে কিছু ক্ষুণ্ণ মোর প্রতি;
কিন্তু, কতক্ষণ রবে সেই ভাব?
কাষ্ঠপুত্তলিকাসম রাজা হস্তে মোর!
ইঙ্গিতে ফিরাই তারে!
বসাইব সিংহাসনে উত্তমে আমার,
সেই হবে রাজা, আমি রাজমাতা।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুটীর।

সুনী। রবি অস্ত যায়,
রজনীর ছায়া নামে ধীরে ধীরে;
একটী দুইটী ফুটিয়াছে তারা;
এখনও ধ্রুব তারা মোর
কেন নাহি এল ফিরে?
ব্যাকুল হইল প্রাণ,
স্থির না থাকিতে পারি;
যাই—অগ্রসর হোয়ে দেখি,
ধ্রুব চাঁদ আসে কি না আসে।

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর;)

ওকি! দূর তরুতলে
শিশুগণ আসে ধ্রুবে ধরাধরি করি ;
হেন দশা কেন হইল বাছার ?
কেহ কি মেরেছে বাছায় ?
যাই কোলে কোরে লয়ে আসি।

(প্রস্থান)

(ধ্রুবকে কোলে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

সুনী। বাবা ধ্রুব! কথা কওনা বাবা! আজ মুখ খানি এত ভারি হোয়েছে কেন? চোক দিয়ে জল পোড়্‌ছে কেন? হ্যাঁ বাছা, তোরা বোল্‌তে পারিস্, ধ্রুব আমার অমন কোরে আছে কেন?

১মবা। ওগো, ধ্রুব আমাদের সঙ্গে এক জায়গায় গিয়েছিল।

সুনী। কোথায়?

১মবা। রাজসভায়।

সুনী। কোন্ রাজসভায়?

১মবা। মহারাজ উত্তানপাদের রাজসভায়।

সুনী। কি! মহারাজ উত্তানপাদের রাজসভায়! তারপর?

১মবা। একজন মেয়ে মানুষ বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে আর ধ্রুবকে খুব বকতে লাগল ; রাজা ধ্রুবকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন।

সুনী। তারপর?

১মবা। ধ্রুব সেই অপমানে কাঁদ্‌তে লাগলো ; আস্‌তে চায় না ; আমরা কত কোরে ধরাধরি কোরে এনেছি।

(বালকগণের প্রস্থান)

সুনী। বাবা! কেন তুই আমাকে না বোলে সেখানে গিয়েছিলি বল্ দেখি? সেখানে আর কখনও যেও না বাবা। তুমি দুঃখিনীর ছেলে, তুমি রাজসভায় কি জন্যে যাও? ধ্রুব! এখন কিছু খাও বাবা! নইলে না খেয়ে ঘুমিয়ে পোড়বে, আর খাওয়া হবে না।

ধ্রুব। হ্যাঁ মা! আমি কি রাজার ছেলে?

সুনী। হ্যাঁ বাবা! এখন কিছু খাও।

ধ্রুব। মা! আমি তবে রাজা হব। হ্যাঁ মা! আমরা আর কতদিন বনে থাক্‌বো?

সুনী। যতদিন বাঁচ্‌বো।

ধ্রুব। কেন মা? বাবা কি আমাদের বন থেকে নিয়ে যাবে না?

সুনী। হরি যে দিন ইচ্ছা কোর্‌বেন, সেই দিন নিয়ে যাবেন।

ধ্রুব। হরি কে মা?

সুনী। তা আমি জানি না; তিনি আছেন এইমাত্র জানি।

ধ্রুব। হাঁ মা! হরিকে ডাক্‌লে নাকি রাজা হওয়া যায়?

সুনী। হরি সবই কোত্তে পারেন।

ধ্রুব। মা! তবে আমি হরিকে ডাকবো;—রাজা হব; কেমন মা?

সুনী। হ্যাঁ বাবা! হরিকে ডেকো, তাঁর পূজা কোরো।

ধ্রুব। হ্যাঁ মা, হরি কোথায় থাকে মা?

সুনী। তিনি সকল স্থানেই থাকেন।

ধ্রুব। কৈ?—আমি ত দেখ্‌তে পাচ্চিনি; মা! হরি দেখ্‌তে কি রকম?

সুনী। যে যেরূপে তাঁকে পূজা করে, তিনি তাকে সেইরূপে দেখা দেন। তিনি পদ্মপলাশলোচন; আমি তাঁকে এইরূপে পূজা করি।

ধ্রুব। মা! হরি কোথা থাকে মা—ঠিক কোরে বল না। আমি শুনেছি, হরি নাকি বনে থাকে। আমি বনে যাব।

সুনী। না বাবা, বনে যেও না; সেখানে বাঘ আছে, সাপ আছে, তোমাকে ধোরে নিয়ে যাবে। তুমিও আমাকে আর দেখ্‌তে পাবে না, আমিও তোমাকে দেখ্‌তে পাব না; সেখানে যেও না বাবা। এখন ঘুমোও, রাত হোয়েছে; কাল সকালে মাটীর হরি ঠাকুর গোড়ে দোব, তাই পূজা কোরো। এখন ঘুমোবে চল।

(কুটীর মধ্যে প্রবেশ ও শয়ন)

ধ্রুব। মা! ঘুম আস্‌ছে না যে!

সুনী। আচ্ছা, আমি ঘুম পাড়াই, ঘুমোও।

ধ্রুব। (কিয়ৎক্ষণ পরে) হরি! হরি! হরি! পদ্মপলাশলোচন হরি!

সুনী। ওকি বাবা! ঘুমের ঘোরে চোম্‌কে উঠলে কেন? ঘুমোও, আমি ঘুম পাড়াই। (ঘুম পাড়ান)

(গাইতে গাইতে নিশির প্রবেশ)

নিশি। আমি ঘোরা নিশীথিনী।

নিথর আকাশ, নিথর বাতাস,
নিথর নীরদ, নিথর মেদিনী।
শিরে চন্দ্র শোভে মুকুট আমার,
কটি তটে ছায়াপথ চন্দ্রহার,
তারকা জড়িত বসন আঁধার,
পায়ে বাজে ঝিল্লি রবে নুপুর ধ্বনি।
শ্বাপদ পেচক নিশাচরগণ,
কোলেতে আমার করিছে ভ্রমণ,
নরঘাতী চোরে, ঘোর অন্ধকারে,
ঘোরে চারি ধারে;
আয় লো সজনি, নিদ্রা বিনোদিনী
ঢাল ঢাল ঘুম প্রাণীর নয়নে।

নিদ্রা। (প্রবেশ করিতে করিতে)
যাই লো সজনি, জীবন সঙ্গিনী।

নিশি। হের লো আঁধারে ঢেকেছি কাননে,
ঢেকেছি ধরণী শান্তি আবরণে;

নিদ্রা। ঘুম আয় আয়, নিশি বোয়ে যায়,
প্রাণি কুল ঢোলে পড় মোর কোলে,
ঘুমাও প্রকৃতি, ঘুমাও প্রসূতি,
ঘুমাও সন্তান মায়েরে ভুলে।

উভয়ে। আয় সহচরি, গলে গলে ধরি,
আকাশ পাতাল দুঁহু বোনে যাই,
নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
চুপি চুপি ঘুম চললো বিলাই।

(গাইতে গাইতে প্রস্থান)

ধ্রুব। (নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া) মা! মা! মা ঘুমিয়েছে; আর সাড়া নেই। এখন খালি মায়ের নিশ্বেস বইছে। জেগে আছে কি না দেখি। আবার ডাকি। মা! মা! খুব ঘুমিয়েছে। (জানু পাতিয়া বসিয়া) হরি! হরি! পদ্মপলাশলোচন হরি! কোথা তুমি? কোথা তুমি? কোথা তুমি? দেখা দাও। বাহিরে যাই (বহির্গমন) এই ত বাইরে এলুম; হরি কোথা?

কোথায় যাচ্ছি? অন্ধকার ঘোর অন্ধকার; এই অন্ধকারে আমার হরি আছে। হরি! হরি! পদ্মপলাশলোচন হরি! কোথা তুমি—দেখা দাও। কেন লুকিয়ে আছ—দেখা দাও না। (কিয়ৎক্ষণ পরে) আমার সুমুখে কে? এ পাশে কে? ও পাশে কে? কে তুমি? কাল ছায়ার মত কে তুমি? যাওনা—চোলে যাওনা; আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছ কেন? (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) আবার আস্‌ছো? বল্‌ছি, শুন্‌ছো না,—ফের আস্‌ছো? কে তুমি? আমি যাচ্ছি, তুমি কেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছো? বারণ কোচ্চি, শুন্‌ছো না? অমন কোল্লে মাকে এখনই ডাক্‌বো। দাঁড়াও, মাকে ডাকি। ওমা! কেমন? এখন পালাও। তাই ত, মাকে ফেলে কোথা যাচ্ছি? আমার হরিকে খুঁজ্‌তে। মা যে আমাকে খুঁজ্‌বে;—মা যে আমাকে দেখ্‌তে না পেলে বড় কাঁদ্‌বে। না—ফিরে যাই—শুই গে। মা! মা! মা! এখনও ঘুমুচ্ছে; এই বেলা চুপি চুপি শুইগে; আর যাব না, ঘুমুই। (কুটীরে প্রবেশ ও শয়ন ও কিয়ৎক্ষণ পরে) না—শোব না, আর থাক্‌বো না, যাই। (বহির্গমন) হরিকে ডাক্‌লে রাজা হব, বাবার কোলে বস্‌তে পাব; হরি! আমাকে রাজা কর। হরি কোথায় থাকে?—সেই যে রাণী বোলেছে "বনে বনে কান্তারে কান্তারে"; হরি বনে থাকে, মাও বোলেছে; আমি বনে যাব। না—মা কাঁদ্‌বে; আমাকে আর দেখ্‌তে পাবে না, ডাক্‌বে, খুঁজ্‌বে, পাবে না, কাঁদ্‌বে। ফিরে যাই, যাব না, শুইগে। (কুটীর দ্বারে যাইয়া ডাকিয়া) মা! মা! মা! এখনও ঘুমুচ্ছে; বেশ সুবিধা। এমন সুবিধা আর হবে না। এখন না গেলে আর হরিকে পাব না। এখনই পালাই; মা কিছুই জান্‌তে পার্‌বে না। মা যে আমাকে বড় ভাল বাসে, আমি ভিন্ন মায়ের কেউ নাই যে! আমি গেলে মায়ের কাছে থাক্‌বে কে? না, আমি যাব না; আমি গেলে মা বড় কাঁদ্‌বে; না, না, আমি যাব, আমি রাজা হব; মাকে বন থেকে নিয়ে যাব, মায়ের দুঃখ ঘুচ্‌বে। হরি! আমার মা রইল। দেখো, মা আমার জন্যে কাঁদ্‌বে; হরি! তুমি মাকে সান্ত্বনা কোরো আর বোলো, তোমার ধ্রুব বনে পদ্মপলাশলোচন হরিকে খুঁজ্‌তে গেছে।

(প্রস্থান)

সুনী। (জাগরিত হইয়া) ধ্রুব! ধ্রুব! বাবা ধ্রুব! ধ্রুব!! (শয্যা-অন্বেষণ) কোথা গেল? এই যে ঘুমিয়েছিল। ধ্রুব! ধ্রুব! তুই বড় দুষ্টু হোয়েছিস্; এত রাত্রে কোথায় লুকিয়ে রইলি? ঘরের ভেতর ভাল

কোরে খুঁজে দেখি (অন্বেষণ) কৈ ? নেই ত। কোথায় গেল ? (অল্প কাঁদ কাঁদ স্বরে) ধ্রুব ! ধ্রুব ! বাবা, কোথায় লুকিয়ে রইলি, দেখা দেনা বাবা, আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছিস্ ? দেখা দে। বাহিরে এসেছে কি ? (বহির্গমন) বাহিরে ঘোর অন্ধকার, দৃষ্টি চলে না ; সে ত এত অন্ধকারে আস্‌তে পার্‌বে না। তবে কোথা গেল ? বাবা ! কোথা গেলি, দেখা দেনা বাবা। দেখি, যদি এই বনের ভেতর লুকিয়ে থাকে। (বন অন্বেষণ) কৈ ? এখানে নেই ত। তবে এই ঘোর রাত্রে কোথায় গেল ? সে যে আমা ছাড়া এক দণ্ড থাক্‌তে পারে না। কোথায় গেল ? কে বোলে দেবে, কোথায় গেল। তরু লতা ! তোমরা কি আমার ধ্রুবকে দেখেছ ! দেখে থাক যদি বোলে দাও আমার ধ্রুব কোথায়। তারামালা ! তোমরা আকাশে থেকে চারদিক ত দেখ্‌তে পাচ্ছ ; আমার ধ্রুব কোথায় গেছে, বোলে দাও। কৈ—কেউ ত উত্তর দেয় না—অভাগিনীকে কেউ ত বোলে দেয় না। কোথা যাই—কাকে জিজ্ঞাসা করি ? আর ত স্থির থাক্‌তে পাচ্চি না। ধ্রুব বিনা সব যে অন্ধকার দেখ্‌ছি। ভগবান ! আমার ধ্রুব কোথা, বোলে দাও ;—সে যে আমার অন্ধের যষ্টি, নয়নের মণি, অন্ধকারের আলোক, আমার জীবন আকাশের ধ্রুব তারা। ধ্রুব ছাড়া আর থাক্‌তে পারিনি। কৈ—কেউ ত কিছু বোলে দিলে না। তবে কি আমার অঞ্চলের নিধি হারাল ; আর সইতে পারিনি ; ওহো, বুক ভেঙ্গে গেল ; ধ্রুব ! ধ্রুব ! বাপধন !

(মূর্চ্ছা)

(তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। একি, এ যে দেখ্‌ছি সুনীতি !
সুনীতি ! সুনীতি !
নাহিক উত্তর—
স্পন্দহীন হেন বোধ হয়।
এ যে মুর্চ্ছিত !
সুনীতি ! সুনীতি ! ভগ্নি ! ওঠ ;
কুটীর তেয়াগি
বনমাঝে ধূলায় শয়ন কেন ?

সুনী। কে তুমি ?—ধ্রুব ! আমার প্রাণের ধ্রুব নাকি ? বাবা কোলে এস। (কোলে লইতে উদ্যত)

তপ। নহি ধ্রুব আমি—দেখ চেয়ে।

সুনী। কে ?—ভগিনি!
কি দেখিছ আর—ভেঙ্গেছে কপাল মম ;
গৃহ অন্ধকার করি কোথা চলে গেছে।
বনমাঝে, কুটীর ভিতরে
খুঁজিলাম পাতি পাতি করি
তবু নাহি পাইলাম তারে।
দিদি! সে যে মোর দুধের বালক!
ক্ষুধা পেলে কে তারে খাইতে দিবে ?
নাহি জানি এতক্ষণ
মা মা বোলে ডাকিতেছে কত।
দিদি! পায়ে ধরি তোর
এনে দাও ধ্রুবকে আমার।

তপ। ভগিনি! না হও অধীর
কি হইবে ফল বৃথা রোদন করিলে ?
বিশ্বের প্রহরী সদা সঙ্গে আছে যার,
কে মারে তাহারে ?
কিছু ভয় নাই।
দোঁহে মিলি যাই দূর বনে
তন্ন তন্ন করি তথা করি অন্বেষণ।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

(ধ্রুবের প্রবেশ)

ধ্রুব। হরি! হরি! পদ্মপলাশলোচন হরি! কোন্ বনে এলুম ? কি অন্ধকার! পথ চিন্‌তে পাচ্চিনি। হরি! কোথা তুমি, দেখা দাও। উঃ! পায়ে বড় হোঁচট লেগেছে (পতন)। আঙ্গুলে বড় লেগেছে, নোকটা ছিঁড়ে গেছে ;—বড় রক্ত পোড়্‌ছে। পদ্মপলাশলোচন হরি! বড় ব্যথা ;

কোথা তুমি, একবার দেখা দাও। আঃ! পায়ের ব্যথা আরাম হোল ; কে যেন আমার পায়ে হাত বুলুচ্চে! মা না কি? মা ত এখানে নেই, তবে কে আমার পায়ে হাত বুলুচ্চে? আবার ছায়া! সেই ছায়া! চারটে হাত,—নীলবর্ণ ছায়া! গলায় ও কি দপ্ দপ্ কোরে জ্বল্‌ছে? এক হাতে শাঁখ, এক হাতে চাকা ঘুর্‌ছে, এক হাতে গদা, এক হাতে আবার একটা বড় ফুল! কে তুমি? কাছে এস। হরিকে ডাক্‌লে তুমি এস কেন? তুমি কি আমার হরি? উঃ! আবার পায়ে কাঁটা ফুট্‌লো ; বড় ব্যাথা কোচ্চে। হরি! কেমন কোরে কাঁটা বার কোর্‌বো? আমার পায়ে হাত দিলে কে? অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্চিনি। কে কাঁটা বার কোচ্চে? আঃ! বাঁচ্‌লুম—কাঁটা বেরিয়ে গেল। মা কাছে নেই, তবে কে এমন কোচ্চে? বোধ করি, হরিই কোচ্চে। নিশ্চয়ই হরিই কোচ্চে। দূরে অন্ধকারে ওটা কি? ঐ সোরে সোরে যাচ্চে,—আবার পেচুচ্ছে—ঐ আবার গাছের পাশে লুকুলো। ঐ আমার হরি। হরি! এইবার তোমায় দেখ্‌তে পেয়েছি। এইবার তোমায় ধরেছি—আর কোথা যাবে ; দাঁড়াও—আমি যাচ্ছি—ধোচ্ছি (বৃক্ষের স্কন্ধ জড়াইয়া ধরন) এযে দেখ্‌ছি একটা গাছ। হরি! তোমায় এত ডাক্‌ছি, তবুও দেখা দিলে না! (নেপথ্যে ব্যাঘ্রগর্জ্জন) ও কিসের শব্দ? কে ডাকুছে? আমার হরি বুঝি এইবার আস্‌ছে। (ব্যাঘ্রের প্রবেশ) এই যে আমার পদ্মপলাশলোচন হরি! হরি! আমাকে বর দাও, আমি যেন সংমার গর্ভে জন্মাই, আর রাজা হই। কথা কইছ না যে? (ব্যাঘ্রগর্জ্জন) ওকি বুঝ্‌তে পাচ্চিনি। আমি তোমার গলা জড়িয়ে ধরি, তা হলে তুমি কথা কইবে। (ব্যাঘ্রকে আলিঙ্গনে উদ্যত ও ব্যাঘ্রের প্রস্থান) হরি! পালিও না ভাই, পালিও না ভাই। পালিয়ে গেলে! তবে কি ও আমার হরি নয়! হরি! পদ্মপলাশলোচন! তবে কোথা তুমি, দেখা দাও। মা বোলেছেন, হরি সকল স্থানেই আছেন ;—হরি বনে থাকে ; এই ত আমি বনে বনে বেড়াচ্ছি, কত খুঁজ্‌ছি, হরিকে ত দেখ্‌তে পাচ্চিনা। হরি, দেখা দাও, দেখা দাও ; আর লুকিয়ে থেকো না, আমাকে আর কাঁদিও না। গা ঝিম্ ঝিম্ কোচ্চে, ঘুম আস্‌ছে, এইখানে একটু শুই। (নিদ্রা)

(গাইতে গাইতে নারদের প্রবেশ)

নারদ। গোবিন্দপদারবিন্দ ফোটে হৃদিসরসীজলে।

মনভৃঙ্গ মকরন্দপানে ধাও পদকমলে॥

কমল ঘেরিয়া কররে গুঞ্জন,
মধুমাখা নাম শ্রীমধুসূদন,
ভাবে মাতোয়ারা, পিও সুধাধারা,
অনন্ত আনন্দ পাবি পদতলে॥

ধ্রুব। (জাগরিত হইয়া) এ কে? এই পদ্মপলাশলোচন হরি! এই আমার প্রাণের হরি! হরি! এত দেরি কোরে এলে কেন? আমি যে তোমাকে কত ডাক্‌ছিলুম। এইবার আমি তোমার পা জড়িয়ে বোসে থাক্‌বো, আর যেতে দোব না (নারদের পদ ধারণ)। এইবার পালাও দেখি—আর ছাড়্‌বো না।

নারদ। শিশো! ছাড় পদ, ছাড় পদ।

ধ্রুব। তুমি চোলে যাবে না, বল, তবে ছাড়্‌বো।

নারদ। না, যাব না; পা ছাড়।

(ধ্রুব কর্ত্তৃক পদত্যাগ)।

নার। বৎস! আমি হরি নই; আমি তাঁর দাসানুদাস।

ধ্রুব। কি বোল্লে?—এঁ্যা—তুমি আমার হরি নও।

(উপবেশন)

ধ্রুব। তবে কি প্রাণের আশা, প্রাণেতেই মিশাইল!
(হরি) এত কোরে ডাক্‌ছি তোমায় (একটু) দয়া মনে নাহি হল॥
কোথা পদ্মপলাশলোচন,
দেখে যাও মরম বেদন,
প্রাণ অধীর তোমারে না হেরে, কোথা গেলে তোমায় পাই বল।

নার। শুন শিশো! কোমল শৈশবে
কেন সদা বনে বনে
বেড়াইছ হরির সন্ধানে?
কেবল রোদনে
নাহি পাবে দরশন তাঁর।
এস মোর সনে
লয়ে যাই তব পিতার সদনে;
বসাব তোমারে রাজসিংহাসনে।

ধ্রুব। না, আমি পিতার কাছে যাব না। হরিকে দেখ্‌তে চাই; বিমাতা

বোলেছে, "হরিসাধনা কর, তবে রাজা হবে" ; আমি হরিসাধনা কোর্‌বো, তবে রাজা হব।

নারদ। বৎস! হরির সাধনা অতীব কঠিন।

তুমি শিশু ;—তব হৃদি অতীব কোমল ;

সে সাধনা তুমি বৎস! নারিবে করিতে।

তাই বলি—চল তব পিতার সমীপে।

ধ্রুব। না,—সেথা আমি যাব না। আমার হরি কোথা আছে, বোলে দাও ; আমি সেইখানে যাব,—হরি সাধনা কোর্‌বো।

নারদ। ধন্য শিশু!

ধন্য হোক নাম তব সংসার ভিতর।

দিব হরিনাম সুধা,

শিখাব সাধনা,

শিখাইব যোগ, শিখাব তপস্যা।

তুচ্ছ রাজ্যভোগ আশা দাও দূরে ফেলি।

এস মোর সনে

লয়ে যাই তোমা

দূরে ঐ পর্ব্বত শিখরে।

ধ্রুব। হাঁ মহাশয়! হরিকে দেখ্‌তে পাব ত?

নারদ। বহু তপস্যার পর।

ধ্রুব। তবে আপনি তপস্যা শিখান।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মধুবন।

(ধ্রুব ও নারদের প্রবেশ)

নারদ। বৎস! এই সেই মধুবন ;

নিত্য বিরাজেন হেথা শ্রীমধুসূদন!

তপস্যার তরে উপযুক্ত স্থান এই।

বিলম্ব কোরো না আর,

যাও—ত্বরা স্নান করি এস
যমুনার নীরে।
আজি শুভক্ষণে
বীজমন্ত্রে তোমা করিব দীক্ষিত।

(ধ্রুবের প্রস্থান)

ধ্রুবের অনন্ত ভক্তিযোগ!
পূর্ব্বজন্মে সাধনার বলে
পেয়েছে বালক অমূল্য রতন—ভক্তি।
ভক্তি হোতে মুক্তিলাভ,
ভক্তি হোতে জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি,
অণিমা মহিমা আদি অষ্টসিদ্ধি,
বাঁধা সদা ভক্তের দুয়ারে।
বিভূতির প্রতি,
ভক্ত যদি বৈরাগ্য আনিতে পারে,
তবেই প্রকৃত ভক্তির উদয়।
সেই ভক্তি অয়স্কান্ত-মণি সম।
আকর্ষণে তার, জগৎ চিন্তামণি
ভক্তহৃদে করে আগমন;
তাহাই সাত্ত্বিক ভক্তি।
বিনা সে সাত্ত্বিক ভক্তি,
হরি দরশন হবে না কখন।
চারিবিধ ভক্তি আছে শাস্ত্রে উল্লিখিত;
তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক, অহৈতুকী।
যেই জীব ডাকে নারায়ণে
অন্যের অনিষ্ট, নিজ ইষ্ট সিদ্ধিতরে,
তামসিক ভক্ত সেই।
যে ভক্তের হৃদে নাই পর অশুভকামনা
শুধু ইষ্ট সিদ্ধি,
আর ঐশ্বর্য্য কামনা করি,
করে হরি আরাধনা,

রাজসিক ভক্ত সেই।
ধ্রুবের সাধনা মূলে,
রাজসিক ভক্তি আছয়ে নিহিত।
রাজসিক ভক্তি বলে,
অচিরে পাইবে ধ্রুব,
ঐশ্বর্য্য, রাজত্ব, মান, অতুল সম্পদ,
ঐশ্বর্য্যরূপিণী লক্ষ্মী দিবে দরশন।
কিন্তু ঐশ্বর্য্যসম্ভোগে,
লিপ্ত যদি হয় শিশু মন,
নারায়ণ দরশন নাহি হবে আর।
ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্য আনিতে হইবে;
একটী কামনা শুদ্ধ রহিবে হৃদয়ে যবে,
কোথা হরি, কোথা শ্রীমধুসূদন,
ভক্তের হৃদয়,
যবে সকল বাসনা ত্যজি,
করিবেক শুদ্ধ হরি অন্বেষণ
তখনই সাত্বিক ভক্তি হইবে উদয়।
আবার যখন, ভক্তচিত্তে,
ভগবান রবে বিরাজিত দিবানিশি,
ক্ষণমাত্র হরিশূন্য না হইবে চিত,
চিত্তে কোন বৃত্তলেশ রহিবে না আর,
ভেদাভেদ জ্ঞান লুপ্ত হোয়ে যাবে,
চিত্তের সম্পূর্ণ লয় হইবে তখন;
সেই অহৈতুকী ভক্তি।
এখন প্রথমে সাত্বিক ভকতি,
যাহে ধ্রুবহৃদে হয় অঙ্কুরিত,
রাজসিক ভক্তি হয় বিদূরিত,
পরিণামে, অহৈতুকী ভক্তি,
হয় প্রস্ফুটিত,
সেই উপদেশ কিছু দিব ধ্রুবে আজি;

গুহ্যমন্ত্র কিছু দিব, কর্ণে তার,
সাধনে যাহার,
হরি দরশন হইবে অচিরে।

(ধ্রুবের প্রবেশ)

বৎস! বোস এই স্থানে জানুপাতি,
গুহ্য উপদেশ কিছু দিব তোমা আজি।

(ধ্রুবের জানু পাতিয়া উপবেশন)

রাজ্যভোগ আশা, তব হৃদে আছে বিরাজিত,
সেই আশা কর বিদূরিত;
শুদ্ধ একমাত্র সেই পদ্মপলাশলোচন চরণে,
প্রাণ কর সমর্পণ;
একমাত্র একাগ্রতা করিবে সাধন,
ভগবান বিনা,
অন্য চিন্তা মনে দিওনা আসিতে।

ধ্রুব। রাজ্যভোগ আশা করিলাম দূর,
ভগবান বিনা,
অন্য চিন্তা মনে দিব না আসিতে।

নারদ। শুন মন দিয়া,
সরল ভাষায়,
তাঁহার সুন্দর রূপ করিব বর্ণন।
নবজলধর রূপ তাঁর,
পদ্মপত্র হেন চক্ষু দুটী,
বিম্বফল সম ওষ্ঠ দুটী তাঁর;
মস্তকে কিরীট, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী,
গলে বনমালা,
হৃদিমাঝে কৌস্তুভ রতন
কর্ণেতে কুণ্ডল, চরণে নূপুর,
পীতবস্ত্র পরিধান।
ধ্যান কর বৎস! দিবানিশি এইরূপ
ধ্যানে হৃদিপটে রূপ করিবে অঙ্কিত;

অচল সমান অটল রহিবে,
স্থির মনে থাকিবে নিয়ত
সাবধান—ধ্যানভঙ্গ নাহি যেন হয়।
এখন তোমারে বৎস! করি মন্ত্র দান,
যেই মন্ত্র জপি অবিরাম
পাইবে অচিরে পদ্মপলাশলোচনে।

(কর্ণে মন্ত্রদান)

এই মন্ত্র জপ অবিরাম।

ধ্রুব। গুরুদেব!
প্রণমি চরণে তব।

নারদ। আশীর্ব্বাদ করি
পূর্ণ হোক্ মনস্কাম তব,
হরি দরশন হউক অচিরে।
এবে চলিলাম আমি।
(স্বগতঃ) যাই এবে ধ্রুবের জননী পাশে,
কাঁদে মাতা পুত্র হারাইয়া
বুঝায়ে সান্ত্বনা করি;
লয়ে যাই তারে রাজার সমীপে।

(প্রস্থান)

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

সংসারে প্রেমের অন্বেষণ করিতেছ? চিরকাল ছায়ার পশ্চাতে ঘুরিতে হইবে। তোমায় সত্য কথা বলি, এক ভগবান ছাড়া প্রেম করিবার ও প্রেম পাইবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছ না? পাইবে। প্রাণ খুলিয়া চাহিতে হইবে। সংসারে আসক্তি থাকে, স্বীকার কর, উহা দুর্ব্বলতা। মনকে আঁখি ঠারিয়া উহাকে ভুল বুঝাইতে যাইও না। তাহা হইলে অনেক দেরি পড়িয়া যাইবে। অনেক ধাক্কা খাইতে হইবে। অনেক ঠেকিতে হইবে—অনেক ভুগিতে হইবে—শেষে ঠিক ঠিক বুঝিবে, এ সব ছায়াবাজি। বৈরাগ্য আসিলে তবে ঠিক ঠিক প্রেমের উদয় হয়। বৈরাগ্য অর্থে সংসারের উপর তীব্র বিরাগ ও ঈশ্বরের উপর প্রবল অনুরাগ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ইক্-প্রকরণস্থ বলিয়াই 'সুম্' লোপ হইলে বৃদ্ধির নিষেধ হইবে না। *

ভাষ্যমূলম্।—ইগ্‌লক্ষণয়োর্গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধঃ। ন চৈষেগ্‌লক্ষণা বৃদ্ধিঃ।

যদীগ্‌লক্ষণয়োর্গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধঃ। স্যদঃ। প্রশ্রথঃ। হিমশ্রথ ইত্যত্র ন প্রাপ্নোতি। ইহ চ প্রাপ্নোতি। অবোদঃ। এধঃ। ওদ্ম ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে' সূত্র, 'ইক্'লক্ষণ-সম্পন্ন 'গুণ' এবং 'বৃদ্ধি'রই নিষেধ করে, কিন্তু 'অভাজি' প্রভৃতি স্থলে যে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা ইক্-লক্ষণক বৃদ্ধি হয় নাই।

যদি ইক্‌লক্ষণক গুণ বা বৃদ্ধিরই নিষেধ হয়, তবে যেখানে 'ইক্'এর প্রাপ্তি নাই, যেমন;—স্যদঃ, প্রশ্রথঃ, হিমশ্রথঃ (১) এই সকল স্থলে নিষেধ (কর্ত্তব্য হইলেও) প্রাপ্তি হইবে না।

আর অবোদঃ, এধঃ, ওদ্মঃ (২) প্রভৃতি স্থলে, (অকর্ত্তব্য হইলেও) নিষেধই প্রাপ্তি হইবে?

বার্ত্তিকমূলম।—নিপাতনাৎ স্যদাদিষু।

বার্ত্তিকানুবাদ।—স্যদাদিতে নিপাতনেই প্রতিষেধ হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—নিপাতনাৎ স্যদাদিষু প্রতিষেধো ভবিষ্যতি।

ন চ ভবিষ্যতি। যদীগ্‌লক্ষণয়োঃ প্রতিষেধঃ শ্রিব্যনুবন্ধলোপে কথম্।

ভাষ্যানুবাদ।—স্যদঃ, প্রশ্রথঃ, হিমশ্রথঃ প্রভৃতি স্থলে নিপাতনেই 'বৃদ্ধি'র প্রতিষেধ হইবে।

(১) অত উপধায়াঃ।৭।২।১১৬। (উপধাস্থিত অকারের বৃদ্ধি হয়, 'ঞ' এবং 'ণ' ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে এই সূত্রানুসারে, ('স্যন্দূ' ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিলে 'অ'কারের বৃদ্ধি 'ইক্'লক্ষণক না হওয়াতে, তাহার নিষেধও হইবে না। 'স্যদঃ, প্রশ্রথঃ, হিমশ্রথঃ' প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

(২) 'অব' পূর্ব্বক 'উন্দী' (পরিক্লেদনে) ধাতু, 'আ'-পূর্ব্বক 'ইন্দী' (ইন্ধনে) ধাতু এবং 'আ' পূর্ব্বক 'উন্দী' ধাতু 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিলে, 'ঘঞ্' প্রত্যয়-পরে থাকিলে, উপসর্গের দীর্ঘ হয় বলিয়া উক্ত উপসর্গ-সমূহের দীর্ঘ হওয়াতে 'অবোদঃ,' 'এধঃ,' এবং 'ওদ্ম' প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু ইহারা 'ইক' না হওয়াতে, বৃদ্ধির নিষেধই প্রাপ্তি হইবে।

তাহা হইবে না। কারণ, যদি ইক্‌লক্ষণক গুণবৃদ্ধিরই প্রতিষেধ হয়, তবে (ইক্‌লক্ষণক) স্রিব্ ধাতুর 'ই'কারের এবং অনুবন্ধ লোপের (লূঞ্ ধাতুর) 'ই'কার এবং 'উ'কারের কি প্রকারে গুণ হইবে? অর্থাৎ 'আস্রেমাণম্' 'লবিতা' 'লবিতুম্' প্রভৃতি প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রত্যয়াশ্রয়ত্বাদন্যত্র সিদ্ধম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—প্রত্যয়াশ্রয়ত্ব হেতুই অন্যত্র সিদ্ধ হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—আর্ধধাতুকনিমিত্তে লোপে প্রতিষেধঃ। ন চৈষ আর্ধধাতুকনিমিত্তো লোপঃ। যদ্যার্ধধাতুকনিমিত্তে লোপে প্রতিষেধঃ। জীরদানুঃ। অত্র ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই স্থলে কোন দোষ হইবে না। কারণ, আর্ধধাতুকনিমিত্তক যেখানে ধাত্বংশের লোপ হইবে, সেখানেই গুণ-বৃদ্ধির প্রতিষেধ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা (স্রিব ধাতুর এবং লূঞ্ ধাতুর অংশ, 'ই' এবং 'ঞ') আর্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হয় নাই। অতএব এই স্থলে, গুণের প্রতিষেধও হইবে না; কোন দোষও হইবে না।

যদি আর্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হইলেই প্রতিষেধ হয়, তবে যে স্থলে, 'জীব' ধাতুর উত্তর উণাদিস্থিত 'রদানুক' প্রত্যয় করিয়া, 'লোপোব্যোর্বলি' ।৬।১ ৬৬। সূত্রানুসারে 'ব'কারের লোপ করা হইয়াছে; তাহা ত আর আর্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হয় নাই। সেই স্থলে কেন গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না? অতএব এই নিয়মানুসারে 'জীরদানুঃ'র 'ঈ'কারের 'গুণ'এর নিষেধ প্রাপ্ত হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—রকিজ্যঃ সংপ্রসারণম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—'জ্য'ধাতুর উত্তর 'রক্' প্রত্যয় করিলে, 'য'কারের সংপ্রসারণ করিয়া 'জীরদানুঃ' পদ সিদ্ধ হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—নৈতজ্জীবে রূপম্। রক্যেতজ্জ্যঃ সংপ্রসারণং ভবতি। যাবতা চেদানীং রকি জীবেরপি সিদ্ধং ভবতি।

কথমুপবর্হণম্॥ বৃহিঃ প্রকৃত্যন্তরম্।

কথং বিজ্ঞায়তে বৃহিপ্রকৃত্যন্তরমিতি।

অচীতি হি লোপ উচ্যতে। অনজাদাবপি দৃশ্যতে নিবৃহ্যতে॥ অনিটীতি চোচ্যতে। ইডাদাবপি দৃশ্যতে নিবর্হিতা নিবর্হিতুমিতি॥ অজাদাবপি ন বৃহ্যতো অনিটীতি চোচ্যতে। ইডাদাবপি দৃশ্যতে নিবর্হিতা। নিবর্হিতুমিতি॥ অজাদাবপি ন দৃশ্যতে। বৃংহয়তি। বৃংহকঃ॥ তস্মান্নার্থঃ পরিগণনেন॥

ভাষ্যানুবাদ।—'জীরদানুঃ' শব্দ, 'জীব' ধাতুর রূপ নহে, কিন্তু 'জ্য' ধাতুর 'রক্' প্রত্যয় করিয়া, 'য'কারের সংপ্রসারণ করিলে, 'জির' এইরূপ রূপ হইবে; তদনন্তর 'রদানুক্' প্রত্যয় করিলে 'ই'কারের, 'চ্'লোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোঽণঃ সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইলেই 'জীরদানুঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

অথবা এক্ষণে 'রক্' প্রত্যয় করিলে, 'জীব' ধাতুর দ্বারাও প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ 'রক্' প্রত্যয়ের 'ক'কার ইৎ হওয়াতে, 'ক্ঙিতি চ' সূত্রানুসারেই গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ হইবে। 'জীরদানু'ও সিদ্ধ হইবে।

উপবর্হণম্ প্রয়োগ (নুম্এর লোপ হইলে, গুণ) কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

'বৃহি' ধাতুর 'বৃহ' নহে। বৃহ্, ধাত্বন্তর বলিব।

'উপবর্হণম্', যে অন্য 'বৃহ' ধাতুর, তাহা কিরূপে জানিলেন?

'অচ্যনিটি' বার্ত্তিকে,'অচ্' পরে থাকিলে লোপ হয়, বলা হইয়াছে,অথচ 'অচ্' পরে না থাকিলেও লোপ দেখা যায়। যেমন,—'নি' পূর্ব্বক 'বৃহি' ধাতুর উত্তর 'যক্' প্রত্যয় করিয়া 'লুট্'এর 'ত' প্রত্যয় করিলে, 'যক্' প্রত্যয় 'অজাদি' না হইলেও 'নুম্'এর লোপ হইয়া 'নিবৃহ্যতে' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে।

বার্ত্তিকে 'অনিটি' বিষয়ে 'নুম্'এর লোপ বলা হইয়াছে, 'ইডাদিতে'ও লোপ দেখা যাইতেছে। যেমন;—'নিবর্হিতা', 'নির্বাহিতুম্' ইত্যাদি।

আবার অজাদি প্রত্যয় পরে থাকিলেও 'নুম্'এর লোপ অনেক স্থানে দেখা যায় না। যেমন;—বৃংহয়তি, বৃংহকঃ ('ণিচ্'এর 'ই' থাকে বলিয়া 'বৃংহয়তি' স্থানে অজাদি প্রত্যয়, এবং 'ণ্বুল্'এর স্থানে 'অক' হয় বলিয়া 'বৃংহকঃ' স্থলে অজাদি প্রত্যয় হইয়াছে)। অতএব জানা যাইতেছে যে, 'বৃহ'ধাতু, 'উপবর্হণম্' স্থলে ধাত্বন্তর। সুতরাং কোন কোন স্থলে গুণবৃদ্ধির নিষেধ হয়; তাহার পরিগণনার কোনও প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূলম্।—যদি পরিগণনং ন ক্রিয়তে। ভেত্স্যতে। ছেত্স্যতে। অত্রাপি প্রাপ্নোতি।

নৈষ দোষঃ। ধাতুলোপ ইতি নৈবং বিজ্ঞায়তে ধাতোর্লোপো ধাতুলোপো ধাতুলোপ ইতি।

কথং তর্হি।

ধাতোর্লোপো যস্মিংস্তদিদং ধাতুলোপং ধাতুলোপ ইতি। তস্মাদিগ্‌লক্ষণা বৃদ্ধিঃ।

যদি তর্হি ইগ্‌লক্ষণয়োর্গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধঃ। পাপচকঃ। পাপঠকঃ মগধকঃ। দৃশদকঃ। অত্র ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি পরিগণন না করা হয়; তবে ভেত্তৃতে, ছেত্তৃতে, এই সকল স্থলেও গুণের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে?

ইহা দোষ নহে। কারণ, 'ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে' সূত্রে, 'ধাতুলোপ' শব্দ এইরূপ জানিবে না যে, ধাতুর লোপ ধাতুলোপ, 'ধাতুলোপ' ইতি।

তবে কিরূপ?

ধাতুর লোপ আছে যাহাতে, সে ধাতুলোপ, সেই এই ধাতুলোপ 'ধাতুলোপ' ইতি। তদুত্তর ইক্‌লক্ষণসম্পন্নেরই বৃদ্ধি করা হইবে।

তবে যদি ইক্‌লক্ষণসম্পন্ন গুণ-বৃদ্ধিরই প্রতিষেধ করা হয়, তবে পাপচকঃ ('পচ্' ধাতু 'ণ্বুল্'), পাপঠকঃ ('পঠ' ধাতু 'ণ্বুল্'), মগধকঃ, দৃষদকঃ ইত্যাদি স্থলে প্রাপ্ত হইবে না?

বার্ত্তিকমূলম্।—অল্লোপস্য স্থানিবত্ত্বাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—'অৎ'লোপের স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না। *

ভাষ্যমূলম্।—অকারলোপে কৃতে তস্য স্থানিবদ্ভাবাদ্‌গুণবৃদ্ধী ন ভবিষ্যতঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—'পাপচকঃ' প্রভৃতি স্থলে, 'যঙ্' 'যক্' প্রভৃতির 'অ'কারের লোপ হইলে, 'অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ' সূত্রানুসারে, 'অ'কারের স্থানিবদ্ভাব করিবার পর, 'হল্' উপধাবিশিষ্ট না হওয়াতে, গুণ বা বৃদ্ধির প্রাপ্তিই হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—অনারম্ভো বা। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা এই 'ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে' সূত্র আরম্ভ না করাই কর্ত্তব্য। *

ভাষ্যমূলম্।—অনারম্ভো বা পুনরস্য যোগস্য ন্যায্যঃ॥ কথং বেভিদিতা। মরীমৃজকঃ। কুসুম্ভিতা। সমিদিতা ইতি।

অত্রাপ্যকারলোপে কৃতে তস্য স্থানিবদ্ভাবাদ্‌গুণবৃদ্ধী ন ভবিষ্যতঃ।

যত্র তর্হি স্থানিবদ্ভাবো নাস্তি তদর্থময়ং যোগো বক্তব্যঃ॥ ক চ স্থানিবদ্ভাবো নাস্তি?

যত্র হলচোরাদেশঃ। লোলুবঃ। পোপুবঃ। মরীমৃজঃ। সরীসৃপ ইতি।

অত্রাপ্যকারলোপে কৃতে তস্য স্থানিবদ্ভাবাদ্‌গুণবৃদ্ধী ন ভবিষ্যতঃ॥ লুকি কৃতে ন প্রাপ্নোতি॥ ইদমিহ সংপ্রধার্য্যম্ লুক্‌ক্রিয়তামল্লোপ ইতি॥ কিমত্র কর্ত্তব্যম্। পরত্বাদল্লোপঃ নিত্যো লুক্। কৃতেঽপ্যল্লোপে প্রাপ্নোত্যকৃতেঽপি প্রাপ্নোতি॥ লুগপ্যনিত্যঃ॥ কথম্॥ অন্যস্য কৃতে প্রাপ্নোতি। অন্যস্যাকৃতে। শব্দান্তরস্য চ প্রাপ্নুবন্নিমিত্তো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এই সূত্রের আরম্ভ না করাই কর্ত্তব্য।

যদি এই 'ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে' সূত্র আরম্ভ না করা হয়, তবে 'বেভিদিতা' ('ভিদ্'ধাতু 'যঙ্'এর লোপে, 'তৃচ্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ), 'মরীমৃজকঃ' ('মৃজ্'ধাতু 'যঙ্'এর লোপে, 'ণ্বুল্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ), 'কুস্তুভিতা' ('কুস্তুভ' ধাতু কণ্ড্বাদিগণীয়, 'যক্' প্রত্যয়লোপে 'তৃচ্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ), সমিধিতা ('সমিধ'শব্দ 'ক্যচ' প্রত্যয়ে নামধাতু করিয়া ক্যচের লোপ এবং 'তৃচ্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ) ইত্যাদি প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে? (গুণ বা বৃদ্ধি কেন হইবে না?)

এই স্থলেও ধাতুসংজ্ঞক যঙাদি প্রত্যয়ের 'অ'কারের লোপ করিলে, 'অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ' সূত্রানুসারে, লুপ্ত 'অ'কারের স্থানিবদ্ভাব করিলে (উপধাভাব-প্রযুক্ত) গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না।

যদি এইরূপ হয়, তবে যেখানে স্থানিবদ্ভাব নাই, সে স্থানের জন্য, এই সূত্র করা হইবে?

কোথায়ই বা স্থানিবদ্ভাব নাই?

যেই স্থানে, হল্ অচ্ সমুদয়ের (লোপ) আদেশ হইয়াছে, অর্থাৎ 'যঙ্লুক্' বিষয়ে। যেমন,—লোলুবঃ ('লূঞ্'ধাতু 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'যঙ্লুক্ করিলে এইরূপ সিদ্ধ হইবে), পোপুবঃ ('পূঞ্'ধাতু), মরীমৃজঃ (মৃজ্ ধাতু), সরীসৃপঃ ('সৃপ্'ধাতু) এই সকল শব্দ, 'যঙোঽচি চ' ২। ৪। ৭৪। সূত্রানুসারে, যাবতীয় 'যঙ্'ভাগের লুক্ করা হইয়াছে।

এই স্থলেও একবারে 'যঙ্'ভাগের 'লুক্' না করিয়া, পূর্ব্বে অকারলোপ করিয়া, পরে 'য'কার লোপ করিব, তাহা হইলেই, হল, অচ্, উভয়ের লোপ না হইয়া অকার-নামক অচ্এর লোপ হইবে। সুতরাং 'অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ' সূত্রানুসারে, অকারের স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত (উপধা না হওয়াতে) গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না?

তাহা হইবে না। কারণ, এই স্থলে 'অ'কারের লোপ প্রাপ্তই হইতে পারে না। প্রথমতঃ 'যঙ্'এর 'যঙোঽচি চ' সূত্রানুসারে 'লুক্' করিলে, 'অ'কার থাকিবেই না; সুতরাং তাহার লোপও হইবে না, স্থানিবদ্ভাবও প্রাপ্তি হইবে না।

এই স্থলে ইহা বিচার্য্য যে, 'যঙ্'এর লুক্ই পূর্ব্বে করা হইবে ('যঙোঽচি চ' সূত্রানুসারে) অথবা 'অ'কারের লোপই ('অতো লোপঃ' সূত্রানুসারে) পূর্ব্বে করা হইবে; এই স্থলে কোন্‌টী কর্ত্তব্য?

'যঙোঽচি চ।' ২। ৪। ৭৪। সূত্রাপেক্ষা, 'অতো লোপঃ।' ৬। ৪। ৪৮। সূত্র পরে বলিয়া, পূর্ব্বে (পরবিধি বলবান্ বলিয়া) 'অ'কারের লোপই কর্ত্তব্য।

তাহা নহে। পূর্ব্বে 'যঙ্'এর লুক্ই কর্ত্তব্য। যেহেতু, 'যঙ্'লুক্ নিত্য। (পরবিধি অপেক্ষাও নিত্যবিধি বলবান্) কারণ, 'অ'কারের লোপ করিলেও 'য'কারের লুক্‌প্রাপ্তি হইবে, না করিলেও প্রাপ্তি হইবে।

(যঙ্) 'লুক্'ও অনিত্য।

কিরূপে ?

কারণ, অকারের লোপ করিলে, অন্যের (য্‌ভাগের) 'লুক্'-প্রাপ্তি হইবে; আর অকারের লোপ না করিলে, অন্যের (সমুদায় 'যঙ্' প্রত্যয়ের) 'লুক্'-প্রাপ্তি হইবে। শব্দান্তরে যে বিধি-প্রাপ্তি হয়, তাহা অনিত্য হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্।—অনবকাশস্তর্হি লুক্॥ সাবকাশো লুক্। কোঽবকাশঃ॥ অবশিষ্টঃ॥

অথাপি কথঞ্চিদনবকাশো লুক্ স্যাদেবমপি ন দোষঃ। অল্লোপে যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। অতো লোপঃ। ততো যস্য, যস্য চ লোপো ভবতি। অত ইত্যেব। কিমর্থমিদম্॥ লুকং বক্ষ্যতি তদ্বাধনার্থম্॥ ততো হলঃ। হল উত্তরস্য যস্য চ লোপো ভবতি। ইহ তর্হি পরত্বাদ্‌যোগবিভাগাল্লোপো লুকং বাধেত॥ কৃষ্ণো নোনাব বৃষভো যদীদম্। নোনূয়তেনোনাব। সমানাশ্রয়ো লুগ্‌লোপেন বাধ্যতে।

কশ্চ সমানাশ্রয়ঃ॥ যঃ প্রত্যয়াশ্রয়ঃ॥ অত্র প্রাগেব প্রত্যয়োৎপত্তের্লুগ্‌ভবতি। কথং স্যাদঃ। প্রশ্রথঃ। হিমশ্রথঃ। জীরদানুঃ। নিকুচিত ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে (যঙ্) লুক্ অনবকাশ-বিষয় বলিয়া অপবাদক হইবে ?

তাহা নহে। লুক্ অবকাশবিশিষ্ট।

যদি সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে অকারের লোপ হইয়া যায়, তবে 'যঙোঽচি চ' সূত্রানুসারে 'যঙ্'লুকের অবকাশ কোথায় ?

অকার লোপ করিবার পরে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে অর্থাৎ 'য্'কার লোপ করিবার জন্য 'লুক্' (যঙোঽচি চ) প্রবর্ত্তিত হইবে।

অনন্তর ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যদি কোনও প্রকারে 'লুক্'এর প্রবর্ত্তিত হওয়ার অবকাশ নাও থাকে, তাহা হইলেও কোন দোষ হইবে না। কারণ, অকারলোপ-বিষয়ে যোগবিভাগ করা হইবে। এক ভাগ করা হইবে 'অতো লোপঃ'; তার পরে করিব 'যস্য' ('যস্য হলঃ' সূত্র হইতে 'যস্য')। তাহা হইলেই 'য'কারেরও লোপ হইবে। কিন্তু যেই স্থানের 'অ'কারের লোপ হইয়াছে, সেই স্থানেরই 'য'কারের লোপ হইবে।

কি জন্য এইরূপ করা হইল ?

'লুক্' বলা হইবে। তাহাকে বাধা করিবার জন্য। তার পরে আর এক ভাগ করা হইবে 'হলঃ'। এক্ষণে অর্থ এইরূপ হইবে যে,—'হল্'এর পরবর্ত্তী যে 'য'কার, তাহারও লোপ হয়। অতএব, এই স্থলে তবে কি পরত্ব হেতু, কি যোগবিভাগ হেতু, 'লোপ'বিধি, 'লুক্'বিধিকে বাধা করিবে, অর্থাৎ 'লুক্' হইবার পূর্ব্বে লোপই হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি এইরূপ যোগবিভাগ করিয়াই কার্য্যসিদ্ধি হয়,তবে 'ক্বকো নোনাব বৃষভোদীদমং' এই শ্রুত্যংশে, 'নোনাব' শব্দ কিরূপে সিদ্ধ হইল ? কারণ, 'ণু' (স্তুতৌ) ধাতুর উত্তর 'যঙ্' প্রত্যয় করিয়া 'নোনূয়' প্রয়োগ হইবে। পরে 'লিট্'এর 'ণল্' প্রত্যয় করিলে, যদি 'অ'কারের লোপ করিয়া 'য'কারের লোপ করা হয়, তবে এই স্থলেও 'অ'কারের স্থানিবদ্ভাব করিয়া ণু ধাতুর 'উ'কার' অজন্তাঙ্গ না হওয়াতে, 'ণল'এর 'ণ'ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলেও 'উ'কারের বৃদ্ধি 'ঔ' হইয়া নোনাব প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না ?

এই স্থলে কোনও দোষ হইবে না। কারণ, সমান আশ্রয়সম্পন্ন লুক্‌ই লোপের দ্বারা বাধিত হয়।

কে সমানাশ্রয় ?

যে প্রত্যয়াশ্রয়। অর্থাৎ এই স্থলে যদি পরবর্ত্তী 'ণল' প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া, অকার লোপ বা যঙ্ লুক্-প্রাপ্তি হইত, তবেই অলোপ, লুক্‌কে বাধা করিত। এখানে কিন্তু প্রত্যয় (ণল্) উৎপত্তির পূর্ব্বেই, 'যঙ্'এর লুক্ হইয়াছে। ('যঙোঽচি চ' সূত্রে, 'চ'কার গ্রহণ প্রযুক্ত, কোন নিমিত্ত না থাকিলেও 'যঙ্'এর লুক্ হয় বলিয়া, এখানেও 'ণল্' প্রত্যয়ের পূর্ব্বেই 'যঙ্'এর লুক্ হইবে ; সুতরাং 'উ'কারের বৃদ্ধি হইয়া 'ঔ'কার হইবে ; 'নোনাব' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে)।

স্তদঃ, প্রশ্রথঃ, হিমশ্রথঃ, জীরদানুঃ, নিকুচিতঃ ইত্যাদি প্রয়োগ কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে ?

বার্ত্তিকমূলম্।—উক্তং শেষে। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এই সকল প্রয়োগ শেষে উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—কিমুক্তম্॥ নিপাতনাৎ স্তদাদিষু। প্রত্যয়াশ্রয়ত্বাদন্যত্র সিদ্ধম্। রকি জ্যাঃ সংপ্রসারণম্॥ নিকুচিতেঽপ্যুক্তম্॥ কিম্। সন্নিপাতলক্ষণো বিধিরনিমিত্তং তদ্বিঘাতস্যেতি॥

ভাষ্যানুবাদ।—শেষে কি উক্ত হইয়াছে ?

এই উক্ত হইয়াছে যে,—স্বনঃ, প্রশ্নঃ প্রভৃতি শব্দ ত নিপাতনেই সিদ্ধ হইয়াছে। আর অন্যান্য স্থলে প্রত্যয়াশ্রয়ত্ব প্রযুক্তই সিদ্ধ হইবে।

'জীরদানুঃ' শব্দ, 'জ্যা' ধাতুর উত্তর 'রক্' প্রত্যয় করিয়া, 'য'কারের সংপ্রসারণ (এবং দীর্ঘ) করিলেই সিদ্ধ হইবে।

'নিকুচি' শব্দেও উক্তই হইয়াছে।

কি উক্ত হইয়াছে ?

সন্নিপাত অর্থাৎ দুইয়ের সম্বন্ধলক্ষণসম্পন্ন যে বিধি, সে তাহার বিঘাতকের (নষ্টের) হেতু হয় না।

তাৎপর্য্যার্থ।—'নি'পূর্ব্বক (ইডাদি) 'কুঞ্চ' ধাতু 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'নিকুচিত' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, 'কুন্চ' ধাতুর যে 'ন'কার, তাহা, 'অনিদিতাং হল উপধায়াঃ ক্ঙিতি চ।' ৬ ৪।২৪। (১) সূত্রানুসারে, 'ক্ত' প্রত্যয়ের 'ক'কার ইৎনিমিত্তক কিৎ হওয়াতে, লোপ হইয়াছে। অতএব যে 'ক্ত' (আর্দ্ধধাতুক) প্রত্যয়কে নিমিত্ত করিয়া 'ন'কার লোপ হইয়াছে, আবার সেই 'ক্ত' প্রত্যয়কেই নিমিত্ত করিয়া 'কুঞ্চ' ধাতুর উকার উপধাও হইবে না ; সুতরাং 'পুগন্তলঘূপধস্য' সূত্রানুসারে, 'উ'কারের গুণও হইবে না। কারণ, পিতা পুত্র যেমন পরস্পর পরস্পরের হন্তা হয় না, সেইরূপ যে যাহার উৎপাদক হইয়া থাকে, সে তাহার বিনাশক হয় না। অতএব 'কুঞ্চ' ধাতুর 'উ'কার উপধা না হওয়াতে, গুণপ্রাপ্তিও নাই ; 'ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে' সূত্র করিবারও প্রয়োজন নাই।

(উদুপধাদ্ভাবাদিকর্ম্মণোঽন্যতরস্যাম্ ১।২।২১। সূত্রানুসারে, 'নিষ্ঠা' প্রত্যয় প্রযুক্ত বিকল্পে কিত্ত্বকার্য্য হয় বলিয়া, 'ক্ঙিতি চ' সূত্রানুসারেও এই স্থলে প্রাপ্তিসম্ভব ছিল না।

ক্ক্ঙিতি চ।৫।

ক্ক্ঙিতি ৭।০।১।

গকার ইৎ, ককার ইৎ এবং ঙকার ইৎ নিমিত্ত হইলে, গুণ বা বৃদ্ধি হয় না।

বার্ত্তিকমূলম্।—ক্ক্ঙিতি প্রতিষেধে তন্নিমিত্তগ্রহণম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—গ, ক, বা ঙ ইৎ প্রতিষেধ বিষয়ে, সেই সকল বর্ণ নিমিত্ত হইলে, প্রতিষেধ হয় ; এইরূপ 'নিমিত্ত' শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। *

---

(১) হল্ অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত শব্দসমূহের এবং ইকার ইৎ (লোপ) ভিন্ন শব্দসমূহের উপধাভূত 'ন'কারের লোপ হয়, ক এবং ঙ ইৎ পরে থাকিলে

গুরুকরণ ।

(জনৈক সাধুর সহিত কথোপকথন ।)

প্র। আজকাল ত গুরু তেমন মনের মতন পাওয়া যায় না; সে স্থলে কি করা কর্ত্তব্য?

উ। তুমি কেবল অন্তরের সহিত ঈশ্বরকে ডাক্‌তে থাক; গুরুকরণ যদি আবশ্যক হয় ত, তিনি মনের মতন গুরু পাঠিয়ে দিবেন; গুরু খুঁজে ব্যাড়াতে হয় না; যেমন ধ্রুবের হইয়াছিল। অথবা হয় ত, তিনি এমন অন্তরে ভাব উদ্রেক করিয়া দিবেন, যাহাতে গুরুলাভের ফল আপনা হইতে হইয়া যাইবে; যেমন প্রহ্লাদের। এমনও আবার হয়—অনেকে হয় ত তাঁকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে আপনা হইতেই হঠাৎসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ, অথবা স্বপ্নসিদ্ধ হইয়া যায়। তাঁকে যদি ঠিক ঠিক ব্যাকুলতার সহিত ডাকা যায়, তিনি ত অন্তর্যামী, ভক্ত-বৎসল, যা দরকার তিনি সংযোগ করিয়া দেন; কিছু মাত্র অভাব থাকে না। আজ্‌ কালকারও কথা বলিতেছি, এমন আমরা অনেক দেখেছি যে, গুরুকরণ হয় নাই অথচ সিদ্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছে।

প্র। আচ্ছা, তা হইলে কি মন্ত্রেরও আবশ্যক করে না?

উ। যদি কোনও মন্ত্রে বিশ্বাস না হয় ত, তাহারও দরকার হয় না। পরমহংসদেব বলিতেন, 'মন্ত্র' মানে কি জান?—'মন তোর'। অর্থাৎ, মনকে নিজের বশে আনিবার জন্যই মন্ত্রের আবশ্যকতা। হাজার কোন মন্ত্র জপ করিলেও কিছু হয় না, আবার হয় তো, দু চার বার মন্ত্র জপ করিলেই অনেক কায হইয়া যায়; যিনি মনকে বশে আনিতে পারিয়াছেন, তাঁর আর বেশী মন্ত্রের আবশ্যক করে না। তিনি যদি কখনও মন্ত্র গ্রহণ করেন, তাহা সামান্য নিমিত্ত কারণ মাত্র; মন্ত্র উচ্চারণ করিতে না করিতেই ঈশ্বরে তাঁর মন লাগিয়া যায়। তবে কি জান, প্রথম অবস্থায় সাধারণতঃ, কোন বিশেষ মন্ত্র লইলে ভাল হয় বটে। তবে তোমাদের যদি কোন বিশেষ মন্ত্রে বিশ্বাস না হয়, ঈশ্বরের অনেক নাম আছে ত, যে কোন একটা নাম জপ করিতে পারিলেই হইতে পারে। তিনি যেন চাঁদামামা—সকলকারই মামা—যে ডাকে তারই।

অনেকে বলে বটে যে, গুরু বাছিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু সেটা সকলের মতে যুক্তিযুক্ত নহে। গুরু যেমনই কেন হন না, শিষ্যের যদি ব্যাকুলতা থাকে, তা হ'লে কিছু আট্‌কায় না। "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়,

তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥" এরকম অনেক স্থলে দেখা যায়, এবং পুরাণাদিতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, গুরুর চেয়েও শিষ্যের গুণ অধিক; শিষ্যের সিদ্ধ হওয়া, গুরুর উপর অনেক স্থলে, নির্ভর না করিতে পারে।

বিশ্বাসই সর্ব্ব কার্য্যেই প্রধান মূল। গুরুকে যদি পরীক্ষা করিয়া লইতেও হয়, তবুও বিশ্বাসের একান্ত আবশ্যক; আজ হয় তো তাঁকে পরীক্ষা করিয়া "ঠিক" মনে করিলাম, কাল তাঁর প্রতি অবিশ্বাস আসিতে পারে। এইরূপ ক'রে, যাবজ্জীবন গুরুই বাছিয়া লইতে থাক? কায আর করিবে কবে? তাহার চেয়ে, গোড়া থেকেই বিশ্বাস করিয়া গেলে ভাল হয়। গুরু কেমন, তা আমাদের দেখ্‌বার দরকার নাই। তাঁর সঙ্গে মন্ত্র লওয়া মাত্র সম্বন্ধ, সেই মন্ত্র লইয়া নিজের বিশ্বাস ভক্তির সহিত সাধন ভজন করিলেই যথেষ্ট, গুরুর দোষের দিকে দৃষ্টি রাখার দরকার নাই। তবে, গুরুকে ভক্তি বিশ্বাস করিতে পার, খুবই ভাল। ভক্তি বিশ্বাস—অহৈতুকী হওয়াই আবশ্যক। সকল বিষয়েই খুঁত ধরিলে—অনেক ধরা যায়; শেষ-কালে হয় তো "ঠগ্ বাছ্‌তে গাঁ উজড় হওয়ার" মত হইয়া দাঁড়ায়; গুরুকরণও হয় না; মন্ত্র লওয়াও হয় না, সাধন ভজনও হয় না। ক্ষুধা যার অতিরিক্ত হয়, তার আর সে সময়ে ভাল মন্দ দ্রব্যের দিকে তত বড় একটা দৃষ্টি থাকে না। ঈশ্বর লাভের জন্য যদি কেহ যথার্থ ব্যাকুল হন, তিনি, গুরুর দোষ গুণের দিকে বা মন্ত্রের ভাল মন্দর দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারেন না।

প্র। তা হলে কি গুরুর নিকট কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক উপকারের আশা করা যেতে পারে না? গুরু কি কেবল মন্ত্রদাতা মাত্র?

উ। সেরূপ উন্নত গুরুলাভ অদৃষ্টের কথা; পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকে, পাইবে। যেখানে এ প্রকার গুরু পাইলে না, অথচ কুলগুরু তেমন মনের মতন লাগ্‌ছেন না, সে স্থলে গুরুকে মন্ত্রদাতার স্বরূপ লইতে হবে বইকি। তবে সেই কুলগুরুকে আপনি নিজের গুণে ভক্তি বিশ্বাস করেন, আপনা হইতেই—গুরুর কৃপায় ফল আপনার ভিতরে আসিয়া যাইবে। সর্ব্ব বিষয়েই ফলদাতা—ঈশ্বর। গুরু—অনেক স্থলে নিমিত্ত মাত্র। অনেকে বলেন, ধ্রুব যখন নিজের বলে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন, এমন কি, দেবর্ষি নারদ পর্য্যন্তও তাঁর সমক্ষে মন্ত্র-দাতা-উপলক্ষ্য স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। একটা গল্প আছে, সকলেই জানেন, গুরু শিষ্য দুইজনে এক সময়ে একটী নদী পার হইতে যাইতেছিলেন;

গুরুর নাম লইয়া শিষ্য অনায়াসে হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেলেন; গুরু তাই দেখিয়া মনে করিলেন, "আমার নামেরই মাহাত্ম্যে সত্যিই শিষ্য এরূপ যাইতে পারিল!" গুরু নিজের নাম লইয়া সেই নদী পার হইতে যাইবেন, আর অমনি ডুবিয়া গেলেন।

প্র। আচ্ছা, ইচ্ছা যদি হয়, যাঁকে তাঁকেই কি গুরু করিয়া লইতে পারি?

উ। কুলগুরু যদি না থাকেন ত, সাধ্যমত সদ্গুরু অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য বটে। তবে কি জানেন, এমন অনেক স্থলে ঘটিতে পারে যে, আজ যাঁকে সদ্গুরু বলিয়া জানিলাম, কাল তিনি অসৎ হইয়া আমার সমক্ষে দাঁড়াইবেন। তাই বলি, সকল স্থলেই নিজের সাধন ভজনের উপর, নিজের ভক্তিবিশ্বাসের উপর, নিজের ব্যাকুলতা বা আন্তরিকতার উপর, বিশেষ নির্ভর করিবেন। যদি অদৃষ্ট বশতঃ তিনি সত্যই সদ্গুরু হন, তাহা হইলে ত, সুবিধার আর অবধি থাকে না। আর যদি তা না হন, তা হ'লেও এমন কিছু বিশেষ ক্ষতি নাই; আপনি নিজে ঈশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে তাঁরই কৃপায় উদ্ধার হইতে পারেন।

গুরু অনেক প্রকার আছেন। মন্ত্রগুরু, শিক্ষাগুরু, উপগুরু, ভেকের গুরু, প্রভৃতি। অনেকে হয়ত মন্ত্রগুরু অথবা দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে কিছুই উপকার পাইলেন না—এক মন্ত্র ছাড়া; তার পর, অদৃষ্ট বশতঃ এমন এক সিদ্ধ শিক্ষাগুরু পাইলেন যে, তাঁহার কৃপাবলে অসম্ভবনীয়রূপে উন্নত হইয়া যাইলেন। অনেক সিদ্ধ শিক্ষাগুরু আছেন, যাঁহারা নিজেরা কর্ণে মন্ত্র দেন না; মন্ত্র অপর কাহারও কাছ থেকে আনাইয়া লয়েন, পরে, তিনি নিজের কৃপাবলে শিষ্যকে উন্নত করিয়া দিয়া থাকেন। আবার এমন অনেক উন্নত সদ্গুরু আছেন, যাঁহারা নিজে মন্ত্রও দিয়া থাকেন এবং শিক্ষাও দিয়া থাকেন।

প্র। কুলগুরু ছাড়িয়া অন্য গুরু গ্রহণ করিতে পারা যায় কি?

উ। সকল স্থলে নয়। যদি ঈশ্বর-ইচ্ছায়, অথবা আপনার সুকৃতি বলে, তেমন সিদ্ধগুরু পান ত, সেই গুরুর কাছ থেকে অনায়াসে মন্ত্র লইতে পারেন। তবে, অনেকে সিদ্ধগুরুর ভড়ং অবলম্বন করিয়া বেড়ান; তাঁহাদিগের নিকট হইতে খুব সাবধান থাকিবেন। কিছু দিন ধরিয়া তাঁহাকে সাধ্যমত ভালরূপ দেখিয়া, বুঝিয়া, তাহার পরে, যদি মন একান্ত আকৃষ্ট হয়, তবে তাঁর কাছ হইতে মন্ত্র বা শিক্ষা লইতে পারেন। কুলগুরুর আজ্ঞা লইয়া এইরূপ গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র লইতে পারিলেই বড় ভাল হয় বটে। অপারগ পক্ষে নাচার, কিন্তু কুলগুরুকে অসন্তুষ্ট করা বিধেয় নহে। তাঁহাকে যেন তেন প্রকারেণ

সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবেন। আর সেরূপ যদি সদ্‌গুরু না পান, কুলগুরুরই নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরকে অন্তরের সহিত ডাকিবেন; তিনিই যাবতীয় আধ্যাত্মিক অভাব পূরণ করিয়া নিশ্চয়ই দিবেন।

প্র। সদ্‌গুরু যদি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় হন, তাহা হইলে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র লইতে পারা যায় কি? ব্রাহ্মণও কি তাঁহার কাছ থেকে মন্ত্র লইতে পারেন?

উ। সদ্‌গুরু অর্থে যদি সিদ্ধ গুরু হন, তাহা হইলে তাঁহার কাছ থেকে সকল জাতিই মন্ত্র লইতে পারেন। প্রকৃত ভক্তের এবং সিদ্ধ মহাপুরুষগণের আবার জাতি কি? নদী সকল যতক্ষণ না সমুদ্রে মিশিয়া যায়, ততক্ষণ তাহাদের নামরূপ প্রভৃতি উপাধি থাকে, সমুদ্রে মিশিলে আর লাল জল সাদা জল, এ নদী ও নদী—কোন প্রকার ভেদাভেদ থাকে না। তেমনি জীব যখন "শিব" হয়, তখন তাহাতে কোন প্রকারেরই জীবভাব থাকিতে পারে না; ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি ভেদ তখন আর তাঁতে থাকা কিরূপে সম্ভব? পুরাণাদিতে এরূপ অনেক স্থলে দেখা যায়, এবং যদি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন ত দেখিতে পান যে, অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণেতর জাতীয় সিদ্ধ গুরুর নিকট হইতে অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণ পর্য্যন্তও মন্ত্র লইয়া যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে বিশেষতঃ, অনেকের ধারণা যে, শূদ্র যদি সিদ্ধ হন, তিনি একজন সামান্য ব্রাহ্মণের চেয়েও নিচু; তাঁহার কাছ থেকে কোনও ব্রাহ্মণ দীক্ষা লইতে পারেন না। কাশীধামেও এইরূপ বদ্ধ ও অন্ধ জাতিভেদ জ্ঞান অনেকের ভিতর আছে। এ সকল কিন্তু ভুল। যাঁহারা সত্যই ধর্ম্মপিপাসু, তাঁহারা এরূপ ভেদজ্ঞান করেন না। যেখানেই গুণ দেখেন, সেইখানেই তাঁরা মাথা নুয়াইয়া থাকেন। তাঁরা ত আর জড়ের উপাসনা করেন না যে, এই খোল্‌টা লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিবেন! যেখানে একটুও মাত্র চৈতন্যের বিকাশ দেখিতে বা বুঝিতে পারিবেন, সেইখানেই তাঁরা ছুটিবেন। অগ্নি সর্ব্বত্রই পবিত্র। অগ্নি যদি আঁচ্‌তাকুড়ে পড়িয়া থাকে, সেই অগ্নি কি কখন অপবিত্র হইতে পারে? আঁচ্‌তাকুড় থেকে যদি কেহ তুলিয়া লয়, সেই অগ্নিকে কি কখন জল দিয়া ধুইয়া লয়?—না, সে অগ্নির দাহিকাশক্তি কখন কমিয়া যায়? আর এক কথা; মনে কর, উমাচরণ পাল—একজন ব্যক্তি—সে শূদ্র। এখন, "উমাচরণ পাল" এই নামটী সেই ব্যক্তির কোন্ জিনিষটাকে দিতেছি? তাহার জড়শরীরটাকে, না, তাহার আত্মাকে, না তাহার শরীরবিশিষ্ট আত্মাকে

অর্থাৎ আত্মা ও শরীর এই দুই মিশ্রিত হইয়া যাহা হইয়াছে, তাহাকে ? যদি তাহার জড়শরীরের নাম "উমাচরণ পাল" বল ; ভাল কথা ; সেই ব্যক্তির "উমাচরণ পাল" নামক জড় শরীরটাই শূদ্র বলিলে ; বেশ ; কিন্তু জড় শরীর ত আর মন্ত্র দেয় না ; মন্ত্র দেন—সেই জড় শরীরের ভিতর যিনি আছেন, তিনি। জড়শরীর শূদ্র হইতে পারে,সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহার ভিতর যিনি আছেন, তিনি ত আর শূদ্র নহেন ; তা হলে তাঁর প্রদত্ত "মন্ত্রে" আর শূদ্রাশূদ্র দোষগুণ কি ? আর যদি বল, সেই ব্যক্তির শরীরকে "উমাচরণ পাল" বলছি না, "উমাচরণ পাল" বলছি তার আত্মাকে ; তা হ'লে মহাভ্রম করিলে। মনে কর, সেই ব্যক্তি মরিয়া গেল. তাহার শরীরটা ভস্ম করিয়া ফেলিলে ; তুমি এখন, তার শরীরের নাম "উমাচরণ পাল" বল্‌ছ না, বল্‌ছ তার আত্মার নাম "উমাচরণ"। এখন তার 'আত্মা' অবশ্য মরিয়াও যায় নি, তার আত্মাকে অবশ্য পুড়াইয়াও ফেলিতে পার নি। তোমার মতে "উমাচরণ পাল"ও তা হোলে অবশ্য এখন বেঁচে আছে "আত্মা"রূপে, তা ভূত হইয়াই থাকুন, আর দেবতা হইয়াই থাকুন, বা আবার মানুষ-জন্মই গ্রহণ করুন। মনে কর, "মানুষ" হইয়াই ফের জন্মাইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের ঘরে নাম হইল "উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেবশর্ম্মা"। তুমি যেয়ে এখন সেখানে মারামারি করগে, কেন এর নাম "উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়" দেওয়া হইল ? এর নাম ছিল "উমাচরণ পাল", এ ছিল শূদ্র ! আবার শ্মশান হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া যেই দেখিলে যে, সেই ব্যক্তির স্ত্রী সমস্ত গহনা খুলিয়া ফেলিয়াছেন, মাথা হইতে সিন্দূর মুছিয়া ফেলিয়াছেন, থান কাপড় পরিয়াছেন, এবং "বিধবা হইলাম" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, তখন, আর একবার, সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গেও ঝগড়া করগে যে, কেন তিনি বিধবা হচ্ছেন ? "উমাচরণ পাল ত মরে নি, উমাচরণ পালকে দেখে এলুম, সে মুখুয্যেদের বাড়ী জন্মেছে !"

এখন বুঝ্‌তে পারলে যে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি উপাধি, আত্মার কখন হইতে পারে না ? শরীরের উপাধি মাত্র।

আর যদি বল, "উমাচরণ পাল" সেই ব্যক্তির "শরীরবিশিষ্ট আত্মা"র নাম। বেশ কথা ; তা হলে, শরীরেরও নাম নহে, আত্মারও নাম নহে উমাচরণ পাল ; বল্‌ছ শরীরবিশিষ্ট আত্মার। কিন্তু, শরীরের সহিত আত্মার সংযোগ এবং সংযুক্তভাবে অবস্থানও যেমন হইয়া থাকে জান, তেমনি আবার শরীর হইতে আত্মার বিয়োগ এবং পৃথক্‌ভাবে অবস্থানও হইয়া থাকে। সাধারণ

কথায়, মানুষ যখন ম'রে যায়, তখন বলা যেতে পারে, "শরীর হইতে আত্মার বিয়োগ" হইল। আর, যখন মানুষ সিদ্ধ হয়, তখন বলা যাইতে পারে যে, শরীর হইতে আত্মা পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেছেন, যেমন "খড়্‌লি নারিকেল" অর্থাৎ যে নারিকেলের জল শুকাইয়া যাইলে নারিকেলের শাঁস মালা হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। মানুষের এই অবস্থার নাম জীবন্মুক্ত অবস্থা। মানুষ মরিয়া যাইলে যেমন আত্মাতে আর কোনও উপাধি দেওয়া যাইতে পারে না; তেমনি মানুষ সিদ্ধ হইলেও তাঁর অন্তরে যিনি আছেন, তাঁতে আর "উমাচরণ পালত্ব" বা শূদ্রত্ব প্রভৃতি উপাধি দেওয়া যাইতে পারে না। উমাচরণ পাল যদি সিদ্ধ বা জীবন্মুক্ত না হইয়া কারুকে মন্ত্র দেন ত, অবশ্য অন্যায় করিবেন; কেন না, তখনও তাঁর জ্ঞান হয় নাই, তখনও তাঁর ভিতরে চৈতন্যের প্রকাশ হয় নাই, তখনও দেহাদি ভাব যায় নাই—দেহেতেই আত্মাভিমান রহিয়াছে আর, যদি সেই উমাচরণ পাল সিদ্ধ বা জীবন্মুক্ত হইয়া কারুকে মন্ত্র দেন ত, তাতে কোনও দোষ হইতে পারে না। কেন না, তখন যিনি মন্ত্র দিলেন, তিনি আর উমাচরণ পাল নন,—উমাচরণ পালের ভিতর যে চৈতন্য আছেন, সেই চৈতন্যই মন্ত্র দিলেন। এরূপ গুরুর নিকট হইতে অনায়াসে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্তও মন্ত্র লইতে পারেন। এরূপ গুরু সাধারণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ-গুরুর (যাঁহাদের অবশ্য আত্মজ্ঞান হয় নাই) অপেক্ষা ভাল।

প্র। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লইলে ত সমাজে "এক-ঘরে" করে ফেল্‌তে পারে।

উ। "একঘরে" ক'রে ফেল্‌তে পারে, যদি সেই গুরু জীবন্মুক্ত পুরুষ না হন। সমাজে দুরকম লোক আছে—ভাল ও মন্দ; বিবেচক আর অবিবেচক; বুদ্ধিমান আর নির্বোধ। জীবন্মুক্ত গুরু যদি অপর জাতীয়ও হন, তাহলে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র লইলে সমাজের বিবেকী সজ্জনগণ কখনই আপনাকে দোষারোপ করিবেন না, বেশ জানিবেন; এবং তা হলে আর আপনি "একঘরে" হইবেন না, বরং আপনার ভালই হইল; কেন না, ভাল লোকগুলিই আপনার পক্ষে হইবেন। মন্দ লোক আপনাকে ভাল বলিল আর মন্দ বলিল, তাতে কি এসে যায়? "লোক না পোক"। যাহারা অবিবেচক, যাহারা নির্বোধ, তাহারা ত সকলকারই প্রায় নিন্দা করিয়া থাকে; আপনি ভাল করিলেও নিন্দে করিবে, মন্দ করিলেও নিন্দে করিবে।

আর এক কথা দেখ; সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে। সমাজেরও একটা সীমা আছে। সমাজ দেশাচার প্রভৃতি লইয়া; সমাজ—পার্থিব বিষয় লইয়া। ধর্ম্মের কিন্তু সীমা নাই; ধর্ম্মের কখনও শেষ নাই। এখানে "ধর্ম্ম" মানে বল্‌ছি "পারমার্থিক তত্ত্ব"। যেমন কাল অনন্ত, যেমন পরমাত্মা অনন্ত, তেমনি পারমার্থিক তত্ত্বও অনন্ত। যতই কেন আপনি উন্নত হন না, তথাপি যদি আপনি সত্যই সত্যপিপাসু হন, আপনার সমক্ষে তখনও অনেক পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার বাকি থাকিবে। পারমার্থিক তত্ত্বচর্চ্চার প্রথম আরম্ভ হইতেছে অবশ্য সমাজের ভিতর হইতে। জীব যতক্ষণ ঈশ্বরোপাসনায় বেশী উন্নত হয়েন নাই, ততক্ষণই সমাজের দ্বারা আবদ্ধ থাকেন, ততক্ষণ তাঁর উপাসনাও অবশ্য, দেশাচার বা লৌকিক আচারের অনুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু যখন জীবের অন্তরে 'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক' প্রজ্বলিত হইতে সুরু হয়; তখনই জানিবেন, তিনি সাধারণ লৌকিক আচারের বহির্ভূত হইতে উন্মুখ হইতেছেন। ক্রমশঃ যখন তিনি জীবন্মুক্ত হন, তখন আর তাঁহাকে সমাজ প্রভৃতি কিছুই আয়ত্তাধীন বা স্পর্শও করিতে পারে না।

প্র। "সিদ্ধগুরু" বলিলেন; এখন, সিদ্ধ অবস্থা কেমন করিয়া বুঝিয়া লইব?

উ। দেহাদিভাব যাঁর যত গেছে, তিনি ততই সিদ্ধ হইয়াছেন। অবশ্য, নিজে সিদ্ধ না হইলে ঠিক ঠিক কে সিদ্ধ, তা বুঝা যায় না; তথাচ, সিদ্ধ অবস্থার কিছু আভাস দেওয়া যাইতে পারে। সহজ কথায়, পরমহংসদেব বলিতেন—সিদ্ধ অর্থাৎ "শেদ্ধো", আলু প্রভৃতি সিদ্ধ হইলে যেমন নরম হয়, যে ব্যক্তি সিদ্ধ হন, তিনিও তেমনি স্বভাব-চরিত্রে অতি নরম হইয়া যান; তাঁর কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি অতিশয় কমিয়া যায়—কিছুই থাকে না বলিতে গেলে। তিনি তখন অতি দীন হীনের ন্যায় হন। পরমহংসদেব আর এক কথা বলিতেন,—যাঁর কাছে বসিলেই সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, ঈশ্বরে মন আপনা হইতেই যায়, তিনিও ঠিক ঠিক সাধু; ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেই যাঁর চক্ষু দিয়া জল পড়ে, তিনিও ঠিক্ ঠিক্ সাধু।

যাঁকে দেখিবে, অনেক সাধক ও যথার্থ ধর্ম্মপিপাসুগণ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেছেন; যিনি কোনও সম্প্রদায়ের নিন্দা করেন না; যিনি বাহিক ক্রিয়াকলাপ বা আড়ম্বর প্রভৃতিতে লিপ্ত নহেন; যাঁহার কোনও বিষয়ে কোনও প্রকার নিজের স্বার্থ নাই; যাঁহার মন সর্ব্বদাই প্রায় ঈশ্বর চিন্তায় রত, তাঁহাকেও ঠিক্ ঠিক্ সাধু বা সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন।

প্র। আচ্ছা, একজন শূদ্র-সিদ্ধ, আর একজন ব্রাহ্মণ সিদ্ধ এইরূপ দুইজন গুরু যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে কাহার নিকট হইতে মন্ত্র লওয়া শ্রেয়?

উ। যাঁর উপর তোমার ভক্তি হইবে, তাঁরই কাছ থেকে লইতে পারি। বস্তুতঃ, সিদ্ধ অবস্থাতে ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই।

প্র। গৃহস্থ কি কখন গুরু হইবার যোগ্য?

উ। যদি মন্ত্র-গুরু বল,—গৃহস্থ যদি কুলগুরু হন, কোন ক্ষতি নাই। গৃহস্থ, যে কোনও জাতি হউন না কেন, তাঁর যদি গুণ থাকে, উপগুরু সকল জাতিরই হইতে পারেন; একটা পিঁপড়ের কাছ থেকেও এক জন সদ্‌ব্রাহ্মণও শিক্ষালাভ করিতে পারেন; ভাগবতে আছে—অবধূত চব্বিশটী এরূপ গুরু করিয়াছিলেন। গৃহস্থ যদি সিদ্ধ হন, অর্থাৎ জনকাদির মতন হন, তাহা হইলে তিনি, ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাকুক, শুকাদি ব্যাসপুত্রেরও গুরু হইতে পারেন।

প্র। গৃহস্থ কুলগুরু ছাড়িয়া সন্ন্যাসী গুরু লইতে পারি কি না? সন্ন্যাসী যদি পূর্ব্বাশ্রমে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতীয় ছিলেন এরূপ হয়, তাঁহাকেও গুরু করা যায় কি না?

উ। সন্ন্যাসী যদি যথার্থ ত্যাগী ও ঈশ্বরনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে তাঁহার কাছ থেকে মন্ত্র বা শিক্ষা অনায়াসে লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কুলগুরুর অনুমতিক্রমে হইলেই বড় ভাল হয়। এরূপ প্রথা ভারতবর্ষের সকল দেশেই আছে। যাঁহারা খুব ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। কুলগুরু যদি অসন্তুষ্ট একান্ত হন, সেই সন্ন্যাসীর তপোবলে সে সব দোষ স্পর্শিতে পারে না। তবে কুলগুরুকে কখনই অশ্রদ্ধা করিবে না।

প্র। সন্ন্যাসী কিসে গৃহস্থ-গুরুর অপেক্ষা বড়?

উ। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় হোম করিতে হয় এবং পিতৃ-পুরুষের ও নিজের পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সেই হোমাগ্নিতে, যিনি ব্রাহ্মণ, তাঁকেও শিখা-সূত্র আহুতি দিতে হয়। এবং, পূর্ব্বাশ্রমের যাবতীয় নাম উপাধি, সমস্তই সেই হোমাগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। সন্ন্যাস গ্রহণ থেকেই তিনি নারায়ণ স্বরূপ হইয়া যান। লোকে কথায় বলে, পৈতে পুড়িয়ে ভগবান হয়। সন্ন্যাসীকে দেখিলেই লোকে "নম নারায়ণ" বলিয়া প্রণাম করে। সন্ন্যাসীর আর তখন কোন সামাজিক বা ব্যবহারিক উপাধি থাকে না। সুতরাং তিনি পূর্ব্বাশ্রমে শূদ্রই থাকুন বা চণ্ডালই থাকুন, তিনি সকল জাতির বা সকল

আশ্রমের গুরু হইতে পারেন। এরূপ প্রথা ভারতবর্ষের সকল স্থানেই দেখা যায়। আমাদের বাঙ্গালা দেশে, সন্ন্যাসীর চাল বড় নাই বলিয়া, সকলে শূদ্র-সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী এইরূপ পৃথক করিতে যান। এ সকল সাধারণ কথা বল্লুম মাত্র। অবশ্য, এমন অনেক জীবন্মুক্ত গৃহস্থ আছেন, যাঁহারা ঠিক ঠিক সন্ন্যাসীর অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহেন।

প্র। শূদ্রও কি তাহা হইলে সন্ন্যাসী হইবার অধিকারী হইতে পারে?

উ। নিশ্চয়। সকলকালে, ও ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশে সকল জাতিরই সন্ন্যাসী হইবার অধিকার আছে; এবং হইয়াও থাকে, দেখা যায়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রায় কোথাও বড় একটা আপত্তি দেখা যায় না। কেন না, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপবীত থাকে; তাঁহারা দ্বিজাতি। দ্বিজাতি মাত্রেরই দণ্ড গ্রহণে অধিকার—ইহা প্রায় সর্ব্ববাদি-সম্মত। এক কথা হইতেছে—শূদ্রসম্বন্ধে। এখন, শূদ্র বলি কাকে? অনেকে বলেন, শাস্ত্রের মর্ম্ম এই যে, অস্পৃশ্য জাতিকেই শূদ্র বলা যায়, অর্থাৎ যাহারা অতি অপবিত্র—শারীরিক ও মানসিক; যাহাদের স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয় ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; যেমন, মেথর, মুচি, মুর্দ্দফরাস প্রভৃতি। যদি বলেন, ইহারা শূদ্র নয়, "অন্ত্যজ" নামক "পঞ্চম" জাতীয়; তবে, শূদ্র বলি যে কাকে, কিছুই ত ঠিক করিতে পারি না। আজকাল ত ব্রাহ্মণ শূদ্রে সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। যে শূদ্রের বাড়ীতে, আমি ব্রাহ্মণ হইয়া পাতা পাতিয়া খাইতে পারি, তা লুচি হউক, মোণ্ডা হউক, আর শুক্নো চিঁড়ে মুড়কি হউক; বা, তৎপরিবর্ত্তে কাঞ্চনমূল্য গ্রহণ করিতে পারি; অথবা তাহার বাড়ীতে শালগ্রাম লইয়া যাইয়া ঘণ্টা নাড়িয়া আসিতে পারি, সেই শূদ্র যদি কখনও সামাজিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি করে, তাহার সেই উন্নতি দেখিয়া, আমি অর্থলোলুপ ও মান্যের ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, হিংসাপরবশ হইয়া তাহাকে শূদ্রজ্ঞানে ঘৃণা করিলে হইবে কি? আজকাল যেমন, শূদ্রের শূদ্রত্ব দেখা যায় না, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বও তেমনি সকল স্থলে দেখা যায় না। শূদ্র কোথায় ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিবে, তা না হয়ে, আজকাল দেখ্‌তে পাচ্ছি, অনেক ব্রাহ্মণ, শূদ্রের দাসত্ব করিতেছেন। উমাচরণ পালের ন্যায় অনেক শূদ্রের তাঁবে অনেক ব্রাহ্মণ ত চাকরি করিতেছেন। অবশ্য সদ্‌ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছি না। অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণের নাম মাত্র ধরেন, তাঁদেরই কথা বলিতেছি মাত্র। চিল শকুনি প্রভৃতি অনেক উচ্চে

উঠে বটে, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি থাকে গোভাগাড়ে। যাহা হউক, সদ্ব্রাহ্মণের পক্ষেও শূদ্র যে অতি হেয়, তাহা নহে। যে শূদ্র ব্রাহ্মণের পদ স্পর্শ করিতে পারে; যে শূদ্রের, ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিবার অধিকার আছে; সে শূদ্রে সাত্ত্বিক ভাব কি আসিতে পারে না? শূদ্রও যদি ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করে, ঈশ্বরের জন্য যদি অতি ব্যাকুল হইয়া পড়ে; যে শূদ্রের, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু একেবারেই ভাল লাগে না, সে শূদ্রের কি ঈশ্বরের জন্য ত্যাগে অধিকার হইতে পারে না? শূদ্রের কথা দূরে থাক, হিন্দু ছাড়া যবনেরও ত্যাগের অধিকার আছে।

"মাং তু পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথাশূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাং গতিং॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তারাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥"

সন্ন্যাস মানে কি? ত্যাগ ত? যদি নিজের কোন প্রকার সুখের জন্য শূদ্র সংসার আশ্রম ত্যাগ করে, তাহা হইলে অবশ্য দোষ হইতে পারে; কিন্তু, ঈশ্বরের জন্যে শূদ্র অনায়াসে সমস্ত ত্যাগ করিতে পারে, তাহাতে কোন দোষ হয় না; ইহা যাবতীয় শাস্ত্র ও যাবতীয় মহাপুরুষগণ বলিয়া থাকেন। শূদ্র যখন সমস্ত ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর অন্তপ্রাণ হন, তখন আর তাঁহাতে, শূদ্রত্বের কথা দূরে থাকুক, জীবত্ব পর্যন্তও লোপ হইয়া যায়। 'ত্যাগ করা' সামাজিক কথা নয়, জাতিগত কথা নয়; ইহা প্রাণের কথা, ইহা পারমার্থিক কথা। ত্যাগ কি যে সে করিতে পারে? যিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, যিনি আর কোন মতে সংসারে মন ধরিয়া রাখিতে পারেন না, যাঁর এক ঈশ্বর ছাড়া, আর কোন বস্তুতেই শান্তি হয় না, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তু বিষ বোধ হয়, তিনি কোন ক্রমে সংসারে আর থাকিতে পারেন না বলিয়াই সমস্ত ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন: তাঁহাকে আর তখন, ব্রাহ্মণ বলুন, শাস্ত্র বলুন, জাতি বলুন, যুক্তি বলুন, পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু বলুন, কাহার সাধ্য আর ধরিয়া রাখিতে পারে? তাঁহার নিকট জাতিধর্ম্ম, বা শাস্ত্র দেখান,—যেমন অরণ্যে রোদন করা। আচ্ছা বলি, আপনি একজন সদ্ব্রাহ্মণ; আপনিই অন্তরের সহিত সত্য কথা বলুন দিকি, আপনি একজন গৃহস্থ, আপনি বড়, না, সেই ত্যাগী ও ঈশ্বরনিষ্ঠ শূদ্র বড়?

মায়া।

(স্বামী সচ্চিদানন্দ)

এক মহাপুরুষ মায়ার যথার্থ স্বরূপ দেখ্‌তে চান্‌ ও দেখেন, এক পরমা সুন্দরী চিরযৌবনা রমণী, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিতা; রমণীর সমস্ত শরীর যেন কারুণ্যের প্রতিমূর্ত্তি। রমণী একটী শিশু প্রসব করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে উদরস্থ করিল।

এই কারুণ্য ও কঠোরতার একত্র সমবায়, অতি যত্নসহকারে স্বীয় গর্ভে শিশুকে ধারণ করিয়া, প্রসব হইবামাত্রই তাহাকে উদরস্থ করণ,—এই নিয়মই যেন জগতের ভিত্তি। জীবনের উদ্দেশ্য মৃত্যু। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবনতি। উদ্দেশ্যের সঙ্গেই উদ্দেশ্যহীনতা। ইহারই নাম মায়া।

গাছে ফুল ধরিল; উদ্দেশ্য—ফুলের পরিণতি ফলে। ফুল ক্রমে ফল হইল; ফল পাকিল; পাকিয়াই পচিতে আরম্ভ করিল। যদি পচনই, মৃত্যুই ফলের চরম দশা, তবে এত কষ্ট করিয়া ফুলকে ফলে পরিণত করার আয়াস কেন? মানবশিশু বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, অবস্থাচয় অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধ হইতেছে। বৃদ্ধ কত দেখিয়াছে, কত শুনিয়াছে, সংসারের ঘাত প্রতিঘাত বৃদ্ধের জ্ঞানভাণ্ডারে কত অমূল্য রত্ন সঞ্চয় করিয়াছে; বৃদ্ধ বাঁচিয়া থাকিলে তাহার জ্ঞান জগতের কত উপকার করিতে পারে; বৃদ্ধের পরামর্শে অর্ব্বাচীনের প্রভূত অমঙ্গল দূর হইত। কিন্তু বৃদ্ধের সে জ্ঞান জগতের কাজে আসিল না। মৃত্যুরূপ দস্যু কর্ত্তৃক তাহার সমস্ত ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইল। মহাপুরুষ কৃচ্ছ্রসাধনবলে অমৃতত্বপ্রয়াসী। সে অমৃতত্বের অবস্থা আর নিজের যথাসর্ব্বস্বের নাশ এক কথা। যেখানে অমৃতত্ব, সেখানে "আমি" বলিবার পর্য্যন্ত অবসর নাই। "যত্র নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, যো বৈ ভূমা তদমৃতম্‌"। চরম উন্নতি আর নিঃশেষ মৃত্যু এক কথা। এ নিত্য ছলনা যেন জাগতিক ব্যাপারের মূলমন্ত্র।

আবার যাহাতেই জীবন, তাহাতেই মৃত্যু। যে পথে অগ্রসর হইলে তোমার জীবন, সেই পথেই প্রতিপদে তোমার মৃত্যু। যে বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসাশ্রমের প্রচার দ্বারা ভারতবর্ষের সার পুরুষগণকে সন্ন্যাসী করিয়া এক সময়ে এ দেশকে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় করিয়াছিল, সেই বৌদ্ধধর্ম্মই আবার ভারতবর্ষের অবনতির বীজ রোপণ করিল। সমাজের সদ্‌গুণসম্পন্ন সন্তানগণ সন্ন্যাস লইতে আরম্ভ করিল; গৃহস্থাশ্রমে সুতরাং পড়িয়া রহিল কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ঢোঁড়

পম দুর্ব্বলপ্রাণ, দুর্ব্বলমস্তিষ্ক কুসন্তান। তাহাদেরই বংশধর আমাদের হাতে ভারতের জাতীয় জীবন ; কাজেই এত দুর্দ্দশা।

জন্মগত জাতিতে পিতা পিতামহাদির বিশেষ গুণ সন্তানে উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণপিতার সদ্গুণ ব্রাহ্মণসন্তান উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়। এ পক্ষে, জন্মগত জাতি একটী সুন্দর প্রথা। কিন্তু এই প্রথাই অন্য পক্ষে আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। বিস্তৃতির দ্বার একবারে রুদ্ধ করিয়াছে। ক্রমে শরীর নষ্ট, মন নষ্ট, আমরা অচেতন পুত্তলিকার দশায় পড়িতেছি। সমাজসংস্কারক ভাবিয়া আকুল ; জন্মগতজাতি না ভাঙ্গিলে উপায় নাই। যাহাতেই জীবন, তাহাতেই মৃত্যু।

সুখের সঙ্গে দুঃখ। ধনী বহু অর্থের অধিকারী। কিন্তু, উদরের দুরবস্থায় সে ধন তাহার ভোগে আসিতেছে না। দরিদ্র সবল ও সুস্থ ; তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ভোগসক্ষম ও লোলুপ ; কিন্তু অর্থের অভাবে দরিদ্র ভোগে বঞ্চিত।

এই না সত্য, না মিথ্যা, মরুমরীচিকাসদৃশ ব্যাপারের নাম মায়া। বিচক্ষণ ব্যক্তি মায়াকে "বিচিত্র ভবের খেলা দুবেলা ভাঙ্গিতে গড়িতে দেখিয়া অবাক্" হন। কোন্ প্রাণে, কোন্ আশায়, কোন্ বিবেক সহায়ে মায়িক জগৎকে সত্য বলিবেন ? কি উদ্দেশ্যেই বা মায়ার কার্য্যের সহিত নিজের আত্মীয়তা স্থাপন করিবেন ?

যে জিনিসটীকে সত্য বলিয়া ধরিতে যান, দেখেন, সেটির অস্তিত্বই নাই। যাহার নিত্য পরিবর্ত্তন, তাকে সত্য বলিয়া ধরিতে যাওয়া বাতুলতা। আজ যাকে আপনার বলেন, স্বার্থে আঘাত লাগিলে দেখেন, কাল সে পর হইয়া যায়। তার পর, কেহই তো চিরদিন আপনার থাকে না ; মৃত্যু আত্মীয়তা বন্ধন ছেদন করিবেই করিবে। উদ্দেশ্যবিহীন উন্মত্তের সঙ্গে কাজ করিতে যাওয়াও কি উন্মত্ততা নয় ? ভাল একটী কাজ করবে, কোন একটী মহান্ উদ্দেশ্য আশ্রয় করে কর্ম্মস্রোতে ভাসিতে যাইবে, কত কষ্ট, কত দিন রাত খেটে, একটা কাজ খাড়া করবে, তৎক্ষণাৎ মায়ার অঙ্গুলিস্পর্শে হুড়মুড় করিয়া সব পড়িয়া যাইবে। এ অতি সত্য। কোথায় শ্রীকৃষ্ণ, কোথায় বুদ্ধ, কোথায় শঙ্কর, কোথায় ঈশা ; তাঁহারা প্রাণ দিয়া জগতের কল্যাণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু জগৎ যে জগৎ সেই জগৎই রহিয়াছে। হতে পারে, দু চার দিনের জন্য, ঐ সকল মহাপুরুষের আগমনে এক মঙ্গলের হাওয়া পৃথিবী পবিত্র করে। কিন্তু সে দু চার দিন আর অনন্ত ভবিষ্যৎ—কত ব্যবধান ! !

তাই সুধী ব্যক্তি মায়াকে প্রণাম করিয়া বলেন, "আমাকে ছাড়িয়া দাও", বালকের মত কাঁদিয়া মাকে বলেন, "মা, তুমি মারিলে মারিতে পার, রাখিলে রাখিতে পার; আমাকে ছাড়িয়া দেও। যদি একান্তই ছাড়িয়া না দিবে, তবে সেই দিব্য দৃষ্টি দেও, যাতে নিত্য দেখ্‌তে পাই, এ লীলা তোমারই। যাতে দেখ্‌তে পাই, সুখের পশ্চাৎ তুমি, দুঃখেরও পশ্চাৎ তুমি; মৃত্যুর পশ্চাতে তুমি, জীবনের পশ্চাতেও তুমি; এক অম্বারূপিণী তোমাতে বিশ্ব পরিপূর্ণ।" ইহার নাম আত্মনিবেদন; মহামায়ার চরণে শরণ লওয়া; ইহাই ভক্তি।

অপরদিকে জ্ঞানী মহামায়ার দুরন্ত সন্তান, মাতৃঘাতী। মায়ার দুরন্ত ছলনা দেখে জ্ঞানী বিবেক মহা অসি হস্তে মায়াকেই বধ করিতে উদ্যত। তিনি আশ্রয়প্রার্থী নন; পুরুষকার তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার পথ মহামায়াকে কেটে যাওয়া। রূপ, গুণ, নাম, যতই সামনে আসুক, তিনি আর তাতে প্রতারিত হন না। বিবেকমাহাত্ম্যবলে সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করে নামরূপাতীত স্বস্বরূপানুসন্ধানে তিনি ব্যস্ত।

ভক্তই হউন, আর জ্ঞানীই হউন, যতদিন মহামায়ার অন্তরে অবস্থিত, ততদিন তাঁহাকে প্রতারিত করা দুঃসাধ্য। ফল না পাকিলে পচিবে না, বৃদ্ধ না হইলে মরণ নাই,—এই মহামায়ার রাজ্যের সাধারণ নিয়ম। না পাকিলে মরিবার যো নাই। অপঘাতমৃত্যু, বাল্যযৌবনে মৃত্যু যেন অস্বাভাবিক। মুক্তি, কি না, অহংকারের সমূলে বিনাশ। এ বিনাশ অপঘাতমৃত্যু নয়, বাল্যযৌবনের মৃত্যুর ন্যায় ফাঁকি দিয়ে পালান নয়। যদি যথার্থ নাশ বলে কিছু থাকে, তা এই মুক্তি। এ মরণে মরিতে হইলে, অতি পক, অতি বৃদ্ধ হইতে হইবে। জ্ঞানীকে বিবেকবৃদ্ধ হইতে হইবে; ভক্তকে ভক্তিতে পরিপক্ক হইতে হইবে। একটু কাঁচা থাকিলে চলিবে না। যতদিন কাঁচা থাকিবে, তত দিনই এই সংসার বৃক্ষের ডালের সহিত সংযোগ অচ্ছেদ্য। ভক্তকে ভক্তির "কড়ার কড়া তস্য কড়া" বোঝাইয়া দিতে হইবে। জ্ঞানীকে অনাত্মবুদ্ধি দূর করে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আত্মবুদ্ধি হইতে হইবে। ক্রমে যেমন ভক্তি-জ্ঞানের সম্যক্ পরিপক্কতা আসিবে, অমনিই মায়ার নিত্যসিদ্ধ নিয়মবশে পাকা ফল আপ্‌নিই পড়িয়া যাইবে। ইহাই শেষ নাশ বা মুক্তি।

মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণমিশনের কার্য্যবিবরণ।

(১৮৯৭ হইতে ১৯০২ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত।)

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ১৮৯৭ সালে মান্দ্রাজ নগরে যাইয়া তদবধি তথায় ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহার কার্য্যের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের বিবরণ সঙ্কলিত করিলাম।

প্রথমতঃ ইনি যাইয়া পরমহংসদেবের কতকগুলি মান্দ্রাজী ভক্তকর্ত্তৃক পরিচালিত ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকার আফিসে বাস করেন। শীঘ্রই ইহাঁর কতকগুলি ছাত্র জুটে। তাহারা নিয়মিত ভাবে ইহাঁর ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় উপদেশ শুনিতে আসিত। মান্দ্রাজের অন্তর্গত ময়লাপুর নামক স্থানে তাঁহার প্রথম কার্য্য আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ মান্দ্রাজের নানাস্থানে ইহাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিবার জন্য অনেকগুলি শিক্ষাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। মান্দ্রাজবাসীরা তেলুগু ও ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন ভাষা বুঝেন না। কাযে কাযেই ইহাঁকে ইংরাজীতেই সমুদয় বক্তৃতা দিতে হয়। ছাত্রগণের মধ্যে অধিকাংশই গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, সুতরাং ইহাঁদের সুবিধার জন্য প্রাতে ও বৈকালে শাস্ত্রব্যাখ্যা হইয়া থাকে। মান্দ্রাজের বিভিন্ন স্থানে দশটী এরূপ শিক্ষাসমিতি আছে। তদ্ব্যতীত মান্দ্রাজের ৫ মাইল দূরবর্ত্তী সৈদাপেট নামক স্থানের কতকগুলি ভদ্রলোকের অনুরোধে তথায় একটী গীতাপাঠসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ছাত্রসংখ্যা তিন শতের অধিক। বলা বাহুল্য, এই শিক্ষার জন্য কোনরূপ বেতন গ্রহণ করা হয় না। উপনিষদ্, গীতা, সাংখ্যদর্শন ও শ্রীমদ্ভাগবত এই সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত এই কয় বৎসরে মান্দ্রাজ ও তাহার নিকটস্থ কতকগুলি ক্ষুদ্র সহরে সর্ব্বপ্রকার শ্রোতার সমক্ষে ৩০ টীর অধিক ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলের লোক স্বামী বিবেকানন্দের উপর এতদূর অনুরক্ত যে, তত্রত্য সালেম জেলার অন্তর্গত ধর্ম্মপুরী (বানিয়ামবাড়ী) ও আরাশমপট্টি নামক দুইটী স্থানে বিবেকানন্দ হল নামে দুটী হল সংস্থাপিত হইয়াছে। বেঙ্কট স্বামী নাইডু নামক তত্রত্য জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুরোধে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঐ হল দুইটীর প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা করেন। ঐ সময়েই তথায় একটী অবৈতনিক বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হয় এবং পর্কোপলক্ষে তথায়

কাঙ্গালীভোজনেরও বন্দোবস্ত হইয়াছে। তথায় প্রতি বৎসর ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবও মহোৎসাহসহকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবাদিন্ আফিসে একবৎসর থাকিবার পর স্বামীজি স্বর্গীয় বিলগিরি আয়েনগার মহাশয়ের অনুরোধে কর্ণান ক্যাস্‌ল নামক তাঁহার সুবৃহৎ প্রাসাদের একাংশে বাস করিতে স্বীকৃত হন। সেই পর্য্যন্ত তিনি তথায়ই বাস করিতেছেন। ময়লাপুরের কতকগুলি ভদ্রলোক স্বামীজির চরিত্র ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মঠের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বিশেষ যত্ন করেন। শেষাচার্য্য মহোদয়ের উদ্যোগে দশ জন ভদ্রলোক কিছু কিছু করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ মাসে মাসে ২৬৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছেন।

সাধারণে এক্ষণে মান্দ্রাজ সহরের মধ্যস্থলে একটা পৃথক্ মঠবাটী নির্ম্মাণের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন এবং ইহার নির্ম্মাণার্থ চাঁদা তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। আশা করা যায়, ধর্ম্মপিপাসু সহৃদয় ব্যক্তিগণের যত্নে ইহা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে। এ পর্য্যন্ত মঠে সর্ব্বশুদ্ধ আয় হইয়াছে ৬৫৩৲ টাকা। ব্যয়—৫৪০/১৫ ; উদ্বৃত্ত আছে ১১২৸৫।

এক্ষণে স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী শিক্ষাসমিতির বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। সৈদাপুরগীতাসমিতি ব্যতীত সকল গুলিই মান্দ্রাজসহরের বিভিন্ন পল্লীতে অবস্থিত।

(১) ময়লাপুর শিক্ষাসমিতি।

১৮৯৭ সালের অক্টোবরে ইহা প্রথম খোলা হয়। প্রতি শনিবার প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ময়লাপুর দেশীয় মধ্যবিদ্যালয়ের হলে ইহার অধিবেশন হয়। এখানে উপনিষদ্ শিক্ষা দেওয়া হয়। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ শেষ হইয়াছে—বৃহদারণ্যক আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে সহজ ও সরলভাবে দুরূহ জটিল দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বক্তৃতাও হইয়া থাকে।

(২) হিন্দু কৈশোরসমিতি, মান্দ্রাজ।

এখানে ১৮৯৭ সালের প্রথম হইতেই ধর্ম্ম ও দর্শনবিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। প্রতি মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫॥ টার সময় এই সভাগৃহে স্বামীজির ছাত্রগণ সমবেত হন। এখানে প্রধান প্রধান হিন্দুদর্শনসম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ১৮৯৮ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত পতঞ্জলির যোগসূত্রসম্বন্ধে এবং পরে ১৯০১ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শনসম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। পরে ১৯০১

সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত ন্যায়দর্শনের বক্তৃতা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা শ্রোতৃবৃন্দের কিছু কঠিন বোধ হওয়ায় অল্প প্রচলিত অপ্রধান উপনিষদ্‌গুলি (শঙ্করাচার্য্য যে গুলির ভাষ্য রচনা করেন নাই) সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতেছে। ইতিমধ্যে কৈবল্য ও অমৃতবিন্দু উপনিষদ্ সমাপ্ত হইয়াছে। বক্তৃতা ব্যতীত প্রত্যহ সকলকেই প্রশ্ন করিতে অবকাশ দেওয়া হয়। স্বামীজি অতি সরল ভাষায় সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া থাকেন।

(৩) মান্দ্রাজান্তর্গত ব্ল্যাক টাউনের উচ্চ তত্ত্ববিদ্যালয়ে উপনিষৎসভার বক্তৃতা।

এই সভা ১৮৯৮এর মার্চ্চে শ্রীমৎ পরমহংস বালসুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামীকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি ১॥ বৎসর ধরিয়া ঈশ ও কেন উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে ১৯০০ সালের ৩১শে জুলাই ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় সভার সভ্যগণকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নিকট উপদেশ লইতে বলেন।

সভার সভ্যগণের অনুরোধে স্বামীজি এখানে প্রতি শুক্রবার অপরাহ্ন ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা আরম্ভ করেন। এখানে ইনি কঠোপনিষদ্ সমুদয় ও প্রশ্নোপনিষদের কতক অংশ অবলম্বন করিয়া ১৯ মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৮টী বক্তৃতা দিয়াছেন। কয়েক সপ্তাহ মাত্র বক্তৃতা বন্ধ গিয়াছিল। অত্যন্ত পরিশ্রমের জন্য কিছুদিন বিশ্রাম লইতে হইয়াছিল এবং বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য গুরুভাইগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এক মাসের উপর কিছু সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে সভার সভ্য হইতে গেলে কিছু কিছু করিয়া চাঁদা দিতে হইত। স্বামিজি আসিয়া এই প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে সকলে বিনা ব্যয়ে ইঁহার বক্তৃতা শুনিতেছে। কোন ছাত্র ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছু দিতে আসিলেও স্বামীজি তাহা গ্রহণ করেন না।

ছাত্রগণ যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিতেছেন, স্বামীজি অতি সরল ভাষায় নানারূপ উদাহরণ দিয়া, কখন বা রূপকের সাহায্যে অতি কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব সকল ছাত্রদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। তাঁহার সদা প্রফুল্ল মুখ, তাঁহার বক্তৃতাকালীন গাম্ভীর্য্য, প্রশ্নের উত্তর দিবার কালীন আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা, তাঁহার অপূর্ব্ব তর্কশক্তি, প্রশ্নকর্ত্তার ধারণার উপযোগী উত্তরদান তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের অতি প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। উপনিষদ্

ব্যাখ্যা ব্যতীত আরও অনেক বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে। নিম্নে তাহার কতক গুলি উল্লিখিত হইল।

১৯০০ সাল

আগষ্ট ১০ ... সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মের ব্যাখ্যা।
" ১৭ ... সচ্চিদানন্দ নিত্যপরিপূর্ণ।
" ২৪ ... দেশকালনিমিত্ত।
" ৩১ ... সাংখ্যদর্শন।
সেপ্টেম্বর ৭ ... চাতুর্ব্বর্ণ্য; আগম ও নিগম।
" ১৪ ... ব্রহ্মাণ্ড কি?
" ২১ ... জড় ও চৈতন্য।
" ২৮ ... মায়া।
অক্টোবর ৫ ... সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তি ও প্রকৃত সন্ন্যাসী কে?
" ২৬ ... প্রণব।
নবেম্বর ২ ... ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এবং ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচরম্।
" ৯ ... প্রাণ ও মন।
" ১৬ ... পঞ্চকোষ ও জ্ঞানীর লক্ষণ।
" ২৩ ... জন্মান্তরবাদ।
" ৩০ ... ধ্যান ও দর্শনের তিন যুগ।
ডিসেম্বর ৭ ... পরমাণুবাদসম্বন্ধে পাঁচজন দার্শনিকের মত এবং এক কিরূপে বহু হইল?
" ১৪ ... আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এবং বদ্ধ ও মুক্তপুরুষের আনন্দের প্রভেদ।
" ২১ ... ইন্দ্রিয়গণের কর্ত্তৃত্বাভিমান কিরূপে হয়।

১৯০১ সাল

জানুয়ারি ১১ ... কিরূপে গুরুসেবা করিতে হয় এবং গুরু কে?
" ১৮ ... ত্রিগুণ ও জ্ঞানীর অবস্থা।
" ২৫ ... অদ্বৈতবাদিগণ জৈমিনিদর্শনকে কিরূপে খণ্ডন করেন?

ফেব্রুয়ারি ১ ... মুক্তিসম্বন্ধে তিনটী দর্শনের মত।
,, ৮ ... মৃত্যু ও সমাধির পার্থক্য।
মার্চ্চ ১ ... জগৎ পক্ষিকুলায়স্বরূপ এবং আত্মতত্ত্ব।
,, ৮ ... আচার্য্যগণের মতভেদ এবং তাঁহাদের ঐক্য।
,, ১৫ ... বিভূতি কি ?
,, ২২ ... মনোবিজ্ঞান ও দর্শন।
এপ্রিল ১ই ... প্রকৃত শিষ্য কে ?
,, ১৯ ... সৃষ্টি কি এবং কিরূপে সৃষ্টি হয় ?
,, ২৬ ... অহঙ্কার কি ; আমরা জ্ঞানপাপী কিসে ?
মে ১০ ... হিন্দু ত্রৈতবাদ (ত্রিদেববাদ)।
,, ২৪ ... দুঃখই সুখের মূল এবং সুখই দুঃখের মূল।
,, ৩১ ... চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর সবই সেই এক ব্রহ্ম ; এবং সমাধিস্থ ও সুপ্ত ব্যক্তির প্রভেদ।
জুন ৭ ... কিছু নয় যাহা, তাহাও কিছু কিরূপে এবং ধর্ম্ম কি ?
,, ১৪ ... ঈশ্বর কোথায় ?
,, ২৮ ... সাধুগণ ঈশ্বরের প্রতিকৃতি কিসে ?
জুলাই ১২ ... বেদান্তশ্রবণের অধিকারী কে ?
,, ১৯ ... অহংনাশের উপায়।
আগষ্ট ৯ ... নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদে প্রভেদ।
সেপ্টেম্বর ২০ ... বৈরাগ্য।
,, ২৭ ... সৎ ও অসৎ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত।

১৯০২ সাল

জানুয়ারি ৩ ... জগতের দুই বিভাগ কি কি ?
ফেব্রুয়ারি ১৪ ... গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যা।
,, ২৮ ... ধ্যান ও সমাধি।

মধ্যে মধ্যে অনেক সন্ন্যাসী, এবং সাহেবও তাঁহার এই সকল বক্তৃতায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার উচ্চভাবসমন্বিত বক্তৃতাশ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন।

আনন্দ উদয়, জ্ঞানের মূল; উপার্জ্জন, কুল।

(৪) কমলীশ্বরণ

১৮৯৮এর নবেম্বরে ইহা খোলা হয়। এই সমিতির অধিবেশন হয়। প্রথমতঃ ভগবদ্‌২॥ বৎসর ধরিয়া গীতা আলোচনার পর ১৯০১ সালের বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন মত সম্বন্ধেও কতকগুলি মনোহর ছাত্রগণকে বেদান্তের ধারণায় সক্ষম দেখিয়া তিনি সম্প্রতি বেদান্তগ্রন্থ পাঠ করাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কি না?

থন।)

প্রতি সোমবারে প্রাতে ৭টা হইতে ৮॥০টা পর্য্যন্ত সমিতির অধিবেশন হইয়াছে, ছাত্রগণের মধ্যে চারিজন স্বেচ্ছাক্রমে মঠের সাহায্যার্থ কিছু কিছু দিয়া থাকেন।

(৫) এগমোর সমিতি।

মান্দ্রাজনগরস্থ এগমোর পল্লীর সাহিত্যসভার অধীনে ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটী ধর্ম্মসমিতি স্থাপিত হয়। তদবধি স্বামীজি মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান ইণ্টারপ্রেটার, রামচন্দ্র রাও বি, এর গৃহে প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবতসম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। এই বক্তৃতা ১৯০১ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত হয়। তার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অধ্যাত্মরামায়ণের উপর বক্তৃতা চলিতেছে। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষেও, বিশেষ বিশেষ বক্তৃতা দিয়াছেন।

(৬) মান্দ্রাজান্তর্গত রায়পুরমে গীতাসমিতি।

১৯০১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর রায়পুরমে গীতাসমিতি খোলা হয়। এ পর্য্যন্ত ১৪ বার সভার অধিবেশন হইয়াছে। ১০ জন ছাত্র লইয়া সমিতির আরম্ভ; এক্ষণে ১৫ জন ছাত্র হইয়াছেন। প্রথমে 'ধর্ম্মের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা হইয়া সভার আরম্ভ হয়। তৎপরে গীতার উপক্রমণিকাস্বরূপে একটী বক্তৃতা হইয়া গীতাসম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম দুই অধ্যায় ইতিমধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে।

(৭) সৈদাপেটস্থ গীতাসমিতি।

সৈদাপেটস্থ বিজয় ভিলাতে ১৮৯৯ এর মে মাসে এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। এখানে স্বামীজি প্রতি শনিবার অপরাহ্ণ ৬॥০টা হইতে

ফেব্রুয়ারি ১ ... মুক্তিসম্বন্ধে তিনটি ভগবদ্গীতাসম্বন্ধেই প্রধানতঃ বক্তৃতা
" ৮ ... মৃত্যু ও সমাধি অন্যান্য অনেক জটিল প্রশ্নেরও মীমাংসা
মার্চ্চ ১ ... জগৎ প্রশ্নেরই অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত উত্তর দিয়া
" ৮ ... আচা
" ১৫ ... ১৫। ২০ টীর অধিক হইবে না, তথাপি তিনি মান্দ্রাজ
" ২২ ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিয়মিতরূপে প্রতি শনিবার
এপ্রিল ১২ গিয়ে যাইয়া থাকেন। এ পর্য্যন্ত ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়
" ব্যাখ্যা হইয়া গিয়াছে। স্বামীজি হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীশ্চিয়ান প্রভৃতি ধর্মসমূহের সমন্বয় বিষয়িণী অনেক বক্তৃতাও দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি এমন উদার ভাবের হইয়াছিল যে, অনেক খ্রীশ্চিয়ান ও মুসলমান ভদ্রলোকও অনেক সময় সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। ভগবদ্গীতার নিঃস্বার্থপরতার ভাব খুব হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। এই সভার একজন সভ্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতার জন্য সাধারণকে ৪০০০ টাকা মূল্যের একটী হল দান করিয়াছেন।

(৮) চিন্তাদ্রিপেট্টা সমিতি।

ইহা ১৮৯৭ সালের মধ্যভাগে খোলা হয়। ভগবদ্গীতা সমুদয় শেষ হইয়া গিয়াছে। ১৮৯৮ সালের শেষ ভাগ হইতে এখন পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত চলিতেছে।

কেন ?

কি অভাব বিধাতার মনে ?
কেন হল জগৎ সৃজন ?
সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু সনে
কেন সদা কোরে আলিঙ্গন ?

কেন রে অমৃত ফল পাশে ?
কালকূট প্রাণিবিনাশন
কেন রে ক্ষণিক সুখ আশে
ধায় নর যথায় মরণ ?

আনন্দ উদয়,
নরনারী সৃষ্টি জ্ঞানের মূল ;
অভিপ্রায়—সৃষ্টি উপার্জ্জন,
তবে প্লেগ দুর্ভিক্ষ ম কুল।
কেন ধরা মাঝেতে সঙ্কু.

কেন ফোটে বাগানেতে ফুল,
হাসি হাসি যেন মুখ খানি,
সৌরভেতে করয়ে আকুল,
গন্ধগ্রাহী যত আছে প্রাণী ?

রূপের ঘটায় কেন হায়,
নয়নেরে মনেরে মজায় ?
কেন রে আবার ভানুতাপে
দুদিন বাদেতে ঝরে যায় ?

কেন পাখী ডাকে শাখী পরে—
আনন্দেতে কূজন ছড়ায় ?
কেন বা সে কোকিল কুহরে ?
সবাকার পরাণ মজায় ?

শিকারীর গুলি লেগে পুনঃ—
কেন হায় পড়ে ভূমিতলে,
ছটফটি হয় রে অজ্ঞান,
সে কাকলী যায় তার চলে ?

কেন এত ভালবাসা বাসি ?
কেন এত মান অভিমান ?
কেন এক দণ্ড ফুটে হাসি ?
কেন পুনঃ বিকট শ্মশান ?

কেন এত জীবনের স্পৃহা ?
কেন এত যত্ন প্রাণ ভরে ?
দুদিনের তরে যদি সব,
কেন তবে প্রাণী খেটে মরে ?

কোমলে কঠোরে কেন খেলা
দেখি নিতি এই ভবমাঝে?
কেন হাসি, কান্না সুখ দুখ
পাশাপাশি ধরায় বিরাজে?

কেন এত যশের বাসনা—
দুদিনের পরে যার শেষ?
কেন এত ধনের কামনা—
ভস্মরাশি যার অবশেষ?

কেন এত বাদ অনুবাদ?
কেন এত দর্শন বিজ্ঞান?
কেন এত মত মতান্তর?
পেয়েছ কি কিছু হে, সন্ধান?

রহস্য কি? ওহে মতিমান,
দিতে কি পার হে বুঝাইয়ে?
কেন সদা ঘুরি ভবমাঝে?
কেন সদা মোহেতে মজিয়ে?

এই সব তত্ত্ব ভেবে ভেবে,
প্রাণ সদা উদাস উদাস;
কর্ম্ম কিছু নাহি ভাল লাগে,
শান্ত হল অন্তর আকাশ।

অপূর্ব্ব ভাবেতে মগ্ন মন,
দেখিনু অপূর্ব্ব লীলা ভবে,—
আনন্দেতে উৎপত্তি সবার,
আনন্দেতে বর্ত্তমান সবে।

আনন্দেতে হবে পুন লয়,
আবার উঠিবে তাহা হতে;
মজ্জমান, পুনঃ ভাসমান,
নিত্যকাল আনন্দের স্রোতে।

তত্ত্বজ্ঞানে আনন্দ উদয়,
ভোগবুদ্ধি অজ্ঞানের মূল;
সাক্ষিবুদ্ধি হলে উপার্জ্জন,
পাইবে হে, ভবার্ণবে কূল।

অহিন্দু হিন্দু হইতে পারে কি না?

(স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন।)

প্রবুদ্ধ ভারত হইতে গৃহীত।

প্র। যে সকল হিন্দু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লওয়া উচিত কি না?

উ। নিশ্চয়ই উচিত। তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লওয়া অনায়াসে যাইতে পারে এবং করা উচিত। তাহা না হইলে, দিন দিন আমাদের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন, যখন মুসলমানগণ ভারতে আসেন, তখন হিন্দুর সংখ্যা ৬০ কোটি ছিল। এখন হিন্দুর সংখ্যা বিশ কোটি মাত্র। আবার কেহ হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে হিন্দুসমাজের সংখ্যা হ্রাস হয়, শুধু তাহাই নহে, সে হিন্দুসমাজের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। আবার অনেকে কেবল তরবারির চোটে মুসলমান বা খ্রীশ্চিয়ান হইয়াছে। তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ এক্ষণে মুসলমান বা খ্রীশ্চিয়ানরূপে বিরাজিত। ইহাদিগকে পুনরায় হিন্দু না করিবার কারণ কি? আর যাহারা স্বাভাবিক হিন্দুসমাজের বহির্ভূত, তাহাদের অনেককে প্রাচীনকালে হিন্দু করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং এখনও এইরূপে হিন্দুসমাজের ভিতর গ্রহণ করার ব্যাপার চলিয়াছে। শুধু অসভ্যজাতি, ভারতবহির্ভূত অন্যান্য জাতি এবং মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে ভারত আক্রমণকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ই যে এইরূপে হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে, পুরাণে যে সকল জাতির বিশেষ উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহারাও এইরূপ অহিন্দুজাতি হইতে গৃহীত, ইহা আমার দৃঢ় ধারণা। যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা পুনরায় হিন্দু হইতে গেলে অবশ্য উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যাহারা কেবল তরবারির বলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, (যেমন কাশ্মীর ও নেপালে দেখা যায়) অথবা যে সকল বিধর্ম্মিগণ হিন্দু হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে কোন প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করা বিহিত নহে।

প্র। কিন্তু স্বামীজি, ইহাঁরা কোন জাতির অন্তর্গত হইবেন? অবশ্য তাঁহাদের কোন জাতির অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক; তাহা না হইলে তাঁহারা অবশ্য হিন্দুদের সহিত মিশিতে পারিবেন না।

উ। স্বধর্ম্মত্যাগীরা পুনর্ব্বার গৃহীত হইলে, অবশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতিতে যাইবে। আর নূতন যাহারা আসিবে, তাহারা নিজেদের জাতি নিজেরাই গঠন করিবে। বৈষ্ণবেরা ইহা পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে এবং হিন্দুবহির্ভূত জাতি হইতেও অনেকে আসিয়া এই বৈষ্ণব জাতি গঠন করিয়াছে—আর ইহাঁদের, সমাজে বেশ একটু প্রতিপত্তিও আছে। রামানুজাচার্য্য হইতে চৈতন্যদেব পর্য্যন্ত সকলেই এইরূপ করিয়াছেন।

প্র। ইহারা কোথায় বিবাহ করিবে?

উ। অবশ্য এখন যেমন করিয়া থাকে, নিজেদের মধ্যে।

প্র। যাহারা বিধর্ম্মী হইয়া গিয়াছে, তাহারা পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে কি নূতন জাতিগত নাম দিতে হইবে?

উ। হাঁ, নামে যথেষ্ট কায হয় বৈকি।

প্র। উহারা কি হিন্দুধর্ম্মের নানাবিধ ভাবের ভিতর হইতে কোন ভাব নিজেরা বাছিয়া লইবে, না, আপনি তাহাদিগকে কোন বিশেষ ধর্ম্মভাবের উপদেশ দিবেন?

উ। এ কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? উহারা আপনারাই আপনাদের উপযোগী ধর্ম্ম বাছিয়া লইবে। তাহা না হইলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলভাবেরই উপর আঘাত করা হইবে। হিন্দুধর্ম্মে যে যেরূপ ইচ্ছা, ইষ্ট নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে।

অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ যেরূপ সঙ্কল্প করে, সেইরূপ হইয়া থাকে। বাস্তবিক আমরা যদি নিজেদের অন্তর একটু অভিনিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করি, তবে বুঝিব, প্রকৃতপক্ষে সমুদয় শক্তি আমাদের ভিতর গূঢ়ভাবে রহিয়াছে। আমরা নিজেদের চিনি না বলিয়াই ইচ্ছামত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারি না। এই স্থূলজগতের পশ্চাতে সূক্ষ্ম জগৎ রহিয়াছে। নিয়ম এখানেও যেমন, সেখানেও তেমন। সূক্ষ্মজগৎ কবিকল্পনা নহে, উহা একটী বাস্তবিক সত্তা। চিন্তাও বস্তুবিশেষ। চিন্তার বলে এক মন অপর মনের উপর অল্পাধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এই শক্তি যখন তীব্রভাবে কার্য্য করে, তখন আমরা যাহাদিগকে অলৌকিক বলি, সেই সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞানে আনন্দ উদয়,
ভোগবুদ্ধি অজ্ঞানের মূল;
সাক্ষিবুদ্ধ হলে উপার্জন,
পাইবে হে, ভবার্ণবে কূল।

অহিন্দু হিন্দু হইতে পারে কি না?

(স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন।)

প্রবুদ্ধ ভারত হইতে গৃহীত।

প্র। যে সকল হিন্দু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লওয়া উচিত কি না?

উ। নিশ্চয়ই উচিত। তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লওয়া অনায়াসে যাইতে পারে এবং করা উচিত। তাহা না হইলে, দিন দিন আমাদের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন, যখন মুসলমানগণ ভারতে আসেন, তখন হিন্দুর সংখ্যা ৬০ কোটি ছিল। এখন হিন্দুর সংখ্যা বিশ কোটি মাত্র। আবার কেহ হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে হিন্দুসমাজের সংখ্যা হ্রাস হয়, শুধু তাহাই নহে, সে হিন্দুসমাজের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। আবার অনেকে কেবল তরবারির চোটে মুসলমান বা খ্রীশ্চিয়ান হইয়াছে। তাহাদের সন্তান-সন্ততিই এক্ষণে মুসলমান বা খ্রীশ্চিয়ানরূপে বিরাজিত। ইহাদিগকে পুনর্ব্বার হিন্দু না করিবার কারণ কি? আর যাহারা স্বাভাবিক হিন্দুসমাজের বহির্ভূত, তাহাদের অনেককে প্রাচীনকালে হিন্দু করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং এখনও এইরূপে হিন্দুসমাজের ভিতর গ্রহণ করার ব্যাপার চলিয়াছে। শুধু অসভ্যজাতি, ভারতবহির্ভূত অন্যান্য জাতি এবং মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে ভারত আক্রমণকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ই যে এইরূপে হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে, পুরাণে যে সকল জাতির বিশেষ উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহারাও এইরূপ অহিন্দুজাতি হইতে গৃহীত, ইহা আমার দৃঢ় ধারণা। যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা পুনরায় হিন্দু হইতে গেলে অবশ্য উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যাহারা কেবল তরবারির বলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, (যেমন কাশ্মীর ও নেপালে দেখা যায়) অথবা যে সকল বিধর্ম্মিগণ হিন্দু হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে কোন প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করা বিহিত নহে।

প্র। কিন্তু স্বামীজি, ইহাঁরা [illegible] অন্তর্গত হইবেন? অবশ্য ইহাদের কোন জাতির অন্তর্গত [illegible], তাহা না হইলে তাঁহারা অবশ্য হিন্দুদের সহিত মিশিতে পারিবেন না।

উ। স্বধর্মত্যাগীরা পুনর্ব্বার গৃহীত হইলে, অবশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতিতে যাইবে। আর নূতন যাহারা আসিবে, তাহারা নিজেদের জাতি নিজেরাই গঠন করিবে। [illegible] ইহা পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে এবং [illegible] জাতি হইতেও অনেকে আসিয়া এই বৈষ্ণব জাতি গঠন করিয়াছে—আর ইহাঁদের, সমাজে বেশ একটু প্রতিপত্তিও আছে। [illegible] হইতে চৈতন্যদেব পর্য্যন্ত সকলেই এইরূপ করিয়াছেন।

প্র। ইহারা কোথায় বিবাহ করিবে?

উ। অবশ্য এখন যেমন করিয়া থাকে, নিজেদের মধ্যে।

প্র। যাহারা বিধর্ম্মী হইয়া গিয়াছে, তাহারা পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে কি নূতন জাতিগত নাম দিতে হইবে?

উ। হাঁ, নামে যথেষ্ট কায হয় বৈকি।

প্র। উহারা কি হিন্দুধর্ম্মের নানাবিধ ভাবের ভিতর হইতে কোন ভাব নিজেরা বাছিয়া লইবে, না, আপনি তাহাদিগকে কোন বিশেষ ধর্ম্মভাবের উপদেশ দিবেন?

উ। এ কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? উহারা আপনারাই আপনাদের উপযোগী ধর্ম্ম বাছিয়া লইবে। তাহা না হইলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলভাবেরই উপর আঘাত করা হইবে। হিন্দুধর্ম্মে যে যেরূপ ইচ্ছা, ইষ্ট নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে।

অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ যেরূপ সঙ্কল্প করে, সেইরূপ হইয়া থাকে। বাস্তবিক আমরা যদি নিজেদের অন্তর একটু অভিনিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করি, তবে বুঝিব, প্রকৃতপক্ষে সমুদয় শক্তি আমাদের ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। আমরা নিজেদের চিনি না বলিয়াই ইচ্ছামত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারি না। এই স্থূলজগতের পশ্চাতে সূক্ষ্ম জগৎ রহিয়াছে। নিয়ম এখানেও যেমন, সেখানেও তেমন। সূক্ষ্মজগৎ কবিকল্পনা নহে, উহা একটি [illegible] সত্তা। চিন্তাও বস্তুবিশেষ। চিন্তার বলে এক মন অপর মনের [illegible] অত্যধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এই শক্তি [illegible] কার্য্য করে, তখন আমরা যাহাদিগকে অলৌকিক বুদ্ধি, সেই [illegible] ।

বিদিত্বা সপ্তপ্রশ্ননির্ণয়দ্বারেণ উক্তং সম্যগবধার্য্য অনুষ্ঠায় যোগী পরং প্রকৃষ্টমৈশ্বরং স্থানমৈশ্বরং প্রতিপদ্যতে আদ্যং আদৌ ভবং কারণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। ২৮।

ভাষ্যানুবাদ। যোগের মাহাত্ম্য এই — সম্যক্‌রূপে বেদ অধ্যয়ন করিলে, যজ্ঞাদির সাঙ্গ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, তপস্যা সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে এবং সকল প্রকার দানের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিলে, অথবা এই সকল কার্য্য মিলিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে যে পুণ্য ফল অর্থাৎ পুণ্যের ফল সুপাদিত হয় বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, এই সপ্ত প্রশ্নের নির্ণয় দ্বারা উপদিষ্ট যোগবিষয়টী জানিতে পারিলে যোগী সেই সকল পুণ্যফলকে অতিক্রম করিয়া যায় এবং এই যোগের বিষয়ে সম্যক্ প্রকার অবধারণ করিয়া অনুষ্ঠান করিলে যোগী "পরম" প্রকৃষ্ট ঈশ্বরভাবস্বরূপ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থান "আদ্য" আদিতে ভব অর্থাৎ কারণ ব্রহ্মস্বরূপ ইহাই অর্থ। ২৮।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শঙ্কর ভাষ্যে অক্ষরব্রহ্ম যোগাখ্যানে

অক্ষর নির্দ্দেশনামক অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

নবম অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১॥

অন্বয়। অনসূয়বে তে ইদং তু গুহ্যতমং বিজ্ঞান সহিতং জ্ঞানং বক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে। ১।

মূলানুবাদ। ভগবান্ বলিলেন। তুমি অসূয়াশূন্য, তোমাকে এই পরম গোপ্য বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান বলিতেছি, যাহা জানিলে তুমি অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ১।

ভাষ্য। অষ্টমে নাড়ী দ্বারেণ যোগঃ সগুণ উক্তঃ। তস্য চ ফল মগ্ন্যর্চ্চিরাদি ক্রমেণ কালান্তরে ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণ মেবানাবৃত্তিরূপং নির্দ্দিষ্টম্। তত্রানেনৈব প্রকারেণ মোক্ষপ্রাপ্তিফল মধিগম্যতে নান্যথেতি তদাশঙ্কা ব্যাবিবৃৎসয়া (শ্রীভগবানুবাচ) ইদং ব্রহ্মজ্ঞানং বক্ষ্যমাণ মুক্তং চ পূর্ব্বেষধ্যায়েষু তদ্বুদ্ধৌ সন্নিধী-কৃতোদমিত্যাহ তু শব্দো বিশেষ নির্দ্ধারণার্থঃ। ইদমেব সম্যগ্‌জ্ঞানং সাক্ষান্মোক্ষ-প্রাপ্তিসাধনং "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "একমেবা দ্বিতীয়" মিত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। নান্যৎ। "অথ যেঽন্যথাতো বিদুরন্য রাজানঃ তে ক্ষয্যলোকাভবন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ; তে তুভ্যং গুহ্যতমং গোপ্যতমং প্রবক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি অনসূয়বে অসূয়া রহিতায়। কিং তদ্‌জ্ঞানং কিং বিশিষ্টং বিজ্ঞানসহিতমনুভবযুক্তং। যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মোক্ষ্যসে অশুভাৎ সংসার বন্ধনাৎ। ১।

ভাষ্যানুবাদ। অষ্টম অধ্যায়ে নাড়ীদ্বারা সগুণধারণাযোগ উক্ত হইয়াছে। অগ্নি ও অর্চিঃ প্রভৃতি মার্গানুসারে কালান্তরে ব্রহ্মপ্রাপ্তি লক্ষণ অপুনরাবৃত্তিরূপ ফল ও ধারণাযোগের দ্বারা পাওয়া যায়, তাহাও বলা হইয়াছে। তাহার পর এইক্ষণে এই একই প্রকারে মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হইতে পারে (ইহাতে অন্য কোন উপায় হয় ত নাই) এই প্রকার শঙ্কা নিবৃত্ত করিবার অভিলাষে (ভগবান্ বলিতেছেন যে) "এই" বক্ষ্যমাণ ও পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সমূহে উক্ত যে

ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই মনে করিয়া "এই" এই শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। "তু" এই শব্দটীর দ্বারা বিশেষ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন। "বাসুদেবই সকল পদার্থ" "এই সকল বস্তু আত্মাই" "একই অদ্বিতীয়" ইত্যাদি স্মৃতি ও শ্রুতি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়। "যে সকল সাধারণ ব্যক্তিগণ এই আত্মাতে ভেদ দৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাঁহারা পুনরাবৃত্তি লাভ করেন" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে, এই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ই মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন হইতে পারে না। "তে" তোমাকে (তুমি কেমন) "অনসূয়ু" অসূয়া রহিত, "গুহ্যতম" গোপ্যতম বলিব। কি তাহা? "জ্ঞান" কিরূপ জ্ঞান? বিজ্ঞান সহিত অনুভবযুক্ত। যে জ্ঞানকে "জানিয়া" পাইয়া (তুমি) "অশুভ" সংসার বন্ধন হইতে মোক্ষলাভ করিবে। ১।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২॥

অন্বয়। ইদং (আত্মজ্ঞানং) রাজবিদ্যা, রাজগুহ্যং, উত্তমং পবিত্রম্, প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং কর্ত্তুং সুসুখম্ অব্যয়ম্। ২।

মূলানুবাদ। এই (আত্মজ্ঞান) সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ এবং সকলপ্রকার রহস্যের সার, ইহা উত্তম পবিত্র, ইহা প্রত্যক্ষানুভব ও ধর্ম্মাবিরুদ্ধ, ইহার সম্পাদন করিতে আয়াস হয় না, ইহার ফল অবিনশ্বর। ২।

ভাষ্য। তচ্চ "রাজবিদ্যা" বিদ্যানাং রাজা দীপ্ত্যতিশয়বত্ত্বাৎ দীপ্যতে হীয়ং ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যানাম্। তথা "রাজগুহ্যং" গুহ্যানাং রাজা। পবিত্রং পাবনমিদমুত্তমং সর্ব্বেষাং পাবনানাং শুদ্ধিকারণমিদং ব্রহ্মজ্ঞানম্ উৎকৃষ্টতমম্ অনেকজন্মসহস্রসঞ্চিতমপি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সমূলং কর্ম্ম ক্ষণমাত্রাদ্ ভস্মীকরোতি যতঃ অতঃ কিং তস্য পাবনত্বং বক্তব্যম্। কিঞ্চ প্রত্যক্ষাবগমং প্রত্যক্ষেণ সুখাদেরিব অবগমো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমম্। অনেকগুণবতোঽপি ধর্ম্মবিরুদ্ধত্বং দৃষ্টম্ ন তথা আত্মজ্ঞানং ধর্ম্মবিরোধি -- কিন্তু "ধর্ম্ম্যং" ধর্ম্মাদনপেতম্। এবমপি স্যাদ্দুঃসম্পাদ্যম্ ইত্যত আহ সুসুখং কর্ত্তুং যথা রত্নবিবেকজ্ঞানং। তত্র অল্পায়াসানাং কর্ম্মণাং সুখসম্পাদ্যানাম্ অল্পফলত্বং দুষ্করাণাঞ্চ মহাফলত্বং দৃষ্টমিতি ইদং তু সুখসম্পাদ্যত্বাৎ ফলক্ষয়াদ্ব্যেতীতি প্রাপ্তে অত আহ "অব্যয়ং" নাস্য ফলতঃ কর্ম্মবদ্ব্যয়োঽস্তীতি অব্যয়ম্ অতঃ শ্রদ্ধেয়মাত্মজ্ঞানং। ২।

ভাষ্যানুবাদ। সেই (আত্মজ্ঞান) "রাজবিদ্যা" বিদ্যা সকলের রাজা, কারণ ইহার দীপ্তি অপর সকল বিদ্যা হইতে অধিক। সকল বিদ্যার মধ্যে এই ব্রহ্মবিদ্যা অতিশয় দীপ্তি পাইয়া থাকে। সেইরূপ (ইহা) "রাজগুহ্য" গুহ্য অর্থাৎ রহস্যসমূহের রাজা। "পবিত্র" পাবন "উত্তম" সকল পাবন বস্তুরও শুদ্ধির কারণ এই ব্রহ্মজ্ঞান, এইজন্য ইহা উৎকৃষ্টতম পবিত্র। অনেক সহস্র জন্মের সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি যাবৎকর্ম্মই মূলের সহিত যে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে ক্ষণমাত্রেই ভস্মীভূত হয়, তাহার পবিত্রতার বিষয়ে আর কি বলা যাইতে পারে? আরও এই ব্রহ্মজ্ঞান "প্রত্যক্ষাবগম" সুখাদি বস্তুর ন্যায় যাহার অনুভব প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকেই প্রত্যক্ষাবগম কহা যায়। বহু গুণ থাকিলেও কোন কোন বস্তু ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইতে পারে ইহা দেখা যায়, কিন্তু এই আত্মজ্ঞান সেই প্রকার নহে, ইহা "ধর্ম্ম্য" অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে অনপেত। এরূপ হইলেও হয় ত ইহার সাধন করিতে বড়ই ক্লেশ পাইতে হয়, এই প্রকার আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য বলিতেছেন যে,—ইহা করিতে আয়াস হয় না, এই জন্য এই আত্মজ্ঞান সুসম্পাদনীয় যেমন রত্ন বিবেক জ্ঞান। সংসারে এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কার্য্যে আয়াস অল্প এবং যাহা সুখের সহিত সম্পাদিত হয়, সেই কর্ম্মের ফল অল্প হইয়া থাকে, আর দুষ্কর কর্ম্মসমূহের ফল মহৎ হইয়া থাকে। এই আত্মজ্ঞান সেই নিয়মানুসারে সুখসম্পাদ্যত্ব নিবন্ধন ক্ষীণ হয় অর্থাৎ ইহার ফল বিনাশী হইতে পারে, এই প্রকার সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য বলিতেছেন, "অব্যয় ফলের ক্ষয়িত্বনিবন্ধন কর্ম্ম যে প্রকার ক্ষয়ি বলিয়া উক্ত হয়, ইহার সেই প্রকার ক্ষয় হইতে পারে না, এই কারণে ইহা অব্যয়, অতএব এই আত্মজ্ঞানের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা করা উচিত। ২।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩॥

অন্বয়। হে পরন্তপ! অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মাং অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে। ৩।

মূলানুবাদ। হে পরন্তপ! এই ধর্ম্মে যাহাদের বিশ্বাস নাই, সেই পুরুষগণই আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসারের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে।

ভাষ্য। যে পুনঃ অশ্রদ্দধানাঃ শ্রদ্ধাবিরহিতা আত্মজ্ঞানস্য ধর্ম্মস্যাস্য স্ব

তৎফলে চ নাস্তিকাঃ পাপকারিণঃ অসুরাণামুপনিষদং দেহমাত্রাত্মদর্শনং এব প্রতিপন্না অসুতৃপঃ পাপাঃ পুরুষাঃ পরন্তপ অপ্রাপ্য মাং পরমেশ্বরং মৎপ্রাপ্তৌ নৈবাশঙ্কা ইতি মৎপ্রাপ্তিমার্গভেদভক্তিমাত্রমপি অপ্রাপ্য ইত্যর্থঃ। নিবর্ত্তন্তে নিশ্চয়েন আবর্ত্তন্তে। ক্ব? মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি মৃত্যুযুক্তঃ সংসারঃ মৃত্যুসংসারঃ তস্য বর্ত্ম নরকতির্য্যগাদিপ্রাপ্তিমার্গস্তস্মিন্নেব বর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। যাহারা কিন্তু "অশ্রদ্দধান" এই আত্মজ্ঞানরূপ ধর্ম্মের স্বরূপ ও ফলে শ্রদ্ধাশূন্য (অর্থাৎ) যাহারা নাস্তিক—পাপকারী—অসুরগণের উপনিষদ্ দেহমাত্রেই আত্মদর্শনকে যথার্থ বলিয়া মানিয়া লয়, সেই ইন্দ্রিয়প্রীতিনিরত পুরুষগণ আমাকে (অর্থাৎ) পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত না হইয়া, আমার প্রাপ্তির সম্ভাবনাও নাই, কিন্তু আমার প্রাপ্তির প্রতি উপায়ের মধ্যে অন্যতম উপায় যে ভক্তিমাত্র, তাহাও না পাইয়া, ইহাই অর্থ, নিবৃত্ত হইয়া থাকে—অর্থাৎ তাহা নিশ্চয়ই আবর্ত্তন করে। কোথায়? এই "মৃত্যুসংসারবর্ত্মে" মৃত্যুযুক্তসংসারই মৃত্যুসংসার শব্দের অর্থ, তাহার বর্ত্ম অর্থাৎ নরক বা তির্য্যগ্ জন্ম প্রভৃতির প্রাপ্তিমার্গ—সেই মৃত্যুসংসারবর্ত্মে তাহারা পরিবর্ত্তন করে। ইহাই অর্থ। ৩।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪॥

অন্বয়। অব্যক্তমূর্ত্তিনা ময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং সর্ব্বভূতানি মৎস্থানি ন চ অহং তেষু অবস্থিতঃ। ৪।

মূলানুবাদ। আমার মূর্ত্তি অব্যক্ত, আমি এই সকল জগৎকে ব্যাপিয়া আছি, সকল প্রাণীই আমাতে অবস্থিত—আমি কিন্তু সেই প্রাণিগণকে আশ্রয় করি না। ৪।

ভাষ্য। স্তুত্বা অর্জ্জুনমভিমুখীকৃত্যাহ ময়া মম যঃ পরো ভাবস্তেন ততং ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ। অব্যক্তমূর্ত্তিনা ন ব্যক্তা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য মম সোহহমব্যক্তমূর্ত্তিঃ তেন ময়া অব্যক্তমূর্ত্তিনা করণাগোচরস্বরূপেণেত্যর্থঃ। তস্মিন্ ময়ি অব্যক্তমূর্ত্তৌ স্থিতানি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি। নহি নিরাত্মকং কিঞ্চিদ্ভূতং ব্যবহারায় অবকল্পতে। অতো মৎস্থানি ময়া আত্মনা আত্মবত্ত্বেন স্থিতানি অতো ময়ি স্থিতানি ইতি উচ্যন্তে। তেষাং ভূতানাম্ অহমেবাত্মা ইত্যতস্তেষু স্থিত ইতি মূঢ়বুদ্ধীনাম্ অবভাসতে অতো ব্রবীমি ন চাহং

তেষু ভূতেষু অবস্থিতঃ মূর্ত্তবৎসংশ্লেষাভাবেন আকাশস্যাপি অন্তরতমোহহং। নহ্যসংসর্গিবস্তু কচিদাধেয় ভাবেন অবস্থিতং ভবতি। ৪।

ভাষ্যানুবাদ। আত্মজ্ঞানের প্রশংসাপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে শুনিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া বলিতেছেন, "আমা দ্বারা" আমার যে পরভাব (অর্থাৎ পারমার্থিক-সত্তা) তাহা দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব "তত" ব্যাপ্ত রহিয়াছে (আমি কি প্রকার?) "অব্যক্ত মূর্ত্তি" অব্যক্ত (অর্থাৎ) ব্যক্ত নহে, "মূর্ত্তি" স্বরূপ যাহার সেই অব্যক্ত মূর্ত্তি অর্থাৎ আমার স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। সেই অব্যক্ত মূর্ত্তি আমাতে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল ভূতই অবস্থান করিতেছে, কোন বস্তুই নিরাত্মক হইয়া ব্যবহারার্হ হইতে পারে না। এই কারণে সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে (অর্থাৎ) আমিই সকল বস্তুর আত্মা, সুতরাং আত্মস্বরূপ আমার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সকল বস্তু আত্মবিশিষ্ট হইয়াছে, এই জন্যই তাহারা আমাতে বর্ত্তমান আছে, ইহা বলা যাইতেছে। সেই সকল প্রাণীর আমিই আত্মা, এই কারণে আমি তাহা-দিগকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছি, এইরূপ মূঢ়বুদ্ধিগণ বুঝিয়া থাকে, এই জন্য আমি বলিতেছি, আমি সেই সকল প্রাণীকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করি না। পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সংযোগ আছে বলিয়া তাহা যেমন সংযুক্ত হইয়া কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকে, আমার কিন্তু সেই প্রকার পরিচ্ছেদনিবন্ধন বস্তুবিশেষের সহিত সংযোগ হইতে পারে না। কারণ আমি আকাশেরও অন্তরতম (সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন) যে বস্তুর সংসর্গ নাই, তাহা কখনও কোন আধারের আধেয় হইতে পারে না। ৪।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫॥

অন্বয়। ভূতানি চ (অপি) ন চ মৎস্থানি মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য, মম আত্মা ভূতভাবনঃ ভূতভৃৎ (কিন্তু) ন চ ভূতস্থঃ (ভবতি)। ৫।

মূলানুবাদ। প্রাণীনিচয়ও যে বাস্তবিক আমাতে আছে, তাহা নহে। আমার ঐশ্বরযোগ দেখ, আমার আত্মা ভূতনিচয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা-দিগকে ধারণও করিতেছে অথচ তাহাদিগকে ইহা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান নহে। ৫।

ভাষ্য। অতএবাসংসর্গিত্বান্মম ন চ মৎস্থানি ভূতানি ব্রহ্মাদীনি পশ্য মে

যোগং যুক্তিং ঘটনং মে মম ঐশ্বরং ঈশ্বরস্যেমং ঐশ্বরং যোগমাত্মনো যাথাত্ম্যমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিরসংসর্গিত্বাদসঙ্গতাং দর্শয়তি "অসঙ্গোনহি সজ্জতে" ইতি ইদং চ আশ্চর্য্যমন্যৎপশ্য ভূতভৃদসঙ্গোঽপি সন্ ভূতানি বিভর্ত্তি ন চ ভূতস্থো যথোক্তেন ন্যায়েন দর্শিতত্বাদ্ ভূতস্থত্বানুপপত্তেঃ। কথং পুনরুচ্যতেঽসৌ মমাত্মেতি বিভজ্যদেহাদিসঙ্ঘাতং তস্মিন্নহংকারং অধ্যারোপ্য লোকবুদ্ধিমনুসরন্ ব্যপদিশতি মম আত্মেতি ন পুনরাত্মন আত্মান্য ইতি লোকবদজানন্। তথাভূতভাবনঃ ভূতানি ভাবয়তি উৎপাদয়তি বর্দ্ধয়তি ইতি বা ভূতভাবনঃ। ৫।

ভাষ্যানুবাদ। আমার এই প্রকার অসংসর্গিত্ব আছে বলিয়াই, ব্রহ্মাদি প্রাণিনিচয়ও (পারমার্থিক ভাবে) আমাতে সংযুক্তরূপে অবস্থিত নহে। আমার "ঐশ্বরযোগ" দেখ, এইখানে যোগশব্দের অর্থ যুক্তি—ঘটনা, যাহা ঈশ্বরের, তাহাকেই ঐশ্বর বলা যায়। ঐশ্বরযোগ এই শব্দের তাৎপর্য্য পরমাত্মার যথার্থস্বরূপ। "অসঙ্গ এই কারণে আত্মা কোন বস্তুতে সক্ত নহে" এইরূপ শ্রুতি ও অসংসর্গিত্বনিবন্ধন আত্মার অসঙ্গতা প্রতিপাদন করিতেছে। এই আর একটা আশ্চর্য্যও দেখ, আমি অসঙ্গ হইয়াও প্রাণীগণের ভরণ করিয়া থাকি, অথচ আমি ভূতস্থ নহি, আমি যে কেন ভূতস্থ নহি, তাহা পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং আমি যে প্রাণীগণকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিব, ইহা কখনই উপপন্ন হইতে না। ইহা আমার আত্মা, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতেছে (ঈশ্বরই আত্মা ঈশ্বরের আবার আত্মা কি প্রকারে হইতে পারে?) দেহাদি সমষ্টিকে বিভাগ করিয়া তাহার মধ্যে কোন একটাতে লৌকিক পুরুষের ন্যায় অহঙ্কারের আরোপ করিয়া লোক-বুদ্ধির অনুসরণ পূর্ব্বক ভগবান্ নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, আমার আত্মা আত্মার আবার আর একটা আত্মা হইতে পারে না। ইহা যেমন লোকে বুঝে না, ভগবান যে সেইরূপ না বুঝিয়া বলিয়াছেন, তাহা নহে। আরও (আমার আত্মা) "ভূতভাবন" যাহা ভূতগণকে উৎপাদন করে, অথবা তাহাদিগকে বাড়াইয়া থাকে, তাহারই নাম ভূতভাবন। ৫।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বগতোমহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬॥

অন্বয়। যথা আকাশস্থিতো বায়ুঃ সর্ব্বগঃ মহান্ তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি ইতি উপধারয়। ৬।

মূলানুবাদ। যেমন সর্ব্বত্র বিচরণশীল মহান্ বায়ু সর্ব্বদা আকাশে অবস্থান করে, সেই সকল ভূতনিচয় সর্ব্বদা আমাতে (অসঙ্গভাবে) বিদ্যমান আছে, ইহা তুমি জান। ৬।

ভাষ্য। যথোক্তেন শ্লোকদ্বয়েন উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্নাহ যথালোকে আকাশস্থিত আকাশে স্থিতোনিত্যং সদাবায়ুঃ সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি সর্ব্বত্রগো মহান্ পরিমাণত স্তথা আকাশবৎ সর্ব্বগতে ময়ি অসংশ্লেষেণৈব স্থিতানীত্যুপধারয়। ৬।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা যে ভাবে পরমার্থ বস্তুর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এইক্ষণে সেই ভাবেই দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিয়া তাহাকে বিশদভাবে বুঝান হইতেছে। যেমন লোকে "আকাশস্থিত" আকাশে অবস্থিত (হইয়াই) "নিত্য" সর্ব্বদা বায়ু "সর্ব্বত্রগ" সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে, (এবং) ঐ বায়ু পরিমাণতঃ মহান্ (ও বটে), সেইরূপ আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত আমাতে অসংশ্লিষ্টভাবেই (সর্ব্বভূত) আমাতে অবস্থান করিতেছে, ইহা তুমি জান। ৬।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭॥

অন্বয়। হে কৌন্তেয়! সর্ব্বভূতানি কল্পক্ষয়ে মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি কল্পাদৌ পুনঃ অহং তানি বিসৃজামি। ৭।

মূলানুবাদ। হে কুন্তীনন্দন! ভূতসমূহ প্রলয়কালে মদীয় প্রকৃতিতে বিলীন হয়। পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। ৭।

ভাষ্য। এবং বায়ুরাকাশইব ময়িস্থিতানি সর্ব্বভূতানি স্থিতিকালে তানি সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মিকাং অপরাং যান্তি মামিকাং মদীয়াং কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে। পুনর্ভূয়স্তানি ভূতানি উৎপত্তিকালে কল্পাদৌ বিসৃজামি উৎপাদয়ামি অহং পূর্ব্ববৎ। ৭।

ভাষ্যানুবাদ॥ এইরূপ বায়ু যেমন আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ স্থিতিকালে সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করে, সেই ভূতসমূহ "কল্পক্ষয়ে" প্রলয়কালে "মামিকা" মদীয় ত্রিগুণাত্মিকা অপরা প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়। পুনর্ব্বার সেই ভূতনিচয়কে সৃষ্টিকালে আমি পূর্ব্ববৎ উৎপাদন করিয়া থাকি॥ ৭॥

ধ্রুবচরিত্র।

চতুর্থ অঙ্ক।—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রসভা।

(দেবগণ বেষ্টিত ইন্দ্র আসীন)

(দূতের প্রবেশ)

ইন্দ্র। কহ দূত! কহ কি সংবাদ।

দূত। নিবেদি চরণে দেব!
অমরের বিজয় নিশান
উড়িতেছে চারিদিকে;
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে শান্তি বিরাজিছে।
কিন্তু সুরনাথ!
অপরূপ দেখিলাম এক!
ধরণী ভিতর মধুবনে,
ধ্রুব নামে পঞ্চমবর্ষীয় এক শিশু
কঠোর তপস্যা করে;
দীপ্ত মধুবন তপোতেজে তার।
শঙ্কা হয় দেব!
পাছে শিশু নিজ তপোবলে
লভে ইন্দ্রলোক;
অমরের ঘটে বা দুর্গতি।

ইন্দ্র। সত্য দূত! যা কহিলে তুমি!
অতি বিস্ময়ের কথা!
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু,
শৈশবেই এত তপোতেজ!
না জানি যৌবনে কত তেজস্বী হইবে।
দেব সিংহাসন নিশ্চয় লভিবে।
অঙ্কুরে নিপাত করি ভবিষ্য বিপদ।
কহ দেবগণ! কি উপায় করিব আশ্রয়?
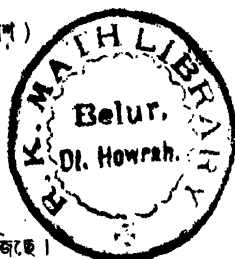
বসন্ত। কি ভয় দেবেন্দ্র!
ইন্দ্রত্ব তোমার, রতিপতি বিদ্যমানে
কে পারে লইতে তপোবলে?
ধ্রুব ত বালক—চিত্ত তার অতীব চঞ্চল;
এক ফুলবাণে ধ্যান ভঙ্গ হবে;
ইন্দ্রত্বের ভয় সামান্য বালক হোতে?

ইন্দ্র। মদন! যাও তবে
ঋতুরাজ সহ অবনীমণ্ডলে;
সঙ্গে লহ বিদ্যাধরীগণে;
সাবধানে সুরতান লয়ে
ঢালিয়ে সঙ্গীত সুধা
ভুলাবে ধ্রুবের মন;
ধ্যান ভঙ্গ হয় যেন ত্বরা।

মদন। যথা আজ্ঞা সুরনাথ!
যাই মধুবনে, সঙ্গে লয়ে বসন্ত-সখারে;
পঞ্চ ফুলবাণ যুড়িব কার্ম্মুকে,
অপ্সরীগণের মোহিনী সঙ্গীতে
বালকের চিত্ত হইবে মোহিত
বসন্ত, মদন, নারী—
তিন শক্তি হলে সংযোজিত
চঞ্চল বালক চিত্ত হারাবে সংযম;
ধ্যান ভঙ্গ হইবে অচিরে।

(বসন্তের সহিত প্রস্থান)

অপ্সরা। নীল আকাশে, ধীর বাতাসে, চললো সই ভেসে ভেসে।
নীরদ কোলে, শরীর ঢেলে, ঘুমাতে ঘুমাতে ধ্রুবপাশে॥
তারকা হীরকে গাঁথিয়ে মালা,
নিতম্বে রাখি বিজলী মেখলা,
শ্যাম ধনু বাসে আবরি তনু, ভুলাব ধ্রুবে মোহন বেশে॥

(গাইতে গাইতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

(তপস্বিনীর স্কন্ধে হস্ত দিয়া আলু থালু বেশে
সুনীতির প্রবেশ।)

সুনী। কত কানন ঢুঁড়িনু সই, হারান মণি মিলল কই ?

তপ। নিতি নিতি শোক গীতি, নাহি গাও রোই রোই।
নয়ননীরে, পাবেনা ফিরে, ডাক কাতরে মাধবে নিয়তই ॥

সুনী। কোথা শ্রীমধুসূদন, ফিরে দাও ধ্রুব ধন,
ধরিতে পারি না প্রাণ ধ্রুব বই।

তপ। ভয় কি প্রহরী আছে, সে যে ফিরে কাছে কাছে,
সই বল মাভৈঃ মাভৈঃ ॥

সুনী। ধ্রুবের খেলনা, ফুলের গহনা, যায় গড়াগড়ি খেলুনি নাই।
(আহা) বাছার চরণ রেখা,
মাটীতে রোয়েছে আঁকা,
ধ্রুবের নাহিক দেখা, ধ্রুব এ জগতে নাই,
শূন্য কুটীরে যাবনা ফিরে, যেতে বোলনা বোলনা সই,
জলে কি অনলে দিব প্রাণ ফেলে,
ধোরোনা আমারে বনে ফিরে যাই ॥

তপ। সখি ! আত্মহত্যা মহাপাপ।
হেন বাক্য না আনিও মুখে।
ধ্রুবে তবে পাইবে অচিরে।
ঐ শুন দূরে বীণার ঝঙ্কার ;
হরিনামস্রোত বাতাসে বহিয়া আসে।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। (মন) জপ জপ সেই মধুর নাম।
জ্ঞানে প্রাণে যাহে অনন্ত আরাম ॥
কভু জ্ঞানে, কভু গানে,
কভু যোগাসনে, ধ্যানে,
কভু বা বীণার তানে, বল হরিনাম অবিরাম ॥

মা সুনীতি !
সম্বর রোদন চারুশীলে !
ধ্রুব তব আছে গো জীবিত ;
ধ্রুব হেতু না কর বিলাপ।

সুনী। প্রভো ! ধ্রুব জীবিত ?
কোথা আছে ? বাছা আছে বা কেমন ?

নারদ। মধুবনে মগ্ন তপস্যায়।

সুনী। শিশু কি জানিবে দেব তপস্যার ক্রিয়া ?

নারদ। শিখায়েছি আমি তারে।
অলৌকিক শিশু তব ;
বড় ভাগ্যবতী তুমি
হেন হরিভক্ত শিশু ধোরেছ জঠরে।
সার্থক জীবন তব।
কিছু ভয় নাই জীবনে তাহার,
স্বয়ং শ্রীহরি ফিরে তার পাশে পাশে।
ইন্দ্রাদি দেবতা, শঙ্কিত স্তম্ভিত,
তপোতেজে তার।
পুণ্যবান শিশু—
পুণ্যবতী তুমি জননী তাহার।

সুনী। দেবর্ষি ! বড় সাধ মনে,
বারেক দেখিতে ধ্রুবে।
ধরি ও চরণে,
ধ্রুব পাশে দুঃখিনীরে লয়ে চল প্রভো !

নারদ। পতিব্রতে !
ধ্রুব দরশন এবে হবে না তোমার—
কিন্তু হইবে অচিরে।
তপঃ পূর্ণ হয়নি তাহার,—
ধ্রুব পাশে যেও না এখন,
যাইলে তপস্যা ভঙ্গ হইবে তাহার ;—
সেই হেতু নিবারি তোমায়।

মা! এস মম সনে,
লয়ে যাই তব স্বামীর নিকটে,
বনবাসে আর হবে না থাকিতে।

স্থনী। প্রভো! স্বামীর আদেশে,
নির্ব্বাসিতা আমি;
ইচ্ছা আছে,— স্বামীর আদেশে পুনঃ,
ফিরে যাব নিকটে তাঁহার।
স্বেচ্ছায় স্বামীর আজ্ঞা নারিব লঙ্ঘিতে।

নার। সাধ্বী, পতিব্রতা তুমি!
পূর্ণ হোক বাসনা তোমার;
স্বামীরে তোমার কহিব এখনি,
লইয়া যাইতে তোমা বনবাস হতে।

(প্রস্থান)

স্থনী। ভগ্নি! দেবর্ষি আশ্বাসে,
আশ্বস্ত হইল প্রাণ;
কথঞ্চিৎ শান্তি পাইনু হৃদয়ে।

তপ। চল ভগ্নি, গৃহে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মধুবন।

(ধ্রুব তপস্যায় নিমগ্ন—দূরে বসন্ত ও মদনের প্রবেশ।)

বসন্ত। সখে মদন! এই সেই মধুবন।

মদন। হের—ঐ অচল শিখরে বিরাজিছে শিশু;
হের—যোড় করে মগ্ন তপস্যায়,
নিমীলিত আঁখি;
হেন তপোতেজ কভু দেখি নাই;
মলিন তপন জ্যোতিঃ তাপসের তেজে।
সখে! বড় শঙ্কা হয় মনে,

সন্নিকটে যাইতে উহার ;
শঙ্করের কথা পড়ে মনে।
সেই তেজ—সেই মহাজ্যোতিঃ
ডরি—পাছে পুনঃ ভস্ম হই।

বসন্ত। কিবা ভয় সখা !
আমার আদেশে, প্রকৃতি এখনি,
নবসাজ করিবে ধারণ ;
কার্য্য তব করহ পালন।
পিনহ প্রকৃতি শ্যামল বসন,
কিশলয় সাজ কর গো ধারণ,
মুঞ্জর মুঞ্জর মাধবী মুঞ্জরী,
আলিঙ্গ তমালে গলে গলে ধরি ;
ফোট্‌রে কুসুম জুড়িয়া কানন,
ছোট্‌রে ভ্রমর করিয়া গুঞ্জন,
ধীরি ধীরি বহ মলয় পবন,
কুসুম সৌরভ কর বিতরণ।
গাওরে পঞ্চমে কোকিল দম্পতি,
ভুলাও ঝঙ্কারে তাপসের মতি,
দিনু আজ্ঞা ত্বরা পাল অনুমতি।

মদন। কই ঋতুরাজ !
তরু না মুঞ্জরে, নাহি ফোটে ফুল
ভৃঙ্গ না গুঞ্জরে, নাহি গায় পিককুল
হে বসন্ত ! তব আজ্ঞা হইল লঙ্ঘন,
হের -যেমন তেমনি রহিল কানন।

বসন্ত। সখে ! বিস্মিত হইনু আমি ;
ব্যর্থ হোল শকতি আমার ;
হেন জ্ঞান হয়—
আমাপেক্ষা মহাশক্তি নিবসে কাননে।
সখে ! ধ্যান ভঙ্গ কর তুমি,
যুড় বাণ ফুলের কার্ম্মুকে।

মদন। সখে! এই ত যুড়িনু বাণ,
এড়ি এই বার—
সখে! কাঁপিছে চরণ, কাঁপে বাহুদ্বয়,
কাঁপিছে হৃদয়;
নাহি বুঝি কারণ ইহার।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

বসন্ত। ঐ শুন সখা! মধুর সঙ্গীতধ্বনি,
আসিতেছে বিদ্যাধরীগণ;
উত্তম সুযোগ এই।
বাঁধ বুক নাহি ভয়,
দৃঢ় হস্তে ধর ধনু,
স্থির চিত্তে স্থির নেত্রে,
লক্ষ্যস্থলে কর শরক্ষেপ।

(গাইতে গাইতে অপ্সরীগণের প্রবেশ ও গীতান্তে প্রস্থান)

মদন। এই ফুলশর করিনু নিক্ষেপ। (বাণক্ষেপ)
হের—শর অর্দ্ধ পথে জ্বলিয়া উঠিল,
ভস্মীভূত হোয়ে শূন্যে মিশাইল;
পূর্ণ মহা তপোতেজে শিশু,
অঙ্গে মম লাগিছে উত্তাপ।
চল সখে! ফিরে যাই ইন্দ্রের সমীপে,
নাহি প্রয়োজন ধ্যান ভঙ্গে আর।

বসন্ত। সখে! গাত্র দাহ হইছে আমার,
আর না তিষ্ঠিতে পারি, কানন ভিতর।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

প্রাণের কথা।

মানুষ কি চায়? কি লাভ করিবার জন্য মানুষ দিবারাত্র নানাবিধ চেষ্টা করিতেছে? বিপুল জনমানবময় নগরের এত উল্লাস উৎসব, এত অবিরাম

কর্ম্মচেষ্টা কিসের জন্য? এ কি অলক্ষ্যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে গতি অথবা ইহার পশ্চাতে কোন গূঢ় অর্থ আছে? যদি থাকে, মানুষ কি তাহা জানে?

যে এই কর্ম্মস্রোতে পতিত নহে, সেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কিন্তু এ জগতের মধ্যে এমন কে আছে যে, এই কর্ম্মস্রোতে পতিত নহে?

ভোগবাসনা অহরহ প্রাণকে উত্তেজিত করিতেছে। যশঃস্পৃহা দিবানিশি আমাদিগকে মাতাইয়া কায করাইতেছে। ইহার ভিতর স্থির হইবার অবকাশ কই? তবু ইহারই ভিতর খানিকক্ষণ মনকে একটু স্থির করি, এস দেখি।

একটী কথা বেশ বুঝিতে পারি, আমাদের এ অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা নহে। আমরা একটা না একটা উত্তেজনা না লইয়া থাকিতে পারি না। তাহাতে বেশ প্রমাণ হয় যে, আমাদের স্বরূপের বিশেষ বিকৃতি, বিশেষ গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারি না কেন? একটা কিছু 'আমার' সদাই প্রয়োজন হয়।

'আমার' বুদ্ধি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ শান্তিলাভের চেষ্টা বৃথা। কারণ, যাহাকে বা যে বস্তুকে 'আমার' বলিয়া বোধ হয়, তাহাকেই আপনার ভিতর টানিয়া লইতে, আপনার সঙ্গে এক করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাহিরের কোন বস্তু, বাহিরের কোন ব্যক্তিকে আপনার সহিত মিশাইয়া ফেলা যায় না। সাংসারিক প্রেম যতই প্রগাঢ় হউক, তাহারও ভিতর লঘুতা ও অসারতা স্পষ্ট বিরাজিত। এক করিতে প্রবল চেষ্টার সফলতা হয় না। সকলেই প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতিক্ষণে আপনার আপনার জীবনের ঘটনা লইয়া আলোচনা করিলে এই ব্যাপার বুঝিবেন। যাহা আমা হইতে পৃথক্, তাহার যেমন পূর্ণ ভোগ হয় না, তেমনি সদাই তাহা হারাইবার ভয়—হারাইলে মহা যন্ত্রণা। থাকিলেও স্বস্তি নাই, না থাকিলেও অস্বস্তি। সংসারের এই অদ্ভুত রহস্যকেই শাস্ত্রকারেরা ও জ্ঞানীরা মায়া বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক, এ কি প্রহেলিকা! হে ভগবন্, কবে এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে? কবে 'আমি'র দিকে লক্ষ্য পড়িবে?

অতি রহস্যের বিষয় এই যে, আমরা যাহা নিত্যপ্রাপ্ত, নিত্য উপভুক্ত, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বাহিরে সুখের চেষ্টায় ধাবমান। বুঝিয়াও বুঝি না, জানিয়াও জানি না।

এই জন্য, আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য স্থলে পঁহুছিতে হইলে বিপরীত গতি অবলম্বন করিতে হয়, উজান বাহিয়া যাইতে হয়। উপনিষদে আছে, কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্—কোন ধীর ব্যক্তি মুক্তিলাভের

ইচ্ছা করিয়া চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের দিক্ হইতে ফিরাইয়া আত্মাকে দর্শন করিলেন। এই জন্যই শাস্ত্রে বৈরাগ্যের উপদেশ। বৈরাগ্য কেমন? যেমন নদীতে উজান বাহিয়া যাওয়া। যে সংস্কারের উপর সংস্কারের বন্ধন পড়িয়াছে, তাহাদিগকে একে একে মুছিয়া ফেলিতে হইবে, তবেই আত্মা আপন স্বপ্রকাশ মহিমায় প্রকাশ পাইবেন। উপনিষদ্ বলিতেছেন, এই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় অতি দুর্গম। কিন্তু নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই। শ্রুতি অভয়বাণী ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন, হে অমৃতের পুত্রগণ, শ্রবণ কর, আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—সেই হিরণ্ময়, অজ, অবিনাশী, অব্যয়, জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দময়, অভয় পুরুষকে জানিয়াছি, তিনি এই সংসারান্ধকারের পরপারে অবস্থিত। তাঁহাকে জানিলে আর জন্মমৃত্যুচক্রে ঘুরিতে হয় না। বেদ বলিতেছেন, তত্ত্বমসি—তুমিই সেই, তোমার ভয় কি? তোমার নিরাশ হবার ত কোন কারণ দেখিতেছি না। এই শ্রুতির পদানুসরণ করিয়া ভক্তগণ বলিতেছেন, 'যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা, জাননারে মন, আমি পুত্র তাঁর' 'দূর হয়ে যা যমের ভটা, আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা।' ভয় কি? ভগবান্ বলিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ, নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে'—হে পার্থ, তুমি ক্লীবত্ব ভাব ত্যাগ কর, ইহা ত তোমায় সাজে না। তুমি অনন্তশক্তিধর, তোমাতে এই সকল সংসারের ম্লানভাব ত সাজে না। দূর পথে যাইতে হইবে বলিয়া ভয় পাইও না। তিনি 'দূরাৎ সুদূরে' আবার 'ইহান্তিকে চ'—অতি নিকট তোমার তিনি।

তিনটী মতের কথা প্রধানতঃ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ। এই তিনটী যেন সেই চরম লক্ষ্যে উঠিবার তিনটী সোপানস্বরূপ। দ্বৈতবাদে ভগবান হইতে আপনাকে পৃথক্ বোধ করিতে বলে। কিন্তু দ্বৈতবাদের গূঢ়মর্ম্ম এই তাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ স্থাপন কর। প্রথমে তাঁহার দাস হও। সেই দাস ভক্ত শ্রীহনূমানের কথা স্মরণ কর। 'মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠং' যিনি মনের ন্যায় দ্রুতগামী, যাঁহার বল পবনতুল্য, যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি বুদ্ধিমানের শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রীরামদূত, সেই ভক্তবীর হনূমানকে হৃদয়ে একবার ধারণ কর। যখন জানকী তাঁহাকে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে মুক্তামালা প্রদান করেন, তখন তিনি দন্ত দ্বারা তাহা কাটিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণদেব উপহাস করিয়া 'বানরের গলায় মুক্তার মালা' বলিয়াছিলেন। তাহাতে হনূমান কিছুমাত্র

বিচলিত না হইয়া উত্তর করেন, আমি দেখিতেছি, ইহার মধ্যে আমার সীতা-রাম আছেন কি না? তখন লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসিলেন, আচ্ছা, তবে তোমার দেহের মধ্যেও ত সীতারাম নাই, তবে দেহকে খণ্ড খণ্ড কর না কেন, এই কথা বলাতে সেই ভক্তবীর নিজ বক্ষ বিদারণ করিয়া তাহার মধ্যে সীতারাম প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। যখন তিনি রাবণ গৃহে রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন করিবার জন্য গিয়াছিলেন, তখন রাবণজায়া মন্দোদরী তাঁহাকে কদলীর প্রলোভন দেখাইয়া ঐ বাণ হরণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন। তাহাতে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মত অপূর্ব্ব কথা আর কেহ কখন শুনিয়াছেন বা শুনিবেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বলিলেন, 'আমার কি ফলের অভাব, তোরা এলি বিফল ফল যে লয়ে, আমি পেয়েছি যে ফল, জনম সফল শ্রীরামকল্পতরু রোপিছি হৃদয়ে। আমি শ্রীরামকল্পতরুমূলে রই, যখন যে ফল বাঞ্ছা করি, সে ফল প্রাপ্ত হই, ফলের কথা কই, সে ফল প্রার্থী নই, আমি যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে।' যাঁহারা দ্বৈতবাদী, তাঁহারা এই হনুমানের আদর্শ সর্ব্বদা চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া দেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। এই হনুমান একেবারে দ্বেষভাববিবর্জ্জিত ছিলেন, অথচ তাঁহার অতিশয় ইষ্টনিষ্ঠা ছিল। তাঁহার সেই কথা এখনও সকলের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়, 'শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি, তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমল-লোচনঃ।'

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম বাস্তবিক পক্ষে এক হইলেও কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব। আবার গোঁড়া দ্বৈতবাদিগণের মত তাঁহার অদ্বৈতবাদে ঘৃণা ছিল না। কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে কি চক্ষে দেখিয়া থাক? তাহাতে তিনি উত্তর করেন, আমি যখন শ্রীরামচন্দ্র হইতে আপনাকে পৃথক্ বোধ করি, তখন আমি তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকি; যখন আপনাকে জীববুদ্ধি করি, তখন আমি তাঁহার অংশস্বরূপ আর যখন আমার দেহবুদ্ধি থাকে না, তখন আমি ও রামচন্দ্র পৃথক্, এ বুদ্ধি আর থাকে না। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ভক্ত হইলেও তিনি একঘেয়ে ছিলেন না; তিনি দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিন ভাবেই বিচরণ করিতেন। ভক্তরাজ প্রহ্লাদও দ্বৈতবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অদ্বৈতবাদকে ঘৃণা করিতেন না। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশিপু বুকে পাষাণ দিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করেন, তখন তিনি ভগবানের স্তব করিতে করিতে ক্রমশঃ

এমন তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন যে, আপনাকে ভগবান বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এমন কি, যাঁহাদের প্রেম জগতে আদর্শস্থানীয়, সেই মহাভাগা গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তাঁহার চিন্তা করিতে করিতে পরিশেষে আপনাদিগকে তন্ময় বোধ করিয়াছিলেন।

ভক্তিসাধনের জন্য যে শান্তদাস্যাদি পঞ্চভাবের কথা শুনা যায়, তাহাও একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় ঐ ভাবগুলি যেন ভক্তজীবনের ক্রমোন্নতি দেখাইতেছে। শান্তভাব—যখন ভগবান আছেন এবং তাঁহাকে উপাসনা করা উচিত, এই বোধে উপাসনা হয়, তাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ স্থাপন হয় না, সেই ভাবকে শান্তভাব বলে। এই ভাবে ভগবান ও আমি সম্পূর্ণ পৃথক্। ক্রমশঃ দাস্যভাবের বিকাশ হয়, মনে হয়, যিনি রাজরাজেশ্বর, আমি তাঁর দাস, আমি এ ক্ষুদ্র সংসারের দাস নই; আমি কামক্রোধাদিরিপুর দাস নই, আমি মনের দাস নই। আমি তাঁর চাকর, তাঁর সেবায়ই আমি প্রাণপাত করিব। এই দাস্যভাবে আবার প্রভুর নিকট যে কোন মাহিনা পাইব, তাহা নহে, ধনমান যশের জন্য তাঁহার সেবা করিব না—আমি তাঁহার প্রসাদভিখারী; কেবল একবার তাঁহার কৃপাকটাক্ষপাত হইলেই আমি চরিতার্থ হইয়া যাই। এইটুকু বলা আবশ্যক, দাস বলিতে আমরা যে সকল হীনভাব বুঝি, এই দাস্যভাবের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। যে ভগবানের দাস, সে ভগবান ব্যতীত আর সংসারের অপর কোন বস্তুর দাসত্বস্বীকার করে না। তাহার অতুল তেজ, অতুল সাহস—সুতরাং এই দাসত্ব বন্ধনের কারণ নহে, ইহা মুক্তিরই সোপানমাত্র। তাঁহাকে পিতা অথবা মাতা বলিয়া চিন্তা করা এই দাস্যভাবেরই বিকাশস্বরূপ। সন্তানের একমাত্র কার্য্য, পিতা-মাতার সেবা; কিন্তু দাসের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য এই, তাঁহার সহিত তাঁহার পিতা বা মাতার ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। 'যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা, জাননারে মন আমি পুত্র তাঁর, আমি সামান্য ত নই, রাজপুত্র হই, পিতৃদত্ত ধনে আমার পূর্ণ অধিকার।' দাসের সহিত তাঁহার যে সম্পর্ক, পুত্রকন্যার সহিত তাঁহার সম্পর্ক তদপেক্ষা গুরুতর। পুত্র শুধু ভিখারী নহে, পুত্রের অধিকার আছে, পুত্রের জোর আছে। তবে আবার এমন পুত্রও আছেন, যিনি কোন অধিকারও চান না; তিনি পিতামাতার সেবা করিয়াই তৃপ্ত—তিনি নিষ্কাম। আবার পিতা অপেক্ষা মাতা মধুর আস্বাদ

ঘনিষ্ঠতর। পিতার নিকট সন্তান যতটা দূর দূর বোধ করে, মায়ের নিকট তত নহে। মার কাছে আবদার চলে—মায়ের সঙ্গে যে নাড়ীর টান। সেই মায়ের বরপুত্র ভক্তবর শ্রীরামপ্রসাদের কথা স্মরণ কর। মায়ের কাছে তাঁর কি সরল প্রার্থনা—কি আবদার—কি তাঁহার উল্লাস—কি অকপট উৎসাহ। তার পর সখ্যভাব। এইখানে ঘনিষ্ঠতা আরও ঘনীভূত। সখা সখার নিকট প্রাণের উচ্ছ্বাস অকপট ভাবে বিবৃত করেন, তাঁহাদের মাঝখানে ব্যবধান খুব কম। সেই ভক্তবীর শ্রীকৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের কথা স্মরণ কর। সখার নিকট আর তুমি কি চাহিবে? তোমার সখা ও তুমি ত এক। কেবল সখার সঙ্গে আনন্দ কর—এক প্রাণ অভিন্নহৃদয় হইয়া থাক। বাৎসল্যভাবে ভগবানকে কিরূপে চিন্তা করা যায়, তা বুঝা একটু কঠিন। অতি উচ্চসাধক না হইলে এ মর্ম্ম কাহারও নিকট বোধগম্য নহে। সন্তানের নিকট পিতামাতা কি কিছু চায়? না, পিতামাতা সর্ব্বস্ব সেই সন্তানকে দিয়া কেবল তাহাকে ভালবাসিয়া, তাহাকে দেখিয়া, তাহাকে আদর করিয়াই তৃপ্ত। এখানে আর 'হে ভগবান, তুমি দাও', এ ভাব নাই—নাও, নাও, তুমি আমার সব নাও—আমি তোমায় কেবল দেখি। মধুরভাবের কথা আর কি বলিব? ইহা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ভাব তাঁহাকে স্বামী বলিয়া ভাবা। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিকা রাজমহিষী সেই মীরাবাইয়ের নিজ স্বামীর প্রতি একটী উক্তি উদ্ধৃত করিলেই ইহার মধুরভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মেরো গিরিধর গোপাল দুসরা না কোই।
সন্তন সঙ্গ বৈঠি বৈঠি লোকলাজ খোই।
অব ত বাত ফয়েল গোয়ি যো হোনি হো সো হোই॥
আঁখিয়ন জল সিঁচ সিঁচ প্রেমবেল বোই।
দধিমথ ঘৃত কাঢ় লীন ছাচ পিবে কোই।
যাকো শিখ ময়ূরমুকুট মীরাপতি সোই॥

(হে রাজা)

আমার স্বামী গিরিধারী গোপাল, দ্বিতীয় আর কেহ নাই। সাধুদের সঙ্গে বসিয়া বসিয়া আমি লোকলজ্জা খোয়াইয়াছি। এখন এই বাক্য চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। চক্ষের জল সেচন করিয়া করিয়া প্রেমের নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে দধি মন্থন করিয়া ঘৃত তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, ঘোলটা আর কে খাইবে?

(অর্থাৎ মনপ্রাণ আমার সব ভগবানে তদ্গত হইয়া রহিয়াছে। দেহটা লইয়া আপনি কি করিবেন?) হে রাজা, যাঁহার শিরে ময়ূরমুকুট বিরাজিত, তিনিই মীরার পতি।

ইহা হইতে যে উচ্চতর ভাব, শ্রীমতী রাধিকার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভাব, তাহা সেই অভেদ ভাবের এত নিকটবর্ত্তী যে, তথায় আর পাপপুণ্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, সুখ দুঃখ নাই—সে পরম অনুরাগ আমি কিরূপে বর্ণনা করি? সেখানে মানুষ উন্মাদ হয়, সংসারের সব বন্ধন আপনি খসিয়া যায়—ঘৃণা লজ্জা ভয় কিছু থাকে না। সে পরমানন্দ সম্ভোগে লীন হইয়া আর কোন দিকে লক্ষ্য করিতে পারে না। তখন সে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, একেবারে সমাধিস্থ। তার পর যাহা হয়, তাহা যাহার হইয়াছে, সেই জানে। তখন

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর।
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর;
ধীরে ধীরে ছায়া দল, মহালয়ে মিশাইল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা নিরন্তর।
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্যে মিশাইল,
অবাঙ্মনসোগোচর, বোঝে প্রাণ বোঝে যার।

এইরূপ হইয়া যায়।

আমরা আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবর লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকি। একটুকু সাধন ভজন করিলাম না—অথচ নানা মতমতান্তরের কথা লইয়া তর্কজালবিস্তার করিয়া দ্বেষাদ্বেষীর তরঙ্গ তুলিয়া থাকি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সামঞ্জস্যকারী জীবনের দিকে একবার লক্ষ্য করি আইস। তাঁহার 'সব সত্য' এই মূলমন্ত্র সঙ্গে লইয়া সমুদয় শাস্ত্রসাগর আলোড়ন করিলে তাহার মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব। এই যে ষড়্দর্শনেরই আপাত প্রতীয়মান মতভেদ, তাহাও এই সামঞ্জস্যবাদের নিকটে একেবারে অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। ন্যায় বৈশেষিক ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্র বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। সাংখ্য তাঁহার অপূর্ব্ব দ্বৈতবাদে জগৎকে বিস্মিত করিয়া জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে পুরুষ প্রকৃতির লীলা দেখাইলেন। বেদান্ত তাহাকে এক তত্ত্বে পর্য্যবসিত করিলেন।

বেদান্তের ভিতরও পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ রহিয়াছে। পরিণামবাদী বলিলেন, যেমন দুগ্ধ হইতে দধি হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ হইয়াছে, অতএব জগৎ ব্রহ্মের বিকার। বিবর্ত্তবাদী ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া বলিলেন, তিনি জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান বিবর্ত্তকারণ। তিনিই জগতের নিমিত্ত কারণ, তিনিই আবার উপাদান কারণ।—তিনিই এই জগৎ। যেমন রজ্জু দেখিয়া সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হইতেছে, বাস্তবিক তিনি ব্রহ্মই আছেন—আমরা তাঁহাকে দেখিতেছি না মাত্র। যখন আমি কোন পদার্থ দেখিতেছি, শুনিতেছি বা স্পর্শ করিতেছি, তাহাতে ব্রহ্মেরই অনুভূতি হইতেছে। আমি কেবল জানি না মাত্র। একবার যদি জানিতে পারি, তবে বুঝিব, তিনি আমা হইতে দূরে নহেন, তখন সমুদয় নরনারীর উপর প্রবলা ভক্তি হইবে—সকলকে দেখিলেই প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইবে—তখন ব্যাঘ্রকেও হরি বলিয়া আলিঙ্গন করা সম্ভব হইবে। তখন আনন্দে বলিতে পারিব, ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী, ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ—তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ—তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী, তুমিই বৃদ্ধ—দণ্ডে ভর দিয়া বেড়াইতেছ; হে প্রভু, তুমি সমুদয় জগতে জন্মাইয়াছ—তুমি সব, তোমাকে বারবার প্রণাম—নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্বঃ—তোমার সম্মুখে নমস্কার, তোমার পশ্চাতে নমস্কার, তোমার চতুর্দ্দিকে নমস্কার। তখনই শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি উভয়ই লাভ হয়। তখনই মানুষের অনাদি মায়াবন্ধন একেবারে কাটিয়া যায়।

জগৎকে—সংসারকে সম্ভোগ করিতে আমরা বড় ভালবাসি। এ কথা ভাবি না, সম্ভোগ কত প্রকারের হইতে পারে। একটী সুন্দর ফুল বাগানে ফুটিয়াছে, চারিদিকে সৌন্দর্য্য ও সুবাস বিতরণ করিতেছে। ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি তাহাকে শত শতবার দেখিতেছে, শত শত বার তাহার আঘ্রাণ লইতেছে; শেষে হয়ত তাহার সম্ভোগের জন্য গৃহে ফুলটী লইয়া গেল। আহা! তাহাকে যে গাছ হইতে ছিঁড়িলে তাহার বেদনা হইবে, তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে, এ কথা কি সে একবারও ভাবিল? আবার কেহ আছেন, যিনি উহাকে একবার মাত্র দেখিয়াই তাহার পশ্চাতে যে অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি রহিয়াছে, ঐ ফুলটী যাহার একটী ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম প্রকাশমাত্র, তাহাতে ডুবিয়া গেলেন। শত শত উদাহরণ কল্পনা করিয়া লউন, দেখিবেন,

ইন্দ্রিয় হইতে যে সুখ লব্ধ হয়, তাহা অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ উচ্চতর সুখ রহিয়াছে। হে মানব, তুমি অসহিষ্ণু, তাই পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিতে ধাবমান হও, একটু সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর দেখি, দেখিবে, জগতে কি সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়। কেবল দোকানদারী, কেবল দোকানদারী! এ ভাব ধীরে ধীরে তাড়াইতে হইবে। শুন নাই কি যে, দেবতারা কিছু ভোগ করেন না, ভোগ্যবস্তু দেখিয়াই তাঁহাদের পরম তৃপ্তি হয়?

ভোগেরও একটী উদ্দেশ্য আছে। আমরা তাহা বুঝি না। নিত্যশুদ্ধ আত্মা যেন কি এক কুহকবশে প্রকৃতির অধীনে পড়িলেন। তার পর তাঁর চেষ্টা কেবল নিজের সেই স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য। প্রকৃতি প্রথমে মানুষকে একেবারে ডুবাইয়া ভুলাইয়া রাখিতে চাহে। নিদ্রা, তন্দ্রা, প্রমাদ, আলস্যে অভিভূত করিয়া নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখে, তার পর একটু একটু করিয়া মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতে থাকে। তখন মনে হয়, কিছু করি। কিছু করিতে গিয়া প্রথম আত্মসুখের চেষ্টা। এই আত্মসুখের চেষ্টা যেন আত্মার একটু তন্দ্রা ভাঙ্গা মাত্র। সে সর্ব্বদাই অনুভব করিতে চায়, আমি আছি—আমি কিছু করিতে পারি। তাহারই ফলে, প্রথম সেই সকল কর্ম্ম আরম্ভ করে, যাহাকে লচরাচর গর্হিত কর্ম্ম বলে। বাস্তবিক পাপপুণ্যের একটা নির্দ্দিষ্ট কোন মাপ কাটি নাই। পাপও আপেক্ষিক, পুণ্যও আপেক্ষিক। যে দিবারাত্র কেবল ঘুমাইয়া কাটায়, তদপেক্ষা যে দিবারাত্র অসৎ কর্ম্ম করিতেছে,সে অধিক পুণ্যবান অর্থাৎ উন্নত বলিয়া আমার ধারণা। ক্রমশঃ যখন বুঝিতে পারা যায়, সুখ আমাদের লক্ষ্য নহে, আত্মার স্বরূপ প্রকাশই লক্ষ্য, তখনই যাহাকে আমরা সৎকর্ম্ম বলি, তাহার সূত্রপাত হয়। সৎকর্ম্মের সার পরোপকার। পরোপকারে আপনার আপাত স্বার্থে অনেক সময় ব্যাঘাত পড়ে—কিন্তু তাহাতে আত্মপ্রকাশে সাহায্য হয় বলিয়া, আপনাকে অনন্ত ভাবিবার একটু সুবিধা হয় বলিয়া, তাহাতে পরম আত্মপ্রসাদ হয়। ক্রমশঃ সে দেখিতে থাকে, পরোপকার যথার্থ করিতে গেলে প্রথমে অহংকে একেবারে নাশ করিয়া ফেলিতে হয়, দেখিতে থাকে, বাহ্য কর্ম্মাপেক্ষা মানসিক কর্ম্মের শক্তি বেশী। বাহ্য কর্ম্মও মানসিক কর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। তখন তাহার কর্ম্মের ভাব ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইতে থাকে।

জড়ভাবপ্রধান আধুনিকগণ কর্ম্মের অতিশয় প্রাধান্য দিয়া থাকে। দেখ

কাল পাত্র ধরিতে গেলে আজকাল সমুদয়ই তমোভাবে পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং এখন কর্ম্মের দিকে ঝোঁক দেওয়া বিশেষ আবশ্যক, তাহার সন্দেহ কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্ম সুখ আয়োজনেই যখন যথেষ্ট আত্মপ্রকাশের সহায়তা হয়, তখন বাস্তবিক নিষ্কাম কর্ম্মের চেষ্টায় যে যথেষ্ট আত্মপ্রকাশের সহায়তা হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু দোষের বিষয় এইটুকু যে, কর্ম্মের প্রাধান্য দিতে গিয়া উহা যেন প্রকৃত চিন্তা, ভাব ও ধ্যানের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়া না বসে। মূল লক্ষ্য কখনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। কর্ম্ম কখন আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না।

অনেক স্থলেই এরূপ হয়, একটী প্রকৃত ভাল ভাবের ঘোর বিকৃতি জন্মাইল। স্বাভাবিক নিয়মে তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটিল। এই প্রতিক্রিয়াযুগে যেমন একটী মহা মঙ্গল হয়, অর্থাৎ তাহাতে অকপটতা আনিয়া মানুষের হৃদয় অধিকার করে, তেমনি একটী ঘোরতর অনিষ্ট এই হয় যে, আক্রমণ শুধু বিকারটীর উপর না হইয়া যে মহান্ ভাবের, মহান্ আদর্শের উহা বিকার, তাহারই উপর আক্রমণ হইয়া থাকে। এই কারণে আমাদিগকে সর্ব্ববিধ উন্নতির পথে এই দুইটী বিঘ্নকে সর্ব্বদা দূর করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথম কপটতা, দ্বিতীয়, উচ্চ আদর্শ লোপের প্রবল চেষ্টা। একটী সামান্য উদাহরণ দিই। লোকের সঙ্গে অন্তরের সহিত শিষ্টাচার করা উচিত, ইহা অবশ্য একটী উচ্চ আদর্শ; কিন্তু অনেক সময়েই এই শিষ্টাচার একটা লঘু লৌকিকতায় পরিণত হয়। সত্যপরায়ণতা বলে, এরূপ অসার কপটাচরণ করিও না। আমি অমনি অকপট আচরণ আরম্ভ করিলাম। আমার হৃদয়ের ভিতর যে হলাহল রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বদা উদ্গীরণ করিয়া স্পষ্টবাদী বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। অকপট হইলাম বটে, কিন্তু অপরের সহিত মধুর শিষ্টাচারের আদর্শকে একেবারে উড়াইয়া দিলাম। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিবর্গের ব্যভিচার অত্যাচারে যখন ঈশার ধর্ম্ম কলুষিত হইয়া গেল, তখন ধর্ম্মবীর সংস্কারক মার্টিন লুথারের বজ্রবাণীতে সমুদয় ইউরোপ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী লুথার—সন্ন্যাসিনী বিবাহ করিয়া ফের গৃহী সাজিলেন। অকপটতার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। যুক্তির প্রাধান্য সগর্ব্বে ঘোষিত হইল। কিন্তু লুথারপ্রণয়িনী একদিন লুথারকে বলিয়াছিলেন, প্রিয়, আমরা যখন কুসংস্কারে আবদ্ধ ছিলাম, তখন যেরূপ গভীরভাবে উপাসনা করিতাম, এখন উপাসনায়

সেরূপ গম্ভীরতা আসে না কেন? এই এক কথাতেই সব বুঝিতে পারা যাইতেছে। রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া আমরা অনেক সময় রোগীকে একেবারে মারিয়া ফেলি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মসাধনের পথ অতি কঠিন। এই সাধনের পথে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। অনেক সময় নৈরাশ্য আসিয়া পড়ে। মনে হয়, সেই আদর্শ এত দূরে, আমার মত পাপী ততদূর যাইতে পারিবে কি না। এই ভাবিয়া হয়ত হাল ছাড়িয়া দিবার উপক্রম হয়। তখন কি কর্ত্তব্য? তখন চিন্তা করিতে হইবে, তিনি ত আমার দূরে নন, তিনি যে আমার অতি নিকটে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে, শুধু তাহাই নহে, আমিই যে তিনি। এই ভাবিয়া নিরাশা তাড়াইতে হইবে। আর একটী বিঘ্ন অহঙ্কার। একটু সাধনা করিয়াই মনে হয়, আমি একটা মস্ত লোক হইয়াছি। ইহা তাড়াইবার উপায়ও নিজের স্বরূপস্মরণ। যে অনন্তস্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, তাহার একটু সামান্য কার্য্যের, সামান্য শক্তির অভিমান কিসের? এ অভিমান ত তাঁতে সাজে না। এই ভাবিয়া আপনাকে অভিমানশূন্য করিতে হইবে। তুমি যে লোকটীকে তোমা অপেক্ষা অবনত মনে করিতেছ, সে যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, সাক্ষাৎ ভগবান। তাহাকে তুমি কেন পাপী, কেন হীন মনে করিয়া নিজের উন্নতি পথের কণ্টক কর? আলস্যবশতঃ আর একটী বিঘ্ন আসে। মনে হয়, সাধন ভজন জপ পূজাদি কর্ম্ম কেন করিব? তাঁহার উপর নির্ভর করিলেই ত সব সিদ্ধি হইয়া যায়। অতএব কেন কর্ম্ম করিব? ইহা বাস্তবিক নির্ভর নহে। নির্ভর হইলে হৃদয়ে পরম শান্তির উদয় হয়। এইরূপ আলস্যপরায়ণ নির্ভরবাদীদের কি সে শান্তি থাকে? নিজের সুখের জন্য সব কায করিতেছি, কিন্তু ভগবানের জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিতে গেলেই নির্ভরের দোহাই। বাস্তবিক অহংনাশ একেবারে না হইলে নির্ভর হয় না। এই জন্য প্রথমে ঘোর ক্রিয়াকর্ম্মে নিষ্ঠাবান হইয়া পরিশেষে নৈষ্কর্ম্ম্যলাভরূপ নির্ভর অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে।

তার পর আর একটী ভাব সাধনপথের বড় বিঘ্ন হয়; ইহাকে চলিত কথায় অম্বলচাখা বলে। একনিষ্ঠতা নাই, দৃঢ়তা নাই, ভ্রান্ত উদারতার দোহাই দিয়া সব দিক্ একটু একটু করিয়া দেখিতেছি। Jack of all trades, master of none এরূপে কি ভগবান লাভ হইতে পারে? তাই বলিয়া দ্বেষভাবাপন্ন গোঁড়ারও সাধন পথে উন্নতি একেবারে অবরুদ্ধ। তাঁহার

সমুদয় শক্তি অপর ভক্তের ও অপর দেবের নিন্দাবাদে ব্যয়িত। তিনি কখন নিজের ইষ্টদেবতার চিন্তা করিবেন? এইরূপে ক্রমাগত দুই দিক্ বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। তা নয়, হয় ঘোর যুক্তিবাদী হইয়া সৎশাস্ত্র, সদ্গুরু পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিলাম—শেষে হয় ত নাস্তিকই হইয়া পড়িলাম। নয় ত অন্ধবিশ্বাসের কুহকে পড়িয়া নিজের বুদ্ধিকে একেবারে বলি দিয়া মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিলাম! হয় ঘোর বিলাসাবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম; নয়, ঘোর কঠোরতায় শরীরকে একেবারে মাটি করিয়া ফেলিলাম, এমন কি, মনকে পর্য্যন্ত নিস্তেজ করিয়া ফেলিলাম। ভক্তি মানিলাম, ত জ্ঞানকে উড়াইলাম—জ্ঞানবাদী হইলাম ত, ভক্তিকে উপহাস করিতে লাগিলাম। নিরাকারবাদী হই ত, সাকারে সর্ব্বনাশ হয়, এই কথা দিবানিশি ঘোষণা করিতে লাগিলাম; আর সাকারবাদী হই ত, নিরাকারের ধ্যান একেবারে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিলাম। দেশীয় ভাব মানিলাম ত, বিদেশীয় ভাবের উপর খড়্গহস্ত হইলাম, আবার বিদেশীয় ভাবের পক্ষপাতী হই ত, দেশীয় সমুদয় ভাবকে অবমাননা করাই জীবনের সার ব্রত জ্ঞান করিলাম।

এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ আমাদের প্রাণে আজকাল পরম শান্তি দিতেছে। এমন সর্ব্বভাবসমন্বয়কারী মহাপুরুষের শক্তি আজ সমগ্র জগতে সঞ্চারিত! তাঁহার সেই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যকারী উপদেশে ধর্ম্মজগতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। মনে হয়, তাঁহার শক্তি বীজ স্বরূপ হইয়া সমগ্র জগতের ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিভাগেই মহা যুগান্তর উপস্থিত করিবে।

ভারতীয় নারীর উন্নতি।

(স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন)

প্রবুদ্ধভারত হইতে গৃহীত।

ভারতের নারীগণের কি উপায়ে উন্নতি হইতে পারে, এই বিষয় লইয়া স্বামীজিকে প্রশ্ন করা হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন ;—

নারীজাতির আদর্শসম্বন্ধে আর্য্য ও সেমিটিকদের মতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেমিটিক জাতি স্ত্রীলোককে উপাসনার বিঘ্ন জ্ঞান করে ও তাহার

কোন প্রকার ধর্ম্মকার্য্য করিবার অধিকার নাই, কিন্তু আর্য্যগণের মতে পত্নী ব্যতীত কোন ধর্ম্মকার্য্যই হইতে পারে না।

প্র। তবে কি হিন্দুধর্ম্ম আর্য্যদিগের ধর্ম্ম নহে ?

উ। আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম অধিক পরিমাণে পৌরাণিক অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের পর উহার উৎপত্তি। দয়ানন্দ স্বামী দেখাইয়া দিয়াছেন, গার্হপত্য অগ্নিতে হোমরূপ বৈদিক কর্ম্মে পত্নীর সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন, কিন্তু আজকাল সে শালগ্রাম শিলা কিম্বা গৃহদেবতাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না, কারণ, এই সকল পূজা পৌরাণিক ধর্ম্মসঙ্গত।

প্র। তাহা হইলে আপনি আজ কাল হিন্দুগণের মধ্যে নরনারীর এত প্রভেদ, একমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে হইয়াছে বলেন ?

উ। যেখানে এই প্রভেদ বিশেষ বর্ত্তমান,সেখানে নিশ্চয়ই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে বৈ কি! কিন্তু হিন্দু নরনারীর মধ্যে যে এই প্রভেদের কথা বলিতেছ, বাস্তবিক তাহা আছে কি ? ইউরোপীয়েরা আমাদের নরনারীর মধ্যে অধিকারের বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া হিন্দুসমাজের সমালোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের মতে পূর্ণ সায় দিতে পারি না। শত শত শতাব্দী ধরিয়া নানা অবস্থাচক্রের মধ্যে পড়িয়া আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে এইরূপে রক্ষা করার আবশ্যকতা হইয়াছে। এইটী বুঝিলেই আমাদের এই সকল প্রথার রহস্য বুঝা যায়। তাহাদের কোন বিষয়ে হীনতার দরুন এ সকল প্রথার উৎপত্তি হয় নাই।

প্র। স্বামীজি, আপনি কি তবে হিন্দুসমাজের রমণীগণের বর্ত্তমান অবস্থায়ই সন্তুষ্ট ?

উ। কখনই নহে। তবে আমাদের তাহাদিগকে কেবল শিক্ষা দিবার মাত্র অধিকার আছে। তার পর তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই পূরণ করিয়া লইবে। শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আমাদের হাত দেওয়ার অধিকার নাই। জগতের অন্যান্য স্থানের নারীগণ যেমন স্বচেষ্টায় নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম, ভারতীয় নারীগণেরও সে শক্তি আছে। আমাদের আবশ্যক—কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া।

প্র। আপনি বলিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দু স্ত্রীলোকগণের অবনতি হইয়াছে। কিরূপে হইয়াছে, বুঝাইয়া দিবেন কি ?

উ। বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে কিছু অনিষ্ট হয় নাই, বৌদ্ধধর্ম্মের অব-

নতির পর হইতেই অনিষ্টের সূচনা হইতে লাগিল। সকল সম্প্রদায়েরই কোন বিশেষগুণ থাকে, যাহা দ্বারা তাহার প্রথমে খুব উন্নতি সাধিত হয়। অবনতির সময় আবার তাহাই উহার প্রধান দোষে পরিণত হয়। ভগবান বুদ্ধ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত শক্তিবলে সঙ্ঘ (বৌদ্ধ-সমাজ) গঠন করিয়া সমুদয় জগতে তাঁহার ধর্ম্মবিস্তার করিলেন। কিন্তু সেই সম্প্রদায় সন্ন্যাসিসম্প্রদায়মাত্র। তাঁহার ধর্ম্মও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছিল। এই জন্য ক্রমশঃ সন্ন্যাসীর বেশ পর্য্যন্ত সম্মানিত হইতে লাগিল। তিনি আবার সর্ব্ব-প্রথম মঠপ্রথার প্রচলন করেন। তাহা হইতেই স্ত্রীলোককে পুরুষের নিম্নাসন দিতে হইল। কারণ, বড় বড় মঠস্বামিনীরা কোন কোন বিশেষ মঠাধ্যক্ষের উপদেশ ও পরামর্শ না লইয়া কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। আপাততঃ ইহাতে অতি মনোরম ফল ফলিল। বৌদ্ধধর্ম্ম বেশ সুপ্রণালীবদ্ধ হইল। কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার ফল বিষময় হইল।

প্র। কিন্তু বেদে ত সন্ন্যাসের কথা আছে!

উ। অবশ্যই আছে, কিন্তু তথায় এ সম্বন্ধে নরনারীর কোন প্রভেদ করা হয় নাই। সকলেই সন্ন্যাস লইতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্যকে জনকরাজার সভায় গার্গী বাচক্নবী নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহার যে প্রশ্ন করিতে অধিকার নাই, এরূপ কোন কথা উত্থাপিতই হয় নাই। আর প্রাচীন আরণ্য পরিষদ্-সমূহে বালক বালিকার সমান অধিকার ছিল। সংস্কৃত নাটকগুলি পাঠ কর, শকুন্তলার উপাখ্যান পাঠ কর। টেনিসনের 'প্রিন্সেস' আমাদিগকে তাহা হইতে অধিক কি শিখাইতে পারে?

প্র। স্বামিজি, আপনি অতি আশ্চর্য্যরূপে আর্য্যজাতির প্রাচীন গৌরব আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন, দেখিতেছি।

উ। হাঁ, বোধ হয়, তাহার কারণ, আমি প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় ভূভাগই দেখিয়াছি। যে জাতি বৈদেহী সীতাকে প্রসব করিয়াছিল—(কেহ বলে, সীতা ঐতিহাসিক নহেন, কাল্পনিক, তাহা মানিয়া লইয়াও বলিতে পারি) যে জাতি এরূপ কল্পনা করিতেও সক্ষম হইয়াছিল, তাহারা নারীজাতিকে যেরূপ ভক্তি করে, পৃথিবীর কোন জাতি সেরূপ করে না। পাশ্চাত্য নারীগণের উপর যে সকল নানাপ্রকার আইনের কঠিন বন্ধন চাপান আছে, আমাদের স্ত্রীলোকদের তাহা নাই। অবশ্য আমাদের অনেক অন্যায় প্রথা আছে,

স্বীকার করি, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিরও অনেক আছে। সকল দেশেরই সামাজিক প্রথাগুলি লোকের হৃদয়ের প্রেম, স্নায়পরতা, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহের প্রকাশের দ্বারস্বরূপ, এ কথা যেন আমরা না ভুলি। পারিবারিক ধর্ম্মসম্বন্ধে আমি নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি, আমাদের ভারতীয় প্রথা অন্যান্য অনেক প্রথা হইতে শ্রেষ্ঠ।

প্র। তবে, স্বামীজি, হিন্দুনারীগণের অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে কোন সমস্যা আছে কি?

উ। অবশ্য, আমাদের নারীগণের উন্নতি সম্বন্ধীয় অনেক গুরুতর সমস্যা আছে বৈ কি। কিন্তু সকলই শিক্ষার অদ্ভুত শক্তিতে সাধিত হইতে পারে। তবে আমরা যথার্থ শিক্ষা কাহাকে বলে, এখনও বুঝিতে পারি নাই।

প্র। আপনি শিক্ষার 'লক্ষণ' কি করেন?

স্বামীজি হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন, আমি কোন বিষয়ের কখন 'লক্ষণ' করি না। তবে বলা যাইতে পারে, কতকগুলি শব্দ মুখস্থ করার নাম শিক্ষা নহে, মনোবৃত্তিগুলির বিকাশকে শিক্ষা বলা যাইতে পারে। অথবা যে ভাবে মানুষকে গঠন করিলে তাহার সৎবিষয়ে—প্রকৃত বিষয়ে ইচ্ছা হয় এবং সেই ইচ্ছা কার্য্যেও পরিণত করিতে পারে, তাহাকেই শিক্ষা বলা যায়। এরূপ শিক্ষা পাইলে ভারতে আবার সেই প্রাচীন সঙ্ঘমিত্তা, লীলা, অহল্যা-বাই, মীরাবাই প্রভৃতি নারীগণের ন্যায় নির্ভীক বীর নারীর অভ্যুদয় হইবে। তখন এমন সকল নারী জন্মাইবেন, যাঁহারা বীরপ্রসবিনী হইবেন, কারণ, তাঁহারা ভগবৎপাদপদ্ম স্পর্শবলে শুদ্ধত্ব, নিঃস্বার্থতা ও দৃঢ়তা লাভ করিবেন।

প্র। তবে আপনার মত দেখিতেছি, শিক্ষার ভিতর ধর্ম্মভাব থাকা আবশ্যক?

স্বামীজি গম্ভীরভাবে বলিলেন, আমি ধর্ম্মকে সকল শিক্ষার সার শিক্ষা মনে করি। তবে আমার অথবা অপর কাহারও ধর্ম্মমত তাহাকে শিখাইতে হইবে, তাহা নহে। যেমন অন্যান্য বিষয়ে ছাত্রের অধিকার বুঝিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, তদ্রূপ তাহার নিজের ভাবের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে সে যাহাতে উন্নতি করিতে পারে, সেই পথে তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে।

প্র। কিন্তু ধর্ম্মানুসারে ব্রহ্মচর্য্যকে শ্রেষ্ঠ করিয়া জননী ও পত্নীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং যাহারা ঐ সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করে,

তাহাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া নারীর উপর প্রবল আক্রমণ করা হইয়াছে, বলিতে হইবে।

উ। মনে রাখা উচিত, ধর্ম্মে যেমন নারীর ব্রহ্মচর্য্যকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে, পুরুষের সম্বন্ধেও তদ্রূপ করিয়াছে। আরও তোমার প্রশ্নে বোধ হইতেছে, তোমার মনেই এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ গোল রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম মতে জীবাত্মার একমাত্র কর্ত্তব্য আছে; তাহা এই, অনিত্যের মধ্যে নিত্যের অন্বেষণ। এখন জোর করিয়া কেহ বলিতে পারে না, এই পথ দিয়াই তাহা সাধন হইতে পারে, অন্য পথে পারে না। বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য্য, ভাল বা মন্দ, বিদ্যা বা মূর্খতা, যে পথ দিয়াই তুমি সেই চরম লক্ষ্যে পঁহুছিতে পার, তাহারই সার্থকতা স্বীকার করিতে হইবে। এই বিষয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ প্রভেদ। বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল বহির্জ্জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে উপদেশ দেন। তাহা মোটামুটী এক উপায়েই সাধিত হইতে পারে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম তাহা বলেন না। মহাভারতের কাকী বকী ভস্মের কথা ও ধর্ম্মব্যাধের কথা মনে করিয়া দেখ। ধর্ম্মব্যাধ এবং সেই গৃহস্থজায়া কেমন সাংসারিক কর্ত্তব্যগুলিই প্রাণপণে সাধন করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

প্র। তবে, স্বামীজি, আপনি এ দেশীয় নারীগণকে কি বলিতে চান?

উ। পুরুষকেও আমি যাহা বলি, নারীগণকেও তাহাই বলিতে চাই। বলিতে চাই, নারীগণ, তোমরা ভারতের উপর বিশ্বাসী হও, ভারতীয় ধর্ম্মে বিশ্বাসী হও। বীর হও, নৈরাশ্য একেবারে ত্যাগ কর,—নিজেদের হিন্দু ভাবিতে লজ্জিত হইও না, আর ইহাও জানিয়া রাখ, আমাদিগকে অপর জাতির নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিতে হইবে বটে, কিন্তু অপর জাতিকে আমাদের যথেষ্ট দিবার আছে ও দিতে হইবে।

ঈশোপনিষৎ।

স্থাবর জঙ্গম যাহা কর নিরীক্ষণ,
সকলে ঈশ্বরবুদ্ধি কর, হে সুজন!
পরধনে লোভ নাহি কর কদাচন;
এরূপে সর্ব্বদা কর আত্মারে রক্ষণ।

ইহাতে অশক্ত যদি—শুভ অনুষ্ঠান
নির্লিপ্ত হইয়া সদা কর হে ধীমান!
এরূপে শতেক বর্ষ দেহ কাটাইয়া,
পরহিতে নিত্যকাল মন মজাইয়া।
না করে ঈশ্বরচিন্তা কিম্বা শুভ কায,
আত্মঘাতী সেই জন—অতি হীনলাজ,
মৃত্যু পরে সে ত অন্ধতম লোকে যায়,
যথা রবিকর নাহি পশিবারে পায়।
এক, অচঞ্চল, দ্রুতগতি মন হতে,
ইন্দ্রিয় সমূহ যাঁরে না পারে ধরিতে,
স্থির তবু বেগবানে অতিক্রম করে,
তাঁর অধিষ্ঠানে বায়ু ধরায় সঞ্চরে।
চল, অচঞ্চল, দূরে অথচ নিকটে
সবার অন্তরে তবু বাহিরে প্রকটে।
আত্মাতেই সর্ব্বভূত নিরখে যে জন,
সর্ব্বভূতে আত্মা সদা করে নিরীক্ষণ,
ঘৃণা তাঁর দূরে যায় প্রাণ প্রেমময়,
অন্তরে আনন্দ তাঁর সদাই উদয়।
যে অবস্থা পেয়ে নর হয়ে জ্ঞানবান,
সর্ব্বভূতে আত্মা বলি করয়ে গেয়ান;
কোথা থাকে শোক তার সে অবস্থা পেলে?
কোথা থাকে মোহ সেই একত্ব দেখিলে?
সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অশরীর,—
বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, সুধীর—
অকায় হইলে কোথা ব্রণের সম্ভব?
স্নায়ুশিরা থাকে কিসে—নাহি অবয়ব—
মনের নিয়ন্তা যিনি উপরি সবার,
আত্মযোনি বলে নাম স্বয়ম্ভু প্রচার,
সেই ব্রহ্ম দিয়াছেন চিরকাল তরে
প্রজাদের যথাযোগ্য ভোগ্য ভাগ করে।
শুধু কর্ম্মে রত, খালি কর্ম্ম আড়ম্বর,
প্রবেশ করয়ে অন্ধতমের ভিতর।

নাহি কর্ম্ম কিন্তু করে জ্ঞান অভিমান
ঘোরতর অন্ধতমে তার অধিষ্ঠান।
করমের ফল এক জ্ঞানফল আর,
ইহা ধীর জন মুখে হয়েছে প্রচার।
উভয়ে একত্র যেবা করে অনুষ্ঠান,
মৃত্যু অতিক্রমি তার অমৃতে প্রয়াণ।
প্রকৃতির উপাসনা করে যেই জন,
অন্ধতম মাঝে হয় তাহার গমন।
প্রকৃতি ছাড়িয়া করে অজ্ঞেয় ভজন,
ঘোরতর অন্ধতমে তাহার গমন।
প্রকৃতির উপাসনে অজ্ঞেয় ভজনে—
এ দুয়ে পৃথক্ ফল, কহে সুধীগণে।
প্রকৃতিরে ঈশ্বরের প্রকাশ জানিয়া,
যে জন ভজন করে আবিষ্ট হইয়া,
জগতে ঈশ্বর যেই করে নিরীক্ষণ,
মৃত্যু অতিক্রমি তার অমৃতে গমন।
হিরণ্ময় পাত্রে তব, সত্য আবরিত,
হে সবিতঃ, মোর তরে কর প্রকাশিত।
সত্যধর্ম্মা আমি যেন দেখিতে হে পাই,
দেখিয়া তাঁহায় মোর পরাণ জুড়াই।
হে পূষণ্, হে একর্ষে, প্রাজাপত্য, যম,
হে সূর্য্য, কর হে কর রশ্মির সংযম;
কর দেব কর তব তেজ সংবরণ।
তব কৃপাবলে তব অত্যন্ত শোভন
রূপ নিরখিয়া হই বিভোর অন্তর,—
এ কি, এ কি, এ কি হেরি তোমার ভিতর!
এ পুরুষে আর মোতে নাহি কিছু ভেদ!
ঘুচে গেল এত দিনে সব দুঃখ খেদ!!
যায় দেহ—যাক উহা ভস্মসাৎ হয়ে—
প্রাণ—সর্ব্বব্যাপী বায়ু অমৃতে মিশায়ে।
ওঁ ওঁ ব্রহ্মনাম স্মর ওরে মন,—
স্মর আর ভবে যাহা করিলি সাধন।
অগ্নে, তুমি মোর সর্ব্ব কর্ম্ম অবগত,
ফলভোগ তরে মোরে দেখাও সুপথ।
কুটিল পাতক হতে করহ উদ্ধার,
করি তব পদে কোটি কোটি নমস্কার।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮॥

অন্বয়। স্বাং প্রকৃতিং অবষ্টভ্য (অহং) প্রকৃতের্বশাৎ অবশং ইমং কৃৎস্নং ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি। ৮।

মূলানুবাদ। নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া প্রকৃতির বশে অবশ সকল প্রাণিনিচয়কে আমি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি। ৮।

ভাষ্য। এবমবিদ্যালক্ষণাং প্রকৃতিং স্বীয়াং অবষ্টভ্য বশীকৃত্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ প্রকৃতিতঃ জাতং ভূতগ্রামং ভূতসমুদায়মিমং বর্ত্তমানং কৃৎস্নং সমগ্রমবশমস্বতন্ত্রং অবিদ্যাদিদোষৈঃ পরবশীকৃতং প্রকৃতের্বশাৎ স্বভাববশাৎ। ৮।

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকার অবিদ্যালক্ষণ স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত এই সকল বর্ত্তমান ভূতসমূহকে আমি সৃষ্টি করিয়া থাকি, (এই ভূতসমুদায়) প্রকৃতির বশে (অর্থাৎ) স্বভাবের বশে "অবশ" অস্বতন্ত্র। অবিদ্যাদিদোষের দ্বারাই ইহারা পরবশীকৃত। ৮।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥ ৯॥

অন্বয়। হে ধনঞ্জয় তেষু কর্ম্মসু অসক্তং উদাসীনবদ্ আসীনং মাং তানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি। ৯।

মূলানুবাদ। হে ধনঞ্জয়! সেই সকল কর্ম্মে অনাসক্ত—উদাসীনের ন্যায় আসীন আমাকে কর্ম্মসমূহ বন্ধন করিতে সমর্থ হয় না। ৯।

ভাষ্য। তর্হি তস্য তে পরমেশ্বরস্য ভূতগ্রামং বিষমং বিদধতস্তন্নিমিত্তাভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং সম্বন্ধঃ স্যাদিতীদমাহ ভগবান্ ন চ মামীশং তানি ভূতগ্রামস্য বিষমবিসর্গনিমিত্তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। তত্র কর্ম্মণামসম্বন্ধত্বে কারণমাহ উদাসীনবদাসীনং যথা উদাসীন উপেক্ষকস্তদ্বদাসীনং আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাৎঅসক্তং ফলাসঙ্গরহিতং অভিমানবর্জ্জিতমহং করোমীতি তেষু কর্ম্মসু। অতোঽন্যস্যাপি কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবঃ ফলাসঙ্গাভাবশ্চাবন্ধকারণমন্যথা কর্ম্মভির্বধ্যতে মূঢ়ঃ কোষকারবদিত্যভিপ্রায়ঃ। ৯।

ভাষ্যানুবাদ। তুমি পরমেশ্বর, নানাপ্রকার ভূতসমূহকে তুমি সৃষ্টি করিয়া

থাক, তাহাই যদি হইবে, তবে সেই প্রাণিসৃষ্টি নিমিত্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সহিত তোমার সম্বন্ধ আছে, এই প্রকার শঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, সেই প্রাণিগণের সৃষ্টিনিমিত্ত কর্ম্মনিচয় আমাকে (অর্থাৎ) ঈশ্বরকে বন্ধন করিতে পারে না, হে ধনঞ্জয়! সেই কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ না হওয়ার কারণ বলিতেছেন--"উদাসীনবৎ আসীন।" যেমন কোন উদাসীন (সকল বস্তুরই) উপেক্ষা করিয়া থাকে, আমিও সেই প্রকার উদাসীন। আত্মার অবিক্রিয় স্বভাব বশতঃ "অসক্ত" ফলাসঙ্গরহিত (অর্থাৎ) "আমি করিতেছি" এই প্রকার অভিমান আমাতে নাই (কোথায় অভিমান নাই?) সেই সেই কর্ম্মেতে। এই কারণে অন্য কোন ব্যক্তি যদি এই প্রকার কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারও কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন হয় না, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়াই মূঢ় জন্তু কোষকারের ন্যায় বদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই অভিপ্রায়। ৯।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে। ১০॥

অন্বয়। প্রকৃতিঃ ময়া অধ্যক্ষেণ সচরাচরম্ সূয়তে হে কৌন্তেয় অনেন হেতুনা জগদ্বিপরিবর্ত্ততে। ১০।

মূলানুবাদ। প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতার বশেই এই সচরাচর বিশ্ব প্রসব করে, হে কৌন্তেয়! এই কারণেই জগৎ পরিবর্ত্তন করিতেছে। ১০।

ভাষ্য। তত্র ভূতগ্রামমিমং বিসৃজামি উদাসীনবদাসীনমিতি চ বিরুদ্ধমুচ্যতে ইতি তৎপরিহারার্থমাহ—ময়া সর্ব্বতো দৃশিমাত্রস্বরূপেণ অবিক্রিয়াত্মনা অধ্যক্ষেণ মম মায়া ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ সূয়তে উৎপাদয়তি সচরাচরং জগৎ। তথাচ মন্ত্রবর্ণঃ একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ ইতি হেতুনা নিমিত্তেন অনেন অধ্যক্ষত্বেন কৌন্তেয় জগৎ সচরাচরং ব্যক্তাব্যক্তাত্মকং বিপরিবর্ত্ততে সর্ব্বাবস্থাসু। দৃশি কর্ম্মত্বাপত্তিনিমিত্তাহি জগতঃ সর্ব্বাপ্রবৃত্তিঃ অহমিদং ভোক্ষ্যে পশ্যামীদং শৃণোমীদং সুখমনুভবামি দুঃখমনুভবামি তদর্থমিদং করিষ্যামি এতদর্থমিদং করিষ্যে ইদং জ্ঞাস্যামি ইত্যাদ্যা অবগতিনিষ্ঠা অবগত্যবসা-

নৈব। "যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্" ইত্যাদয়শ্চ মন্ত্রা এতদর্থং দর্শয়ন্তি। ততশ্চৈকস্য দেবস্য সর্ব্বাধ্যক্ষভূতচৈতন্যমাত্রস্য পরমার্থতঃ সর্ব্বভোগানভিসম্বন্ধিনোঽন্যস্য চেতনান্তরস্যাভাবে ভোক্তুরন্যস্যাভাবাৎ কিং নিমিত্তেয়ং সৃষ্টিরিত্যত্র চ প্রশ্নপ্রতিবচনে অনুপপন্নে। "কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণেভ্যঃ। দর্শিতং চ ভগবতা অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। ইতি। ১০।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্তবাক্যসমূহের মধ্যে "আমি প্রাণিসমূহকে সৃষ্টি করি" ও "উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত" এই দুইটী বাক্য ভগবান্ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া ফেলিয়াছেন, এই প্রকার আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য (ভগবান্) বলিতেছেন যে, আমি সকল স্থানেই একমাত্র জ্ঞানস্বরূপে বিরাজমান, আমার কোন প্রকার বিকার নাই, আমিই অধ্যক্ষরূপে প্রেরণা করি বলিয়া, আমার মায়া ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎকে প্রসব করিয়া থাকে, মন্ত্ররূপ বেদেও ইহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"সেই দ্যুতিময় আত্মা অদ্বিতীয়, তিনি সকল প্রাণীতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, তিনি সকলের ব্যাপক এবং সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা, তিনি কর্ম্মমাত্রেরই অধ্যক্ষ, সকল ভূতই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে, তিনি সাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ, এক ও নির্গুণ।" এই আমার অধ্যক্ষতারূপ নিমিত্তের বশেই, হে কৌন্তেয়, এই চরাচরাত্মক ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ বিপরিবর্ত্তন করিতেছে অর্থাৎ ব্যাবহারিক নানা অবস্থাতে পরিবর্ত্তন করিতেছে। জগতের যতপ্রকার ব্যবহার হইতে পারে, জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়াই ঐ সকল ব্যবহার আছে বলিয়া স্বীকৃত হয়। "আমি ইহা ভোগ করিব, আমি ইহা দেখিতেছি, আমি ইহা শুনিতেছি, আমি এই সুখানুভব করিতেছি, আমি দুঃখানুভব করিতেছি, আমি সুখের জন্য এই কার্য্য করিব, এই দুঃখনিবৃত্তির জন্য আমি ইহা করিব, ইহা জানিব" ইত্যাদি যত প্রকার প্রবৃত্তি আছে, জ্ঞানের অবলম্বনেই ইহারা সৎ বলিয়া অঙ্গীকৃত হয় এবং জ্ঞানেতেই ইহাদের অবসান হইয়া থাকে। "এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের যিনি অধ্যক্ষ, তিনি পরম আকাশে বিরাজমান।" এই সকল মন্ত্রভাগও এই অর্থ প্রদর্শন করিতেছে। তাহাই যদি হইল, তবে ইহা স্থির যে, সেই সর্ব্বাধ্যক্ষ দ্যোতনাত্মা কেবল চৈতন্যস্বভাব, পরমার্থতঃ কোন প্রকার ভোগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই এবং তাঁহা

ছাড়া অন্য কোন ভোক্তা চেতনান্তরও নাই, সুতরাং এই সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? এই প্রকার প্রশ্ন এবং ইহার উত্তর দুইটী অনুপপন্ন (অর্থাৎ এই সৃষ্টি পরমার্থতঃ অনির্ব্বচনীয়, মিথ্যা ; যাহা মিথ্যা, তাহার সৃষ্টি, স্থিতি বা প্রলয়ও মিথ্যা ছাড়া আর কি হইতে পারে, তাহাই যদি হইল, তবে সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব-নিবন্ধন পরমাত্মার বিকার হইবার সম্ভাবনা কোথায়?) "এই সৃষ্টির তত্ত্ব পরমার্থরূপে কে বুঝে? কেই বা এ জগতে এই সৃষ্টির বিষয়ে উপদেশ করিল? এই জগৎ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? কেনই বা এই সৃষ্টি হইল।" এই সকল বেদ-মন্ত্রের দ্বারাও ইহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। ভগবানও দেখাইয়াছেন যে, অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত, এই কারণেই জীবসকল মোহ প্রাপ্ত হয়। ১০।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১॥

অন্বয়। মম ভূতমহেশ্বরং পরং ভাবমজানন্তো মূঢ়া মাং মানুষীং তনুং আশ্রিতং অবজানন্তি॥ ১১॥

মূলানুবাদ। প্রাণিসমূহের উপর সর্ব্বপ্রকারে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ আমাকে পরম ভাব বোধে অসমর্থ অজ্ঞব্যক্তিগণ মনুষ্যমূর্ত্তিধারী সামান্য জীব বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ১১।

ভাষ্য। এবং মাং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজন্তুনামাত্মানমপি সন্তং অবজানন্তি অবজ্ঞাং পরিভবং কুর্ব্বন্তি মাং মূঢ়া অবিবেকিনো মানুষীং মনুষ্য-সম্বন্ধিনীং তনুং দেহং আশ্রিতং মনুষ্যদেহেন ব্যবহরন্তং ইত্যেতৎ। পরং প্রকৃষ্টং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বমাকাশকল্পং আকাশস্যাপি অন্তরতমমজানন্তো মম, ভূত-মহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরং স্বমাত্মানং ততশ্চ তস্য মমাবজ্ঞানভাবনেনা-হতা বরাকাস্তে। ১১।

* ভাষ্যানুবাদ। আমার স্বভাব নিত্যমুক্ত ও নিত্যবুদ্ধ এবং আমিই সকল জীবের আত্মা, তথাপি "মূঢ়গণ" অবিবেকী জন সমূহ আমাকে "অবজ্ঞা করিয়া থাকে" পরিভূত করিয়া থাকে। "মানুষী" মনুষ্যসম্বন্ধিনী তনুকে আশ্রয় করিলেও অর্থাৎ মনুষ্যদেহকে আশ্রয় করিয়া ব্যবহার করিলেও আমি প্রকৃত-পক্ষে "ভূতমহেশ্বর" জীবসমূহের পরমেশ্বর অর্থাৎ অন্তরাত্মা আমার পরম

"ভাব" পরমাত্মতত্ত্ব, যাহা আকাশকল্প অথচ আকাশ হইতেও অন্তরতম, তাহাকে না বুঝিয়া আমাকে মূঢ়গণ অবজ্ঞা করিয়া থাকে। আমার প্রতি এই প্রকার অবজ্ঞা ভাবনা করে বলিয়া তাহারা সংসারে অত্যন্ত অকিঞ্চন, শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে। ১১।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২॥

অন্বয়। (যে মাং অবজানন্তি তে) রাক্ষসীং আসুরীং চ মোহিনীং প্রকৃতিং এব শ্রিতাঃ মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ (চ) ভবন্তি। ১২।

মূলানুবাদ। (যাহারা আমাকে অবজ্ঞা করে তাহারা) মোহকারিণী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিকেই আশ্রয় করে, তাহাদের আশা নিষ্ফল হয়, তাহাদের কার্য্য সফল হয় না, তাহাদের জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন হয়, এবং তাহারা বিকৃতচিত্ত হইয়া থাকে। ১২।

ভাষ্য। কথং—মোঘাশা—বৃথা আশা আশিষো যেষাং তে মোঘাশাঃ। তথা মোঘকর্ম্মাণো যানি চ অগ্নিহোত্রাদীনি তৈরনুষ্ঠীয়মানানি কর্ম্মাণি তানি চ তেষাং ভগবতঃ পরিভবাৎ স্বাত্মভূতস্য অবজ্ঞানান্মোঘান্যেব নিষ্ফলান্যেব কর্ম্মাণি ভবন্তি ইতি মোঘকর্ম্মাণঃ। তথা মোঘজ্ঞানা জ্ঞানমপি তেষাং নিষ্ফলমেব স্যাৎ। বিচেতসঃ বিগতবিবেকাশ্চ তে ভবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্চ তে ভবন্তি রাক্ষসীং রক্ষসামেব প্রকৃতিং স্বভাবং আসুরীং অসুরাণাঞ্চ প্রকৃতিং মোহিনীং মোহকরীং দেহাত্মবাদিনীং শ্রিতা আশ্রিতাশ্ছিন্ধি ভিন্ধি পিবস্বাদ পরস্বমপহর ইত্যেবং বদনশীলাঃ ক্রূরকর্ম্মাণো ভবন্তীত্যর্থঃ। "অসূর্য্যানাম তে লোকাঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ১২।

ভাষ্যানুবাদ। কেন (তাহারা এমন শোচনীয় দশাগ্রস্ত হয়)? "মোঘাশা" বৃথা হয় যাহাদের "আশা" অভিলাষ তাহাদিগকে মোঘাশ বলা যায় (ঐ সকল ব্যক্তির আশা বৃথা হয়) সেইরূপ তাহারা মোঘকর্ম্মা হইয়া থাকে, আমাকে অর্থাৎ তাহাদের পরমাত্মাকে অবজ্ঞা করে বলিয়া তাহাদের অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মসমূহ নিষ্ফল হয়, সুতরাং তাহারা মোঘকর্ম্মা হইয়া থাকে। সেই প্রকার তাহারা "মোঘজ্ঞান" নিষ্ফলজ্ঞান হয়, তাহাদের জ্ঞানও নিষ্ফল হইয়া থাকে।

তাহারা বিচেতা হয়, তাহাদের সদসৎ বিবেক থাকে না, ইহাই অভিপ্রায়। আরও তাহারা "রাক্ষসী" রাক্ষসগণের "প্রকৃতি" স্বভাবকে প্রাপ্ত হয় এবং "আসুরী" অসুরগণের প্রকৃতিকেও প্রাপ্ত হয়। এই রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি "মোহিনী" মোহকরী—অর্থাৎ ইহা দেহেতে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেয়,এই প্রকার স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা "ছিন্ন কর, ভিন্ন কর, পান কর, আস্বাদ কর, পরের ধন অপহরণ কর,"এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিয়া জগতে সকলপ্রকার ক্রূরকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহাই অর্থ। শ্রুতিতেও কথিত আছে যে, তাহারা "অজ্ঞানহীন লোক প্রাপ্ত হয়"। ১২।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩॥

অন্বয়। হে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতা মহাত্মানঃ মাং ভূতাদিং অব্যয়ং জ্ঞাত্বা অনন্যমনসঃ (সন্তঃ) ভজন্তে। ১৩।

মূলানুবাদ। হে পার্থ! দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় মহাত্মাগণ আমাকে ভূত-সমূহের আদি ও ব্যয়রহিত (অবিনাশী) জানিয়া ও অনন্যচেতা হইয়া আমাকে ভজনা করেন। ১৩।

ভাষ্য। যে পুনঃ শ্রদ্দধানা ভগবদ্ভক্তিলক্ষণে মোক্ষমার্গে প্রবৃত্তা মহাত্মানস্ত্বক্ষুদ্রচিত্তা মামীশ্বরং পার্থ দৈবীং দেবানাং প্রকৃতিং শম-দম-দয়া-শ্রদ্ধাদি-লক্ষণাং আশ্রিতাঃ সন্তো ভজন্তি সেবন্তে অনন্যমনসঃ অনন্যচিত্তা জ্ঞাত্বা ভূতাদিং ভূতানাং বিয়দাদীনাং প্রাণীনাং চ আদিং কারণমব্যয়ম্। ১৩।

ভাষ্যানুবাদ। যাহারা কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং ভগবদ্ভক্তিরূপ যোগমার্গে প্রবৃত্ত—(সেই সকল) "মহাত্মা" অক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ "দৈবী" দেবতাগণের "প্রকৃতি" শম-দম-দয়া-শ্রদ্ধাদিলক্ষণ স্বভাবকে প্রাপ্ত (হইয়া এবং) "অনন্য-মনা" অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে (অর্থাৎ) ঈশ্বরকে "ভূতগণের" আকাশা-দির ও প্রাণিগণের "আদি" কারণ ও অব্যয় জানিয়া "ভজনা" সেবা করিয়া থাকে। ১৩।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪॥

অন্বয়। মাং সততং কীর্ত্তয়ন্তঃ যতন্তঃ দৃঢ়ব্রতাঃ মাং নমস্যন্তশ্চ ভক্ত্যা নিত্যযুক্তাঃ উপাসতে। ১৪।

মূলানুবাদ। সর্ব্বদা ব্রহ্মস্বরূপ আমার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ও দৃঢ়ব্রত হইয়া (জ্ঞানলাভের জন্য) প্রযত্ন করিয়া থাকেন—ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা আমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন—এই ভাবেই নিত্যযুক্ত হইয়া সাধকগণ আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। ১৪।

ভাষ্য। কথং—সততং সর্ব্বদা ভগবন্তং ব্রহ্মস্বরূপং মাং কীর্ত্তয়ন্তো যতন্তশ্চ ইন্দ্রিয়োপসংহারশমদমদয়াদিলক্ষণৈর্ধর্ম্মৈঃ প্রযতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ দৃঢ়ং স্থিরমচাঞ্চল্যং ব্রতং যেষাং তে দৃঢ়ব্রতা নমস্যন্তশ্চ মাং হৃদয়েশয়মাত্মানং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তাঃ সন্ত উপাসতে সেবন্তে। ১৪।

ভাষ্যানুবাদ। কি প্রকারে? (তাঁহারা উপাসনা করিয়া থাকেন তাহাই বলা হইতেছে) "সতত" সর্ব্বদা আমাকে (অর্থাৎ) ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্‌কে কীর্ত্তিত করিতে করিতে (এবং) যত্নপর হইয়া (অর্থাৎ) ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার, শম, দম, দয়া ও অহিংসাদিরূপ ধর্ম্মদ্বারা (চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবার জন্য) প্রযত্নপরায়ণ হইয়া—(এবং) "দৃঢ়ব্রত" দৃঢ় স্থির অর্থাৎ চাঞ্চল্যরহিত ব্রতের অনুষ্ঠান যাহারা করে, তাহাদিগকেই দৃঢ়ব্রত বলা যায়। এইরূপ দৃঢ়ব্রত হইয়া ও সকলের হৃদয়স্থিত আত্মস্বরূপ আমাকে (সর্ব্বদা) নমস্কার করিতে করিতে নিত্যযুক্ত (যোগী) গণ আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। ১৪।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫॥

অন্বয়। অপিচ অন্যে জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ মাং উপাসতে (কেচন) একত্বেন (কেচন) পৃথক্ত্বেন (কেচন) বহুধা বিশ্বতোমুখং (মাং উপাসতে ইতি শেষঃ)। ১৫।

মূলানুবাদ। জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা পূজা করিয়া কোন কোন ব্যক্তি আমার উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই জ্ঞান কাহারও এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ক, কেহ বা চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি নানা আকারে ভাবিয়া উপাসনা করেন, কেহ বা বহুভাবে অবস্থিত সর্ব্বব্যাপক ভাবিয়াও আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। ১৫।

ভাষ্য। তে কেন প্রকারেণ উপাসতে ইত্যুচ্যতে—জ্ঞানযজ্ঞেন জ্ঞানমেব ভগবদ্বিষয়ং যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ পূজয়ন্তো মামীশ্বরং চাপ্যন্যে অন্যা-মুপাসনাং পরিত্যজ্য উপাসতে। তচ্চ জ্ঞানমেকত্বেন একমেব পরংব্রহ্ম ইতি পরমার্থদর্শনেন যজন্ত উপাসতে। কেচিচ্চ পৃথক্ত্বেন আদিত্যচন্দ্রাদিভেদেন সএব ভগবান্ বিষ্ণুরাদিত্যাদিরূপেণাবস্থিত ইতি উপাসতে। কেচিদ্ বহুধা অবস্থিতঃ স এব ভগবান্ বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বতোমুখঃ বিশ্বরূপ ইতি তং বিশ্বরূপং সর্ব্বতোমুখং বহুধা বহুপ্রকারেণ উপাসতে। ১৫।

ভাষ্যানুবাদ। তাঁহারা কোন্ কোন্ প্রকারে উপাসনা করিয়া থাকেন। তাহাই বলা হইতেছে, "জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা" ভগবদ্বিষয় জ্ঞানই যজ্ঞ (বলিয়া উক্ত হইয়াছে) সেই জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা পূজা করিয়া এবং অন্য প্রকার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কোন কোন সাধকগণ আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞান (কি প্রকার হয়।) একত্ব প্রকারে অর্থাৎ একমাত্র পরব্রহ্মই সৎ এইরূপ পরমার্থ দৃষ্টি দ্বারাই তাঁহারা আমার পূজা করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। কোন কোন সাধক পৃথক্‌ভাবে (অর্থাৎ) আদিত্য বা চন্দ্রাদিভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন—একই সেই ভগবান্ বিষ্ণু আদিত্যাদি নানারূপে অবস্থিত আছেন—ইহাই ভাবিয়া তাঁহারা উপাসনা করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন সাধক ভাবিয়া থাকেন যে, সেই নানারূপ নানাপ্রকারে অবস্থিত হইলেও ভগবান্ বিষ্ণু "বিশ্বতোমুখ" সর্ব্বতোমুখ অর্থাৎ বিশ্বরূপ, অর্থাৎ সেই সর্ব্বতোমুখ বহুভাবে অবস্থিত ভগবান্‌কে বহুপ্রকারে উপাসনা করিয়া থাকেন। ১৫।

মান্দ্রাজনিবাসিগণের অভিনন্দনপত্রের উত্তর।

মান্দ্রাজনিবাসী স্বদেশী স্বধর্ম্মাবলম্বী বন্ধুগণ,—

হিন্দুধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের জন্য আমি যৎকিঞ্চিৎ যাহা করিয়াছি, তাহা যে আপনারা আদরের সহিত অনুমোদন করিয়াছেন, তাহাতে আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম। এই আনন্দ, আমার নিজের এবং সুদূর বিদেশে আমার প্রচার কার্য্যের ব্যক্তিগত প্রশংসার জন্য নহে। আমার আহ্লাদের কারণ এই;—আপনারা যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে আনন্দিত, তাহাতে ইহাই স্পষ্ট দেখাইতেছে যে, যদিও হতভাগ্য ভারতের মস্তকের উপর দিয়া কতবার বৈদেশিক আক্রমণের ঝঞ্ঝাবাত গিয়াছে, যদিও শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমাদের নিজেদের উপেক্ষায় এবং আমাদের বিজেতৃগণের অবজ্ঞায় প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের মহিমা স্পষ্টই ম্লান হইয়াছে, যদিও শত শত শতাব্দীব্যাপী বন্যায় হিন্দুধর্ম্মরূপ সৌধের অনেকগুলি মহিমাময় অবলম্বনস্তম্ভ, অনেক সুন্দর সুন্দর খিলান ও অনেক অপূর্ব্ব পার্শ্বপ্রস্তর ভাসিয়া গিয়াছে, তথাপি উহার ভিত্তি অটলভাবে এবং উহার সন্ধিপ্রস্তর অটুটভাবে বিরাজমান; যে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর হিন্দুজাতির ঈশ্বরভক্তি ও সর্ব্বভূতহিতৈষণারূপ অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত, তাহা পূর্ব্ববৎ অটুট ও অবিচলিত ভাবে বর্ত্তমান। তাঁহার অতি অনুপযুক্ত দাস আমি, ভারতে ও সমগ্র জগতে তাঁহার যে উপদেশ প্রচারের ভার প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছি, তোমরা তাহা আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছ; তোমরা তোমাদের স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি বলে তাঁহাতে এবং তাঁহার উপদেশে সেই মহতী আধ্যাত্মিক বন্যার প্রথম অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়াছ, যাহা নিশ্চিত অনতিদীর্ঘকালে ভারতে দুর্দ্দমনীয় বেগে উপস্থিত হইবে, অনন্ত শক্তিস্রোতে যাহা কিছু দুর্ব্বল ও দোষযুক্ত, সব ভাসাইয়া দিবে আর হিন্দুজাতির শত শত শতাব্দী ধরিয়া নীরব সহিষ্ণুতার পুরস্কারস্বরূপ, তাহাদিগকে অতীত হইতেও উজ্জ্বলতর গৌরবমুকুটে ভূষিত করিয়া তাহাদের বিধিপ্রাপ্য সত্ব স্বরূপ, উচ্চপদবীতে উন্নীত করিবে এবং সমগ্র মানব জাতির সম্বন্ধে উহার যে কার্য্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিকপ্রকৃতিসম্পন্ন মানবজাতির বিকাশ, তাহাও সম্পাদন করিবে।

দাক্ষিণাত্যবাসী তোমাদের নিকট আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ বিশেষ ঋণী, কারণ,

ভারতে আজ যে সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশেরই মূল দাক্ষিণাত্য। শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকারগণ, যুগপ্রবর্ত্তনকারী আচার্য্যগণ, যথা, শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব, (১) ইহাঁরা সকলেই দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়াছিলেন। মহাত্মা শঙ্কর, জগতের প্রত্যেক অদ্বৈতবাদীই যাঁহার নিকট অমোচ্য ঋণজালে আবদ্ধ; মহাত্মা রামানুজ, যাঁহার স্বর্গীয় স্পর্শ, পদদলিত পরিয়াগণকেও আলওয়ারে (২) পরিণত করিয়াছিল ; মহাত্মা মধ্ব, সমগ্র ভারতে শক্তিসঞ্চারকারী আর্য্যাবর্ত্তের সেই একমাত্র মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুবর্ত্তিগণও যাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্য ইহাঁদের সকলেরই জন্মস্থান। বর্ত্তমানকালেও বারাণসীধামের শ্রেষ্ঠ গৌরবস্বরূপ মন্দিরসমূহে দাক্ষিণাত্যবাসীরই প্রাধান্য, তোমাদের ত্যাগই হিমালয়ের সুদূরবর্ত্তী চূড়াস্থিত পবিত্র দেবালয়সমূহকে শাসন করিতেছে। অতএব মহাপুরুষগণের পূতশোণিতে পুরিতধমনী, তথাবিধ আচার্য্যগণের আশীর্ব্বাদে ধন্যজীবন, তোমরা যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সর্ব্ব প্রথম বুঝিবে ও আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

দাক্ষিণাত্যই চিরদিন বেদবিদ্যার ভাণ্ডার, সুতরাং তোমরা বুঝিবে যে, অজ্ঞ হিন্দুধর্ম্ম-আক্রমণকারী সমালোচকগণের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদসত্ত্বেও এখনও শ্রুতিই (৩) হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড স্বরূপ।

জাতিবিদ্যাবিৎ বা ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের নিকট বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগের (৪) যতই মূল্য হউক, 'অগ্নিমীলে', 'ইষেত্বোর্জ্জেত্বা', 'শন্নো-

---

(১) রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও বেদান্তদর্শনের উপর ঐ মতসঙ্গত ব্যাখ্যাযুক্ত শ্রীভাষ্যের রচয়িতা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমতে চিৎ (জীব) অচিৎ (জড়) ও তাহাদের অন্তর্যামী ঈশ্বর এই তিন তত্ত্ব আছে। মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

(২) দাক্ষিণাত্যের চণ্ডালতুল্য অস্পৃশ্য নীচ জাতিবিশেষকে পরিয়া বলে। আলওয়ার শব্দের অর্থ ভক্ত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভক্তগণকে আলওয়ার বলে।

(৩) বেদ।

(৪) চতুর্ব্বেদের প্রত্যেকটীতে তিনটী করিয়া অংশ আছে। (১) ভিন্ন ভিন্ন দেবগণের উদ্দেশ্যে স্তোত্রাত্মক মন্ত্রসমূহের নাম সংহিতা। (২) এই সকল মন্ত্র কোন্ যজ্ঞে কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার বর্ণনাত্মক বেদভাগের নাম ব্রাহ্মণ। (৩) অরণ্যে ঋষিগণদ্বারা আলোচিত তত্ত্বসমূহের নাম আরণ্যক। উপনিষদ্‌সমূহ এই আরণ্যকের অন্তর্গত।

দেবীরভীষ্টয়ে', (১) প্রভৃতি বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ বেদীযুক্ত বিভিন্ন যজ্ঞে নানাবিধ আহুতি দ্বারা প্রাপ্য ফলসমূহ যতই বাঞ্ছনীয় হউক, সমুদয়ই ভোগৈকফল; আর কেহই কখন এগুলি মোক্ষজনক বলিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হয় নাই। সুতরাং, আধ্যাত্মিকতা ও মোক্ষমার্গের উপদেশক জ্ঞানকাণ্ড, যাহা আরণ্যক বা শ্রুতিশির বলিয়া কথিত হয়, তাহাই ভারতে চিরকাল শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে ও চিরকাল করিবে।

সনাতন ধর্ম্মের নানামতমতান্তররূপ গোলকধাঁধায় দিগ্‌ভ্রান্ত;—একমাত্র যে ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন উপযোগিতা তৎপ্রচারিত অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ব্রহ্মের অবিকল প্রতিবিম্বস্বরূপ—পূর্ব্বভ্রান্তসংস্কারবশবর্ত্তী হইয়া তদ্ধর্ম্মমর্ম্ম-বোধে অক্ষম; জড়বাদসর্ব্বস্ব জাতির নিকট ঋণসূত্রে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিকতার মানদণ্ডাবলম্বনে অন্ধকারে অন্বেষণপরায়ণ, আধুনিক হিন্দুযুবক বৃথাই তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের ধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করেন এবং হয় ঐ চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ঘোর অজ্ঞেয়বাদী হইয়া পড়েন অথবা স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের প্রেরণায় পশুজীবনযাপনে অসমর্থ হইয়া প্রাচ্যগন্ধি বিবিধ পাশ্চাত্য জড়বাদের নির্য্যাস অসাবধানে পান করেন এবং শ্রুতির এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করেন ;—

পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ। (২)

তাঁহারই কেবল বাঁচিয়া যান, যাঁহাদের আত্মা সদ্‌গুরুর জীবনপ্রদ স্পর্শ-বলে জাগ্রত হয়।

ভগবান ভাষ্যকার (৩) ঠিকই বলিয়াছেন,

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥ (৪)

পরমাণু, দ্ব্যণু, ত্রসরেণু প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তপ্রসূ বৈশেষিক-

(১) এই তিনটী যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদের প্রথম শ্লোকের অংশস্বরূপ।

(২) কঠোপনিষদ্। অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় মূঢ়েরা নানা দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

(৩) শ্রীশঙ্করাচার্য্য।

(৪) বিবেকচূড়ামণি, ৩। এই তিনটী অতি দুর্লভ, দেবানুগ্রহেই লাভ হইয়া থাকে,—মনুষ্যজন্মলাভ, মোক্ষের প্রবল ইচ্ছা ও মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ।

দের (১) সূক্ষ্ম বিচারসমূহই হউক, অথবা নৈয়ায়িকদের জাতিদ্রব্যগুণ-সমবায় (২) প্রভৃতি বস্তুসম্বন্ধীয় অপূর্ব্বতর বিচারাবলিই হউক, অথবা পরিণামবাদের জনকস্বরূপ সাংখ্যাদিগের তদপেক্ষা গভীরতর চিন্তাগতিই হউক, অথবা এই বিভিন্নরূপ বিশ্লেষণাবলির সুপক্ক ফলস্বরূপ ব্যাসসূত্রই হউক, মনুষ্যমনের এই সকল বিবিধ সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের একমাত্র ভিত্তি শ্রুতি। এমন কি, বৌদ্ধ বা জৈনদিগের দার্শনিক গ্রন্থাবলিতেও শ্রুতির সহায়তা পরিত্যক্ত হয় নাই, আর অন্ততঃ কতকগুলি বৌদ্ধসম্প্রদায়ে এবং জৈনদের অধিকাংশ গ্রন্থে শ্রুতির প্রামাণ্য সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে; তবে তাঁহারা শ্রুতির কোন কোন অংশকে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 'হিংসক' শ্রুতি আখ্যা দেন—এবং সে গুলির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। বর্ত্তমান কালেও স্বর্গীয় মহাত্মা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীও (৩) এতদ্বিধ মত পোষণ করিতেন।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, প্রাচীন ও বর্ত্তমান সমুদয় ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর কেন্দ্র কোথায়, যদি কেহ নানাবিধ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মেরুদণ্ড কি, জানিতে চান, তবে অবশ্যই ব্যাসসূত্রই এই কেন্দ্র, এই মেরুদণ্ড বলিয়া প্রদর্শিত হইবে।

---

(১) দ্ব্যণু=দুইটী অণুর সম্মিলিত অবস্থা। ত্রসরেণু=তিনটী অণুর সম্মিলিত অবস্থা। বৈশেষিক—হিন্দুদর্শন প্রধানতঃ ছয়টী। ১। বৈশেষিক—কণাদপ্রণীত; ২। ন্যায়—গৌতমপ্রণীত; ৩। সাংখ্য—কপিল প্রণীত; ৪। যোগ—পতঞ্জলিপ্রণীত; ৫। পূর্ব্বমীমাংসা (ইহাতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মীমাংসা আছে)—জৈমিনিপ্রণীত; ৬। বেদান্ত বা ব্যাসসূত্র—ব্যাসপ্রণীত।

(২) দ্রব্য—ন্যায়মতে দ্রব্য নয়টী, যথা,—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, দেশ, কাল, আত্মা ও মন। জাতি—কতকগুলি বস্তুর সাধারণ ধর্ম্ম, যাহা দ্বারা শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে, যেমন পশুত্ব, মনুষ্যত্ব। গুণ—ন্যায় মতে গুণ বলিতে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব্দ, এই কয়েকটীকে বুঝায়। সমবায়—যেমন ঘটে ও যে মৃত্তিকায় উহা নির্ম্মিত, তাহাদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ।

(৩) আর্য্যসমাজের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা। ইহার মত পঞ্জাবে খুব প্রচলিত। এখানকার ব্রাহ্মদের সঙ্গে ইঁহারা অনেক বিষয়ে একমত।

হিমাচলস্থিত অরণ্যাণীর হৃদয়স্তব্ধকারী গাম্ভীর্য্যের মধ্যে স্বর্ণদীর গভীর ধ্বনিমিশ্রিত অদ্বৈতকেশরীর অস্তি ভাতি প্রিয়রূপ (১) বজ্রগম্ভীর রবই কেহ শ্রবণ করুন, অথবা বৃন্দাবনের মনোহর কুঞ্জসমূহে 'পিয়া পীতম্' (২) কূজিতই শ্রবণ করুন, বারাণসীধামের মঠসমূহে সাধুদিগের গভীর ধ্যানেই যোগদান করুন, অথবা নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের উন্মাদনৃত্যে যোগদানই করুন; বাদকালী, তিনকালী (৩) প্রভৃতি শাখাযুক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমতাবলম্বী আচার্য্যগণের পাদমূলেই উপবেশন করুন, অথবা মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের বাক্যই শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করুন, গৃহী শিখদিগের 'ওয়া গুরু কি ফতে' (৪) রূপ সমরবাণীই শ্রবণ করুন, অথবা উদাসী ও নির্ম্মলাদিগের গ্রন্থসাহেবের (৫) উপদেশই শ্রবণ করুন; কবীরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে সৎসাহেব (৬) বলিয়া অভিবাদনই করুন, অথবা সখীসম্প্রদায়ের ভজনই শ্রবণ করুন; রাজপুতানার সংস্কারক দাদূর অদ্ভুত গ্রন্থাবলি বা তাঁহার শিষ্য রাজা সুন্দরদাস ও তাঁহা হইতে ক্রমশঃ নামিয়া বিচারসাগরের বিখ্যাত রচয়িতা নিশ্চলদাসের গ্রন্থই (ভারতে গত

---

(১) অদ্বৈতকেশরী—অদ্বৈতবাদরূপ সিংহ অর্থাৎ সর্ব্বমতশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদ। অস্তি, ভাতি ও প্রিয় = সৎ, চিৎ, আনন্দ। এই তিনটী শব্দ পঞ্চদশীতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) ভাবুক বৈষ্ণবেরা, বৃন্দাবনের কুঞ্জমধ্যে বিহঙ্গগণের গীতিমধ্যে এই ধ্বনি শুনিতে পান—অর্থ রাধাকৃষ্ণ।

(৩) প্রথমোক্তটী সংস্কৃত ভাষায় রচিত শাস্ত্র অর্থাৎ প্রাচীন বেদ বেদান্ত প্রভৃতি ও আধুনিক শ্রীভাষ্য প্রভৃতিকে অধিক প্রামাণ্য জ্ঞান করেন। দ্বিতীয়োক্তেরা দিব্যপ্রবন্ধ নামক তামিলভাষায় রচিত গ্রন্থের বিশেষ পক্ষপাতী। আরো অনেক অনেক বিষয়ে উভয়ের মতভেদ আছে।

(৪) গুরুর জয় হউক।

(৫) উদাসী ও নির্ম্মলা দুইটী নানকপন্থী সম্প্রদায়। প্রথমটি নানকের পুত্র শ্রীচাঁদকর্ত্তৃক স্থাপিত; দ্বিতীয়টী গুরুগোবিন্দ স্থাপিত। গ্রন্থ সাহেব—নানকপন্থীদের ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে নানক হইতে গুরুগোবিন্দ পর্য্যন্ত দশগুরুর উপদেশ লিখিত আছে। শিখেরা এই গ্রন্থকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকে। সাহেব শব্দের অর্থ মাননীয়।

(৬) পূজনীয় সাধু।

তিন শতাব্দী ধরিয়া যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সকলের অপেক্ষা এই বিচারসাগরগ্রন্থের ভারতীয় জনসমাজে প্রভাব অধিক) পাঠ করুন, এমন কি, আর্য্যাবর্ত্তের ভাঙ্গীমেথরগণকে তাঁহাদের লালগুরুর উপদেশ বিবৃত করিতেই বলুন, তিনি দেখিবেন, এই আচার্য্যগণ ও সম্প্রদায়সমূহ, সকলেই সেই ধর্ম্মপ্রণালীর অনুবর্ত্তী, শ্রুতি যাহার প্রামাণ্যগ্রন্থ, গীতা যাহার ভগবদ্বক্ত্রবিনিঃসৃত টীকা, শারীরক ভাষ্য (১) যাহার সুপ্রণালীবদ্ধ বিবৃতি আর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যগণ হইতে লালগুরুর ঘৃণিত মেথর শিষ্যগণ পর্য্যন্ত ভারতের সমুদয় বিভিন্ন সম্প্রদায়, যাহার বিভিন্ন বিকাশ।

অতএব দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, এবং আরো কতকগুলি অনতিপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাযুক্ত এই প্রস্থানত্রয় (২) হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থস্বরূপ, প্রাচীন নারাশংসীর (৩) প্রতিনিধিস্বরূপ পুরাণ উহার উপাখ্যানভাগ এবং বৈদিক ব্রাহ্মণভাগের প্রতিনিধিস্বরূপ তন্ত্র উহার কর্ম্মকাণ্ড।

পূর্ব্বোক্ত প্রস্থানত্রয় সকল সম্প্রদায়েরই প্রামাণ্যগ্রন্থ, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ই পৃথক্ পৃথক্ পুরাণ ও তন্ত্রকে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তন্ত্রগুলি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরই একটু পরিবর্ত্তিত আকারমাত্র, আর কেহ উহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা অসম্বদ্ধ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ ভাগ, বিশেষতঃ, অধ্বর্য্যুব্রাহ্মণ ভাগের সহিত মিলাইয়া তন্ত্র পাঠ করিতে পরামর্শ দিই; তাহা হইলে তিনি দেখিবেন, তন্ত্রে ব্যবহৃত অধিকাংশ মন্ত্রই অবিকল ব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত। ভারতবর্ষে তন্ত্রের প্রভাব কিরূপ, জিজ্ঞাসা করিলে বলা যাইতে পারে যে, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মব্যতীত হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সমুদয় প্রচলিত ধর্ম্মই তন্ত্র হইতে গৃহীত আর উহা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই উপাসনাপ্রণালীকে নিয়মিত করিয়া থাকে।

অবশ্য, আমি এ কথা বলি না যে, সকল হিন্দুই সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের স্বধর্ম্মের এই সকল মূল সম্বন্ধে অবগত আছেন। অনেকে, বিশেষতঃ, নিম্নবঙ্গে, এই সম্প্রদায় ও প্রণালীসমূহের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই; কিন্তু জ্ঞাতসারেই

(১) শ্রীশঙ্করপ্রণীত বেদান্তভাষ্য।

(২) উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্ত। সন্ন্যাসিগণ এই প্রস্থানত্রয় শিক্ষা করিতে বাধ্য।

(৩) সংহিতা।

হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, পূর্ব্বোক্ত তিন প্রস্থানের উপদেশানুসারে সকল হিন্দুই চলিয়াছেন।

অপর দিকে, যেখানেই হিন্দী ভাষা কথিত হয়, তথাকার অতি নীচ-জাতি পর্য্যন্ত নিম্নবঙ্গের অনেক উচ্চতম জাতি হইতে বৈদান্তিক ধর্ম্মসম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ।

ইহার কারণ কি?

মিথিলাভূমি হইতে নবদ্বীপে আনীত, শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ প্রভৃতি মনীষিগণের প্রতিভায় সযত্নে লালিত ও পরিপুষ্ট, কোন কোন বিষয়ে সমগ্রজগতের অন্যান্য সমুদয় প্রণালী হইতে শ্রেষ্ঠ, অপূর্ব্ব সুনিবদ্ধ বাক্‌শিল্পে রচিত, তর্কপ্রণালীর বিশ্লেষণস্বরূপ বঙ্গদেশীয় ন্যায় শাস্ত্র হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেদের চর্চ্চায় বঙ্গবাসীর যত্ন ছিল না; এমন কি, কয়েক বর্ষ মাত্র পূর্ব্বে পতঞ্জলির মহাভাষ্য (১) পড়াইতে পারেন, এমন কেহ বঙ্গদেশে ছিলেন না বলিলেই হয়। একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই 'অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক' (২) জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবারমাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল; কিছু দিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্ম্মজীবনের সহভাগী হইয়াছিল।

একটু বিস্ময়ের বিষয় এই, শ্রীচৈতন্য একজন ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইয়াছিলেন, সুতরাং ভারতী (৩) ছিলেন বটে, কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীই প্রথম তাঁহার ধর্ম্মপ্রতিভা জাগ্রত করিয়া দেন।

বোধ হয় যেন পুরীসম্প্রদায় বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিকতা জাগাইতে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্য ব্যাসসূত্রের যে ভাষ্য লিখেন, তাহা হয় নষ্ট হইয়াছে,

(১) পাণিনির ব্যাকরণের ভাষ্য। বেদশিক্ষা করিতে হইলে পাণিনির বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে।

(২) ন্যায়ে ব্যবহৃত শব্দদ্বয়—অবচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ বিশিষ্ট, যাহা দ্বারা সীমাবদ্ধ করে, অবচ্ছেদকের অর্থ—যে বিশিষ্ট করে।

(৩) শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ দশটী সন্ন্যাসিসম্প্রদায় স্থাপন করেন। ইঁহাদিগকে দশনামী বলে। যথা,—গিরি, পুরী, ভারতী, বন, অরণ্য, পর্ব্বত, সাগর, তীর্থ, সরস্বতী, পদ্ম।

না হয়, এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাঁহার শিষ্যেরা দাক্ষিণাত্যের মাধ্বসম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিলেন। ক্রমশঃ রূপসনাতন ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আসন বাবাজীগণ অধিকার করিলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্যের মহান্ সম্প্রদায় ক্রমশঃ ধ্বংসাভিমুখে যাইতেছিল, কিন্তু আজকাল উহার পুনরভ্যুত্থানের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আশা করি, উহা শীঘ্রই আপন লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিবে।

সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের শক্তি লক্ষিত হয়। যেথানেই লোকে ভক্তিমার্গ জানে, সেথানেই তাঁহার বিষয় লোকে আদরপূর্ব্বক চর্চ্চা করিয়া থাকে ও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে: আমার বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে যে, সমুদয় বল্লভাচার্য্যসম্প্রদায় (১) শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ মাত্র। কিন্তু তাঁহার তথাকথিত বঙ্গীয় শিষ্যগণ জানেন না, তাঁহার প্রভাব এখনও কিরূপে সমগ্র ভারতে কার্য্য করিতেছে। কিরূপেই বা জানিবেন? শিষ্যগণ গদিয়ান হইয়াছেন, কিন্তু তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া আচণ্ডালকে ভগবানের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে ভিক্ষা করিতেন।

যে অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা, বঙ্গদেশ এবং অধিক পরিমাণে বঙ্গদেশেই প্রচলিত, তাহাও উহার, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ধর্ম্মজীবন হইতে পৃথক্ থাকিবার আর একটী কারণ।

সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, বঙ্গদেশ, এখন পর্য্যন্ত যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনের প্রতিনিধি ও ভাণ্ডারস্বরূপ, সেই মহান্ সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের জীবন হইতে কখন শক্তিপ্রাপ্ত হয় নাই।

বঙ্গের উচ্চবর্ণেরা ত্যাগ ভাল বাসেন না, তাঁহাদের ঝোঁক ভোগের দিকে। তাঁহারা কিরূপে আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টি লাভ করিবেন? ত্যাগে-নৈকেনামৃতত্বমানশুঃ, (২) অন্যপ্রকার কিরূপে সম্ভব হইবে?

অপর দিকে, সমুদয় হিন্দীভাষী ভারতের মধ্যে ক্রমান্বয়ে অনেক সুদূর-ব্যাপিপ্রভাবসম্পন্ন মহামহা ত্যাগী আচার্য্যগণ বেদান্তের মত প্রতি গৃহে গৃহে

---

(১) বৈষ্ণবসম্প্রদায়বিশেষ। বল্লভাচার্য্য বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য। এই সম্প্রদায় বোম্বাই অঞ্চলে খুব প্রবল।

(২) একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। একটী বৈদিক শ্লোকের অংশবিশেষ।

প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের রাজত্ব কালে ত্যাগের যে মহিমা প্রচারিত হয়, তাহাতে অতি নিম্নশ্রেণীর লোকেও বেদান্তদর্শনের উচ্চতম উপদেশ পর্য্যন্ত শিক্ষা পাইয়াছে। প্রকৃত গর্ব্বের সহিত পঞ্জাবী কৃষকবালিকা বলিয়া থাকে, তাহার চরকা পর্য্যন্ত সোহহং সোহহং ধ্বনি করিতেছে। আর আমি হৃষীকেশের (১) জঙ্গলে সন্ন্যাসিবেশ-ধারী মেথরত্যাগীদিগকে বেদান্ত পাঠ করিতে দেখিয়াছি। অনেক গর্ব্বিত উচ্চবর্ণের লোকও তাঁহাদের পদতলে বসিয়া আনন্দের সহিত উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কেনই বা না করিবেন? 'অন্ত্যাদপি পরোধর্ম্মঃ।' (২)

অতএব উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাববাসীরা, বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের অধিবাসিগণ হইতে ধর্ম্মবিষয়ে অধিক শিক্ষিত। দশনামী, বৈরাগী, পন্থী (৩) প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ত্যাগী পরিব্রাজকগণ প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ধর্ম্ম বিলাইতেছেন। মূল্য এক টুকরা রুটিমাত্র। আর তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কি মহৎ ও নিঃস্বার্থচরিত্র! কাচুপন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত (স্বাধীন—যাঁহারা প্রচলিত কোন সম্প্রদায়ের সহিত মিশিতে চান না) একজন সন্ন্যাসী আছেন।(৪) তিনি উপলক্ষ্য হইয়া সমুদয় রাজপুতানায় শত শত বিদ্যালয় ও দাতব্য আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। তিনি জঙ্গলের ভিতর হাঁসপাতাল খুলিয়াছেন, হিমালয়ের দুর্গম গিরিনদীর উপরে লৌহসেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, কিন্তু তিনি কখন মুদ্রা স্পর্শ করেন না; তাঁহার একখানি কম্বল ছাড়া সাংসারিক সম্বল আর কিছুই নাই, এই জন্য তাঁহাকে লোকে কম্‌লী স্বামী বলিয়া ডাকে—তিনি দ্বারে দ্বারে মাধুকরী দ্বারা আহার সংগ্রহ করেন। আমি তাঁহাকে কখন এক বাড়ীতে স্থূলভিক্ষা করিতে দেখি নাই, পাছে গৃহস্থের কোন ক্লেশ হয়। আর এরূপ সাধু তিনি একা নহেন, এরূপ শত শত সাধু রহিয়াছেন। তোমরা কি মনে কর, যত দিন এই ভূদেবগণ ভারতে জীবিত থাকিয়া তাঁহাদের দেবচরিত্ররূপ

---

(১) হরিদ্বার হইতে ১২ মাইল দূরে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত সাধুদের তপোভূম। এখানে নানা সম্প্রদায়ের সাধু কুটীর বাঁধিয়া বর্ষাকাল ব্যতীত ৮ মাস সাধনভজন শাস্ত্রপাঠাদি করেন।

(২) নীচ ব্যক্তিগণের নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। (মনুসংহিতা)

(৩) বৈষ্ণবসাধুগণকে বৈরাগী বলে। পন্থী, যথা,—কবীরপন্থী, নানক-পন্থী প্রভৃতি।

(৪) ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে ইনি দেহরক্ষা করিয়াছেন।

দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেছেন, তত দিন এই প্রাচীন ধর্ম্মের বিনাশ হইবে ?

এই দেশে (আমেরিকায়) পাদরিগণ বৎসরের মধ্যে ছয় মাস মাত্র প্রতি রবিবার দুই ঘণ্টা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ৩০০০০, ৪০০০০, ৫০০০০, এমন কি, ৯০০০০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইয়া থাকেন। আমেরিকাবাসিগণ তাঁহাদের ধর্ম্মরক্ষার জন্য কত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন আর বাঙ্গালী যুবকগণ শিক্ষা পাইয়াছেন, কম্‌লি স্বামীর ন্যায় এই সকল দেবতুল্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ব্যক্তিগণ অলস ভবঘুরে মাত্র !

'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।' (১)।

একটী চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত লও—একজন অতি অজ্ঞ বৈরাগীর কথা ধর। তিনিও যখন কোন গ্রামে গমন করেন, তিনিও তুলসীদাস (২) বা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে যাহা জানেন, অথবা দাক্ষিণাত্যে হইলে আলওয়ারদিগের নিকট হইতে যাহা জানেন, তাহা শিখাইতে চেষ্টা করেন। ইহা কি কিছু উপকার করা নহে ? আর এই সমুদয়ের বিনিময়ে তাঁহার প্রাপ্য এক টুকরা রুটি ও একখণ্ড কৌপীন। ইহাঁদিগকে নির্দ্দয়ভাবে সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে, ভ্রাতৃগণ, তোমরা চিন্তা কর, তোমরা তোমাদের স্বদেশবাসিগণের জন্য কি করিয়াছ, যাহাদের ব্যয়ে তোমরা শিক্ষা পাইয়াছ, যাহাদিগকে শোষণ করিয়া তোমাদের পদগৌরব রক্ষা করিতে হয়, ও তোমাদের শিক্ষকগণকে, বাবাজীগণ কেবল ভবঘুরেমাত্র, এই শিক্ষার জন্য বেতন দিতে হয়।

আমাদের কতকগুলি স্বদেশী বঙ্গবাসী হিন্দুধর্ম্মের এই পুনরুত্থানকে হিন্দুধর্ম্মের 'নূতন বিকাশ' বলিয়া তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা উহাকে 'নূতন' আখ্যা দিতে পারেন। কারণ, হিন্দুধর্ম্ম সবে মাত্র বাঙ্গালা দেশে প্রবেশ করিতেছে ; এখানে এতদিন ধর্ম্ম বলিতে কেবল আহার বিহার ও বিবাহ-সম্বন্ধীয় কতকগুলি দেশাচারমাত্রকেই বুঝাইত।

রামকৃষ্ণশিষ্যগণ হিন্দুধর্ম্মের যে ভাব সমগ্রভারতে প্রচার করিতেছেন,

---

(১) আদি পুরাণের এক শ্লোকের অংশ। আমার ভক্তের যাহারা ভক্ত, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, এই আমার মত।

(২) সুনামখ্যাত সাধু। ইহার রচিত রামায়ণ হিন্দুস্থানীরা অতি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাঁর দোঁহাগুলিও অতি গভীর উপদেশপূর্ণ।

তাহা সৎশাস্ত্রের অনুমোদিত কি না, এই ক্ষুদ্র পত্রে সেই গুরুতর প্রশ্নের বিচারের স্থান নাই। তবে আমি আমার সমালোচকগণকে কতকগুলি সঙ্কেত দিব, যাহাতে তাঁহারা আমাদের মত বুঝিতে অনেক সাহায্য পাইবেন।

প্রথমতঃ, আমি কখন এরূপ তর্ক করি নাই যে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের গ্রন্থ হইতে হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ ধারণা হইতে পারে, যদিও তাঁহাদের কথা 'অমৃতসমান' এবং যাঁহারা উহা শুনেন, তাঁহারা 'পুণ্যবান।' হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে হইলে বেদ ও দর্শন পড়িতে হইবে এবং সমুদয় ভারতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের উপদেশাবলি জানিতে হইবে।

ভ্রাতৃগণ, যদি তোমরা গোতমসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বাৎস্যায়ন ভাষ্যের আলোকে 'আপ্ত' (১) সম্বন্ধে তাঁহার মত পাঠ কর, শবর ও অন্যান্য ভাষ্যকারগণের সাহায্যে যদি মীমাংসকগণের মত আলোচনা কর, অলৌকিক প্রত্যক্ষ ও আপ্ত সম্বন্ধে এবং সকলেই আপ্ত হইতে পারে কি না এবং এইরূপ আপ্তদিগের বাক্য বলিয়াই যে বেদের প্রামাণ্য, এই সকল বিষয়ে তাঁহাদের মত যদি অধ্যয়ন কর, যদি তোমাদের মহীধরকৃত যজুর্ব্বেদভাষ্যের উপক্রমণিকা দেখিবার অবকাশ থাকে, তবে দেখিবে, তাহাতে বেদ মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়মাবলি, এ বিষয়ে সুন্দর বিচার আছে। তাঁহারা তাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বেদ অনাদি অনন্ত।

'সৃষ্টির অনাদিত্ব' মত সম্বন্ধে বক্তব্য এই, ঐ মত, কেবল হিন্দুধর্ম্মের নহে; বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মেরও উহা একটী প্রধান ভিত্তি।

এক্ষণে, ভারতীয় সমুদয় সম্প্রদায়কে মোটামুটি জ্ঞানমার্গী বা ভক্তিমার্গী বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনারা শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরক ভাষ্যের উপক্রমণিকা পাঠ করেন, তবে দেখিবেন, তথায় জ্ঞানের 'নিরপেক্ষতা' সম্পূর্ণভাবে বিচারিত হইয়াছে আর এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মানুভূতি ও মোক্ষ কোনরূপ অনুষ্ঠান, মত, বর্ণ, জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে না। যে কোন ব্যক্তি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, (২) সেই ইহার অধিকারী। সাধনচতুষ্টয় সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধিকর কতকগুলি অনুষ্ঠানমাত্র।

---

(১) যিনি পাইয়াছেন,—যিনি আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সমুষ্যস্বভাবসুলভদুর্ব্বলতাবিমুক্ত পুরুষ।

(২) (১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক—ব্রহ্ম নিত্য ও জগৎ অনিত্য—এই

ভক্তিমার্গসম্বন্ধে বক্তব্য এই, বাঙ্গালী সমালোচকগণও বেশ জানেন যে, কতকগুলি ভক্তিমার্গের আচার্য্য বলিয়াছেন, মুক্তির জন্য জাতি বা লিঙ্গে কিছু আসিয়া যায় না, এমন কি, মনুষ্যজন্ম পর্য্যন্ত আবশ্যক নহে; একমাত্র প্রয়োজন—ভক্তি।

জ্ঞান ও ভক্তি সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং কোন আচার্য্যই এরূপ বলেন নাই যে, মুক্তিলাভে কোন বিশেষ মতাবলম্বীর, বিশেষ বর্ণের বা বিশেষ জাতির অধিকার। এ বিষয়ে 'অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ' (১) এই বেদান্তসূত্রের উপর শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্বকৃত ভাষ্য পাঠ কর।

সমুদয় উপনিষদ্ অধ্যয়ন কর; এমন কি, সংহিতা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান কর; কোথাও অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় মোক্ষের সঙ্কীর্ণ ভাব পাইবে না। অপর ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতির ভাব ত সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। এমন কি, অধ্বর্য্যুবেদের সংহিতাভাগের চত্বারিংশৎ অধ্যায়ের তৃতীয় বা চতুর্থ শ্লোকে আছে,—(যদি আমার ঠিক স্মরণ থাকে) ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম-সঙ্গিনাং। (২) এই ভাব হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বত্র রহিয়াছে। ভারতে কেহ কি কখন নিজ ইষ্টদেবতা নির্ব্বাচনের জন্য অথবা নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী হইবার জন্য নিগৃহীত হইয়াছেন, যতদিন তিনি সামাজিক নিয়ম মানিয়া চলিয়া-ছেন? সামাজিক নিয়মভঙ্গাপরাধে সমাজ যে কোন ব্যক্তিকে শাসন করিতে পারেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি, এমন কি, অতি নীচ পতিত পর্য্যন্ত কখন হিন্দুধর্ম্মমতে মুক্তির অনধিকারী নহে। এই দুইটী একসঙ্গে মিশাইয়া

তত্ত্বের বিচার। (২) ইহামুত্রফলভোগবিরাগ—সাংসারিক সুখে ও পারলৌকিক স্বর্গাদিভোগে বিতৃষ্ণা (৩) শমাদি ষট্সম্পত্তি (ক) শম—চিত্তসংযম (খ) দম—ইন্দ্রিয়সংযম (গ) উপরতি—সন্ন্যাস ও চিত্তবৃত্তির উপরম (ঘ) তিতিক্ষা—প্রতী-কার ও চিন্তাবিলাপশূন্য হইয়া সমুদয় দুঃখসহন (ঙ) শ্রদ্ধা—গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস (চ) সমাধান—ব্রহ্মে চিত্তের একাগ্রতা। (৪) মুমুক্ষুত্ব—মোক্ষলাভের জন্য প্রবল ইচ্ছা।

(১) বেদান্তসূত্র। ৩।৪।৩৬। ইহার অর্থ এই, শাস্ত্রে দেখা যায়, অনেক ব্যক্তি কোন আশ্রমবিশেষ অবলম্বন না করিয়াও জ্ঞানে অধিকারী হইয়াছিলেন।

(২) গীতাতেও আছে। অর্থ,—যাহারা কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া কর্ম্মে আসক্ত, সেই অজ্ঞগণকে জ্ঞানের কথা বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাদের মতি বিচলিত করিবেন না।

গোল করিও না। ইহার উদাহরণ দেখ। মালাবারে একজন চণ্ডালকে, একজন উচ্চবর্ণের লোকের সঙ্গে এক রাস্তায় চলিতে দেওয়া হয় না, কিন্তু সে মুসলমান বা খ্রীশ্চয়ান হইলে তাহাকে অবাধে সর্ব্বত্র যাইতে দেওয়া হয়, আর এই নিয়ম একজন হিন্দুরাজার রাজ্যে কত শতাব্দী ধরিয়া রহিয়াছে। ইহা একটু অদ্ভুত রকমের বোধ হইতে পারে, কিন্তু অতিশয় প্রতিকূল অবস্থার ভিতরও অপরাপর ধর্ম্মের প্রতি হিন্দুধর্ম্মের সহানুভূতির ভাব ইহাতে প্রকাশ করিতেছে।

হিন্দুধর্ম্ম এই এক বিষয়ে জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, এই এক ভাব প্রকাশ করিতে সাধুগণ সংস্কৃতভাষার সমুদয় শব্দরাশি প্রায় নিঃশেষিত করিয়াছেন যে, মানুষকে এই জীবনেই ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে হইবে আর অদ্বৈত বচনাবলি ইহার উপর এই ন্যায়সঙ্গত কথা যোগ দেন যে, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

এই মতের ফলস্বরূপ প্রত্যাদেশের অতি উদার ও মহান্ মত আসিতেছে; ইহা শুধু বৈদিক ঋষিগণ বলিয়াছেন, তাহা নহে; শুধু বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ (১) ও অপরাপর প্রাচীন মহাপুরুষেরা ইহা বলিয়াছেন, তাহা নহে, কিন্তু সে দিন সেই দাদূপন্থীসম্প্রদায়ভুক্ত ত্যাগী নিশ্চলদাসও নির্ভীকভাবে তাঁহার 'বিচারসাগর' গ্রন্থে ঘোষণা করিয়াছেন,

"যো ব্রহ্মবিদ্ ওই ব্রহ্ম তাকু বাণী বেদ।
সংস্কৃত ঔর ভাষামে করত ভ্রমকি ছেদ॥"

যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনিই ব্রহ্ম; তাঁহার বাক্যই বেদ; সংস্কৃত অথবা দেশপ্রচলিত যে কোন ভাষায় তিনি বলুন না কেন, তাহাতেই লোকের অজ্ঞান দূর হয়।

অতএব দ্বৈতবাদানুসারে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা এবং অদ্বৈতবাদমতে ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়াই বেদের সমুদয় উপদেশের লক্ষ্য আর অন্য যে কিছু শিক্ষা বেদে আছে, তাহা সেই লক্ষ্যে পঁহুছিবার সোপানমাত্র। আর ভগবান ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের এই মহিমা যে, তিনি নিজপ্রতিভাবলে ব্যাসের ভাবগুলি অদ্ভুত ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

নিরপেক্ষ সত্যহিসাবে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; আপেক্ষিক সত্য হিসাবে,

(১) মহাভারত, বনপর্ব্ব দেখ।

এই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বা ভারতবহির্ভূত প্রদেশস্থ সমুদয় সম্প্রদায়ই সত্য। তবে কোন কোনটী অপরগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই মাত্র। মনে কর, কোন ব্যক্তি বরাবর সূর্য্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপে তিনি সূর্য্যের নূতন নূতন দৃশ্য দেখিবেন। যতদিন না তিনি প্রকৃত সূর্য্যের নিকট পঁহুছিতেছেন, ততদিন সূর্য্যের আকার, দৃশ্য ও বর্ণ প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন হইতে থাকিবে। প্রথমে সূর্য্যকে তিনি একটী বৃহৎ বলের ন্যায় দেখিয়াছিলেন। তার পর উহার আকৃতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। সূর্য্য বাস্তবিক কখন তাঁহার প্রথমদৃষ্ট বলের মত বা তার পর পর দৃষ্ট সূর্য্যসমূহের ন্যায় নহে। কিন্তু তথাপি ইহা কি সত্য নহে যে, সেই যাত্রী বরাবর সূর্য্যই দেখিতেছিলেন, সূর্য্যব্যতীত অপর কিছু দেখেন নাই? এইরূপ, সমুদয় সম্প্রদায়ই সত্য, কোনটী প্রকৃত সূর্য্যের নিকটতর, কোনটা বা দূরতর। সেই প্রকৃত সূর্য্যই আমাদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

আর যখন এই সত্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেষ্টা একমাত্র বেদ—অন্যান্য ঐশ্বরিক ধারণা যাঁহারই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ দর্শনমাত্র; যখন 'সর্ব্বলোকহিতৈষিণী শ্রুতি' সাধকের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে যাইবার সমুদয় সোপানগুলি দিয়া লইয়া যান, আর অন্যান্য ধর্ম্ম যখন ইহাদের মধ্যে কোন একটী রুদ্ধগতি ও স্থিতিশীল সোপান মাত্র, তখন জগতের সমুদয় ধর্ম্ম এই নামরহিত, সীমারহিত, নিত্য বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত।

শত শত জীবন ধরিয়া চেষ্টা কর, অনন্ত কাল ধরিয়া তোমার অন্তরের অন্তস্তল অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তথাপি এমন কোন মহৎ ধর্ম্মভাব আবিষ্কার করিতে পারিবে না, যাহা এই আধ্যাত্মিকতার অনন্ত খনির ভিতর পূর্ব্ব হইতেই নিহিত নাই।

তথাকথিত হিন্দু পৌত্তলিকতাসম্বন্ধে বক্তব্য এই. প্রথমে গিয়া দেখ, ইহা কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে; প্রথমে জান গিয়া, উপাসকগণ কোথায় প্রথমে উপাসনা করেন, মন্দিরে, প্রতিমায় অথবা দেহমন্দিরে।

প্রথমে, নিশ্চয় করিয়া জান, তাহারা কি করিতেছে—(শতকরা নিরনব্বই জনের অধিক নিন্দুকই এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ) তখন উহা বেদান্তদর্শনের আলোকে আপনিই ব্যাখ্যাত হইয়া যাইবে।

তথাপি এ কর্ম্মগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। বরং মনু খুলিয়া দেখ—উহা প্রত্যেক বৃদ্ধকে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছে, আর তাহারা

উহা গ্রহণ করুক বা না করুক, তাহাদিগকে সমুদয় কর্ম্ম অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে।

সর্ব্বত্রই ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, এই সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানে সমাপ্ত হয়—'জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।'　　(ক্রমশঃ)

ধ্রুবচরিত্র।

পঞ্চম অঙ্ক।—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গোলোকধাম।

(লক্ষ্মী সিংহাসনে উপবিষ্ট ও সখীদিগের গীত)

সখীগণ। ভাস্‌ছে আকাশ নীল আলোকে।
হাস্‌ছে শশী, পূর্ণজ্যোতিঃ, সেই পুলকে॥
তপন তারা গ্রহের মেলা,
ছুটোছুটি জ্যোতির খেলা,
দূরে ছুধে মেঘের মালা,
উঠ্‌ছে তড়িৎ আভা, চমকে চমকে॥
কোথা ভুবন হোচ্ছে বিলয়,
কোথা নব ভুবন উদয়,
অনন্ত লীলা তরঙ্গ বয়,
তোমারই হরি নয়ন পলকে॥

লক্ষ্মী। প্রিয় সখীগণ!
নাথ নাহি আসে কেন?
বহু দিন ধরি শূন্য সিংহাসন;
শূন্য এ গোলোকপুরী প্রাণেশ বিহনে।

ভক্তি। শূন্য নহে কিন্তু হৃদয় তোমার;
পূর্ণ নারায়ণ রূপে।
দিবানিশি, কমলাহৃদয়
ভাবে সেই চরণকমল।
হের, হের—নীলাম্বরে
নীলজ্যোতিঃ সহসা প্রকাশে;

আসে বুঝি হরি ;
ক্রমে জ্যোতিঃ উজ্জ্বল উজ্জ্বলতর।

(নারায়ণের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। নাথ! অতীব কাতরা দাসী
বহু দিন হোতে নাহি হেরি শ্রীচরণ।

নারা। প্রিয়ে! তোমা চেয়ে
কাতর হোয়েছে প্রাণ প্রিয় ভক্ত তরে।

লক্ষ্মী। কোন্ ভক্ত, প্রভো!
ভক্তিডোরে পুনঃ বাঁধিল তোমায় ?

নারা। দুর পৃথ্বীতলে, যমুনাপুলিনে,
মধুবন মাঝে,
ধ্রুব নামে পঞ্চমবর্ষীয় রাজার কুমার এক,
ডাকিছে আমায়,
অনাহারে, অনিদ্রায় হাহাকার কোরে।
তার তরে ক্ষণমাত্র স্থির না থাকিতে পারি।

লক্ষ্মী। প্রভো! অতি বিস্ময়ের কথা!
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু
করিয়াছে উচাটন তোমা।
কত শত যোগী ঋষি
সহস্র বৎসর ধরি
যে চরণ করি ধ্যান না পায় দর্শন,
রাজার কুমার ধ্রুব, পঞ্চম বরষে,
লভিবে তা কোন্ পুণ্যবলে ?

নারা। প্রিয়ে!
পূর্ব্বজন্মে ছিল ধ্রুব ব্রাহ্মণকুমার।
ভক্তি সহকারে
করিত সে পিতৃমাতৃসেবা ;
আমাতে একাগ্র মতি করিয়া স্থাপন,
নিজ ধর্ম্ম প্রাণপণে করিত পালন।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সেই পুণ্যবলে,

আর এ জন্মের তীব্র সম্বেগ আবেগে,
করিবেক সিদ্ধিলাভ পঞ্চম বরষে।

লক্ষ্মী। প্রভো! ব্রাহ্মণের বংশে কেন না জনমি,
ক্ষত্রিয় রাজার বংশে জনমিল ধ্রুব?

নারা। প্রিয়ে! পূর্ব্বজন্মে
ধ্রুবের যৌবনকালে,
কোন এক রাজপুত্র মিত্র ছিল তার;
দেখিয়া ঐশ্বর্য্য তার, ধ্রুবের হৃদয়ে,
রাজপুত্র হব বলি জনমে বাসনা;
সেই বাসনার বলে
ক্ষত্রিয় রাজার বংশে লয়েছে জনম।
প্রিয়ে! ভক্ত দুঃখ হেরি
হৃৎপিণ্ড চূর্ণ হোয়ে যায়।
সুধু মুখে তার কোথা পদ্মপলাশলোচন;
সিংহে ব্যাঘ্রে নাহি করে ভয়,
মাতৃস্তন ত্যজি আমার চরণ সুধা,
সদা করিতেছে পান।
ঊর্দ্ধমুখে, আকাশের পানে চেয়ে,
দিবানিশি ডাকিছে আমায়
ভক্তি বারিধারা
বহে অবিরত নয়ন যুগল হোতে।
ভক্ত তরে প্রিয়ে! বিদীর্ণ হোতেছে প্রাণ।
দেখিয়াছি বহু ভক্ত
অনাদি অনন্ত কাল হোতে,
কিন্তু দেখি নাই কভু, শিশুহৃদে,
হেন ভক্তিস্রোত বহিতে প্রবল।

লক্ষ্মী। আহা! আহা! আর কেন তবে নাথ!
শিশু প্রতি হইছ নিঠুর?

নারা। ভক্ত প্রতি নিঠুর বোলো না প্রিয়ে!
বড়ই আঘাত লাগিতেছে প্রাণে।

একটু সাধন চাই ;
সাধন না হোলে,
নাহি পায় দরশন।

লক্ষ্মী। প্রভু! শুনিয়া শিশুর কঠোর সাধনা
বড়ই কাতর হইতেছে প্রাণ।
আজ্ঞা দেহ নাথ,
নিজে আমি যাই মধুবনে,
বড় সাধ
তোমার এমন ভক্তে
স্তনপান করাই আদরে কোলে লয়ে।

নারা। আনন্দ প্রবাহ ঢালিলে হৃদয়ে
ভক্তে মম করুণা প্রকাশি।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। জয় জয় কমলা, কমলারমণ,
জয় জয় পুরুষ প্রকৃতি মিলন।
অনন্ত বিশ্বের তুমি মা প্রকৃতি,
পরমেশ্বর হরি চিতি শকতি,
যুগল চরণে করি গো প্রণতি,
যুগল মিলনে বিশ্বের সৃজন।
রবি শশী গ্রহ চরণে গড়ায়,
ফুটিছে মুদিছে ঐ রাঙ্গা পায়,
জীব কুল স্রোত অবিরল ধায়,
করুণা সঞ্চারি করিছ পালন।
পুনঃ শূন্যে হবে বিলীন যখন,
ওঁকার রূপেতে তুমিই তখন,
ভাসিবে একাকী ব্যাপি ত্রিভুবন,
নিভিয়া যাইবে শশাঙ্ক তপন।

নারা। কি হেতু আসিলে গোলোকে দেবেন্দ্র ?
কুশলে আছে ত ইন্দ্রত্ব তোমার ?

ইন্দ্র। ভগবন্! এখন কুশল বটে ;

কিন্তু ভাবী অমঙ্গল ভয়ে,
শঙ্কিত হোতেছে প্রাণ।

নারা। কিবা তব শঙ্কার কারণ,
কহ দেবরাজ!

ইন্দ্র। নিবেদি চরণে শ্রীমধুসূদন!
দেখিলাম পৃথ্বীতলে,
মধুবনে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু
করিছে কঠোর তপ।
তপোতেজে তার
বিশ্ব বুঝি উলটিয়া যায়।
লুপ্ত হয় বুঝি ইন্দ্রত্ব আমার;
নিষ্প্রভ তপন তাপসের তেজে,
রুদ্ধশ্বাস জীবলোক।
শঙ্কার কারণ কহিনু চরণে;
ত্রাণ কর প্রভো! অনাথতারণ!

নারা। সত্য বটে ইন্দ্র!
কিন্তু নাহি ভয় তব—
যাবে না ইন্দ্রত্ব।
ধ্রুব তরে, ধ্রুবলোক নামে
নবলোক হইছে সৃজন।
সপ্তর্ষি মণ্ডল
ঘেরি তাহে করিছে ভ্রমণ।
বহু তপস্যার ফলে,
ধ্রুব শিশু অবশেষে লভিবে সে লোক।
নির্ভয়ে ইন্দ্রত্ব ভোগ কর গে দেবেশ।

ইন্দ্র। প্রভো! পাইয়া আশ্বাস,
আশ্বস্ত হইল প্রাণ।
দেহ অনুমতি
যাই তবে অমর নগরে।
নমি দোঁহা চরণ যুগলে। (প্রস্থান)

ভক্তি ইত্যাদি। কমলাকরুণাস্রোত বহিল উজান।
নীরবে কেশব আঁখিনীরে ভাসমান॥
ফুল ফুটেছে মধুবনে,
স্রোত ছুটেছে ফুলের পানে,
মাত্‌লো জগৎ ফুলের ঘ্রাণে, বিশ্বপ্রাণে দিচ্ছে টান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মধুবনের এক অংশ।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। মধুর এ মধুবনে বিরাজিত শ্রীমধুসূদন,
প্রকৃতি পোরেছে যেন চির শান্তি আবরণ।
শান্তি ধারা ঝরে নিশির শিশিরে,
শান্তি বহে ঐ সুধীর সমীরে,
শান্তি স্রোত চলে যমুনার নীরে,
শান্ত কানন আজি যোগে মগন।
শান্তি হোতে উঠি অনাদি ওঁকার,
কাননে গগনে হইছে প্রচার
সে ওঁকার বীণা কর্ রে, ঝঙ্কার,
বলি ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ নারায়ণ।
বিহ্বল বিভুপ্রেমে যমুনা জলে,
ওঁকার নিনাদ তরঙ্গ উথলে,
ফল ফুল দুলে দুলে ওঁ ওঁ বলে,
ওঁ নারায়ণ বল আমার মন।
অনন্ত আকাশ রবি তারা সোম,
তরু শিরে লতা কুঞ্জে বিহঙ্গম,
অচল নির্ঝর বল ওঁ ওঁ
বল প্রতিধ্বনি ওঁ নারায়ণ।
ছয় মাস প্রায় হইল বিগত,
করিছে কঠোর তপ কোমল বালক।

হেরিয়া ধ্রুবের অদ্ভুত তপস্যা,
ত্রিভুবন হোয়েছে বিস্মিত।
তপোতেজে তার
স্থাবর জঙ্গমময় অনন্ত প্রকৃতি
হয়েছে কম্পিত।
ধ্রুবের হৃদয়ে
ভক্তিস্রোত বহিছে প্রবল ;—
কিন্তু যতক্ষণ ভগবান তরে
ব্যাকুলতা না আসিবে ধ্রুব হৃদে—
নির্ম্মল নিষ্কাম না হবে হৃদয়,
ততক্ষণ নাহি ববে হৃদয়ে তাহার
সাত্বিক ভক্তির স্রোত।
হইলে সাত্বিক ভক্তি হৃদয়ে উদয়,
অহৈতুকী ভক্তি আসিবে আপনি।
সেই ভক্তি মুক্তির সোপান ;
প্রকৃত চরম ভক্তি তাহা।
সেই ভক্তিবলে
নারায়ণ দরশন হইবে ধ্রুবের।
যাই এবে যথা ধ্রুব মগ্ন তপস্যায় ;
দেখি গিয়া ধ্রুবের অবস্থা। (প্রস্থান)

একখানি পত্র।

ভাই, এই সেই বৃন্দাবন--যেখানে গোলোকবিহারী হরি ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী হইয়াছিলেন।

এই সেই যমুনাপুলিন--যেখানে কৃষ্ণবিরহিণী রাই উন্মাদিনী হইয়াছিলেন।

এই সেই বংশীবট—যেখানে ঠাকুর বাঁশী বাজাইয়াছিলেন—যে বাঁশীর রবে যমুনার জল উজান বহিত, রাধা পাগলিনী হইত, গোপীগণ ধেয়ে যাইত, রাই কুটিলার যন্ত্রণা সহিত, আয়ান ঘোষ লুকাইয়া রহিত,—রাইকে পরীক্ষা করিতে।

এই সেই কুঞ্জবন,তাতে আবার বসন্তকাল,যাহার বিষয় কবি বলিয়াছেন,—

"এ সময়ে যদি কুঞ্জবনে যাও,
দেখে শুনে আর আসিতে না চাও।"

এই সেই নিধুবন—যেখানে গোপীগণসহ ঠাকুর খেলা করিয়াছিলেন, যেখানে রাধার পুষ্পশয্যা তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে—যেখানে এখনও যাত্রিগণ দুই চারি খানা ইটু দিয়া খেলার ঘর তৈয়ার করে।

এই সেই মদনমোহন—যাঁহার রূপে মদন মোহন।

গোবিন্দের বিষয় কি বলিব, যাঁহার দর্শনে এ পাষাণও দ্রব হইয়াছিল, চক্ষে বারিধারা বহিয়াছিল।

গোপীনাথের মাহাত্ম্য গোপীগণ জানেন, এ অধম হইতে তাহা কিরূপে বর্ণন হইবে?

বৃন্দাবন দর্শন করিলাম, এক আধ কথা লিখিতে হয়, তাই লিখিলাম। নতুবা বৈষ্ণব-বেদ ভাগবত যে স্থানের বর্ণন করিতে গিয়া, চকিত, ত্রস্ত, ভীত ও বিমোহিত হইয়াছেন; এ তুচ্ছাতিতুচ্ছ অধম কিরূপে তাহার সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে সমর্থ হইতে পারে?

এখন ঠাকুর বৃন্দাবনলীলা সমাপন করিয়া মথুরায় চলিলেন—যেখানে, জন্মস্থান কংসকারাগার গৃহটী, যাই যাই করিয়া নাম মাত্র রহিয়া গিয়াছে, যেখান হইতে ঠাকুরকে লইয়া বসুদেব পলাইয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদের ভাগ্যে বা কারাগারই পলায়! কংসবেদীও তথৈবচ—সহরের এক প্রান্তরে ধূ ধূ করিতেছে। তবে যাত্রিপীড়ন-পরিপূরিত হিসাবের খাতাটা সেখানেও পাণ্ডাদের হাতে আছে। আর আছেন, পাতিত কংসোপরি সগদোত্তোলিত-হস্ত মৃন্নির্ম্মিত কৃষ্ণ বলরাম।

অশুষ্কা অভয়া মাথুরীয়া যমুনা, অতীব সুন্দরী, মনোলোভা, নয়নরঞ্জনী, সুরঙ্গ-তরঙ্গ-ভঙ্গাঙ্গা।

কুব্জানাথের অপরূপ রূপে বুঝি মদনমোহনও মোহিত হন। সমস্তই দর্শন হইল, কেবল মথুরানাথের নহে। জানি না, কি দুরদৃষ্ট ছিল, যতবার যাই, ততবারই কপাট বন্ধ। ভাবিলাম, যেই কুব্জানাথ, যেই গোবিন্দ, যেই মদনমোহন, সেই ত মথুরানাথ, একের দর্শনেই সর্ব্বদর্শন সিদ্ধি।

বৃন্দাবনে ১৫ দিন পূর্ব্বেই দোল আরম্ভ হয়। একাদশীর দিন গোবিন্দের দোল দর্শন করিলাম। বড় রাস্তায় নিবিড় আবিরে রক্তবর্ণের কুজ্ঝটিকা, মধ্যে মধ্যে অভ্রচূর্ণ দ্বারা শ্বেতায়মান হইতে লাগিল। রাস্তায় অজস্রলোক;

কিন্তু কাহারও কাহাকেও দেখিবার যোটী নাই। সর্ব্বময় আবিরে অন্ধকার। হইবেই না কেন? যে বৃন্দাবন লীলার দোল উৎসবে আজ সমগ্র ভারত আনন্দিত, সেই বৃন্দাবনে কেনই বা ঈদৃশ আনন্দ না হইবে? তবে তামসিক লোকদিগদ্বারা অশ্লীলতাটুকুও বেশ ঢুকিয়াছে।

পূর্ণানন্দ লইয়া গত রবিবার অপরাহ্ন ৫টার সময় ৺কাশীধামে প্রবেশ করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে আপনার পত্র পাইয়া অন্য ভাব আসিল, আপনাকে মনে হইল, পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল; চিঠিখানা দেখিয়া বুঝিলাম, আপনার ন্যায় লোকের যোগ্যই ইহা লিখিত হইয়াছে। সংসার-সুখকে এরূপ অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করিতে না পারিলে আর ঐশ্বরীয় সুখের আশা আছে?

যে কথা লিখিয়াছেন—"একজন ভগবানের নিত্য বিলাসভূমিতে, আর একজন পিশাচের ক্রীড়াস্থলে! একজন কাশীতে, আর একজন সেখের-নগরেতে। তৃফাৎ অল্পই * * *।" সকলই ঠিক বটে; কিন্তু স্বর্গে ইন্দ্রের বড় ভয়---কখন তাঁহার রাজত্ব যায়—কখন তাঁহাকে দৈত্যগণ আক্রমণ করে—কখন তাঁহাকে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি" হইতে হয়। মর্ত্ত্যবাসি-জনগণের আশা আছে—এক দিন দুঃখের শান্তি হইবে। এক দিন চন্দ্রত্ব, ইন্দ্রত্ব, এমন কি, মোক্ষপদও লাভ হইতে পারে; কিন্তু ইন্দ্রের সে আশা অতি অল্প। তিনি ভোগেই মত্ত। এখন আমি ৺ কাশীধামে আছি। পরম সুখ ভোগ করিতেছি। কিন্তু ভয় দৈত্য (রিপু) গণের—ভয় মর্ত্ত্য পতনের (কুদেশ গমনের)—ভয় পুণ্যক্ষীণতার।

যিনি প্রহ্লাদের কান্না ঘুচাইয়াছিলেন—কোলে করিয়া, ধ্রুবের কান্না ঘুচাইয়াছিলেন -বর দান করিয়া, দ্রৌপদীর কান্না ঘুচাইয়াছিলেন—বস্ত্র দান করিয়া, অর্জ্জুনের কান্না ঘুচাইয়াছিলেন—সারথী হইয়া, তিনি কলির কাঙ্গাল আপনার আমার কান্না যে শীঘ্রই ঘুচাইবেন, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? যদি কাঁদার মত কাঁদিতে পারি। আমি অনেক কাঁদা কাঁদিয়াছিলাম, তাই এখন পরম সুখ লাভ করিতেছি। তাই বলি ভাই, কান্না কখনও বিফল নহে। এস ভাই, সকলে মিলিয়া কাঁদি, যাহাতে আর জন্মজন্মান্তর কাঁদিতে হইবে না।

আপনার সেই ভালবাসার মোক্ষদা।

নাস্তিক।

(শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।)

দারাপুত্র পরিজনে উজ্জ্বল ভবন,
অর্থের অভাব নাই, সম্মান সকল ঠাঁই,
চেষ্টাবলে করিয়াছি উন্নতি সাধন;
কে ঈশ্বর? দুর্ব্বলের কল্পিত সৃজন!

আসিয়াছে ঝড়বৃষ্টি, নাস্তিক প্রান্তরে,
প্রলয়ের যেন শব্দ, বজ্রনাদে জীব স্তব্ধ,
উপায়বিহীন পান্থ আতঙ্কে শিহরে;
নহে স্থির—দীননাথে প্রত্যয় না করে!

জনপূর্ণ প্রাসাদেতে আজি হাহাকার!
এক মাত্র বংশধরে, শমন লয়েছে হরে,
বিকৃত-মস্তিষ্ক করে নাস্তিক চীৎকার,
ঈশ্বরে নির্ভর নাই কি করিবে আর!

নিশীথে সর্ব্বস্ব দস্যু করিল লুণ্ঠন;
নাস্তিক উন্মত্ত ধায়, প্রাণ ত্যজিবারে চায়,
চিরকাল করিয়াছে অর্থ উপার্জ্জন,
অর্থ বিনা শ্রেয়ঃ তার প্রাণ বিসর্জ্জন।

ঈশ্বরে প্রত্যয় যদি থাকিত তোমার,
অশান্তি লইয়া বুকে, জীবন কি যেত দুখে?
শান্তিহীন হইত কি হৃদয়-আগার,
আক্রমিতে পারিত কি অন্তরে আঁধার?

তিনি পিতা, মোরা সবে তাঁহার তনয়,
এ বিশ্বাস হৃদে যার, সুখে বা বিষাদে তার,
নির্ভয় অন্তর সদা শান্তির আলয়!
নহিলে নাস্তিক সম শুষ্ক মরুময়!!

ভাষ্যমূলম্।—ক্ঙিতি প্রতিষেধে তন্নিমিত্তগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ক্ঙিন্নিমিত্তে যে গুণবৃদ্ধী প্রাপ্নুতস্তে ন ভবত ইতি বক্তব্যম্।

কিং প্রয়োজনম্।

ভাষ্যানুবাদ।—'ক্ঙিতি চ' সূত্রের স্বভাবতঃ এইরূপ অর্থ হয় যে, গ ইৎ, ক ইৎ এবং ঙ ইৎ পরে থাকিলে, গুণ এবং বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু বার্ত্তিককার বলিতেছেন যে, এই সূত্রে, প্রতিষেধ বিধয়ে 'নিমিত্ত' শব্দ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে অর্থ এইরূপ হইবে যে, গ, ক, এবং ঙ ইৎ প্রযুক্ত, যে সকল স্থলে, গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত, তাহা হইবে না; এইরূপ বলা উচিত।

তাহার (নিমিত্ত গ্রহণের) প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূলম্।—উপধারোরবীত্যর্থম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ—উপধার জন্য এবং 'রোরবীতি' র জন্য। *

ভাষ্যমূলম্।—উপধার্থং রোরবীত্যর্থং চ।

উপধার্থং তাবৎ। ভিন্নঃ। ভিন্নবানিতি॥ কিং পুনঃ কারণং ন সিধ্যতি॥ ক্ঙিতীত্যুচ্যতে। যত্র ক্ঙিত্যনন্তরো গুণো ভবিষ্যতি তত্রৈব স্যাৎ। চিতম্। স্তুতম॥ ইহ তু ন স্যাদ্। ভিন্নঃ ভিন্নবানিতি।

নন্থ চ যস্যগুণ উচ্যতে তং ক্ঙিৎপরত্বেন বিশেষয়িষ্যামঃ। পুগন্তলঘূপধস্যাঙ্গস্য গুণ উচ্যতে তচ্চাত্র ক্ঙিৎপরম্।

পুগন্তলঘূপধস্যেতি নৈবং বিজ্ঞায়তে পুগন্তাঙ্গস্য লঘূপধস্য চেতি॥ কথং তর্হি॥ পুকি অন্তঃ পুগন্তঃ লঘ্বীউপধা লঘূপধা পুগন্তশ্চ লঘূপধা চ পুগন্তলঘূপধং পুগন্তলঘূপধস্যেতি॥ অবশ্যং চৈতদেবং বিজ্ঞেয়ম্। অঙ্গবিশেষণে সতীহ প্রসজ্যেত। ভিনত্তি। ছিনত্তীতি।

রোরবীত্যর্থং চ। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভোরোরবীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—উপধাকার্য্য সিদ্ধির জন্য এবং 'রোরবীতি' প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য সূত্রে, 'নিমিত্ত' গ্রহণ কর্ত্তব্য।

উপধা কার্য্যের জন্য, যথা,—'ভিন্নঃ,' 'ভিন্নবান্' ইত্যাদি প্রয়োগ যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে।

'নিমিত্ত' শব্দের গ্রহণ না করিলে, কি কারণে বা ইহারা সিদ্ধ হইবে না?

এই সকল সিদ্ধ না হইবার কারণ এই,—সূত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, —গ, ক এবং ঙ ইৎ পরে থাকিলে, গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ হয়। সুতরাং এতদ্দ্বারা

এই রূপ অর্থই প্রকাশিত হইবে যে, যে স্থলে গ্, ক্ বা ঙ্ ইৎএর অব্যবহিত পূর্ব্বে গুণ কর্ত্তব্য রহিয়াছে, সেই স্থলেই (নিষেধ) হইবে। যেমন ;—চিতম্ ('চিঞ্' ধাতু'ক্ত' প্রত্যয়), স্তুতম্ ('স্তুঞ্' ধাতু 'ক্ত' প্রত্যয়) এসকল স্থলে, 'ক্' ইৎ বিশিষ্ট 'ক্ত' প্রত্যয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে, 'চি' এবং 'স্তু'ধাতুর 'ই' এবং 'উ'কার থাকাতে যে, 'সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রানুসারে গুণ প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহাদেরই গুণের নিষেধ করিল। কিন্তু এই সকল স্থলে নিষেধ হইবে না। যেমন,—ভিন্ন ('ভিদির্' ধাতু'ক্ত'প্রত্যয়ে সিদ্ধ) ভিন্নবান্ ('ক্তবতু' প্রত্যয়ে সিদ্ধ)। এই সকল স্থলে 'ভিদ' ধাতুর পরে, 'ক'ইৎ বিশিষ্ট 'ক্ত'প্রত্যয় হইলে ও 'দ'কার ব্যবধানে থাকাতে, 'পুগন্তলঘূপধস্য' সূত্রানুসারে যে, 'ই'কারের গুণ প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহার নিষেধ হইবে না ; সুতরাং 'ভিন্ন' প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

যদি বল যে, যাহার গুণ বলা হইয়াছে, তাহারই ক্, গ্, ঙ্, ইৎ পরে থাকিলে নিষেধ হয় ; এইরূপ বিশেষণ করিব। যেমন,—'পুক্'অন্ত এবং লঘুউপধা-বিশিষ্ট অঙ্গের গুণ বলা হইয়াছে। তাহা এই স্থলে, ক্, গ্, ঙ্, ইৎপর বিশিষ্ট হইলে হয় না, এইরূপ হইবে।

'পুগন্তলঘূপধস্য' এই সূত্রের অর্থ এইরূপ জানিবে না যে,—'পুগন্ত যে অঙ্গ, তাহার এবং লঘুউপধার,' এরূপ সমাস করা হইয়াছে।

তবে কিরূপ ?

পুকেতে যে অন্ত সে পুগন্ত ; আর, লঘু যে উপধা, সে লঘূপধা। পুগন্ত এবং লঘূপধা, পুগন্তলঘূপধ, তাহার, পুগন্তলঘূপধের।

'পুগন্তলঘূপধস্য চ' সূত্রে, এইরূপ বিগ্রহবাক্য, অবশ্যই জানিতে হইবে। নতুবা 'অঙ্গের' বিশেষণ করিলে, 'ভিনত্তি,' 'ছিনত্তি' প্রভৃতি স্থলেও ('ই'কারের) গুণ প্রসঙ্গ হইবে।

'রোরবীতি' প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য যে, 'নিমিত্ত' গ্রহণ কর্ত্তব্য ; তাহার দৃষ্টান্ত যথা ;—'ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি' এই স্থলে, 'রোরবীতি'শব্দ, 'রু'ধাতুর উত্তর 'যঙ্' প্রত্যয় করিয়া 'তিপ্' প্রত্যয় করিলে, 'যঙ্' এর 'ঙ্'ইৎ হওয়াতে 'রু'ধাতুর 'উ'কারের গুণ হইত না, সুতরাং 'রোরবীতি' প্রয়োগও সিদ্ধ হইত না। কিন্তু নিমিত্ত গ্রহণ করাতে ; যেহেতু এই স্থলে, 'যঙ্' নিমিত্ত গুণ হয় নাই, সেই হেতুই 'ঙ'ইৎ প্রযুক্ত গুণের নিষেধও হইবে না। (এই স্থলে, 'তিপ্' নিমিত্তই গুণ হইয়াছে)।

ভাষ্যমূলম্।—যদি তন্নিমিত্তগ্রহণং ক্রিয়তে, শচঙন্তে দোষঃ, ব্রিয়তি। পিয়তি। ধিয়তি॥ প্রাচুক্রবৎ। প্রাসুস্রুবৎ। অত্র ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি এই সূত্রে 'নিমিত্ত' গ্রহণ করা যায়; তবে, 'শচঙন্তে' দোষ হইবে। যেমন;—'রি'ধাতুর উত্তর 'তিপ্' প্রত্যয় করিলে, 'কর্ত্তরি শপ্' সূত্রানুসারে যেখানে 'শপ্' আগম হইবে; সেখানে, 'রি'র ইকারের 'ইয়ঙ্' আদেশ না হইয়া 'গুণ' হইবে। অতএব, ('রি'ধাতুর) রিয়তি, ('পি'ধাতুর) পিয়তি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না। এইরূপ ('প্র'পূর্ব্বক 'দ্রু' ধাতুর উত্তর 'লুঙ্' এর 'তিপ্' প্রত্যয় করিলে, 'চঙ্' হইলে, 'চঙ্' এর'ঙ' ইৎ হওয়াতে, গুণএর নিষেধ হইবে না; সুতরাং প্রাসুস্রুবৎ রূপও সিদ্ধ হইবে না) 'প্র'পূর্ব্বক 'দ্রু'ধাতুর উত্তর 'প্রাদুদ্রুবৎ' এবং 'প্র'-পূর্ব্বক 'স্রু'ধাতুর উত্তর 'প্রাসুস্রুবৎ' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—শচঙন্তস্যান্তরঙ্গলক্ষণত্বাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—'শ'কারান্ত এবং চঙন্তের, অন্তরঙ্গ লক্ষণ প্রযুক্ত 'গুণ' হইবে না। *

ভাষ্যমূলম্।—অন্তরঙ্গলক্ষণত্বাদত্রেয়ঙুবঙোঃ কৃতয়োরনুপধাত্বাদ্ গুণো ন ভবিষ্যতি। এবং ক্রিয়তে চেদং তন্নিমিত্তগ্রহণং ন চ কশ্চিদ্দোষো ভবতি। ইমানি চ ভূয়স্তন্নিমিত্তগ্রহণস্য প্রয়োজনানি। হতো হথঃ। উপোয়তে। ঔয়ত। লোয়মানিঃ। পৌয়মানিঃ। নেনিক্ত ইতি।

নৈতানি সন্তি প্রয়োজনানি। ইহ তাবৎ হতোহথ ইতি। প্রসক্তস্যানভিনিবৃত্তস্য প্রতিষেধেন নিবৃত্তিঃ শক্যা কর্ত্তুম্। অয়ং চ ধাতূপদেশাবস্থায়ামেবাকারঃ। ইহচোপোয়তে ঔয়ত লোয়মানিঃ পৌয়মানিরিতি। বহিরঙ্গে গুণবৃদ্ধী। অন্তরঙ্গঃ প্রতিষেধঃ। অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে। নেনিক্ত ইতি পররূপেণ ব্যবহিতত্বান্ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—শপ্ এবং চঙ্ প্রত্যয় পরে থাকিলেও কোন দোষ হইবে না। কারণ, 'রি'ধাতুর উত্তর 'শপ্' প্রত্যয় করিলে, এবং 'প্র'পূর্ব্বক 'দ্রু'ধাতুর উত্তর 'লুঙ্' এর 'চঙ্' করিলে, 'ইয়ঙ্' আদেশ (১) অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রথমতঃ, 'ইয়ঙ্' আদেশ এবং 'উবঙ্' আদেশ হইবে। এইরূপে 'রিয়তি' প্রভৃতি স্থলে, 'ইয়ঙ্' বা 'উবঙ্' আদেশ হইবার পরে, 'ই'বা 'উ'উপধা না হওয়াতে গুণও হইবে না।

এইরূপে এই 'তন্নিমিত্ত' গ্রহণ করা হইবে; এবং কোন দোষও হইবে না,অথচ 'নিমিত্ত'গ্রহণের,রাশি রাশি এই সকল প্রয়োজন রহিয়াছে,যেমন;—

হতঃ ('হন্' ধাতু 'তস্' বা 'ক্ত'), হথঃ ('হন্' ধাতু 'থস্'), উপোয়তে (উপ-পূর্ব্বক আঙ্-পূর্ব্বক 'বেঞ্' ধাতু কর্ম্মণি 'যক্' 'ত' আত্মনেপদের রূপ), ঔয়ত (আ—বেঞ্+ত), লৌয়মানিঃ ('লূয়মান' শব্দ অপত্যার্থে 'ঞি') পৌয়মানিঃ পূয়মান+ঞি), নেনিক্ত ('নিজির্'ধাতু, যঙন্ত'ক্ত') ইত্যাদি।

এই সকল কথনও ('নিমিত্ত'গ্রহণের) প্রয়োজন হইতে পারে না।

যদি বল যে, 'হতঃ' 'হথঃ' এই সকল প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে? অর্থাৎ 'নিমিত্ত' গ্রহণ যদি না করা যায়, তবে সাধারণতঃ এরূপ অর্থ হইবে যে, গ, ক, এবং ঙ ইৎ পরে থাকিলে, তাহার পূর্ব্বে, গুণসংজ্ঞক কোনও বর্ণই থাকিতে পারিবে না; তবে 'ঙিৎ' (১) 'তস্' 'থস্' প্রভৃতি প্রত্যয়ের 'ত' 'থ' পরে থাকিলে, গুণবাচক 'হন' ধাতুর 'হ'কারস্থিত গুণবাচক অকার, কিরূপে অবস্থান করিবে?

এই স্থলে কোন দোষ হইবে না। কারণ, কোনও স্থলে যদি কোনও পদার্থের বা আদেশের প্রসক্ত অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়, অথচ তাহা, অনভিনিবৃত্ত অর্থাৎ অনিষ্পন্ন হয়; তবেই তাহার প্রতিষেধের দ্বারা, নিবারণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। কিন্তু এই স্থলে (হন) ধাতুর উপদেশ কালেই ('হ'কারে) অকার রহিয়াছে। অতএব এই স্থলে অকারের প্রাপ্তিও নাই, নিষেধও হইবে না।

---

(১) সার্বধাতুকমপিৎ।১।২।৪ 'প'কার ইৎ হয় নাই এমন যে সার্বধাতুক, তাহার 'ঙ' ইৎ এর ন্যায় কার্য্য হয়। এই জন্য তস্, থস্ প্রভৃতি প্রত্যয় অপিৎ সার্বধাতুক হওয়াতে, ঙিৎ হইয়াছে।

উপোয়তে, ঔয়ত, লৌয়মানিঃ, পৌয়মানিঃ এই সকল স্থলেও 'যক্' প্রত্যয়ের 'ক'কার ইৎবিশিষ্ট 'য'কার পরে আছে বলিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞক 'ও'কার এবং 'ঐ'কার নিবৃত্তি হইবে না। কারণ, 'আদ্‌গুণঃ' প্রভৃতি সূত্রানুসারে, যে সকল গুণ বা বৃদ্ধি সংজ্ঞা হইয়াছে, তাহারা "বহিরঙ্গ' এবং নিষেধ কার্য্য অন্তরঙ্গ। অন্তরঙ্গ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গ শাস্ত্র অসিদ্ধ হয়। এজন্য অন্তরঙ্গ কার্য্য বহিরঙ্গ কার্য্যকে দেখিতে পায় না বলিয়া গুণ এবং বৃদ্ধি হইল।

'নেনিক্ত' এই স্থলে 'ক' ইৎবিশিষ্ট 'ক্ত' প্রত্যয় পরে থাকিলেও 'গুণ' বাচক 'নে'র একারের পরে, বর্ণ দ্বয় ব্যবধান থাকাতে গুণের নিষেধ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—উপধার্থেন তাবন্নার্থঃ। ধাতোরিতি বর্ত্ততে। ধাতুং ক্ঙিৎ-পরত্বেন বিশেষয়িষ্যামঃ।

যদি ধাতুর্বিশেষ্যতে বিকরণস্ত ন প্রাপ্নোতি। চিনুতঃ। সুনুতঃ। লুনীতঃ। পুনীত ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—উপধাকার্য্যের জন্যও 'নিমিত্ত' শব্দগ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, ('ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে' সূত্র হইতে 'ধাতু' শব্দের অনুবৃত্তি আনিয়া) 'ধাতুর'ত বর্ত্তমানই আছে। সেই 'ধাতু' শব্দকে, গ্‌ক্‌ঙ্‌ ইৎ পরে থাকিলে, গুণ বৃদ্ধি কার্য্য নিষেধ হয়, এইরূপ বিশেষণ করিব। এক্ষণে এইরূপ অর্থ হইবে যে, ধাতুর পরে ক্‌, গ্‌, ঙ্‌ ইৎ থাকিলে গুণ এবং বৃদ্ধি হয় না।

যদি ধাতুর বিশেষণ করা যায়; বিকরণের প্রাপ্তি হইবে না? যেমন,—চিনুতঃ ('চিঞ্‌' চয়নে, স্বাদিগণীয় ধাতু বলিয়া, 'শ্নু' বিকরণ হইয়াছে, অতএব 'শ্নু' ধাতু না হওয়াতে, তাহার 'উ'কারের গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ হইবে না), প্রত্যয়ের সুনুতঃ ('ষুঞ্‌' অভিষবে ধাতু), লুনীতঃ ('লূঞ্‌' লবনে ক্র্যাদি গণীয় 'শ্না' বিকরণবিশিষ্ট ধাতু), পুনীতঃ ('পূঞ্‌' পবনে) ইত্যাদি।

ভাষ্যমূলম্।—নৈষদোষঃ। বিহিতবিশেষণং ধাতুগ্রহণম্। ধাতোর্যো বিহিত ইতি।

ধাতোরেব তর্হি ন প্রাপ্নোতি।

নৈবং বিজ্ঞায়তে ধাতোর্বিহিতস্য ক্ঙিতীতি।

কথং তর্হি।

ধাতোর্বিহিতে ক্ঙিতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সকল স্থলে দোষ হইবে না। কারণ, বিহিত বিশেষণ-বিশিষ্ট, 'ধাতু' শব্দ গ্রহণ করিব। এক্ষণে এই অর্থ হইবে যে, ধাতুর উত্তর বিহিত যে, গ্‌, ক্‌, ঙ্‌ ইৎ প্রত্যয়, তাহা পরে থাকিলে, গুণ এবং বৃদ্ধি হয় না। তাহা হইলেই, 'চি' ধাতুর উত্তর (ঙিৎ বিশিষ্ট) 'তস্‌' প্রত্যয় করিলে, 'শ্নু' প্রত্যয়ও ধাতুর উত্তর বিহিত করাতে, তাহার 'উ'কারের গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না।

যদি এইরূপ হয়, তবে (মধ্যে 'শ্নু' প্রত্যয় ব্যবধান থাকাতে) ধাতুরই (গুণ বা বৃদ্ধি) প্রাপ্ত হইবে না। এইরূপ জানিবে। যে ধাতুর উত্তর যাহা বিহিত (শ্নু, শ্না প্রভৃতি) হইয়াছে, তাহারই 'ইক্‌'এর গুণবৃদ্ধির নিষেধ হইবে।

তবে কি ?

গ্, ক্, ঙ্ ইৎ পরে থাকিলে, ই, ধাতুই হউক্ বা তদুত্তর বিহিতই হউক্, তাহার গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা কার্য্যকালং সংজ্ঞাপরিভাষং যত্র কার্য্যং তত্র দ্রষ্টব্যম্॥ পুগন্তলঘূপধস্যেত্যুপস্থিতমিদং ভবতি ক্ঙিতি নেতি।

অথবা যদেতস্মিন্‌যোগে কিঙিদ্‌গ্রহণং তদাবকাশং তস্যানবকাশত্বাদ্ গুণবৃদ্ধী ন ভবিষ্যতঃ।

অথবাচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ভবত্যুপধালক্ষণস্য প্রতিষেধ ইতি। যদয়ং ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ। ইকোঝল্ হলন্তাচ্চেতি ক্নুসনৌ কিতৌ করোতি।

কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্॥ কিৎকরণ এতৎপ্রয়োজনং গুণঃ কথং ন স্যাদিতি। যদি চাত্র গুণপ্রতিষেধো ন স্যাৎ কিৎকরণমনর্থকং স্যাৎ। পশ্যতি ত্বাচার্য্যো-ভবত্যুপধালক্ষণস্যাপি গুণস্য প্রতিষেধ ইতি। ততঃ ক্নুসনৌ কিতৌ করোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এই নিয়ম করিব যে, কার্য্য-কাল, সংজ্ঞা এবং পরিভাষার হইয়া থাকে; সুতরাং ('কিঙতিচ' এই পরিভাষা সূত্রও) যেখানে কার্য্য ('সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' প্রভৃতি স্থলে) উপস্থিত হইবে, সেখানেই ইহা দেখা যাইবে। 'পুগন্তলঘূপধস্য চ' সূত্রেই 'গুণ' কার্য্য প্রাপ্তি হইবে, সেই স্থানেই ('কিঙতি চ' পরিভাষাসূত্র) ইহা উপস্থিত হইবে; সুতরাং 'কিৎ' 'গিৎ' এবং 'ঙিৎ' পরে থাকিলে, গুণ হইবে না।

অথবা এই (ক্ঙিতি চ) সূত্রে যে, গ, ক, বা ঙ্ ইৎ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার কোথাও অবকাশ নাই; তাহার অনবকাশ হেতুই জানা যাইতেছে যে, যেখানে গুণ এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হইবে, (ক্ঙিৎপরে থাকিলে) তাহারই নিষেধ হইবে।

অথবা আচার্য্যের অভিপ্রায় এইরূপেই জানা যাইতেছে যে, উপধালক্ষণেরই গুণ বা বৃদ্ধির প্রতিষেধ হয়। যেহেতু তিনি, 'ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ' ৩।২।১৪০। (১) সূত্রে, 'ক্নু'প্রত্যয়; 'ইকোঝল্' ।১।২।৯। (২) এবং 'হলন্তাচ্চ' ১।২।১০। (৩) 'সন্'প্রত্যয় 'ক' ইৎবিশিষ্ট করা হইয়াছে।

(১) ত্রস্, গৃধ্, ধৃষ্, এবং ক্ষিপ্ ধাতুর উত্তর 'ক্নু'প্রত্যয় হয়।

(২) 'ইক্'প্রত্যাহারান্তর্গতবর্ণ পরে আছে যার, এমন ঝল্‌প্রত্যাহারান্তর্গত আদিবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর 'সন্' হয় এবং তাহা 'কিৎ' হয়।

(৩) 'ইক্'প্রত্যাহারান্তর্গতবর্ণের সমীপস্থিত হল্‌এর পরে ঝল্‌আদি বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর 'সন্' হয় এবং তাহা কিৎ হয়।

কি করিয়া ইহা জ্ঞাপক হইল?

'ক্নু'প্রত্যয়ে, এবং 'সন্'প্রত্যয়ের এ স্থলে, 'ক'ইৎ করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, কোন প্রকারে যেন গুণ না হয়। যদি এই স্থলে গুণের নিষেধ না হয়; তবে এই স্থলে 'ক'ইৎবিশিষ্ট 'ক্নু'প্রত্যয় করা অনর্থক হয়। আচার্য্য ইহা দেখিয়াছেন যে, উপধালক্ষণসম্পন্নগুণেরও প্রতিষেধ হয়; এবং সেই হেতুই, ক্নু এবং সন্ প্রত্যয় 'ক'ইৎ বিশিষ্ট করিয়াছেন।

ভাষ্যমূলম্।—রোরবীত্যর্থে নাপি নার্থঃ। ক্ঙিতীত্যুচ্যতে। ন চাত্র কিতং ঙিতং বা পশ্যামঃ। প্রত্যয়লক্ষণেন প্রাপ্নোতি ন লুমতা তস্মিন্নিতি প্রত্যয়লক্ষণপ্রতিষেধঃ।

অথাপি ন লুমতাঙ্গস্যেত্যুচ্যতে এবমপি ন দোষঃ।

কথম্। ন লুমতা লুপ্তেঽঙ্গাধিকারঃ প্রতিনির্দ্দিশ্যতে। কিং তর্হি যোসৌ লুমতা লুপ্যতে তস্মিন্ যদঙ্গং তস্য যৎ কার্য্যং তন্ন ভবতীতি। অথাপ্যঙ্গাধিকারঃ প্রতিনির্দ্দিশ্যতে। এবমপি ন দোষঃ॥ কথম্। কার্য্যকালং সংজ্ঞাপরিভাষং যত্র কার্য্যং তত্র দ্রষ্টব্যম্। সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োর্গুণোভবতীত্যুপস্থিতমিদং ভবতি ক্ঙিতি নেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'রোরবীতি' প্রয়োগসিদ্ধ হইবার জন্যও নিমিত্ত গ্রহণের প্রয়োজন নাই। কারণ, সূত্রে ক্, গ্, এবং ঙ্ ইৎ পরে থাকিলে, গুণ এবং বৃদ্ধির নিষেধ বলা হইয়াছে; কিন্তু এই স্থলে 'ক'ইৎ ও দেখিতে পাই না বা 'ঙ'ইৎও দেখিতে পাই না। যদি বল যে, ('রু'ধাতুর উত্তর যে, 'ঙ'ইৎ বিশিষ্ট 'যঙ্' প্রত্যয় করা হইয়াছে) 'প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্'। ১।২।৬২। (১) সূত্রানুসারে, প্রত্যয় লক্ষণ মানিয়া 'ঙ'ইৎ হইয়াছে। তাহা হইতে পারে না। কারণ, ন লুমতাঙ্গস্য ।১।১।৬৩। (২) সূত্রানুসারে, প্রত্যয়লক্ষণের নিষেধ হইয়া থাকে; সুতরাং এইস্থলে 'যঙ্' প্রত্যয়েরও, 'লুক্' বলিয়া লোপ হওয়ায়, সেই 'লুক্' বিশিষ্ট 'যঙ্' প্রত্যয় পরে থাকিলে, প্রত্যয়লক্ষণের প্রতিষেধ হইবে। (১)

(সূত্রকারপক্ষে) অনন্তর যদি, 'ন লুমতাঙ্গস্য'ও বলা যায়, তাহা হইলেও কোন দোষ হইবে না।

কেন?

---

(১) প্রত্যয়ের লোপ হইলেও তাহাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য হইয়া থাকে।

(২) লুক্, শ্লু এবং লুপ্, ইহারা লুবিশিষ্ট বলিয়া ইহাদিগকে 'লুমৎ' বলে। লুমৎ শব্দের দ্বারা লোপ হইলে তৎ নিমিত্ত অঙ্গকার্য্য হয় না।

'ন লুমতাঙ্গস্য' সূত্র, অঙ্গাধিকার প্রকরণে প্রতিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব 'লুমতা' শব্দ দ্বারা যাহা লোপ হইবে, তাহাতে যে অঙ্গ অবস্থান করিবে, তাহার যে কার্য্য প্রাপ্তি হয়, তাহা হইবে না। সুতরাং 'ক্ঙিতি চ' সূত্র অঙ্গাধিকারী (৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদ হইতে অঙ্গাধিকার আরম্ভ হইয়াছে) না হওয়াতে প্রাপ্তি হইবে না।

অনন্তর বক্তব্য এই যে, যদি অঙ্গাধিকারের প্রতি নির্দ্দেশ ('নলুমতাঙ্গস্য' সূত্র) করা যায়, তাহা হইলেও কোন দোষ হইবে না।

কিরূপে ?

সংজ্ঞা এবং পরিভাষা, কার্য্যকালে হইয়া থাকে, অতএব যেখানে কার্য্য হইবে, সেখানেই ইহার ('ক্ঙিতি চ'র) উপস্থিতি দেখা যাইবে। অতএব যেখানে 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রানুসারে গুণ হইবে, সেখানেই এই 'ক্ঙিতিচ' সূত্র উপস্থিত হইয়া গুণের নিষেধ করিবে।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা ছান্দসমেতৎ। দৃষ্টানুবিধিশ্ছন্দসি ভবতি।

অথবা বহিরঙ্গোগুণোঽন্তরঙ্গপ্রতিষেধঃ। অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে।

অথবা পূর্ব্বস্মিন্‌যোগে যদার্ধধাতুকগ্রহণং তদনবকাশং তস্যানবকাশত্বাদ্‌গুণো-ভবিষ্যতি।

ইহ কস্মান্ন ভবতি। লৈগবায়নঃ। কাময়তে।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা ইহা (রোরবীতি), ছান্দস অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগ জানিবে। বেদেতে যেরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, পরবর্ত্তী লোকগণও সেইরূপই বিধান করিয়া থাকেন।

অথবা ('রোরবীতি' এই স্থলে,) গুণকার্য্য বহিরঙ্গ, প্রতিষেধ কার্য্য অন্ত-রঙ্গ। সুতরাং অন্তরঙ্গ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গকার্য্য অসিদ্ধ হয় বলিয়া গুণই হইবে।

অথবা পূর্ব্বসূত্রে ('ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে') যে, 'আর্দ্ধধাতুক' শব্দের গ্রহণ হইয়াছে, তাহা চরিতার্থ হইতে কোথাও অবকাশ পায় নাই। সুতরাং তাহার অনবকাশত্ব প্রযুক্ত গুণই হইবে। (১)

যদি তাহাই হয়, তবে 'লৈগবায়নঃ' (২), 'কাময়তে' (৩) এই সকল

---

(১) একটী 'নলুমতাঙ্গস্য' সূত্রের, বার্ত্তিককারপক্ষে অর্থগ্রহণ করিয়া খণ্ডন করা হইল।

(১) নিরবকাশোবিধির্বলবান্ ভবতি।

মান্দ্রাজনিবাসিগণের অভিনন্দনপত্রের উত্তর।

[৫২৭ পৃষ্ঠার পর]

এই সকল কারণে, অন্যান্য দেশের অনেক ভদ্রলোক অপেক্ষা একজন হিন্দুকৃষকও অধিক ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন। আমার বক্তৃতাসকলে ইউরোপীয় দর্শন ও ধর্ম্মের অনেক শব্দ ব্যবহারের জন্য কোন বন্ধু সমালোচনাচ্ছলে অনুযোগ করিয়াছেন। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে পারিলে আমার পরম আনন্দ হইত। উহা অপেক্ষাকৃত সহজ হইত, কারণ, সংস্কৃত ভাষাই ধর্ম্মভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু বন্ধুটী ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য নরনারীগণ আমার শ্রোতা ছিলেন, আর যদিও কোন ভারতীয় খ্রীশ্চিয়ান মিসনরী বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা তাহাদের সংস্কৃতগ্রন্থের অর্থ ভুলিয়া গিয়াছে, মিসনরীগণই উহার অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, তথাপি আমি সেই সমবেত বৃহৎ মিসনরীমণ্ডলীর মধ্যে এক জনকে দেখিতে পাইলাম না, যিনি সংস্কৃত ভাষার একটী পংক্তি পর্য্যন্ত বুঝেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বেদ, বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম্মের যাবতীয় পবিত্র শাস্ত্রসম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া বড় বড় গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন!

আমি কোন ধর্ম্মের বিরোধী, এ কথা সত্য নহে। আমি ভারতীয় খ্রীশ্চিয়ান মিসনরীদের বিরোধী, এ কথাও তদ্রূপ সত্য নহে। তবে আমি আমেরিকায় তাঁহাদের টাকা তুলিবার কতকগুলি উপায়ের প্রতিবাদ করি।

বালকবালিকার পাঠ্য পুস্তকে অঙ্কিত ঐ চিত্রগুলির অর্থ কি? চিত্রে অঙ্কিত যে, হিন্দুমাতা তাহার সন্তানগণকে গঙ্গায় কুম্ভীরের মুখে নিক্ষেপ করিতেছে। জননী কৃষ্ণকায়া, কিন্তু শিশু শ্বেতাঙ্গরূপে অঙ্কিত; ইহার উদ্দেশ্য, শিশুগণের প্রতি অধিক সহানুভূতি আকর্ষণ ও অধিক চাঁদাসংগ্রহ। ঐ ছবিগুলির অর্থ কি, যাহাতে একজন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে নিজ হস্তে একটী কাষ্ঠস্তম্ভে বাঁধিয়া পুড়াইতেছে, উদ্দেশ্য, সে ভূত হইয়া তাহার স্বামীর শত্রুগণকে পীড়ন করিবে?

বড় বড় রথ রাশি রাশি মনুষ্যকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিতেছে—এ সকল ছবির অর্থ কি? সে দিন এখানে (আমেরিকায়) ছেলেদের জন্য একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাহাতে একজন পাদরি ভদ্রলোক তাঁহার কলিকাতা

দর্শনের বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিনি কলিকাতার রাস্তায় একখানি রথ কতকগুলি ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তির উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন।

মেমফিস নগরে আমি একজন পাদরী ভদ্রলোককে প্রচারকালে বলিতে শুনিয়াছি, ভারতের প্রত্যেক পল্লীগ্রামে ক্ষুদ্র শিশুদের কঙ্কালপূর্ণ একটী করিয়া পুষ্করিণী আছে।

হিন্দুরা খ্রীষ্টশিষ্যগণের কি করিয়াছেন যে, প্রত্যেক খ্রীশ্চিয়ান বালক-বালিকাকেই হিন্দুদিগকে দুষ্ট, হতভাগা ও পৃথিবীর মধ্যে ভয়ানক দানব বলিয়া ডাকিতে শিক্ষা দেওয়া হয়?

বালকবালিকাদের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার এক অংশই এই ;— খ্রীশ্চিয়ান ব্যতীত অপর সকলকে, বিশেষতঃ হিন্দুকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া, যাহাতে তাহারা শৈশবকাল হইতেই মিশনে তাহাদের পয়সা চাঁদা দিতে শিখে।

সত্যের খাতিরে না হইলেও অন্ততঃ তাঁহাদের সন্তানগণের নীতির খাতিরেও খ্রীশ্চিয়ান মিসনরীগণের আর এরূপ ভাবের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এরূপ বালকবালিকাগণ যে বড় হইয়া অতি নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর নরনারীতে পরিণত হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কোন প্রচারক যতই অনন্ত নরকের যন্ত্রণা এবং তথাকার জ্বলমান অগ্নি ও গন্ধকের বর্ণনা করিতে পারেন, গোঁড়াদিগের মধ্যে তাঁহার ততই অধিক প্রতিপত্তি হয়। আমার কোন বন্ধুর একটী অল্প-বয়স্কা দাসীকে 'পুনরুত্থান'সম্প্রদায়ের (৩৬) ধর্ম্মপ্রচার শ্রবণের ফলস্বরূপ, বাতুলালয়ে পাঠাইতে হইয়াছিল। তাহার পক্ষে জ্বলন্ত গন্ধক ও নরকাগ্নির মাত্রাটী কিছু অতিরিক্ত হইয়াছিল!

আবার মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত, হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে লিখিত গ্রন্থগুলি দেখ। যদি কোন হিন্দু খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে এরূপ এক পংক্তি লেখেন, তাহা হইলে মিসনরীগণ স্বর্গমর্ত্ত্য তোলপাড় করিয়া ফেলেন।

স্বদেশবাসিগণ, আমি এই দেশে এক বৎসরের অধিক হইল রহিয়াছি। আমি ইহাঁদের সমাজের প্রায় সকল অংশই দেখিয়াছি। এখন উভয় দেশের তুলনা করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে, মিসনরীরা জগতে আমাদিগকে

* (৩৬) যে সম্প্রদায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাচীন ভাব বলিয়া অনুদার মতসমূহের পুনঃস্থাপনে প্রয়াসী। আমেরিকার খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়বিশেষ।

যে দৈত্য বলিয়া পরিচয় দেন, আমরা তাহা নহি, আর তাঁহারাও আপনাদিগকে দেবতা বলিয়া ঘোষণা করিলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা দেবতা নহেন। মিশনরীগণ হিন্দুবিবাহপ্রণালীর দুর্নীতি, শিশুহত্যা ও অন্যান্য দোষের কথা যত কম বলেন, ততই ভাল। এমন অনেক দেশ থাকিতে পারে, যথাকার বাস্তবিক চিত্রের সমক্ষে মিসনরীগণের হিন্দুসমাজের সমুদয় কাল্পনিক চিত্র নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। কিন্তু বেতনভুক্ নিন্দুক হওয়া আমার জীবনের লক্ষ্য নহে। হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, এ দাবী আর কেহ করে করুক, আমি ত কখন করিব না। এই সমাজের যে সকল ত্রুটি অথবা শত শত শতাব্দীব্যাপী দুর্ব্বিপাকবশে ইহাতে যে সকল দোষ জন্মিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আর কেহই আমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। বৈদেশিক বন্ধুগণ, যদি তোমরা যথার্থ সহানুভূতির সঙ্গে সাহায্য করিতে আইস, বিনাশ তোমাদের যদি উদ্দেশ্য না হয়, তবে তোমাদের কার্য্যের খুব উন্নতি হউক, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

কিন্তু যদি এই অবসন্ন পতিত জাতির মস্তকে অনবরত, সময়ে অসময়ে ক্রমাগত গালিবর্ষণ করিয়া স্বজাতির নৈতিক শ্রেষ্ঠতা দেখান তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি স্পষ্টই বলিতে পারি, যদি একটু ন্যায়পরতার সহিত এই তুলনা করা হয়, তবে হিন্দুগণ, নীতিপরায়ণ জাতি হিসাবে জগতের অন্যান্য জাতি হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ আসন পাইবেন।

ভারতে ধর্ম্মকে কখন ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই। কোন ব্যক্তিকেই তাহার ইষ্টদেবতা, সম্প্রদায় বা আচার্য্য মনোনয়নে বাধা দেওয়া হয় নাই; সুতরাং ধর্ম্মের এখানে যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, অন্য কোথাও সেরূপ হইতে পায় নাই।

অপর দিকে আবার, ধর্ম্মের ভিতর এই নানাভাব বিকাশের জন্য একটী স্থিরবিন্দুর আবশ্যক হইল—সমাজ এই অচল বিন্দুরূপে গৃহীত হইল। ইহার ফল এই হইল যে, সমাজ কঠোরশাসনপূর্ণ ও একরূপ অচল হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়।

পাশ্চাত্য প্রদেশে কিন্তু সমাজ ছিল, বিভিন্নভাব বিকাশের ক্ষেত্র এবং স্থির বিন্দু ছিল ধর্ম্ম। প্রতিষ্ঠিত চর্চ্চের সহিত ঐকমত্য ছিল, ইউরোপীয় ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—এমন কি, এখনও তাহাই আছে আর যদি কোন সম্প্রদায় প্রচলিত মত হইতে কিছু স্বতন্ত্ররূপ হইতে যাইত, তাহাকেই শোণিতসাগরের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে হাঁটিয়া তবে একটু সুবিধা লাভ করিতে হইত। ইহার

ফল হইয়াছে একটা মহৎ সমাজসংহতি, কিন্তু তাহাতে যে ধর্ম্ম প্রচলিত, তাহা স্থূলতম জড়বাদের উপর কখন উঠে নাই।

আজ পাশ্চাত্য প্রদেশ আপনার অভাব বুঝিতেছে। এখন উন্নত পাশ্চাত্য ঈশ্বরতত্বান্বেষিগণের মূলমন্ত্র হইয়াছে—'মানুষের যথার্থ স্বরূপ ও আত্মা।' সংস্কৃতদর্শন অধ্যয়নকারী মাত্রেই জানেন, এ হাওয়া কোথা হইতে বহিতেছে, কিন্তু তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, যতক্ষণ ইহা নূতন জীবন সঞ্চার করিতেছে।

ভারতে আবার নূতন নূতন অবস্থার সংঘর্ষে সমাজসংহতির নবগঠন বিশেষ আবশ্যক হইতেছে। বিগত শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ ধরিয়া ভারত সমাজ-সংস্কারসভা ও সমাজসংস্কারকে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু হায়! ইহার মধ্যে সকলগুলিই বিফল হইয়াছে। ইহাঁরা সমাজসংস্কারের রহস্য জানিতেন না। ইহাঁরা প্রকৃত শিখিবার জিনিষ শিখেন নাই। ব্যস্ততাবশতঃ তাঁহারা আমাদের সমাজের যত দোষ, সব ধর্ম্মের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। প্রবাদবাক্যে যেমন আছে, মশা মাত্তে গালে চড়, তেমনি তাঁহারা সমাজের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া সমাজকেই একেবারে ধ্বংস করিবার যোগাড় করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ ক্ষেত্রে তাঁহারা অটল অচল গাত্রে আঘাত করিয়াছিলেন, শেষে উহার প্রতিঘাতবলে নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেন। যে সকল মহামনা নিঃস্বার্থ পুরুষ এইরূপ বিপথে চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তি ধন্য! আমাদের নিশ্চেষ্ট সমাজরূপ নিদ্রিত দৈত্যকে জাগরিত করিতে সংস্কারোন্মত্ততার এই বৈদ্যুতিক আঘাতের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল।

আমরা ইঁহাদিগকে আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া ইহাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভবান হই আইস। তাঁহারা ইহা শিক্ষা করেন নাই যে, ভিতর হইতে বিকাশ আরম্ভ হইয়া বাহিরে তাহার পরিণতি হয়, তাঁহারা শিক্ষা করেন নাই, সমুদয় ক্রমবিকাশ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ক্রমসঙ্কোচের পুনর্বিকাশ মাত্র। তাঁহারা জানিতেন না, বীজ উহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূত হইতে উপাদান সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বৃক্ষ হইয়া থাকে। হিন্দুজাতি একেবারে ধ্বংস হইয়া নূতন কোন জাতি যতদিন না তাহার স্থান অধিকার করিতেছে, ততদিন সমাজের এরূপ বিপ্লবকর সংস্কার সম্ভব নহে। যতই চেষ্টা কর না কেন, যতদিন না ভারতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতেছে, ততদিন ভারত কখন ইউরোপ হইতে পারে না।

ভারতের কি অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে? সেই ভারত, যাহা সমুদয় মহত্ব, নীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রাচীন জননী, যে ভূমিতে সাধুগণ বিচরণ করিতেন, যে ভূমিতে ঈশ্বরপ্রতিম ব্যক্তিগণ এখনও বাস করিতেছেন? সেই গ্রীসিয় সাধু সক্রেটিসের নিকট সত্যানুসন্ধান আলোক লইয়া হে ভ্রাতৃগণ, এই বিস্তৃত জগতের প্রত্যেক নগর, গ্রাম, অরণ্য অন্বেষণ করিতে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে রাজি আছি, অপর স্থানে যদি এরূপ লোক পাও, ত দেখাও। এ প্রবাদ ঠিক যে, ফল দেখিয়া গাছ চেনা যায়। ভারতের প্রত্যেক আম্রবৃক্ষের তলে বসিয়া বৃক্ষ হইতে পতিত ঝুড়ি ঝুড়ি কীটদষ্ট, পক্ক, আম্র কুড়াও ও তাহাদের প্রত্যেকটী সম্বন্ধে একশত করিয়া খুব গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা কর। তথাপি তুমি একটী আম্রসম্বন্ধেও সঠিক তত্ত্ব লিখিতে পারিলে না। একটী সুপক্ক, সরস, সুমিষ্ট আম্রে পাড়িয়া তাহার বর্ণনা করিলেই বুঝিব, তুমি আম্রের প্রকৃত গুণ বিদিত হইয়াছ ও তাহার প্রকৃত বর্ণনা করিয়াছ।

এই ভাবেই এই ঈশ্বরকল্প মানবগণই হিন্দুধর্ম্ম কি, তাহা প্রকাশ করেন। যে জাতিরূপ বৃক্ষ শত শত শতাব্দী ধরিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত, যাহা সহস্র বর্ষ ধরিয়া ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও অনন্ত তারুণ্যের অক্ষয় তেজে এখনও গৌরবান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ইঁহাদের জীবন দেখিলেই তাহার স্বরূপ, শক্তি ও তাহার গূঢ়নিহিত তেজের বিষয় জানা যায়।

ভারতের কি বিনাশ হইবে? তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা চলিয়া যাইবে, চরিত্রের মহান্ আদর্শ সমুদয় নষ্ট হইবে, সমুদয় ধর্ম্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিনষ্ট হইবে, সমুদয় ভাবুকতা নষ্ট হইবে; তাহার স্থলে কাম ও বিলাসিতারূপ দেবদেবীর রাজত্ব হইবে; অর্থ হইবেন—তাহার পুরোহিত; প্রতারণা, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে—তাহার পূজাপদ্ধতি আর মানবাত্মা হইবেন, তাহার বলি। এরূপ কখন হইতে পারে না। কার্য্যশক্তি হইতে সহ্যশক্তি অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ; ঘৃণাশক্তি হইতে প্রেমশক্তি অনন্তগুণে অধিক শক্তিমান। যাঁহারা মনে করেন, হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান পুনরুত্থান কেবল দেশহিতৈষিতাপ্রবৃত্তির একটী বিকাশমাত্র, তাঁহারা ভ্রান্ত।

প্রথমতঃ, আমরা এই অপূর্ব্ব ব্যাপার কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি আইস।

ইহা কি আশ্চর্য্য নহে যে, একদিকে যেমন আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রবল আক্রমণে পাশ্চাত্য স্বমতান্ধ ধর্ম্মসমূহের প্রাচীন দুর্গসমূহ ধূলিসাৎ হইতেছে—একদিকে যেমন বর্ত্তমান বিজ্ঞানের হাতুড়ির চোটে, বিশ্বাস অথবা চর্চ্চসমিতির অধিকাংশের সম্মতিই যাহার মূল, সেই সকল ধর্ম্মমতরূপ মৃৎপাত্রকে গুঁড়াইয়া ছাতু করিয়া ফেলিতেছে; একদিকে যেমন আততায়ী আধুনিক চিন্তার ক্রমবর্দ্ধনশীল স্রোতের সহিত আপনাকে মিলাইতে পাশ্চাত্য ধর্ম্মমতসকল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে; একদিকে যেমন অপর সমুদয় ধর্ম্মপুস্তকের মূলগ্রন্থগুলি হইতে আধুনিক চিন্তার ক্রমবর্দ্ধনশীল তাড়নায়, যথাসম্ভব বিস্তৃত ও উদার অর্থ বাহির করিতে হইয়াছে, আর তাহাদের অধিকাংশই ঐ চাপে ভগ্ন হইয়া অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভাণ্ডারে রক্ষিত হইয়াছে; একদিকে যেমন অধিকাংশ পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তি চর্চ্চের সঙ্গে সমুদয় সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া অশান্তিসাগরে ভাসিতেছেন, অপর দিকে তেমনি যে সকল ধর্ম্ম সেই বেদরূপ জ্ঞানের প্রস্রবণমূল হইতে প্রাণপ্রদ জল পান করিয়াছে অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মেরই কেবল পুনরুত্থান হইতেছে?

অশান্ত পাশ্চাত্য নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী কেবল গীতা বা ধম্মপদেই (৩৭) স্বীয় আশ্রয় পাইয়া থাকেন।

অদৃষ্টচক্র ঘুরিয়া গিয়াছে। আর যে হিন্দু নৈরাশ্যাশ্রুপরিপ্লুতনেত্রে নিজ বাসভবনকে আততায়িপ্রদত্ত অগ্নিতে বেষ্টিত দেখিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে বর্ত্তমান চিন্তার প্রখর আলোকে ধূম অপসারিত হইবার পর দেখিতেছেন, তাঁহার গৃহই একমাত্র নিজ বলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে আর অপরগুলি সব হয় ধ্বংস হইয়াছে, নয়, হিন্দু আদর্শ অনুযায়ী পুনর্গঠিত হইতেছে। তিনি এক্ষণে তাঁহার অশ্রুমোচন করিয়াছেন আর দেখিতে পাইয়াছেন, যে কুঠার সেই "ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থের" (৩৮) মূলদেশ কাটিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে বাস্তবিক অস্ত্রচিকিৎসকের ছুরীর কার্য্য করিয়াছে।

তিনি দেখিতেছেন, তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহার শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ

(৩৭) বৌদ্ধদের শ্রেষ্ঠ নীতিশাস্ত্র।

(৩৮) কঠোপনিষদ্ ও গীতা হইতে গৃহীত—অর্থ—এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধে (ব্রহ্ম) আর নিম্নে শাখা প্রশাখা গিয়াছে। এখানে হিন্দুধর্ম্মকে বুঝাইতেছে।

অথবা অন্য কোনরূপ কপটতা করিবার আবশ্যকতা নাই। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার শাস্ত্রের নিম্নাঙ্গগুলিকে নিম্নই বলিতে পারেন, কারণ, তাহা অরুন্ধতীদর্শনন্যায়মতে (৩৯) নিম্নাধিকারিগণের জন্য বিহিত। সেই প্রাচীন ঋষিগণকে ধন্যবাদ, যাঁহারা এরূপ সর্ব্বব্যাপী, সদাবিস্তারশীল ধর্ম্মপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা জড়রাজ্যে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে ও যাহা কিছু হইবে, সবই সাদরে গ্রহণ করিতে পারে। তিনি সেইগুলিকে নূতন ভাবে বুঝিতে শিখিয়াছেন এবং আবিষ্কার করিয়াছেন যে, যে সকল আবিষ্ক্রিয়া প্রত্যেক সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষে এত ক্ষতিকর হইয়াছে, তাহা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের ধ্যানলব্ধ তুরীয় ভূমি হইতে আবিষ্কৃত সত্যসমূহের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ভূমিতে পুনরাবিষ্কার মাত্র।

এই কারণেই তাঁহার কিছুই ত্যাগ করিবার আবশ্যক নাই অথবা অন্য কোন স্থলে অন্য কিছু খুঁজিবার জন্য তাঁহার যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যে অনন্ত ভাণ্ডার তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ লইয়া নিজ কাযে লাগাইলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাহা তিনি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ক্রমশঃ আরো করিবেন। ইহাই কি বাস্তবিক এই পুনরুত্থানের কারণ নহে?

বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদিগকে আমি বিশেষ করিয়া আহ্বান করিয়া বলিতেছি,—

ভ্রাতৃগণ, লজ্জার বিষয় হইলেও ইহা আমরা জানি যে, বৈদেশিকগণ যে সকল প্রকৃত দোষের জন্য হিন্দুজাতিকে নিন্দা করেন, তাহার কারণ আমরা। আমরাই ভারতের অন্যান্য জাতির মস্তকে অনেক অনুচিত গালিবর্ষণের কারণ। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা ইহা সম্পূর্ণ জানিতে পারিয়াছি আর তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমরা শুধু আপনাদিগকেই শুদ্ধ করিব, তাহা নহে, সমুদয় ভারতকেই সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিত আদর্শানুসারে জীবন গঠন করিতে সাহায্য করিতে পারিব। প্রথমে আইস, প্রকৃতি ক্রীতদাসের কপালে সদাই যে ঈর্ষ্যারূপ তিলক অঙ্কিত করেন, তাহা মোচন করি। কাহারও প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত

(৩৯) অরুন্ধতী অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র বিশেষ। কাহাকেও এই নক্ষত্র দেখাইতে হইলে প্রথমে উহার নিকটবর্ত্তী বৃহৎ কোন নক্ষত্রকে দেখাইয়া তাহাতে চক্ষু স্থির হইলে তবে অরুন্ধতী দৃষ্টিগোচর হয়। সেইরূপ ধর্ম্মের সূক্ষ্মভাব বুঝিতে হইলে প্রথমে স্থূলভাবের সাহায্য লইতে হয়।

হইও না। সকল শুভকর্ম্মানুষ্ঠায়ীকেই সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক। ত্রিলোকীর প্রত্যেক জীবের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা প্রেরণ কর।

আমাদের ধর্ম্মের এক কেন্দ্রীভূত সত্য—যাহা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকলেরই সাধারণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, তাহার উপর দণ্ডায়মান হই আইস। সেই কেন্দ্রীভূত সত্য এই মানবাত্মা, অজ, অবিনাশী, সর্ব্বব্যাপী অনন্ত মানবাত্মা, যাঁহার মহিমা স্বয়ং বেদ প্রকাশ করিতে অক্ষম, যাঁহার মহিমার সমক্ষে অনন্ত সূর্য্য চন্দ্র তারকা ও নীহারময় নক্ষত্রপুঞ্জ বিন্দুতুল্য। প্রত্যেক নরনারী, শুধু তাহাই নহে, উচ্চতম দেব হইতে তোমাদের পদতলস্থ ঐ কীট পর্য্যন্ত সকলেই ঐ আত্মা, হয় উন্নত, নয় অবনত। প্রভেদ—প্রকারগত নহে, পরিমাণগত।

আত্মার এই অনন্ত শক্তি, জড়ের উপর প্রয়োগ করিলে ভৌতিক উন্নতি হয়, চিন্তার উপর প্রয়োগ করিলে মনীষার বিকাশ এবং আপনার উপর প্রয়োগ করিলে মানুষকে ঈশ্বর করিয়া তুলে।

প্রথম আমরা ব্রহ্মত্ব লাভ করি আইস, পরে অপরকে ব্রহ্ম হইতে সাহায্য করিব। 'আপনি সিদ্ধ হইয়া অপরকে সিদ্ধ হইতে সহায়তা কর,' ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক। মানুষকে পাপী বলিও না। তাহাকে বল, তুমি ব্রহ্ম। যদিও শয়তান কেহ থাকে, তথাপি আমাদের ব্রহ্মকেই স্মরণ করা কর্ত্তব্য—শয়তানকে নহে।

যদি গৃহ অন্ধকার থাকে, তবে সর্ব্বদা অন্ধকার অন্ধকার বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে অন্ধকার দূর হইবে না। আলো লইয়া আইস। জানিয়া রাখ, যাহা কিছু অভাবাত্মক, যাহা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই নিযুক্ত, যাহা কিছু কেবল দোষদর্শনাত্মক, তাহা চলিয়া যাইবেই যাইবে; যাহা কিছু ভাবাত্মক, যাহা কিছু গড়িতে চেষ্টা করে, যাহা কোন একটী সত্য স্থাপন করে, তাহাই অবিনাশী, তাহাই চিরকাল থাকিবে। এস, আমরা বলিতে থাকি, 'আমরা সৎস্বরূপ, ব্রহ্ম সৎস্বরূপ আর আমরাই ব্রহ্ম, শিবোঽহং শিবোঽহং'—এই বলিয়া অগ্রসর হইয়া যাই, চল। জড় আমাদের লক্ষ্য নহে, চৈতন্য। যে কোন বস্তুর নামরূপ আছে, তাহাই নামরূপহীন সত্তার অধীন। শ্রুতি বলেন, ইহাই সনাতন সত্য। আলোক লইয়া আইস, অন্ধকার আপনিই চলিয়া যাইবে। বেদান্তকেশরী গর্জ্জন করুক, শৃগালগণ তাহাদের গর্ত্তে পলায়ন করিবে। ভাব চারিদিকে ছড়াইতে থাক; ফল যাহা হইবার, হউক। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ একত্রে

রাখিয়া দাও; উহাদের মিশ্রণ আপনা আপনিই হইবে। আত্মার শক্তির বিকাশ কর; উহার শক্তি ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দাও; যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা আপনা আপনিই আসিবে।

তোমার আভ্যন্তরিক ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট কর, সমুদয়ই উহার চারিদিকে সামঞ্জস্যভাবে বিন্যস্ত হইবে। বেদে বর্ণিত ইন্দ্রবিরোচনসংবাদ (৪০) স্মরণ কর; উভয়েই তাঁহাদের ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশ পাইলেন। কিন্তু অসুর বিরোচন তাঁহার দেহকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন, ইন্দ্র কিন্তু দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, বাস্তবিক আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। তোমরা সেই ইন্দ্রের সন্তান; তোমরা সেই দেবগণের বংশধর। জড় কখন তোমাদের ঈশ্বর হইতে পারে না, দেহ কখন তোমাদের ঈশ্বর হইতে পারে না।

ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নহে, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নহে, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর বেশসহায়ে; অর্থের শক্তিতে নহে, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে। বলিও না, তোমরা দুর্ব্বল; বাস্তবিক, সেই আত্মা সর্ব্বশক্তিমান। রামকৃষ্ণের শ্রীচরণের দেবস্পর্শে যে ঐ কয়েকটী মুষ্টিমেয় যুবকদলের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত কর। তাঁহারা আসাম হইতে সিন্ধু ও হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তাঁহার উপদেশামৃত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা পদব্রজে ২০০০০ ফুট ঊর্দ্ধবর্ত্তী হিমালয়ের তুষাররাশি অতিক্রম করিয়া তিব্বতের রহস্য ভেদ করিয়াছেন। তাঁহারা চীরধারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছেন। কত অত্যাচার তাঁহাদের উপর দিয়া গিয়াছে—এমন কি, তাঁহারা পুলিস দ্বারা অনুসৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, অবশেষে যখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নির্দ্দোষিতার বিষয়ে বিশেষরূপ প্রমাণ পাইয়াছেন, তখন তাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

এক্ষণে তাঁহারা বিংশতি জন মাত্র। কালই যেন এই সংখ্যা দ্বিসহস্রে পরিণত হয়। হে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ, তোমাদের দেশের জন্য ইহা প্রয়োজন, সমুদয় জগতের জন্য ইহা প্রয়োজন। তোমাদের আভ্যন্তরীণ ব্রহ্মশক্তি জাগরিত কর; উহা তোমাদিগকে ক্ষুধাতৃষ্ণা শীত উষ্ণ সমুদয় সহ্য করিতে সক্ষম করিবে। বিলাসপূর্ণ গৃহে বসিয়া, সর্ব্বপ্রকার সুখসম্ভোগে পরিবেষ্টিত

(৪০) ছান্দোগ্যোপনিষদের শেষাংশ দেখ

থাকিয়া একটু সখের ধর্ম্ম করা অন্যান্যদেশের পক্ষে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু ভারতের অস্থিমজ্জায় ইহা হইতে উচ্চতর ভাব জড়িত। সে সহজেই প্রতারণা ধরিয়া ফেলে। তোমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। মহৎ হও। স্বার্থত্যাগ ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না। পুরুষ স্বয়ং জগৎসৃষ্টি করিবার জন্য আপনার স্বার্থত্যাগ করিলেন, আপনাকে বলি দিলেন। তোমরা সর্ব্বপ্রকার আরাম, সুখসচ্ছন্দ, নাম, যশ অথবা পদ, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া মানবরূপ শৃঙ্খলগঠিত এমন একটী সেতু নির্ম্মাণ কর, যাহার উপর দিয়া লক্ষ লক্ষ লোক এই জীবনসমুদ্র পার হইয়া যাইতে পারে।

সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলকারী শক্তিকে একত্রীভূত কর। তুমি কোন্ পতাকার নিম্নে থাকিয়া যাত্রা করিতেছ, সে দিকে লক্ষ্য করিও না। তোমার পতাকা নীল, হরিত বা লোহিত, তাহা গ্রাহ্য করিও না, কিন্তু সমুদয় রঙ মিশাইয়া প্রেমরূপ শ্বেতবর্ণের তীব্র জ্যোতির প্রকাশ কর। আমাদের আবশ্যক—কার্য্য করিয়া যাওয়া—ফল যাহা, তাহা আপনা আপনি হইবে। যদি কোন সামাজিক নিয়ম তোমার ব্রহ্মত্বলাভের প্রতিকূল হয়, তাহা আত্মার শক্তির সম্মুখে আর টিকিবে না। আমি ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা দেখিতে পাইতেছি না, দেখিবার জন্য আমার আগ্রহও নাই। কিন্তু আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের সেই প্রাচীনামাতা আবার জাগরিতা হইয়াছেন, পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক মহিমান্বিতা হইয়া পুনর্ব্বার নব-যৌবনশালিনী হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন। শান্তি ও আশীর্ব্বাক্য প্রয়োগ সহকারে তাঁহার নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।

কর্ম্ম ও প্রেমে চিরকাল তোমাদেরি

বিবেকানন্দ।

ধ্রুবচরিত্র।

পঞ্চম অঙ্ক।—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মধুবনের অপর পার্শ্ব।

(ধ্রুব তপস্যায় মগ্ন ও নারদের প্রবেশ।)

নারদ। আহা! এই মধুবন!
পূর্ণ যেন পবিত্র হাওয়ায়!
বোধ হয়, সব যেন ভক্তিমাখা, দয়ামাখা, শান্তিমাখা হেথা।
ফলভরে নতশির তরুশাখাগুলি
যেন ভক্তিভাবে ভগবানে করিছে প্রণাম।
মৃদুল সমীরে, কভু দুলে ধীরে ধীরে
অলক্ষ্যে দুলায় যেন পাখা,
পাছে কীট পতঙ্গাদি ধ্রুব অঙ্গে বসি
ধ্রুব ধ্যান করে ভঙ্গ।
আহা! কিবা ভক্তির মহিমা।

(নেপথ্যে ভক্তির গীত)

আমারে যে চায়, সেই তাঁরে পায়,
আঁধার খনিতে উজলে মণি।

নারদ। কোমল সঙ্গীত স্রোত কোথা হোতে আসে?
কে গাইছে—"আমারে যে চায় সেই তাঁরে পায়"
কাহারে চাইলে কারে পাওয়া যায়?
ভক্তিরে চাইলে ভগবান মিলে।
"আঁধার খনিতে উজলে মণি"
সত্য বটে—অজ্ঞানতারূপ
অন্ধকারময় হৃদয়খনিতে
জ্বলে উঠে জ্ঞানরূপ মণি।
ধ্রুবের সে ভক্তির প্রবাহে,
জড় প্রকৃতিও যেন হইয়াছে ভক্তিমাখা;
সেই ভক্তি

মূর্ত্তিমতী হোয়ে বুঝি আসিছে নিকটে;
তাহারই এ মিষ্ট কণ্ঠধ্বনি।

(গাইতে গাইতে ভক্তির প্রবেশ)

ভক্তি। আমারে যে চায়, সেই তাঁরে পায়,
আঁধার খনিতে উজলে মণি।
আমি না আইলে, সহজে না মিলে,
নব জলধর সেই রূপ খানি॥
সাধুর বিমল হৃদয় মন্দিরে,
সাধনে প্রবেশি আমি ধীরে ধীরে,
যেখানে আমি, গোলোক স্বামী,
রমাসনে নামি আসেন আপনি॥

নারদ। কে—মা ভক্তি এসেছ?

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

প্রীতি শ্রদ্ধা দয়া, তিনটী তনয়া,
তোমারই জননী ভকতি গো।

নারদ। আবার কোমল কণ্ঠধ্বনি!
কে আসিছে পুনঃ?

(অন্যদিক হইতে প্রীতি শ্রদ্ধা ও দয়ার গাইতে গাইতে প্রবেশ)

প্রীতি শ্রদ্ধা দয়া, তিনটী তনয়া
তোমারই জননী ভকতি গো।
মা গো তব সনে, মিলি তিন বোনে,
ভক্ত হৃদে করি বসতি গো॥
তিনে এক একে তিন, বাঁধা আছি চিরদিন,
যার টানে মেয়ে আনে, ফুটে উঠে সাধু প্রাণে,
বিমল যোগ জ্যোতিঃ গো॥

নারদ। ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, দয়া!
বড়ই হইনু প্রীত
হেরি তোমাদের
মূর্ত্তিমতী আজি মধুবনে।

ভক্তি। প্রভো! সূক্ষ্মরূপে

ভগবান পাদপদ্মে বাস করি মোরা ;
ভক্ত আকর্ষণে স্থূলরূপে আমাদের প্রকট প্রকাশ।
ধ্রুব আরাধনে
কম্পিত গোলোকে বিষ্ণু সিংহাসন ;
লক্ষ্মী নারায়ণ চরণ যুগল
হোয়েছে চঞ্চল ;
কাতরা কমলা, কাতর শ্রীহরি ;
বাঁধা ছিনু মোরা শ্রীহরিচরণে,
ধ্রুবের কঠোর তপঃ আকর্ষণে
সে বন্ধন হইল শিথিল ;
সেই আকর্ষণে প্রভো !
আইনু আমরা আজি মধুবনে।

নারদ। ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধা দয়া
যেই স্থানে করে আগমন,
ত্বরায় আসেন তথা শ্রীমধুসূদন।
আহা! আজি ময় কিবা আনন্দের দিন,
ধ্রুব তপোবলে গোলোক আভাস,
মধুবনে ক্ষণে ক্ষণে হইছে প্রকাশ।
ধন্য আমি হেন শিষ্যে মন্ত্রদান করি !
ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধা দয়া !
চারিজনে ধ্রুবহৃদে হও বদ্ধমূল।
(স্বগতঃ) যাইব এখন ধ্রুবের পিতার কাছে,
সুনীতির বনবাস করিব মোচন
বলিয়া উত্তানপাদে। (প্রস্থান)

ভক্তি আদি। নবীন নীরদ ঐ এল বোলে এল এল।
হেসে হেসে আসে আগে কমলা বিজলী আলো॥
কাঁদে ধ্রুব কাঁদে মেঘ,
বেগে ধারা বহিবে গো,
গলেছে নীরদ হৃদি, আর ত থাকে না জল॥

(ভক্তি আদির প্রস্থান)

ধ্রুব। হৃদয়ের ধন, সে নীল রতন
পদ্মপলাশলোচন কোথা লুকাইল ?
এই যে এখনই
হৃদি মাঝে ছিল বিরাজিত ;
ক্ষণে দেখা দেয়—
আবার লুকায় কেন ?
কোথা হরি পদ্মপলাশলোচন
দাও দেখা ;
তব অদর্শন আর পারিনা সহিতে।

ধ্রুব। সে প্রাণধনে, অতি যতনে, হৃদে রাখিতে চাই।
তবু ক্ষণে ক্ষণে, কেন সে রতনে, হারাই হারাই ॥
এই দেখি কাছে, এই কোথা গেছে,
পুনঃ আসিয়াছে, পুনঃ দেখি নাই,
মেঘে লুকোচুরি, চপলা চাতুরী,
কোরনাক হরি অধীনের ঠাঁই ॥
গভীর আঁধারে, ফেলো না আমারে,
মরম ভিতরে বড় ব্যথা পাই,
(বুঝি) মনের মতন, পাওনা যতন,
তাই কর তুমি পালাই পালাই ॥

লক্ষ্মী। (নেপথ্যে) লও বৎস !
লও লও ঐশ্বর্য্য আমার ;
রাজ্যের আশায় তপস্যা তোমার,
সেই আশা আমি করিব পূরণ।
হের, শূন্যে দোলে ঐ স্বর্ণসিংহাসন
আনিয়াছি তব তরে।
ধর বৎস ! ধর সিংহাসন
ক্ষান্ত হও তপস্যায় ;
রাজা হয়ে সুখে কর রাজ্যভোগ।

ধ্রুব। একি ! একি !
সহসা শিহরি উঠে কেন প্রাণ ?

কাঞ্চনের জ্যোতিঃ
কে আনিল হৃদাকাশে ?
ঐ দুলিতেছে শূন্যে স্বর্ণসিংহাসন ;
কাঞ্চন রতন, অতুল বৈভব
রহিয়াছে রাশীকৃত।

বৈরাগ্য। (নেপথ্যে) ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা রাজসিংহাসন।

বিবেক। (নেপথ্যে) পাবে না পাবে না হরি দরশন।

ধ্রুব। কি! পাব না পাব না তবে হরি দরশন ?
ছার সিংহাসন,
ছার রাজ্যধন নাহি প্রয়োজন ;
নিরখি যখন সুন্দর সে রূপরাশি
অন্তরে তখন হয় যে সুখ উদয়,
সে সুখের সনে,
রাজসিংহাসনে হয় না তুলনা।
কে গো তুমি, আনি প্রলোভন
ভুলাও আমায় ?
ভুলায়োনা, ভুলায়োনা ;
প্রলোভনে ভুলি
ভুলিব না সেই পদ্মপলাশলোচনে।
কোথা হরি পদ্মপলাশলোচন
দাও দেখা ;
এই প্রাণে ছিলে,
কোথা লুকাইলে পুনঃ ?
উহুঃ! বুক ভেঙ্গে গেল,
হারাইনু হারাইনু হরি।
শুনিয়াছি পঞ্চতপ করিলে সাধন
হরি দরশন মিলে ;
পঞ্চতপ তবে আজি করিব সাধন—
শিরে সূর্য্য রাখি,
জ্বালি অগ্নি চারিভিতে

কেন্দ্রস্থলে করিব আসন ;
ঊর্দ্ধমুখে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে
ডাকিব ডাকিব বলি, জয় জয় নারায়ণ
দেখি টলে কি না টলে সেই রাজীব চরণ
দেখি পাই কি না পাই পদ্মপলাশলোচন,
দেহের পতন কিম্বা তপস্যা সাধন।
জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্ জ্বলন্ত অনল।
প্রসার প্রসার তব জিহ্বা লোল॥
ওহে জ্যোতির্ম্ময় মধ্যাহ্ন তপন,
ঢাল ঢাল শিরে প্রখর কিরণ,
পঞ্চতেজ আজি হোক সম্মিলন,
দীন হীন ধ্রুবে দাও দাও কোল॥

(অগ্নি মধ্যে ঝম্প প্রদান)

(প্রীতি শ্রদ্ধা ও দয়ার সহিত বেগে ভক্তির প্রবেশ)

ভক্তি। অপূর্ব্ব বালক! অপূর্ব্ব তপস্যা!
হেন ভক্ত দেখি নাই কভু!
অনায়াসে অগ্নিমাঝে করিল প্রবেশ।
প্রীতি! শ্রদ্ধা! দয়া!
এস সবে মিলি
নিজ নিজ শক্তিস্রোত সমষ্টি করিয়া
একাধারে ধ্রুবহৃদে ঢালি অবিরাম।
অচিরে ধ্রুবের
যাতে হয় নারায়ণ দরশন লাভ।
কোথা হরি দয়াময়!
রক্ষা কর ভক্তে তব।
আমাদের শক্তিস্রোত ঢালিয়া নিয়ত
হইয়াছি ক্ষীণ মোরা
থাকিতে পারিনা আর।
এস ত্বরা করি—
নতুবা ভকতবৎসল নামে কলঙ্ক হইবে।

(ধ্রুবকে কোলে করিয়া অগ্নিমধ্য হইতে লক্ষ্মীর উত্থান)

লক্ষ্মী। ধন্য শিশু! ধন্য ভক্তি এর!
ধন্য এর গুরুদেব!
ধন্য এর কঠোর সাধন!
হেরিয়া শিশুর এই কঠিন সাধনা,
প্রাণ বড় হইল ব্যাকুল।
কোথা প্রভু! ভক্তে ত্বরা দাও দরশন।
দেখ আসি—তব তরে
কত কষ্ট সহিছে বালক।
আমি নারী,
কতক্ষণ আর দেখিবারে পারি
শিশুর এ তপস্যা কঠিন।
কোথা প্রাণেশ্বর, শ্রীমধুসূদন!
পাষাণ হয়ে কি তুমি রহিলে গোলোকে?
বারেক আসিয়া প্রভো! দেখ না বালকে।

ভক্তি। মাগো! জগতের ভক্তি
যেথানে যা ছিল,
সমষ্টি করিয়া
একাধারে ধ্রুবহৃদে কোরেছি স্থাপন।
করিছে বালক কঠোর সাধনা;
দয়াময় হরি, এখনও তবু
নাহি দিল দরশন।

লক্ষ্মী। তাই তো—এখনও তো
প্রাণনাথ না দিলেন দেখা!
ভক্তি! অচিন্ত্য মনের গতি তাঁর
কে পারে বুঝিতে!

ভক্তি। প্রীতি! শ্রদ্ধা! দয়া!
হের—হের;
অকস্মাৎ ঐ লতিকার শির
নত হয়ে কেন চুমিছে ধরণী?

কেন তরুশাখাগুলি
নত হয়ে করিছে প্রণাম?
নিবিড় নীরদমালা
কেন শূন্যে হয় আলোড়িত?
অন্তরীক্ষে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী
কেন ক্রমে হইছে নিষ্প্রভ?
নীলাম্বরে নীলবর্ণ জ্যোতির সাগর
তরঙ্গে তরঙ্গে হইতেছে প্রবাহিত।
এতদিনে হরি
পূরাইল বুঝি ধ্রুবের বাসনা।

ভক্তি আদি। ঐ শুন শূন্যে বাজিছে নুপুর।
এল এল এল হরি, আর নাহিক অধিক দূর॥
নেমেছে কাঞ্চন ভাতি,
নামিছে নীলিম জ্যোতিঃ,
আলোকে নুপুর বাজে, আহা কি সুন্দর উজলে মধুর॥

(নারায়ণের আবির্ভাব ও ভক্তি আদির প্রস্থান।) (ক্রমশঃ)

প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

(স্বামী বিমলানন্দ।)

মানুষ কোন কার্য্যে যখন বহুদিনের অভ্যাস দ্বারা আসক্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে সেই কার্য্য হইতে নিরস্ত করা বড়ই কঠিন। বিশেষতঃ, যদি সেই কার্য্যটী তাহার ভাল বলিয়া ধারণা থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে নিবৃত্ত করা এক প্রকার অসম্ভব। এইরূপ ব্যক্তিকে সহসা যদি কেহ (তাহার যথার্থ কল্যাণ ইচ্ছাতেও) বলে যে, সে যাহা করিতেছে, তাহা অন্যায়, তাহা হইলে উপদেষ্টার কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সে ব্যক্তি দৃঢ়তর আসক্তি প্রকাশ করিয়া সেই নিষিদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হয়।

ব্যক্তিগত এই স্বভাব জাতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই নিমিত্ত সমাজ বা ধর্ম্মসংস্কারকগণ এত চেষ্টা করিয়াও দেশবিশেষে বদ্ধমূল কোন

সামাজিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রীতি নীতির পরিবর্ত্তন করিতে কৃতকার্য্য হন না। যতদিন না অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রচলিত কোন রীতিবিশেষের প্রতি দ্বেষ ভাব আইসে, ততদিন তাহার মূলোৎপাটনকারী কোন বিপ্লব ঘটিতে পারে না। এবং এইরূপ বিপ্লব না ঘটিলে দীর্ঘকালের জাতীয় কোন রীতির পরিবর্ত্তনও হয় না।

সমাজ বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রীতি নীতি বিশেষের প্রতি সাধারণের ঘৃণা তখনই আইসে, যখন উহা মানবহৃদয়ের পবিত্র ভাব সকলের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া মনুষ্যকে উৎপীড়ন বা অধঃপাতিত করিবার উপায় হইয়া দাঁড়ায়। যে সকল রীতি নীতি সাময়িক অবস্থা বিশেষের উপযোগী করিয়া গঠিত, সে গুলি সেই অবস্থাবিশেষের পরিবর্ত্তন বা বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে। কতকগুলি রীতি নীতি ক্ষমতাশালী স্বার্থপর ব্যক্তি দ্বারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কেবল ক্ষমতার প্রভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। এরূপ রীতি নীতি স্বভাবতঃই অনিষ্টকর এবং মনুষ্যের নির্ম্মল ধর্ম্মভাববিরুদ্ধ। সেই নিমিত্ত এরূপ রীতি নীতি অতি অল্পসংখ্যক স্বার্থপর ব্যক্তি ব্যতীত সকলের নিকট ঘৃণিত এবং শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। কিন্তু কতকগুলি রীতি নীতি কোন দেশ বা কালবিশেষে প্রবর্ত্তিত হইলেও তাহা মানবান্তঃকরণের কতকগুলি চিরন্তন আধ্যাত্মিক ভাবের উপর স্থাপিত। এই সকল রীতি নীতি সময়ে অজ্ঞানবশতঃ বিকার প্রাপ্ত হইলেও কোন কালে মনুষ্যের শুদ্ধ ধর্ম্মভাবের সহিত একান্ত বিরোধী হয় না; কখনও এরূপ হয় না যে, মনুষ্য ইচ্ছা করিলে সেই সকল রীতি নীতি পালন করিয়া উচ্চ আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে না পারে।

আমাদের দেশে মূর্ত্তিপূজা এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়। তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই এবং ইতিহাসেও জানিতে পারি যে, অনেক ব্যক্তি মূর্ত্তিপূজা করিয়াও অতি উচ্চ আদর্শে জীবন গঠিত করিয়াছেন এবং করিতেছেন। যদি ধর্ম্মের সহিত মূর্ত্তিপূজা একেবারে বিরোধী হইত, তাহা হইলে এরূপ হওয়া সম্ভব হইত না।

মূর্ত্তিপূজা অনেক স্থলে যে অধর্ম্ম আচরণের উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি। কিন্তু এরূপ স্থলে আমরা মূর্ত্তিপূজার উপর দোষারোপ না করিয়া পূজকের দোষ বলিব। বলিব যে, পূজক যথার্থ

ধর্ম্মজীবন লাভে কৃতসঙ্কল্প নয়, এইজন্য তাহার নিকট মূর্ত্তিপূজা ঐরূপ বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছে। যাহার যথার্থ ধর্ম্মলাভ উদ্দেশ্য, সে মূর্ত্তি পূজার পবিত্রভাব রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম-জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে। আর যাহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, সে ধর্ম্মের অতি উচ্চ উচ্চ কথা বলিয়া (অনেক সময় বাহ্য দৃষ্টিতে মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও) ধর্ম্ম-জীবনে কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর হইতে পারে না। এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, অনুষ্ঠানের উপর ধর্ম্ম-জীবন নির্ভর করে না; উদ্দেশ্য ধর্ম্ম-লাভ হইলেই ধর্ম্ম-লাভ হয়। এ কথার উত্তরে আমরা বলিব, উদ্দেশ্য ধর্ম্ম-জীবন লাভের একটী প্রধান কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নয়। উদ্দেশ্য এবং তদনুকূল উপায়—এই দুইয়ের মিলনে কার্য্য সিদ্ধ হয়। এ কথা যে কেবল ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সত্য, এমন নয়। মনুষ্য যে কোন বস্তু লাভ করিতে ইচ্ছা করুক না কেন, যদি সেই বস্তু লাভের জন্য কোন অনুকূল উপায়ের অনুসরণ না করে, তাহা হইলে তাহা লাভ করিতে পারে না। পণ্ডিত হওয়া যাহার উদ্দেশ্য, তাহাকে পড়িতে হয়।, যে ব্যক্তি শারীরিক বল বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে ব্যায়ামাদি করিতে হয়। কিন্তু পাণ্ডিত্যলাভেচ্ছু ব্যক্তি ব্যায়াম দ্বারা নিজ উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে না; আবার স্বাস্থ্য যাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, পড়া শুনা করিয়া সে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে না। এই নিমিত্তই বলিয়াছি, কেবল উদ্দেশ্য থাকিলে কায হইবে না; তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল উপায়ের অনুসরণ আবশ্যক। ধর্ম্মসম্বন্ধে বলি, ধর্ম্ম-লাভ করিবার কেবল মাত্র ইচ্ছা থাকিলেই হইবে না, সাধন চাই। উদ্দেশ্যরহিত সাধন অতি সহজেই বিকৃত ভাব ধারণ করে। কিন্তু উদ্দেশ্য ঠিক থাকিলে আজ না হয় দুদিন পরে ঠিক সাধন খুঁজিয়া লয়।

সকল বস্তুতে এক অদ্বিতীয় অনন্ত আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লাভের উপায় স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন সাধন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। স্থূল দৃষ্টিতে এই সকল সাধন পরস্পর হইতে বিভিন্ন মনে হইলেও, বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, এই সকল গুলিই এক সত্য অবলম্বনে গঠিত। সর্ব্বভূতে ভগবান দেখিতে হইলে প্রথমে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি (যথা গুরু) বস্তু (যথা সূর্য্য) বা স্থানে (যথা হৃদয়) ঈশ্বর বুদ্ধি স্থাপন করিয়া পুনঃ পুনঃ ভাবনা দ্বারা সেই ঈশ্বর বুদ্ধি দৃঢ় করিতে হয়। এইরূপ অভ্যাস দ্বারা এই ঈশ্বর বুদ্ধি এত দৃঢ় করিতে হয় যে, অবশেষে সেই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু, বা স্থানের

প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন হইবে। এইরূপ দৃঢ় ঈশ্বর বুদ্ধি হইতে—সেই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্ত্যাদিতে যথার্থ ঈশ্বর উপলব্ধি হয়। কোন এক স্থানে ঈশ্বর উপলব্ধি হইলেই জানিতে হইবে যে, তখন ঈশ্বর দর্শনের চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে। তখন যে দিকে দেখিবে, সেই দিকে একমাত্র তাঁহাকেই দেখিবে। বাস্তবিক তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। আমাদের চক্ষু নাই বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। যে দিন এক স্থানে তাঁহাকে দেখিব, সেই দিন সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখিব।

এই বস্তুবিশেষে ঈশ্বর বুদ্ধি স্থাপনা করিবার ব্যবস্থা বেদান্ত শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম প্রতীক উপাসনা। প্রতিমা উপাসনা এক প্রকার প্রতীকোপাসনা বিশেষ। এই প্রকৃত তাৎপর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রতিমা উপাসনা করিলে উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা কোথায় বুঝিতে পারি না।

তর্কের অনুরোধে যদিও স্বীকার করি যে, প্রতিমা উপাসনা উপরোক্ত উচ্চ উদ্দেশ্যে গঠিত হয় নাই, তথাপি আমরা এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না যে, প্রতিমা উপাসনা এখনও আমাদের দেশের সহস্র সহস্র লোকের প্রাণের জিনিষ। এখন সহস্র যুক্তি দেখাইলেও এই সকল লোক মূর্ত্তিপূজা হইতে ক্ষান্ত হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যতদিন না কোন ধর্ম্ম-রীতির উপর সাধারণের ঘৃণা ও বিদ্বেষ আইসে, ততদিন তাহাকে বিলোপ করিতে কেহই সক্ষম হয় না। সাধারণ লোক যুক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে না; হৃদয়ের ভাবই (Feeling) তাহাদিগকে চালাইয়া লয়। সেই নিমিত্ত বলি, তর্কের মুখে যদিও স্বীকার করি, মূর্ত্তিপূজা যুক্তিবিরুদ্ধ, তথাপি আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের মূর্ত্তিপূজার প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় আস্থা আছে, তাহাতে মনেও করিতে পরি না যে, মূর্ত্তিপূজা উঠাইয়া দিবার সময় এখনও আসিয়াছে। যখন আরও দেখি যে, এই মূর্ত্তিপূজা এরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, যাহাতে পূজকের ধর্ম্মভাব উত্তরোত্তর হ্রাস না হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, তখন আমাদের মনে হয় যে, আধুনিক ধর্ম্মপ্রচারক-গণ প্রতিমাদির বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি দিয়া যে শক্তিব্যয় করিতেছেন, সে শক্তি যদি প্রতিমাপূজা কিরূপে সাধিত হইলে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি হইতে পারে, জন সাধারণকে ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের যথার্থ কল্যাণ সাধন করেন।

ঈশ্বরবুদ্ধি একস্থানে দৃঢ় করিবার পক্ষে প্রতিমার উপকারিতা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ দৃষ্টিতে প্রতিমাকে দেখিলে ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করার যে আপত্তি, তাহা অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। অর্থাৎ প্রতীকোপাসকগণ ঈশ্বরকে কস্মিন্ কালে সসীম বলেন না; বরঞ্চ তাঁহার অসীম রূপ সন্দর্শন করিবার নিমিত্তই এই উপাসনা অবলম্বন করেন।

মনুষ্য যতদিন নিজ সসীম মন লইয়া ঈশ্বরকে বুঝিতে যাইবে, ততদিন তাঁহাকে সসীমই দেখিবে। মানুষের ঈশ্বর এক প্রকারের মানুষ ব্যতীত আর কিছু হইতেই পারে না। তবে কাহারও ঈশ্বর অপরের ঈশ্বরের তুলনায় অনেক উচ্চ মানুষ হইতে পারে। আমরা কেহ ত তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা করি নাই; সকলেই নিজের নিজের মনগড়া ভাব লইয়া বসিয়া আছি। যাহার মনের গড়ন যে প্রকার, তাহার ঈশ্বরও সেইরূপ।

এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, তবে ঈশ্বর বাস্তবিক নাই; তিনি কেবল মনুষ্য-কল্পনা-প্রসূত একটী ভাব মাত্র। ঈশ্বর লাভ কথাটী আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক শব্দমাত্র। আমরা বলি, এ আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নয়। দশ জন লোকের ধন নাই বলিয়া যদি তর্ক কর, (জগতে) ধন নাই, তাহা যেমন যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে, আমাদের ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান নাই বলিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই, এ কথা মনে করাও ঠিক সেইরূপ। শাস্ত্র বলিতেছেন, যদি সেই অসীম ঈশ্বরকে দেখিতে চাও, তাহা হইলে তোমার মনকে নির্ম্মল করিতে হইবে। মন যখন একেবারে নির্ম্মল হইয়া যাইবে, তখন ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারিবে। সেই নিমিত্ত যে কোন কার্য্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহাকেই ঈশ্বর লাভের সাধন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রতিমাপূজা দ্বারা এই চিত্তশুদ্ধি কিরূপে সাধিত হইতে পারে, এক্ষণে আমরা সেই বিষয় আলোচনা করিব।

চিত্তশুদ্ধি করিতে হইলে তপস্যা করিতে হয়—শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। শরীরকে প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসাইয়া না দিয়া সংযম এবং শৌচ অবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বা পরহিতার্থে নিযুক্ত করিলে শারীরিক তপস্যা হয়। পরনিন্দা পরচর্চ্চা কঠোর বাক্য প্রয়োগ মিথ্যা কথা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রপাঠ ঈশ্বরীয় কথোপকথন ও ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তনের নাম বাচিক তপস্যা। মানসিক তপস্যা বলিলে বুঝিতে হইবে, কুচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ চিন্তাদি লইয়া থাকা। প্রতিমাপূজক প্রাতঃকালে

উঠিয়া স্নাত হইয়া, পুষ্প চন্দন, দেবগৃহ মার্জ্জন এবং ভোগাদি সংগ্রহদ্বারা তপস্যা করেন। এই কার্য্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার উদ্দেশ্যে এই গুলি সাধিত হইতেছে, তাঁহাকে স্মরণ করা সহজেই হওয়া উচিত। ইহাতে মানসিক তপস্যাও কথঞ্চিৎ সম্পন্ন হইতে পারে। পূজার সময় পুষ্প সুগন্ধ খাদ্যদ্রব্যাদি নিবেদন করিয়া ভগবান তৃপ্ত হইয়াছেন, এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া অন্তরাত্মাকে কত তৃপ্ত করিতে পারা যায়! এই আন্তরিক তৃপ্তি আসিলে মন কত পবিত্র হইয়া যায়! মন অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও আর বাহিরের বস্তুর দিকে সুখ পাইবার আশে ধাবিত হয় না। পূজার পর প্রসাদ লইয়া পাঁচ জন দীন দুঃখীকে খাওয়াইয়া আরও কত তৃপ্ত হওয়া যায়, আরও কত শারীরিক তপস্যা সঞ্চয় করিতে পারা যায়। পূজান্তে জপ এবং স্তোত্র পাঠাদি দ্বারা বাচিক তপস্যা হয়। ঈশ্বর জ্ঞানে প্রতিমার সম্মুখে আসিলে ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন সহজেই হওয়া সম্ভব। পূজা দ্বারা সেই ভাব আরও দৃঢ় হওয়ায় মানসিক তপস্যা হইয়া থাকে।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, যে সকল ব্যক্তি কেবল প্রতিমাদিতে ঈশ্বরকে অবস্থিত মনে করিয়া পূজা করে, তাহারাও ঈশ্বরকে নিজেদের অপেক্ষা অনেক বড় মনে করে। যদি তাহা না মনে করিত, তাহা হইলে তাহারা পূজা করিত না। পূজা করা অর্থ—শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করা। মন পুনঃ পুনঃ যে বিষয় চিন্তা করে, ক্রমশঃ সেই আকার প্রাপ্ত হয়। কোন মহৎ জিনিষের চিন্তা করিতে করিতে মনও উন্নত হয়; তখন তাহাপেক্ষা মহত্তর দ্রব্যের ভাব সহজে তাহার বোধগম্য হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বে যে তপস্যার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহার যেরূপ ধারণা, সে সেইরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিলেই ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকিবে।

একথা বলিবার তাৎপর্য্য যেন কেহ না বুঝেন যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ভাব লইয়া রহিয়াছে, সে চিরদিন সেই ভাব লইয়াই থাকিবে। যে যত উচ্চভাব ধারণা করিতে সমর্থ, তাহাকে তত উচ্চভাব প্রদান করা ধর্ম্মাচার্য্যগণের কর্ত্তব্য। উন্নতিই ত ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য। যদি সম্ভব হয়, অদ্যই ধর্ম্মসংস্কারকগণ সমস্ত লোককে মূর্ত্তিপূজাদি হইতে উঠাইয়া একেবারে সচ্চিদানন্দসাগরে ডুবাইয়া দিন। ইহা যদি সম্ভব

হইত, তাহা হইলে সংসারে আর আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু এ মায়ার সংসারে এরূপ কখনও হইতে পারে বলিয়া স্বপ্নেও মনে হয় না। অতি অল্পসংখ্যক বিশেষ উন্নত লোক ব্যতীত সকলেই ধর্ম্মের সহিত কোন না কোন বাহ্য অনুষ্ঠানাদির সম্পর্ক রাখিয়া দিবে। এই সকল লোকের নিকট বাহ্য-প্রকাশ-শূন্য ধর্ম্মের কথা বলিলে, হয় তোমাকে নাস্তিক পাষণ্ড বলিয়া উড়াইয়া দিবে, নচেৎ তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া বাহ্য অনুষ্ঠানাদি ত্যাগ করিয়া দুদিনের মধ্যে সমস্ত ধর্ম্মভাব লোপ করিয়া বসিবে। বাহ্যাড়ম্বরের আধিক্য হইতে ধর্ম্ম সহজেই বিকৃত হইয়া উঠে, জানি; কিন্তু এ দিকে আবার দেখিতে পাই, একেবারে বাহ্যচিহ্নশূন্য ধর্ম্ম শীঘ্র লোপ পাইয়া যায়। অনেক সুবিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে এত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও যে অদ্যাপি জীবিত আছে, তাহার একটী প্রধান কারণ, হিন্দুদিগের বাহ্যধর্ম্মানুষ্ঠানে নিষ্ঠা। দেখিতে পাওয়া যায়, যে জাতির মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথা প্রচলিত আছে, সেই জাতির মধ্যেই পবিত্র-চরিত্র ধর্ম্মবীরগণ জন্মগ্রহণ করেন।

যেখানে মূর্ত্তিপূজার বেশে অধর্ম্ম রাজত্ব করিতেছে, সেখানে যথার্থ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া অধর্ম্মের স্রোত বন্ধ করিতে চেষ্টা কর। যদি শিক্ষাতে কিছু না হয়, তাহা হইলে (যদি পার) সেখানে মূর্ত্তিপূজা উঠাইয়া দাও। কিন্তু তা বলিয়া ভুলিও না যে, এখনও আমাদের দেশের হাজার হাজার লোক যথার্থ ধর্ম্মলাভের জন্য মূর্ত্তিপূজা করিয়া থাকে। কেবলমাত্র মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে বলিয়া তাহাদের অপকার ব্যতীত উপকার করিতে পারিবে না। কিরূপ ভাবে মূর্ত্তিপূজা করিলে তাহাদের মঙ্গল হইবে, তাহাই তাহাদিগকে শিক্ষা দাও। শিক্ষা দাও, ইন্দ্রিয় সংযম না করিলে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র না হইলে, ভগবান পূজা গ্রহণ করেন না। শিক্ষা দাও, ভগবানের প্রীতিসাধন করিতে হইলে তাঁহার পূজা করিবার পরে তাঁহার দীন দুঃখী সন্তানদিগকে সেবা করিতে হয়, নচেৎ পূজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আর সকলকে ক্রমশঃ বুঝাইতে চেষ্টা কর যে, এই মূর্ত্তির মধ্য দিয়া সেই অমূর্ত্ত অদ্বিতীয় অনন্ত ব্রহ্মে যাইতে হইবে।

স্থানে, বৃদ্ধি হইল?

বার্ত্তিকমূলম্।—ক্ত্তিক্তকাম্যোরিক্প্রকরণাৎ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ক্তিক্ত প্রত্যয় এবং কম ধাতুর যে বৃদ্ধি, 'ইক্' প্রকরণে তেই প্রাপ্তি হয়।

ভাষ্যমূলম্।—ইগ্ লক্ষণয়োর্গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধঃ। ন চৈতে ইগ্ লক্ষণে।

ভাষ্যানুবাদ।—ইক্ লক্ষণ সম্পন্ন যে গুণ এবং বৃদ্ধি, ('ক্ঙিতি চ' সূত্রে) তাহারই প্রতিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা ইক্ লক্ষণ সম্পন্ন নহে।

ভাষ্যমূলম্।—লকারস্ত ঙিত্বাদাদেশেষু স্থানিবদ্ভাবপ্রসঙ্গঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—লকার সমূহের 'ঙ্'ইৎপ্রযুক্ত আদেশেও তাহার স্থানিবদ্ভাবের প্রসঙ্গ হইবে?

ভাষ্যমূলম্।—লকারস্ত ঙিত্বাদাদেশেষু স্থানিবদ্ভাবঃ প্রাপ্নোতি। অচিনবম্। অসুনবম্। অকরবম্।

ভাষ্যানুবাদ।—'লঙ্' 'লুঙ্' 'লিঙ্' প্রভৃতি 'ল'কারসমূহের 'ঙ্' ইৎ প্রযুক্ত তাহাদের স্থানে যাহা আদেশ হইবে, তাহাদেরও স্থানিবদ্ভাব প্রাপ্তি হইবে।

যেমন,—অচিনবম্। ('চিঞ্' ধাতু 'শ্নু' বিকরণ বিশিষ্ট), অসুনবম্ ('ষুঞ্' ধাতু) অকরবম্ ('ডুকৃঞ্ করণে ধাতু') ইত্যাদি স্থলে 'ঙ' ইৎবিশিষ্ট 'লঙ্' 'ল'কার করিলে, তাহার স্থানিবদ্ভাব মানিয়া গুণ নিষেধ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—লকারস্ত ঙিত্বাদাদেশেষু স্থানিবদ্ভাবপ্রসঙ্গ ইতিচেন্ যাসুটো ঙিদ্বচনাৎ সিদ্ধম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—লঙাদি 'ল'কার 'ঙ' ইৎবিশিষ্ট হইয়াছে বলিয়া যদি বল যে, আদেশ সমূহেও তাহার স্থানিবদ্ভাবের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে, তবে 'যাসুট্'-প্রত্যয়ে 'ঙ'ইৎকার্য্য করাতেই তাহা (গুণ বৃদ্ধি) সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অয়ং যাসুটোঙিদ্বচনং শাস্তি তজ্ জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যো ন ঙিদাদেশা ঙিতোভবন্তীতি॥ যদ্যেতজ্ জ্ঞাপ্যতে কথং নিত্যং ঙিতঃ ইতশ্চেতি ঙিতো যৎকার্য্যং তদ্ভবতি ঙিতি যৎকার্য্যং তন্ন ভবতীতি।

কিং বক্তব্যমেতৎ॥ ন হি॥ কথমনুচ্যমানং গংস্যতে। যাসুট এব ঙিদ্বচনাৎ অপর্য্যাপ্তশ্চৈব হি যাসুট্ সমুদায়স্ত ঙিত্বে ঙিতং চৈনং করোতি। তস্যৈতৎ-প্রয়োজনং ঙিতোযৎকার্য্যং তদ্ যথা স্যাদ্ ঙিতি যৎ কার্য্যং তন্মাভূদিতি। ক্ঙিতি চ॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ। যেহেতু, 'যাসুট্ পরস্মৈপদেষু' [illegible] ৩।৪।১০২। ('লিঙ্' ইহাতে পরস্মৈপদের বিভক্তি সমূহ পরে থাকিলে, 'যাসুট্' আগম হয়; আর তাহা উদাত্তবৎ ঙিৎ হয় এবং 'ঙাইৎ হয়') এইসূত্রে, (পাণিনি আচার্য্য) 'যাসুট্' আগম এবং তাহার ঙ্ইৎপ্রযুক্ত কার্য্য উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতেই আচার্য্য জানাইতেছেন যে, 'লঙ্', 'লিঙ্' প্রভৃতি 'ঙ্'ইৎ বিশিষ্ট লকারের স্থানে যাহা আদেশ হয়, তাহাতে 'ঙ্'ইৎ প্রযুক্ত কার্য্য হয় না।

যদি এইরূপই আগম হয়, তবে নিত্যং ঙিতঃ ৩।৪।৯৯। (১) 'ইতশ্চ' ৩।৪।১০০। (২) প্রভৃতি সূত্রে, 'ঙ্'ইৎপ্রযুক্ত যে কার্য্য হওয়া উচিত, তাহা কিরূপে হইয়া থাকে?

এই স্থলে এই নিয়ম করা হইবে যে,—'ঙ্'ইৎ হইবে, তাহার স্থানে যে কার্য্য, তাহা ('লঙ্'প্রভৃতিতেও) হইয়া থাকে। কিন্তু 'ঙ্'ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয়াদি পরে থাকিলে, যে কার্য্য (গুণ নিষেধাদি), তাহা হইবে না।

এইরূপ কি বলা কর্তব্য?

নহে।

না বলিলে, কিরূপে অবগত হইবে?

'যাসুট্'আগমে, 'ঙ্'ইৎ কার্য্য দ্বারাই অবগতি হইবে। কারণ, 'লিঙ্'এর স্থানে যে 'যাসুট্'আগম হইয়াছে, তাহা সমুদয় স্থানেই 'ঙ্'ইৎএর স্থানিবদ্ভাব করিয়া পর্য্যাপ্তরূপে (সম্পূর্ণরূপে) কার্য্যসিদ্ধি হইবে না বলিয়াই, ঙিৎসত্বেও পুনরায় 'যাসুট্' প্রত্যয়, ঙিৎ করিয়াছেন। তাহার (এইরূপ করিবার) প্রয়োজন এই যে,—'ঙ্'ইৎ প্রযুক্ত যে কার্য্য, তাহা যাহাতে হইতে পারে। কিন্তু 'ঙ্'ইৎ পরে থাকিলে যে কার্য্য, তাহা যাহাতে না হয়।

'ক্ঙিতি চ' সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইল॥

---

(১) সকার আছে অন্তে যার, এমন যে ঙ ইৎবিশিষ্ট উত্তম পুরুষ, তাহার নিত্যই লোপ হয়।

(২) ঙইৎ হইয়াছে এমন যে 'ল'কার, সেই লকারের স্থানে পরস্মৈপদস্থিত ইকারান্ত, তাহার লোপ হয়।

দীধীবেবীটাম্ ।৬।

দীধী। বেবী। ইটাম্ ।৬।

দীধী ধাতু বেবী ধাতু এবং 'ইট্'এর গুণ এবং বৃদ্ধি হয় না।

ভাষ্যমূলম্।—কিমর্থমিদমুচ্যতে। গুণবৃদ্ধী মা ভূতামিতি। আদীধ্যনম্। আদীধ্যকঃ। আবেব্যনম্। আবেব্যকঃ। অয়মবোণাঃ শকোঽহকর্ত্তৃম্। কথম্।

বার্ত্তিকমূলম্।—দীধীবেব্যোশ্ছন্দোবিষয়ত্বাদ্ দৃষ্টানুবিধিত্বাচ্চ ছন্দসোঽদী-ধেদদীধয়ুরিতি গুণদর্শনাদপ্রতিষেধঃ।*।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা কেন বলা হইল?

গুণ বা বৃদ্ধি না হয়, এইজন্ত বলা হইল। যেমন,—আদীধ্যনম্ ('আ'—'দীধীঙ্' দীপ্তিদেবনয়োঃ ধাতু+'ল্যুট্' প্রত্যয় এই স্থলে গুণ প্রাপ্তি ছিল) আদীধ্যকঃ (আ—দীধীঙ্+ণ্বুল্ প্রত্যয় এই স্থলে বৃদ্ধি প্রাপ্তি ছিল), আবে-ব্যনম্ (আ-বেবীঙ্ বেতিনাতুল্যে+ল্যুট্, গুণ প্রাপ্তি ছিল), আবেব্যকঃ (আ—বেবীঙ্+ণ্বুল্, বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ছিল) এই সকল স্থলে, গুণ এবং বৃদ্ধি প্রাপ্তি ছিল, এই সূত্রানুসারে নিষেধ হইল।

এই সূত্র না করিলেও চলে।

কিরূপে?

বার্ত্তিকানুবাদ।—দীধীঙ্ এবং বেবীঙ্ ধাতু ছন্দ (বেদ) বিষয়ক, ছন্দে যেরূপ বিধান দেখা যায়, পশ্চাদ্বর্ত্তী গ্রন্থাদিতেও ছন্দেরই অনুকরণ হয় বলিয়া এবং ছন্দেঽদীধেৎ 'অদীধয়ুঃ' প্রভৃতিস্থলে, গুণ দেখা যায় বলিয়া (গুণ বৃদ্ধির) প্রতিষেধ অনাবশ্যক।*।

ভাষ্যমূলম্।—দীধীবেব্যৌ ছন্দসো বিষয়ৌ দৃষ্টানুবিধিশ্চ ছন্দসি ভবতি। দীধীবেব্যোশ্ছন্দোবিষয়ত্বাদ্দৃষ্টানুবিধিত্বাচ্চ ছন্দসঃ। অদীধেদদীধয়ুরিত্যত্র চ গুণস্য দর্শনাদপ্রতিষেধঃ।

অনর্থকঃ প্রতিষেধঃ। অপ্রাপ্তবেধঃ॥

প্রজাপতির্বৈ যৎকিঞ্চন মনসা দীধেৎ॥ হোত্রায় বৃতঃ কৃপয়ন্নদীধেৎ॥ অদীধয়ুর্দাশরাজ্ঞে বৃতাসঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—দীধী এবং বেবী ধাতু বেদের বিষয়। যেরূপ বেদে দেখা যায়, সেইরূপই পরবর্ত্তী গ্রন্থে অনুবিধান হইয়া থাকে। দীধী বেবী ধাতুর বেদ

বিষয়ত্বপ্রযুক্ত, পশ্চাদনুকরণকারী প্রয়োগকর্ত্তাগণও বেদের প্রয়োগ দেখিয়াই প্রয়োগ করিবেন। ('আদীধ্যনম্' প্রয়োগও বেদের অনুকরণ করিয়াই সিদ্ধ হইবে)।

(আর বেদের প্রয়োগ সিদ্ধির জন্যও এই সূত্রের প্রয়োজন নাই; কারণ, বেদে তাহার অন্যথা অর্থাৎ গুণও দেখা যায়। যেমন;—) অদীধেৎ ('লঙ্' এর 'তিপ্'), অদীধয়ুঃ ('লিঙ্'এর 'ঝি'র স্থানে জুস্) এই সকল স্থলে, গুণ দেখা যায় বলিয়া, অপ্রতিষেধ অর্থাৎ গুণ বৃদ্ধির নিষেধ করা নিষ্প্রয়োজন। ('অপ্রতিষেধ' শব্দের অর্থ, এইরূপ নহে যে, কোথাও প্রতিষেধ হয় না; তবে) এইরূপ প্রতিষেধ বিধায়ক সূত্র অনর্থক; এই অর্থে 'অপ্রতিষেধ' শব্দ বলা হইয়াছে। (বেদে, 'গুণ' এর স্থল দেখান হইতেছে),—

"প্রজাপতির্বৈ যৎকিঞ্চন মনসা অদীধেৎ। হোত্রায় বৃতঃ কৃপয়ন্নদীধেৎ। অদীধয়ুর্দাশরাজ্ঞে বৃতাসঃ।"

ভাষ্যমূলম্।—ভবেদিদং যুক্তমুদাহরণমদীধেদিতি।

ইদং ত্বযুক্তমদীধয়ুরিতি। অয়ং জুসি গুণঃ প্রতিষেধ-বিষয় আরভ্যতে স যথৈব ক্ঙিতিচেত্যেনং বাধতে। এবমেনমপি বাধতে।

নৈবদোষঃ। জুসিগুণঃ প্রতিষেধবিষয়ঃ আরভ্যমাণস্তুল্যজাতীয়ং প্রতিষেধং বাধতে। কশ্চ তুল্যজাতীয়ঃ। প্রত্যয়াশ্রয়ঃ। প্রকৃত্যাশ্রয়শ্চায়ম্।

অথবা যেন নাপ্রাপ্তে তস্য বাধনং ভবতি ন চাপ্রাপ্তে ক্ঙিতিনেত্যেতস্মিন্ প্রতিষেধে জুসিগুণ আরভ্যতে। অস্মিন্ পুনঃ প্রাপ্তে চাপ্রাপ্তে চ।

যদি তর্হ্যয়ং যোগোনারভ্যতে। কথং দীধ্যদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'অদীধেৎ' এইটী উপযুক্ত উদাহরণই হইতে পারে বটে; কিন্তু 'অদীধয়ুঃ, এই উদাহরণটী ত অসঙ্গত? কারণ, জুসি চ ৭।৩।৮৩ এই যে প্রতিষেধবিষয়ক সূত্র আরম্ভ করা হইয়াছে; তাহা, যেই প্রকারে, (গুণবৃদ্ধি নিষেধক) 'ক্ঙিতি চ' সূত্রকে বাধ করিয়াছে, ('গুণ'বিধান করিয়াছে) সেই প্রকারে ইহাকে ('দীধীবেবীটাম্' সূত্রকে) ও বাধ করিবে।

ইহা, কোনও দোষ নহে। কারণ, প্রতিষেধ বিষয়ক যে 'জুসি গুণঃ' আরভ্যমাণ সূত্র; তাহা, তুল্যজাতীয় প্রতিষেধকেই বাধ করিবে।

কোন্‌টী তুল্যজাতীয় প্রতিষেধ?

যেইটী প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়াছে। কিন্তু এই (দীধীবেবীটাম্) সূত্রটী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াছে।

তাৎপর্য্যার্থ। জুসি চ ৭।৩।৮৩। (অজাদি 'জুস্' প্রত্যয় পরে থাকিলে, ইগন্তাঙ্গের গুণ হয়) 'জুস্' প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া গুণ হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্র, যদি কাহাকেও বাধ করে; তবে প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া যে 'ক্ঙিতি চ' সূত্র করা হইয়াছে, তাহাকেই বাধ করিবে; কিন্তু প্রকৃতি অর্থাৎ ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে 'দীধীবেবীটাম্' সূত্র করা হইয়াছে, তাহাকে (বিষয় ভিন্ন বলিয়া) বাধ করিবে না।

অথবা 'যাহার অপ্রাপ্তে যে বিধি আরম্ভ করা হয়, সে কেবলমাত্র তাহারই বাধক হয়; কিন্তু অন্যের বাধক হয় না'। এই নিয়মানুসারে, 'ক্ঙিতি চ' সূত্রানুসারেই 'জুস্' প্রত্যয় পরে থাকিলে, গুণের নিষেধ প্রাপ্তি হইয়াছে; সুতরাং তাহার প্রতিষেধের জন্যই 'জুসি চ' সূত্র করা হইয়াছে। এইস্থলে ('দীধীবেবীটাম্'এর স্থলে), ('ক্ঙিতি চ' সূত্রানুসারে) কিন্তু নিষেধ প্রাপ্তেও সূত্রারম্ভ করা প্রয়োজন। নিষেধ অপ্রাপ্তেও সূত্র আরম্ভ করা প্রয়োজন।

অতএব ছন্দে দৃষ্টবিধ্যনুসারে প্রয়োগাদি সিদ্ধ হইবে বলিয়াই এই সূত্র অনাবশ্যক প্রতিপন্ন হইল।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি এই যোগ অর্থাৎ সূত্র আরম্ভ না করা যায়, তবে দীধ্যৎ ('দীধীঙ্' ধাতুর লেট 'ল'কারে 'হ'কারের গুণ না হওয়াতে, 'যণ্' হইয়া অর্থাৎ সন্ধিতে 'ঈ'র স্থানে 'য' হইয়া 'দিধ্যৎ' হইয়াছে) এই প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

বার্ত্তিকমূলম্। দীধ্যদিতি চ শ্যন্ব্যত্যয়েন সিদ্ধম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ। 'দীধ্যৎ' এই প্রয়োগ, গণের ব্যতিক্রম করিয়া 'শ্যন্' প্রত্যয় করিলেই সিদ্ধ হইবে।*

ভাষ্যমূলম্। দীধ্যদিতি চ শ্যন্ব্যত্যয়েন সিদ্ধো ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ। 'দীধ্যৎ' এই প্রয়োগ, ব্যতিক্রম করিয়া 'শ্যন্' প্রত্যয় করিলেই সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ 'দীধী' ধাতু, অদাদিগণে পাঠ না করিয়া, 'শ্যন্' বিকরণ বিশিষ্ট দিবাদিগণে পাঠ করিলেই, 'শ্যন্'এর 'ঙ'ইৎ প্রযুক্ত কার্য্য হয় বলিয়া, 'ক্ঙিতি চ' সূত্রানুসারেই গুণের নিষেধ হইবে; সুতরাং 'দীধীবেবীটাম্' সূত্র করা অনাবশ্যক।

ভাষ্যমূলম্। ইটশ্চাপি গ্রহণং শক্যমকর্ত্তুম্॥ কথমকণিষমরণিষং কণিতাশ্বো রণিতাশ্ব ইতি।

আর্দ্ধধাতুকস্যেড্বলাদেরিত্যত্র ইডিত্যনুবর্ত্তমানে পুনরিড্গ্রহণস্য প্রয়োজন ইট্ ইডেব যথা স্যাৎ যদন্যৎ প্রাপ্নোতি তন্মা ভূদিতি।

কিং চাতঃ প্রাপ্নোতি। গুণঃ। যদি নিয়মঃ ক্রিয়তে। পিপঠিষতের্ক্বিপ্রত্যয়ঃ পিপঠীঃ। দীর্ঘত্বং ন প্রাপ্নোতি।

নৈষ দোষঃ। আঙ্গং যৎকার্য্যং তন্নিয়ম্যতে ন চৈতদাঙ্গম্।

অথবা অসিদ্ধং দীর্ঘত্বং তস্যাসিদ্ধত্বান্নিয়মো ন ভবিষ্যতি॥

ভাষ্যানুবাদ। দীধীবেবীটাম্ সূত্রে, 'ইট্'এর গ্রহণও না করিলে চলে।

অকণিষম্ ('কণ' গতৌ 'লঙ্' এর 'সিপ্' 'ইট্'আগম) অরণিষম্ ('রণ'-গতৌ), কণিতাঃ ('কণ'ধাতু 'লুট্' এর 'বস' প্রত্যয় 'ইট্'আগম), রণিতাবঃ ('রণ'ধাতু 'বস্' প্রত্যয়) প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

আর্দ্ধধাতুকস্যেড্বলাদেঃ ।৭।২।৩৫। (বল প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ আদি বিশিষ্ট আর্দ্ধধাতুকের 'ইট্' আগম হয়) এই সূত্রানুসারে ইট্ আগম হইয়া থাকে। কিন্তু এইসূত্রে, পূর্ব্বস্থিত "নেড্বশিকৃতি ।৭।২।৮।" এই সূত্র হইতে 'ইট্'শব্দের অনুবৃত্তি আনিলেই যাবতীয় কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অথচ এইরূপ অনুবৃত্তি আনা সত্ত্বেও যে, 'আর্দ্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেঃ' সূত্রে, পূর্ব্বসূত্র হইতে অনুবৃত্তি আনা সত্ত্বেও যখন পুনঃ 'ইট্' গ্রহণ্ করা হইয়াছে, তখন তাহার ইহাই প্রয়োজন যে; 'ইট্' আগম হইলে, সেই 'ইট্' যাহাতে 'ইট্' এইরূপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং অন্য যাহা কিছু প্রাপ্তি সম্ভব, তাহা না হয়।

('ইট্'এর স্থানে) অন্য কি প্রাপ্তি ছিল?

গুণ অর্থাৎ 'সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রানুসারে, গুণ প্রাপ্তি হইয়াছিল।

যদি (এই 'আর্দ্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেঃ') সূত্রে, 'ইট্' গ্রহণ ব্যর্থ হওয়াতে) এইরূপ নিয়মই করা হয়, তবে, 'পঠ' ধাতুর উত্তর 'সন্' প্রত্যয় করিয়া "পিপঠিষতেঃ"র উত্তর অ প্রত্যয় অর্থাৎ সম্যক্ লোপবিশিষ্ট 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া ধাতুত্ব নষ্ট হইয়া প্রাতিপদিক হইলে, তাহার প্রথমার একবচনে, 'পিপঠীঃ' এই স্থলে, দীর্ঘত্ব (র্ব্বোরুপধায়াদীর্ঘইকঃ) প্রাপ্তি হইবে না?

এইস্থলে দোষ হইবে না। কারণ, অঙ্গস্থিত যে কার্য্য, তাঁহারই নিয়ম করা হইয়াছে। কিন্তু পিপঠিস্ অন্তবর্ত্তী স্',স্থলে 'র' হইলে, 'র্বোরুপধায়াদীর্ঘঃ। ৮।২।৭৬।' সূত্রানুসারে যে দীর্ঘ হইয়াছে; তাহা, অঙ্গের উত্তর হয় নাই বলিয়া, ইহা অঙ্গে কার্য্য হয় নাই; সুতরাং 'পিপঠিস্' এর 'ইট্' আগম বিহিত 'ই' কারের দীর্ঘ হইলেও কোন দোষ হইবে না।

অথবা দীর্ঘ বিধায়ক 'র্বোরুপধায়াদীর্ঘঃ' অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদস্থিত বলিয়া অসিদ্ধ হওয়াতে দীর্ঘত্ব অসিদ্ধ হওয়াতে তৎপ্রতি নিয়ম হইবে না।

হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ। ৭।

হলঃ। ১। অনন্তরাঃ। ১। সংযোগঃ। ১।

স্বরবর্ণ দ্বারা ব্যবধান না হয় এমন যে হল্ (ব্যঞ্জনবর্ণ), তাহার সংযোগ সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—অনন্তরা ইতি॥ কথমিদং বিজ্ঞায়তে। অবিদ্যমানমন্তরং যেষামিতি। আহোস্বিদবিদ্যমানা অন্তরা যেষামিতি।

কিং চাতঃ। যদি বিজ্ঞায়তে অবিদ্যমানমন্তরং যেষামিতি।

অবগ্রহে সংযোগসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি। অপ্‌স্বিত্যপ্‌স্বিতি। বিলম্বতে হ্যন্তরমিতি।

অথ বিজ্ঞায়তেঽবিদ্যমানা অন্তরা যেষামিতি ন দোষো ভবতি। যথা ন দোষস্তথাস্তু।

অথবা পুনরস্তু অবিদ্যমানমন্তরং যেষামিতি। ননু চোক্তং। অবগ্রহে সংযোগসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি অপ্‌স্বিত্যপ্‌সু ইতি। বিলম্বতে হ্যন্তরমিতি। নৈষ দোষো ন প্রয়োজনম্।

ভাষ্যানুবাদ।—সূত্রস্থিত 'অনন্তরা' শব্দ; কিরূপে ইহা জানা যাইবে যে,—'বিদ্যমান নাই অন্তর (বিলম্বিত কাল) যাহাদের' এইরূপই সমাস হইবে? অথবা 'বিদ্যমান নাই অন্তরা (ভিন্নজাতীয় অর্থাৎ স্বরবর্ণ ব্যবধান) যাহাদের', এইরূপ সমাস হইবে?

ইহাতে অর্থাৎ এইরূপ বিচারে কি ফল হইবে?

যদি এইরূপ মনে করে যে, 'বিদ্যমান নাই অন্তর (ব্যবধান কাল) যাহাদের' তাহাই অনন্তর; তবে, অবগ্রহে (১) সংযোগ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে না।

যেমন,—বেদেতে যে স্থলে পদ বিভাগ করিবার জন্য 'অপ্সু' শব্দ স্থলে, 'অ প্ সু' পাঠ করা হইয়াছে, সেই স্থলে, 'প'কারের পরে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করিয়া 'সু'র পাঠ হয় বলিয়া উহাদের সংযোগ সংজ্ঞাও হইবে না।

(১) 'অ প্ সু' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে বেদে যেখানে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাকে 'অবগ্রহ' বলে।

(সুতরাং 'অপ্ সু'র অকারের গুরু সংজ্ঞাও হইবে না)। কারণ, এই স্থলে ('প্' এবং 'সু'তে) অন্তর (কালবিলম্ব) ই রহিয়াছে।

অনন্তর, যদি "বিদ্যমান নাই অন্তর (বর্ণ ব্যবধান) যাহাদের, সেই অনন্তর" এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায় ; তবে, কোনও দোষ হইবে না। অতএব যেরূপ বিগ্রহ করিলে দোষ না ঘটে, তাহাই হউক।

অথবা পুনরায় পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে যে, 'বিদ্যমান নাই অন্তর (কাল যাহাদের', এইরূপই বিগ্রহবাক্য হউক। যদি বল যে, অবগ্রহে সংযোগ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে না। যেমন (পূর্ব্বোক্ত) 'অপ্ সু' ইতি 'অপ্সু' ইতি। এই স্থলে ত কালই ব্যবধান রহিয়াছে ? (এই দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে ; কারণ,) এই স্থলে সংযোগ সংজ্ঞা হইলে, কোন দোষও হইবে না, বা এই স্থলে সংযোগ সংজ্ঞা দ্বারা কোন প্রয়োজনও সাধিত হইবার নাই। অর্থাৎ 'অপ্ সু' এই স্থলে, 'অ'কারের 'গুরু' করিয়া "গুরোরনৃতোঽনন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য প্রাচাম্" সূত্রানুসারে, 'অ'কারকে প্লুত করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

বার্ত্তিকমূলম্।—সংযোগসংজ্ঞায়াং সহবচনং যথান্যত্র। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—যেমন অন্যত্র সূত্রকার 'সহ' শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ সংযোগ সংজ্ঞায়ও কর্ত্তব্য। *

ভাষ্যমূলম্।—সংযোগসংজ্ঞায়াং সহগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ সহেতি বক্তব্যম্।

কিং প্রয়োজনম্॥ সহভূতানাং সংযোগসংজ্ঞা যথা স্যাদেকৈকস্য মা ভূদিতি। যথান্যত্র॥ তদ্যথা। সহসুপা। উভে অভ্যস্তং সহেতি।

কিং চ স্যাৎ। যদ্যেকৈকস্য সংযোগসংজ্ঞা স্যাৎ। ইহ নির্যায়াৎ নির্বায়াৎ বান্যস্য সংযোগাদেরিত্যেত্বং প্রসজ্যেত। ইহ চ সংস্বরীষ্টেতি ঋতশ্চ সংযোগাদেরিতীট্ প্রসজ্যেত। ইহ চ সংস্ক্রিয়ত ইতি গুণোর্ত্তিসংযোগাদ্যোরিতি গুণঃ প্রসজ্যেত। ইহ চ দৃষৎকরোতি সমিৎকরোতীতি সংযোগান্তস্যেতি লোপঃ প্রসজ্যেত। ইহ চ শক্তা বস্তেতি স্কোঃসংযোগাদ্যোরন্তে চেতি লোপঃ প্রসজ্যেত। ইহ চ নির্যাতো নির্বাতঃ সংযোগাদেরাতোধাতোর্যণ্বত ইতি নিষ্ঠানত্বং প্রসজ্যেত।

ভাষ্যানুবাদ।—সংযোগসংজ্ঞাতে, 'সহ'শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ "হলোনন্তরাঃ সংযোগঃ সহ"

গ্যালিলিও।

(শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।)

"বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দির" প্রতিষ্ঠার পর যে সকল ভক্ত ও সাধক আসিয়া তথায় অর্চনা ও উপাসনা করিতেন, তাঁহাদের মঙ্গলাচরণের সেই মধুর মন্ত্রে, উপাসনার সেই উদাত্ত স্বরে এখনও মন্দির প্রতিধ্বনিত। অনেক দিন হইল, তাঁহাদের দেহাবসান হইয়াছে বটে, তথাপি চিরকালই তাঁহারা আমাদের পরিচিত। মরণ কি করিবে? সমস্ত জীবনব্যাপী কঠোর সাধ্যসাধনার পর "সেত শয়ন সুন্দর"। কবির ভাষায় "যায় সেই কাল বহি, লহরী খেলিয়া আনন্দে চরণাম্বুজে করিয়া প্রণাম"। এইসকল বিজ্ঞানসেবী-দিগের মধ্যে গ্যালিলিও অন্যতম।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যকালে নিউটনের সময় পর্য্যন্ত ইউরোপে অনেকগুলি মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল ; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণই প্রধান ;—রজার বেকন, কোপার্নিকাস, টাইকোব্রে, জন কেপলার, ব্যাপটিষ্টা পোর্টা, উইলিয়াম গিলবার্ট, গ্যালিলিও, নেপিয়ার ডেকার্ট, পাস্কাল, এবং গিওয়েরিক্।

গ্যালিলিও গ্যালিলি ১৫৬৪ অব্দে ইটালির অন্তর্গত পাইসা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ। গ্যালিলিও বাল্যে আপ-নার ও বন্ধুবর্গের আমোদের জন্য কলকারখানার ক্ষুদ্রানুকৃতি ও খেলানা নির্ম্মাণ করিতেন। পিতার অবস্থা ভাল ছিল না ; তথাপি বহুকষ্টে সে সময়কার প্রথামত সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। বিশ্রাম সময় সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন বিদ্যার আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। চিত্রাঙ্কন বিদ্যা এত ভাল বাসিতেন যে, ইহাকেই জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিলেন। সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন বিদ্যার উৎকর্ষলাভার্থ গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। পিতার অনুরূপ ইচ্ছা হওয়ায় ১৫৮১ অব্দে পাইসা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। বিদ্যালয়ে গ্যালিলিও অধ্যাপক-দিগের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন।

এরিষ্টটলের মতোদ্ধার করিয়া তাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের দুরূহ বিষয়গুলি বোঝাইবার চেষ্টা করিতেন। গ্যালিলিওর ইহা ভাল লাগিত না। কোন দার্শনিকতত্ত্বের অনুকূল মতোদ্ধার অপেক্ষা স্বাধীন যুক্তি তাঁহার অধিক

প্রিয় ছিল। জ্যামিতি আরম্ভ করিবার সময় তাহার যুক্তিপ্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। এই প্রকার যুক্তিতে স্বতঃসিদ্ধ বিষয় ভিন্ন বিশেষ কিছু মানিয়া লইতে হয় না। ইউক্লিড পাঠ সমাপনান্তে আর্কিমিডিসের গ্রন্থপাঠ করিলেন এবং তৎকৃত বারিবিজ্ঞান পাঠ করিতে করিতে "বারিমাপক তুলাযন্ত্র" (Hydrostatic Balance) সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেন। এই রচনা পাঠ করিয়া একজন প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত গ্যালিলিওর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন ও "কঠিন পদার্থের ভারকেন্দ্রের অবস্থান" শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিলেন। প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হওয়ায় ১৫৮৯ অব্দে ২৬ বৎসর বয়সে গ্যালিলিও পাইসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং টাস্কেনির ডিউকের সহিত পরিচিত হন। গ্যালিলিওর সময় এরিষ্টটলের বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় মত সাধারণের উপর প্রভূত অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। গ্যালিলিও অধ্যাপক হইয়াই এরিষ্টটলের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির যাথার্থ্য নির্ণয়ে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে অনেকে এরিষ্টটলের মতগুলি আক্রমণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এমন ভাবে আক্রমণ করিতে কাহারও সাহসে কুলায় নাই। গ্যালিলিও দেখিলেন, অধিকাংশ মতের সহিতই সত্যের বিরোধ; কিন্তু তাঁহার অকাট্য যুক্তির বিশেষ কোন ফল হয় নাই, তাঁহার সর্ব্বধ্বংসী আক্রমণ অন্ধবিশ্বাসরূপ দুর্গের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের দুই একটি স্থান ভগ্ন করিল বটে, কিন্তু ফল হইল এই যে, সাধারণে দুর্গমধ্যে আপনাদিগকে একেবারে আবদ্ধ করিল। সে দুর্গ জয় করা অসাধ্য।

এরিষ্টটলের মতে দুইটি পতনশীল বস্তুর মধ্যে যাহার ভার অধিক, তাহার বেগ অন্যটি অপেক্ষা অধিক। কিন্তু গ্যালিলিও বলিলেন, সকল দ্রব্যই সমান বেগে পতিত হয়, এবং যদি বেগের তারতম্য দৃষ্ট হয়, বায়ুর প্রতিরোধই ইহার কারণ। উভয় পক্ষে মহাতর্ক উপস্থিত হইল। গ্যালিলিও দেখিলেন যে, অনায়াসে ইহার মীমাংসা হইতে পারে, কারণ, পাইসায় এক উচ্চপ্রাসাদ (Leaning Tower) আছে; তথা হইতে এই বিষয়ের পরীক্ষা করিলেই সত্য নিরূপিত হইবে। তাহাই হইল, গ্যালিলিও যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই প্রমাণিত হইল। বিপক্ষীয়েরা নিজ চক্ষে আপনাদিগের ভ্রান্তি দেখিয়াও উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের মতই যথার্থ, "এস্থলে কোন অজ্ঞাত কারণ দ্বারা তাঁহাদের মতের ভিন্নতা প্রমাণিত হইতেছে। এক পাউণ্ড অপেক্ষা ১০ পাউণ্ড দশগুণ বেগে পতিত হয়।"

এই পরীক্ষার বিষময় ফল ফলিল। ইহাতে এরিষ্টটলপক্ষীয়েরা নিজ ভ্রম বুঝিতে না পারিয়া গ্যালিলিওর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হইলেন। গ্যালিলিও পাইসা পরিত্যাগ করিয়া প্যাডুয়ায় গমন করিলেন ও তথায় গণিতের অধ্যাপক হইলেন। এথানে অধ্যাপকের বেতন সামান্য বলিয়া তাঁহাকে গৃহশিক্ষকের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। প্যাডুয়ায় আসিয়া গ্যালিলিও কয়েকখানি পুস্তক লিখেন ও এক প্রকার তাপমান যন্ত্রের (Air Thermometer) উদ্ভাবন করেন। যন্ত্রটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। কন্দসমন্বিত এক কাচনলের অগ্রভাগ তরল দ্রব্যপূর্ণ কোন পাত্রের মধ্যে নিমজ্জিত। ঐ তরল দ্রব্যে নলের কিয়দংশ পূর্ণ থাকে; নলের অবশিষ্ট অংশ ও কন্দটি বায়ুপূর্ণ। তাপাধিক্য ও তাপাল্পতা নিবন্ধন ঐ বায়ুর প্রসারণ ও আকুঞ্চন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাপপরিমাণ নির্ণয় করা হইত। এক্ষণে এই যন্ত্রের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

প্যাডুয়ায় গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপনা কালে গ্যালিলিও কোপার্ণিকাস আবিষ্কৃত জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় মতই যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। কোপার্ণিকাসের মত কি, বলিবার পূর্ব্বে গ্যালিলিওর সময়ে প্রচলিত মতের বিষয় কিছু বলা যাইতেছে। গ্যালিলিওর সময় যাঁহার জ্যোতিষতত্ব লোকে বিশ্বাস করিত, তাঁহার নাম টলেমি। যদিও গ্যালিলিওর জন্মের একশত বৎসর পূর্ব্বে কোপার্ণিকাস টলেমির মতের খণ্ডন করিয়াছিলেন, তথাপি সাধারণে টলেমির মতই বিশ্বাস করিত। টলেমি ১৫০ খ্রীঃ অব্দে মিশরদেশান্তর্গত এলেকজাণ্ড্রিয়া নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে অনেকগুলি জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণই প্রধান—পাইথাগোরাস্, এরিষ্টারকাস্, হিপার্কাস্, গ্যালাস্, অলাসগেলাস্ ইত্যাদি। টলেমির মতে আমাদের পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে নিশ্চলভাবে অবস্থিত, ইহার চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই সপ্তগ্রহ বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করে এবং ইহাদিগের বাহিরে নক্ষত্রসমূহের এক বৃত্ত পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। টলেমির মতে সূর্য্য সম্বৎসরে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঠিক বৃত্তকক্ষায় ভ্রমণ করে না; সূর্য্য নিজে বৃত্তকক্ষায় ভ্রমণ করে এবং এই বৃত্তগুলির কেন্দ্রযোগ করিলে যে ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, তাহা একটি বৃত্ত এবং এই বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে আমাদের পৃথিবী অবস্থিত। সূর্য্যের বৃত্তকক্ষা, কেন্দ্রসমষ্টিকৃত এই বৃত্তের একটি এপিসাইকল্ (Epicycle)। টলেমি বিশ্বাস

করিতেন যে, পৃথিবী কখন সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে পারে না, কারণ (১) স্থিরনক্ষত্র (Fixed star) গুলিকে ঠিক একই স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় (২) পৃথিবী যদি ঘুরিত,তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন বস্তুগুলি পৃথিবী অপেক্ষা অল্প ভারী বলিয়া পিছনে পড়িয়া থাকিত ; কারণ,এরিষ্টটলের মতানুসারে যাহার ভার অধিক, তাহারই বেগ অধিক। এই কারণে টলেমির মতে পৃথিবী আপনার অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে পৃথিবীর অধিক বেগ নিবন্ধন পক্ষী ও মেঘসমূহ পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত এবং পূর্ব্ব দিকে কোন প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে উহা একটুকুও অগ্রসর হইত না এবং বোধ হইত, পূর্ব্বদিকে না যাইয়া প্রস্তরখণ্ড পশ্চিম দিকে যাইতেছে। কারণ, প্রস্তর অপেক্ষা পৃথিবীর বেগাধিক্য নিবন্ধন প্রস্তর পৃথিবীর পিছনে পড়িবে।

টলেমির এই মতই লোকে বিশ্বাস করিত। পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে কোপার্নিকাস নামক একজন পোল্যাণ্ডদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাইথাগোরাস্ ও টলেমির মতের তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া, ইহার জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা উপলব্ধি করিয়া ইহাকে যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া স্থির করিলেন, এবং নিজমতের প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে সূর্য্য কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ; ইহার কোন গতি নাই। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি আপন আপন কক্ষায় ভ্রমণ করে। কোপার্নিকাসের মতে পৃথিবীর কক্ষা বৃত্তাকার * এবং ইহার চতুর্দ্দিকে ইহার উপগ্রহ চন্দ্র পরিভ্রমণ করে এবং ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী আপনার চতুর্দ্দিকে একবার পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ভ্রমণ করে।

গ্যালিলিও যখন প্যাডুয়ায় গণিতের অধ্যাপক, তখন কোপার্নিকাসের মতই যথার্থ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন ; কিন্তু সাধারণ বিশ্বাসানুযায়ী তাঁহাকে কিছুকাল টলেমির মত শিখাইতে হইত। প্যাডুয়ায় থাকিতে থাকিতে গ্যালিলিও সকলের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এত লোক তাঁহার অধ্যাপনা শুনিতে আসিত যে, সহস্র লোকের উপযুক্ত গৃহে শ্রোতৃবৃন্দের স্থান সংকুলান হইত না। প্যাডুয়ায় ১৮ বৎসর কাল অধ্যাপনান্তর অনুরুদ্ধ হইয়া আবার পাইসায় প্রত্যাগমন করিলেন। প্যাডুয়ায় থাকিতে থাকিতে একটি আশ্চর্য্য

* ইহার পর কেপলার নামক একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রমাণ করিয়াছেন যে, গ্রহগণের কক্ষাক্ষেত্র বৃত্ত না হইয়া বৃত্তাভাস (Ellipse)।

যন্ত্রের উদ্ভাবন করিলেন, ইহার নাম দূরবীক্ষণ যন্ত্র। কিন্তু অনেকের মতে গ্যালিলিও সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবক নহেন। লিপারসে নামক একজন ওলন্দাজ চসমাবিক্রেতা দুইটি স্থূলমধ্য কাচের (Convex lens) সাহায্যে দৈবক্রমে এমন একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন, যদ্দ্বারা দূরবর্ত্তী বস্তু নিকটে দেখা যাইত। ১৬০৯ অব্দে ভিনিসে অবস্থান কালে গ্যালিলিও শুনিলেন যে, হলাণ্ডে একপ্রকার যন্ত্র আবিস্কৃত হইয়াছে, যাহা দ্বারা দূরবর্ত্তী বস্তু নিকটে দেখা যায়। যন্ত্রটি কি প্রণালীতে নির্ম্মিত, তাহা শুনেন নাই। চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, দুইটী সূক্ষ্মমধ্য (Concave lens) কিম্বা স্থূলমধ্য কাচখণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি নিজেই এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। লিপারসের মত দুইটি স্থূলমধ্য কাচখণ্ড না লইয়া একটি স্থূলমধ্য আর একটী সূক্ষ্মমধ্য কাচ লইলেন। স্থূলমধ্যটি দর্শনীয় বস্তুর দিকে এবং সূক্ষ্মমধ্যটি দর্শকের চক্ষুর দিকে রহিল। এই দূরবীক্ষণ দ্বারা বস্তুগুলি তিনগুণ বৃহদায়তন দেখাইত। যন্ত্রটি লইয়া গ্যালিলিও ভিনিসে উপস্থিত হইলেন; ভিনিসে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এক মাস ধরিয়া প্রধান প্রধান নাগরিকেরা ইহা দেখিতে আসিতেন। ভিনিস গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারী গ্যালিলিওকে বলিলেন যে, ঐ অদ্ভুত যন্ত্রটি পাইলে সেনেট (Senate) আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিবেন। গ্যালিলিও অনুরোধ মত যন্ত্রটি উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। ইহার ফলস্বরূপ চিরজীবনের জন্য প্যাডুয়ার অধ্যাপকপদ পাইলেন এবং বেতন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। এই যন্ত্রটি এত কৌতূহলের উদ্রেক করিয়াছিল যে, নগরের সর্ব্বত্র ইহার অনুকরণে নির্ম্মিত নিকৃষ্ট যন্ত্র বিক্রীত হইতে লাগিল। গ্যালিলিও আর একটি দূরবীক্ষণ তৈয়ার করিলেন; ইহা দ্বারা দূরস্থিত দ্রব্য ৮ গুণ বৃহদায়তন দেখাইত। এই যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্র সম্বন্ধে অনেক বিষয় আবিষ্কার করিলেন। চন্দ্রেও পৃথিবীর ন্যায় পর্ব্বত ও উপত্যকা নয়নগোচর হইল। গ্যালিলিও চন্দ্রের গাত্রসংলগ্ন কৃষ্ণবর্ণ অংশকে সাগর বলিয়া স্থির করিলেন। এবারও এরিষ্টটলমতাবলম্বীরা বিরক্ত হইলেন। কারণ, তাঁহাদের মতে চন্দ্রের সকল অংশ সমোচ্চ অর্থাৎ ইহা সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তুলাকার। তাঁহারা চাক্ষুষপ্রমাণ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া কৌশলজাল অবলম্বন করিলেন। একজন বলিলেন যে, চন্দ্রের শূন্যগর্ভ অংশটি প্রকৃতপক্ষে শূন্যগর্ভ নহে; উহা একপ্রকার অদৃশ্য স্বচ্ছ স্ফাটিক পদার্থে পূর্ণ। গ্যালিলিও বলিলেন, এ মত বেশ

আশ্চর্য্য; ইহার দোষ এই যে, ইহা প্রমাণিত নহে এবং প্রমাণ করা যাইতেও পারে না।

১৬১০ অব্দের ৭ই জানুয়ারি তারিখে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণসাহায্যে দেখিলেন যে, বৃহস্পতির সম্মুখে ৩টী জ্যোতিষ্ক রহিয়াছে; ৮ই তারিখে দেখিলেন যে, তাহারা বৃহস্পতির বিপরীত দিকে রহিয়াছে। ১০ই তারিখে দেখেন যে, তন্মধ্যে ২টি কেবল ৮ই তারিখের ন্যায় রহিয়াছে। ইহা হইতে চিন্তা করিয়া অনুমান করিলেন যে, এই তিনটি জ্যোতিষ্ক নক্ষত্র নহে, ইহারা বৃহস্পতির উপগ্রহ এবং চন্দ্র যেমন পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, ইহারাও সেইরূপ বৃহস্পতির চতুর্দ্দিকে আপন আপন কক্ষায় পরিভ্রমণ করে। ১৩ই তারিখে বৃহস্পতির আর একটি উপগ্রহ নয়নগোচর হইল। এইরূপে গ্যালিলিও বৃহস্পতির চারিটি উপগ্রহের আবিষ্কার করেন। *

গ্যালিলিওর এই আবিষ্কার সকলে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এরিষ্টটল-মতাবলম্বীরা ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না। বহু অনুরোধসত্ত্বেও প্যাডুয়ার দর্শনশাস্ত্রের প্রধানাধ্যাপক দূরবীক্ষণ সাহায্যে বৃহস্পতির উপগ্রহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে সম্মত হইলেন না। তর্কশাস্ত্রের অবরোহণ প্রণালী (Deductive reasoning) অবলম্বনে প্রমাণ করিলেন যে, উপগ্রহের অস্তিত্ব অসম্ভব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধারণে সাতটি মাত্র গ্রহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন—চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। গ্যালিলিওর চারিটি উপগ্রহের কথা শুনিয়া সিজি নামক একজন প্রসিদ্ধ ফ্লোরেন্সবাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ এক কৌতুকাবহ যুক্তির অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন, সাতটির অধিক গ্রহ বা গ্রহশ্রেণীর জ্যোতিষ্ক (Planetary Bodies) থাকিতে পারে না, কারণ, অধিকাংশ বস্তুই সাতটি করিয়া বর্ত্তমান, যথা (১) মস্তকের সাতটি ছিদ্র—দুইটি নাসারন্ধ্র, দুইটি চক্ষু, দুইটি কর্ণ এবং একটি মুখবিবর॰ (২) সাতধাতু (৩) সপ্তাহের সাতদিন ইত্যাদি। বিপক্ষীয়দলের একজন বলিলেন, "দূরবীক্ষণ দ্বারা ভূপৃষ্ঠে আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হয় বটে, কিন্তু নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্ক সকলের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। বিবর্ত্তিত আলোক-রশ্মিই (Refracted ray of light) এই ভ্রান্ত ধারণার কারণ। আমার

* ইহার প্রায় তিন শত বৎসর পরে ১৮৯২ অব্দে লিক্ অবসারভেটারির অধ্যক্ষ প্রোফেসর বারণার্ড (Professor Barnard) বৃহস্পতির আর একটী উপগ্রহের আবিষ্কার করিয়াছেন। অদ্যাবধি বৃহস্পতির এই ৫টি উপগ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে।

দেহ মধ্যে আত্মা আছে, এই জ্ঞান অপেক্ষা এই ভ্রান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত। প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, তথাপি চারিটি নূতন গ্রহের অনুমোদন করিব না"।

দূরবীক্ষণ আবিষ্কারে একটি সুবিধা হইল; এই যন্ত্র সাহায্যে গ্রহমণ্ডল অতি সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, কিন্তু তারকাগুলি কেবল অধিকতর উজ্জ্বল দেখা যায়। পূর্ব্বে গতি দেখিয়া গ্রহের পরিচয় হইত; কিন্তু এখন হইতে দূরবীক্ষণ সাহায্যে অনায়াসে গ্রহ ও নক্ষত্র চিনা যাইত।

গ্যালিলিও দেখিলেন যে, বৃহস্পতির উপগ্রহের আবিষ্কারে নাবিকদিগের একটি মহৎ উপকার সাধিত হইতে পারে—সমুদ্রে কোন স্থানের দ্রাঘিমা (Longitudo) নির্ণয়। তিনি স্থির করিলেন যে, নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বনে দ্রাঘিমা নির্ণীত হইতে পারে। বৃহস্পতির কোন নির্দ্দিষ্ট উপগ্রহের আবর্ত্তন কাল নির্ণয় করিতে হইবে; এবং ফ্লোরেন্স হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, কখন ইহা ঠিক বৃহস্পতির ছায়ায় প্রবেশ করে। ইহা হইতে সম্বৎসরের মধ্যে কতবার ও কোন্ সময় সেই নির্দ্দিষ্ট উপগ্রহ ছায়ায় প্রবেশ করে, গণনা করিতে হইবে। গ্যালিলিও দেখিলেন যে, পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় আপনার চতুর্দ্দিকে একবার অর্থাৎ ৩৬০° ডিগ্রি ভ্রমণ করে অথবা ১ ঘণ্টায় ১৫° ডিগ্রি ভ্রমণ করে; অর্থাৎ ফ্লোরেন্সে যখন মধ্যাহ্ন ১২টা, ১৫° পশ্চিমে তখন পূর্ব্বাহ্ন ১১টা। অতএব সময়ের তারতম্য দেখিয়া দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যাইতে পারে। গ্যালিলিও স্থির করিলেন যে, যদি ফ্লোরেন্স ও অপর কোন স্থান হইতে বৃহস্পতির কোন নির্দ্দিষ্ট উপগ্রহের বৃহস্পতির ছায়ায় প্রবেশ পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে উভয় স্থানের ঘটিকা-নির্দ্দিষ্ট সময়ের তারতম্য দৃষ্ট হইবে। ফ্লোরেন্সে পূর্ব্বোক্ত পঞ্জিকানির্দ্দিষ্ট সময় ও দ্বিতীয় স্থানের সময় হইতে অনায়াসে দ্বিতীয় স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যাইতে পারে। গ্যালিলিওর এই যুক্তি তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করে; কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করার অনেক প্রতিবন্ধক আছে। চলমান ডেক হইতে বৃহস্পতির উপগ্রহের এই পর্য্যবেক্ষণ বড় সহজ ব্যাপার নহে; এবং গ্যালিলিওর সময় যথার্থ সময়জ্ঞাপক ঘড়ি ছিল না। এই সকল সুবিধা থাকিলে গ্যালিলিওর সময়ই এই কৌশল কার্য্যে পরিণত হইত।

এই ঘটিকার কথার অবতারণা করিয়া গ্যালিলিও সম্বন্ধে আর একটি

কথা মনে পড়িল। ১৮ বৎসর বয়সে গ্যালিলিও একদিন পাইসার গির্জ্জায় উপাসনা করিতে গেলেন ; দেখিলেন যে, একজন ভৃত্য আসিয়া ল্যাম্প তৈলপূর্ণ করিয়া দিল। ল্যাম্পটি দুলিতে লাগিল। তিনি একাগ্রচিত্তে ইহা দর্শন করিতে লাগিলেন। অবশেষে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন যে, পরিদোলনের (Oscillation) সময় গুলি সমান। ইহাই পরিদোলক (Pendulum) যন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। বৃহস্পতির পর শনিগ্রহের প্রতি গ্যালিলিওর মনোযোগ আকৃষ্ট হইল ; কিন্তু তাঁহার দূরবীক্ষণ শনিতত্ত্বাবিষ্কারোপযোগী ছিল না। তিনি এক স্থলে বলিতেছেন, "আমি বিস্ময়ের সহিত দেখিয়াছি, শনি একটি মাত্র জ্যোতিষ্ক নহে ; কিন্তু তিনটি জ্যোতিষ্কের সমষ্টি। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কাহারও আপেক্ষিক গতি নাই। দুইটি ছোট বৃত্তের মাঝখানে একটি বৃহৎ বৃত্ত রাখিলে যে প্রকার দেখায়, ইহার আকার তদ্রূপ। সহস্র অপেক্ষা অল্প গুণ বৃহদায়তন করে, এমন দূরবীক্ষণ সাহায্যে যদি শনিকে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বৃত্তাভাসবৎ (Ellipse) দেখা যাইবে।"

অতঃপর গ্যালিলিও সৌর কলঙ্কের (Sun-spot) আবিষ্কার করেন। এই সকল সৌর কলঙ্ককে সূর্য্যমণ্ডলের উপর চলিতে দেখিয়া প্রথমে স্থির করিলেন যে, কতিপয় গ্রহ সূর্য্যের চারি ধারে ভ্রমণ করে এবং জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যমণ্ডলকে পশ্চাতে রাখে বলিয়া কলঙ্কবৎ প্রতীয়মান হয়। তাহার পর গ্যালিলিও বুঝিতে পারিলেন যে, ইহারা সূর্য্যের গাত্রসংলগ্ন গ্রহ নহে। ইহার পর নানা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিলেন যে, সূর্য্যের আপনার অক্ষের চারিদিকে আবর্ত্তনই এই সকল সৌর কলঙ্কের গতির কারণ এবং গণনা করিলেন যে, এই আবর্ত্তন করিতে সূর্য্যের ২৮ দিন লাগে। সৌর কলঙ্কের ন্যায় সূর্য্যের গাত্রে কতকগুলি অংশ আবিষ্কার করিলেন, যাহারা অবশিষ্টাংশ অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল।

১৬১১ অব্দে গ্যালিলিও রোমদর্শনে যাত্রা করেন। যাজকসমাজ প্রতিভার জন্য গ্যালিলিওকে সাদর সম্ভাষণে প্রীত করিলেন। সৌরকলঙ্ক ও শুক্রগ্রহ প্রদর্শনের জন্য আপনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় এক বিজ্ঞানসমিতিতে যোগদান করিলেন। এই সমিতি নিজ ব্যয়ে গ্যালিলিওর অনেকগুলি পুস্তক মুদ্রিত করিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞানানুশীলনে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিলেন। রোম হইতে ফ্লোরেন্স প্রত্যাগমন করিয়া গ্যালিলিও "ভাসমান বস্তুবিষয়ক প্রস্তাব" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধে আর্কিমীডিসের

মতই যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। আর্কিমীডিসের নিয়ম—"কোন কঠিন বস্তুকে জলাদিতে নিমজ্জিত করিলে তাহার সমায়তন জলাদি স্থানান্তরিত হয় এবং ঐ স্থানান্তরিত জলাদির ভারের তুল্য বলে উহা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।" এই প্রবন্ধে এরিষ্টটলমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের মতের খণ্ডন করিলেন। তাঁহাদের মতে কোন বস্তুর আকৃতিই তাহার জলাদিতে নিমজ্জিত কিম্বা ভাসমান হইবার কারণ। এই প্রকার ভ্রান্তি প্রদর্শনে গ্যালিলিওর শত্রুসংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। পূর্ব্বপ্রচলিত মতের পোষণকারী অধ্যাপকেরা আপনাদিগের সম্মান ও মর্য্যাদার হানি হইতেছে দেখিয়া গ্যালিলিওকে বিদ্বেষপূর্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। কোপার্নিকাস আবিষ্কৃত জ্যোতিষ তত্ত্বের সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যাজকমণ্ডলী তাঁহাকে বিষচক্ষে দেখিতে লাগিলেন; গ্যালিলিও এবং তাঁহার মতাবলম্বীদিগকে যথেচ্ছ গালি দিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, "জ্যামিতি শয়তানের শাস্ত্র এবং খ্রীষ্টান শাস্ত্রবিরুদ্ধমত প্রচার করার জন্য গণিতজ্ঞদিগকে নির্ব্বাসিত করা উচিত।" যাজক সম্প্রদায় গ্যালিলিওর উপর কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিবার পূর্ব্বে তখনকার যাজকসভা কিরূপ অত্যাচার করিতেন, বলা যাইতেছে। রোমে একটি যাজকসভা ছিল, তাহার নাম ইন্‌কুইজিশান্ (Inquisition)। যাঁহারা পৌত্তলিক, কিম্বা রোম্যান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন, কিম্বা স্বাধীনভাবে ধর্ম্মমতের আলোচনা করিতেন, তাঁহারা এই সভা দ্বারা দণ্ডনীয় হইতেন। তাঁহাদিগকে অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ করা হইত কিম্বা ভয়ানক যাতনা প্রদান করা হইত; এমন কি, সময়ে সময়ে খুঁটিতে বাঁধিয়া জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করা হইত। এই শেষোক্ত কার্য্যের নাম ছিল, "বিশ্বাসমূলক কার্য্য" (Act of Faith)!!! রোমের Inquisition সভা গ্যালিলিওকে শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিও পুনর্ব্বার রোমে গমন করিলেন। জনশ্রুতি উঠিল, বিচারের জন্য তাঁহাকে রোমে আসিতে হইয়াছে। গ্যালিলিওর বিচারের জন্য Inquisition সভা আপনাদিগের সভাভুক্ত কয়েকজন যাজককে নিযুক্ত করিলেন। গ্যালিলিওকে বলা হইল যে, তিনি কোন প্রকারে পৃথিবীর গতি সম্বন্ধীয় মত প্রচার ও সমর্থন করিতে পারিবেন না, এমন কি, মতটি বিশ্বাসও করিতে পারিবেন না; ইহার অন্যথা হইলে কারাবদ্ধ হইবেন, এই ভয়প্রদর্শন করা হইল। কারাগারের ভয়ে গ্যালিলিও তাঁহাদের আজ্ঞা-

নুযায়ী কার্য্য করিবেন, স্বীকার করিলেন। যাজকসভা ঘোষণা করিলেন যে, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি সম্বন্ধে যত পুস্তক লেখা হইয়াছে, সমস্তই ভ্রমমূলক ও খ্রীষ্টান শাস্ত্র বিরুদ্ধ। গ্যালিলিও বিষণ্ণচিত্তে রোম হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর "জোয়ার ভাটার কারণ" শীর্ষক একখানি পুস্তক লিখেন। এই পুস্তকের মুখবন্ধে আর্ক ডিউক লিওপোল্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "রোমে যখন যাজক সম্প্রদায় কোপার্ণিকাসের পুস্তক ও তাঁহার মত বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন, তখন আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম। কিন্তু এই ভদ্রমহোদয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তক খানির প্রচার রহিত করিয়াছেন ও মতটি ভ্রান্ত এবং খ্রীশ্চিয়ানশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমার মত নিস্তেজ বুদ্ধিযুক্ত লোকের, আমা অপেক্ষা অধিক-জ্ঞানী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ যে মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা বিশ্বাস ও মান্য করা উচিত; এই বিবেচনা করায় আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, অনুগ্রহ করিয়া আমার এই মতটিকে স্বপ্ন বা উপকথার ন্যায় জ্ঞান করিবেন; কারণ, ইহা পৃথিবীর গতিরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। কিন্তু কবি তাঁহার কল্পনাপ্রসূত সৃষ্টির বিশেষ পক্ষপাতী, আমিও তাঁহার মত আমার এই ভ্রান্তির আদর করিতেছি।" পাঠকগণকে বলিতে হইবে না যে, ইহা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে পূর্ণ।

এই সময় পোপ পঞ্চম পলের মৃত্যু হয় এবং গ্যালিলিওর বন্ধু কার্ডিনাল বারবেরিণি (Cardinal Barberini) আরবান্ নামে পোপপদে অভিষিক্ত হইলেন। গ্যালিলিওর বন্ধুরা নবাভিষিক্ত পোপকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহাকে রোমে যাইতে অনুরোধ করিলেন। জরাজীর্ণ গ্যালিলিওকে ডুলি চড়িয়া রোমে যাইতে হইয়াছিল (১৬২১)। পোপ আরবান্ গ্যালিলিওকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন ও কতকগুলি উপঢৌকন প্রদান করিলেন। পোপ তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব মুরুব্বি Duke of Tuscanyর পুত্রের সহিত আলাপ করিয়া দিলেন। এই প্রকার ব্যবহারে গ্যালিলিও আশ্বস্ত হইলেন এবং মনে করিলেন, যাজক সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি আর অত্যাচার করিবে না।

১৬৩২ অব্দে গ্যালিলিও "কোপার্ণিকাস আবিষ্কৃত পৃথিবীর গতিবিষয়ক মত সম্বন্ধে কথোপকথন" শীর্ষক একখানি পুস্তক প্রচারিত করিলেন। এই খানিই তাঁহার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ পুস্তক। এই পুস্তকে চারিদিনের কথোপকথনে কোপার্ণিকাস ও টলেমির পৃথিবীর গতিসম্বন্ধীয় মতের সমালোচনা করা হইয়াছে। এই পুস্তকের মুখবন্ধে "বিবেচক পাঠকের

প্রতি” সম্বোধন করা হইয়াছে। মুখবন্ধ বিদ্রূপপূর্ণ; লিখিতেছেন, “কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি হিতকারী ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কেহই পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে মত প্রচার করিতে পারিবে না। কতিপয় অবিমৃশ্যকারী ব্যক্তি বলিলেন যে, এই আদেশ প্রদান করিবার পূর্ব্বে আজ্ঞাকারীরা যুক্তি সহকারে বিচার করেন নাই। তাঁহারা অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে, জ্যোতিষ বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তার বাধা দেওয়া উচিত নহে। এই সকল নির্ব্বোধ অভিযোগ শুনিয়া আমি নীরব থাকিতে পারি নাই। আমি স্থির করিলাম যে, প্রকৃত সাক্ষ্য দিবার জন্য আমাকে পৃথিবীর নাট্যশালায় প্রকাশ্যে বাহির হওয়া উচিত। আমি এই পুস্তকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ইটালি হইতে শুদ্ধ আত্মার মোক্ষ সাধন সম্বন্ধীয় মতের প্রচার হয় নাই, এই দেশ হইতে বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপযোগী মতও আবিষ্কৃত হইয়াছে”।

তিন জন লইয়া এই কথোপকথন। প্রধান বক্তা কোপার্ণিকাসের মতের ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং এরিষ্টটল ও টলেমির মতসমর্থক দ্বিতীয় বক্তার অকিঞ্চিৎকর আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন। তৃতীয় বক্তা যথার্থ আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। তৃতীয় বক্তার অবতারণায় পুস্তকখানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই পুস্তক প্রচারে রোমে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। Inquisition সভা গ্যালিলিওর বিচারের জন্য স্থির করিলেন। তাঁহাকে রোমে আসিবার আজ্ঞা করা হইল। টাস্কানির ডিউক গ্যালিলিওর বৃদ্ধাবস্থা ও ভগ্নস্বাস্থ্য ইত্যাদি কারণ প্রদর্শন করিয়া পোপের সভায় একজন দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু যাজকসম্প্রদায় তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না; সুতরাং ১৬৩৩ অব্দে গ্যালিলিওকে রোমে আসিতে হইল। ধর্ম্মের অবমাননা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ আনয়ন করা হইল। অনেকের বিশ্বাস, গ্যালিলিওকে অন্ধকার কারাগৃহে রাখা হইয়াছিল; কিন্তু ইহার একবর্ণও সত্য নহে। তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু যতদূর সম্ভব, সদ্ব্যবহার করা হইত। যখন তাঁহার বিচার হইতেছিল, তখন গ্যালিলিওকে কারাগারে থাকিতে হয় নাই। টাস্কেনির ডিউকের বাটীতে থাকিতেন। কিন্তু বিচারের শেষকালে যখন বিচারালয়ে গ্যালিলিওর উপস্থিতির প্রয়োজন হইত, তখন তাঁহাকে কারাগারে থাকিতে হইত। কিন্তু নিয়মানুযায়ী নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করিতে হইত না। টাস্কেনির

রাজসরকার হইতে তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছিল; কিন্তু এই প্রকার ব্যবহারও গ্যালিলিওর ভাল লাগিল না। অবশেষে পোপের ভ্রাতুষ্পুত্র কার্ডিনাল বার্বেরিণি আপনার ঝুঁকিতে তাঁহাকে টাস্কেনির ডিউকের প্রাসাদে থাকিবার অনুমতি দেওয়াইলেন। দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের দিন গ্যালিলিওকে পাপানুতাপব্যঞ্জক বেশে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। Inquisition সভার হস্তে প্রাণদণ্ড দিবার ক্ষমতা ছিল। Inquisition গ্যালিলিওকে যথাসম্ভব শাস্তি প্রদানের ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। গ্যালিলিওকে রীত্যনুযায়ী ও প্রকাশ্যে আপনার মত ভ্রান্তিযুক্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইল। Inquisition সভা দণ্ডাজ্ঞালিপি পাঠ করিলেন। তাহা হইতে আমরা সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

"গ্যালিলিও, ১৬১৫ অব্দে যাজক সভা কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কারণে তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছিল—(১) সূর্য্য নিশ্চলভাবে বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি আছে, এই ভ্রান্ত মতের সমর্থন।

(২) ছাত্রদিগকে এই মতের অধ্যাপনা।

(৩) পত্রদ্বারা কতিপয় জর্ম্মাণিদেশীয় গণিতজ্ঞের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা।

(৪) সৌরকলঙ্ক সম্বন্ধীয় মতের আবিষ্কার ও সমর্থন।

(৫) আপনার মনোমত খৃষ্টীয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা উহা হইতে উদ্ধৃত মতের খণ্ডন।

সেই সময় তোমার প্রতি কঠোর ভাবে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা না করায় যাজক সভা তোমাকে এই মত পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন এবং বলেন যে, পরিত্যাগ না করিলে তুমি ইহার প্রচার, পারপোষণ ও সমর্থন করিতে পারিবে না। এই আদেশ মান্য না করিলে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল। যাজক সভার সভাপতি তোমাকে সামান্যরূপ তিরস্কার করেন এবং কয়েকজন সাক্ষীর সম্মুখে তোমাকে এই মত পরিত্যাগ করিতে বলেন। এই আদেশ পালন করিবে প্রতিজ্ঞা করায় তোমাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছিল।

ভবিষ্যতে কোন অপকার সাধিত না হয় ও রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মের কোন ক্ষতি না হয়, এই উদ্দেশে যাজক সভাকর্ত্তৃক এই মতের সমর্থক পুস্তকা-

বলীর প্রচার রহিত হয় ও মতটি ভ্রান্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ঘোষণার পরও তুমি "কথোপকথন" শীর্ষক এক-খানি পুস্তক প্রচার করিয়াছ। ইহা দ্বারা নিষিদ্ধ মতের পুনঃ প্রচার হইতেছে, এবং পুস্তকখানিকে কৌশল করিয়া এমনভাবে লেখা হইয়াছে যে, যেন এই মত সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ আছে। এই দোষে যাজকসভা বিচারের জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন; বিচারালয়ে তুমি স্বীকার করিয়াছ যে, যাজকসভার ঘোষণার পর পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। তোমার শত্রুপক্ষীয়েরা বলিতেছে যে, তুমি এই মত পূর্ব্বে শপথ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলে ও ইহার জন্য তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। তুমি কার্ডিনাল বেলারামাইনের (Cardinal Bellaramine) নিদর্শনপত্র (Certificate) দ্বারা প্রমাণ করিয়াছ যে, তুমি পূর্ব্বে এ মত শপথ করিয়া পরিত্যাগ কর নাই এবং তোমাকে শাস্তিও দেওয়া হয় নাই। তোমার Certificate অনুসারে তোমাকে জ্ঞাত করা হইয়াছিল যে, পৃথিবীর গতি ও সূর্য্যের নিশ্চল অবস্থা বিষয়ক সিদ্ধান্ত খৃষ্টীয়শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এই Certificateই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। পৃথিবীর গতি সম্বন্ধীয় মত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ জানিয়াও কোন্ সাহসে তুমি সম্ভব বলিয়া ইহার প্রচার ও সমর্থন করিয়াছিলে? বিচারালয়ে তুমি একজন প্রকৃত রোম্যান্ ক্যাথলিকের ন্যায় উত্তর প্রদান করিয়াছ।

অতএব আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার মাতা ভগবতী মেরিকে ভক্তি-ভাবে সম্বোধন করিয়া তোমার সম্বন্ধে এই মন্তব্য লিখিতেছি। শাস্ত্রবিরুদ্ধা-চরণের জন্য তুমি দোষী সাব্যস্ত হইয়াছ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী তোমাকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

আমরা আদেশ করিতেছি, যদি তুমি আমাদের সম্মুখে অকপট হৃদয়ে ও সরল বিশ্বাসে শপথ করিয়া এই মত পরিত্যাগ কর ও আপন ভ্রান্তির জন্য আত্মগ্লানি প্রকাশ কর, তাহা হইলে শাস্তি হইতে তোমাকে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য ও ভবিষ্যতে আর এমন কার্য্য না কর, ইহার জন্য তোমার প্রতি নিম্নলিখিত শাস্তি প্রদত্ত হইল।

(১) প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা 'কথোপকথন' শীর্ষক পুস্তকের প্রচার রহিত হইবে।

(২) যাজক সভার আদেশ মত রীত্যানুযায়ী কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

(৩) তিন বৎসর ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সপ্তাহে একবার অপরাধ ভঞ্জনের ৭টি শ্লোক আবৃত্তি করিতে হইবে।" পুস্তকখানি দগ্ধ করিবার আদেশ হইল। গ্যালিলিওকে জানু পাতিয়া বাইবেল স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিয়া স্বীয় মতের প্রত্যাহার করিতে হইল ; এবং ভবিষ্যতে আবার মত সমর্থন করিলে দণ্ডনীয় হইবেন, স্বীকৃত হইলেন।

ইহার পর উত্থান করিয়া নিকটস্থিত এক বন্ধুর কর্ণে আস্তে আস্তে বলিলেন, "তবুও পৃথিবী ঘুরে।"

চারিদিন কারাবাসের পর গ্যালিলিওর মুক্তি হইল। ইহার পর তাঁহাকে চোখে চোখে রাখা হইত। ইহার পর পাঁচ বৎসর ধরিয়া গ্যালিলিও ফ্লোরেন্স যাইবার অনুমতি পান নাই। ফ্লোরেন্স যাইয়া বাটীর বাহিরে যাইতে ও পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার আদেশ ছিল না। ১৬৩৭ অব্দে গ্যালিলিও দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন ; চক্ষুরত্ন হারাইয়া একেবারে অন্ধ হইলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার এক ছাত্র লিখিয়াছেন, "চক্ষুদ্বয় চিরকালের মত জ্যোতিঃহীন হইল। সত্য সত্যই বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার চক্ষু পরলোকগত সকল ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দেখিয়াছে এবং ভবিষ্যদ্‌বংশীয়ের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে।" এই দুর্ভাগ্যের পর Inquisition তাঁহার উপর ততটা কঠোর ব্যবহার করেন নাই এবং গ্যালিলিও বন্ধুবর্গের সহিত আলাপ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। ১৬৪২ অব্দে ৭৮ বৎসর বয়সে চিরকালের মত মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ধ্রুবচরিত্র।

পঞ্চম অঙ্ক।—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অবশিষ্ট)

লক্ষ্মী। প্রভো! দেখ চেয়ে
তোমার পরম ভক্ত ধ্রুব শিশু মগ্ন তব ধ্যানে।
রাখহ মিনতি নাথ! ত্বরা দাও দরশন।

নারা। প্রিয়ে! সকলই জানি আমি।
কিন্তু কি করিব—যতক্ষণ ভক্ত, নাহি করে
পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ আমার উপরে

তৎক্ষণ নাহি পায় মম দরশন।
বাসনার লেশ থাকিলে হৃদয়ে নাহি মিলে দরশন।
ধ্রুবের এখন হইয়াছে পূর্ণ বৈরাগ্য উদয়।

লক্ষ্মী। তবে অন্তর্যামী, বিলম্ব করিছ কেন?
ভক্ত প্রতি আর হোয়োনা নিষ্ঠুর প্রভু!

নারা। প্রিয়ে! ভক্ত কাঁদে মম তরে,
আমি করি ভক্ত তরে অধিক ক্রন্দন।
মম তরে, এক বিন্দু অশ্রু যদি ভক্ত করে বিসর্জ্জন,
না পারি থাকিতে আর বৈকুণ্ঠে তখন—
ছুটে এসে দিই আমি ভক্তে আলিঙ্গন।
ভক্তের ব্যাথায় ব্যথিত হৃদয় মম।

লক্ষ্মী। তবে নাথ! তব ভক্ত
তব তরে এত কষ্ট পাইল বা কেন?

নারা। প্রিয়ে। ভক্তে ছেড়ে এক দণ্ড না পারি থাকিতে;
বৃথা মোরে নাহি গঞ্জ রমে।
মাতৃ অঙ্ক ত্যজি, মাতৃস্তন ত্যজি,
গভীর নিশায়, গাঢ় অন্ধকারে,
প্রবেশিল ধ্রুব যবে নিবিড় কাননে,
যখন সে একবার, ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল আমারে
"কোথা হরি, কোথা পদ্মপলাশলোচন"
তখনই হৃদয়তন্ত্রী উঠিল বাজিয়া;
তখনই সে গভীর নিশায়, ছাড়িনু বৈকুণ্ঠধাম;
ছায়াকারে ধ্রুবপাশে বদ্ধ রহিলাম।
সে অবধি তিলেকের তরে ছাড়ি নাই ভক্তে মম।
প্রতি পদে পদে রক্ষা কোরেছি বালকে;
হের—ভক্ততরে কত শত চিহ্ন অঙ্গে কোরেছি ধারণ।
অধিক কি কব রমে!
ভক্ত মম প্রাণ, ভক্ত মম অস্থি, মাংসপেশী, শিরার শোণিত;
ভক্ত আমি অভিন্ন শরীর,
ভক্তজনে ভগবান জানিও কমলে।

ধ্রুব। হরি, নাহি ফুকারে হামারি বাণী।
নিরখি নিরখি তব চরণ দুখানি॥
ভাষা মিশায়ে গেছে, ভাবে প্রাণ ভোরে আছে,
আঁখি দিশি হারায়েছে (আমি) স্তবস্তুতি নাহি জানি॥

নারা। বৎস! বেদময় শঙ্খ প্রান্তে
করিলাম স্পর্শ কপোল তোমার ;
এখনই বাক্‌শক্তি, তব কণ্ঠে হইবে সঞ্চার।
রসনায় তব সরস্বতী লইবে আসন।
কর তুমি এক প্রাণে স্তব আরাধন।

ধ্রুব। বন্দে বিশ্বপতে পুরুষ পুরাণ,
অসীম বিশ্বের তুমি পরম নিধান।
তুমি বিশ্ব, বিশ্বস্বামী, অগ্নি, বারি, বায়ু, ভূমি,
আকাশে আকাশ তুমি, তোমা ব্যাপ্ত সর্ব্ব স্থান।
শ্রীচরণে করি তব সহস্র প্রণাম॥
তুমি কল্প কল্প অন্তে, সহায় করি অনন্তে,
যোগঘুমে মগ্ন হও, জাগ যোগ হোলে অবসান।
শ্রীচরণে করি তব সহস্র প্রণাম॥
বন্দে মাতঃ নারায়ণী,
জীবজীবনপালিনী,
অবিরত কর তুমি জীবের কল্যাণ।
শ্রীচরণে করি তব সহস্র প্রণাম॥

নারা। বৎস! তুষ্ট হনু বড় স্তব শুনি তোর ;
মনোমত বর করহ প্রার্থনা।

ধ্রুব। নাহি জানি প্রভো!
কোন্ বর লব তব ঠাঁই।

নারা। পিতৃরাজ্য চাহ যদি,
এখনই তা দিব তোরে।

ধ্রুব। রাজ্যধনে আর প্রভো! নাহি প্রয়োজন।

নারা। যেই রাজ্য হেতু তুই করিলি সাধন,
সেই রাজ্যে কেন আজি নাহি প্রয়োজন ?

ধ্রুব। প্রভো! নাহি সুখ রাজ্যধনে;
ধন মান রাজ্য সুখ ভোগ
শুধু ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ।
সুখ যদি হয় দুঃখের কারণ,
হেন সুখে মোর নাহি প্রয়োজন।

নারা। তবে কোন্ বর চাহ বৎস?
যেই বর তুমি করিবে প্রার্থনা,
তাই দিয়া তব পূরাব বাসনা।

ধ্রুব। প্রভো! দিয়াছ সকলি;
চাহিবার কিছু নাহি ত আমার হরি।
আমার পরম পিতা তুমি;
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, সে রাজার পুত্র আমি;
কি অভাব আছে মোর প্রভো?
একান্তই যদি রাজ্য দিতে চাও,—
দাও প্রভো! হেন রাজ্য মোরে
নাহি হবে যার পতন কখনও।
হে অন্তর্যামী, পিতৃরাজ্য, পৃথিবীর রাজ্য
কিম্বা স্বর্গ রাজ্য নাহি চায় প্রাণ,—
এই বর দেহ প্রভো! পদ্মপলাশলোচন!
ভক্তিরাজ্যে যেন করি বাস।
সে রাজ্যের প্রজা সাধু যোগী ঋষিগণ;
বর দেহ প্রভো!
হোয়ে প্রজা সে সাধু প্রজার,
সাধুসেবা করি আজীবন।
সাধুর করিলে সেবা,
বদ্ধ থাকে ভগবান ভক্তের হৃদয়ে।
তাই বলি প্রভো!
ভক্তিরাজ্যে দাও মোরে করিবারে বাস।
জন্ম জন্ম তথা,
হোয়ে থাকি যেন তব দাস অনুদাস।

নারা। তথাস্তু, তথাস্তু বৎস!
দুর্ল্লভ রতন ভক্তি দিলাম তোমায়।
এই ভক্তিবলে তুমি,
লভিবে দুর্ল্লভ স্থান ধ্রুবলোক নামে।
এই ভক্তিবলে তুষ্ট হোয়ে আমি
করিনু তোমায় দিব্য দৃষ্টি দান।
দিব্য দৃষ্টি বলে, স্বরূপ আমার করহ দর্শন।

ধ্রুব। একি! একি! নবজলধর মোহন মুরতি,
অকস্মাৎ শূন্যে কোথা মিশাইল?
সব শূন্য হেরি সব শূন্য,
তুমি এক জ্যোতিঃপূর্ণ,
আর কিছু নাহি হেরি, হেরি তোমারেই হরি;
পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম, দুই আঁখি রবি সোম,
প্রতি লোমকূপে জ্বলে অসংখ্য তারকা।
পিতামহ ব্রহ্মা নাভিপদ্মে বসি যোগেতে মগন;
মহেশ মহেন্দ্র আদি দেবগণ,
তোমার বিরাট অঙ্গে বিরাজিত;
অনন্ত অনন্ত কোটী পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গম
ছাইয়া রোয়েছে তোমার শরীর;
গন্ধর্ব্ব, মানব, নাগ, কিন্নর, দানব,
যক্ষ, রক্ষঃ, দেব, দৈত্য
দেহে তব করে বিচরণ;
স্থাবর জঙ্গম পর্ব্বত প্রদেশ,
রাজ্য রাজ্য, প্রলম্বিত তব অঙ্গে।
বর্ণিতে তোমার এ অনন্তরূপ,
ক্লান্ত এ রসনা মম।
আমি যে দুর্ব্বল শিশু—
এ বিরাট মূর্ত্তি তব,
নাহি পারি আর করিতে দর্শন।
শঙ্কিত হোয়েছে প্রাণ।

ধর প্রভো! পুনঃ সেই চতুর্ভুজরূপ
প্রীতি শান্তি আসে যাহে প্রাণে।

নারা। হের ধ্রুব চতুর্ভুজ রূপ পুনঃ,
দিব্য দৃষ্টি তব করি আকর্ষণ।

ধ্রুব। কিবা সুনীল সুন্দর মুরতি মধুর,
কিবা রাজীব চরণে বাজিছে নূপুর।
কিবা চন্দন চর্চ্চিত, তুলসী শোভিত,
পদ অরবিন্দে, নখ ইন্দু বিরাজিত।
কিবা পীতবাস ছটা, কটিতটে রাজে,
কিবা নিতম্বশোভিত কাঞ্চিদাম সাজে।
কিবা মোহন বনমালা দুলিতেছে গলে,
কিবা কৌস্তুভ রতন উরসে উজলে।
কিবা বাহুতে বলয়, শ্রবণে কুণ্ডল,
কিবা কিরীটবেষ্টিত মস্তক মণ্ডল।
কিবা উষার হাসিটি অধরে প্রকাশে,
কিবা আননসরসে আঁখিপদ্ম ভাসে।
কিবা বামে বিরাজিত সাগরনন্দিনী,
করুণনয়না জগতপালিনী।
জয় শ্রীবৎসলাঞ্ছন, জয় চতুর্ভুজ,
দেহ ধ্রুবদাসে চরণ অম্বুজ।

নারা। বৎস ধ্রুব! জগতের মহাবীর,
পঞ্চম বরষে যাণ্মাসিক তপস্যার বলে,
যেই ভক্তিবীজ আজি রোপিলে ধরায়,
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিতে,
অঙ্কুরিত হোয়ে তাহা,
বৃক্ষে হবে পরিণত;
অমৃত পূরিত ফল তার
সাধুগণ করিয়া ভক্ষণ
আনন্দে উন্মত্ত হবে।
হরিনাম স্রোতে জগৎ প্লাবিবে।

তোমার আদর্শ করিয়া দর্শন,
সহস্র সহস্র ভক্ত জন্মিবে ধরায় ;
তোমার চরিত্র যথা হইবে কীর্ত্তন,
সেই স্থান পুণ্যময় তীর্থ-সম হবে।
তোমার চরিত্র যেবা করিবে শ্রবণ,
পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার সম,
হৃদয় তাহার হইবে নির্ম্মল।
হের বৎস! হের ঐ ধ্রুবলোক,
সপ্তর্ষি মণ্ডল, ধর্ম্ম, অগ্নি,
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, তারকাদি সহ,
ঐ স্থান নিরন্তর করে প্রদক্ষিণ।
ঐ স্থান তব তরে হোয়েছে নির্ম্মিত ;
এ অবধি কেহ কভু ঐ স্থানে করে নি গমন ;

ধ্রুব। (মাকে ছেড়ে) আমি যাব না একা ধ্রুবলোকে।
মা যে প্রাণে বাঁচিবে না আমার শোকে ॥
মা যে আমার হরি পরম গুরু,
তাঁর পুণ্যে পেয়েছি তোমায় কল্পতরু,
কেমন কোরে এমন মাকে,
ছেড়ে যাব ধ্রুবলোকে,
মাকে ছাড়িলে, ডুবিব আমি ঘোর নরকে ॥
দয়ার উপর কর হে দয়া,
দাও হে মাকে চরণ ছায়া,
এই শেষ কৃপা হরি কর হে বালকে ॥
আমি থাক্‌বো মার কাছে সদা,
তুমি থাক্‌বে আমার হৃদে বাঁধা,
আমি উঠ্‌ব একবার মার কোলে,
আবার ঝাঁপ দিব তোমার পদমূলে,
রাখ্‌বো তোমায় রাখ্‌বো মাকে, সদা আমার চোকে চোকে ॥

নারা। মাতৃভক্তি হেরি তোর তুষ্ট হনু আমি,
ধন্য জননী তব—মাতৃভক্ত হেন শিশু

গর্ভে যেবা কোরেছে ধারণ!
পিতৃ মাতৃ ভক্তি যার নাহিক হৃদয়ে,
পরম ভকত হয় যদিও সে জন,
জন্ম জন্ম সাধনেও নাহি পায় মম দরশন।
পিতা মাতা প্রত্যক্ষ দেবতা;
হেন দেবতায় যেবা করে আরাধনা,
সহজেই তারে আমি দিই দরশন।
পিতৃমাতৃভক্তি, ভগবানে ভক্তির কারণ।
মাতৃভক্তিবলে তুমি পেয়েছ আমায়,
মাতৃভক্তিবলে তুমি পাবে ধ্রুবলোক;
তোমার বিমান সনে, আসিবে বিমান এক
তোমার জননী তরে, মাতা পুত্রে তথা,
কল্পান্ত অবধি করিবে নিবাস।

ধ্রুব। আর এক ভিক্ষা চাই প্রভো!

নারা। কি ভিক্ষা বৎস?

ধ্রুব। তোমারে ছাড়িয়া
ক্ষণমাত্র থাকিতে না চায় প্রাণ।
এই ভিক্ষা দাও প্রভো!
কাতর অন্তরে
যখনই ডাকিব তোমায়,
পাই যেন তখনই দেখিতে।
বিষয় বাসনা ত্যজি, ঐ শ্রীচরণে
সদা যেন লিপ্ত থাকে মন।
অন্তর হইতে মম হোয়োনা অন্তর।

নারা। তথাস্তু বৎস!
যখনই ডাকিবে—তখনই দিব দেখা।

ধ্রুব। প্রণমি চরণে প্রভো! প্রণমি মা জগৎ জননী।

(লক্ষ্মী নারায়ণের প্রস্থান)

ধ্রুব। কোথা হরি পদ্মপলাশলোচন
দাও দরশন।

(লক্ষ্মী নারায়ণের পুনঃ প্রবেশ)

নারা। আবার ডাকিলে কেন বৎস ?

ধ্রুব। জান না কি তুমি, আমার সনে কোরেছ কত লুকোচুরি,
আমিও খেলিব হরি, তোমার সনে সেই চাতুরী।
ভালবাস কি, না বাস,
ডাক্‌লে কাছে আস কি না আস,
পূরাও কিনা ভক্ত আশা তাই পিছু ডেকেছি হরি ॥
চরণে কোরেছি দোষ,
কোরোনা কোরোনা রোষ,
ভক্ত অপরাধ তুমি কর ক্ষমা ভূরি ভূরি।

নারা। বেঁধেছ কঠিন ডোরে,
আর না ছাড়িব তোরে,
ডাকিবি আমায় যতবার,
জুড়াবে ভক্ত প্রাণ আমার ;
আমি আসিব, চুমিব, হেরিব ঐ মুখচন্দ্র মাধুরী।

ধ্রুব। সুধাবিন্দু, ঢালে ইন্দু, প্রাণসিন্ধু নাচে উথলে।
জ্যোতিঃস্রোত, অবিরত, সিন্ধুনীরে বিম্ব নিকলে ॥
চরণ ইন্দু ছুঁইতে প্রাণ,
উথলি হইছে ধাবমান,
করুণাকণা কর হে দান, বাঁধা থাকি যেন পদতলে ॥
আমি চাই না মুক্তি, চাই গো ভক্তি,
আমি মিশ্‌বো না তোমাতে,
থাক্‌বো পৃথক্ তোমা হোতে,
ধোর্‌বো রাঙ্গা চরণ শিরে,
ধোব চরণ আঁখি নীরে,
সেই সুখেতে ভাস্‌বো সদা প্রাণ সিন্ধু জলে ॥

(একদিক দিয়া গাইতে গাইতে ধ্রুবের ও অন্য দিক দিয়া
ধীরে ধীরে লক্ষ্মীনারায়ণের প্রস্থান)

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তাহার (এরূপ বলিবার) প্রয়োজন কি ?

সহ গ্রহণের প্রয়োজন এই যে, সহ অর্থাৎ একত্রীভূত বর্ণ সমূহের, যাহাতে সংযোগ সংজ্ঞা হয় ; এক একটী বর্ণের সংযোগ সংজ্ঞা না হয়। যেমন অন্যত্র হইয়া থাকে।

সেইটী যেমন অন্যান্য স্থলেও, যেখানে একত্র মিলিত শব্দ সমূহের কার্য্য করিতে হইবে, সেই স্থলে 'সহ' শব্দের গ্রহণ করা হয়। তাহার উদাহরণ যথা ;—"সহসুপা। ২।১।৪।" (সুবন্তের সহিত সুবন্তের সমাস হইয়া থাকে) উভে অভ্যস্তং সহ। ৬।১।৫। (১) ইত্যাদি সূত্রে, সমুদায়ে মিলিত হইয়া কার্য্য হইবার জন্য 'সহ' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে।

যদি এক একটী বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ রূপে, সংযোগ সংজ্ঞা হয় ; তাহা হইলেই বা কি দোষ হয় ?

নির্যায়াৎ (নির্—যা+[লিঙ্‌এর] যাৎ) নির্বায়াৎ (নির্—বা+[লিঙ্‌এর] যাৎ) ; এই সকল স্থলে 'রেফ্, যকার' এবং 'রেফ্ বকার' প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে, সংযোগ সংজ্ঞা বিশিষ্ট হওয়াতে ; "বান্যস্য সংযোগাদেঃ।৬।৪।৬৮।" ('ঘু' সংজ্ঞক ধাতু, মা, স্থা, গা, পা প্রভৃতি কতিপয় ধাতু ভিন্ন অন্য সংযোগ-তাদি বিশিষ্ট ধাতুর 'আ'কারের স্থানে 'এ'কার হয়, আর্দ্ধধাতুকস্থিত 'ক'ইৎ বিশিষ্ট 'লিঙ্' পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে 'এ'কার প্রাপ্তি হইবে।

সংহ্বৃষীষ্ট (সং—হ্ব+লুঙ্‌ এর তিপ্‌ আত্মনেপদ), এই স্থলে, 'অনুস্বার' (হল্ মধ্যে পাঠ হেতু) এবং 'হ্ব' উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ রূপে সংযোগ বিশিষ্ট হওয়াতে, ঋতশ্চ। ৭।৪।৯২। (২) এই সূত্রানুসারে, 'ইট্' আগম প্রসঙ্গ হইবে।

সংহ্বয়ত (সং—হ্ব+লিঙ্‌এর ত), এই স্থলে, 'গুণোর্ত্তিসংযোগাদ্যোঃ। ৭।৪।২৯। (৩) এই সূত্রানুসারে, গুণ প্রাপ্তি হইবে।

---

(১) ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

(২) ঋকারান্ত ধাতুর ও রুক্, রিক্ এবং রীক্ আগম হয়, যঙ্ এবং যঙ্‌লুক্ পরে থাকিলে।

(৩) ঋ ধাতুর এবং সংযোগ আদি বিশিষ্ট ঋকারান্তের গুণ হয়, যক্ পরে থাকিলে; যকার আদি বিশিষ্ট আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে এবং লিঙ্ পরে থাকিলে।

দৃষৎকরোতি, সমিৎকরোতি, ইত্যাদি স্থলে, ত এবং ক কার প্রত্যেকে সংযোগবিশিষ্ট বলিয়া, সংযোগান্তস্য লোপঃ। ৮।২।২৩ (১) এই সূত্রানুসারে 'ত'কারের লোপ প্রাপ্তি হইবে।

শক্তা (শক+লুট্, তিপ্, তা) বস্তা (বস+তিপ্, তা), প্রভৃতি স্থলে, "স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তে চ। ৮।২।২৯।" (২) এই সূত্রানুসারে 'ক'কার এবং 'স'কারের লোপ প্রাপ্তি হইবে।

নির্যাতঃ (নির্—যা+ক্ত), নির্বাতঃ (নির্—বা+ক্ত) এই স্থলে, 'সংযোগাদেরাতোধাতোর্যণ্বতঃ। ৮।২।৪৩। (সংযোগ আদি বিশিষ্ট আকারান্ত ধাতুর 'যণ্' বিশিষ্টের নিষ্ঠার স্থানে 'ন' হয়) এই সূত্রানুসারে নিষ্ঠার স্থানে, নত্ব প্রসঙ্গ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—নৈষদোষঃ। যত্তাবদুচ্যতে ইহ তাবন্নির্যায়াৎ নির্বায়াৎ। বান্তস্য সংযোগাদেরিত্যেত্বং প্রসজ্যেতেতি। নৈবং বিজ্ঞায়তে। সংযোগ আদির্যস্য সোঽয়ং সংযোগাদিঃ সংযোগাদেরিতি॥ কথং তর্হি॥ সংযোগৌ আদী যস্য সোঽয়ং সংযোগাদিঃ সংযোগাদেরিতি। এবং তাবৎ সর্বমাঙ্গং পরিহৃতম্।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা কখনও দোষ নহে। কারণ পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে— নির্যায়াৎ নির্বায়াৎ ইত্যাদি স্থলে, "বান্তস্য সংযোগাদেঃ।" এই সূত্রানুসারে 'এ'ত্ব—প্রসঙ্গ হইবে; তাহা হইবে না। কারণ, এইরূপ জানিবেন না যে, সংযোগ হইয়াছে আদি যার, সে সংযোগাদি, তাহার, সংযোগাদির।

তবে কিরূপ?

সংযোগদ্বয় হইয়াছে আদি যার, সে সংযোগাদি, তাহার, সংযোগাদেঃ। অতএব নির্বায়াৎ প্রভৃতি স্থলে রেফ্ এবং বকার উভয়ই সংযোগ সংজ্ঞাবিশিষ্ট হইলেও উভয়েই ধাতুর অবয়ব বিশিষ্ট সংযোগদ্বয় হয় নাই। কারণ রেফ্টী উপসর্গের অবয়ব। সুতরাং এত্ব‍ও হইবে না।

এইরূপে যাবতীয় আঙ্গ কার্য্য পরিহার (দোষোদ্ধার) করা হইল।

ভাষ্যমূলম্।—যদপ্যুচ্যতে। ইহ চ দৃষৎকরোতি সমিৎকরোতি। সংযোগান্তস্যেতি লোপঃ প্রসজ্যেতেতি॥ নৈবং বিজ্ঞায়তে সংযোগোঽন্তো যস্য তদিদং সংযোগান্তং সংযোগান্তস্যেতি॥ কথং তর্হি॥ সংযোগাবন্তৌ যস্য তদিদং সংযোগান্তং সংযোগান্তস্যেতি।

(১)(২) ইহাদের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে যে,—'দৃষৎকরোতি,' 'সমিৎকরোতি,' এই সকল "সংযোগান্তস্য লোপঃ।" এই সূত্রানুসারে 'ত' কারের লোপপ্রসঙ্গ প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইবে না। কারণ, এইরূপ মনে করিবেন না যে, সংযোগ হইয়াছে অন্তে যাহার, সে সংযোগান্ত, তাহার, সংযোগান্তের।

তবে কি?

সংযোগদ্বয় অন্তে আছে যাহার, সে সংযোগান্ত, তাঁহার—'সংযোগান্তের' অতএব 'দৃষৎকরোতি'র 'ত'কার একটী সংযোগ হওয়াতে 'লোপ' হইল না।

ভাষ্যমূলম্।—যদপ্যুচ্যতে। ইহ চ শক্তা বস্তেতি স্কোঃ সংযোগাদ্যোরিতি লোপঃ প্রসজ্যেতেতি॥ নৈবং বিজ্ঞায়তে সংযোগাবাদী সংযোগাদি সংযোগাদ্যোরিতি॥ কথং তর্হি॥ সংযোগয়োরাদি সংযোগাদি সংযোগাদ্যোরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যাহা বলা হইয়াছে যে, 'শক্তা' 'বস্তা' এই সকল স্থলে, "স্কোঃ সংযোগাদ্যোঃ" এই সূত্র অনুসারে, যথাক্রমে 'ক' কার এবং 'স'কারের লোপ হইবে; তাহাও হইবে না। কারণ, ইহা কখনও মনে করিবেন না যে, সংযোগদ্বয় বিশিষ্ট যে আদি, সে সংযোগাদি, তাহাদের—'সংযোগাদিদের'।

তবে কি?

সংযোগদ্বয়ের যে আদি, সে সংযোগাদি, তাঁহাদের—'সংযোগাদিদের', অতএব 'শক্তা' 'বস্তা' ইহাদের 'ক'কার এবং 'স'কার ইহারা সংযোগাদি হইলেও দুইটী সংযোগের আদি না হওয়াতে, লোপও হইবে না।

ভাষ্যমূলম্। যদপ্যুচ্যতে। ইহ চ নির্ধাতো নির্বাত ইতি সংযোগাদেরাতো ধাতোর্য্বণ্বত ইতি নিষ্ঠানত্বং প্রসজ্যেতিতি। নৈবং বিজ্ঞায়তে সংযোগ আদির্যস্য সোঽয়ং সংযোগাদিঃ সংযোগাদেরিতি॥ কথং তর্হি॥ সংযোগাবাদী যস্য সোঽয়ং সংযোগাদিঃ সংযোগাদেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আর পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে যে,—'নির্ধাতঃ' 'নির্বাতঃ' এই সকল স্থলে, 'সংযোগাদেরাতোধাতোর্য্বণ্বতঃ'। ৮।২।৪৪। এই সূত্রানুসারে, নিষ্ঠা অর্থাৎ 'ক্ত' এবং 'ক্তবতু' প্রত্যয়ের 'ত'কারের 'ন'ত্ব প্রসঙ্গ হইবে।

এই স্থলেও দোষ হইবে না। কারণ, এইরূপ মনে করিবে না যে, সংযোগ আছে আদিতে যার, সে সংযোগাদি, তাহার, সংযোগাদির।

তবে কি?

সংযোগদ্বয় আছে আদিতে যার, সে সংযোগাদি, তাহার, সংযোগাদির। এইরূপ হইলে, নির্বাতঃ প্রভৃতির, 'রেফ্' এবং 'ব'কার, উভয়ে প্রত্যেকে সংযোগ হইলেও, সংযোগদ্বয় (ধাতুর) না হওয়াতে 'ন'ত্ব হইবে না। কোন দোষও হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—কথং কৃত্বা একৈকস্য সংযোগসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি॥ প্রত্যেকং বাক্যপরিসমাপ্তিদৃষ্টেতি। তদ্‌যথা বৃদ্ধিগুণসংজ্ঞে প্রত্যেকং ভবতঃ।

নন্থ চায়মস্তি দৃষ্টান্তঃ। সমুদায়ে বাক্যপরিসমাপ্তিরিতি। তদ্‌যথা। গর্গাঃ শতং দণ্ড্যন্তাম্। অর্থিনশ্চ রাজানো হিরণ্যেন ভবন্তি। ন চ প্রত্যেকং দণ্ডয়ন্তি। সত্যেতস্মিন্ দৃষ্টান্তে যদি তত্র প্রত্যেকমিত্যুচ্যতে ইহাপি সহগ্রহণং কর্ত্তব্যম্॥ অথ তত্রান্তরেণ প্রত্যেকমিতি বচনং প্রত্যেকং গুণবৃদ্ধিসংজ্ঞে ভবতঃ। ইহাপি নার্থঃ সংগ্রহণেন।

ভাষ্যানুবাদ।—কেমন করিয়া এক একটী বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ সংযোগ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে?

তাহা, যেমন করিয়া (অ, এ, ও, এবং আ, ঐ, ঔ র প্রত্যেক বর্ণের) গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইয়াছিল।

যদি বল যে, সমুদায়ে বাক্য পরিসমাপ্তিরও ত এই দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; যেমন "গর্গবংশীয় জনগণকে শতমুদ্রা দণ্ড কর," রাজগণ এইরূপ আদেশ করিলে, যদিও রাজগণ অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে বটে; তথাপি গর্গবংশের প্রত্যেকটী লোকের নিকট শতমুদ্রা দণ্ডবিধান করেন না। (কিন্তু সকলকে মিলিয়া শতমুদ্রা দণ্ডবিধান করেন)?

অতএব এইরূপ উভয় প্রকারের দৃষ্টান্ত সত্বে, যদি সেই স্থলে ('বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে) 'প্রত্যেকে'র (আ, ঐ, ঔর পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাবোধ হইবার জন্য) গ্রহণ করা হয়; তবে এই স্থলেও (একত্র মিলিত বর্ণ সমূহের সংযোগ সংজ্ঞা বোধ হওয়ার জন্য) 'সহ' শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আর যদি সেই স্থলে, "প্রত্যেক" এই শব্দের গ্রহণ বিনাই যদি প্রত্যেক বর্ণের গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে, এই স্থলেও 'সহ' শব্দ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূলম্।—অথ যত্র বহূনামানন্তর্য্যম্। কিং তত্র দ্বয়োর্দ্বয়োঃ সংযোগসংজ্ঞা ভবতি। আহোস্বিদবিশেষেণ॥ কশ্চাত্র বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এক্ষণে, জিজ্ঞাস্য এই যে, যেখানে অনেক বর্ণের একত্র সমাবেশ হইয়াছে, সেখানে দুই দুইটী বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ সংযোগ সংজ্ঞা

হইবে, অথবা অবিশেষ রূপে অর্থাৎ একটী, বা একত্র মিলিত সমুদায় বর্ণের সংজ্ঞা হইবে ?

এস্থলে এরূপ দুইপক্ষ করাতে বিশেষ কি হইবে ?

বার্ত্তিকমূলম্।—সমুদায়ে সংযোগাদিলোপো মস্‌জেঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ। সমুদায় বর্ণ একত্র মিলিত হইয়া সংযোগ সংজ্ঞা হইলে সংযোগের আদিভূত 'মস্‌জ' ধাতুর 'স'কার লোপ হইবে না।*

ভাষ্যমূলম্—সমুদায়ে সংযোগাদিলোপো মসজের্ণসিদ্ধ্যতি। মঙ্‌ক্তা। মঙ্‌ক্তুম্।

ইহ চ নির্গ্লেয়াৎ নির্গ্লায়াৎ নির্গ্লেয়াৎ নির্ম্লায়াৎ। বান্তস্য সংযোগাদেরিত্যেত্বং ন প্রাপ্নোতি।

ইহ চ সংস্বরিষীষ্টেতি ঋতশ্চ সংযোগাদেরিতীট্ ন প্রাপ্নোতি।

ইহ চ সংস্বর্য্যতে ইতি গুণোর্ত্তিসংযোগাদ্যোরিতি গুণো ন প্রাপ্নোতি।

ইহ চ গোমান্ করোতি যবমান্ করোতীতি সংযোগান্তস্য লোপঃ ইতি লোপো ন প্রাপ্নোতি।

ইহ চ নির্গ্লানো নির্ম্লান ইতি সংযোগাদেরাতোধাতোর্যণ্বত নিষ্ঠানত্বং ন প্রাপ্নোতি।

অস্তু তর্হি দ্বয়োর্দ্বয়োঃ সংযোগসংজ্ঞা।

ভাষ্যানুবাদ—যদি একত্র মিলিত সমুদায় বর্ণে সংযোগ সংজ্ঞা হয়, তবে সংযোগের আদিভূত 'মস্‌জ' ধাতুর 'স'কারের লোপও সিদ্ধ হইবে না। যেমন মঙ্‌ক্তা (টুমস্‌জো শুদ্ধৌ, এই 'মস্‌জ' ধাতুর উত্তর, লুট্‌এর 'তিপ্' এবং তদনন্তর 'ডা' প্রত্যয় করিলে, "মস্‌জিনশোর্ঝলি। ৭।১।৬০।" এই সূত্রানুসারে, ঝল্ অন্তর্গত অর্থাৎ 'তা' পরে থাকাতে, 'মস্‌জ' ধাতুর 'ম'কার স্থিত অকারের পরে, নুম্ আগম হইয়াছে। অর্থাৎ 'মন্‌স্‌জ তা' এইরূপ স্থিতি হইয়াছে। এক্ষণে এই 'ন্‌স্‌জ' একত্র মিলিত তিনটি বর্ণের যদি, সংযোগ সংজ্ঞা বলা হয়, তবে, 'স'কার, সংযোগের 'আদি' না হইয়া 'মধ্য' হওয়াতে "স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তে চ' এই সূত্রানুসারে, 'স'কারের লোপ হইবে না), মঙ্‌ক্তুম্ (পূর্ব্ববৎ, 'তুমন্' প্রত্যয় মাত্র বিশেষ) এই সকল স্থলে 'স'কারের লোপ হইবে না। প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

আর, নির্গ্লেয়াৎ, নির্গ্লায়াৎ (নির্—গ্লা ধাতু, আশীর্লিঙ্, যাসুট্ 'তিপ্') নির্ম্লেয়াৎ, নির্ম্লায়াৎ, (নির্-ম্লা+যাসুট্, তিপ্) এই স্থলে, (ম্লা এবং গ্লা ধাতু

সংযোগবিশিষ্ট হইলেও 'ম্না' এবং 'ম্না' এর রেক্‌টী ধাতুর রেক না হইয়া উপ-সর্গের হওয়াতে) 'বাস্তস্য সংযোগাদেঃ' সূত্রানুসারে, 'এ'কার প্রাপ্তি হইবে না।

আর, সংস্বরিষীষ্ট (সং—স্বৃ+সঙ্ ত) এই স্থলে, 'সং'উপসর্গের অনুস্বার এবং ধাতুর 'স'কার 'ব'কার একত্রে সংযোগ হওয়াতে) 'ঋতশ্চ সংযোগাদেঃ' এই সূত্রানুসারে, ইট্‌ প্রাপ্ত হইবে না।

আর সংস্বর্ধ্যতে (সং—স্বৃ ত, আত্মনেপদ) এই স্থলে, (উপসর্গের 'সং'এর অনুস্বারের সহিত 'স্বৃ' ধাতুর 'স'কার মিলিত হওয়াতে, 'স'কার সংযোগের আদি হইবে না বলিয়া) 'গুণোহর্তিসংযোগাদ্যোঃ' সূত্রানুসারে, গুণপ্রাপ্তি হইবে না।

আর গোমান্‌করোতি (গোমৎ শব্দের উত্তর, প্রথমার একবচনে 'নুম্' আগম্ করিলে, যখন 'গোমন্ত্' এইরূপ স্থিতি হইবে; তখন তাহার সহিত 'করোতি' শব্দ যোগ করিলে, 'ন্তক' এই তিন বর্ণ একত্র সংযোগ হওয়াতে, 'ত'কার, সংযোগের অন্ত না হওয়াতে) এবং যবমান্ করোতি (যবমৎ শব্দ) এই স্থলে, "সংযোগান্তস্য লোপঃ" এই সূত্রানুসারে" ('ত'কারের লোপ প্রাপ্তি হইবে না।

আর, নির্গ্লানঃ (নির্—গ্লৈ+ক্ত), নির্ম্লানঃ (নির্—ম্লৈ+ক্ত) এইস্থলে, "সংযোগাদেরাতোধাতোর্যণ্বতঃ" এই সূত্রানুসারে 'নিষ্ঠা' স্থিত ক্ত প্রত্যয়ের 'নত্ব'প্রাপ্তি হইবে না। কিন্তু দুই দুইটী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ সংযোগ সংজ্ঞা হইলে, এই সকল স্থলে, কোনও দোষ হইবে না।

আচ্ছা তবে, দুই দুইটী বর্ণেরই সংযোগ সংজ্ঞা হউক।

বার্ত্তিকমূলম্।—দ্বয়োর্হলোঃ সংযোগ ইতিচেদ্দ্বির্বচনম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—দুইটী ব্যঞ্জনের যদি সংযোগ সংজ্ঞা হয়, তবে, দ্বিত্ব কার্য্য হইবে না। *

ভাষ্যমূলম্।—দ্বয়োর্হলোঃ সংযোগ ইতিচেদ্দ্বির্বচনং ন সিধ্যতি ইন্দ্রমিচ্ছতি ইন্দ্রীয়তি। ইন্দ্রীয়তেঃ সন্। ইন্দিদ্রীয়িষতি। নদ্রাঃ সংযোগাদয় ইতি দকারস্য দ্বির্বচনং ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—দুই দুইটী ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগ সংজ্ঞা হইলে, অবশ্য-কর্ত্তব্য দ্বিত্ব স্থলে দ্বিত্ব সিদ্ধ হইবে না। যেমন,—'ইন্দ্রকে ইচ্ছা করে,' (এইরূপ বাক্য ইন্দ্র শব্দের উত্তর, ইচ্ছার্থে ক্যচ্ প্রত্যয় করিলে) ইন্দ্রিয়তি (এক্ষণে, সনাদ্যন্তাধাতবঃ বলিয়া তাহার ধাতু সংজ্ঞা হইলে)

'ইন্দ্রিয়তি'র উত্তর 'সন্' প্রত্যয় করিলে, পুনঃ 'ইন্দিদ্রীয়িষতি' প্রয়োগ হইল। এই স্থলে বক্তব্য এই যে, 'ইন্দ্র' শব্দের 'ন্দ্র'এর দুই দুই বর্ণ মিলিয়া পৃথক্ পৃথক্ সংযোগ সংজ্ঞা হওয়াতে, 'ন্ দ্' এক সংযোগ এবং 'দ্ র্' আর এক সংযোগ হইয়াছে। সুতরাং 'দ'কারও, সংযোগের আদিভূত হওয়াতে, 'সন্' প্রত্যয় পরে থাকাতে, 'দ'কারের দ্বিত্ব প্রাপ্তি হইবে না। কারণ 'নন্দ্রাঃ সংযোগাদয়ঃ। ৬।১।৩।' (১) এই সূত্রানুসারে, (সংযোগাদি দ্বিত্ব নিষেধ করে বলিয়া) 'দ'কারের দ্বিত্ব প্রাপ্তি হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন বাজ্‌বিধেঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা 'অচ্' বিধি হওয়াতে, দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—ন বা এষ দোষঃ। কিং কারণম্। অজ্‌বিধেঃ। ন্দ্রাঃ সংযোগাদয়ো ন দ্বিরুচ্যন্তে। অজাদেরিতি বর্ত্ততে।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা ইহা কোনও দোষ নহে।

কি কারণে?

অচ্ বিধান হেতু। অর্থাৎ 'অচ্'কে আশ্রয় করিয়া দ্বিত্ব নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া। 'নন্দ্রাঃ সংযোগাদয়ঃ। ৬।১।৩।' (অচ্ এর পরস্থিত সংযোগের আদিভূত, ন, দ, এবং র এর দ্বিত্ব হয় না) এই সূত্রে, সংযোগের আদিভূত ন, দ, এবং র এর দ্বিত্ব নিষেধ করা হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই স্থলেই "আদি 'অচ্' এর পরস্থিত" এরূপ বাক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং 'ইন্দ্র' শব্দের আদি 'অচ্' 'ই'কারের অব্যবহিত পরে 'দ'কার না থাকিয়া 'ন'কার ব্যবধান থাকাতে, 'দ'কারের দ্বিত্ব নিষেধ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—অথ যত্রৈবং বহূনাং সংযোগসংজ্ঞা তথাপি দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥ কিং গতমিয়তা সূত্রেণ। আহোস্বিদন্যতরস্মিন্ পক্ষে ভূয়ঃ সূত্রং কর্ত্তব্যম্॥

গতমিত্যাহ॥ কথম্॥

যদা তাবদ্‌বহূনাং সংযোগসংজ্ঞা তদৈবং বিগ্রহঃ করিষ্যতে। অবিদ্যমান-মন্তরমেষামিতি॥ যদা দ্বয়োর্দ্বয়োঃ সংযোগসংজ্ঞা তদৈবং বিগ্রহঃ করিষ্যতে। অবিদ্যমানা অন্তরা এষামিতি। দ্বয়োশ্চৈবান্তরা কশ্চিদ্বিদ্যতে বা ন বা।

এবমপি বহূনামেব প্রাপ্নোতি। যান্ হি ভবানত্র ষষ্ঠ্যা প্রতি নির্দ্দিশতি এতেষামন্তেন ব্যবায়েন ভবিতব্যম্।

(১) অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণের পর, সংযোগের আদিভূত যে, ন, দ এবং র, তাহার দ্বিত্ব হয় না।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি এই প্রকারই হয়, তবে এক্ষণে এরূপ বলিব যে,— হয় বহুবর্ণ একত্র মিলিতেরই সংযোগ সংজ্ঞা, অথবা দুই বর্ণেরই পৃথক্ পৃথক্ সংযোগ সংজ্ঞা। অর্থাৎ দুই পক্ষের, যে কোন এক পক্ষই হউক। উভয়ই সঙ্গত।

এই একটী সূত্রের দ্বারাই কি ইহা চরিতার্থ হইল? অথবা অন্যতর পক্ষে পুনঃ পুনঃ সূত্র করা কর্ত্তব্য হইবে?

এই এক সূত্র দ্বারাই গত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কার্য্য শেষ হইবে।

কিরূপে?

যখন যেখানে বহুবর্ণ মিলিত হইলে সংযোগ সংজ্ঞা হইবে, সেখানে এইরূপ বিগ্রহ অর্থাৎ সমাসের ব্যাসবাক্য করা হইবে যে, বিদ্যমান নাই অন্তর (কাল) যাহাদের, তাহারা 'অনন্তরাঃ'। আর যখন দুই দুইটীর সংযোগ সংজ্ঞা হয়, সেখানে এইরূপ বিগ্রহ করা হইবে যে, বিদ্যমান নাই অন্তরা (বর্ণান্তর দ্বারা ব্যবধান) ইহাদিগের, তাহারা,"অনন্তরঃ"। অতএব দুই বর্ণের মধ্যে কোনও অন্য বর্ণ ব্যবধান থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে।

এইরূপ হইলেও অনেক বর্ণ মিলিতের সংযোগ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে। কারণ, আপনি যে হেতু এই বিগ্রহে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ বিগ্রহ বাক্যের শেষে যে "এষাং" এই রূপ ষষ্ঠীর বহুবচন করিয়াছেন, তাহা যাহাতে অন্যের (বর্ণান্তরের) দ্বারা ব্যবধান হইতে পারে; এই জন্যই করিয়াছেন। কারণ, 'এষাং' এইরূপ বহুবচননিষ্পন্ন শব্দ একবর্ণ ব্যবধান থাকিলে হইতে পারে না।

ভাষ্যমূলম্। অস্তু তর্হি সমুদায়ে সংজ্ঞা। ননু চোক্তং সমুদায়ে সংযোগাদিলোপা মস্জেরিতি॥ নৈষদোষঃ। বক্ষ্যত্যেতৎ। অন্ত্যাৎপূর্ব্বো মস্জের্মিদনুষঙ্গসংযোগাদিলোপার্থমিতি।

ভাষ্যানুবাদ। আচ্ছা, তবে সমুদায় বর্ণেরই (সংযোগ) সংজ্ঞা হউক! যদি বল যে, সমুদায়ে সংযোগ সংজ্ঞা হইলে 'মস্জ' ধাতুর সংযোগের আদিভূত বর্ণের (সকারের) লোপ সিদ্ধ হইবে না?

এই স্থলেও কোন দোষ হইবেনা। কারণ, এই কথা বলা হইবে যে, 'মস্জেরন্ত্যাৎপূর্ব্বোনুম্বাচ্যঃ' ('মস্জ' ধাতুর অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ববর্ণে, 'নুম্' আগম হয়; এইরূপ বলা কর্ত্তব্য)। অনুষঙ্গ অর্থাৎ উপধা এবং সংযোগের আদি বর্ণের লোপের জন্যই এই 'ম' ইৎ বিশিষ্ট 'নুম্' আগম করা হইয়াছে।

পওহারী বাবা।

অনেকে আজকাল বলিয়া থাকেন, নিজের মুক্তিলাভের চেষ্টা করা স্বার্থপরের কার্য্য। সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া জগতের যাহাতে হিত হয়, তাহার চেষ্টা কর; সংসারসাগরে ঝম্পপ্রদান করিয়া ইহার দুঃখ নিবারণে সচেষ্ট হও। পরোপকারই যথার্থ ধর্ম্ম, তাহার সহিত একটু আধটু ঈশ্বরকে ডাক, ভাল। ইহাঁরা ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের কার্য্য দেখাইয়া ইহা প্রমাণ করিতে চান। কিন্তু তাঁহারা এইটী ভুলিয়া যান, সেই কার্য্যশক্তি কোথা হইতে প্রসূত হয়, তাহার মূলদেশ কোথা। বুদ্ধদেব যে ছয় বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই দিকে তাঁহারা একবার ভুলিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না।

চিন্তা যত প্রগাঢ় হইবে, কার্য্যও তত অধিক হইবে। সামান্য কার্য্য সাধনে—সামান্য চিন্তার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু যে কার্য্যের দ্বারা জগদ্ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় হইয়া যায়, তাহার মূলে গূঢ় চিন্তাশক্তি, গভীর ধ্যান, গবেষণা অন্তর্নিহিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও দেখুন—কত চিন্তা, কত ধ্যানের পর একটী মত (Theory) আবিষ্কৃত হইল। সেই মতের সহায়তায় আজ জগতে কত নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে—আবার তাহার কত বিভিন্ন প্রয়োগে কত নব নব শিল্পের অভ্যুদয় হইতেছে, কিন্তু চিন্তাশক্তি তাহার মূলে না থাকিলে ও সকল কি সম্ভব হইত ? যিনি নূতন নূতন ভাবে কোন সত্য কার্য্যে প্রয়োগ করেন, তাঁহার গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু যিনি উহা প্রথমে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহারই কি এ গৌরব প্রথম প্রাপ্য নহে ? রসায়নের Periodical law রূপ theory হইতে আজ কত কত নব মূলপদার্থ আবিষ্কৃত হইতেছে, আবার কত মূলপদার্থ এখনও আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা হইতেছে, তাহা জানিলে ঐ নিয়মের আবিষ্কর্ত্তাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। গ্রহাবলির গতিবিধি গণনা করিয়া এমন সিদ্ধান্ত হইল যে, আকাশের অমুক স্থানে একটী গ্রহের অবস্থান সম্ভব। তিনি উহা দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তিগণ ঐ স্থানে দূরবীক্ষণ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে তথায় একটী নূতন গ্রহের আবিষ্কার করিলেন।

ধর্ম্মরাজ্যেও এই চিন্তার বিশেষ প্রাধান্য। ধর্ম্মরাজ্যে ধ্যানপরায়ণ

পুরুষেরা শুধু কোন মত আবিষ্কার করেন না, তাঁহারা সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন, আর শুধু যে, কার্য্যে প্রয়োগ করাই উহার গৌরব, তাহা নহে, যে ব্যক্তি যত ধ্যানরাজ্যে বিচরণ করিতে পারেন, যে ব্যক্তি যত সামান্য ইন্দ্রিয়ের রাজ্যের সামান্য সুখ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন, তিনি ততদূর মনুষ্যত্বসম্পন্ন। জগৎসমস্যার যদি মীমাংসাই না হইল, তবে গড্ডলিকাপ্রবাহের মত দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ফল কি? এই জন্য অনেক মহাপুরুষ গভীর ধ্যানরাজ্যে বিচরণ করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। মহম্মদ এবং ঈশাকেও অনেক দিন চিন্তারাজ্যে বিচরণ করিতে হইয়াছিল। অবশ্য, যাঁহারা কর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া এই উচ্চভাব রক্ষা করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমরা জগতে সর্ব্বদা এরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দর্শন আশা করিতে পারি না।

পাহাড়ী বা পওহারী বাবার কথা বলিবার জন্য এত কথা বলিলাম। বাঙ্গালা সম্বাদপত্রপাঠকগণ মাত্রেই তাঁহার জীবনের শেষ পরিণাম ঘটনা জানেন। কেশব সেন মহাশয়, ইঁহাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, তাহাতেও অনেকে ইঁহার সম্বন্ধে জানিয়াছিল। তাঁহার অভিনীত নববৃন্দাবন নাটকে তিনি পাহাড়ী বাবার নাম অবতারণা করিয়াছিলেন।

পওহারী বাবার সংক্ষিপ্ত জীবন কথা বলিব। বারাণসী বিভাগের গুজী-নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী একটী পল্লীগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতি শৈশব কালেই গাজিপুরে খুড়ার নিকট থাকিয়া পড়িবার জন্য আসেন। ইঁহার খুড়া রামানুজ বা শ্রীসম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণব এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন অর্থাৎ আজীবন বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিব, এই ব্রত লইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক গুলি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল; তাহাদের মধ্যে ইঁহাকে তিনি পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার নিকট থাকিয়া তিনি ব্যাকরণ, ন্যায় শাস্ত্র ও শ্রীসম্প্রদায়সম্মত ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ করিয়াছিলেন। পড়াশুনায় তিনি খুব মনোযোগী ছিলেন। ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ পটুতা প্রকাশ পাইয়াছিল।

কিছু দিন পরে, এক ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ে অতিশয় আঘাত লাগে। তাঁহার খুড়াকে তিনি প্রাণের তুল্য ভালবাসিতেন। তাঁহার দেহত্যাগে পওহারী বাবার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। অনেকের এরূপ শোক হয়, আবার ভুলিয়া যায়, কিন্তু এই

বালক নিশ্চয় সুকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, জগতে এমন কি বস্তু আছে, যাহার কখনই নাশ হয় না। সেই জিনিষকে লাভ করিতে হইবে।

ইনি গৃহত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন। গুরু অন্বেষণ ও জ্ঞানশিক্ষার জন্য তখন তিনি উন্মত্ত। যাঁহাদের হৃদয়ে এই ব্যাকুলতা কখন উদয় হইয়াছে, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, বালকের তখন মনের কি অবস্থা! তিনি কোথা কোথা ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ঠিক বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহে (শ্রীসম্প্রদায়ের অধিকাংশ গ্রন্থই এই ভাষায় লিখিত) এবং বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহে অভিজ্ঞতা দেখিয়া অনুমান হয়, তিনি দাক্ষিণাত্যে ও বঙ্গদেশে অনেক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার বন্ধুগণ বলেন, এই ভ্রমণকালে তিনি গুজরাটান্তর্গত কাটিওয়ার প্রদেশস্থ গিরণার পর্ব্বতে গমন করেন। সেইখানেই তিনি প্রথম যোগসাধনে দীক্ষিত হন। এই গিরণার পর্ব্বতের পাদদেশে রাজা অশোকের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানে অনেক দিন ধরিয়া অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ বৌদ্ধস্তূপ জঙ্গলাবৃত ছিল। পূর্ব্বে এই স্থানে বৌদ্ধদের অতি পবিত্র তীর্থভূমি ছিল। জৈনসম্প্রদায় এখনও এই স্থানকে অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। হিন্দুরা বলেন, এখানে মহাযোগী দত্তাত্রেয় বাস করিতেন। এখানে এখনও অনেক সাধু পুরুষ বাস করেন। শুনা যায়, অনেক ভাল ভাল সিদ্ধপুরুষ এই স্থানে গোপনে বাস করেন। দৈবাৎ কখন কখন কোন ভাগ্যবান তাঁহাদের দর্শন পান। পওহারী বাবার ভাগ্যেও এই সিদ্ধসমাগম ঘটিল।

ইহার কিছু কাল পরে ইনি বারাণসীর কিছু দূরে গঙ্গাতীরে এক সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া তথায় কিছুকাল বাস করেন। এই সন্ন্যাসী গঙ্গাতীরে একটী গুহা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে থাকিয়া যোগ অভ্যাস করিতেন। এই সময়ে তিনি কাশীতে কোন সন্ন্যাসীর নিকট অদ্বৈতবাদও শিক্ষা করেন।

অনেক বর্ষ এইরূপ ভ্রমণ, সাধনা ও শাস্ত্রালোচনার পর ইনি ইহার পূর্ব্ববাসস্থান গাজিপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন। সেখানে তাঁহার বাল্যকালের বন্ধুগণ তাঁহাকে এইরূপ উন্নত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা তাঁহাকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিল ও শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইল।

তিনি কিন্তু যাহা শিক্ষা করিয়া আসিলেন, তাহার সাধনা ভুলিলেন না, বরং উত্তরোত্তর সাধনায় তাঁহার অনুরাগ আরো বৃদ্ধি পাইল। তিনি তাঁহার বারাণসীধামের গুরুর ন্যায় গঙ্গাতীরে একটী গুহা খনন করিয়া তাহার ভিতরে অনেকক্ষণ থাকিয়া সাধন ভজন করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছু পরে তিনি আর এক ব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিয়া নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া ভোগ দিতেন। রন্ধনকার্য্যে তাঁহার বিশেষ পটুতা ছিল। তার পর সমুদয় ভোগ দীন দুঃখী সকলকে বণ্টন করিয়া দিতেন এবং নানারূপে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। রাত্রি হইলে সাঁতার দিয়া গঙ্গা পার হইয়া অপর পারে সমস্ত রাত্রি সাধন ভজন করিতেন। প্রত্যুষেই আবার এ পারে আসিয়া সর্ব্বভূতকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিতেন।

ইতিমধ্যে তাঁহার নিজের আহারও দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। শুনা যায়, তিনি কিছু দিন গোটা কতক নিম পাতা বা লঙ্কা খাইয়া থাকিতেন। ক্রমশঃ তিনি গঙ্গার অপর পারে সাধনার্থে গমন না করিয়া গুহার মধ্যেই গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতে লাগিলেন। শুনা যায়, কখন কখন মাসাবধি ধরিয়া তিনি গুহায় সমাধিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। এত দীর্ঘকাল তিনি কি খাইয়া থাকিতেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। তাই লোকে তাঁহার নাম পওহারী বাবা দিল। 'পওহারী' শব্দের অর্থ, পবনভোজী বা দুগ্ধ আহারী।

তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি এই গুহায়ই কাটাইয়াছিলেন। একবার তিনি এত দীর্ঘকাল গুহাভ্যন্তরে ছিলেন যে, লোকে স্থির করিল, তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। অনেক দিন পরে তিনি গুহার বাহিরে আসিয়া সাধুদিগকে এক ভাণ্ডারা দিলেন। ভাণ্ডারা অর্থে সাধুভোজন।

যখন তিনি ধ্যানমগ্ন থাকিতেন না, তখন তিনি গুহার উপরিভাগস্থ এক গৃহে বাস করিতেন। তখন লোকজনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। চারিদিকে তাঁহার যশ বিস্তৃত হইতে লাগিল। কেশবসেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয়ের কথা অনেকেই জানেন। তিনি পওহারী বাবাকে একজন উচ্চদরের সিদ্ধযোগী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কেশববাবুর নিকট হইতে তিনি একখান পরমহংসদেবের ফটো পাইয়াছিলেন। ইহা তিনি অতি যত্ন সহকারে রাখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পরমহংসদেবকে অবতার বলিয়া উল্লেখ

করিতেন। পরমহংসদেবের শরীর ত্যাগের পর স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার অনেক শিষ্য ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেব বলিতেন, ফুল ফুটিলেই ভ্রমর আপনি আসিয়া ফুলে বসে—ফুলকে আর ভ্রমর ডাকিতে যাইতে হয় না। আরও তিনি বলিতেন, আপনি ভগবানের ভজন করিলেই যথেষ্ট প্রচার কার্য্য হয়। ইঁহার জীবনে এই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। দিন রাত ইঁহার ভগবৎসাধন—অন্য কর্ম্ম নাই—তাই কত কত অনুরাগী ব্যক্তি একবার মাত্র তাঁহার সাক্ষাৎ করিয়া ধন্য হইয়া যাইত।

স্বামী বিবেকানন্দ একবার ইঁহাকে বলেন, আপনি কেন সংসারে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা জীবের কল্যাণ সাধন করেন না? তাহাতে তিনি প্রথমে একটী গল্প বলেন;—

একটী দুর্ব্বৃত্ত লোক কোন অন্যায় কর্ম্ম করিয়া ধরা পড়ে। যে ধরিল, সে তাহার শাস্তিস্বরূপ তাহার নাক কাটিয়া দিল। তখন সে সমাজে মুখ দেখাইতে অতিশয় লজ্জা বোধ করিয়া এক জঙ্গলে গিয়া একখানি বাঘছাল বিছাইয়া বসিয়া রহিল। যখনই কেহ নিকটে আসিত, তখনই সে ধ্যানের ভাণ করিত। কাহারও সহিত কথা কহিত না। তাহাকে পরম সাধু মনে করিয়া দলে দলে তাহার নিকট লোক আসিতে লাগিল—সকলেরই ইচ্ছা, তাঁহার নিকট কিছু উপদেশ শ্রবণ করে। শেষে এক যুবক তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য মহা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। কোন রূপে তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া সে তাহাকে বলিল, কাল অতি প্রত্যূষে একখানি শাণিত ক্ষুর লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবে। যুবক অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাহাই করিল। তখন ঐ ভণ্ড সাধু তাহাকে অরণ্যের এক নিভৃত প্রদেশে লইয়া গিয়া খাপ হইতে ক্ষুর খানি বাহির করিয়া এক কোপে তাহার নাকটী কাটিয়া দিল ও গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি এই দীক্ষা পাইয়াছি; তোমাকেও সেই দীক্ষা দিলাম। তুমিও সুবিধা পাইলে অপরকে এই দীক্ষা দিতে ছাড়িবে না।" যুবক লজ্জায় আর তাহার সেই দীক্ষার বিষয় লোকের নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। বরং সাধ্যমত গুরুর উপদেশ পালন করিতে লাগিল। এইরূপে একদল নাককাটা সাধুসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইল। তুমি কি আমাকে এইরূপ আর একটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে বল?"

অন্ত সময়ে আর এক প্রশ্নের উত্তরে এ সম্বন্ধে যথার্থ নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "তুমি কি মনে কর, শরীরের দ্বারা লোকের উপকারই একমাত্র উপকার? শরীরের সহায়তা ব্যতীত কেবল মন দ্বারা একজন কি অপরের উপকার করিতে পারে না?"

আর এক সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি এত বড় যোগী হইয়াও নিম্নাধিকারিগণের জন্ত বিহিত হোম, পূজা প্রভৃতি কর্ম্ম করেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর দেন, সকলেই যে নিজের জন্ত কর্ম্ম করে, এ কথা মনে করিতেছ কেন? এমন কি হইতে পারে না যে, একজন অপরের জন্ত কর্ম্ম করিতেছে?

একজন চোর একবার তাঁহার আশ্রমে চুরীর অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল। তাঁহার ঠাকুর ঘরের সমুদয় তৈজস সংগ্রহ করিয়া সে পলায়ন করিতেছিল—এমন সময়ে তাঁহাকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া সব ফেলিয়া পলায়ন করে। তিনি অমনি সেই পুঁটলিটী লইয়া চোরের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনেক দূর দৌড়িয়া চোরের নাগাল পাইয়া তাহাকে সেই বুঁচকীটী দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি আপনার কার্য্যে ব্যাঘাত দিয়া অন্তায় করিয়াছি। এ সব আপনার, আমার নহে। এই বলিয়া তাহাকে ঐ গুলি লইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

পাঠক মহাশয়েরা কি ইহাকে পাগ্‌লামী বলিবেন, না, কি বলিবেন? চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া হইল বলিয়া মহা চটিয়া উঠিবেন না ত? আমরা চোর সন্দেহেই কত লোককে কত লাঞ্ছনা করিয়া থাকি। ধরা পড়িলে ত কথাই নাই! আমরা অভিমান করিয়া বলিয়া থাকি, চোরকে শাস্তি দিলে তাহার আর চুরীতে তত প্রবৃত্তি হইবে না, অপর লোকেরও শিক্ষা হইবে। তাহাকে ক্ষমা করিলে সমাজের মহা অমঙ্গল, তাহারও অমঙ্গল। কিন্তু কার্য্যতঃ কি দেখা যায়? শাস্তি ত চিরকালই হইতেছে—চুরী কমিতেছে কি? অবশ্য ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, আমি শাস্তির কোন উপকারিতা স্বীকার করি না, বা সকল অপরাধীকে একেবারে ক্ষমা করিবার পক্ষপাতী। আমার ইহাই বক্তব্য যে, আমরা, যে ভাবে অপরাধিগণের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাই চরম আদর্শ নহে। আমরা নিজেরা অধম বলিয়া এখনও এই অধম উপায় লইতে বাধ্য। বস্তুতঃ আমাদের হৃদয়ে সাধনাবলে যদি কখন একটুও প্রেমের সঞ্চার হয়, তখন বুঝিব, সেই প্রেমজনিত আন্তরিক ক্ষমার

ব'লে কত কত অলৌকিক কার্য্য সাধিত হইতে পারে! শুনা যায়, সেই চোর এই ঘটনার পর একেবারে সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিল।

বাস্তবিক তাঁহার চক্ষে জগৎ ভগবানেরই প্রকাশ বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি সমুদয় দুঃখকষ্টগুলিকে পাহন দেবতা বলিতেন। ঐ স্থানীয় হিন্দী ভাষায় পাহন শব্দের অর্থ কুটুম্ব। যাহাতে অপরের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা হয়, সেই সকল কষ্টকেও তিনি, অপরে যে পাহন দেবতা না বলিয়া অন্য নামে বলিবে, তাহাও সহ্য করিতে পারিতেন না। এক সময়ে তাঁহাকে একটী গোখ্‌রো সাপ দংশন করে। অনেকক্ষণ তিনি অচেতন অবস্থায় থাকেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে মৃত বলিয়া স্থির করেন। পরিশেষে চৈতন্য লাভ করিয়া বলেন, পাহন দেবতা আসিয়াছিলেন।

তিনি বিনয়নম্রতার প্রতিমূর্ত্তিবিশেষ ছিলেন—সকলকেই নারায়ণজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধাপ্রকাশ ও সাদরসম্ভাষণ করিতেন। তাঁহার এই নীরব সাধন ও প্রচারের ফলে লোকের কতদূর উপকার হইয়াছে, যাঁহারা গাজিপুরের চতুর্দ্দিকস্থ পল্লীগ্রাম সমূহে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহার সাক্ষ্য দিতে পারেন।

শেষ অবস্থায় তিনি কোন মানুষের সহিত চাক্ষুষ সাক্ষাৎ করিতেন না। এই অবস্থায় তাঁহার দশ বৎসর কাটিয়াছিল। তাঁহার এক সহোদর ভ্রাতা তাঁহার জন্য প্রত্যহ বাড়ীর গেটের নিকট যৎসামান্য খাদ্য, যথা গোটাকতক আলু ও একটু ঘৃত রাখিয়া আসিত। তিনি গভীর রাত্রে উঠিয়া কোন দিন খাইতেন, কোন দিন বা খাইতেন না। তাঁহার গুহার উপরিভাগস্থ গৃহের দ্বার সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকিত। সেই দ্বারের নিকট বসিয়া তিনি কথাবার্ত্তা কহিতেন। তিনি যে সেই গৃহে আসিয়াছেন, তাহা হোমের ধূমদৃষ্টে অথবা পূজার দ্রব্যসমূহ আয়োজনের শব্দে বুঝা যাইত।

তিনি বলিতেন, 'যব সাধন, তব সিদ্ধি।' অর্থাৎ সিদ্ধিলাভের উপায়ভূত সাধনগুলিতে এত যত্ন করিতে হইবে, যেন তাহারাই সিদ্ধিস্বরূপ। তাহা তাঁহার নিজের জীবনেই প্রমাণিত হইত। তিনি শ্রীরঘুনাথজীর পূজায় যেরূপ যত্নের সহিত নিবিষ্ট হইতেন, পূজার একখানা তাম্রকুণ্ড মাজিবার জন্যও সেই যত্ন ও মনোযোগ প্রদান করিতেন।

তাঁহার বিনয় কোন মৌখিক ব্যাপার ছিল না—অথবা আপনার হেয়ত্ব বা অপদার্থত্ব বোধ হইতেও প্রসূত হয় নাই। তিনি ভগবানকে সার জানিয়া

সর্ব্বস্ব, এমন কি, আপনাকে পর্য্যন্ত তাঁহাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিতেন না। কিন্তু একবার তাঁহার ভাবের ফোয়ারা খুলিয়া গেলে অমৃতময় গভীর উপদেশ সকল তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত। তিনি আপনাকে কখনই গুরু মনে করিতেন না, সেই জন্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

তিনি দীর্ঘকায় ও মাংসল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটী মাত্র চক্ষু ছিল আর তাঁহাকে তাঁহার যথার্থ বয়সের অপেক্ষা ছোট দেখাইত। যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, এরূপ মধুর স্বর আর জগতে কাহারও গলায় শুনেন নাই। এইরূপে সেই পবিত্রতা, নম্রতা ও প্রেমের আদর্শ মহাপুরুষ যেন যোগশাস্ত্রের যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্যই জীবন কাটাইতে লাগিলেন।

এক দিন, যে ধূমে হোমঘৃতের গন্ধ থাকিত, তাহাতে দগ্ধ মাংসের গন্ধ পাওয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সমবেত জনগণ কিছু কারণ বুঝিতে পারিল না। এ দিকে অতি ভয়ানক দুর্গন্ধ বহির্গত হইতে লাগিল আর রাশি রাশি ধূম বহির্গত হইতে লাগিল। তখন তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল; দেখিল, এই মহাযোগী নিজের হোমাগ্নিতে নিজ শরীরকে শেষ আহুতি দিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে সেই পবিত্র দেহাবশিষ্ট কতকগুলি ভস্মরাশিমাত্র পড়িয়া রহিল।

যাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ জানিতেন, তাঁহারা অনুমান করেন, ইনি ইঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত আসন্নপ্রায় বুঝিতে পারেন। যাহাতে তাঁহার দেহত্যাগের পরও কাহারও কষ্ট না হয়, এ জন্যই বোধ হয়, সজ্ঞানে নিজ দেহ আহুতি প্রদান করেন।

ধ্রুবচরিত্র।

পঞ্চম অঙ্ক।—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর কক্ষ।

সুনী। দিন বোয়ে গেল,
কৈ—ধ্রুব ত আমার নাহি এল ফিরে;
সে কি আর প্রাণে বেঁচে আছে?
অভাগিনী ধন আর কি আসিবে ফিরে?
তপস্বিনী সনে,

কত কাননে কাননে,
অরণ্যের নিবিড় প্রদেশ,
কত ভীষণ নিভৃত পর্ব্বত গুহায়,
ভ্রমিয়াছি ধ্রুব তরে ;
খুঁজিয়াছি তারে তন্ন তন্ন কোরে ;
বৃথা আকিঞ্চন,
কোথা অভাগীর ধন !
হারানিধি কেবা পায় ফিরে !
হয় ত সে এতদিন,
অনাহারে অনিদ্রায়,
ঘুমায়েছে অনন্তের কোলে।
(কিয়ৎক্ষণ পরে) নিরাশার অন্ধকার মাঝে
জ্বলে ক্ষীণ আশার আলোক ;
বোলেছেন দেবর্ষি নারদ,
ধ্রুব মোর বেঁচে আছে।
তাই ত সে আশে
এতদিন জীর্ণ দেহে ধরিয়াছি প্রাণ।
জীর্ণ দেহ ক্রমে হইতেছে ক্ষীণ ;
ধ্রুব বিনা আর
কতদিন দেহে রবে প্রাণ !
শূন্য ত্রিভুবন,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ দুনয়ন ;
চাঁদ মুখ কতদিনে পাইব দেখিতে !
ধ্রুব ! বাপধন !
দেখা দাও—দেখা দাও একবার ;
ওরে—মার প্রাণে সহে না যে আর।

(নারদ ও রাজার সহিত ধ্রুবের প্রবেশ)

ধ্রুব। মা !

সুনী। কে ?—বাবা ধ্রুব এলি ! (মূর্চ্ছা)

ধ্রুব। মা! মা!

পিতা! হেন দশা কেন হইল মাতার?
নির্ব্বাক নিস্পন্দ কেন হইল জননী?
গুরুদেব!
কি গো গো মাতার?
কেন মাতা নাহি কয় কথা?
জীবন লক্ষণ কেন নাহি হেরি জননীর?

নারদ। বৎস! বহুদিন তব অদর্শনে,
জীর্ণ দেহ হইয়াছে জননী তোমার;
অকস্মাৎ তব আগমনে,
আনন্দের স্রোত বহিল প্রবল বেগে;
জীর্ণ দেহে সে প্রবল বেগ
সহিতে না পারি
মূর্চ্ছিত হোয়েছে জননী তোমার।
ডাক উচ্চৈঃস্বরে
মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবে এখনি।

ধ্রুব। (সুরে) উঠমা, উঠমা, চেয়ে দেখ একবার,
এসেছে এসেছে ফিরে, হারানিধি তোমার।
কৈ—গুরুদেব! না পাই উত্তর কেন?
পিতা! সর্ব্বনাশ বুঝি হইল আমার,
ভাঙ্গিল কপাল বুঝি মোর!

নারদ। বৎস! কিছু ভয় নাই;
মৃত নহে জননী তোমার;
ক্ষণেকের তরে হোয়েছে মূর্চ্ছিত।
ডাক পুনর্ব্বার,
মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবে এখনি;
এখনই পাইবে উত্তর।

ধ্রুব। উঠমা উঠমা চেয়ে দেখ একবার।
এসেছে এসেছে ফিরে হারানিধি তোমার॥

সুনী। কই কই কই নয়নের মণি,
কাছে আয়রে আমি দেখিতে পাইনি,

হাতে তুলে দেনা চাঁদ মুখ খানি,
আঁখি নীরে হেরি সব ধূমাকার ॥

ধ্রুব। উঠমা উঠমা চেয়ে দেখ একবার।
এই যে মা আমি এসেছি কাছে,
চেয়ে দেখ ধ্রুব আজও বেঁচে আছে,
দেমা অঞ্চল আঁখি দিই মুছে,
কেঁদনা, কেঁদনা মাগো, কেঁদনাক আর ॥

সুনী। আয়রে আয়রে আয়রে কোলে,
জুড়ারে প্রাণ মা মা বোলে,
"মা" "মা" বাণী বহুদিন শুনি নি,
মৃত দেহে কর জীবন সঞ্চার ॥

ধ্রুব। ওমা ওমা ওমা, মা গো আমার ॥

(ধ্রুবকে কোলে গ্রহণ)

নারদ। মা সুনীতি!

সুনী। প্রভো! প্রণমি শ্রীপদে।

নারদ। মা! ধরণীর ভক্তশিরোমণি
ধ্রুব ধনে লও ফিরে তব।
সার্থক জীবন তব
হেন হরিভক্ত শিশু ধোরেছ জঠরে।
সার্থক জীবন মম,
হেন ভক্তে শিষ্যরূপে করিয়া গ্রহণ।
আশীর্ব্বাদ করি,
মাতা পুত্রে সুখে কর রাজ্যভোগ।

ধ্রুব। মা! আমি তোর জন্যে এক জিনিস এনেছি।

সুনী। কি জিনিস বাবা?

ধ্রুব। ফিরে বনে বনে, এনেছি মা কিনে,
সাধনের পণে, আদরের ধন।
ধর মা আঁচল পাতি, এ রতনে দিবা রাতি,
রাখিও যতনে অতি,
অযতনে সে মা করে পলায়ন ॥

এমনি আমায় ভালবাসে,
ডাক্‌লে অমনি ছুটে আসে,
আমার সঙ্গে খেলে হাসে,
কোলে লয় মধুর ভাষে,
সদা ঘোরে আশে পাশে,
আদর করে ওমা তোমারি মতন ॥

সুনী। কই বাবা! আমি তো দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।

ধ্রুব। হের মা আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডল,
তারা পুঞ্জ সনে ঘোরে অবিরল,
ঐ ধ্রুবলোক তারি কেন্দ্র স্থল,
তথায় হবে মা হরি দরশন।
রাজ্য অবসানে, আরোহি বিমানে,
মাতা পুত্রে তথা যাইব যখন,
দেখিতে পাবি মা তখন পদ্মপলাশলোচন ॥

নারদ। মহারাজ! বহু পুণ্যফলে
লভিয়াছ এই দুর্লভ রতন।
রাজসিংহাসন ধ্রুবে করিয়া প্রদান,
বানপ্রস্থ করহ গ্রহণ।

রাজা। যথা আজ্ঞা প্রভো!
অভিষেক ক্রিয়া
সম্পাদন করিব এখনি।
মহিষি! লয়ে যাও ধ্রুবে,
মনোমত রাজবেশ পরাও যতনে।

(ধ্রুবকে লইয়া সুনীতির প্রস্থান)

রাজা। প্রভো! তব কৃপাবলে
মনুবংশ হইল উজ্জ্বল।
ধ্রুব মোর বংশের গরিমা;
ধ্রুব হতে এ বংশের যশের সৌরভ
অনন্ত অনন্ত কাল ধরি
ব্যাপ্ত রবে ধরণী মণ্ডলে;

আসুন দেবর্ষি রাজসভামাঝে,
আশীর্ব্বাদ করিবেন ধ্রুবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(বেগে সুরুচির প্রবেশ)

সুরু। উহুঃ! জ্বলে গেল জ্বলে গেল প্রাণ!
কি এক ভীষণ যাতনা যেন
দহিতেছে অন্তস্তল মোর!
শিরায় শিরায়
অগ্নিস্রোত বহিতেছে যেন!
পুড়ে গেল সর্ব্বাঙ্গ আমার!
কোথা যাই—
কোথা গেলে পাব পরিত্রাণ?
ঐ—ভীষণ আকৃতি এক যেন
তীক্ষ্ণ অসি করে
অগ্রসর হইতেছে সম্মুখে আমার—
বলিছে বিকট স্বরে যেন—
নাহিক উত্তম,
নাই তোর রাজ্য আর।
ঐ আসি কেশে ধরি মোর
লয়ে যায় শূন্য দেশে।
শূন্য হতে ফেলে দিল পুনঃ
ঘোর অন্ধকারময় পাতাল প্রদেশে।
সহস্র বৃশ্চিক আসি তথা
ঘেরিল আমারে ;
সবে একযোগে,
ধাইয়া আসিছে মোরে করিতে দংশন।
ওকি! বৃশ্চিকের গায়ে কার নাম লেখা?
এযে ঈর্ষ্যা—ঈর্ষ্যা!
ঈর্ষ্যাই বৃশ্চিক রূপ করিয়া ধারণ
দংশিতে আসিছে মোরে।

কোথা যাই—না দেখি উপায়;
কিসে পাব পরিত্রাণ!
কে আছ—কে আছ
রক্ষা কর—রক্ষা কর অভাগীরে।
একি! পলাইছে বিষধরগণ!
অকস্মাৎ অন্ধকার ভেদি
নামিতেছে ধীরে,
জ্যোতির্ম্ময় সুন্দর বিমান;
মধ্যস্থলে বসি তার সাধু একজন
দেবতানিন্দিত উজ্জ্বল বিমল তনু
সহাস্য বদনে
ঢালিতেছে সুধারাশি।
স্নিগ্ধ হল কলেবর,
জুড়াল সকল জ্বালা।
ঐ—মেঘের ভিতর পুনঃ লুকাল বিমান।
একি হেরি পুনঃ!
ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি
ঘুরায় ভীষণ চক্র
ঘন ঘন সম্মুখে আমার।
চক্র আসি বুঝি কাটিল মস্তক মোর।
কোথা পলাইব স্থান নাহি পাই;
কে রক্ষিবে এ সঙ্কটে!
মের না মের না মোরে,
প্রাণভিক্ষা দেহ অভাগীরে,
কৃপা করি ক্ষম অপরাধ।
পুনঃ সেই জ্যোতির বিকাশ!
মেঘের ভিতর হতে পুনঃ
পূর্ণিমার চন্দ্র সম
সেই মূর্ত্তি হইল প্রকাশ!
কাহার এ মুরতি সুন্দর?

চিনি চিনি যেন বোধ হয়!
এ যে মোর সপত্নী সুনীতি পুত্র
ধ্রুব করে আগমন।
বৎস! রক্ষা কর
রক্ষা কর বিমাতারে তব;
দুর্ম্মতির বশে,
সপত্নী বিদ্বেষে,
মর্ম্মে তব দিয়াছি দারুণ ব্যথা;
অপরাধ ক্ষমা কর জননীর।
ঐ—কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি হল তিরোহিত।
পুনঃ মেঘে লুকাল বিমান—
পুনঃ সেই কৃতান্ত সমান ভীষণ আকৃতি,
গ্রাসিতে আসিছে মোরে;
অগ্নি শিখা সম
লোলজিহ্বা লক্ লক্ করে;
ঐ—ক্রমে আসিছে নিকটে,
গেল বুঝি গেল গেল প্রাণ;
ধ্রুব বিনা কেহ আর
এ সঙ্কটে নারিবে রক্ষিতে,
যাই ছুটে ধ্রুব পাশে।

(বেগে প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(নারদ রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। মন্ত্রিবর!
অভিষেক সংবাদ ত
প্রজাগণে কোরেছ জ্ঞাপন?
উৎসবের হেতু

অন্য অন্য কার্য্য সব
যেরূপ যা কোরেছি আদেশ
নির্ব্বিঘ্নে ত হইছে সাধিত ?

মন্ত্রি। মহারাজ !
রাজ্যমধ্যে দিয়াছি ঘোষণা,
সিংহাসনে আজি
অধিষ্ঠিত হইবে কুমার।
কোষাধ্যক্ষ, তব আজ্ঞামত,
দীনদুঃখী দরিদ্র আতুরে,
অকাতরে ধন রত্ন করে বিতরণ !
কারামুক্ত হইয়াছে বন্দিগণ।
রাজ্যমধ্যে দেবালয় আছে যত
পুষ্পমাল্যে হোয়েছে শোভিত।
পুরোহিতগণ, প্রতি দেবালয়ে
কুমারের মঙ্গলের তরে
করিতেছে স্বস্ত্যয়ন।
মঙ্গলসূচক শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি
হইতেছে চারিদিকে।
প্রতি গৃহদ্বার, প্রতি রাজপথ
দেবতরু কিশলয়ে হোয়েছে সজ্জিত।
প্রতি গৃহচূড়ে, রাজপথে,
পতাকার শ্রেণী
উড়িতেছে পত্ পত্ রবে ;
নগর অপূর্ব্ব শোভা কোরেছে ধারণ।
প্রজাবর্গ আনন্দে মগন,
আনন্দের স্রোত বহিছে নগরে।

রাজা। আজি কিবা আনন্দের দিন !
ভক্তচূড়ামণি ধ্রুবে আজি
সিংহাসন করিব অর্পণ।
ধন্য হইলাম আমি,

ধন্য রাজধানী,

ধন্য হ'ল রাজত্ব আগার।

ধ্রুব রাজ্যে করি বাস

প্রজাবর্গ হবে ভাগ্যবান।

(ধ্রুবকে লইয়া সুনীতি ও সুরুচির প্রবেশ)

রাজা। প্রভো! অনুমতি দেহ দাসে

রাজসিংহাসনে বসাই কুমারে।

নারদ। তথাস্তু।

সুরুচি। বৎস! ধর্ম্মমত তুমি,

রাজদণ্ড করহ গ্রহণ।

করি আশীর্ব্বাদ

আজীবন ভুঞ্জ রাজ্যসুখ;

অনুজ উত্তম,

তব দাস হোয়ে

সেবা করুক তোমার।

রাজা। বৎস! তব করে আজি

সিংহাসন করিনু অর্পণ

আশীর্ব্বাদ করি

পুত্র সম প্রজাগণে করিয়া পালন

অক্ষয় অনন্ত কীর্ত্তি লভ ধরাতলে।

(ধ্রুবকে সিংহাসন অর্পণ)

সুনী। সার্থক জীবন মম

ধ্রুবে আজ সিংহাসনে হেরি।

নারদ। বৎস! গুরুভার আজি লইলে মস্তকে।

সযতনে বহিবে এভার।

অধিক কি উপদেশ দিব তোমা আর—

অপত্য সমান প্রজা করিও পালন।

অনাসক্ত হোয়ে, রাজর্ষি সমান,

রাজকার্য্য করিও সাধন।

ভোগে যেন লিপ্ত নাহি হয় মন।

ভোগের সামগ্রী তব রহিবে সম্মুখে
ধর্ম্মবীর তুমি বৎস—
ভোগাসক্তি করিও বিজয়।
প্রজাগণে সুবিচার কোরো বিতরণ।
ন্যায় পথে থাকি
রাজধর্ম্ম করিও পালন।
আশীর্ব্বাদ করি,
সুখে ভুঞ্জি রাজ্যসুখ,
লভ সে দুর্ল্লভ স্থান ধ্রুবলোক নামে।

ধ্রুব। গুরুদেব।
তব আজ্ঞা প্রাণপণে করিব পালন।
প্রণিপাত তব শ্রীচরণে।

(গাইতে গাইতে তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। পুরাণ সুন্দর সেই হাসটি হাস।
চম্পক চামেলি চারু অধরে বিকাশ॥
রাজা হবে বোলে তুমি,
দেখিতে এসেছি আমি,
শাস সসাগরা ভূমি,
পূরাও দুঃখিনী জননী আশ॥

ধ্রুব। মাগো!
আশীর্ব্বাদ করুন সন্তানে
ধর্ম্মপথ হোতে যেন
বিচলিত নাহি হই কভু।

তপ। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি,
ধর্ম্মে যেন চিরকাল মতি থাকে তব।

নারদ। মহা আনন্দের দিন আজি,
এস সবে মিলি,
এক প্রাণে করি হরি নাম গুণ গান।

সকলে। জয় দেব নারায়ণ, জয় পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন,
জয় মাধব, কেশব, জয় নিত্য নিরঞ্জন।

করুণার নিধি স্নেহ নীরধর,
কৃপা নিরবধি কাতরে বিতর,
শান্তির সাগর, আনন্দ আকর,
প্রণমি কমলে, প্রেম নিকেতন ॥
ধ্রুব। নমি নমি পদ্মপলাশলোচন, দেহি পদপল্লবমুদারং ॥

ইতি সমাপ্ত।

সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে গুটি কয়েক কথা।

সমাজ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। বৈদিক যুগে যে সমাজ ছিল, তাহার কথা ছাড়িয়াই দিন, কত কত শতাব্দী ধরিয়া নানা অবস্থাচক্রে নানা ঘাত প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজের অবস্থা একরূপ দাঁড়াইয়াছে। এখনও পরিবর্ত্তন চলিতেছে। ভবিষ্যতে কত কি পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা কে জানে?

যাঁহারাই হিন্দু জাতির শাস্ত্রাদির ও প্রাচীন আচার ব্যবহারাদির ইতিহাস একটুও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই নিতান্ত অন্ধ না হইলে জানেন, পরিবর্ত্তন কত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, বর্ত্তমান সমাজের পরিচালক কে হইবেন?

মধ্যে মধ্যে সমাজে যুগচক্রপরিবর্ত্তনকারী মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। তাঁহারাই সমাজকে পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা শুধু কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়া যান না। তাঁহারা সমাজে এক অভূতপূর্ব্ব শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন। পরে সেই শক্তি হইতে সময়োপযোগী নানাবিধ নিয়মের অভ্যুদয় হয়। কালবশে আবার এই নিয়মগুলি বন্ধনমাত্রে পর্য্যবসিত হইলে আবার নূতন নিয়মের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সংস্কারকগণ খুব উন্নত মহাপুরুষ না হইলে সংস্কার কার্য্যে সফল হইতে পারেন না। পরমহংসদেবের কথায় বলিলে বলিতে হয়, 'চাপরাস না পাইলে তাহার কথা কেহ লয় না।' অতএব ঈশ্বরের নিকট এই শক্তি সংগ্রহ করিয়া তবে সংস্কার কার্য্যে নামা আবশ্যক। ইহা অপেক্ষা মহৎ ও উচ্চ ব্রত কিছু নাই। এই জন্য ইহার সাধনও অতি কঠোর।

পক্ষান্তরে কেবল দোষ দর্শন, নিন্দা বা সমালোচনা দ্বারা সমাজ গঠন হয় না। অথবা অপর কোন সমাজের আদর্শ উপস্থিত করিয়া তাহার অনুসরণ

চেষ্টা করিলেও সে সংস্কার শুভজনক হয় না—তাহাতে সফলকাম হওয়াও অতি কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হিন্দু সমাজকে ইউরোপীয় আদর্শের অনুকরণে গঠনের চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। ইউরোপীয় সমাজ আদর্শ সমাজ নহে। অনেক বিষয়ে উহারই সংস্কার আবশ্যক।

মায়িক জগৎ কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। পূর্ণতা যেখানে, সেখানে সমাজ নাই, সেখানে কেবল ব্রহ্মের প্রকাশ। তবে যে সমাজ যত পরিমাণে ব্রহ্মজ্ঞ নরনারী গঠনে সহায়তা করে, তাহা ততই উন্নত। এ উন্নতির বিরাম নাই, বিরাম সেই মোক্ষলাভে, বিরাম সেই ব্রহ্মজ্ঞানে—সেই পরাশান্তিতে।

প্রয়োজন অনুসারে আবার সমাজে কখন একটী প্রথা প্রচলনের আবশ্যকতা হয়, কখন তাহার ঠিক বিপরীত প্রথা বিশেষউপযোগী হইয়া থাকে। কোন প্রথা কোন্ সময়ের উপযোগী, তাহা সেই সময়কার উন্নত নিরপেক্ষ মহাপুরুষগণই বুঝিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিধবার বিবাহ সেই সমাজে প্রচলনের আবশ্যক হয়, যে সমাজে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কার্য্যতঃ অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু উহা সাময়িক বিধানমাত্র। তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যে শিক্ষিত করিতে পারিলে তখন বিধবা বিবাহ অতি নিন্দনীয় কর্ম্ম বলিয়া প্রচার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। যখন সন্ন্যাসের ভানে নানা কপটতা ও ব্যভিচারে দেশ আচ্ছন্ন হইয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন গার্হস্থ্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তনের আবশ্যকতা হয়। আবার যখন লোকে কতকটা পশুজীবন হইতে মুক্ত হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমের দাম্পত্য প্রেমকেই চরমাদর্শ জ্ঞান করিতে থাকে, তখন প্রকৃত চরমাদর্শ ব্রহ্মচর্য্যের, সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। কখন সমাজে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিধানের কঠোর নিয়ম করার আবশ্যক হয়, আবার কখন বা তদ্বিষয়ে একটু স্বাধীনতা প্রদান করা আবশ্যক হইয়া উঠে।

এই যে জাতিভেদের বিরুদ্ধে কত তর্ক শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, এক সময়ে ইহাতে পরম মঙ্গল করিয়াছিল, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং এখনও কতক কতক শুভ করিতেছে, ইহা কাহারও কাহারও মত। এক্ষণে ইহা বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাকে ঠিক করিতে গেলে কেবল যথেচ্ছা আহার বিহারে হয় না। অন্য উপায় অবলম্বন আবশ্যক।

আপনাদের রাজা থাকিলে রাজার শাসনে কতকটা সমাজ সংস্কার হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ রাজার অভাবে সাধারণ মত গঠন ব্যতীত অন্য

কোন রূপে সমাজ সংস্কার হয় না। এই মত গঠন কার্য্যে শিক্ষার মত দ্বিতীয় সহায়ক আর কেহ নাই। সমাজসংস্কারকগণ নরনারীর উপযুক্ত শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলে বড় ভাল হয়। যে সকল সামাজিক নিয়মে শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়, তাহা একটু বিশেষ চেষ্টা করিলে আর কোন প্রতিবন্ধক উৎপাদন করিতে পারে না। মনে করুন, অনেকের মতে বাল্য বিবাহ স্ত্রীজাতির শিক্ষার এক প্রবল অন্তরায়। তার পর স্ত্রীজাতির অবরোধ প্রথা। কিন্তু আপাততঃ এ সকল থাকিলেও জাতীয় উপায়ে দেশে এমন স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করা যাইতে পারে, যাহাতে স্ত্রীজাতিরা আপন আপন কর্ত্তব্য বাছিয়া লইতে পারে। সংস্কারকগণ স্ত্রীলোকের পতিগণের যথাবিহিত শিক্ষা দিতে পারিলে যে স্ত্রীজাতির শিক্ষার উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে, একথা আমি খুব বিশ্বাস করি। তার পর যদি ব্রহ্মচর্য্যের দিকে খুব ঝোঁক দেওয়া যায়, এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়েই এ বিষয়ে বিশেষরূপ শিক্ষিত হয়, তখন অবরোধপ্রথার কতক শৈথিল্য করিলেও তত দোষের হইবে না। ইতিমধ্যে কতকগুলি যথার্থ ব্রহ্মচর্য্যশালী পুরুষ কতকগুলি বিধবা ব্রহ্মচারিণীকে ও অন্যান্য নারীকে এরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা পুরুষসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া অন্যান্য স্ত্রীকেও এরূপ শিক্ষা দিতে পারেন। শুধু বিদ্যালয় করিয়া নহে; এই শিক্ষিতা ললনাগণ লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাঁহাদিগকে নানা-বিদ্যায় শিক্ষিতা করিতে পারেন। এইরূপে ক্রমশঃ বাল্যবিবাহপ্রথারও ক্রমশঃ অনাবশ্যকতা হইতে পারে।

আসল কথা এই, এই সকল সংস্কার কার্য্যে চরিত্রবান ধার্ম্মিক পুরুষের, ব্রহ্মচর্য্যবলে জিতেন্দ্রিয় পুরুষের বিশেষ আবশ্যক। যত দিন না তাহা হইতেছে, ততদিন সমুদয় আন্দোলনই একরূপ বিফল।

আর ইহাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, ধর্ম্মশিক্ষাই শিক্ষার সার। স্ত্রীলোকদিগের লৌকিক বিদ্যায় কতটুকু প্রয়োজন, তাহা আগে জানা দরকার, তাহা না হইলে অন্ধভাবে পুরুষগণ যে প্রণালীতে শিক্ষিত হইতেছে, তাহার অনুসরণ করিলে কিছুই হইবে না। পুরুষগণের যে ভাবে ও যাহা শিক্ষা হইতেছে, তাহারই সংস্কার প্রয়োজন। তাহা যে ঠিক সম্পূর্ণ, তোমায় কে বলিল? অতএব সংস্কারকার্য্যে হঠকারিতা অবলম্বন না করিয়া বিশেষরূপ সহিষ্ণুতার আবশ্যক, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

অনেকে শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও ঔচিত্য

দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু এই শাস্ত্রের বিচার উভয়পক্ষেই অনেক স্থলে নিরপেক্ষ হয় না। সকলেই আপনার মনোমত শাস্ত্রপ্রমাণ তুলিয়া থাকেন। আবার কোন শ্লোক তুলিলেও তাহার ব্যাখ্যা লইয়া বিশেষ গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। অবশ্য যথাসাধ্য নিরপেক্ষভাবে প্রাচীন সমুদয় শাস্ত্রে উল্লিখিত সামাজিক জীবনের ইতিহাস সহজ ভাষায় লোকসমক্ষে ধরিতে পারিলে ক্রমশঃ শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মবল, চরিত্রবল ব্যতীত কার্য্যকালে সবই বৃথা হইয়া যাইবে। এই জন্য সমাজসংস্কার প্রধানতঃ চরিত্রবলের উপর নির্ভর করে। মনে করুন, আমি বালবিধবার বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রসঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত জ্ঞান করিলাম। কিন্তু অতিশয় মানসিক বল ব্যতীত তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার আমার সামর্থ্য কই? এই জন্য যত চরিত্রবলশালী ব্যক্তির উৎপত্তি হইতে থাকিবে, তত সমাজসংস্কার সোজা হইয়া আসিবে। যথার্থ ধর্ম্মবলে বলী তেজীয়ান ব্যক্তির শক্তিকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না। তাঁহার শক্তির নিকট, শাস্ত্র বলুন, দেশাচার বলুন, কিছুই আর কোন ভয় প্রদর্শন করিতে পারে না।

তার পর সমাজসংস্কারকেরা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কার্য্যকেই সমাজসংস্কার নাম প্রদান করিয়া থাকেন। বাস্তবিক সমাজসংস্কার কি? সমাজরূপ সুবৃহৎ তরুর দুই একটী ডালপালা ছেদন করিলে কি হইবে? সমাজের আমূলসংস্কার করিতে হইবে। কতকগুলি স্থূলব্যাপারে শুধু হস্তক্ষেপ করিলে চলিবে না। যে সকল সূক্ষ্ম কারণ পরম্পরা হইতে এই সকল স্থূল ব্যাপারের প্রসব হইতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া সেই সকল কারণ গুলিকে সংশোধন করিতে হইবে।

ভারতে আবার সমাজসংস্কার ধর্ম্মের ভিতর দিয়া ব্যতীত অন্য কোনরূপে হইবার উপায় নাই। এখানকার জীবনীশক্তি ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ছাড়িয়া এখানে সমাজ বা যে সংস্কারই বলুন না কেন, এমন কি, রাজনীতির সংস্কার পর্য্যন্ত মিছা বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। হইতেছেও ত তাহাই। তাই বলি, আমাদের এখনও এখানে সমগ্র জগৎ হইতে বিশেষত্ব, সেই ধর্ম্ম লইয়া মাতিতে হইবে—ভিতরে লক্ষ্য করিতে হইবে—গভীরযোগ, প্রবল প্রেমের উৎস ছুটাইতে হইবে। তবেই সমাজ প্রকৃতসংস্কারের পথে ধাবিত হইবে।

বিগত কংগ্রেসে যে 'সামাজিক সভা' বসিয়াছিল, তাহার গতি দেখিয়া

আমার বড় আশা হয়। এখন সমাজসংস্কার আর ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ নাই—গণ্যমান্য সকল হিন্দুরই এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে, এ বিষয়ে চিন্তা উদয় হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় সকল বিশেষ বিশেষ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তায় মত দিতে না পারায় কোন কোন সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র তাঁহাকে সভাপতির অযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের সূক্ষ্মদর্শিতার অভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা যে স্বভাবতই একযোগ হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারি না, সেই আমাদের স্বাভাবিক অনৈক্যাগ্নিতে ইহাতে আরো সমিধ্ প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহাদের যেন ধারণা, আমরা গুটিকয়েক কার্য্য, যাহাকে সমাজসংস্কার বলিয়া স্থির করিয়াছি, তাহাই সমাজসংস্কার। এই যে শিক্ষিতসমাজে সর্ব্বত্রই একটা আন্দোলনের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহাতে কি তাঁহাদের আনন্দ করা উচিত নয়? লোককে লওয়াইতে গেলে তাহাকে ভাবাইতে হইবে। তাহা না হইলে, অন্ধভাবে গতানুগতিকের ন্যায় সমাজসংস্কারকবিশেষের অনুসরণ করা আর বাপ পিতামহ যাহা করিয়া আসিতেছিলেন, সেই অনুসারে চলা, ইহাতে বড় প্রভেদ দেখিতে পাই না।

প্রকৃত কথা এই, আমাদিগকে পরস্পরের প্রতি প্রেম ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে। দেখা যায়, অনেক ব্যক্তি সত্য ও স্পষ্টবাদিতার দোহাই দিয়া প্রতিবাদীকে অতিশয় কটুকাটব্য করিতে লজ্জা বোধ করেন না, কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত, প্রথমে, আপনার ছিদ্র কত আছে। সে সকল সংশোধনের প্রয়াস না পাইয়া অপরের ছিদ্র উপলক্ষ্য করিয়া উপহাস ও গালাগালি করা উন্নত মনের পরিচায়ক নহে।

আসুন, আমরা বুঝি, শত দোষ সত্ত্বেও ইহা আমাদের সমাজ। এই আমাদের জুড়াইবার স্থান। জাহাজে ফুটো হইয়া থাকিতে পারে, তাই বলিয়া অপর সকলকে ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা না করিয়া এস, আমরা সকলে এই ফুটো মেরামত করিবার চেষ্টা করি। না পারি, আমরা সকলে একত্রে ডুবিব। কিন্তু চিরকাল জানিব, আমাদের সমাজের সকলেই আমার ভাই—সকলেই আমার আপনার। আপনার জনকে কেহ কি কখন ছাড়িতে পারে?

সর্ব্বোপরি সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বনিয়ন্তা করুণাময় পরমেশ্বরকে জানাইতে হইবে, প্রভো, অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং

সময়—অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতে লইয়া যাও। এইরূপ হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা যদি প্রতি অন্তর হইতে দিবানিশি উঠিতে থাকে, তবে আমাদের সমাজ, শুধু আমাদের কেন, সকল সমাজই দেবসমাজে পরিণত হয়—যথায় দেবদেবী আনন্দে বিচরণ করিতে থাকিবে। কুসংস্কার কুসংস্কার বলিতেছ? এই চীৎকার ত্যাগ করিয়া লোকে যাহাতে ভগবৎ-সংস্কার-সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা কর। সত্যজ্যোতি প্রকাশিত হইলে মিথ্যার অন্ধকার কতক্ষণ টিকিবে? আর বাস্তবিক ধরিতে গেলে কুসংস্কারসম্পন্ন নয় কে? এক জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত সকলেরই ত দেহ, ধনমান যশ প্রভৃতির নানাপ্রকার কুসংস্কার রহিয়াছে। যদি প্রকৃত সত্য চাও, যদি সে ভরসা থাকে, তবে প্রকৃত বিচারসম্পন্ন হইতে চেষ্টা কর দেখি। হায়, পৌত্তলিকাতে দেশ ভরিয়া গেল, এ সকল চীৎকার কি তোমার শোভা পায়? তুমি ত নিজদেহ, নিজ স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পুত্তলিকার চরণে কোটি কোটি বার মস্তক অবনত করিতেছ। প্রকৃত আদর্শ, প্রকৃত চরিত্র দেখাও, জগৎ তোমার উপদেশ অবনতমস্তকে পালন করিবে, নতুবা সমুদয় চীৎকার নিষ্ফল। সংস্কারকগণের একটী ভুলধারণা এই যে, সংস্কার হিন্দুসমাজে সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা নহে। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কার অনবরত চলিতেছে। বুদ্ধদেবের সময় ইহা প্রবল ও সার্ব্বভৌমিক আকার ধারণ করে। তার পর শঙ্করাচার্য্য, রামানন্দ, রামানুজ, মধ্ব, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নানক, কবীর, দাদূ প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ সকলেই নীরবে সমাজের সংস্কার ও গঠনকার্য্যে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। হঠকারিতা অবলম্বন না করিয়া, পাশ্চাত্যগুরুগণের আপাতযুক্তিপূর্ণ বাক্যে মুগ্ধ না হইয়া সেই প্রাচীন মহাপুরুষগণের কার্য্যাবলি শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ণভাবে আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে। যে সকল শক্তি লইয়া আজ এই পাশ্চাত্যজাতিরও মহাবিস্ময় উৎপাদক, অপূর্ব্ব সমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই শক্তিগুলিকে বুঝিতে হইবে, তাহার উপর যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, উহা যেখানে আছে, সেখান হইতেই উহাকে কিছু ঊর্দ্ধে ঠেলিয়া দিতে হইবে। প্রকৃত শক্তির বিকাশে দুর্ব্বলতা, দোষ সব পলায়ন করিবে। সূর্য্য উঠিলে কি আর পেচক উড়িয়া বেড়ায়; না, চোর চুরী করিতে সাহস পায়?

ভাষ্যমূলম্।—অথবা অবিশেষেণ সংযোগসংজ্ঞা বিজ্ঞাস্যতে দ্বয়োরপি বহূনামপি তিত্র দ্বয়োর্যা সংজ্ঞা তদাশ্রয়োলোপো ভবিষ্যতি। যদপ্যুচ্যতে। ইহ নির্গ্লেয়াৎ নির্গ্লায়াৎ। নির্ম্লেয়াৎ। নির্ম্লায়াৎ। বান্যস্য সংযোগাদেরিতোত্বং ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা সাধারণরূপে সংযোগ সংজ্ঞা বিজ্ঞাপিত করা যাইবে। দুই দুই বর্ণেরও হইবে এবং বহুবর্ণেরও সংযোগসংজ্ঞা হইবে। সে স্থলে অর্থাৎ দুইবর্ণেরই হউক, বা বহুবর্ণেরই হউক, যেহেতু বহুবর্ণের মধ্যেও দুইবর্ণ অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে; সুতরাং দুই দুই বর্ণের যে (সংযোগ) সংজ্ঞা, তাহাকে আশ্রয় করিয়া লোপ হইবে।

তবে যে বলা হইয়াছে নির্গ্লেয়াৎ, নির্গ্লায়াৎ, নির্ম্লায়াৎ, নির্ম্লেয়াৎ এই স্থলে 'বান্যস্য সংযোগাদেঃ ৬।৪।৬৮।' (১) এই সূত্রানুসারে, ('গ্লা' এবং 'ম্লা'র মধ্যে 'র্ গ্ ল, র্ ম্ ল তিনবর্ণ সংযোগস্থলে') এত্বপ্রাপ্তি হইবে না ?

ভাষ্যমূলম্।—অঙ্গেন সংযোগাদিং বিশেষয়িষ্যামঃ। অঙ্গস্য সংযোগাদেরিতি। এবং তাবৎসর্ব্বমাঙ্গং পরিহৃতম্। যদপ্যুচ্যতে। ইহ চ গোমান্ করোতি যবমান করোতীতি সংযোগান্তলোপো ন প্রাপ্নোতীতি। পদেন সংযোগান্তং বিশেষয়িষ্যামঃ। পদস্য সংযোগান্তস্যেতি॥ যদপ্যুচ্যতে। ইহ নির্গ্লানো নির্ম্লান ইতি সংযোগাদেরাতোধাতোর্যণ্বত ইতি নিষ্ঠানত্বং ন প্রাপ্নোতীতি। ধাতুনা সংযোগাদিং বিশেষয়িষ্যামঃ। ধাতোঃ সংযোগাদেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অঙ্গের সহিত সংযোগাদির বিশেষণ করিব। তাহা হইলে সংযোগের আদিস্থিত যে অঙ্গ, বিকল্পে তাহার আকার স্থানে একার হইবে। এইরূপে অঙ্গবিহিত কার্য্যে যত দোষ উপস্থিত হইবে, তাহার পরিহার হইবে।

তবে যে বলা হইয়াছে, 'গোমান্ করোতি' 'যবমান্ করোতি' ইত্যাদি স্থলে, "সংযোগান্তস্য লোপঃ" সূত্রানুসারে সংযোগের অন্তস্থিত বর্ণের (যেমন 'ৎক') লোপ প্রাপ্ত হইবে না; সেই দোষও থাকিবে না। কারণ, এই স্থলে পদের সহিত সংযোগান্তের বিশেষণ করিব। তাহা হইলেই পদের সংযোগান্তের লোপ হইবে। 'গোমান্ করোতি' র 'ক'কার ভিন্ন পদের হওয়াতে, 'ত'কার লোপের বাধা হইবে না। আর যাহা বলা হইয়াছে যে, 'নির্গ্লানঃ' 'নির্ম্লানঃ' প্রভৃতি স্থলে,

(১) ঘু সংজ্ঞকধাতু, মা এবং স্থা প্রভৃতি ভিন্ন অন্যান্য সংযোগ আদি ধাতুর আকার স্থানে একার হয় বিকল্পে, ককারইৎবিশিষ্ট লিঙ্ সম্বন্ধী আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে।

'সংযোগাদেরাতো ধাতোর্যণ্বতঃ, ৮।২।৪৩। (১) এই সূত্রানুসারে 'নিষ্ঠা' অর্থাৎ 'ক্ত' 'ক্তবতু' প্রত্যয়ের 'ত'কারের 'ন'ত্ব হইবে না, তাহাও নহে। কারণ, সম্প্রতি আমরা সংযোগের আদির সহিত বিশেষণ করিব। তাহা হইলেই ধাতুর সংযোগাদির 'ক্ত' 'ক্তবতু' প্রত্যয়ের 'ত' কারের 'ন'ত্ব হইবে। নির্ম্লান প্রভৃতি-স্থলেও 'ম্লা' ধাতুর (সংযোগ আদি হওয়াতে) পরে 'ন'ত্ব হইয়া প্রয়োগসিদ্ধি।

বার্ত্তিকমূলম্।—স্বরানন্তর্হিতবচনম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—স্বরবর্ণ দ্বারা অব্যবহিতবর্ণে বচন হইয় থাকে। *

ভাষ্যমূলম্। স্বরৈরনন্তর্হিতা হলঃ সংযোগ-সংজ্ঞা ভবন্তীতি বক্তব্যম্।

কিং প্রয়োজনম্।

ব্যবহিতানং মাভূৎ। পচতি পনসম্।

নন্বু চানন্তরা ইত্যুচ্যতে তয়োশ্চৈবানন্তরা ইত্যুচতে তেন ব্যবহিতানাং ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ। স্বরবর্ণ সমূহ দ্বারা ব্যবধান হয় নাই, এমন যে 'হল্' (ব্যঞ্জন বর্ণ সমূহ), তাহার সংযোগ-সংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলা উচিত্।

ইহার প্রয়োজন কি ?

ব্যবধান বিশিষ্ট বর্ণ সমূহের সংযোগ সংজ্ঞা যাহাতে না হয়। যেমন, 'পচতি পনসম্' ('প'এর পর 'অ'কার ব্যবধান, এইরূপে প্রত্যেক বর্ণের পরে স্বর-বর্ণ ব্যবধান থাকাতে যাহাতে সংযোগ-সংজ্ঞা না হয়)।

যদি বল যে, সূত্রে যে 'অনন্তরা' এই শব্দ বলা হইয়াছে, তাহাতে দুই বর্ণের মধ্যে যে অনন্তর অর্থাৎ অ ব্যবধান, তাহারই সংযোগসংজ্ঞা হইবে, সুতরাংই ব্যবহিত বর্ণের সংযোগ-সংজ্ঞা হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—দৃষ্টমানন্তর্য্যং ব্যবহিতেঽপি। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—ব্যবধানেও আনন্তর্য্য শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখা যায়।

ভাষ্যমূলম্। ব্যবহিতেঽপ্যনন্তরশব্দো দৃশ্যতে। তদ্ যথা। অনন্তরাবিমৌগ্রামাবিত্যুচ্যতে। তয়োশ্চৈবান্তরানদ্যশ্চ পর্ব্বতাশ্চ ভবন্তীতি। যদি তর্হি অনন্তরশব্দো ব্যবহিতেঽপি ভবতি আনন্তর্য্যবচনমিদানীং কিমর্থং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ। ব্যবধান হইলে অনন্তর শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন,

---

(১) সংযোগ আদিভূত যে আকারান্ত যণ্ বিশিষ্টধাতু, তাহার নিষ্ঠা (ক্ত, ক্তবতু) প্রত্যয়ের 'ত'কারের স্থানে নকার হয়।

—এই গ্রাম দুইটী (পরস্পর) "অনন্তর" এইরূপ বলা হয়, অথচ তাহাদের ব্যবধানে, কত নদী, কত পর্ব্বত থাকে।

অনন্তর শব্দ যদি ব্যবধানেও প্রয়োগ হয়, তবে সূত্রে আনন্তর্য্য বচন কেন প্রয়োগ করিলেন?

বার্ত্তিকমূলম্।—আনন্তর্য্যবচনং কিমর্থমিতি চেদেকপ্রতিষেধার্থম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—'আনন্তর্য্য' বচন কেন করা হইল, যদি এই কথা বল, তাহা হইলে একবর্ণের সংযোগ-সংজ্ঞা নিষেধের জন্য বলিব। *

ভাষ্যমূলম্।—একস্য হলঃ সংযোগ-সংজ্ঞা মাভূদিতি। কিং চ স্যাৎ। যদ্যেকস্য হলঃ সংযোগ-সংজ্ঞা স্যাৎ। ইয়েষ। উবোষ। ইজাদেশ্চ গুরুমতোনৃচ্ছ ইত্যাম্ প্রসজ্যেত।

ভাষ্যানুবাদ।—একটী ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগ-সংজ্ঞা যাহাতে না হয়, (এই জন্য 'আনন্তর্য্য' বচনের প্রয়োজন)।

কি (দোষ) হইবে, যদি একটী হলের (ব্যঞ্জনের) সংযোগ-সংজ্ঞা হয়?

'ইষ' এবং 'উষ' ('ইচ্' আদি হওয়াতে) ধাতুর, "ইজাদেশ্চ গুরুমতোঽনৃচ্ছঃ। ৩।১।৩৫।" ('ইচ্' আদিস্থিত যে গুরুসংজ্ঞাবিশিষ্ট ধাতু, তাহার উত্তর 'আম্' আগম হয়, 'লিট্'এর বিভক্তি পরে থাকিলে, 'ঋচ্ছ' ধাতু ভিন্ন অন্যত্র) এই সূত্রানুসারে, 'আম্' প্রাপ্তি হইবে; অতএব 'ইয়েষ,' উবোষ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন বাঽতজ্জাতীয়ব্যবায়াৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—তজ্জাতীয়বর্ণ ব্যবধান না থাকাতে, সেই দোষ হইবে না *

ভাষ্যমূলম্।—ন বা এষ দোষঃ।

কিং কারণম্।

অতজ্জাতীয়ব্যবায়াৎ। অতজ্জাতীয়কং হি লোকে ব্যবধায়কং ভবতি।

কথং পুনর্জ্জায়তে। অতজ্জাতীয়কং হি লোকে ব্যবধায়কং ভবতীতি।

এবং হি কংচিৎ কশ্চিৎ পৃচ্ছতি অনন্তরে এতে ব্রাহ্মণকুলে ইতি।

স আহ। নানন্তরে। বৃষলকুলমনয়োরন্তরেতি।

কিং পুনঃ কারণং ক্বচিদতজ্জাতীয়কং হি লোকে ব্যবধায়কং ভবতি ক্বচিন্ন।

সর্ব্বত্রৈবহ্যতজ্জাতীয়কং ব্যবধায়কং ভবতি।

কথমনন্তরাবিমৌগ্রামাবিতি।

গ্রামশব্দোঽয়ং বহ্বর্থঃ। অস্ত্যেব শালাসমুদায়ে বর্ত্ততে। তদ্‌যথা গ্রামো-দগ্ধ ইতি।

অস্তি বাটপরিক্ষেপে বর্ত্ততে। তদ্‌যথা গ্রামং প্রবিষ্ট ইতি॥ অস্তি মনুষ্যেষু বর্ত্ততে। তদ্‌যথা গ্রামো গতো গ্রাম আগত ইতি। অস্তি সারণ্যকে সসমীকে সস্থণ্ডিলকে বর্ত্ততে। তদ্‌যথা গ্রামো লব্ধ ইতি। তদ্যঃ সারণ্যকে সসীমকে সস্থণ্ডিলকে বর্ত্ততে তমভিসমীক্ষ্যৈতৎ প্রযুজ্যতেঽনন্তরাবিমৌগ্রামাবিতি সর্ব্বত্রৈব হ্যতজ্জাতীয়কং ব্যবধায়কং ভবতি॥

ভাষ্যানুবাদ। অথবা এই দোষ হইবে না। কারণ কি?

যে হেতু, ভিন্নজাতীয় বস্তুরই ব্যবধান হইয়া থাকে। লোক-সমাজে ভিন্ন জাতীয় বস্তু দ্বারাই ব্যবধান হইয়া থাকে।

ইহা কিরূপে জানিলে যে, ভিন্নজাতীয় বস্তুই ব্যবধায়ক হইয়া থাকে?

এইরূপ কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে যে, এই সকল ব্রাহ্মণকুল কি পরস্পর অনন্তর (অব্যবধান)?

সে বলে (উত্তর করে) যে, অব্যবধান নহে। বৃষণ (শূদ্র) কুল ইহাদের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে।

তবে বা কি কারণেই আবার কোথাও অন্যজাতীয় বস্তু লোকে 'মনুষ্য-সমাজে) ব্যবধায়ক হইয়া থাকে, কোথাও হয় না?

সর্ব্বত্রই অন্য জাতীয় বস্তু ব্যবধায়ক হইয়া থাকে।

তবে কিরূপ এই 'গ্রাম দুইটী পরস্পর অব্যবধান' এইরূপ বলা হইয়াছে?

এইখানে গ্রাম শব্দ বহু অর্থবাচক; কারণ, শালা (গৃহ) সমূহে, গ্রাম শব্দ বর্ত্তমানই আছে। যেমন, (গৃহ দগ্ধ হইলে) 'গ্রাম দগ্ধ' এইরূপ বলা হইয়া থাকে।

গ্রাম শব্দ, বাটপরিক্ষেপে (১) বর্ত্তমান রহিয়াছে; যেমন, গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে অর্থাৎ গ্রামের সীমানাস্থিত রাস্তা অতিক্রম করিয়া কেহ গ্রামে প্রবেশ করিলে, তাহারও নাম গ্রাম।

মনুষ্য সমূহেও গ্রাম শব্দ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যথা, (কোন মনুষ্য গেলে বা আসিলে) 'গ্রাম গিয়াছে, গ্রামে আসিয়াছে,' এইরূপ বলা হয়।

(১) পূর্ব্বকালে গ্রামের চারিদিকে প্রাচীর এবং প্রাচীরের চারিদিকে বেষ্টিত রাস্তা থাকিত; এখনও 'জয়পুর' প্রভৃতি স্থানে রহিয়াছে। সেই রাস্তাকেই 'বাটপরিক্ষেপ' বলে।

গ্রাম শব্দ,—অরণ্যের সহিত, সীমার সহিত, স্থণ্ডিলের (১) সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং তাহা (এরূপ ব্যবহার) সম্পূর্ণ দেখিতে পাইয়াই এরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে যে, এই গ্রাম দুইটী পরস্পর অব্যবধান। সুতরাং সর্ব্বত্র ভিন্নজাতীয় বস্তু ব্যবধানকার হইবেক, অতএব লোকব্যবহার দ্বারাই যখন সিদ্ধ হইবে, তখন স্বরবর্ণ দ্বারা ব্যবধান না হয়, এমন ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগ-সংজ্ঞা হয়, এইরূপ সূত্র বা বার্ত্তিক করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ।

সূত্রানুবাদ।—মুখের সহিত এবং নাসিকার সহিত একত্র মিলিত হইয়া উচ্চারিত হয় যে বর্ণ, তাহার 'অনুনাসিক' সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—কিমিদং মুখনাসিকাবচনম্। মুখঞ্চ নাসিকা চ মুখনাসিকম্ মুখনাসিকং বচনমস্য সোঽয়ং মুখনাসিকাবচনঃ।

যদ্যেবং মুখানাসিক-বচন ইতি প্রাপ্নোতি।

নিপাতনাদ্দীর্ঘত্বং ভবিষ্যতি।

অথবা মুখনাসিকমাবচনমস্য সোঽয়ং মুখনাসিকাবচনঃ।

অথ কিমিদমাবচনমিতি।

ঈষদ্বচনমাবচনমিতি। কিঞ্চিন্মুখবচনং কিঞ্চিন্নাসিকাবচনম্।

মুখদ্বিতীয়া বা নাসিকা বচনমস্য সোঽয়ং মুখনাসিকাবচনঃ।

মুখোপসংহিতা বা নাসিকা বচনমস্য সোঽয়ং মুখনাসিকাবচনঃ।

ভাষ্যমূলম্।—এই (সূত্র) মুখনাসিকাবচন জিনিষটী কি?

মুখ এবং নাসিকা মুখনাসিক, মুখনাসিক হইয়াছে বচন (২) ইহার, সে মুখনাসিকাবচন।

যদি এইরূপই (সমাস) হয়; তবে মুখনাসিক বচন এইরূপ (আকারশূন্য 'ক' কার) প্রাপ্তি হইবে।

(তাহা হইলেও পুনঃ) নিপাতনের দ্বারা দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইবে।

---

(১) যজ্ঞার্থ নির্ম্মিত রেখাভ্যন্তরস্থ ভূমি।

(২) উচ্চারণের যে সাধক, তাহার নাম বচন।

অথবা মুখনাসিকা হইয়াছে আবচন ইহার, তাহাই এই মুখনাসিকাবচন।

আবার এই আবচন, জিনিষটাই বা কি ?

ঈষৎ (যৎকিঞ্চিৎ) বচনের নাম আবচন, কিঞ্চিৎ মুখবচন, কিঞ্চিৎ নাসিকাবচন।

অথবা মুখদ্বিতীয়া (মুখকে সহায় করিয়া) নাসিকা হইয়াছে বচন ইহার, সেই এই মুখনাসিকাবচন।

অথবা মুখের সমীপে মিলিত হইয়াছে যে নাসিকা, তাহাই হইয়াছে বচন ইহার, সে মুখনাসিকাবচন।

ভাষ্যমূলম্।—অথ মুখগ্রহণং কিমর্থম্। নাসিকাবচনোঽনুনাসিক ইতীয়ত্যুচ্যমানে যমানুস্বারাণামেব প্রাপ্নোতি। মুখগ্রহণে পুনঃ ক্রিয়মাণে ন দোষো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, 'মুখ' শব্দের গ্রহণ (সূত্রে) কেন করা হইল ?

যদি 'মুখ' শব্দের উল্লেখ না করিয়া, সূত্রে কেবল নাসিকা বচনকেই অনুনাসিক বলে ; তবে যম (১) এবং অনুস্বার প্রভৃতিরই কেবলমাত্র অনুনাসিক সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু পুনঃ 'মুখ' শব্দের গ্রহণ করিলে, কোনও দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—অথ নাসিকাগ্রহণং কিমর্থম্।

মুখবচনোঽনুনাসিক ইতীয়ত্যুচ্যমানে ক চ ট ত পানামেব প্রাপ্নোতি। নাসিকা-গ্রহণে পুনঃ ক্রিয়মাণে ন দোষো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তরজিজ্ঞাস্য এই যে, নাসিকা শব্দ গ্রহণ করা হইল কেন ?

'নাসিকা' গ্রহণ না করিয়া, মুখবচনোঽনুনাসিকঃ, কেবলমাত্র এত টুকুই বলিলে, 'ক চ ট ত প' ইহাদেরই অনুনাসিক সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে ; কিন্তু পুনঃ 'নাসিকা' শব্দের গ্রহণ করিলে, কোন দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—মুখগ্রহণং শক্যমকর্তুম্। কেনেদানীমুভয়বচনানাং সিদ্ধং ভবিষ্যতি। প্রাসাদবাসিন্যায়েন। তদ্‌যথা কেচিৎ প্রাসাদবাসিনঃ কেচিদ্ভূমিবাসিনঃ কেচিদুভয়বাসিনঃ। অত্র যে প্রাসাদবাসিনো গৃহ্যন্তে তে প্রাসাদবাসিগ্রহণেন। যে ভূমিবাসিনো গৃহ্যন্তে তে ভূমিবাসিগ্রহণেন। যে তূভয়বাসিনঃ

(১) বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণের পরে পঞ্চমবর্ণ থাকিলে মধ্যে তৎসদৃশ যে একটী বর্ণের আগম হয়, তাহার নাম 'যম' :যেমন, পলিক্‌ক্নী চখ্‌খ্নতুঃ, অগ্‌গ্নিঃ, ঘ্‌ঘ্নন্তি ইত্যাদি। (ইহার ব্যবহার বেদেই দৃষ্ট হয়)।

গৃহ্যন্তে তে প্রাসাদবাসিগ্রহণেন ভূমিবাসিগ্রহণেন চ। এবমিহাপি কেচিন্মুখবচনাঃ কেচিন্নাসিকাবচনাঃ কেচিদুভয়বচনাঃ। তত্র যে মুখবচনা গৃহ্যন্তে তে মুখগ্রহণেন। যে নাসিকাবচনা গৃহ্যন্তে তে নাসিকাগ্রহণেন। যে উভয়বচনা গৃহ্যন্তে তে মুখগ্রহণেন নাসিকাগ্রহণেন চ।

ভাষ্যানুবাদ।—সূত্রে 'মুখ' শব্দ গ্রহণ না করিলেও চলে।

তবে ('মুখ' গ্রহণ না করিলে) সংপ্রতি কিরূপে (মুখ ও নাসিকা) উভয় স্থানোৎপন্ন বচনের (বর্ণের) অনুনাসিক সংজ্ঞা সিদ্ধ হইবে?

প্রাসাদবাসিন্যায়ের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। যেমন,—কোন কোন লোক প্রাসাদে (অট্টালিকায়) বাস করে; কেহ কেহ ভূমিতে (মৃত্তিকোপরি) বাস করে, কেহ কেহ বা উভয় স্থানেই বাস করে ; তন্মধ্যে যাহারা প্রাসাদবাসী তাহারা প্রাসাদবাসিগ্রহণেই গৃহীত হয়, যাহারা ভূমিবাসী, তাহারা ভূমিবাসী গ্রহণেই গৃহীত হয়, আর যাহারা উভয়বাসী, তাহারা প্রাসাদবাসী গ্রহণেও গৃহীত হয় এবং ভূমিবাসী গ্রহণেও গৃহীত হয়। সেরূপ এখানেও কোন কোন বর্ণ মুখবচন, কোন কোন্ বর্ণ নাসিকাবচন, আর কোন কোন বর্ণ উভয়বচন ; তন্মধ্যে যাহারা মুখবচন, তাহারা 'মুখ' গ্রহণেই গৃহীত হয়, যাহারা নাসিকাবচন, তাহারা নাসিকা-গ্রহণেই গৃহীত হয়, আর যাহারা উভয়বচন, তাহারা মুখ এবং নাসিকা উভয় গ্রহণে গৃহীত হয়।

ভাষ্যমূলম্।—ভবেদুভয়বচনানাং সিদ্ধম্। যমানুস্বারাণামপি প্রাপ্নোতি। নৈব দোষো ন প্রয়োজনম্।

ইতরেতরাশ্রয়ং তু ভবতি।

কা ইতরেতরাশ্রয়তা? সতোঽনুনাসিকস্য সংজ্ঞয়া ভবিতব্যম্। সংজ্ঞয়া চানুনাসিকো ভাব্যতে তদিতরেতরাশ্রয়ং ভবতি। ইতরেতরাশ্রয়াণি চ কার্য্যানি ন প্রকল্পন্তে।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি উভয় বচনেরই সংযোগ সংজ্ঞা সিদ্ধি হয়, তবে 'যম,' 'অনুস্বার' প্রভৃতিরও ত প্রাপ্তি হইবে?

হইলই বা, তাহাতে কোন দোষ নাই, কোন প্রয়োজনও নাই।

কিন্তু ইতরেতরাশ্রয়তা হইবে?

কিরূপে ইতরেতরাশ্রয়তা (অন্যোন্যাশ্রয়তা) হইবে, যে পূর্ব্ব হইতে অনুনাসিক বর্ত্তমান থাকিলেই তাহার পরে আবার সংজ্ঞা হইতে পারে ; আবার সংজ্ঞা হইলে পরে তাহা অনুনাসিক বর্ণকে গ্রহণ করে (পরস্পরের অপেক্ষা করি-

তেছে যে, অনুনাসিক বলিয়া কোন বর্ণ থাকিলে, তাহার সংজ্ঞা করিবে, আবার অনুনাসিক সংজ্ঞা হইলে, পরে তদ্দ্বারা অনুনাসিক বর্ণসমূহের গ্রহণ হইবে) সুতরাং ইতরেতরাশ্রয় হইবে। ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটিত কোনও কার্য্য (শাস্ত্রাদিতে) কুত্রাপি কল্পিত (ব্যবহৃত) হয় না।

বার্ত্তিক।—অনুনাসিকসংজ্ঞায়ামিতরেতরাশ্রয়ে উক্তম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অনুনাসিক সংজ্ঞাতে যে ইতরেতরাশ্রয় (জনিত দোষ ঘটিবে, তাহার পরিহার পূর্ব্বেই) উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—কিমুক্তম্।

সিদ্ধং তু নিত্যশব্দত্বাদিতি। নিত্যাঃ শব্দাঃ নিত্যেষু শব্দেষু সতোঽনুনাসিকস্য সংজ্ঞা ক্রিয়তে ন সংজ্ঞয়া অনুনাসিকো ভাব্যতে।

যদি তর্হি নিত্যাঃ শব্দাঃ। কিমর্থং শাস্ত্রম্।

কিমর্থং শাস্ত্রমিতি চেন্নিবর্ত্তকত্বাৎ সিদ্ধম্। নিবর্ত্তকং হি শাস্ত্রম্।

কথম্।

আঙস্মা অবিশেষেণোপদিষ্টোঽনুনাসিকস্তস্য সর্ব্বত্রাননুনাসিকবুদ্ধিঃ প্রসক্তা তত্রানেন নিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে। ছন্দস্যাচি পরত আঙোঽনুনাসিকস্য প্রসঙ্গেঽনুনাসিকঃ সাধুর্ভবতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—কি বলা হইয়াছে ?

শব্দ নিত্য বলিয়াই সমস্ত প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। যাবতীয় শব্দই নিত্য। সুতরাং নিত্য শব্দের মধ্যে স্বতঃই সিদ্ধ রহিয়াছে যে অনুনাসিক, তাহার সংপ্রতি এই সূত্র দ্বারা সংজ্ঞা করা হইতেছে; কিন্তু সংজ্ঞা করিবার পরে যে, সংপ্রতি অনুনাসিক বর্ণ উৎপন্ন হইল, তাহা নহে।

শব্দ যদি তবে নিত্যই হয়, তবে আর শাস্ত্র করিবার প্রয়োজন কি ? (যেহেতু, অসিদ্ধ বিষয়কে সিদ্ধ করিবার জন্যই শাস্ত্রের প্রয়োজন; যদি তাহা নিত্য সিদ্ধই হইল, তবে আর শাস্ত্রের প্রয়োজন কি ?)

যদি এই কথা বল যে, "শাস্ত্রের, প্রয়োজন কি ?" তবে নিবর্ত্তকত্ব হেতুই শাস্ত্রের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। শাস্ত্র হইয়াছে (নিষিদ্ধ বিষয়ের) নিবর্ত্তক।

কিরূপে ?

যেমন 'আঙ্' উপসর্গটী ইহাকে (এই ছাত্রকে) সাধারণ ভাবে নিরনুনাসিক উপদেশ করা হইয়াছে; সুতরাং ইহার সর্ব্বত্রই নিরনুনাসিকবুদ্ধি, প্রসঙ্গ ক্রমে উপস্থিত হইবে; এবং তাহাই এই (পরবর্ত্তী) সূত্র দ্বারা নিবৃত্তি করা

নির্ব্বাণতত্ত্ব।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।)

পদার্থ মাত্রেরই এক এক বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বই ইহাকে অন্যান্য পদার্থ হইতে বিশেষ বা পৃথক্ করিয়া ইহার নিজত্ব বিধান করে। এই নিজত্ববিধায়ক বিশেষ ভাবটির নামই স্বভাব। সুতরাং বস্তুর স্বভাব জানিলেই তাহাকে যথার্থ জানা হইল। এরূপ জ্ঞানের নামই তত্ত্বজ্ঞান। কোন বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান জানিতে হইলে তাহার স্বভাব জানিলেই হইল। এই স্বভাব রাগদ্বেষাত্মক; ইহা কতকগুলিকে গ্রহণ করিতে চায়, কতকগুলিকে ত্যাগ করিতে চায়; কতকগুলির সহিত ইহার নিত্যপ্রীতি, কতকগুলির সহিত নিত্য অপ্রীতি। পদার্থ সমুদয় জড় ও চেতন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। জড়পদার্থসমূহের ভিতরেও রাগদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। যেমন অন্ধকারের সহিত অন্ধকারেরই ঘনিষ্ঠতা হয়, আলোকের কখনও হয় না, সেইরূপ সজাতীয় বস্তুর সহিতই বস্তুর ঘনিষ্ঠতা হইয়া থাকে, বিজাতীয়ের সহিত কখনই হয় না। জলীয় ও স্নেহময় পদার্থ বিজাতীয় বলিয়া মিলিত হইতে পারে না। জলীয় জলীয়ের সহিত, স্নেহময় স্নেহময়েরই সহিত মিলিত হয়। স্থাবর জীবেও, (যথা বৃক্ষলতাদি) রাগদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। বায়ু, জল এবং সূর্য্যালোক ইহাদের অভিমত; অনাবৃষ্টি, অতিরিক্ত উত্তাপ, এবং অন্ধকার ইহাদের অনভিমত। বায়ু, জল এবং আলোকের সহায়ে বর্দ্ধমানা লতা স্বীয় সুকোমল অগ্রভাগদ্বারা কেবল সূর্য্যালোকতপ্ত স্থানই অন্বেষণ করে, তুমি যতই তাহাকে ছায়ার দিকে ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা কর না, তোমার যত্ন কখনও সফল হইবে না। অদ্য ফিরাইয়া দাও, কল্য দেখিবে, তাহা সূর্য্যাভিমুখী হইয়াছে। আলোকের প্রতি অনুরাগ এবং ছায়ার প্রতি দ্বেষই ইহার স্বভাব। সুতরাং জড় ও উদ্ভিদ পদার্থসমূহ যে রাগদ্বেষের অধীন, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

জীবজগৎ রাগদ্বেষ দিয়া গঠিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গো, মহিষ প্রভৃতি শষ্পপ্রিয় জন্তুগণ তৃণ, পল্লব, লতা প্রভৃতিতেই বিশেষ অনুরক্ত, কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদকুল মাংসাশী বলিয়া, তৎসমুদয়ে উহাদের কোনও অনুরাগ লক্ষিত হয় না। প্রতি জীবেই এই রাগদ্বেষের পার্থক্য দৃষ্ট হয় বলিয়া, তদ্দ্বারাই তাহাদের স্বভাব নির্ণয় করিতে হয়। স্বভাব রাগদ্বেষাত্মক হইলেও

প্রকৃতপক্ষে ইহা রাগাত্মক ভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ, আলোকই আমার একমাত্র অনুরাগের কারণ বলিয়া তদ্বিপরীত অন্ধকার সহজেই হেয় হইবে। অতএব দ্বেষ অনুরাগজন্য বলিয়া, ইহা অনুরাগেরই অন্য এক রূপ, এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত। রাগে গ্রহণ এবং দ্বেষে ত্যাগ করায়, এই জন্য রাগ ভাবাত্মক, এবং দ্বেষ অভাবাত্মক অর্থাৎ রাগেরই সত্তা আছে, দ্বেষের সত্তা নাই। সুতরাং স্বভাব রাগাত্মক। যে যাহা চায়, তাহাই তাহার স্বভাব, যে যাহা দ্বেষ করে, তাহাই তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক। মৎস্য জলে বাস করিতে চায়। জলে বাসই সুতরাং তাহার স্বভাব। আবার স্থলে বাস ইহার পক্ষে অত্যন্ত হেয় বলিয়া, তাহা ইহার পক্ষে অস্বাভাবিক।

এইরূপে মনুষ্যস্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাও রাগদ্বেষাত্মক। আনন্দভোগে ঈপ্সা, দুঃখভোগে জিঘাংসা কাহার না হয়? জীবনে প্রীতি এবং মরণে ভীতি সকলেরই দৃষ্ট হয়। মননশীল মনুষ্য মনন সহায়ে জ্ঞানোপার্জ্জনে একান্ত অনুরক্ত; অজ্ঞানের উপাসনা, সূর্য্যের অন্ধকার উপাসনার ন্যায়, তাহার পক্ষে অসম্ভব; জ্ঞানে আদর এবং অজ্ঞানে অনাদর তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এইরূপে মনুষ্যের স্বভাব, অর্থাৎ, মনুষ্য কি দিয়া গঠিত, জানিতে হইলে আমরা সহজেই দেখিতে পাই যে, আনন্দভোগই তাহার স্বভাব, দুঃখ নহে; জীবনধারণই তাহার স্বভাব, মরণ নহে, এবং জ্ঞানই তাহার স্বভাব, অজ্ঞান নহে। আনন্দভোগ আনন্দপদবাচ্য, জীবনধারণ সৎপদবাচ্য, এবং জ্ঞান চিৎপদবাচ্য। ঋষিগণ এইরূপে মনুষ্যকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

মানব সচ্চিদানন্দময় স্থির হইলে, যাহা মরণশীল, তাহা মনুষ্য নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে। দেহবান্ মনুষ্যের জন্ম ও মরণ আছে, সুতরাং তিনি প্রকৃত মনুষ্য নহেন। এইরূপে ক্রিয়াময়, মননশীল, কর্ত্তা ও ভোক্তা-পদবাচ্য মনুষ্য নিদ্রাবস্থায় লয় হয়েন বলিয়া তিনিও প্রকৃত মনুষ্য নহেন, কারণ, সৎস্বভাবের লয় হওয়া অসম্ভব। এই জন্যই পণ্ডিতগণ মনুষ্যকে পঞ্চকোষাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোষান্তর্গত মানব প্রকৃত মনুষ্যের ছায়ামাত্র। কোষ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন বলিয়া প্রকৃত মানব অসীম, বিভু, মহতো মহীয়ান্, আর্য্য ঋষিকুলের এইরূপ মীমাংসা।

ক্ষত্রিয়কুলগৌরব শুদ্ধোদননন্দন শাক্যসিংহের জীবনে প্রকৃত মনুষ্যের বিকাশ যেরূপ পরিলক্ষিত হয়, সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মনুষ্য

সচ্চিদানন্দময় হইলেও পৃথিবীর প্রায় সমগ্র মানবমণ্ডলীই আপনাদিগকে নামরূপবিশিষ্ট, সোপাধিক, নশ্বর জীব স্বরূপ ধারণা করিয়া সন্তুষ্ট আছেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে এরূপ বোধ হয় না যে, তাঁহারা নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন, সর্ব্বতঃপূর্ণ, পরমানন্দময় পরম পুরুষ। ঘট কুড্যাদির ন্যায় তাঁহারাও নশ্বর, নানাবিধ অবস্থার অধীন, সুখ দুঃখের তরঙ্গমধ্যে দোদুল্যমান হইয়া নিত্যই কৃপাপাত্র ও কৃপাভিক্ষুক। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনেই তাঁহাদের যাবতীয় শক্তি ব্যয়িত হয়। তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ অন্যরূপে জীবনযাপন করিতে চাহেন, অমনিই তিনি স্বীয় স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতির ভাবভঙ্গি দেখিয়া, সেরূপ সঙ্কল্প হইতে বিরত হয়েন। সুতরাং এই সংসার-এক ধারায় আহার নিদ্রাদির বশবর্ত্তী মানবকুলকে লইয়া আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একজন এই মহা স্রোতের উপর মস্তক উত্তোলন করিয়া বজ্রনির্ঘোষে বলেন, "পশুবৎ জীবনযাপন করা মানবের উদ্দেশ্য নহে। স্ব স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া এই দুঃখসঙ্কুল সংসার-সমুদ্র হইতে আপনাদের উদ্ধার কর।" সেই শব্দে কেহ কেহ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠেন, এবং সেই দেবতুল্য সৌম্যমূর্ত্তির দিব্য মুখজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া, এবং তাঁহার অবিশ্বাসরূপ অন্ধকার বিনাশী সুযুক্তির আলোকপূর্ণ, সুমধুর, সহজবোধ্য, উপদেশাবলি শ্রবণ করিয়া, হৃদয়ে আশা ও বল প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারাও তৎসঙ্গে সংসারসমুদ্রের উপর স্ব স্ব মস্তক উত্তোলন করেন এবং দেখেন যে, তাঁহাদের প্রাণের ক্ষুধা ও পিপাসা মিটাইবার একমাত্র বস্তু সম্মুখে জাজ্বল্যমান। তাহার অন্বেষণে এতদিন তাঁহারা মিথ্যা সংসারসমুদ্রের অতল তলে হাবু ডুবু খাইতেছিলেন, তাহা যে ঐ ভয়সঙ্কুল, দুঃখময় সাগরের বাহিরে অবস্থিত, ইহা কেবল এই মহাপুরুষের বাক্যে জানিতে পারিয়া আপনাদের কৃতার্থ করিলেন। মধ্যে মধ্যে এইরূপে কেহ কেহ মহাপুরুষ সহায়ে আপনাদের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন। এবং ঐ মহাপুরুষও মধ্যে মধ্যে এখানে দেখা দিয়া অনেক দুঃখী, হতাশ, শোকসন্তপ্ত মানবকে নিত্য শান্তিনিকেতনে লইয়া যান। এই সকল পরদুঃখকাতর, শান্তিদানসমর্থ, মহাপুরুষগণ মধ্যে মধ্যে আসেন বলিয়াই এই দুঃখের সংসারে দুঃখী তাপীর দুঃখের অবসান আছে। তাহা না হইলে ইহা নরকতুল্য ভয়ঙ্কর হইত, অজ্ঞান অন্ধকার কখনও ইহা হইতে অপসৃত হইত না।

শাক্যসিংহ যে এইরূপ এক মহাপুরুষ ছিলেন, ইহা তাঁহার যুবজীবন পর্য্যা-

লোচনা করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে। সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আদর্শ, সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন, সর্ব্বসৌভাগ্যের আস্পদ, সুকোমলহৃদয় সেই রাজপুত্র নিখিল আরাম-নিলয় স্বীয় দিব্য প্রাসাদে যুবতী জায়া, ও নবজাত সন্তানের সহিত অশেষ দাস-দাসীপরিবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহাকে সর্ব্ববিধ সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য তাঁহার স্নেহময় পিতা রাজা শুদ্ধোদন কোন যত্নেরই ত্রুটি করেন নাই। প্রাসাদের চতুঃপার্শ্বে ক্রোশব্যাপী ইন্দ্রের নন্দনকানন তুল্য মনোহর উদ্যান। তন্মধ্যে কত প্রফুল্লকমলহংসকারণ্ডবাকীর্ণ, চিত্তমুগ্ধকারী সরোবর, কত কেলিসদন, কত দেবদেবীনরনারীর প্রস্তরময়ী, মনোহারিণী মূর্ত্তি, কত কেলিতরণীসমাকীর্ণ সরোবর হইতে সরোবরান্তরগামী, ঈষৎ তরঙ্গাকুল খাত, তাহা কে গণনা করিতে পারে? কিন্তু সেই পরিখা ও প্রাকার বেষ্টিত সুবিশাল উদ্যান সীমাবদ্ধ বলিয়া স্বাধীনচেতা, মুক্তস্বভাব রাজকুমারের পক্ষে অনতিবিলম্বেই বিষম বন্ধনভূমির ন্যায় বোধ হইল। তিনি একদা প্রাতঃকালে মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, "দেখিতে হইবে, এই প্রাকারের বহির্দ্দেশে কি আছে?" এরূপ স্থির করিয়া ছন্দকনামা স্বীয় সূতকে কহিলেন, "অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি উদ্যানের বহির্দ্দেশে গমন করিব, তুমি রথ লইয়া প্রস্তুত থাকিও।"

সমাচার পিতার কর্ণে উপনীত হইল। তিনি অমনি প্রজাবর্গকে স্বীয় রাজধানী সুসজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন; কুরূপ, কুশব্দ, ও কুগন্ধ যাহাতে রাজকুমারকে ব্যথিত না করে, এই বিষয়ে সকলকে বিশেষ সতর্ক হইতে কহিলেন।

সন্ধ্যা সমাগত। উদ্যানের উত্তর দ্বার দিয়া ছন্দকপরিচালিত রথ নগরে প্রবেশ করিল। অসংখ্য নরনারী মনোহর বেশে সুসজ্জিত হইয়া রাজকুমারের দর্শনলালসায় উদ্‌গ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। কুমার রাজপথে উপনীত হইলে সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। গায়ক ও নর্ত্তকগণ মধুরস্বরে মঙ্গলগীতি গান করিতে লাগিলেন। যুবরাজের তদ্দর্শনে ও তচ্ছ্রবণে অপার আনন্দ হইল।

সন্ধ্যা প্রায় অতীত হইয়া যায়। এমন সময় ছন্দক উদ্যানাভিমুখে রথ ফিরাইলেন। সেই সময় এক জরাতুর বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন বলিয়া যষ্টির উপর ভর করতঃ নিকটবর্ত্তী কোনও পান্থকে পথ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এবং যদিও সেই পান্থ তাঁহাকে বার বার দক্ষিণে যাইতে কহিতেছিলেন, তথাপি শ্রবণশক্তিহীন বলিয়া স্থবিরও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পথের কথা জিজ্ঞাসা

করিতেছিলেন। তাঁহার শ্বেত কেশ ও শ্মশ্রু, রদনহীন বক্ত্র, কম্পিত কলেবর, ও ভগ্নস্বর দর্শন এবং শ্রবণ করতঃ কুমার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সূত, এ কোন্ জাতীয় জীব?" সূত কহিলেন, "প্রভো, ইনি বৃদ্ধ, বার্দ্ধক্যে সকল মনুষ্যেরই এই অবস্থা হয়।" কুমার কহিলেন, "আমাকেও এরূপ হইতে হইবে?" সূত তাহাতে উত্তর দিলেন, "যুবরাজ, জরাবশে মনুষ্য মাত্রকেই এরূপ ইন্দ্রিয়শক্তিশূন্য, অজ্ঞান শিশুর ন্যায় হইতে হয়।" ইহা শুনিয়া তিনি নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। যান প্রাসাদে উপনীত হইল। সে রজনী তিনি সুখে আরাম করিতে পারিলেন না। দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় ছন্দকপরিচালিত রথ কুমারকে লইয়া উদ্যানের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বহির্গত হইল। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় নগরবাসিগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং মধুর মঙ্গলগীতিরব চিন্তাকুল কুমারের চিন্তাকে ক্ষণকালের জন্য তিরস্কৃত করিয়া দিল। কিয়দ্দূর গিয়া যুবরাজ দেখিলেন যে, একব্যক্তি রোগের যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে, এবং আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। তাহার স্বজনগণ বিবিধ উপায়ে তাহাকে স্থির করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। কুমার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "কুমার, এ ব্যক্তি জ্বরে অভিভূত হইয়া বিষম যন্ত্রণা পাইতেছে। মনুষ্যদেহে ধাতুবৈষম্য উপস্থিত হইলে এরূপ হয়। যতদিন ধাতুসমূহ সমতা-প্রাপ্ত না হয়, ততদিন ইহাকে এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।" ইহাতে যুবরাজ কহিলেন, "সকলকেই কি এইরূপে সর্ব্বসুখবিনাশক অতীব ক্লেশজনক জ্বরের অধীন হইতে হইবে?" ছন্দক কহিলেন, "সর্ব্বকাল মনুষ্যের হিতা-হিত বিবেচনাশক্তি থাকে না, সুতরাং তিনি অনেক সময়েই অত্যাচার করিয়া ফেলেন। সেই অত্যাচার হইতে ধাতুবৈষম্য, ও তাহা হইতে জ্বরের উদয় হয়।" যুবরাজ ব্যাকুলচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রজনীতে উত্তমরূপ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না।

তৃতীয় দিবস কুমারের রথ নগরের পশ্চিম দিকে, সন্ধ্যার সময়, উপনীত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় জয়ধ্বনি ও মঙ্গলগান আর তাঁহাকে অধিক উল্লসিত করিতে পারিল না। কিয়দ্দূর গিয়া যুবরাজ দেখিলেন যে, চারি-ব্যক্তি খট্টার উপর শায়িত পুরুষকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন এবং তাঁহাদের পশ্চাৎ কতিপয় স্ত্রীপুরুষ আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে গমন

করিতেছেন। এই করুণদৃশ্যে ব্যথিত হইয়া কুমার ছন্দককে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কহিলেন, "হে কুমার, খট্টায় শয়ান পুরুষ আর জীবিত নাই। তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহমাত্র এখানে আছে। সকলকেই কোন না কোন সময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। মনুষ্য শতবৎসর কাল মাত্র এ ভবধামে থাকিবার অধিকার পাইয়াছেন। তাহার পর তাঁহাকে ইহা ত্যাগ করিতেই হইবে। অধিকাংশই ষষ্ঠি বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে চলিয়া যান।"

এই নূতন সম্বাদে যুবরাজ চমকিয়া উঠিলেন। ব্যাকুলান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি সে রজনী মুহূর্ত্তমাত্রও নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যে জ্ঞান আমার এত প্রিয়, যাহার আমি স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি, বার্দ্ধক্য তাহার অপলাপ হইবে, যে আনন্দ পৃথিবীর একমাত্র আকর্ষণ, রোগতাড়নায় তাহার লোপ হইবে ; যে জীবন এত আশাময়, এত মনোহর, মৃত্যুতে তাহারও অবসান হইবে। তবে কিসের জন্য সকলে এই পার্থিব জীবনকে এত আদর করিয়া থাকে ? মনুষ্য মাত্রেই উন্মাদরোগগ্রস্ত। যাহার স্থিরতা নাই, তাহাকে স্থিরজ্ঞান করা কি বাতুলতা নয় ?" এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া তিনি অতি কষ্টে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন।

প্রভাত হইল। প্রফুল্লকুসুমকুল প্রাতঃসমীরণে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া চারিদিকে আপন আপন সৌরভ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। পক্ষিসমূহ পরমানন্দে প্রাভাতিক গান আরম্ভ করিয়া দিল। প্রকৃতির সকলই মনোহর, সকলই উৎফুল্ল ও সজীব। যুবরাজের বদনকমলের অদ্য আর সেরূপ বিকাশ নাই। পাছে গোপা মনে ব্যথা পান, এই হেতু তিনি স্বীয় ভাব গোপন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সম্যক্ কৃতকার্য্য হইলেন না। পতিপ্রাণা গোপা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আরাধ্য দেবতার কোনও গভীর মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সশঙ্কিতচিত্তে যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আর্য্যপুত্র, অদ্য তোমাকে এরূপ বিমনা দেখিতেছি কেন ? আমি কি তোমার নিকট কোনরূপে অপরাধিনী হইয়াছি ?" সুমধুর প্রিয়সম্ভাষণে কুমার স্বীয় জায়ার শঙ্কা দূর করিলেন, এবং তিনি কোনও দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন আছেন বলিয়া কিছুক্ষণ একান্তে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, গোপা অন্যত্র গমন করিলেন।

ছন্দকপরিচালিত রথ সন্ধ্যার সময় অশ্ব উদ্যানের উত্তর দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিল। নাগরিকগণ জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া যুবরাজ এক ভিক্ষাপাত্রধারী, কাষায়বসন, উদাসীন-দৃষ্টি ভিক্ষুককে দেখিয়া ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তির এরূপ উদাসীন ভাবে থাকিবার কারণ কি?" ছন্দক উত্তর করিলেন, "হে কুমার, এই মহা-পুরুষ জগতের অকিঞ্চিৎকরত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার প্রতি উদাসীন হইয়াছেন। ইনি স্বীয় স্ত্রীপুত্রপরিবার প্রভৃতির সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ-পূর্ব্বক এক্ষণে যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বস্থলেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইঁহার কোনও নির্দ্দিষ্ট গৃহ নাই। যখন যেখানে থাকেন, তাহাই উঁহার গৃহ। উঁহার আত্মপর কেহ নাই। উনি সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ত।" এই সমাচারে ভাবিবুদ্ধের যাবতীয় চিন্তা দূর হইয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন যে, সংসারের মধ্যে এই ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী। অনিত্যে নিত্য-জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বাতুলতা মাত্র। যদিও তাঁহার নিদ্রা হইল না, তথাপি তিনি সে রজনী আনন্দে অতিবাহিত করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "অজ্ঞান, দুঃখ, ও মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় কি? জগতের ক্ষণভঙ্গুর সুখে সর্ব্বতোভাবে উদাসী না হইলে সে উপায় কখনও উদ্ভাবিত হইবে না।"

যুবরাজ ইহা স্থিরনিশ্চয় করিলেন, এবং কিয়দ্দিবস পরে গোপনে রাজ্য হইতে পলাইয়া গিয়া ভিক্ষুবেশে ক্রমাগত ছয় বৎসর অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, এবং বহুগুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক অকৃতকার্য্য হইয়া, পরিশেষে স্বচেষ্টায় সেই পথ আবিষ্কার করিলেন, যদ্দ্বারা গমন করিলে অজ্ঞান, দুঃখ ও মৃত্যু সর্ব্বোতোভাবে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞান (চিৎ), আনন্দ ও চিরজীবন (সৎ) পথিকের লাভ হয়। সুতরাং বুদ্ধাবিষ্কৃত নির্ব্বাণ, ঋষিদৃষ্ট সচ্চিদানন্দময় স্বস্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মৃত্যু।

'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥'

প্রাণিগণ প্রতিদিনই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; তথাপি আর সকলে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবার বাসনা করিতেছে, ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য আর কি আছে? একদিন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহা বলিয়া মহাবিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আমি যখন ভাবিতে চেষ্টা করি, এই মুহূর্ত্তেই হয়ত আমি কলেরা বা প্লেগরোগাক্রান্ত হইয়া মরিতে পারি, তখন কে যেন আমার মনের ভিতর হইতে আশ্বাস দিয়া বলে, না, তুমি মরিবে কেন? যে মরিবার, সে মরিবে; আমি যতই তাহাকে সদ্‌যুক্তি দেখাই, বলি, কে তোমায় বলিল, আমি মরিব না, তখন সে তাহার নানা বিপরীত যুক্তি দেখাইতে থাকে। মরিবার কথা ভাবিলেই যেন মনটা দমিয়া যায়, কায কর্ম্মে যেন আর উৎসাহ থাকে না। যেন ভয়ে মন আড়ষ্ট হইয়া আসে। নানা বন্ধু নানা সান্ত্বনা বলেন,--জগতের ভিতর নানা অশুভ আছে সত্য, অশুভের সেরা মৃত্যু আছে, এ কথাও সত্য, কিন্তু যখন তখন ওরূপ চিন্তা করিয়া সংসারের রসভঙ্গ করিও না। বিবাহবিভ্রাটের নন্দলালের মত বাসরঘরে বসিয়া 'শেষের সে দিন মন' গাহিও না। এখন যাহা চলিতেছে, সব চলুক; অশোভন অসুন্দর সমুদয় ব্যাপার গুলিকে নিরাবরণ করিয়া বীভৎস রসের সৃষ্টি করিও না। তোমার কি একটু কবিত্ব বোধ নাই, তোমার কি একটু art এর জ্ঞান নাই? যাহা কিছু অশুভ, তাহা যত না দেখিতে পার, চেষ্টা কর, যদি বাধ্য হইয়া দেখিতেই হয়, তবে তাহার উপর যত পার ফুল চাপাও, ফুল চাপাইয়া তাহা ঢাকিয়া রাখ, সোনার পাতে শব মুড়িয়া রাখ--জগতে আসিয়া কাযের লোক হও; অনর্থক ভাবুকতা করিও না।

যুক্তি জিনিষটা যেন মনের দাসীস্বরূপ, মনের হস্তে যন্ত্রস্বরূপ; উহাকে যে দিকে লওয়াইবে, ও সে দিকে যাইবে। এই বন্ধুর যুক্তিগুলি কি রকম? যেন মনকে আঁখি ঠারা, মনের স্বাভাবিক গতিকে বন্ধ করিয়া রাখা। নিজে-দের কার্য্যগুলি সমর্থনের জন্য বুদ্ধিবিচারকে যেন ধাবা দেওয়া। প্রকৃত বিচার কি কখন আমাদের হয়?

মৃত্যুচিন্তা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে উদিত না হইলে—সংসারের সমুদয় অশুভ, বিপদ্, দুঃখ সর্ব্বদা চক্ষের সমক্ষে না রাখিলে সেইগুলি হইতে মুক্ত হইবার উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে না। যাহাকে জয় করিতে হইবে, তাহাকে সর্ব্বদা চক্ষের সামনে রাখা দরকার, তাহার বলাবল পরীক্ষার দরকার, তাহা হইতে পলায়ন, তাহাকে ভুলিয়া থাকা কাপুরুষের লক্ষণ। কত বিপদ্ যে আমাদের মস্তকের উপর সর্ব্বদা ঝুলিতেছে, তাহার গণনা করা যায় না। এই মুহূর্ত্তেই, যে গৃহে রহিয়াছি, তাহার ছাদ পড়িয়া যাইতে পারে—নদীতে গমন কালে নৌকা ডুবি হইতে পারে; গাড়ীতে যাইতে যাইতে বা ট্রামে চলিতে চলিতে ঘোড়া খেপিয়া বিপদ্ ঘটাইতে পারে, এমন কি, ধূমপান করিতে করিতে তাহার ভিতর হইতে সর্প বহির্গত হইয়া লোকের মৃত্যুসাধন করিয়াছে, শুনা গিয়াছে। নানাপ্রকার রোগ যেন যমদূতের মত সর্ব্বদা জগতে সঞ্চরণ করিতেছে; কাহাকে লইবে, কিছু ঠিক নাই। পরন্তু এই দেহনাশের এত প্রকার উপায় রহিয়াছে যে, তথাপি কেন এই দেহ এখনও স্থির রহিয়াছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সুখ দুদিনের জন্য, আমোদ দুদিনের জন্য, উৎসব দু দিনের জন্য, তার পর ঘোর অন্ধকার। রাজা প্রজা, বড়লোক ছোটলোক, এ বিষয়ে কাহারও প্রভেদ নাই।

একবার এই মৃত্যুর কথা গভীরভাবে ভাবিলে আমাদের আশা উদ্যম, সুখচেষ্টা, প্রেম, অহঙ্কার, অভিমান সমুদয়ই দেখিয়া হাসি পায়। মানুষের এই শক্তি! এই শক্তির এত অহঙ্কার? এত ঐশ্বর্য্য, এত সম্পদ্, তাহার এই পরিণাম! এত বিদ্যা, এত মান, তাহার এই পরিণাম! আবার এত উৎসব, এত প্রেম, এত হাঁসি খুঁসি, তাহারও এই পরিণাম! কি ভয়ানক! মরিবার জন্যই এই জন্ম—জন্মের সঙ্গেই মৃত্যুবীজ উপ্ত; একদল যাইতেছে, আর এক দল আসিতেছে।

ভগবানের সৃষ্টি কখন শূন্য থাকিতেছে না, কিন্তু আজ যে দল, কাল আর সে দল নাই! আজ যে ছেলে, কাল সে ছেলের বাপ হইতেছে, পরশ্ব সে ঠাকুরদাদা হইয়া নাতিদের সহিত আমোদ করিতে লাগিল। পরদিন সে আপনার স্থান শূন্য করিয়া দিয়া অপরকে আবার তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতেছে। সে ঠাকুরদাদা এখন গেলেন কোথায়? কে জানে?

এখন কথা এই, এই মৃত্যু ব্যাপারটী সত্য, আবার ইহাতে যে মানুষের একটা মহাভয়, তাহাও সত্য, কিন্তু এই সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন মানুষের মনে

স্বতঃ উদয় হয়। ১ম, এই মৃত্যু কোনরূপে নিবারণ করা যাইতে পারে কি না, ২য়, ইহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করা উচিত কি না, ৩য়, মৃত্যুর পর কি হয়, ৪র্থ, যদি ইহাকে নিবারণ করা অসম্ভব বা অনুচিত হয়, তবে তজ্জনিত মহাভয়, মহা আতঙ্ক নিবারণেরই বা উপায় কি আর ঐ ভয়ের কারণই বা কি ? এই গুলির যথামতি আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

সমুদয় জগতে চিরকাল ধরিয়া চেষ্টা চলিয়াছে, মৃত্যু একেবারে লোপ করিয়া দিয়া কিসে চিরজীবিত্ব লাভ করিতে পারা যায়। এই চেষ্টার ফলে চিরজীবিত্ব না হউক, দীর্ঘজীবিত্ব লাভ অনেকের হইয়াছিল, পড়া যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন ঋষি অনেক সাধনার পর ১১৬ বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক যুগে শুনা যায়, অনেকে স্বভাবতঃই ১০।২০ হাজার বৎসর জীবন ধারণ করিতেন আবার অনেকে যোগ-তপস্যার দ্বারা উহা আরো বাড়াইতেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে রসায়ন নামক এক দর্শনের কথা পাওয়া যায় ; সেই দর্শনানুসারিগণ পারদের অদ্ভুত শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, পারদ কোন এক বিশেষ প্রকারে প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহার সেবনে মানুষ অসম্ভবরূপ দীর্ঘায়ু হইতে পারে। হঠযোগীরাও প্রাণায়াম সাধনের দ্বারা অতিশয় দীর্ঘায়ু হইতে পারা যায়, বলিয়া থাকেন। শুধু আমাদের দেশে নহে, ইউরোপেও এক সময়ে আলকেমি নামক এক বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। এই আলকেমিষ্টগণ দ্রব্যগুণ দ্বারা এমন কোন রসায়ন প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেন, যাহাতে মানুষ মৃত্যুকে একেবারে জয় করিতে পারে। এই সকল কথা ছাড়িয়া দিয়াও আজ কাল বৈজ্ঞানিক জগতেও এই অনুসন্ধানের কথা দেখা যায়—দুই চারিটী ব্যক্তির কথা শুনা যায়, যাঁহারা পরিমিত জীবনযাপনের দ্বারা সাধারণ আয়ুষ্কাল অপেক্ষা অধিক দীর্ঘায়ু হইয়াছেন। একজন পার সাহেবের কথা পড়া যায়, যিনি ১২০ বৎসর বয়সে পুত্রমুখ দেখেন এবং ১৫৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। বৈজ্ঞানিক-গণও যোগীদের দীর্ঘজীবন প্রভৃতি ব্যাপারে উপহাস করিলেও বাস্তবিক তাঁহারাও যে ইহা অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে কথা এই, এই দীর্ঘজীবন হইলেও মৃত্যুশঙ্কা একেবারে গেল না। রোগজরার আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইলেও অপঘাতমৃত্যুর সম্ভবনীয়তা নিবারণ হইল না। তার পর কথা এই, এই দীর্ঘজীবন লাভ সম্ভব হইলেও ইহা প্রার্থনীয় কি না। এই দীর্ঘজীবন লইয়া কি করিব ? পার্থিব সমুদয়

সুখ সম্ভোগ করিব? না, তত্ত্ব অন্বেষণ করিব? সুখসম্ভোগে কি এক দিন বিতৃষ্ণা আসিবে না? ইহা কি এক দিন একঘেয়ে হইয়া যাইবে না? আর যদি তত্ত্বানুসন্ধানেই জীবন যাপন করি, তবে ত এখনকার পরমায়ু লইয়াও তত্ত্বালোচনা করিতে পারি। আর মরিলে হয়ত কোন অজানিত রাজ্যে গিয়া অনেক নূতন নূতন তত্ত্বালোক পাইতাম। তাহাতেও ত বঞ্চিত হইলাম। আর এখনকার মত মৃত্যু থাকিলে হয়ত সংসারে আসক্তি অনেকটা কমিত। তত্ত্বান্বেষণে স্পৃহা অনেকটা বাড়িত। আর যতই দীর্ঘজীবন লাভের আশা থাকুক, কাল যে মরিব না, এ বিশ্বাস কেহ যে কখন নিশ্চিত করিয়া পোষণ করিতে পারেন, ইহা ত আমার বোধ হয় না। আদত সমস্যা যে মৃত্যুভীতির নিরাকরণ, তাহা ইহাতেও হইতেছে না।

এই মৃত্যুর পর কি হয়, তাহা জানিবার জন্য চিরকাল অনুসন্ধান চলিয়াছে। নিশ্চয় কিছু হইয়াছে কি না, কে জানে? কঠোপনিষদে নচিকেতারও এই প্রশ্ন, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি না? তাহাতে বলা হইয়াছে, মানুষ কর্ম্ম ও সংস্কার অনুসারে কেহ বা স্থাবর যোনি, কেহ বা পশুযোনি, কেহ বা মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায়, সৎকর্ম্মী-দের নানালোক লোকান্তর দিয়া শেষে চন্দ্রলোকে গতি হয়, অবশেষে আবার পৃথিবীতে আসিতে হয়। যাঁহারা জ্ঞানপরায়ণ, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গতি হয়, তথা হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। আবার যাহারা অতিশয় পাপকর্ম্মী ছিল, তাহাদের মশক দংশাদি হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণগ্রস্ত হইতে হয়। পুরাণে আবার আমরা নানাবিধ লোকের কথা পাঠ করিয়া থাকি ;—ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জনাদি এবং ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ লোক প্রভৃতি উচ্চতর লোকসমূহ এবং পাতাল, তলাতল, রসাতল প্রভৃতি নিম্নতর লোকসমূহ। আবার রৌরব, মহা-রৌরবাদি নানাবিধ নরকেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ ভাব স্পষ্টতঃ সর্ব্বত্র বর্ণিত আছে যে, স্বর্গনরকাদি যাহাই ভোগ হউক না, এই নরলোক অথবা অন্য কোন লোকে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে, যতদিন না জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের উদয়ে আর এই সংসারচক্রে আবর্ত্তন করিতে হয় না।

হিন্দুধর্ম্মের সন্তান বৌদ্ধধর্ম্মেও নানাপ্রকার স্বর্গনরকাদি এবং পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকৃত। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম বলেন, মৃত্যুর পর মানুষ হয় অনন্ত স্বর্গে, নয় অনন্ত নরকে গমন করিয়া থাকে কিন্তু বাইবেল মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিলে তাহাতেও স্থলে স্থলে পুনর্জ্জন্মবাদে বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রভাবে এই সকল পারলৌকিক ব্যাপার উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজ্ঞান প্রমাণ ব্যতীত কোন জিনিষ স্বীকার করিতে চান না। তিনি বলেন, ও সকল স্বর্গ নরকাদির কোন প্রমাণ নাই। শুধু তাহাই নহে, তিনি মৃত্যুর পর আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান। বিজ্ঞান সব কাটিয়া ছাঁটিয়া এইটুকু বলিতে চান, "ও সকল ব্যাপার সম্বন্ধে আমি 'না', 'হাঁ,' কিছুই বলিতে পারি না। ও সম্বন্ধে আমি একেবারে অজ্ঞেয়বাদী। আমি বলি, ও সকল অনর্থক বিষয়ে মাথা ঘামাইয়া অনর্থক শক্তিক্ষয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

কিন্তু মানুষের প্রাণ বিজ্ঞানের স্তোকবাক্যে ভুলিয়া থাকিতে পারে না। জানিতে না পারিলেও সে সর্ব্বদা যবনিকার অন্তরালে উঁকি মারিতে চেষ্টা করে। আধুনিক বিজ্ঞানের পীড়নে পূর্ব্ববিশ্বাস হারাইতে বসিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিদের কতকগুলি ব্যক্তি প্রেততত্ত্ব (Spiritualism) নামক এক নূতন বিদ্যা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাঁরা এমন অনেক প্রমাণ দেখান, যাহাতে বোধ হয়, পরলোকের সহিত ইহলোকের ক্ষণিক সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে। ইহাঁরা অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা দেখাইতেছেন এবং বলিতেছেন, মৃতের প্রেতাত্মা ব্যতীত অন্য কোন জড়শক্তির কর্ত্তৃত্বে এ সকল ঘটা অসম্ভব। অবশ্য ইহার মধ্যে অনেক জালজুয়াচুরী থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু সকল ঘটনাগুলি একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহারা যে প্রেতাত্মার কর্ত্তৃত্বে ঘটিতেছে, কি আর কোন অজানিত শক্তির প্রভাবে হইতেছে, সে সম্বন্ধে এখনও নিঃসংশয় প্রমাণের অভাব রহিয়াছে।

সম্পূর্ণ জড়বাদীকে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের নিঃসংশয় প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। তাঁহার বুঝা উচিত, যদি তিনি তাঁহার কোনরূপ ইন্দ্রিয়সাহায্যে বা কোনরূপ যন্ত্রবলে আত্মার সাক্ষাৎকার পাইতে পারেন, তবে সেই আত্মা অন্যান্য জড় পদার্থের ন্যায়ই হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহাকে জিজ্ঞাস্য, জড়ের প্রমাণ কি? আমার অনুভব ব্যতীত দ্বিতীয় প্রমাণ কিছু আছে কি? আমার অনুভব যদি জড়েরও প্রমাণ হয়, তবে চৈতন্যকে প্রমাণ করিতে হইলে তাহাকে চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত আর কিসে প্রমাণ করা যাইবে? জড়বাদীরা যে বলিয়া থাকেন, মন বা আত্মা মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিশেষ, কিন্তু জিজ্ঞাস্য, তোমার মস্তিষ্ক তুমি কি কখন দেখিয়াছ? তুমি অপরের মস্তিষ্ক দেখিয়া, অনুমান করিতেছ, তোমার মস্তিষ্ক আছে। কিন্তু তুমি তোমার মনকে সাক্ষাৎ

জানিতেছ। আর ইহার যে একেবারে ধ্বংস হয় না, তাহার প্রমাণ এই যে, কেহই 'আমি নাই বা থাকিব না', এরূপ চিন্তা করিতে পারে না। আসল কথা এই, স্থূল বুদ্ধিতে আত্মতত্ত্ব বুঝা যায় না। যেমন স্বরজ্ঞানের জন্য বিশেষরূপে কর্ণকে প্রস্তুত করিতে হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য শুদ্ধচিত্ত হইতে হয়। কেহ বলিতে পারেন, বড় বড় বৈজ্ঞানিক কি তবে স্থূলবুদ্ধি? উত্তর—আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বটে। আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জন্য যেরূপ শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা কোন কিছু না মানিয়াও হইতে পারে। সংযতেন্দ্রিয়, সংযতচিত্ত হওয়া কোন রূপ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। পরোপকারের জন্য আত্মবলিদানে প্রস্তুত হইয়া থাকা কোন বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। অতএব যাঁহার আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না হয়, তাঁহার বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক, তিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন কি না।

তার পর দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব একবার স্বীকার করিলে তাহার যে পুনর্ব্বার দেহধারণ সম্ভব, এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ইহাতে অনেক তত্ত্বের, অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান হয় বলিয়া ইহাকেই আপাততঃ একটী স্বীকৃত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পুনর্জ্জন্মবাদের যুক্তিপরম্পরা সকলেই বোধ হয় জানেন, তজ্জন্য উহার বিস্তার করিলাম না।

কিন্তু সে কথার কি হইল? মৃত্যুভয় ঘুচে কিসে? দেখা যাক, মৃত্যুকে আমাদের এত ভয় হয় কেন? প্রথমতঃ, দেখিতেছি, আমরা এই শরীর লইয়া নানাবিধ ভোগ করিতেছি। যদি এই শরীরের অঙ্গবিশেষ নষ্ট হয়, তাহা হইলে আমরা কত দুঃখিত হইয়া থাকি ও আপনাদিগকে দুর্ভাগ্য মনে করিয়া হাহাকার করি। তখন সমগ্র ভোগের আয়তন শরীরটী নাশ হইয়া গেলে যে কিছুই ভোগ করিতে পাইব না—দেখিবার ইচ্ছা, দেখিতে পাইব না; শুনিবার ইচ্ছা, শুনিতে পাইব না; বলিবার ইচ্ছা, বলিতে পাইব না; খাইবার ইচ্ছা, খাইতে পাইব না—এরূপ অবস্থা মহা বিড়ম্বনার কারণ ভাবিয়া আমরা মৃত্যুকে মহা অমঙ্গলের বিষয় মনে করিয়া উহার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করা অন্যায় মনে করি। আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের ধারণা ভোগ ও ভোগাভাব বা ভোগশক্তির অভাবেই সীমাবদ্ধ।

ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, কিরূপভাবে আপনাকে গঠন করিতে পারিলে আর মৃত্যুভয়ে ভীত হইতে হইবে না। বস্তুতঃ, যদি আমরা এখন হইতেই চেষ্টা করি, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়সংযোগ না হয়, অর্থাৎ যদি

আমরা এখন হইতে একটু একটু করিয়া মরিতে অভ্যাস করি, তবে বোধ হয়, মৃত্যু আমাদিগকে একেবারে অত ভীত করিতে পারিবে না। দেহ থাকিতে থাকিতে যাহাতে আমরা দেহজ্ঞানশূন্য হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টা কিরূপে করিতে হইবে, তাহারই উপায় শাস্ত্র ও গুরুমুখে পাওয়া যায়। ইহা বড় কঠোর সাধনা। বলেন কি, যে মৃত্যুকে আমাদের এত ভয়, সেই মৃত্যুরই সাধনা। আসক্তির সমূলে উৎপাটন—ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহর্ব্বিষয় ছাড়াইয়া, তথা হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতে নিয়োগ। একি সাধারণ কথা? কিন্তু যদি আমরা মৃত্যুভয়শূন্য হইতে চাই, তবে এই পথ ছাড়া আর উপায় নাই। যে যে অবস্থায় অবস্থিত আছে, তাহাকে তাহারই ভিতর থাকিয়া ধীরে ধীরে এই চেষ্টা করিতে হইবে।

কামনা, সুখভোগের ইচ্ছা যে হেয়, পরিত্যজ্য—তাহার আর এক কারণ, সত্য ও সুখ দুইটী পৃথক্ পদার্থ। সত্যলাভ করিবার যার চেষ্টা আছে, সে যেন সুখের প্রয়াসী না হয়। দিবারাত্রি ত আমাদের হয় সুখভোগে, না হয় সুখের আকাঙ্ক্ষায়, না হয়, উহার বিরহে কাটিয়া যাইতেছে। সত্য অনুসন্ধান হইতেছে কই? ভয়ের উৎপত্তি মিথ্যা হইতে—অসত্যনিষ্ঠা হইতে। সত্য—নিত্য বস্তু—সদা সর্ব্বদা বর্ত্তমান—উহা সর্ব্বব্যাপী, নিত্যপ্রাপ্ত, উহা হারাইবার ভয় নাই।

সেই নিষ্কাম, ভক্ত, জ্ঞানী, স্থির, ধীর, শান্ত,অচল, অটল, নিষ্কম্প মহাপুরুষই ধন্য, যিনি মৃত্যুভয়শূন্য হইয়া সদা আত্মাতে আনন্দ করিতেছেন।

দীনতা সাধন।

অনেকে, বিশেষতঃ ভক্তসম্প্রদায়ে, কথায় কথায় আপনাদিগকে দীনহীন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। অবশ্য, কপটদের কথা ধরিতেছি না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনবোধ সম্ভব কি না, আর যদি সম্ভব হয়, উহা উন্নতির সহায়ক, না, উন্নতির প্রতিকূল? আমার আশঙ্কার কারণ-গুলি বলিতেছি। যদি যথার্থ বিচার করিয়া দেখি, তবে ত দেখিতে পাই, আমি বাস্তবিক অনেকের হইতে শ্রেষ্ঠ। আমি জগতের সর্ব্বনিকৃষ্ট, এইরূপ ভাবা একটা নিরর্থক ভাবুকতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? দেখিতেছি,

কত লোকে দিন রাত কত ভয়ানক ভয়ানক অন্যায় কর্ম্ম করিতেছে! আমি সত্যসম্বন্ধে একেবারে অন্ধ না হইলে কিরূপে মনে করিতে পারি, আমি তাহাদের অপেক্ষা হীন? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, অসৎ ব্যক্তিগণ যে অবস্থাচক্রে পড়িয়া সেই সকল অসৎ কর্ম্ম করিয়াছে, আমি সেই সকল অবস্থায় পড়িলে তাহা অপেক্ষাও গুরুতর অসৎ কর্ম্ম করিতাম না, তাহার প্রমাণ কি? আমি বলি, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে যে, অবস্থাচক্রকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, আরও ইহাতে এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে যে, সকল মানুষই সমান, কারণ, অবস্থাচক্র অতিক্রমে সকলেরই সমান সামর্থ্য। তবে আর আমি অপরের অপেক্ষা হীন হইলাম কিরূপে? সুতরাং বোধ হইতেছে, কেহই সত্যের বিরোধী না হইয়া কখনই এই দীনতা সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

কিন্তু বাস্তবিক এই দীনতাসাধনের অন্তরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। মানুষ যখন উন্নতি করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার ক্রমশঃ আপনার দিকে প্রখর দৃষ্টি পড়িতে থাকে। অপরের দোষ গুণের আলোচনার দিকে দৃষ্টি ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ক্রমশঃ সে দেখিতে পায়, বাস্তবিক যাহাদিগকে আগে অসৎ দেখিতেছিলাম, তাহাদের মধ্যে ভগবান রহিয়াছেন। সেই ভগবানের দিকে তাহার ক্রমাগত দৃষ্টিবশতঃ তাহার বাস্তবিকই সকলের উপর যথার্থ ভক্তি হইতে থাকে। এমন কি, জড়পদার্থগুলির উপর পর্য্যন্ত তাহার যে স্বাভাবিক ঘৃণা, তাহাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে। কিন্তু বাস্তবিক কেবল কি তাহার নিজের উপরই ক্রমাগত ঘৃণা হয়? তাহা কখনই হয় না। তাহার ঘৃণা হয় অহংভাবটীর উপর। যে অহংভাবটীর দরুন আমাদিগকে সকল ভূতে ও সকল বস্তুতে ব্রহ্মবোধ করিতে দেয় না, তাহারই উচ্ছেদে তাহার প্রাণপণ শক্তি নিয়োজিত হয়।

এই অহংভাব দূর করিবার জন্য মহাপুরুষগণ দুইটী পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ১ম—আমিত্বের প্রসার, ২য়, আমিত্বের সঙ্কোচ। প্রথমটীতে 'আমি' এই সমুদয় জগদ্ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ—সবই আমি, এইরূপ চিন্তা করিতে হয়, দ্বিতীয়টীতে সেই বিরাট্ সর্ব্বব্যাপী পুরুষের সত্তাতে ক্ষুদ্র 'আমি' জ্ঞানটী ধীরে ধীরে ডুবাইতে হয়। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, উভয়টীতেই 'আমি' জ্ঞানের বিনাশ হয়, আবার উভয়টীতেই প্রকৃত 'আমি' স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয়। এই উভয় অবস্থাই এক এবং অনির্ব্বচনীয়। এইরূপ অবস্থাপন্ন

ব্যক্তিগণ যথার্থই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডকে ও আপনাকেও প্রকৃত প্রেম ও ভক্তির সহিত পূজা করিতে পারেন।

দীনতার যথার্থ ধারণা করিতে হইলে বুঝিতে হইবে—দীনতা অর্থে আত্মবিসর্জ্জন। আমরা ভ্রান্তবুদ্ধিতে বুঝিয়া থাকি, জগৎ সংসার সমস্ত যেন আমারই জন্য—আমারই সুখভোগের জন্য—সৃষ্ট। এই বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া আমি সংসারে সকলকে ঠেলিয়া আপনিই অগ্রবর্ত্তী হইতে বাসনা করি। কিন্তু যথার্থ সাধু পুরুষ জানেন, এ সংসার আমার জন্য নহে, সুতরাং তিনি আপনাকে সর্ব্বদা সকলের পশ্চাতে রাখিয়া থাকেন। তাঁহার এই উদাহরণের প্রভাবে সকলেই যদি আপনাকে সকলের পশ্চাৎ রাখিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে অতি মহৎ ফলই ফলিয়া থাকে, জগতে সংঘর্ষ একেবারে উঠিয়া যায়; সুতরাং এই আত্মবিসর্জ্জন সাধনেই যথার্থ দীনতাসাধন হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যিনি 'আমি'র বিস্তার করিতে চান, তাঁহারও লক্ষ্য বাস্তবিক অহংবিনাশ। সুতরাং তিনিও প্রকৃত দীনতার সাধক, তাহার সন্দেহ নাই। এই জ্ঞানসাধক যতই উন্নত হউন না, তিনি কখনই ভাবিতে পারেন না, আমি খুব উন্নত হইয়াছি, কারণ, তিনি জানেন, আমি বাস্তবিক অনন্তস্বরূপ, সুতরাং আমি যে একটু উন্নতি করিয়াছি, মনে করিতেছি, তাহা ত কিছুই নয়। মোট কথা, যাঁহার মনে সর্ব্বদা অতি মহা আদর্শ বিরাজিত, তাঁহার কখন অভিমান আসিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দিবানিশি ঈশ্বরচিন্তাই দীনতা লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন।

আমরা আমাদের অভিমান নানাপ্রকার লৌকিক বিষয়ের উন্নতির উপরও স্থাপিত করিয়া থাকি। আমি ধনী, আমি সদ্বংশজাত, আমি বিদ্বান পণ্ডিত, এই সকল অভিমান সচরাচর আমাদের হইয়া থাকে। আমরা যদি ধনমান বিদ্যা প্রভৃতির অনিত্যত্ব সর্ব্বদা চিন্তা করি এবং নিত্য অনন্ত পদার্থের চিন্তায় দিবানিশি মনকে ডুবাইয়া রাখিতে পারি, তবে এই সকল অভিমান ধীরে ধীরে কোথায় পালাইয়া যায়! নিউটনের সেই কথা স্মরণ করুন,—আমি অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের তটে কতকগুলি উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র, অনন্ত সমুদ্র সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। সক্রেটিসকে যখন ডেলফির প্রত্যাদেশবাণী গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করিল, তখন তিনি আপনার মহত্ত্বের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিলেন, আমি যে কিছু জানি না, আমি এইটীই জানি বলিয়াই আমাকে লোকে এত বড় বলিতেছে। বাস্তবিক

যে প্রকৃত দীন, সেই যথার্থ সত্যের উপাসক—সে জগতের মধ্যে আপনার স্থান কতটুকু, জগতের সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ, তাহা জানিয়াছে। সে বুঝিয়াছে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি একটী ক্ষুদ্র বেঙ্গাচিতুল্য; সে বুঝিয়াছে, জগতে যাহাদিগকে নগণ্য তুচ্ছাৎ তুচ্ছতম পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতেছে, আমিও এক সময়ে সেই সকল ছিলাম। ক্রমবিকাশে আমি এখন এই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছি, আবার কত উন্নতি হইবে, কে জানে?

দীনতা ব্যতীত উন্নতির কোন সম্ভাবনা থাকে না। অভিমানের অর্থ উন্নতির গতি রোধ—যে অবস্থায় আছি, তাহাতেই তৃপ্তি—সীমাবদ্ধ হইয়া থাকা। দীনতা ব্যতীত অপরের মহত্ত্ব বুঝা যায় না, অপরের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা অন্ধ হইয়া থাকিতে হয়, মনের প্রসার হয় না।

অতএব মনকে সর্ব্বদা এরূপ ভাবে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের জগতে সর্ব্ববিধ দোষদর্শন সত্ত্বেও সর্ব্বদা উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবের সম্ভবনীয়তাতে বিশ্বাস হয়। এই বিশ্বাস ব্যতীত কখন উন্নতি হইতে পারে না।

পূর্ব্বে দীনতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে অবশ্য বেশ বুঝিতে পারা গেল, এই দীনতা একটী মহাশক্তিস্বরূপ। এই দীনতার তেজের নিকট যাহাদিগকে আমরা বড় লোক বলি, রাজা মহারাজা, বিদ্বান সকলকেই মাথা নুয়াইতে হয়। অতএব এই দীনতা সাধনকে আমরা যেন কখন না ভুলি।

কীটের সিদ্ধিলাভ।

কীট আমি দলে সবে পায়,
ঘৃণা করে মোরে কীট বোলে;
কেন আমি বল কার দোষে
এতই অধম ভূমণ্ডলে?

পিতামাতা গুণ দোষ ভাগী
পুত্রকন্যা—পণ্ডিতেরা বলে—
আমিও কি পিতামাতা দোষে
হেন নীচ এ মহীমণ্ডলে?

প্রতিপদে অতি সশঙ্কিত
কেহ নাহি স্নেহদৃষ্টি করে;—

ভয়—কারো পদচাপবলে
বুঝি মোর পরাণ বাহিরে।

বুঝি দগ্ধ বিধাতার কোপে
হেন দশা হয়েছে আমার;
রে বিধাতঃ, তাই যদি হয়,
দিই তোরে শাপ বারম্বার।

কিম্বা বুঝি গ্রহপরবশে,
দুরবস্থা এত হল মোর;
তবে বল, বল কিরূপেতে
ঘুচাই এ দুরদৃষ্ট ঘোর?

কেমন সুন্দর পাখা ভরে
উড়ে পাখী গগন মাঝারে;
সুমধুর কূজন ছড়ায়ে,
সকলের প্রাণ লয় হরে।

কেমন সে প্রতিহিংসাক্ষমা
ভুজঙ্গিনী বিচরে মহীতে;
ক্ষুদ্র অনিষ্টেতে প্রতিশোধ
দেয় কত আনন্দিত চিতে।

ব্যাঘ্র সিংহ কথা কি বলিব?
সবে শক্ত আপন রক্ষায়;—
আমিই কি কেবল একাই
ভুলুণ্ঠিত, ঘৃণিত ধরায়?

মানুষের কথা ছেড়ে দাও;
সেত হয় দেবতার প্রায়—
বল বল কার তীব্র দোষে—
এত নীচ আমি এ ধরায়?

কেন মোর জীবনের সাধ?
কেন মোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদে?

দিব প্রাণ দিব বিসর্জ্জন
পড়িব না আর মায়া ফাঁদে।

কীট নাম বিলুপ্ত করিব,—
আলিঙ্গিব মরণে নিশ্চয় ;—
বৃথাই ঘৃণিত বপু ধরে
ধরা ভ্রমা উচিত না হয়।

ভাবি পুনঃ কঠোর সাধনে
মহা ঘোর যোগ তপস্যায়
কীটত্ব কি যাবে না কখন?
দেবত্ব কি হবে না উদয়?

হবে হবে, বলে হৃদিবাণী
ভয় নাই, মাত উৎসাহেতে,
যায় যাক্, থাকে থাক্ প্রাণ,
ঢালি অঙ্গ তপস্যার স্রোতে।

তপস্যায় জগৎ সৃজন,
তপস্যায় ধরা নিয়মিত ;
তপস্যায় ষড়্ঋতু বয়,
তপস্যায় বায়ু প্রবাহিত।

কিম্বা কেন কল্পনার স্রোতে
ভাসিয়া চলেছি আমি হায়?
করিব এখনি তপ ঘোর,
ঘুচাইব অদৃষ্ট বালাই।

যে কোন কারণে এই দশা,
কিবা কায বিচার করিয়া?
বর্ত্তমান উন্নতি সাধনে
সঁপিব এ প্রাণ মন হিয়া!

আছে শক্তি আমার ভিতরে,
অনুভূত হইতেছে হৃদে ;

সর্ব্বশক্তি করি পরাজয়
জয়ী হব; কিবা কায খেদে।

যদি হয় এ ঘোর সংগ্রামে
একান্তই মোর পরাজয়;
বুঝিব এ ধরার মাঝারে
উচ্চ আশা ব্যোমপুষ্প প্রায়।

কিন্তু নাহি কোরে প্রাণপণ
কেন দিই নানাজনে দোষ?
কেন বৃথা বিফল রোদনে
কেন বৃথা কোরে অসন্তোষ?

অথবা সন্দেহ কেন করি,
সন্ধ শোভে অলস জনার;
সক্ষম কি অক্ষম করিতে,
দেখা যাক দশা প্রতীকার।

এত বলি কীট তপস্যামগন,—
অনেক কঠোর সাধনার পরে,
মহাশক্তি আর মহা জ্ঞান লভি,
কীট দেহ ত্যজি নরদেহ ধরে।

হইল পরম উচ্চ সিদ্ধ যোগী—
পরম সন্তোষ উদয় হৃদয়ে—
ধরাবাসী সবে শাপভ্রষ্ট ভ্রমে—
স্তব করে তাঁরে সম্ভ্রমে বিস্ময়ে—

আমরা কি কীট হতে এতই অধম?
হবে না কি শক্তিস্ফূর্ত্তি কখন হৃদয়ে?
ঘৃণিত দলিত হয়ে রব চিরকাল—
মাটীর পুতুল রব মাটীতে মিশায়ে?

———

ঠাকুরদাদার গল্প।

সুখটুকুও আছে আবার রাগটুকুও আছে।

একদা এক দণ্ডী ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া কোন বৃক্ষতলে একখানি ইট মাথায় দিয়া শুইয়াছিলেন। গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা সেই পথ দিয়া জল আনিতে যাইতেছিল। তাহারা দণ্ডীকে এইরূপ ইষ্টক মস্তকে শুইতে দেখিয়া আপনা আপনি বলাবলি করিতে লাগিল, দেখ দিদি, ইনি দণ্ডী হয়েছেন, সংসার ছেড়েচেন, তবু এঁর এখনো সুখটুকু আছে, শুধু মাথায় শুতে পারেন না, আবার ইঁট মাথায় দেওয়া হয়েচে। দণ্ডী সমস্ত শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাইত, আমার এখনো ত সুখবাসনা যায় নাই, আগে না হয় বালিশ মাথায় দিতাম, এখন নয় তাহার পরিবর্ত্তে ইট মাথায় দিয়াছি, একটা কিছু মাথায় দেওয়া চাই। কেন, শুধু মাথায় শুইতে পারিব না কেন? এই বলিয়া তিনি ইট খানি মাথা হইতে সরাইয়া শুধু মাথায় শুইয়া রহিলেন। জলপূর্ণ কলস কক্ষে করিয়া গ্রাম্য নারীগণ আবার সেই পথ দিয়া স্ব স্ব আবাসে ফিরিতেছিল। তাহারা পুনরায় দণ্ডীর কাছ দিয়া যাইতে লাগিল। দণ্ডীকে এবার শুধু মাথায় শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা আবার পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—দিদি, সন্ন্যাসী ঠাকুরের রাগটুকুও আছে। মেয়ে মানুষের দুটো কথা সইতে পার্‌লেন না, অমনি ইটখানা মাথা থেকে নামিয়ে দিয়েছেন। সন্ন্যাসী ভাবিলেন, মজা মন্দ নয়। আর তিনি কখন লোকের কথায় চালিত হইতেন না।

পালঙ্কের গদি।

নলিনী বাবু হালে বড়লোক হইয়াছেন। অনবরত তাওয়া দিয়া গুড়গুড়িতে তামাক চলিতেছে। টানা পাখায় হাওয়া চলিতেছে। চাকর বাকরে কেহ পাদসম্বাহন করিতেছে, কেহ দূরে দাঁড়াইয়া হুকুমের অপেক্ষা করিতেছে। অনেক টাকা খরচ করিয়া অনেক যত্নে একখানি পালঙ্কের গদি তৈয়ার করাইয়াছেন, তাহাতে বাবু শায়িত। হঠাৎ বাবু উঠিয়া ডাকিলেন, ভোজো। ডাকিতে না ডাকিতে ভজহরি যোড়হস্তে হাজির। বাবু বলিলেন, কোচ্‌ম্যানকে গাড়ী তৈয়ার কর্‌তে বল, একটু হাওয়া খেয়ে আসি। বাবু হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কিছু পরে সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠামাখা কাদামাখা ন্যাংটা একটা লোক আসিয়া

হাজির। আসিয়া পাগলের মত বাবুর সেই সখের গদির উপর যাইতে উদ্যত। চাকরদের বাধা প্রদান। পাগল কিছু না মানিয়া গদির উপর শয়ন করিল ও একবার এ পাশ একবার ও পাশ করিতে লাগিল। চাকর বাকর তাহাকে ছুঁইতেও পারে না, গায়ে বিষ্ঠামাখা, অবার একটা কুসংস্কার—বোধ হয় এ পরমহংস, কোন কিছু বলিলে শাপ দিতে পারে, এদিকে বাবুর ভয়ে সন্ত্রস্ত। এদিকে এই গোলমাল, এমন সময় বাবু আসিয়া হাজির। ছিলাম ভরো, বলিতে না বলিতেই ব্যাপার দেখিলেন, চাকর বাকরে যোড় হাত করিয়া বলিতে লাগিল, বাবু আমাদের কোন দোষ নাই। এদিকে পাগলা সটান শুইয়া আছে। বাবুর চাবুক গ্রহণ ও সপাসপ পাগ্‌লার পৃষ্ঠে প্রদান। পাগ্‌লা এ পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল ; যেন কত আরামে আবার ও পাশে ফিরিল। চাবুক চলিতেছে—ক্রমশঃ দর দর ধারে রক্তপ্রবাহ ; পাগ্‌লা অচঞ্চল, স্থির। রক্তে গদি রক্তময় হইতে লাগিল। পাগ্‌লাকে স্থির দেখিয়া তখন বাবুর মনে একটু ভয় হইল—মনে ভাবিলেন, বুঝি, নরহত্যা অপরাধে অপরাধী হইলাম। এই বলিয়া পাগ্‌লার মুখের দিকে দেখিতে গেলেন, দেখেন, পাগ্‌লা ফিক্ ফিক করিয়া হাসিতেছে। তখন বাবুর অমনি পদদ্বয় ধারণ, পাগ্‌লার অমনি উঠিয়া কি কর, কি কর, বলিয়া বাবুর হস্তধারণ। পাগ্‌লা বলিতে লাগিল, এতক্ষণ বেশ চলিতেছিল, এ আবার কি ভাব? নলিনী বাবু কাঁদিয়া বলিলেন, আমি মহাপাপী, কিছু উপদেশ—কে আপনি? পাগ্‌লা বলিতে লাগিলেন—ওসব অতশত জানি না, তবে এইটুকু বোল্‌তে চাই যে, এই পালকের গদি, এতে আমি সুখের জন্য নয়, অমনি খানিকক্ষণ শোবার জন্য এতগুলি চাবুক খেলুম—এর সংস্পর্শের গুণ এই, আর তুমি এত যত্ন কোরে, এত সখ কোরে কোরেছ, এইতে দিন রাত তোমার মন প্রাণ পোড়ে আছে, এর সঙ্গ দিন রাত তোমার। তোমাকে কত চাবুক খেতে হবে, এক একবার ভেবো দেখি। এই বলিয়া উত্থান ও বেগে প্রস্থান। বাবুরও কাপড় ফাড়িয়া কৌপীন ধারণ ও দ্রুতবেগে প্রস্থান।

দশ বৎসর পরে নলিনী বাবুদের বাড়ীর সকলে একবার তীর্থ ভ্রমণ ছলে হরিদ্বারে যান। সেখানে দেখেন, এক মহা তেজঃপুঞ্জকায় পুরুষ একটী নির্জ্জন মঠে ধ্যাননিমগ্ন রহিয়াছেন। বাঙ্গালীর চেহারা। তাঁহারা নলিনী বাবু বলিয়া চিনিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্রসর হইতে ভরসা করেন নাই। তিনিও কোন কথা বলেন নাই।

যাত্রা বেশ হচ্চে, কিন্তু পথে বড় গোল।

হরিবিলাস বাবু বামুন আড়া গ্রামের জমিদার। বাবুর যাত্রা শুন্‌বার বড় সখ—স্বর্ণলতায় বিধুভূষণের মত। কিন্তু বাবু বড় ধার্ম্মিক, সন্ধ্যা থেকে ২। ৩ ঘণ্টা জপ পূজা আহ্নিক করা আছে। তার পর বয়সও অনেক হইয়াছে। কিছু আহার অবশ্যই করিতে হয়। এইরূপ জমিদারীরও কিছু কিছু কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় বাবুর যাত্রা শুনিতে যাইবার একটু বিলম্ব হইয়াছে, রাত ১২টা। রাতদশটার সময় সাংতা গ্রামে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, গোবিন্দ অধিকারীর দল। তাঁহার গ্রাম হইতে ১॥০ মাইলটাক দূর। বাবু বাহির হইলেন, চাকর লণ্ঠন লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বাবুর পাল্‌কী আছে বটে, কিন্তু ১০। ১২ ক্রোশ যাইতে না হইলে পাল্‌কীর ব্যবহার হয় না। আর আজ চাঁদনীরাত, পথটীও ভাল। সোজা পথ। বাবু চলিতেছেন। হাতে মালা আছে, জপও চলিতেছে। অর্দ্ধেক পথ গিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি লোক ফিরিয়া আসিতেছে, দাঁড়াইয়া প্রীতিসম্ভাষণ হইল। পরিচিত বৃদ্ধ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন হচ্চে দাদা? তিনি বলিলেন, দাদা, যাত্রা বেশ হচ্চে, কিন্তু পথে বড় গোল। ঘুমকাতরেরা যাত্রার মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেল। বাবুও থমকিয়া দাঁড়াইলেন। চাকর বলিল, বাবু দাঁড়ালেন যে! বাবু বলিলেন, হুঁ, যাত্রা বেশ হচ্চে, কিন্তু পথে বড় গোল। চাকর ভাবিল, বাবুর ভিড় বশতঃ যাত্রা শুনিবার আর ইচ্ছা নাই। কিন্তু বাবু ত হাজার ভিড় হইলেও যাত্রা শুনিতে কখন নারাজ নন। চাকর একটু বিস্মিত হইল। চাকর জিজ্ঞাসিল, তবে ফিরিবেন কি? বাবু বলিলেন, হুঁ, যাত্রা বেশ হচ্চে, কিন্তু পথে বড় গোল। চাকর লণ্ঠন লইয়া ফিরিল। পথে অনেকের সঙ্গে দেখা হইল, সকলেই ইহাঁকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে সকলকেই এক কথা, যাত্রা বেশ হচ্চে, কিন্তু পথে বড় গোল। সকলেই একটু বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহাদের যাত্রা শুনিবার সখ এত প্রবল হইয়াছিল যে, আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, সকলে চলিয়া গেল।

বাড়ী গিয়া ছেলে পুলে সকলকে ডাকান হইল। সরকারকে ডাকান হইল। জিজ্ঞাসা করিলে সেই এক কথা। বিষয় ভাগ হইল। প্রাতে এক বস্ত্রে নিরুদ্দেশ।

আমরাও সকলে যাত্রা শুনিতে মত্ত, পথের গোলের কথা কেহ ভাবি কি?

নাস্তিক ও আস্তিক বন্ধুদ্বয়।

রামধন ও হরিধনে ভারি বন্ধুত্ব। এক সঙ্গে শয়ন, এক সঙ্গে ভোজন, এক সঙ্গে কথোপকথন, আলাপ; যে কোন স্থানে যান, কখন দুজনে ছাড়া-

ছাড়ি হয় না। তবে ঠিক সন্ধ্যার সময় ঘণ্টা খানেকের জন্য রামধনকে কেহ দেখিতে পায় না। হরিধনের ক্রমশঃ কৌতূহল হইল—কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সে সন্ধানে সন্ধানে বেড়াইতে লাগিল, জানিবে, রামধন কি করিতেছে। একদিন রামধন ধরা পড়িল। হরিধন দেখিল, রামধন চক্ষু মুদিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেছে। হরিধন হাঁসিয়াই খুন। একেবারে রামধনের গায়ে পড়িয়া গিয়া বলিল, কি হে, ভারি ধার্ম্মিক হোয়েছ যে দেখ্‌চি! ও সব ঈশ্বর টীশ্বর কিছু আছে না কি? রামধন বন্ধুকে আদর করিয়া বসাইয়া বলিল, ভায়া, যদি কিছু নাই থাকে, তাতে ক্ষতি কি? একঘণ্টা সময় না হয় বাজে গেল, ২৩ ঘণ্টা ত আমোদ করিলাম—আর, যদি কিছু থাকে? হরিধন মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, তাই ত, তা হলে ত আমি একেবারে গেলাম! হরিধনের মুখে ক্ষণিক একটু বিষাদের ছায়া আসিয়া আবার পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল। রামধনেরও মনে একটা খট্‌কা উঠিল; এখনও আমি 'যদি'র ভিতর রহিয়াছি। বন্ধুকে ত ঈশ্বর মানাইতে পারিলাম না। কিসে মানান যায়—যুক্তি তর্কে ত পারা যাইবে না। এই মনে করিয়া সে গোপনে গোপনে সদ্‌গুরু অন্বেষণ করিতে লাগিল। শুনিয়াছি, শেষে উভয়েই সদ্‌গুরু পাইয়া কঠোর সাধনায় ঈশ্বরসাক্ষাৎকার পাইয়াছিল।

সমালোচনা।

পালিভাষার উৎপত্তি ও উন্নতি; পালি ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং পালি ও সংস্কৃতভাষার পরস্পর সম্বন্ধ। (বাবু চারুচন্দ্র বসু প্রণীত; মহা-বোধি পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।) এই তিন খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ইংরাজী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকার নানা প্রমাণ সহকারে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, পালিভাষা প্রথমে মগধে উৎপন্ন হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি-সহকারে ক্রমশঃ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে উহা বিস্তৃত হয়। অশোকের রাজত্বকালে তাঁহার পুত্র যুবরাজ মাহিন্দ সিংহলে পালিভাষার বিস্তার করেন, তথা হইতে ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশে গমন করে। অন্যান্য বৌদ্ধপ্রচারকগণ ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমুদয় এসিয়াতে এই ভাষার প্রচার করেন। কাচ্চায়ন ও অন্যান্য বৌদ্ধগণ প্রণীত ব্যাকরণের অস্তিত্ব দ্বারা গ্রন্থকার বলিতে চান, পালি একটী অসংযত ভাষা নহে; এমন কি, পালিভাষা ও সংস্কৃত ভাষা উভয়ই কোন প্রাচীন অজানিত ভাষা হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। যাহা হউক, প্রধান প্রধান বৌদ্ধগ্রন্থ পালিভাষায় লিখিত বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে এবং ভারতের একটী শ্রেষ্ঠতম যুগের আচার ব্যবহার সামাজিক জীবনসম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করিতে হইলে পালিভাষার চর্চ্চা বিশেষ আবশ্যক। আমরা ইংরাজী অনুবাদের মায়া কাটাইয়া যদি মূল পালিভাষার চর্চ্চায় মনোযোগ দিই, তবে যে আমরা ভারতেতিহাসের ও ভারতীয় ধর্ম্মের অনেক নূতন নূতন ও গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হইতেছে যে, অচ্ (স্বরবর্ণ) পরে থাকিলে, বেদে "আঙোঽনুনাসিকশ্ছন্দসি ৬।১।১২৬।" (আঙ্ উপসর্গের পরে স্বরবর্ণ থাকিলে, অনুনাসিক হয় এবং তাহার প্রকৃতি ভাব হয় অর্থাৎ সন্ধি হয় না, বেদে) এই সূত্রানুসারে, প্রসঙ্গক্রমে বেদে অনুনাসিকই সাধু হইবে।

তুল্যাস্যপ্রয়ত্নং সবর্ণম্।

তুল্যাস্যপ্রয়ত্নং।১। সবর্ণম্।১।

সূত্রানুবাদ।—তালু প্রভৃতি স্থান এবং আভ্যন্তর প্রযত্ন, ইহারা দুইটীই, যে যাহার সহিত তুল্য, তাহারা (তালু প্রভৃতি স্থান এবং আভ্যন্তরপ্রযত্নবিশিষ্ট বর্ণ সমূহ) পরস্পর সবর্ণ-সংজ্ঞা-বিশিষ্ট হয়।

ভাষ্যমূলম্।—তুলয়া সম্মিতং তুল্যম্। আস্যং চ প্রয়ত্নশ্চ আস্যপ্রয়ত্নম্। তুল্যাস্যং চ তুল্যপ্রয়ত্নঞ্চ সবর্ণসংজ্ঞং ভবতি।

কিং পুনরাস্যম্।

লৌকিকমাস্যম্। ওষ্ঠাৎ প্রভৃতি প্রাক্কাকলকাৎ।

কথং পুনরাস্যম্।

অস্যন্ত্যনেন বর্ণানীতি আস্যম্।

অন্নমেতদাস্যন্দত ইতি বা আস্যম্।

অথ কঃ প্রয়ত্নঃ।

প্রয়তনং প্রযত্নঃ প্র পূর্ব্বাৎ যততের্ভাবসাধনো নঙ্ প্রত্যয়ঃ।

যদি লৌকিকমাস্যম্। কিমাস্যোপাদানে প্রয়োজনম্। সর্ব্বেষাং হি তত্তুল্যম্।

বক্ষ্যত্যেতৎ। প্রয়ত্নবিশেষণমাস্যোপাদানমিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তুলা (তুলনামক পরিমাণযন্ত্র) দ্বারা সম্যক্‌প্রকারে পরিমাণ করা যায় যাহা, তাহার নাম তুল্য। আস্য এবং প্রযত্ন আস্যপ্রযত্ন। তুল্য আস্য এবং তুল্য প্রযত্ন বিশিষ্ট বর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞা হয়।

আস্য জিনিসটী পুনঃ কিরূপ?

আস্য বলিতে লোকসমাজে যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহারই নাম 'আস্য'; অর্থাৎ ওষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কাকলকের (১) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

(১) আমাদের গ্রীবার মধ্যে যে উন্নত স্থান আছে, তাহার নাম 'কাকলক।'

'আস্য' এই শব্দটী কিরূপে নিষ্পন্ন হইল? অর্থাৎ ওষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কাকলকের পূর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত যে মুখ, তাহার 'আস্য' সংজ্ঞা কিরূপে সিদ্ধ হইল?

অস্যন্তি (বহির্নির্গচ্ছন্তি) অর্থাৎ বহির্গত হয় বর্ণ সমূহ ইহা (এইস্থানে) দ্বারা, এই জন্য ইহার নাম 'আস্য'।

অথবা অন্ন সমূহ 'আস্যন্দতে' (দ্রবীকরোতি) অর্থাৎ দ্রবীভূত হয় এখানে নিক্ষেপ করিলে, এই জন্য ইহার নাম 'আস্য'।

আস্য যেন সিদ্ধ হইল, অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, 'প্রযত্ন' জিনিসটী কি?

প্র (প্রকৃষ্টরূপে) যতন, প্রযত্ন; 'প্র' পূর্ব্বক 'যত' ধাতু ভাববাচ্যে 'নঙ্' প্রত্যয়।

যদি লোকপ্রসিদ্ধ আস্য শব্দই এই স্থলে গৃহীত হইয়া থাকে, তবে আবার (স্বতঃসিদ্ধ) আস্য শব্দ শাস্ত্রে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? সকলেরই ত তাহা একরূপ?

প্রযত্নের বিশেষণ করিবার জন্যই সূত্রে 'আস্য' শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন; এই কথা পরে বলা হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সবর্ণ সংজ্ঞায়াং ভিন্নদেশেষতিপ্রসঙ্গঃ প্রযত্নসামান্যাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—সবর্ণ সংজ্ঞাতে ভিন্ন দেশে (ভিন্ন ভিন্ন স্থানে) উৎপন্ন যে বর্ণ, তাহাদেরও প্রযত্ন সমান বলিয়া অতিপ্রসঙ্গ (১) হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—সবর্ণ সংজ্ঞায়াং ভিন্নদেশেষতিপ্রসঙ্গোভবতি। জবগডদশাম্।

কিং কারণম্।

প্রযত্নসামান্যাৎ। এতেষাং হি সমানঃ প্রযত্নঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—সবর্ণ সংজ্ঞা করিলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উৎপন্ন যে বর্ণ, তাহার অতিপ্রসঙ্গ হইবে। যেমন,—জ, ব, গ, ড, দ, ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ তালু, ওষ্ঠ, প্রভৃতি স্থান হইতে উৎপন্ন যে বর্ণ, ইহারাও পরস্পর সবর্ণ হইবে:

কারণ কি?

প্রযত্ন সমান বলিয়া। এই সকল (জ, ব, গ, ড, দ) বর্ণের প্রযত্ন সমান (একই)।

---

(১) প্রসঙ্গকে অতিক্রম করিয়া অন্য বিষয়কে বুঝাইলে, তাহাকে 'অতিপ্রসঙ্গ' বা 'অতিব্যাপ্তি' বলে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধং ত্বাস্যে তুল্যদেশপ্রযত্নং সবর্ণম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—আস্যে (মুখে) যাহাদের তুল্য স্থান এবং প্রযত্ন, তাহার সবর্ণসংজ্ঞা সিদ্ধই হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ।

কথম্।

আস্যে যেষাং তুল্যোদেশঃ প্রযত্নশ্চ তে সবর্ণসংজ্ঞা ভবন্তীতি বক্তব্যম্।

এবমপি কিমাস্যোপাদানে প্রয়োজনং সর্ব্বেষাং হি তত্তুল্যম্।

প্রযত্নবিশেষণমাস্যোপাদানম্। সন্তি হ্যাস্যাদ্বাহ্যাঃ প্রযত্নাঃ তে হাপিতা ভবন্তি। তেষু সৎস্বসৎস্বপি সবর্ণসংজ্ঞা ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

আস্যে (মুখাভ্যন্তরে) যাহাদের তুল্য স্থান এবং তুল্য প্রযত্ন, তাহাদের সবর্ণ সংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলিতে হইবে।

এইরূপ হইলেও পুনঃ (সূত্রে) আস্য শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন কি? কারণ তাহা ত সকলেরই তুল্য?

প্রযত্নের বিশেষণ হওয়ার জন্য 'আস্য' শব্দ (সূত্রে) উল্লেখ করা হইয়াছে। মুখের বাহিরে কতকগুলি প্রযত্ন রহিয়াছে; 'আস্য' শব্দ গ্রহণে তাহারা বিনষ্ট হইবে, অর্থাৎ সবর্ণ সংজ্ঞাতে তাহারা গৃহীত হইবে না।* তাহারা (বাহ্যপ্রযত্ন সমূহ) তুল্য হইলেও হইবে; না হইলেও (সবর্ণ সংজ্ঞা) হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—কে পুনস্তে।

বিবারসংবারৌ। শ্বাসনাদৌ। ঘোষবদঘোষবত্তা। অল্পপ্রাণতা মহাপ্রাণতেতি॥ তত্র বর্গানাং প্রথমদ্বিতীয়া বিবৃতকণ্ঠাঃ। শ্বাসানুপ্রদানা অঘোষাশ্চ। একেঽল্পপ্রাণা ইতরে মহাপ্রাণাঃ। তৃতীয় চতুর্থাঃ সংবৃতকণ্ঠা নাদানুপ্রদানা ঘোষবন্তঃ। একেঽল্পপ্রাণা অপরে মহাপ্রাণাঃ। যথা তৃতীয়াস্তথা পঞ্চমা আনুনাসিক্যবর্জম্। আনুনাসিক্যমেষামধিকোগুণঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—তাহারা কি কি?

বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ; ঘোষবত্তা, অঘোষবত্তা; অল্পপ্রাণতা, মহাপ্রাণতা ইত্যাদি।

তন্মধ্যে বর্গের যে প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ণ, বিবৃতকণ্ঠ, শ্বাসানুপ্রদান এবং অঘোষপ্রযত্নবিশিষ্ট, তাহাদের মধ্যে একটী অর্থাৎ প্রথম বর্ণ অল্পপ্রাণ-

বিশিষ্ট, তদ্ভিন্ন অন্যান্য বর্ণ মহাপ্রাণবিশিষ্ট॥ তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণ সংবৃত, কণ্ঠ, নাদানুপ্রদান এবং ঘোষবান্; তাহার মধ্যে একটী অর্থাৎ বর্গের তৃতীয় বর্ণ অল্পপ্রাণবিশিষ্ট। অন্য বর্ণ মহাপ্রাণবিশিষ্ট। তৃতীয় বর্ণের যেরূপ প্রযত্ন, পঞ্চম বর্ণেরও সেইরূপ প্রযত্ন, অনুনাসিক ধর্ম্ম ব্যতিরেকে অর্থাৎ পঞ্চম বর্ণে তৃতীয় বর্ণ অপেক্ষা অনুনাসিক ধর্ম্মমাত্র অধিক।

ভাষ্যমূলম্।—এবমপ্যবর্ণস্য সবর্ণসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি। বাহ্যং হ্যাস্যাঃ স্থানমবর্ণস্য।

সর্ব্বমুখস্থানমবর্ণস্য একে ইচ্ছন্তি। এবমপি ব্যপদেশো ন প্রকল্পতে। আস্যে যেষাং তুল্যোদেশ ইতি। ব্যপদেশিবদ্ভাবেন ব্যপদেশো ভবিষ্যতি। সিদ্ধ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এরূপ হইলেও অবর্ণের (অকারে আকারে) সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে না; কারণ অ বর্ণের স্থান মুখের বাহিরে।

(এই স্থলেও কোন দোষ হইবে না); যেহেতু, এক সম্প্রদায়ের জনগণ, মুখই অ বর্ণের অবস্থান-স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এইরূপ হইলেও (মুখ অ বর্ণের স্থান হইলেও) ব্যপদেশ [মুখ্য স্থানে মুখ্য ব্যবহার] প্রকল্পিত হইবে না। আস্যে (মুখের অভ্যন্তরে কোনও এক স্থানে) যে সকল বর্ণের তুল্য স্থান, তাহাদের সবর্ণসংজ্ঞা হইয়া থাকে; সুতরাং মুখের একদেশ হইতে উচ্চারিত বর্ণের সবর্ণসংজ্ঞাই যখন মুখ্য; তখন 'অ' বর্ণ মুখের একদেশে উচ্চারিত না হইয়া সর্ব্বমুখব্যাপী হইলে, কিরূপে সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে?

ব্যপদেশিবদ্ভাব (ভিন্ন দেশের ন্যায় ভাব অর্থাৎ অমুখ্য স্থলেও মুখ্য ব্যবহার) হইয়া থাকে বলিয়া এই স্থলেও (অবর্ণের, মুখের একদেশে) মুখ্য ব্যবহার হইয়া, কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূলম্ —সূত্রং তর্হি ভিদ্যতে।

যথান্যাসমেবাস্তু।

নমু চোক্তং সবর্ণসংজ্ঞায়াং ভিন্নদেশেম্বতিপ্রসঙ্গঃ প্রযত্নসামান্যাদিতি।

নৈষদোষঃ। ন হি লৌকিকমাস্যম্।

কিং তর্হি।

তদ্ধিতান্তমাস্যং আস্যে ভবমাস্যম্। শরীরাবয়বাদ্যৎ।

কিং পুনরাস্যে ভবম্।

স্থানং করণং চ।

এবমপি প্রযত্নোঽবিশেষিতো ভবতি।

প্রযত্নশ্চ বিশেষিতঃ। কথম্।

ন হি প্রয়তনং প্রযত্নঃ। কিং তর্হি।

প্রারম্ভো যত্নস্য প্রযত্নঃ।

যদি প্রারম্ভোযত্নস্য প্রযত্নঃ। এবমপ্যবর্ণস্য এঙোশ্চ সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তাহা হইলে (প্রকারান্তরে সিদ্ধ করিলে) সূত্র ত ভিন্ন হইবে?

আচ্ছা, তবে সূত্র যেরূপ আছে, সেরূপই হউক? যদি বল যে, সবর্ণ সংজ্ঞায় (মুখের) ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অতিপ্রসঙ্গ হইবে, যেহেতু প্রযত্ন পরস্পর সমান?

এইস্থলে কোন দোষ হইবে না। কারণ, লোকে আস্য বলিতে যাহা ব্যবহার হয়, এই স্থলে তাহা গ্রহণ করা হইবে না।

তবে কি হইবে?

তদ্ধিতপ্রত্যয়নিষ্পন্ন আস্য শব্দ, এখানে গ্রহণ করা হইবে। আস্যে (মুখে) উৎপন্ন যে সকল বর্ণ, তাহারই নাম আস্য। আস্য শব্দ শরীরের অবয়বকে বুঝায় বলিয়া শরীরাবয়বাদ্ যৎ ৫।১।৬। (শরীরের অবয়ববাচক শব্দের উত্তর 'যৎ' প্রত্যয় হয়) 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, আস্যে কি উৎপন্ন হয়?

স্থান এবং করণ (উচ্চারণসহায়ক প্রযত্নাদি।)

এইরূপ হইলেও প্রযত্নকে বিশেষ করিবে না, অর্থাৎ আস্য শব্দ এইরূপ তদ্ধিতপ্রত্যয়বিশিষ্ট হইলেও তাহাতে 'প্রযত্ন' শব্দ গৃহীত হইবে না; তাহা অনুল্লিখিতই থাকিবে।

প্রযত্নও বিশেষিত (বিশেষত্ব প্রযুক্ত গৃহীত) হইবে।

কিরূপে?

কারণ, প্র (প্রকৃষ্টরূপে) যত্নের নাম যে প্রযত্ন, তাহা নহে।

তবে কি?

প্রারম্ভ যত্নের নাম প্রযত্ন।

যদি প্রারম্ভ যত্নের নামই প্রযত্ন হয়; তবে এইরূপ হইলেও ত অবর্ণের এবং এঙ্ (এও) এর পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে?

ভাষ্যমূলম্।—প্রশ্লিষ্টবর্ণাবেতৌ। অবর্ণস্য তর্হ্যেচোশ্চ সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি বিবৃততরাবর্ণাবেতৌ। এতয়োরেব তর্হি মিথঃ সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি।

নৈতৌ তুল্যস্থানৌ।

উদাত্তাদীনাং তর্হি সবর্ণসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি। অভেদকা উদাত্তাদয়ঃ।

অথবা কিং ন এতেন প্রারম্ভোযত্নস্ত প্রযত্ন ইতি। প্রযতনমেব প্রয়ত্নঃ তদেব চ তদ্ভিতাস্তমাস্তম্। যৎসমানং তদাশ্রয়িষ্যামঃ।

কিং সতি ভেদে, সতীত্যাহ। সত্যেব হি ভেদে সবর্ণসংজ্ঞয়া ভবিতব্যম্।

কুত এতৎ।

ভেদাধিষ্ঠানাহি সবর্ণসংজ্ঞা। যদি হি যত্র সর্ব্বং সমানং তত্র স্যাৎ সবর্ণ-সংজ্ঞাবচনমনর্থকং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—তাহা ('অ'বর্ণে এবং একার ওকারে পরস্পর সবর্ণ) হইবে না। কারণ, ইহারা উভয়েই প্রশ্লিষ্ট (একত্র মিলিত) বর্ণ। (১)

আচ্ছা, তবে 'অ'বর্ণ এবং ঐকার ঔকারের সহিত পরস্পর (২) সবর্ণসংজ্ঞা হইবে?

তাহাও হইবে না। কারণ, এই (ঐ, ঔ) বর্ণদ্বয় বিবৃততর প্রযত্নবিশিষ্ট। অর্থাৎ অবর্ণের কেবল বিবৃতপ্রযত্ন, এবং ঐকার ঔকারের বিবৃততর প্রযত্ন বলিয়া, প্রযত্নভেদ হওয়াতে, ইহারা পরস্পর সবর্ণ হইতে পারিবে না।

আচ্ছা তবে, এই (ঐ এবং ঔ) বর্ণদ্বয়ের পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্তি হউক?

তাহাও হইবে না। কারণ, ইহাদের (ঐকারের এবং ঔকারের) স্থানই সমান নহে।

(যদি এইরূপই হয়) তবে, উদাত্ত প্রভৃতি অর্থাৎ উদাত্ত অ, অনুদাত্ত অও এবং স্বরিত অও পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা হইতে পারিবে না।

তাহাতেও কোন দোষ হইবে না। কারণ, উদাত্তানুদাত্তাদিও পরস্পর অভেদবাচক। (ভেদবাচক নহে)।

---

(১) যেমন কর্দ্দমাক্ত জল মাটীর সহিত অত্যন্ত প্রশ্লিষ্ট বলিয়া কোন্ অংশ জল কোন্ অংশ মাটী, তাহা পৃথক্ করা যায় না; সেরূপ অকারে, ইকার বা উকারের অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট (মিলিত) থাকাতেও চিনিবার যো থাকে না বলিয়া 'এ'কার বা 'ও'কারের সহিত যে অকার মিলিত আছে, তাহাও জানা যায় না। এজন্যই 'অ'বর্ণের সহিত 'এ'কার 'ও'কার সবর্ণও হইবে না।

(২) ঐ এবং ঔ বলিলে তৎপূর্ব্বভাগে অকার স্পষ্ট প্রতীতি হয় বলিয়া (অ+ই=ঐ, অ+উ=ঔ) পুনঃ এইরূপ শঙ্কা করা হইয়াছে।

অথবা "প্রারম্ভ হইয়াছে যে যত্ন, তাহার নাম প্রযত্ন," এইরূপ অর্থ করিবার আমাদের প্রয়োজন কি?

প্রযতন অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যত্নের নামই প্রযত্ন; আর সেই তদ্ধিতপ্রত্যয় নিষ্পন্নই "আস্য" শব্দ। সুতরাং যে বর্ণ যে বর্ণের সমান, তাহাকেই আশ্রয় করিবে।

কি, ভেদ (বাহ্য প্রযত্ন সকল ভিন্ন) হইলেও সবর্ণসংজ্ঞা হইবে?

হাঁ, তাহাই হইবে। যেহেতু বর্ণসমূহ পরস্পর (কোনও ধর্ম্মপ্রযুক্ত) ভিন্ন হইলেও, পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা হইতে পারে।

কেন এইরূপ হইবে?

ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণসমূহ অবস্থিত হইলেই সবর্ণসংজ্ঞা হইয়া থাকে। নতুবা যে সকল বর্ণের সকল ধর্ম্মই সমান, তাহারাই যদি পরস্পর সবর্ণ হয়; তাহা হইলে সবর্ণ সংজ্ঞার জন্য পৃথক্ সূত্র করাই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। (অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে যাহা ছিল না, পরে তাহা বিধান করিবার জন্যই সূত্রের প্রয়োজন।)

ভাষ্যমূলম্।—যদি তর্হি সতি ভেদে কিংচিৎ সমানমিতি কৃত্বা সবর্ণসংজ্ঞা ভবিষ্যতি। অকারহকারয়োঃ যকারঠকারয়োঃ সকারথকারয়োঃ সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। এতেষাং হি সর্ব্বমন্যৎ সমানং করণবর্জ্জম্।

এবং তর্হি প্রয়তনমেব প্রযত্নঃ তদেব হি তদ্ধিতান্তমাস্যম্, ন স্বরং দ্বন্দ্বঃ, আস্যং চ প্রযত্নশ্চ আস্যপ্রযত্নমিতি। কিং তর্হি? ত্রিপদোয়ং বহুব্রীহিঃ; তুল্য আস্যে প্রযত্ন এষামিতি।

অথবা পূর্ব্বস্তৎপুরুষস্ততো বহুব্রীহিঃ। তুল্য আস্যে তুল্যাস্যস্তুল্যাস্যঃ প্রযত্ন এষামিতি।

অথবা পরস্তৎপুরুষস্ততো বহুব্রীহিঃ। আস্যে প্রযত্নঃ আস্যপ্রযত্নঃ। তুল্য আস্যপ্রযত্ন এষামিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে যদি বর্ণসমূহ পরস্পর ভেদ সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, এই করিয়া সবর্ণসংজ্ঞা হয়; তবে অকারের সহিত হকারের, যকারের সহিত ঠকারের, সকারের সহিত থকারের সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে। কারণ, ইহাদের আর সমস্ত ধর্ম্মই (স্থান প্রভৃতি) সমান; কেবল করণ অর্থাৎ প্রযত্ন সমান নহে।

এইরূপ দোষ হইলে, তবে প্রযতন (প্রকৃষ্ট যত্ন) ই প্রযত্ন; আর সেই

তদ্ধিতপ্রত্যয়নিষ্পন্ন 'আস্য' শব্দ। কিন্তু ইহা আস্য এবং প্রযত্ন=আস্য-প্রযত্ন এইরূপ দ্বন্দ্বসমাসনিষ্পন্ন নহে।

তবে কি ?

ইহা ত্রিপদ বহুব্রীহি। যেমন ;—তুল্য হইয়াছে আস্যে (মুখে) প্রযত্ন ইহাদের, এইরূপ বিগ্রহ করিব। তাহা হইলেই কোন দোষও হইবে না।

অথবা পূর্ব্বভাগে তৎপুরুষ সমাস করিব, পরে বহুব্রীহি সমাস করিব। যেমন ; তুল্য আস্যে (আস্যে তুল্য ৭মী তৎপুরুষ) তুল্যাস্যঃ ; তুল্যাস্য-প্রযত্ন হইয়াছে ইহাদের (বহুব্রীহি) সে তুল্যাস্যপ্রযত্ন।

অথবা পরাংশে তৎপুরুষ এবং তদনন্তর পূর্ব্বাংশে বহুব্রীহি সমাস করিব। যেমন ; আস্যে প্রযত্ন (৭মী তৎ) আস্যপ্রযত্ন ; তুল্য হইয়াছে আস্যে প্রযত্ন ইহাদের, এইরূপ বিগ্রহবাক্য করিয়া "তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্" এই সূত্র নিষ্পন্ন হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—তস্য। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্ সূত্রে, তস্য (তাহার) এই শব্দ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। *

ভাষ্যমূলম্।—তস্যেতি তু বক্তব্যম্। কিং প্রয়োজনম্। যো যস্য তুল্যাস্য-প্রযত্নঃ স তস্য সবর্ণসংজ্ঞো যথা স্যাৎ। অন্যস্য তুল্যাস্যপ্রযত্নোঽন্যস্য সবর্ণ-সংজ্ঞো মাভূৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—তস্য (তাহার) এইরূপ বাক্য বলা উচিত।

তাহার প্রয়োজন কি ?

যে যাহার তুল্য আস্য এবং প্রযত্ন, সে তাহারই যাহাতে সবর্ণ সংজ্ঞা হয় ; অন্য এক বর্ণের সহিত তুল্য আস্য এবং প্রযত্ন, সে সেই বর্ণের সবর্ণ না হইয়া, অন্য বর্ণের সবর্ণ যাহাতে প্রাপ্তি না হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—তস্যাবচনং বচনপ্রামাণ্যাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—বচনের প্রামাণ্য অর্থাৎ এই সূত্রের আরম্ভ হেতুই তস্য (তাহার)—এইরূপ বাক্য (সংযোগ) করিবার প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূলম্।—তস্যেতি ন বক্তব্যম্। অন্যস্য তুল্যাস্যপ্রযত্নো ঽন্যস্য সবর্ণসংজ্ঞঃ কস্মান্ন ভবতি। বচনপ্রামাণ্যাৎ। সবর্ণসংজ্ঞাবচনসামর্থ্যাৎ। যদি হি অন্যস্য তুল্যাস্যপ্রযত্নোঽন্যস্য সবর্ণসংজ্ঞঃ স্যাৎ। সবর্ণসংজ্ঞাবচনমনর্থকং স্যাৎ।

রামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। তবে অনেকদিন হইতে তাঁহার জীবনী ও উপদেশ শুনিয়া ও পড়িয়া আসিতেছি। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার অনেক ভক্তের সহিত সাক্ষাৎকারলাভ ঘটিয়াছে। তাঁহার ভক্তদের মধ্যে অনেকে এবং যাঁহারা ইহাঁদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, এরূপ অনেকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করিয়া থাকেন। আমি অবতারবাদ ভালরূপ বুঝি না। তবে পল্লবগ্রাহী হইয়া সকল শাস্ত্রের সাধুভক্ত, ঋষি, মহাপুরুষ, অবতার সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছি এবং নিজে কিছু কিছু ঘুরিয়া নানা স্থানের সাধু মহাপুরুষ দর্শন করিয়া ও অপর ভ্রমণকারিগণ মুখে সাধুদের বৃত্তান্ত শুনিয়া বর্ত্তমান সাধুগণের জীবন যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার মনে এই ধারণা দিন দিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত লোক এ পর্য্যন্ত কেহ জন্মেন নাই। মনে হয়, তিনি যেন প্রাচীন সমুদয় মহাপুরুষগণের সমষ্টি এবং তাহা হইতেও অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। আমি তাঁহার সম্বন্ধে দু একথা লিখিতেছি, ইহাতে তাঁহার কোন মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হইবে না জানি, কিন্তু তাঁহার সহিত চাক্ষুষ না হইলেও তাঁহার শক্তিতে মহান্ উপকার পাইয়াছি ও পাইতেছি। সুতরাং তাঁহার বিষয়ে দু এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মহাপুরুষেরা সকল সময়েই নিজ নিজ সময়ের আদর্শ হইতে অনেক উচ্চতর আদর্শ দেখাইয়া যান। খুব অল্প লোকই তাঁহাদিগকে বুঝিতে পারে। আজ যে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে, ইহা সমাজের পক্ষে অতি শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। এমন উদার বিশ্বজনীনভাব, এমন দৃঢ়নিষ্ঠা, এমন অদ্ভুত ত্যাগ, এমন গভীর ভাবসমাধি, এমন ভক্তি, এমন জ্ঞান, এমন জীবহিতনিষ্ঠা, এমন সরল ভাষায় গভীর তত্ত্বের উপদেশ লোকে দেখে ত নাইই, শুনেও নাই। অবতারবাদ না বুঝিতে পারি, কিন্তু নিজের কল্পিত একটা ঈশ্বরের উপাসনার চেয়ে ইহাঁর উপাসনা করিলে যে বেশী উপকার পাওয়া যায়, তাহা বুঝিতে পারি। সরল প্রাণে যে তাঁহার নিকট গিয়াছে, সেই, সেই জীবনের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে নাই আর বাস্তবিক যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সরল প্রাণে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছে, সেও সেই শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইবেই হইবে বলিয়া আমার ধারণা।

এমন বিশ্বব্যাপী উদারতা কি কেহ কখন দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন? সকল ধর্ম্মই সত্য, তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি বলিতেন, যে যে বিশ্বাসে আছ, তাহাই দৃঢ় করিয়া ধরিয়া থাক। শেষে যদি কিছু তোমার ভুল থাকে, সব ঘুচিয়া গিয়া সত্যই পাইবে। এটা ভ্রান্ত মত, ওটা ঠিক—এই সব কথা বলিয়া আস্ফালনকারী জনগণের নিকট তাঁহার শক্তি এই ঘোষণা করিতেছে, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সৃষ্ট সবই সত্য—তাহার ভিতর যাহা মায়িক অংশ আছে, তাহা আত্মার উন্নতি হইলে আপনিই চলিয়া যাইবে। আর তুমি সত্য পাইয়াছ, অপরে মিথ্যা লইয়া আছে, কি করিয়া জানিলে? যদি সত্যকে যথার্থ পাইয়া থাক, তবে তোমার উপস্থিতিতেই সব অজ্ঞান ধ্বংস হইবে। তুমি গঠন কর, ধ্বংস করিতে বৃথা শক্তিক্ষয় করিও না।

তাঁহার ত্যাগ আমাদের নিকট বলিতেছে, আসক্তিরূপ অন্যায় বন্ধনকে কেন ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছ? কেন কপটতার জাল বিস্তার করিতেছ? তোমার সম্বন্ধ কেবল অনন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে, কেন নারীর সহিত অন্যায় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সংসারের বীজ রোপণ করিয়া পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, মাসী খুড়ী প্রভৃতি সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছ? প্রবুদ্ধ হও; দেখ, তোমার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধই কেবল নিত্য। তবে ইহা একেবারে বুঝিতে না পার, অজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে যদি তোমার এতই ভাল লাগে, তবে উহাকে অজ্ঞান বলিয়াই জানিয়া রাখ—একদিন জ্ঞানের আশা আছে। আপন দুর্ব্বলতা স্বীকার কর। সংসারে যদি থাকিতেই চাও, তবে উহাকে ঈশ্বরের সংসার করিয়া লও। একদিন বন্ধন আপনিই খসিয়া যাইবে।

তিনি যেন বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য ছাড়িয়া গিয়া গভীর ধ্যানসমাধির রাজ্যে চলিয়া যাও। সেই খানেই পরম আনন্দ। এখানে যেমন সুখ, তেমনি তাহার প্রতিক্রিয়া দুঃখ। 'এ যেন আমড়ার অম্বল খাওয়া। শাঁস নেই, কেবল আঁটি আর চামড়া; খেলে অম্বলশূল হয়। তেতলার গদির উপর আসিয়া শয়ন কর, আর নীচের অন্ধকার কুটুরীতে থাক্‌তে ভাল লাগ্‌বে না।'

তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগের কথা সকলেই শুনিয়াছেন। অনেকে আছেন, তাঁহারা মুখে অনেক ত্যাগের কথা বলেন, কিন্তু কার্য্যকালে সাধারণ সংসারী ব্যক্তির সহিত তাঁহাদের কোন পার্থক্য উপলব্ধি হয় না। ইনি কিন্তু যাহা বলিতেন, তাহা কাযে করিতেন। নারীজাতি মাত্রকেই তাঁহার ভগবতী

বলিয়া ধারণা ছিল। এ কি একটা সহজ কথা মনে করিতেছেন? যাহা লইয়া বিশ্ব সংসার মুগ্ধ, শুধু মুগ্ধ নহে, জগৎ যাহাকে একমাত্র সার জানিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে, তাহাকে ত্যাগ করা কি সহজ বীরত্বের কায? এ কে বুঝিবে? তাঁহার সত্যই সকলকে দেবীধারণা হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কেবল ভক্তিমাত্র ছিল। হায়, কবে আমরা ইহার কণিকা উপলব্ধি করিতে পারিব?

তিনি আহার অতি যৎসামান্য করিতেন, পোষাকের দিকে নজরই ছিল না, এমন কি, কাপড়খানাই সব সময়ে কোমরে থাকিত না। শুধু বিলাসের দিকে মোটেই লক্ষ্য ছিল না, তাহা নহে, বিলাসের সাধন অর্থের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ভয় ছিল। যে অর্থকে আমরা জীবনের সার সর্ব্বস্ব করিয়া জানি, তাহাকে তিনি এত ভয় করিতেন যে, ধাতু দ্রব্য স্পর্শ মাত্র তাঁহার হাত বেঁকিয়া যাইত। কেহ কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার বিছানার নীচে কোন ধাতুদ্রব্য রাখা হইয়াছে। তিনি সেই বিছানা স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার নিদ্রা অতি অল্প ছিল। বস্তুতঃ তিনি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবচ্চিন্তায়, তন্নামকীর্ত্তনে ও পরহিতে কাটাইয়া দিতেন।

তাঁহার অভিমানের লেশমাত্র ছিল না। তিনিই আগে সকলকে প্রণাম করিতেন। একবার তাঁহার সাধন অবস্থায় কোন ডাক্তার দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। তিনি ইহাঁকে বাগানের মালি মনে করিয়া ফুল তুলিয়া দিতে বলেন। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা সম্পাদন করেন। এই ডাক্তার তাঁহার অসুখের সময় দেখিতে আসিয়া আশ্চর্য্য ও সঙ্কুচিত হইয়া বলিয়াছিলেন, এঁ্যা, এঁকেই যে আমি ফুল তুলিয়া দিতে বলিয়াছিলাম! ইনি কখন এমন অভিমান করিতেন না যে, আমি নানাগুপ্তবিদ্যা জানি, তাঁহার সরল হৃদয় হইতে কেবল ভগবৎ কথা বহির্গত হইত।

তিনি সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেন। দার্শনিক বাগ্‌বিতণ্ডায় কখন কাল কাটান নাই, অথচ অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে জটিল দার্শনিক তত্ত্বসমূহের সার সিদ্ধান্ত বলিতে পারিতেন। তাঁহার জ্ঞান—সেই অনন্ত জ্ঞানের উৎস হইতে নির্গত হইত বলিয়া এবং উহা পুঁথিগত ছিল না বলিয়া কখন ফুরাইত না। তিনি কখন জ্ঞানের কথা বলিতে ক্ষান্ত হইতেন না। ভক্তির কথা আর কি বলিব? যাঁহারা তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনে মাতোয়ারা নৃত্য, তাঁহার প্রেমাশ্রু

বিসর্জ্জন ও ভাবসমাধি দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান—তাঁহারা নিশ্চয়ই কিছু অপূর্ব্ব জিনিষ দেখিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ কি?

তাঁহার দয়ার কথা বলিব। তাঁহার ভক্তেরাই তাঁহার দয়ার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন। তিনি যেচে যেচে লোককে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে ভগবৎ পথে আনিতে চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রাহিতা ছিল। তিনি যাই শুনিয়াছেন, কোন ব্যক্তি কোন অসাধারণ গুণে গুণবান্, তখনই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। এইরূপে কেশব সেন, বিদ্যাসাগর, শশধর প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল।

তাঁহার সম্বন্ধে আমি কি জানি? কিই বা লিখিব? তাঁহার শক্তি এক্ষণে তাঁহার ভক্তদের ভিতর অল্পাধিক পরিমাণে খেলিতেছে। অন্ধ, সে অতি অন্ধ, যে দেখিয়াও দেখিতেছে না।

বিশ্বাস।

'বিশ্বাস' কথাটী লইয়া অনেক সময় মারামারি হইয়া থাকে। 'বিশ্বাস ব্যতীত মুক্তি হয় না', 'বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি,' 'বিশ্বাসে মিলিবে বস্তু তর্কে বহুদূর', ইত্যাকার অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমার বোধ হয়, 'বিশ্বাস' শব্দটীর ঠিক পরিষ্কার ধারণা খুব কম লোকেরই আছে। যা শুনিব, তাই মানিব, ইহারই নাম কি বিশ্বাস? না, উহা কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি? উহা কি সহজ, অর্থাৎ বিশ্বাস করিলেই হইল, না, উহা কঠোর সাধন-লভ্য? কি বিশ্বাস করিব? কি বিশ্বাস করিলে মুক্তি হইবে? তর্ক বিশ্বাসে কোন কার্য্যকারণ ভাব আছে কি না? বিশ্বাস ও প্রত্যক্ষে কি সম্বন্ধ? যাহা বিশ্বাস করা যায়, অর্থাৎ মানিয়া লওয়া যায়, তাহাই যদি চিন্তাবলে প্রত্যক্ষ হয়, তবে সে প্রত্যক্ষের মূল্য কতদূর এবং সে বিশ্বাসও বিপথপ্রেরক কি না? ইত্যাদি বহু সন্দেহ উঠে।

প্রথমতঃ, যদি বলা যায়, যা শুনিব, তাই মানিব, ইহাই বিশ্বাস, তবে একজনের নিকট শুনিলাম, ভূত আছে, মানিলাম, আবার অপর জন বলিল, নাই, আমিও অমনি বলিলাম, নাই। এইরূপ হইলে ত সেই বিশ্বাসপরায়ণ

ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্রতাই থাকে না, দেখিতেছি। সে ত পশুতুল্য, যন্ত্রতুল্য হইয়া যায়। সেত আর মানুষ থাকে না। ইহাতে যদি বলা যায়, আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিব, তাহা হইলে আমার জিজ্ঞাস্য, একজনকে আপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করিবে কিরূপে? যদি বল, পাঁচ জনের কথায় তাহাকে আপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করিব, তবে ত তুমি পাঁচ জনকেই অগ্রে বিশ্বাস করিলে। যদি বল, শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস করিব, তাহা হইলে, তোমায় জিজ্ঞাসিব, শাস্ত্র এখন অবিকৃত-ভাবে আছে, তাহার মধ্যে কিছু প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, কিরূপে জানিলে? আর যদিও অবিকৃতই থাকে, তাহা হইলেও উহার অর্থ বুঝিতে ত অনেক গোল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকার টীকাকারেরা ত ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিতেছেন। এখন যাইবে কোথায়? যদি বল, যাহা হয়, একটা ধরিয়া পড়িয়া থাকিব, তুমি তর্ক তুলিয়া আমার শান্তিভঙ্গ কর কেন, তবে তোমায় বলিব, ভাই, তুমি তোমার বিশ্বাসের ব্যাসাতি লইয়া দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়া বসিয়া থাক, বিশ্বাস বিশ্বাস বলিয়া অপরের শান্তিভঙ্গ করিও না।

বিশ্বাস বাস্তবিক একটী অন্তঃকরণ বৃত্তি। আমি লণ্ডন দেখি নাই, কিন্তু ভূগোলে পড়িয়া বা লণ্ডনপ্রত্যাগত ব্যক্তির নিকট শুনিয়া লণ্ডনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। এখন এই বিশ্বাসের ভিত্তি, আমার ভূগোললেখকের বা লণ্ডনপ্রত্যাগতের কথায় বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাসে অনেক সময় কার্য্য নির্ব্বাহ হইলেও এই বিশ্বাস কি সত্যাসত্য সঠিক রূপে নির্ণয়ে সমর্থ? হইতে পারে, ভূগোললেখক বা আমার বন্ধু আমাকে প্রতারিত করিয়াছে। দেখিতে পাই, যাহাকে আজ পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করি, কাল সে বিশ্বাসঘাতকতা করিল। যে স্ত্রী, যে পুত্র, যে বন্ধুকে কত বিশ্বাস করিতাম, তাহারা কত প্রতারণা করিল। বিশ্বাস করিয়া সাধুর নিকট গেলাম, সাধু ঠকাইল, তবে বিশ্বাস করি কাহাকে? বিশ্বাস বলিয়া মনোবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু বিশ্বাস-পাত্র কে?

বিশ্বাসরূপ মনোবৃত্তির অর্থ এই, যাহা আমার পরোক্ষ, তাহার যতক্ষণ না সাক্ষাৎকার হয়, ততক্ষণ তাহার অস্তিত্ব অপরের বাক্যে মানিয়া লওয়া। আমি লণ্ডনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আমি এখন লণ্ডন দেখিতেছি না বটে, কিন্তু লণ্ডনদর্শী পুরুষ আমাকে বলিবেন, তুমি যদি এত অর্থসংগ্রহ ও এইরূপ আয়োজন করিতে পার, তবে তোমায় লণ্ডন দেখাইতে পারি। সুতরাং আরো দেখা গেল, যাহার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা আছে, তাহারই

উপর বিশ্বাস সম্ভবপর। যদি কেহ কোন বিষয় এমন বলে, যাহা আমি সহস্র চেষ্টাসত্ত্বেও কখন সাক্ষাৎ করিতে পারিব না, সে বিষয়ের যথার্থ বিশ্বাস কখন হইতে পারে না, বিশ্বাসের কোন প্রয়োজনও নাই।

সংসারে যে বিশ্বাস পূর্ব্বক অনেক কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা ঠিক। কিন্তু সে বিশ্বাস আপেক্ষিক, তাহা অল্পবিস্তর সন্দেহ জড়িত। অনেক সময় অতিরিক্ত বিশ্বাসী বাস্তবিক বোকা বা পাগল, তাহার সন্দেহ নাই। সন্দেহের অর্থ অবিশ্বাস নহে, অবিশ্বাসও এক প্রকার বিশ্বাস। সন্দেহের অর্থ মনের স্থিতি না হওয়া। তা এমন কোন্ মানুষ আছে, যাহার সম্পূর্ণ স্থিতিপদ লাভ হইয়াছে?

এতক্ষণ সাংসারিক বিশ্বাসের কথা হইল—দেখা গেল, সংসারের কাহারও প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন অসম্ভব। যদি কোন ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসস্থাপন অসম্ভব হয়, তবে কি গুরু ও শাস্ত্র বাক্যেও অবিশ্বাসী হইতে হইবে?

এখন কথা এই, শাস্ত্র কি আর গুরুই বা কে? দেখিতেছি, অনন্ত শাস্ত্রং, অনন্ত মত, কাহার কথা বিশ্বাস করি, কাহার কথা মানি? অসংখ্য গুরুবেশধারী, সাধুবেশধারী রহিয়াছেন; কত লোকে কতবার কি ইঁহাদের দ্বারা প্রতারিত হন নাই? ক্বচিৎ কেহ কখন সদ্গুরু পাইয়াছেন।

এতক্ষণ অন্যমত খণ্ডন করিলাম। এখন কি বলিতে চাই, তাহা বলিব। যতক্ষণ কোন বিষয় প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ বিশ্বাস ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, যদি সেটী বিশ্বাসের কোন প্রয়োজন থাকে। আমি ভূত দেখি নাই—ভূত মানি, কারণ, ভূতে আমার প্রয়োজন আছে। কি প্রয়োজন—না, ভূত থাকিলে অবশ্য আমার ইহাও বিশ্বাস হইবে যে, দেহ যাইলে আত্মাও থাকিবেন। এই আত্মা থাকা আমার প্রয়োজন—আমার প্রাণ আত্মা না মানিয়া তৃপ্ত হয় না। কতকগুলি বিষয় আছে, যে গুলি মানিলেও কিছু আসিয়া যায় না, না মানিলেও কিছু আসিয়া যায় না, সেগুলিতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কেবল তর্ক জমাইবার জন্য এইগুলির আলোচনা হইয়া থাকে। যাহা আমার দেখিবার, শুনিবার বা কোন রূপে সাক্ষাৎকার করিবার কখনও সম্ভাবনা নাই, তাহার অস্তিত্ব আছে কি না, বিচারের কি প্রয়োজন? যাহাতে আমার প্রয়োজন, তাহাই বিশ্বাস করিয়া সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করা আবশ্যক।

পরমাত্মা ও আত্মা সম্বন্ধীয় বিশ্বাসও সাধনলভ্য। গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাসও সাধনলভ্য।

আমাদের আবশ্যক, এই বিশ্বাস, এই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করা, অন্য সব বিশ্বাস তাড়াইয়া দেওয়া। পিতামাতা, ভাই বন্ধু, স্ত্রী পুত্র সকলেতেই অবিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইবে—পরমাত্মাতে আর যাঁহার নিকট পরমাত্মা উপলব্ধির সাহায্য পাওয়া যাইবে, এমন গুরু ও শাস্ত্রে বিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে। শুধু তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস নয়, তিনিই সর্ব্বস্ব বলিয়া বিশ্বাস—সেই বিশ্বাস হইতেই ক্রমশঃ তীব্র সাধন বলে তাঁহার প্রত্যক্ষ হয়। সাংসারিক বিশ্বাস সন্দেহজড়িত, এ বিশ্বাসেও যে প্রথম প্রথম সন্দেহ থাকে না, তাহা নহে। তবে সাংসারিক বিশ্বাসপাত্রে সন্দেহ ঘনীভূত হয়, কিন্তু পরমাত্মায় বিশ্বাস উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া শেষে পরোক্ষ বিশ্বাস চলিয়া গিয়া অপরোক্ষানুভূতি হয়।

সাংসারিক কতকগুলি বিশ্বাসের ফল, পরিণামে প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু তাহাদের ফল অনিত্য, সুতরাং সে বিশ্বাসে সাংসারিক ফলোপধায়কতা আছে, পারমার্থিক নাই।

বিশ্বাসের আর একটী দিক্ দেখা যাউক,—কোন মানুষের অপর মানুষে কি এমন যথার্থ বিশ্বাস হইতে পারে যে, তাহার দ্বারা কোনরূপ অসৎ কর্ম্ম সম্ভব নয়? আপনার প্রিয় যাহা কিছু, আপনার টাকা কড়ি, আপনার স্ত্রী, এমন কি আপনার দেহ এবং মন পর্য্যন্ত তাহার উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে? সংসারে দেখিতেছি, বিশ্বাসের পশ্চাতে সন্দেহ ছায়ার ন্যায় বিরাজিত। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু বান্ধব, দাস দাসী কাহারও প্রতি কি বাস্তবিক বিশ্বাস হয়? আর এই বিশ্বাসে বাস্তবিক উন্নতি হয়, কি অবনতি হয়? মনে করুন, একজন ব্যক্তি আপনার ছেলের প্রতি বিশ্বাসী। তিনি মনে মনে বিশ্বাস করেন, আমার ছেলে কখনো মিথ্যাকথা কহিবে না। এরূপ বিশ্বাস করিলে ছেলের বেশী উন্নতি হয়, না, যদি সর্ব্বদা সন্দেহবশবর্ত্তী হইয়া তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে চালান যায়, তবে তাহার বেশী উন্নতি হইতে পারে? আমার বোধ হয়, বিশ্বাস—বিশ্বাসপাত্র ও বিশ্বাসকারী উভয়ের উপর নির্ভর করে। সচরাচর যে সকল বিশ্বাস দেখা যায়, তাহা বড় স্থায়ী হয় না। এইরূপ হিসাবে ধরিলে বরং সন্দেহকেই জগৎ সংসারে কার্য্যক্ষেত্রের ভিত্তি করাই উচিত বোধ হয়—যাহা কিছু কার্য্যতঃ বিশ্বাস করা যায়, তাহাতে মনের সন্দেহ একেবারে যায় না। ব্যক্তিবিশেষের উপর অনেক পরীক্ষার পর অনেক পরিমাণে বিশ্বাস দেখা যায় বটে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কথাও ত অনেক শুনা যায়। তবে কি এমন কোন

ব্যক্তি নাই, যাঁহার উপর নিঃসংশয়ে বিশ্বাসস্থাপন করা যাইতে পারে? —সর্ব্ববিষয়ে? বোধ হয়, সাক্ষাৎ ঈশ্বর যদি দেহধারী হইয়া কখন আসেন, তবেই সম্ভব হইতে পারে।

প্রকৃত বিশ্বাস বলিতে আমি বুঝি, সর্ব্ব জীবের ব্রহ্মত্বে বিশ্বাস। ইহা নিজের কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। অপরকে যতই খারাপ দেখি না কেন, তাহার ব্রহ্মস্বরূপত্বে সদাই বিশ্বাস রাখা—শুধু মতে মানিয়া লওয়া নহে, তাহার ভিতর যথার্থই ভগবানকে দেখা, ইহা অনেক তপস্যা না করিলে হয় না। ইহাতে যে বিশ্বাস উপার্জ্জিত হয়, তাহা বিশ্বাসপাত্রের কোনরূপ সদ্‌গুণ বা অসদ্গুণের উপর নির্ভর করে না।

আমরা সাধারণতঃ লোকের গুণদোষ দেখিয়া বিচার করিয়া থাকি। কাহাকেও বিশ্বাসপাত্র ভাবি, কাহারও উপর বা ঘোর অবিশ্বাস করিয়া থাকি। কাহাকেও কতকটা বিশ্বাস করি আবার কতকটা চোকে চোকে রাখি। কার্যাক্ষেত্রে এরূপ অবশ্য না করিলে চলে না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ না করিয়া থাকিতে পারি না বলিয়াই আমাদের এত দুঃখ—আমাদের এবং অপরেরও কোন উন্নতি হয় না। বাস্তবিক নিজে উন্নত হইয়া যত অপরের উপর, অপরের ব্রহ্মত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারা যাইবে, ততই আমাদের নিজেদের উন্নতি এবং অপরেরও উন্নতি।

এইরূপে অপরের সহস্র দোষ সত্ত্বেও তাহার ব্রহ্মত্বে বিশ্বাসী হইতে পারিলে নিজের ত উন্নতি হয়ই, আবার বিশ্বাসপাত্রেরও উন্নতি হইয়া থাকে। আমাকে যদি কেহ সর্ব্বদা অনন্তশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বসদ্‌গুণের আধার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া পূজা করিতে আন্তরিক ভাবে দিন রাত প্রস্তুত দেখি, তবে কি আমার কখন মনে হইবে না যে, বোধ হয়, আমি বাস্তবিকই ঐরূপ, এখন কতকগুলি আবরণে জড়িত হইয়া পড়িয়া আপন স্বরূপ ভুলিয়াছি মাত্র, আপনার যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ করিতে হইবে—একটা লজ্জাও কি আমাদের উপস্থিত হইবে না?

এই বিশ্বাস উপার্জ্জিত না হইলে আমাদের অশান্তির সীমা পরিসীমা থাকে না, উন্নতির কোন সম্ভাবনাই থাকে না। ছাত্রকে শিক্ষা দিবার সময় শিক্ষকের যদি বিশ্বাস থাকে, আমি শত চেষ্টায় ছাত্রের কিছু করিতে পারিতেছি না, ইহা ছাত্রের দোষ নহে, উহার ভিতরে ব্রহ্ম নিদ্রিত রহিয়াছেন, আমার শক্তিহীনতাবশতঃ উহাকে আমি জাগাইতে পারিতেছি না, তাহা হইলে

কি তাহাতে ছাত্রের উন্নতির পথ মুক্ত হয় না? আধ্যাত্মিক গুরুও শিষ্যসম্বন্ধে এইরূপ করিয়া থাকেন। তাঁহার বিশ্বাস—শিষ্যের ভিতরে সেই ব্রহ্ম রহিয়াছেন' সে যতই খারাপ হউক না কেন, আমি যখন তাহার ভার লইয়াছি, তখন উহাকে জাগাইতে হইবেই হইবে। এই বিশ্বাস—উন্নত মহাপুরুষগণে সাক্ষাৎ অপরোক্ষজ্ঞানের নামান্তর এবং তাঁহাদের হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নদরের ব্যক্তিতে পরোক্ষজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। বাস্তবিক ধর্ম্মে যে বিশ্বাসের এত প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা সেই বিশ্বাস, ইহা দৃঢ় ধারণা। নতুবা যা তা মানিয়া লওয়া নহে।

অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া একটা কথা শুনা যায়। বাস্তবিক 'বিশ্বাস' এই মহৎ ভাবের সহিত অন্ধ কথাটী জড়ানো ঠিক নয়। অন্ধবিশ্বাস বাস্তবিক আর কিছুই নহে, উহা মনের জাড্য বা আলস্যের ফল বিশেষ—উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই।

পূর্ব্বে এক স্থলে বলা হইয়াছে, আমাদের যে দিকে ঝোঁক হয়, সেই দিকেই বিশ্বাস হইয়া থাকে। তবে কি এই বিশ্বাসকে একেবারে বর্জ্জন করাই সত্যানুসন্ধানের প্রকৃষ্ট পন্থা নহে? কেবল যুক্তি অবলম্বন করিয়া গেলেই ত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু হায়, এই যুক্তিটীর স্বরূপ যদি আমরা একবার ভাবিয়া দেখি, তবে আমাদিগকে একরূপ হতাশ হইতে হয়। যে দিকে ঝোঁক থাকে, যুক্তি তাহারই সত্যতা প্রতিপাদন করে মাত্র। যুক্তি কোন নূতন আলোক দিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক জগতেই বলুন, আর আধ্যাত্মিক জগতেই বলুন, বিশ্বাসেই পোনর আনা চলিতেছে, দেখিতেছি। বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতিবাদী। কিন্তু তিনি এমন কি প্রমাণ পাইয়াছেন যে, বাস্তবিক নিম্ন হইতে ক্রমাগত উচ্চেই যাইতেছে? তিনি কেবল কতকগুলি জীবের মধ্যে উন্নতি অবনতির মাত্রা নির্ণয় করিয়াছেন মাত্র। উন্নতই যে ক্রমশঃ অবনত হয় নাই, ইহাই বা তাঁহাকে কে বলিল? তবে তিনি ইহা বিশ্বাস করেন এই জন্যে যে, উন্নতি হইলেই তাঁহার ভাল লাগে।

যদি ইহা কখন সম্ভব হয় যে, আপনার রুচির দিকে, ঝোঁকের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল সত্যানুসন্ধান করিবার ইচ্ছা হয়, তবে একদিন বিশ্বাসকে সমূলে উৎপাটন করা যাইতে পারে, কিন্তু জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মানুষের মনোবৃত্তিকে হিন্দুশাস্ত্রকারেরা সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতিতে বিশ্বাস বা তাহাদের দিকে ঝোঁক স্বাভাবিক। সাত্ত্বিক ব্যক্তি ইহাদের অস্তিত্বের সপক্ষে যে সকল যুক্তিপ্রদান করেন, রাজসিক তামসিক লোকের তাহাতে কখনই পরিতৃপ্তি জন্মিতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্রে এই সাত্ত্বিক বৃত্তিকেও উন্নত অবস্থায় সত্যানুসন্ধানের অন্তরায় বলা হইয়াছে। 'এই তিন জনই চোর।' তবে সাত্ত্বিক বৃত্তিরূপ চোর অপেক্ষাকৃত সদয়। সেইজন্য সে প্রকৃত সত্যকে দূর হইতে দেখাইয়া দিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে পলাইয়া আসে।

আর একটী কথা আসিতেছে। কোন একটী বিষয় বিশ্বাস করিতে করিতে এমন কি হইয়া যায় না যে, তাহাই প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়? কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরকে পূর্ব্ব হইতে বিশ্বাস করা ছিল বলিয়াই তাঁহার প্রত্যক্ষই বল আর যাহা কিছু বল, সবই হইয়া থাকে। এ সকল পূর্ব্ব সংস্কারের ফল মাত্র। ইহাতে বাস্তবিক বিশ্বাসের কতদূর শক্তি, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। যদি বিশ্বাস করিয়া তাহার যথাবৎ কার্য্য হওয়া স্বীকার করা যায়, তবে সে বিশ্বাস করা আর যথার্থ কোন বিষয় হওয়া এক হইয়া দাঁড়াইল। কোন ব্যক্তির যদি বিশ্বাসে ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, বিশ্বাসে ব্যারাম সারে, বিশ্বাসে মনের উন্নত অবস্থা হয়, তবে এ বিশ্বাসে আর প্রত্যক্ষে প্রভেদ কোথা, তাহা ত দেখিতে পাই না। বলিতে পার, একজন পাগলেও আপনাকে রাজা বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে কি সে বাস্তবিক রাজা? আমি বলি, রাজা বলিতে বুঝ কি, বল দেখি? রাজার যে মনোবৃত্তি, রাজার যে সুখ দুঃখ, সবই যখন সে ব্যক্তিতে আসিয়াছে, তখন তাহাকে রাজা বলিতে হইবে বৈ কি! বাস্তবিক মনের শক্তি অসীম। এই বিশ্বাসের দার্শনিক নাম ধারণা। এই ধারণাবলে অসাধ্য সাধন করা যাইতে পারে।

যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, যদি তোমাদের এক বিন্দু সর্ষপবীজের মত বিশ্বাস থাকিত, তবে পাহাড়কে এখান হইতে সরিয়া যাইতে বলিলেও সরিয়া যাইত। বিশ্বাস এখানে ইচ্ছাশক্তির দার্ঢ্য অর্থে ব্যবহৃত। এই ইচ্ছাশক্তিবলে আমরা যাহাকে অলৌকিক বলি, এরূপ শত শত কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

জ্ঞানিগণ 'বিশ্বাস' সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়া থাকেন, তাহা বড় অপূর্ব্ব। তাঁহারা বলেন, প্রত্যক্ষ বলিয়া কিছু নাই, সবই বিশ্বাস। তুমি যে সন্দেশ খাইয়া তৃপ্ত হইতেছ, আবার অপর জিনিষের ঘ্রাণ মাত্র নাসিকা কুঞ্চিত

করিতেছ, ইহা তোমার বিশ্বাসের ফলমাত্র। তুমি এ জন্মে না করিয়া থাক, পূর্ব্বজন্মে এ অভ্যাস করিয়াছ। আর এই সকল ভ্রান্তবিশ্বাস—এই সকল কুসংস্কার তাড়াইয়া একমাত্র সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এই বিশ্বাস উপার্জ্জন করিতে পারিলেই সমুদয় হইয়া গেল। জ্ঞানী সংসারকাতর জীবকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'কথং রোদিষি রে বৎস নামরূপং ন তে ন মে।' বলেন, তুমি সর্ব্ব-শক্তিমান, তুমি অনন্ত—তুমি কেন আপনাকে ক্ষুদ্র বিশ্বাস করিয়া ভ্রমে পড়িয়া আছ? অনন্ত জগতের রাজা, তুমি কোথায় রাজা খুঁ[illegible]? হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।

ব্রাহ্মণ।

হে ব্রাহ্মণ, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, দান্ত, ধীর,
সর্ব্বভূতে আত্মা জ্ঞানে সর্ব্ব হিতে রত,
ভুলিলে স্বরূপ নিজ, জাগো জাগো বীর,
জগৎবাসীরে পুনঃ দেখাও সুপথ।

অধ্যাত্মরাজ্যের গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার,
ভুলি অধিভূত কার্য্যে কেন দাও মন,
জান না কি, শাস্ত্রে বলে, হৃদে ব্রহ্ম যার,
ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বভূতে সেই সে ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ যে, নাহি জানে সে ত কভু দ্বেষ;
যশোলিপ্সা, ধনলিপ্সা, প্রভুত্ব বাসনা
নাহি কভু হৃদে তার; শুধু পরমেশ
আর ভূতহিতচিন্তা হৃদয়ে ভাবনা।

আয়েচ্ছচণ্ডালে কোল দেয় অনায়াসে,
গর্ব্ব তার হৃদি কভু স্পর্শিবারে নারে,
ব্রহ্মতেজে তেজোময়, মন তাঁর বশে,
নমতায় তৃণ বলি তাঁর [illegible]।

প্রশান্তহৃদয়, মন সদা চিদাকাশে;
পুরুষপ্রকৃতিলীলা করে নিরীক্ষণ –
পরাবিদ্যা সাধনায় বদ্ধ তাঁর পাশে—
অধিকারী জনে গিয়ে করয়ে ভজন।

অনন্ত শক্তির হয়ে এক অধীশ্বর,
ধরিয়ে ভূদেব নাম—জীবহিততরে
সদা শক্তিবিনিয়োগ—সর্ব্বচরাচর
কারো দুখ হৃদে কভু সহিবারে নারে।

শুচি, কার্য্যদক্ষ অতি, সৌম্যমূর্ত্তিধর,
দেখিলেই ইচ্ছা হয়, নোয়াই এ শির;
নির্লোভ নিষ্কাম সদা, দানে মুক্তকর,
দুঃখেতে সহিষ্ণু অতি—বিপদেতে বীর।

অপমান তিরস্কার অমৃত সেয়ান,
মানে বিষ বলি সদা দূরে পরিহার,
প্রেমিক সুজন, নাহি ধার্ম্মিকের ভান,
ঊর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী আজন্মকুমার।

যথা কুহকের বশে চক্রবর্ত্তী রাজা
আপনারে দীন বলি করয়ে গেয়ান;
সেইরূপ হে ব্রাহ্মণ, তুমি মহাতেজা,
সত্য কি বারেক দেখ করিয়া ধেয়ান।

ভস্ম আচ্ছাদিত বহ্নি—দাও উড়াইয়া—
ফুৎকারেতে ঐ ভস্ম—হোক সুপ্রকাশ!
লক লক করি বহ্নি উঠুক ভেদিয়া,
করুক আচ্ছন্ন দিগ্‌দিগন্ত আকাশ।

সে আগুনে হবে ভস্ম অজ্ঞানের রাশি,
উঠিবে জ্ঞানের জ্যোতি গগন প্রকাশি।
সকলে আপন বর্ণ দিবে ধরাইয়া,
মহাতেজে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম প্রকাশিয়া।

সৃষ্টির পূর্ব্বেতে যথা সকলে ব্রাহ্মণ,—
ব্রহ্মধ্যানে রত সবে ছিল সর্ব্বক্ষণ,
এখনও হইবে তাই—পুন একাকার,
হইবে সবার মুক্তি, সবার উদ্ধার।

সনাতন ধর্ম্ম তবে হইবে স্থাপন।
ভেদাভেদ কিছু নাহি রহিবে তখন।

তাই বলি,

ধর্ম্মকোষগোপ্তা হে ব্রাহ্মণ,
অগ্রজন্মা!—কর কর শীঘ্র জাগরণ।

তুমি জাগিলেই পুন জগৎ জাগিবে,
পুন আনন্দের স্রোতে জগৎ ভাসিবে।
আপনা উদ্ধারি, কর অপরে উদ্ধার,
করি তব পদে কোটি কোটি নমস্কার।

প্রাচীন ও আধুনিক।

প্রাচীন ও আধুনিকের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া অনেক সময়ে বিবাদ হইয়া থাকে। প্রাচীনের পক্ষপাতীরা বলেন, পূর্ব্বকালীন লোকে আমাদের অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে উন্নত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের পথানুসরণ করা ব্যতীত আমাদের আর কোন উপায় নাই। তাঁহারা বীরত্বে বলুন, জ্ঞানে বলুন, ধর্ম্মে বলুন, বিদ্যায় বলুন, সর্ব্ববিষয়ে আমাদের অপেক্ষা উন্নত ছিলেন, অতএব শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাদের কার্য্যকলাপের আলোচনা কর, তাঁহাদের যাহা আপাততঃ অজ্ঞতা, ভ্রান্তি বা কুসংস্কার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না বলিয়াই ঐরূপ বোধ হয়। প্রকৃত ব্যাখ্যার আলোকে সেই সকল, গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক বলিয়া প্রতীত হইবে। পক্ষান্তরে যাঁহারা আধুনিকের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, ক্রমোন্নতিবশে আমাদের সেই প্রাচীন অবস্থা হইতে কত উন্নতি হইয়াছে, সুতরাং প্রাচীনের দিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা এই আধুনিক উন্নতিতে মাতি এস।

নিরপেক্ষ বিচারের চেষ্টা করিলে প্রতীয়মান হয়, প্রাচীনত্ব বা আধুনিকত্ব, কিছুই শ্রেষ্ঠতার কারণ নহে। শ্রেষ্ঠ যাহা, তাহা প্রাচীন বা আধুনিক হউক, শ্রেষ্ঠই থাকে, তাহাতে তাহার কোন গৌরবের হানি হয় না। বরাবরই যে আমাদের উন্নতি হইয়া আসিতেছে, তাহারই বা প্রমাণ কই, আবার ক্রমাগত অবনতি হইতেছে, তাহাই বা তুমি কিরূপে প্রমাণ করিতে পার? ক্রমবিকাশ-বাদীরা (Evolutionists) আবার পুরুষানুক্রমিকশক্তিহ্রাসও (Atavism) মানিয়া থাকেন। ক্রমাগত উন্নতিই হইতেছে, এ বিষয়ে প্রমাণ কিছুই নাই, উহা কেবল একটী মত মাত্র, (Theory) উহা একটী ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র। আবার ক্রমাবনতিবাদীরাও বিশ্বাস ব্যতীত আর কি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন যে, তাহাতে ক্রমশঃ সর্ব্ববিষয়ে অবনতিই হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? এ বিষয়ে যদি কখন প্রাচীন ও আধুনিকের যথার্থ ইতিহাস সঙ্কলন হয়, তবেই কতকটা নিঃসংশয় হইতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাসের কথা ছাড়িয়াই দিন, পাশ্চাত্যদেশে ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের যে সকল প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে কতটা বিশ্বাস করা যাইতে পারে, তাহাতেই ত সন্দেহ উপস্থিত হয়। প্রথম ধরুন, আধুনিক কালের ইতিহাস সঙ্কলনেই কত বাধা, কত বিঘ্ন আসিয়া থাকে। এক ত মানুষের জাতিগত, ব্যক্তিগত, পক্ষপাতের দরুন সত্যের উপর একটা কুজ্ঝটিকাবরণ পড়ে। তার পর সব ঘটনাই কি ঠিক ঠিক জানা যায়? অনেকটাই অনুমানের উপর সারিয়া লইতে হয়! দেশের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলনে আরও গোল দেখা যায়। এখানে আন্দাজে ঢিল মারার যদ্দূর প্রভাব, আর কোথাও তত নহে। শিলালেখ, তাম্রশাসনের দ্বারা সত্য নির্ণয়ের দ্বার কতকটা উদ্ঘাটিত হইতে পারে বটে, কিন্তু অনেক সময়ে ভাষার গোলযোগে তাহা হইতেও সত্যাসত্য নির্ণয়ের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। যাহাকে আভ্যন্তরিক প্রমাণ (Internal evidence) বলে, তাহা এত অনিশ্চিত যে, তাহাতে বাস্তবিক কিছু প্রমাণ হয় বলিয়া বোধ হয় না। দুইখানি গ্রন্থের রচনাপ্রণালীর ভাব দেখিয়া কি করিয়া তাহার পূর্ব্বাপর নির্ণীত হইবে? দেখা যায়, এক সময়েই কত বিভিন্ন প্রণালীর রচয়িতা বর্ত্তমান। এরূপ বিচারের সময় কতকগুলি theory প্রথমেই মানিয়া লওয়া হয়। বঙ্কিম বাবু শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র সমালোচনাকালে বলিয়াছেন, যাহা কিছু অলৌকিক, (Miraculous) তাহাকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। কে বলিল? আগে অলৌকিক

ঘটনার অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করুন। এ সকল যদি মানিয়াই লইলেন, তবে আর প্রমাণ করিলেন কি?

অতএব সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ রাস্তা এই, প্রাচীনত্ব আধুনিকত্বের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল সত্যের দিকে দৃষ্টি করা। যেখানে সত্য পাইব, সেইখানেই লইব। সত্যের প্রমাণ সত্য। সত্য যাহা, তাহা নিত্য, তাহা অবিনাশী, তাহার কোন উপাধি নাই। প্রাচীন যাহা আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইবে, তাহা যদি বাস্তবিক গ্রহণযোগ্য হয়, কেন না গ্রহণ করিব আর আধুনিকে কিছু সত্য থাকিলে তাহাই বা কেন ঘৃণা করিব? অনেকে মাথা ঘামাইতে চাহেন না বলিয়াই এইরূপ একটা যা তার উপর বরাত দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু এক তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, আমরা নিজ নিজ যুক্তিদ্বারা যাহা সিদ্ধান্ত করিব, তাহাই যে সত্য হইবে, তাহা কে বলিল? সত্য বটে, যুক্তি ভ্রান্ত হইতে পারে; কিন্তু যতদিন যুক্তি ব্যতীত সত্যানুসন্ধানের অন্য কোন উপায় না পাই, ততদিন যুক্তিবলে আমরা আংশিক সত্যেও যে উপনীত হইতে পারিব, তাহার আর সন্দেহ কি? আর যুক্তিবলে মন ক্রমশঃ সতেজ হইবে, তাহার সত্যানুসন্ধান শক্তি বর্দ্ধিত হইবে— ক্রমশঃ যুক্তি হইতেও সত্যানুসন্ধানের শ্রেষ্ঠতর উপায় সকল আমরা জানিতে পারিব। যুক্তির একটী বিশেষ দোষ এই যে, উহা আমাদের রুচির (Bais) অনুগামী হইয়া থাকে। এই রুচিকে প্রবল হইতে বাধা দিবার অভ্যাস করিতে হইবে। জিগীষাপ্রবৃত্তি আমাদের নিয়ামক না হইয়া যাহাতে আমরা নিরপেক্ষ হইতে পারি, তাহার জন্য বাসনার সংযম সাধনা করিতে হইবে। আর সকলের উপর, বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপে যত কম সত্য আমরা লাভ করি না কেন, তাহা আমাদের যথার্থ কাযে আসিবে।

প্রাচীন যাহা কিছু আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাকে যেমন পাই, তেমনি লইয়া আমরা যেন চেষ্টা করি, তাহার মধ্যে আমাদের কতটুকু গ্রহণীয়, তাহার নির্ণয় করিতে; যতটুকু আমাদের কাযে লাগিতে পারে, তাহার গ্রহণ করিতে। নতুবা প্রাচীন গৌরবের ঘোষণায় বা আধুনিকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে বিশেষ কোন লাভ নাই।

কেনোপনিষৎ।

কাহার প্রেরণাবশে মন
বিষয়েতে হয় ধাবমান ?
বল গুরো, কাহার প্রেরণে
বিষয়েতে ধায় আদি প্রাণ ?

বল বল কার প্রেরণায়
লোকে করে বাক্য উচ্চারণ ?
কোন্ দেব বল চক্ষু কর্ণে
বিষয়েতে করে নিয়োজন ?

শ্রবণশ্রবণ তিনি নয়ননয়ন ;
মনেরও মানস তিনি বাক্যেরও বচন ;
প্রাণেরও প্রাণন তিনি জেন সুধীগণ।
জেনে তাঁরে ত্যজে আত্মবুদ্ধি ইন্দ্রিয়েতে
ত্যজি ইহলোক সাধু যায় অমৃতেতে।

নাহি যায় চক্ষু, নাহি যায় মন,
নাহি যায় তথা অথবা বচন ;
জানি তাঁরে নাহি বলিবারে পারি,
কিরূপে শিখাব স্বরূপ তাঁহারি ?

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিমুখে শুনেছি বচন,
জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হতে ভিন্ন তিনি হন।

বাক্য যাঁরে প্রকাশ করিতে নাহি পারে,
কিন্তু যাঁর শক্তিবলে নরবাক্য স্ফুরে।
তাঁহারেই সাধুবর, জেন ব্রহ্ম বলি,
নহে ব্রহ্ম, লোকে যাঁরে দেয় পূজা বলি।

মনেতে পারে না যাঁরে করিতে মনন,
মনেরে দেখেন যিনি, বলে জ্ঞানিগণ ;
তাঁহারেই সাধুবর, জেন ব্রহ্ম বলি,
নহে ব্রহ্ম নরে যাঁরে দেয় পূজাবলি।

যাঁরে চক্ষু দিয়া নাহি পায় দেখিবারে,
যাঁর বলে চক্ষু দেখে বিশ্বচরাচরে;
তাঁহারেই সাধুবর, জেন ব্রহ্ম বলি,
নহে ব্রহ্ম নরে যাঁরে দেয় পূজাবলি।

শ্রোত্রবলে যাঁরে কেহ শুনিতে না পায়,
কিন্তু যাঁর জ্ঞানে শ্রোত্র বিষয়ের প্রায় ;
তাঁহারেই সাধুবর, জেন ব্রহ্ম বলি,
নহে ব্রহ্ম, নরে যাঁরে দেয় পূজা বলি।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়বলে যাঁর নাহি প্রায় ঘ্রাণ,
যাঁর বলে ঘ্রাণ স্ববিষয়ে ধাবমান,
তাঁহারেই সাধুবর, জেন ব্রহ্ম বলি,
নহে ব্রহ্ম, নরে যাঁরে দেয় পূজা বলি।

যদি মনে কর তাঁয় ভালরূপে জানি,
বুঝিব তোমারে ব্রহ্মস্বরূপে অজ্ঞানী।
তোমার ভিতরে তাঁর কিরূপ প্রকাশ,
দেবতা ভিতরে কিম্বা কিরূপ বিকাশ,
এ সকল তত্ত্ব আগে কর অন্বেষণ।
শুনি শিষ্য কিছুদিন ব্রহ্মের চিন্তন
করি, পুন গুরু পাশে করিয়া গমন
বলেন—জেনেছি ব্রহ্ম হেন লয় মন।

ইহা শুনি গুরুদেব করিলা উত্তর,
শুন মোর অনুভব, ওহে সাধুবর,
সুষ্ঠুরূপে জানি ব্রহ্মে বলিতে না পারি,
জানি না ইহাও আমি বলিবারে নারি ;

'জানি না তাহাও নয়—জানি তাও নয়'
এ তত্ত্ব যে জানে সেই জেনেছে নিশ্চয়।

ব্রহ্মে জানি নাই এই জ্ঞান সদা যাঁর,
তাঁহারি হৃদয়ে সদা ব্রহ্মের বিহার।
জেনেছি এ অভিমান যাঁহার হৃদয়ে,
জ্ঞান তাঁর যায় বহু দূরে পলাইয়ে।

কত জ্ঞান মানুষের নিয়ত হয় উদয়,—
সেই জ্ঞানমূল তাঁরে যেবা করেছে নিশ্চয়;
বীর্য্যলাভ করে সেই—সেই আত্মবিদ্যাবলে
অমৃতত্ব লভি বাস করে সদা ভূমণ্ডলে।

এখানেই জানে ব্রহ্মে জনম সফল,
জানিতে নারিলে তার বিনাশ নিশ্চয়;
ধীর তাঁরে প্রতি ভূতে করিয়া চিন্তন,
ইহলোক হতে গিয়ে অমর যে হয়।

ব্রহ্মশক্তিবলে, দেব অসুরবিজয়ী,
ব্রহ্মে ভুলি করে সদা আত্ম অভিমান,—
আমাদের শক্তিবলে মহিমার বলে
অসুরে জিনিয়া ভুঞ্জি বৃন্দারক ধাম।
জানিয়া তাঁদের এই মহা অহঙ্কার,
দর্পচূর্ণ তরে ব্রহ্ম হন অবতার।

জ্যোতিরূপে হল তাঁর উদয় দ্যুলোকে
দেবগণ দেখে তাঁরে, এ জিজ্ঞাসে ওকে।
কেবা এই পূজ্যতম মহা জ্যোতির্ম্ময়?
যাও অগ্নি, এর তত্ত্ব কর হে নিশ্চয়।

শুনি অগ্নি তাঁর পাশে করিলা গমন,
কহে জ্যোতির্ম্ময়, তুমি হও কোন্ জন?
'অগ্নি মোর নাম, আমি বিদিত সংসারে,
জাতবেদা নাম মোর ঘোষে চরাচরে।'

'জাতবেদঃ, বল শুনি, কি বীর্য্য তোমার ?'
'পৃথিবীর সর্ব্বদাহে ক্ষমতা আমার !'
একগাছি তৃণ দিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলে—
'কর অগ্নে, দগ্ধ ইহা তব শক্তিবলে'।

তৃণের সমীপে গিয়া যতদূর বল
প্রয়োগি হইল অগ্নি পুড়াতে বিফল।
ফিরি দেবগণ পাশে করে নিবেদন
জানিতে নারিনু জ্যোতির্ম্ময় কোন্ জন।

'যাও বায়ু, জানি এস বলে দেবগণ'
মহাদম্ভে বায়ু তবে করিলা গমন।
'কে তুমি ?'—'পবন আমি খ্যাত চরাচর ;
মাতরিশ্বা নাম মোর ঘোষে সদা নর।'

'কি শক্তি ?'—'সকল আমি উড়াই নিমিষে,'
'উড়াও তৃণেরে', জ্যোতির্ম্ময় কন হেসে।
সর্ব্বশক্তি প্রয়োগিয়া হইল বিফল,
চূর্ণ অভিমান, বুদ্ধি হইল বিকল।

দেবপাশে গিয়া সব করে নিবেদন,
শুনি দেবগণ ইন্দ্রে করিলা প্রেরণ।
ইন্দ্র যদা তাঁর পাশে করিলা গমন,
জ্যোতির্ম্ময় তখনই হল অদর্শন।

আবির্ভূতা আকাশেতে বহুশোভমানা
হৈমবতী উমা অতি সুন্দরদর্শনা।
তাঁর পাশে মঘবান করিয়া গমন
জিজ্ঞাসেন—জ্যোতির্ম্ময় হন কোন্ জন ?

বলিলেন উমা—'ইনি ব্রহ্ম—এঁর বলে
লভেছ বিজয় যত দেবগণ সকলে।'

এরূপে জানিল ইন্দ্র ব্রহ্ম বলি তাঁরে
প্রথম জানিল তাই, সবার উপরে।
অগ্নি বায়ু গিয়েছিলা তাঁর নিকটেতে
এ হেতু গরিষ্ঠ তাঁরা দেবসমাজেতে।

দেবতাসমীপে এই ব্রহ্মের প্রকাশ
চক্ষের নিমেষ প্রায়—বিদ্যুত আভাস।
মন সদা তাঁর কাছে করিয়া গমন,
নিরন্তর করে যেন তাঁহারে স্মরণ।

ভজনীয় তাঁর নাম— ভজ সদা তাঁরে—
যদি হে যাইবে সাধু, ভবসিন্ধু পারে।
তাঁহারে জানেন এইরূপে সদা যিনি,
সর্ব্বভূত তাঁর সঙ্গ চায় বহু গণি।

চেয়েছিলে সাধো, উপনিষদ্ জানিতে
বলি তাই ব্রহ্মতত্ত্ব তোমার সাক্ষাতে।
তপোদম কর্ম্ম বেদ বেদাঙ্গ পঠন,
ব্রহ্মবিদ্যা লাভে হয় এ সব সাধন।
সত্যেরে জানিও সাধো, আশ্রয় ইহার;
ব্রহ্মবিদ্যা জেনো ভবে সর্ব্ববিদ্যাসার।

এই ব্রহ্মবিদ্যা ভবে হয় লাভ যার,
ঘুচে যায় সমুদয় পাতক তাহার।
অনন্ত গরিষ্ঠ স্বর্গে প্রতিষ্ঠা তাহার,
সেই ব্রহ্মবিৎ পদে নমি বার বার।

আমাদের কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে বলিয়াছেন, দুইটী রাস্তা মানুষের সামনে খোলা আছে—একটী প্রবৃত্তি ও অন্যটী নিবৃত্তিমার্গ। ইহাদের দ্বারা যথাক্রমে অভ্যুদয় অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতিসাধন এবং নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। তুলনা করিলে বোধ হয়, হিন্দুজাতির সমুদয় চেষ্টাই অন্তর্ম্মুখী আর পাশ্চাত্য জাতির বহির্ম্মুখী। তাই হিন্দু অভ্যুদয় সাধনের জন্য যাগযজ্ঞ, যোগতপস্যা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক উপায় বহুপরিমাণে অবলম্বন করিল। এইগুলিদ্বারা বাস্তবিক ঐহিক কোন উপকার সাধিত হইতে পারে কি না, সে বিচারের এস্থলে প্রয়োজন নাই। কিন্তু পাশ্চাত্যজাতি যে প্রবল কর্ম্মনিষ্ঠাবলে আজ প্রকৃতির সহস্র সহস্র গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে ও দিন দিন করিতেছে ও এইরূপে প্রকৃতিকে আপনার দাসী করিয়া রাখিয়াছে, সেই কর্ম্মনিষ্ঠার দীক্ষা আমরা বোধ হয়, অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে লাভ করিতে পারি। আজ ভারতের চতুর্দ্দিকে হাহাকার; অন্নাভাবে শত শত প্রাণী মরিতেছে, মহামারী চারিদিকে আপন করালছায়া বিস্তার করিতেছে। কিছুকাল এইরূপ ভাবে চলিলে হিন্দুজাতির নাম ভারতবর্ষ হইতে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। এসময়ে কি অদৃষ্টের দোহাই দিয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়া নিশ্চিন্তমনে ধূমপান বিহিত? আমাদিগকে জাগ্রত হইতে হইবে—প্রবল উৎসাহসম্পন্ন হইতে হইবে। এসময় মহোৎসাহের বৈদ্যুতিক শক্তিসঞ্চার ব্যতীত ইহার জাগরণ অসম্ভব। তাই বলি, উঠিতে হইবে, জাগিতে হইবে। যাহাতে দেশের এই সকল অমঙ্গল দূর হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ক্ষীণ রাজনৈতিক আন্দোলনে অধিকার পাইবার আশা খুব কম। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা; বীর হইতে হইবে। নিজেকে উপযুক্ত হইতে হইবে। নহিলে ভিক্ষুকবেশে উপযাচক হইয়া অপরের দ্বারে উপস্থিত হইলে সে দয়া করিয়া কখন একটু ছেঁড়া রুটি দিবে, কখন বা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে।

উপযুক্ত আপনাদিগকে করিব কিরূপে? প্রথম উৎসাহসম্পন্ন হইতে হইবে; তাহার পর ধীরভাবে ভাবিতে হইবে, কিসে আমরা উপযুক্ত হই। অপরের চর্ব্বিতচর্ব্বণ গলাধঃকরণ করিয়া আপনি জাওর কাটিলে চলিবে না। আমাদের যা লেখাপড়া শেখা হইতেছে, তাহা কি কেবল এই জাওর কাটা নয়? আর উদ্দেশ্য কি? না, দুমুটা অন্ন—অন্ন। আপাত সুখের উত্তেজনায় লোক

ভবিষ্যৎ ভুলিয়া যায়। আমাদের দেশে এমন কি যুবকদল নাই, যাহারা আপাততঃ দুটী খাবার ভাবনা ছাড়িয়া আপাততঃ কিছু কষ্ট করিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য মাথা ঘামাইতে পারে? কই, বাঙ্গালা ভাষায় কখানা মৌলিক গ্রন্থ দেখিতেছি? হয় সংস্কৃতের, না হয় ইংরাজীর চর্ব্বিতচর্ব্বণ। মাতৃভাষায় এমন মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া চাই, যাহা পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় অনু-বাদের যোগ্য। তার পর শরীর? অল্প বয়সে সন্তানোৎপাদন ও ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া আমরা বল হারাইতে বসিয়াছি। শারীরিক বল সাংসারিক উন্নতির পক্ষে ত বটেই, আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষেও বিশেষ আবশ্যক। পিতামাতাগণ আপন আপন সন্তানগণকে কতকগুলা অনর্থক মাথা বকান হইতে নিবৃত্ত করিয়া আগে যাতে তাহারা মানুষ হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করুন। শারীরিক বল উপার্জ্জিত হউক, তার সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক অনুসন্ধানের স্পৃহা উত্তেজিত করা হউক। প্রথম প্রথম অবশ্য অনেককে আপন আপন স্বার্থে বলি দিতে হইবে—এমন কি, মরিবার জন্য পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। কারণ, নরবলি ব্যতীত ভারতমাতা কখন তৃপ্ত হইবেন না। কতকগুলি ভারতীয় নরনারী আপনা-দিগের বলি দিলে দেখিবেন, কেমন অপরাপর নরনারীতে শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে। কি সমাজে, কি রাজনৈতিক জগতে, কি যুগান্তর উপস্থিত হইতেছে। নূতন তত্বাবিষ্কারের চেষ্টা, এই হইতেছে মূলমন্ত্র। অপরে যাহা আবিষ্কার করিতেছে, তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। প্রাচীন ভারতের ফাঁকা গৌরব ঘোষণা করিলে চলিবে না। প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক পাশ্চাত্য-জগতের যাহা কিছু ভাল, সেই গুলিকে আপনার করিয়া লইতে হইবে, তার পর চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে আরো নূতন নূতন তত্ত্ব বাহির করিতে পারি। জীবনের প্রয়োজন কি কি, আগে বুঝিতে হইবে, তার পর সেগুলির সাধনে মন প্রাণ নিয়োগ করিতে হইবে।

আমরা কতকগুলি সংস্কারের ভারে, তাহা সুই হউক, বা কুই হউক, অব-সন্ন। সেইগুলি যেন তেন প্রকারেণ ঠিক, ইহা প্রমাণ করিয়া নাসিকায় সর্ষপ-তৈল প্রদানের চেষ্টা ছাড়িতে হইবে। যাহাতে উন্নতি হয়, তাহাই করিতে হইবে।

অনেকে দেশের ধনিগণের দিকে তাকাইয়া দেশের উন্নতির ভরসা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। অতি যে দরিদ্র, সে চেষ্টা আরম্ভ করুক—ধনিগণের ধন তাহার নিকট আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে। ভিক্ষুকের ভাব ত্যাগ করিয়া

বীর হইতে হইবে, ইহার প্রথম সাধনা, আপনাতে বিশ্বাস ও অপর সকলে বিশ্বাস। আমি কিছু করিতে পারি; এই সমস্ত জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে, ইহাতে আমারও একটু স্থান আছে এই বিশ্বাস লইয়া সকলেই নিজ নিজ স্থানে বসিয়া তাহারই উন্নতির পথ জানিতে হইবে। কবে আমি সুবিধা পাইব, কবে সব সুযোগ জুটিবে, ইহা ভাবিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে কোন উন্নতি কখন হয় না। বর্ত্তমান অবস্থায় বর্ত্তমান প্রবন্ধ, ইহাই জীবনসমস্যার মূলমন্ত্র। ভাবো, খাটো, প্রাণপাত কর। ইহাতে শুধু ঐহিক উন্নতি হইবে না, পারমার্থিক উন্নতির পথও সুপ্রশস্ত হইবে।

অধঃপতিত জাতির মুক্তির চেষ্টা উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুক্তি কার হয়? যে শত শত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ, তার কি কখন মুক্তি হয়? এ মুক্তির চেষ্টা আমাদের নিকট পাগলচেষ্টার, বাতুলতার নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলস্য—আলস্য—আমরা ঘোর আলস্যপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছি। মহা তমোগুণে আচ্ছন্ন। রজঃশক্তির প্রবল বিকাশ ভিন্ন যথার্থ সাত্ত্বিকতার বিকাশ সুদূরপরাহত। আমরা একটা বিষয়ে লাগিয়া থাকিতে পারি না, একটার জন্য প্রাণপাত করিতে পারি না। আমাদের সাহিত্য প্রেমের কবিতায় ও সাংসারিক আলস্যময় জীবনের সুখস্বপনে, আমাদের বিজ্ঞান কল্পনায়, আমাদের ধর্ম্ম অসার কর্ম্মাড়ম্বরে বা শুষ্ক জ্ঞানের কচকচিতে পূর্ণ। পরের দুঃখে হৃদয় বিগলিত হয় না, টিকিকে খাড়া উচ্চুণ্ড করিয়া বা একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের পথ পাইলাম! যে পাদরি প্রকাশ্য রাস্তায় চলিয়া গেলে ব্রাহ্মণের পথ চলা বন্ধ হয়, যে আমাদিগকে যখন তখন কেলে কালো 'নেটিব,' 'নিগার,' ইত্যাদি মধুর আখ্যা প্রদান করিয়া কান মলিয়া দেয় বা সবুট পদাঘাত করে, তাহার তখন অভিযোগের বিষয় কি আছে, বুঝিতে পারি না। দুঃখের বিষয় কি বলিব, যে ধর্ম্মে ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল এবং এখনও যেখানে অনেক মহাপ্রাণ ধর্ম্মবীরের নাম শুনা যায়, সে জাতিকে কি না ধর্ম্মবিষয়েও পাশ্চাত্য জাতির নিকট শিক্ষা লইতে হইতেছে! কি লজ্জা, কি ঘৃণা! আমাদের আত্ম-সম্মান বোধ একেবারে চলিয়া গিয়াছে। আমরা যথার্থই পতিত, যথার্থই হীন হইয়াছি।

কত দিন আর এ কাতরোক্তি করিতে হইবে, কত দিন আমরা এরূপে নিদ্রিত থাকিব? কত দিনে আমরা আমাদের যথার্থ প্রাচীন ভাবগুলির আদর

করিতে শিখিব ও পাশ্চাত্যগণের নিকট হইতে যাহা গ্রহণের উপযুক্ত, তাহা লইব? আমরা কি প্রাচীন শাস্ত্রে যথার্থ বিশ্বাসী? হায়, যদি আমরা যথার্থ বিশ্বাসী হইতাম, তবে কি আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইত? আমরা যে মহা কপট হইয়াছি। 'লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়' এই আমাদের মটো হইয়াছে। জাতিগঠন দূরের কথা। এক এক জাতির ভিতর সহস্র অবান্তরভেদ দূরের কথা। সেই অবান্তর ভেদের ভিতরও যে দলাদলি! বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করিয়া এস। দেখিবে, দলাদলি। এক গ্রামে দেখিলাম, তিন চার ঘর লোক, তার ভিতরে দুই দল। ইহার একমাত্র কারণ আলস্য। আলস্য-পরায়ণ হৃদয় শয়তানের লীলাক্ষেত্র। আমাদের এই স্বভাবসিদ্ধ আলস্য না তাড়াইলে কি আর আমাদের কোন উপায় আছে?

হিন্দুধর্ম্ম এই ভারতের ভিতর এত রকম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে যে, সকলকে হিন্দু বলিয়া মনে করা কঠিন। এত মতমতান্তরের পার্থক্য, এত আচার ব্যবহারের অনৈক্য! কিন্তু বাস্তবিক কি এই হিন্দুধর্ম্মের কোন সাধারণ ভাব নাই? অবশ্যই আছে। মহাপুরুষেরা হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ মতগুলি স্পষ্ট করিয়া প্রচার করিতেছেন। সেইগুলি বুঝিয়া ধারণা করিয়া আপন আপন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বর্জ্জন করিতে হইবে। মূলের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে, আগাছাগুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। একটু আচারের খুঁটিনাটিতে হিন্দু-সমাজচ্যুত না করিয়া যথার্থ সদাচার, সৎকর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্য, সহানুভূতি ও চরিত্র-বলের উপর হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। জন্মগত না করিয়া হিন্দুভাব কর্ম্মগত করিতে হইবে। তাহা না হইলে আমাদের ক্রমশঃ সংখ্যা হ্রাস হইয়া শেষে আমরা নিশ্চয়ই একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম কথিত।)

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে।]

সপ্তমীপূজা, শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খৃঃ অঃ।

আজ ঠাকুর রামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরীতে আগমন করিয়াছেন। অনেকগুলি কাজ। শারদীয় মহোৎসব—রাজধানী মধ্যে হিন্দুর প্রায় ঘরে ঘরে আজ মায়ের সপ্তমীপূজা আরম্ভ। ঠাকুর অধরের (খ) বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিবেন ও আনন্দময়ীর আনন্দোৎসবে যোগদান করিবেন। আর একটি সাধ—শিবনাথকে দর্শন করিবেন।

বেলা আন্দাজ তিন প্রহর হইতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ফুটপাথের উপর একটি ছাতা হাতে করিয়া মাষ্টার পাদচারণ করিতেছেন। একটা বাজিল, দুইটা বাজিল, কিন্তু ঠাকুর আসিলেন না। শ্রীযুক্ত মহলানবীশের ডিস্পেন্সারির ধাপে মাঝে মাঝে বসিতেছেন ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে ছেলেদের আনন্দ ও আবালবৃদ্ধ সকলের ব্যস্তভাব দেখিতেছেন। বেলা তিনটা বাজিল, কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই সমাজমন্দিরদৃষ্টে ঠাকুর করজোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গে হাজরা। মাষ্টার ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আমি শিবনাথের বাড়ী যাব।" ঠাকুরের আগমন বার্তা শুনিয়া দেখিতে দেখিতে কয়েকটি ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া জুটিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া ব্রাহ্মপাড়া মধ্যে শিবনাথের বাড়ীর দ্বারদেশে লইয়া গেলেন। শিবনাথ বাড়ীতে নাই। কি হইবে? দেখিতে দেখিতে বিজয় (গ) মহলানবীশ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষেরা উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া সমাজ মন্দির মধ্যে লইয়া গেলেন। ঠাকুর

(ক) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) অধরলাল সেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বাড়ী শোভাবাজার বেনেটোলা। ঠাকুর তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। অধর প্রায় প্রত্যহ গাড়ী ভাড়া করিয়া আফিসের পর ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালিবাড়ীতে যাইতেন।

(গ) শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

একটু বসুন—ইতিমধ্যে শিবনাথ আসিয়া পড়িলেও পড়িতে পারেন। ঠাকুর আনন্দময়, সহাস্য বদনে আসন গ্রহণ করিলেন। বেদীর দিকে যে স্থানে সংকীর্ত্তন হয়, সেই স্থানে বসিবার আসন করিয়া দেওয়া হইল। বিজয়াদি অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত সম্মুখে বসিলেন।

সাধারণ ব্রহ্মসমাজ ও

সাইনবোর্ড (Sign-Board) সাকার, নিরাকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি, হাসিতে হাসিতে)। শুনলাম এখানে সাইন-বোর্ড (Sign-board) আছে। অন্যমতের লোক নাকি এখানে আসিবার যো নাই। নরেন্দ্র (ক) বল্লে 'সমাজে গিয়ে কাজ নাই, শিবনাথের বাড়ীতে যেও।'

"আমি বলি সকলে তাঁকে ডাক্‌ছে। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। কেউ বল্‌ছে সাকার, কেউ বল্‌ছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক, যার নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারই উপাসনা করুক। তবে এই বলা যে মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) ভাল নয়। অর্থাৎ আমার ধর্ম্ম ঠিক, আর সকলের ধর্ম্ম ভুল। আমার ধর্ম্ম ঠিক আর ওদের ধর্ম্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে—এ ভাব ভাল, কেন না ঈশ্বরের স্বরূপ তাঁর সাক্ষাৎকার না কল্লে বুঝা যায় না।

"কবীর বল্‌তো, 'সাকার আমার মা নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো কাকো বন্দো দোনো পাল্লা ভারী।'

"হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়ীতে মাছ আনেন আর পাঁচটি ছেলে থাকে তাহলে সকলকেই পোলোয়া কালিয়া করে দেন না। কেন না সকলের পেট সমান নয়। কারুর জন্য মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন কিন্তু মা সকলকেই সমান ভাল বাসেন।

"আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব। (সকলের হাস্য)। আমি ভাজা, হলুদ দিয়ে টকের মাছ, বাটিচচ্চড়ি এ সব তাতেই আছি। আবার মুড়ির ঘণ্টতেও আছি, কালিয়া পোলোয়াতেও আছি। (সকলের হাস্য)।

(ক) ইদানীং স্বামী বিবেকানন্দ।

"কি জান, দেশ কাল পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। যদি কোন মত আশ্রয় করে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হলে তিনি সে ভুল শুধরে দেন। যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথ দর্শনে বেরোয় আর ভুলে দক্ষিণদিকে না গিয়ে উত্তরদিকে যায়, তাহলে অবশ্য কেউ বলে দেয়, 'ওহে ওদিকে যেওনা, দক্ষিণদিকে যাও'। সে ব্যক্তি কখন না কখন জগন্নাথ দর্শন করবে।"

"তবে অন্যের ভুলমত হয়েছে একথা আমাদের ভাববার দরকার নাই যাঁর জগৎ তিনি ভাবছেন। আমাদের কর্তব্য কিসে যো সো করে জগন্নাথ দর্শন হয়।"

"তা তোমাদের মতটি বেশ তো। তাঁকে নিরাকার বলছো তাতো বেশ। মিছরির রুটি সিদে করে খাও, আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগবে।"

(বিজয়ের প্রতি) তবে মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। তুমি বহুরূপীর গল্প শুনেছ? একজন বাহ্যে করতে গিয়ে গাছের উপর বহুরূপী দেখেছিল। বন্ধুদের কাছে এসে বল্লে আমি একটি লাল গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস একেবারে পাকালাল। আর একজন সেই গাছতলা থেকে এসে বল্লে যে, আমি একটি সবুজ গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস একেবারে পাকাসবুজ। কিন্তু যে গাছতলায় বাস কর্ত্তো, সে এসে বল্লে তোমরা যা বলছ সব ঠিক, তবে সে জানোয়ারটি কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, আবার কখন কোন রং থাকে না।

"বেদে তাঁকে সগুণ, নির্গুণ দুই বলা হয়েছে। তোমরা নিরাকার বলছো, একঘেয়ে। তা হোক। একটা ঠিক জানলে অন্যটাও জানা যায়। তিনিই জানিয়ে দেন। তোমাদের এখানে যে আসে, একেও জানে, আবার তাঁকেও জানে।"

ঠাকুর এই বলিয়া দুএকজন ব্রাহ্মভক্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(বিজয়ের প্রতি উপদেশ।)

বিজয় তখনও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। ব্রাহ্মসমাজের একজন বেতনভোগী আচার্য্য। আজকাল তিনি ব্রাহ্মসমাজের সব নিয়ম মানিয়া চলিতে পারিতেছেন

না ; সাকারবাদীদের সঙ্গে মিশিতেছেন। এই সকল লইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কর্তৃপক্ষীয়দের সঙ্গে তাঁহার মনান্তর হইতেছিল। এই সমাজের ব্রাহ্মভক্তদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ হঠাৎ বিজয়কে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন।

(বিজয় ও লোকনিন্দা।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশ বলে তোমার নাকি বড় নিন্দে হয়েছে? যে ভগবানের ভক্ত, তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাই (Anvil); হাতুড়ীর ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্ব্বিকার। যেমন তেমনি। অসৎ লোকে তোমাকে কত কি বলবে, নিন্দা করবে। তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তাহলে সব সহ্য করবে।

(বিজয় ও দুষ্ট লোক।)

দুষ্ট লোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বর চিন্তা হয় না? দেখ না, ঋষিরা বনের মধ্যে থেকে ঈশ্বরকে চিন্তা করতো। চারিদিকে বাঘ, ভালুক, নানা হিংস্রক জন্তু। অসৎ লোকের বাঘ ভালুকের স্বভাব, তেড়ে এসে অনিষ্ট করে।

এই কয়টির কাছে থেকে সাবধান হতে হয়। প্রথম, বড়মানুষ। টাকা লোকজন অনেক, মনে করলে তোমার অনিষ্ট করতে পারে। তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বলে, সায় দিয়ে যেতে হয়। তার পর কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের মিষ্টি আওয়াজ করে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর ষাঁড়। গুঁতোতে এলে তাকেও মুখের আওয়াজে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও তাহলে তোর চোদ্দপুরুষ তোর হেন তেন বলে গালাগাল দেবে। তাকে বলতে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তাহলে খুব খুসি হবে, তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।

অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হইয়া যাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে হুঁকো টুকো আছে? আমি বলি আছে।

কারও কারও সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় চোবল দেবে। চোবল সামলাতে অনেক বিচার আনতে হয়। তা হলে হয়তো তোমার এমন রাগ হবে, তার আবার উল্টে অনিষ্ট করতে ইচ্ছে হয়।

(বিজয় ও সাধুসঙ্গ।)

তবে মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ বড় দরকার। সৎসঙ্গ করলে তবে সদসৎ বিচার আসে।

বিজয়। অবসর নাই, এখানে কাজে আবদ্ধ থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমরা আচার্য্য। অন্যের ছুটি হয়, কিন্তু আচার্য্যের ছুটি নাই। নায়েব একধার শাসিত করলে, জমিদার আর একধার শাসন কর্ত্তে পাঠান। তাই তোমার ছুটি নাই।

বিজয়। (কৃতাঞ্জলি)। আপনি একটু আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওসব অজ্ঞানের কথা, ঈশ্বরই আশীর্ব্বাদ করবেন।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাস।)

বিজয়। আপনি কিছু উপদেশ দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে, সমাজগৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া)। এ এক রকম বেশ। সারে মাতে। সারও আছে; মাতও আছে। (সকলের হাস্য)। আমি বেশী কাটিয়ে জলে গেছি। (সকলের হাস্য)। নক্স খেলা জান? সতের ফোঁটার বেশী হলে জলে যায়। একরকম তাস খেলা। যারা সতের ফোঁটার কমে থাকে, তারা বড় সেয়না, পাঁচে থাকে, সাতে থাকে, দশে থাকে। আমি বেশী কাটিয়ে জলে গেছি।

কেশব সেন বাড়ীতে লেকচার দিলে। আমি শুনেছিলাম। অনেক লোক বসেছিল। চিকের ভিতর মেয়েরা ছিল। কেশব বল্লে, হে ঈশ্বর, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা ভক্তির নদীতে একেবারে ডুবে যাই। আমি হেসে কেশবকে বল্লাম, "ভক্তির নদীতে যদি একেবারে ডুবে যাবে, তাহলে চিকের ভিতর যাঁরা রয়েছেন, ওঁদের দশা কি হবে? তবে এক কর্ম্ম করো। ডুব দেবে, আর মাঝে মাঝে আড়ায় (ক) উঠবে। একেবারে ডুবে তলিয়ে যেও না।" এই কথা শুনে কেশব আর সকলে হো হো করে হাঁস্তে লাগলো।

তা হোক্! আন্তরিক হলে সংসারেও ঈশ্বর লাভ করা যায়। 'আমি' আর 'আমার' এইটি অজ্ঞান। হে ঈশ্বর 'তুমি' ও 'তোমার' এইটি জ্ঞান। সংসারে থাক যেমন বড় মানুষের বাড়ীর দাসী। সব কাজ করে, ছেলে মানুষ করে,

(ক) আড়া অর্থাৎ নদীর পার

বাবুর ছেলেকে বলে 'আমার হার,' কিন্তু মনে মনে বেশ জানে, এবাড়ী আমার নয়। সব কাজ করে, কিন্তু তার মন দেশে পড়ে থাকে। তেমনি সংসারে সব কর্ম্ম কর, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রেখো। আর জেনো যে গৃহ, পরিবার পুত্র এ সব আমার নয়, এ সব তাঁর। আমি কেবল তাঁর দাস।

আমি মনে ত্যাগ করতে বলি। সংসার ত্যাগ করতে বলি না। অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে তাঁকে আন্তরিক চাইলে তাঁকে পাওয়া যায়।

(ব্রাহ্মসমাজ ও ধ্যানযোগ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি)। আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান করতুম। তার পর ভাবলুম, এমন করলে, (চক্ষু বুজলে) ঈশ্বর আছেন, আর অমন করলে (চক্ষু খুললে) কি ঈশ্বর নেই? চক্ষু খুলেও দেখ্‌ছি, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, জীব, জন্তু, গাছ, পালা, চন্দ্র সূর্য্যমধ্যে, জলে, স্থলে, সর্ব্বভূতে তিনি আছেন। আবার অন্তরে হৃদয়মধ্যেও আছেন।

(শিবনাথ 'মম তেজোংহংশসম্ভবম্') (ক)

কেন শিবনাথকে চাই? যে অনেক দিন ঈশ্বর চিন্তা করে, তার ভিতর সার আছে। তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে। আবার যে ভাল গায়, ভাল বাজায়, কোন একটা বিদ্যে খুব ভাল রকম জানে, তার ভিতরও সার আছে, ঈশ্বরের শক্তি আছে। এটি গীতার মত। চণ্ডীতে আছে, যে খুব সুন্দর, তার ভিতর সার আছে, ঈশ্বরের শক্তি আছে।

(শ্রীযুত কেদারনাথ চাটুর্য্যে।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। আহা! কেদারের কি স্বভাব হয়েছে, এসেই কাঁদে। চক্ষু দুটি সর্ব্বদাই যেন ছানাবড়া হয়ে আছে।

বিজয়। সেখানে (খ) কেবল আপনার কথা ও আপনার কাছে আসবার জন্য ব্যাকুল।

(ক) 'যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংহংশসম্ভবম্।

(খ) ৺কেদার চাটুয্যে পরম ভক্ত। তখন ঢাকায় সরকারি কাজ উপলক্ষে ছিলেন। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন ঢাকায় মাঝে মাঝে যাইতেন, তখন তাহার সহিত দেখা হইত। দুজনেই ভক্ত, পরস্পর দর্শনে আনন্দ করিতেন।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মভক্তেরা নমস্কার করিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন। ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিতে যাইতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বার আমেরিকায় গিয়া অধিকাংশ সময় কালিফোর্ণিয়ায় বেদান্ত প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ তথায় একটি মঠ স্থাপিত হইয়াছে, ইহা উদ্বোধন পাঠকগণের বিদিত আছে। ঐ সময়েই কালিফোর্ণিয়ার রাজধানী সানফ্রান্সিস্কো সহরে এক বেদান্তসভা গঠিত হইয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহার সভ্য—ডাক্তার লোগান নামক এক বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহার সভাপতি। এই সভায় স্বামী তুরীয়ানন্দ অনেক দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির পর তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইলে উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত সেই সভার কার্য্য করিবার জন্য গিয়াছেন। এই সভার সভ্যগণ স্বামীজির মহাসমাধির সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত 'প্যাসিফিক বেদান্তিন' নামক সংবাদপত্রিকায় গভীর শোক প্রকাশ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এত সুন্দর, এত মর্ম্মস্পর্শী ও তাঁহার প্রতি এত গভীর প্রেমের পরিচায়ক যে আমরা উদ্বোধন পাঠকগণকে তাহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

"পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ গত ৪ঠা জুলাই হঠাৎ নশ্বর মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া জগদম্বার অনন্ত ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছেন। আমাদের প্রিয়তম স্বামীজি তাঁহার গুরুর পদাঙ্কানুসরণ করিলেন। তাঁহারই সম্বন্ধে তিনি 'আমার গুরু' নামক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গুরুসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, কোন মানব কখন তাহার গুরুপাদপদ্ম সম্বন্ধে এত সুন্দর ভাষায় লিখে নাই। তিনি তাঁহার গুরুকে যেরূপ ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন, আমরাও সেইরূপ তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিব। মহাপুরুষগণ জগতের হিতার্থে যুগ-যুগান্তরে এক এক বার আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তিনিও সেইরূপ একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট ও অন্যান্য মহাপুরুষগণের অবতারস্বরূপ ছিলেন। তিনি বর্ত্তমান কালের অভাব দূর করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বাস্তবিক তাঁহার গুরুর সহিত অভেদাত্মা ছিলেন— যিনি প্রাচীন আধুনিক

সকল ধর্ম্মের সমন্বয়ের অবতার। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মহান ভাবরাশি দ্বারা সমুদয় জগৎ তোলপাড় করিয়া গিয়াছেন—যতদিন পর্য্যন্ত কালের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন উহারা কালরূপ গৃহে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। তাঁহার নিকট সকল ব্যক্তি ও সকল ধর্ম্মমত এক ছিল। তাঁহার খৃষ্টের ন্যায় দয়া এবং সূর্য্য ও বায়ুর ন্যায় সকলের প্রতি সমভাব ও সদাশয়তা ছিল। কি রাজা কি প্রজা, কি ধনী কি দরিদ্র, কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ, এমন কি, পতিত ক্রীতদাস ও বেশ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিত। তিনি বলিতেন, সকলেই এক পরিবার-ভুক্ত, আমি দেখিতেছি, আমি তাহাদের সকলের ভিতর রহিয়াছি এবং [illegible] আমার ভিতর রহিয়াছে। এই জগৎ এক পরিবার স্বরূপ—ঈশ্বর ইহার [illegible]তা স্বরূপ ও ইহার যথার্থ সত্তা। প্রকৃতি তাঁহাকে অতি মনোহর রূপ [illegible]লেন, কিন্তু অবিশ্রান্ত কঠোর পরিশ্রমের উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করেন [illegible] জগৎ আশাবাণী শুনিবার জন্য কাতরভাবে অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি [illegible] তাহা শুনাইলেন—তিনি জগতের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। [illegible]ই দেশে প্রথম আসিলেন, তখন তাঁহার বয়স অতি অল্প, তাহাতে [illegible] বিদেশ; এখানে আধুনিক কালের বাছা বাছা ধর্ম্মাচার্য্যগণের সহিত [illegible] হইল। সেই বিরাট ধর্ম্মসভায় অগণ্য যুক্তিপ্রিয় দর্শকগণের মনে তাঁহার [illegible] দর্শন ও অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তিগুণে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভীতি উৎপাদন করা এবং [illegible]ও এই ভাব বরাবর রক্ষা করিয়া চলাতে তাঁহার অপরিমিত পরিশ্রম [illegible]ইহা তাঁহার কোমল শরীরে কিরূপে সহ্য হইবে? সেই মহতী সভায় এরূপ অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন পুরুষ আর কেহ ছিলেন না, আর কোন ধর্ম্ম-প্রতিনিধিই এরূপ শক্তি দেখাইতে পারেন নাই। আর কাহারই এত মহান এত বৃহৎ কার্য্য ছিল না। আমাদের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ সম্ভ্রম শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিলেন। যখন তিনি মিচিগানের অন্তর্গত ডিট্রএট সহরের ভিতর দিয়া যান, তখন লোকে বলিতে লাগিল, 'ইঁহার প্রকাণ্ড বুদ্ধির সহিত তুলনায় এই অধ্যাপকগণ শিশুমাত্র' 'এই প্রকাণ্ড হিন্দুঝড় জগৎকে তোলপাড় করিয়া দিয়াছে।' তাঁহার নিকট কোন জাতিই অপরিচিত ছিল না অথবা কোন দেশই তাঁহার বিদেশ ছিল না। সমগ্র পৃথিবীই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল। এখন তিনি তাঁহার কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ জগজ্জননীর ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছেন; আবার এই সন্তপ্ত কাতর জগতে আসিবেন। যখন তিনি আবার আসিবেন, তখন যেন আমরা তাঁহাকে সম্যক বুঝিতে পারি আর আমাদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বশেষ দেখিয়াছেন, তাঁহারা যেন সেই সময় ইহলোকে বর্ত্তমান থাকেন, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

যখন তিনি এই সুদূর প্রশান্তমহাসাগরোপকূলে আসিয়াছিলেন, আমাদের অনেকেরই তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। অনেক ভক্ত খৃষ্টীয়ানগণের পক্ষে যীশুখৃষ্ট যেরূপ, আমাদের পক্ষে তিনিও সেইরূপ। যদিও এক্ষণে আমাদের নিকট তিনি স্থূলশরীরে বর্ত্তমান নহেন, তথাপি তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের অধিকতর সমীপে রহিয়াছেন। আমরা যে তাঁহাকে স্থূলশরীরে দেখিয়াছিলাম, সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছিলাম এবং তাঁহার মধুর ঐশ্বরিক প্রভাব অনুভব করিয়াছিলাম, তাহাতে আমরা আপনাদিগকে অতিশয় সৌভাগ্যশালী মনে করি।

উঠুক এ মন্ত্র সদা আমা সবাকার
অনন্ত শাশ্বত পদ হোক গো তোমার—
হে স্বামীজি, প্রিয়, প্রিয়তম আমাদের—
কি দিবসে, কি রাত্রিতে, সেই অনন্তের।

স্বামীজির শরীর ত্যাগে আমাদের বেদান্ত প্রচার—এমন এক নেতা হারাইলেন, যিনি আমাদের সকলের গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধার বস্তু ছিলেন। তাঁহার মধুর হাস্য, সুমিষ্ট বাণী ও মধুর সম্ভাষণে সকলেরই তাঁহাকে যত্ন করিয়া কাছে রাখিতে ইচ্ছা হইত। তিনি মানবীয় ও দৈব শ্রেষ্ঠ গুণসমূহের আধার এক অদ্ভুত পুরুষ ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম আদর্শে জীবন যাপন করিতেন, সুতরাং তাঁহার নাম, তাঁহার চরিত্র ও তাঁহার স্মৃতি তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের পক্ষে চিরকালের জন্য উচ্চ ভাবের উদ্দীপক আধ্যাত্মিক শক্তিস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিবে।

নাহি মৃত্যু ভবমাঝে—দেব একজন
ধীর পদে ধরাতলে করে বিচরণ;
প্রিয়তম বন্ধু আমাদের যবে হরে,
'মৃত' বলি আখ্যা তদা দিই তাঁহাদেরে।
কিন্তু চক্ষু অগোচরে সদা সন্নিকটে
প্রিয় অমরাত্মাগণ করে বিচরণ,
জান না কি অনন্ত এ ব্রহ্মাণ্ড ভুবন
প্রাণরূপ— কভু হেথা নাহিক মরণ?

ভ্রাতঃ, সখে, গুরো, শান্তি ও বিদায়।

পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা এই সভা হইতে এই কয়েকটী প্রস্তাব স্থির করিলাম,—

১ম—আমাদের পূজনীয় আচার্য্যদেবকে জগদম্বা আমাদের নিকট হইতে কেন কাড়িয়া লইলেন, ইহা আমরা যদিও সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিতেছি না, তথাপি আমরা সেই জগদম্বার ইচ্ছার নিকট ভক্তিভাবে মস্তক অবনত করিতেছি, যাঁহার পক্ষে ভ্রম ও নিষ্ঠুরতা অসম্ভব।

২য়,—যদিও আমরা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ গুরুর দেহত্যাগ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্তোষকর দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি না, তথাপি আমাদের পরমাত্মায় বিশ্বাস অটলভাবে বর্ত্তমান আর আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, তাঁহার শোকসন্তপ্ত সন্ন্যাসী গুরুভাইগণকে ভগবান সান্ত্বনা দিবেন।

৩য়—এই সভার বিবরণীপুস্তিকায় আমাদের প্রিয় পরলোকগত গুরুর প্রতি ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি রক্ষিত হউক এবং উহার নকল ভারতের মঠে বা অন্যত্র তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভাইগণের নিকট প্রেরিত হউক।

সানফ্রান্সিস্কোর বেদান্তসভা হইতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রেরিত—

এম, এইচ, লোগান—সভাপতি।
সি, এফ, পেটার্সন—সহকারী সভাপতি।
এ, এস, উডবার্গ—সম্পাদক।